অনুবাদ পত্রিকা

মে—সেপ্টেম্বর ২০০২

যে পত্রিকা কখনো
পুরানো হয় না।

With Best Compliments from :—



A

WELL

WISHER

ANUBAD PATRIKA :

A BENGALI HINDI QUARTERLY JOURNAL OF TRANSLATION

অনুবাদ পত্রিকা

মে-সেপ্টেম্বর সংখ্যা : ২০০২

ANUBAD PATRIKA

May-September : 2002

৫৪ তম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (১৯৮১) অভিনন্দিত এবং 'আনন্দপুরস্কার', 'মাতা কুসুমকুমারী' পুরস্কারে সম্মানিত।

সম্পাদক : বৈশম্পায়ন ঘোষাল

যুগ্ম সম্পাদক : অনুরাধা মহাপাত্র

সহ সম্পাদক : বিতস্তা ঘোষাল

মুখ্য উপদেষ্টা : ড। স্বরাজ সেনগুপ্ত

Editor—Baishampayan Ghoshal

Joint Editor—Anuradha Mahapatra

Asst. Editor—Bitasta Ghoshal

Chief Adviser—Dr. Swaraj Sengupta

Registrarion No. N 27068/75
Anubad Patrika

May-September—2002
Rs. 25·00

P19056

P19057

'ভাষা সংসদ' এর পক্ষে

প্রচ্ছদ-শিল্পী : হিরণ মিত্র

সম্পাদক, প্রকাশক : কৈলাশপতি ঘোষাল
ভাষা সংসদ প্রকাশন, ৮নং, নটবর দত্ত রো, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত।
অনুবাদ পত্রিকা, ৩ শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৭ প্রকাশিত।
ফোন—২১১ ২১৭৮ (অফিস)

সম্পাদকীয়

আমরা মর্মাহত. আমরা শোকাহত এই কারণে. যে আমাদের দেশবাসী, আমাদের জন্মভূমি ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়ভূমি গুজরাট—সেখানে চলেছে শত শত মানুষ নিধন। আমরা ধিক্কৃত, লজ্জিত এই কারণে যে সমগ্র সহজ মানবতাবোধ আজ ধ্বংসের মুখে! আমরা বিপন্ন এবং সত্যই চিন্তান্বিত যে সারাদেশে ধর্ম, জাতি, ক্ষমতা দখলের নামে ভবিষ্যতেও এই দাঙ্গা, নারীসম্ভার এই চরম অবমাননা, পাশবতা সারা দেশে না ছড়িয়ে পড়ে। আমরা সবসময়ই অত্যাচারিতের পাশে। শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, লালন, দাদু, কবীর, গোপালকৃষ্ণ আদিগা, মানবেন্দ্রনাথ রায়, আর. কে. নারায়ণ, গুরু গোবিন্দ সিং, কুমারন আসান, মহাত্মা গান্ধী, বীরসা মুণ্ডা, সৈয়দ আলী সরদার জাফরি, জগদীশচন্দ্র বসু, বিবেকানন্দ ও কস্তুরী রঙ্গনের মতো বিজ্ঞানী, দ্রষ্টা, চিন্তাবিদরা—

"জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন শববাহনের শক্তি খোঁজে তবু প্রেম
পাওয়া যায় কিনা তার অক্লান্ত সন্ধানে"—

যে পথ অতিক্রম করে গেছেন আমাদের দেশের মানবসংস্কৃতির নানান অধ্যায়ে, মানুষের ভেতর তার উত্তর পথের কি এখানেই শেষ? 'অনুবাদ পত্রিকা' তা বিশ্বাস করে না। এই মহাকালে সময় থাকে না, তারার আলো থাকে স্থির। তাই আমাদের মতো মুমুক্ষু মানবতাবাদীদেরও একই আশা—এই পাশব-প্রস্তরযুগে তুলা সময়ও একদিন চলে যাবে। আজ প্রয়োজন, নবতর সহজ মানবতার—যা আমাদের হৃদয়কে একসূত্রে বাঁধবে।

হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হচ্ছে। শেকড় থেকে উৎখাত, তারা দিশেহারা দেশে—দেশান্তরে। এই জগৎও আজ আমাদের স্পর্শ করে, অস্থির করে। সারা পৃথিবী জুড়ে এঁদের ভাষা সন্ধান চলেছে।

অনুবাদ পত্রিকা শুরু করেছিলেন, সৃষ্টি-সৃষ্টি-চিন্তা-হৃদয়ের অধিকারী সুহৃদ শ্রীবৈশম্পায়ন ঘোষাল, শুভ স্বরাজ সেনগুপ্ত, ডা বিকল্প ভট্টাচার্য তাঁদের অমল অক্লান্ত সাধনায়। অনুবাদ-পত্রিকা'র মিলন সাগর তীরে মিলিত হয়েছিলেন দেশের নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অমিতধর শক্তিশালী সাহিত্যিক, কবি প্রমুখ। তাঁদের তরণে ফসলে ভরা জাহাজ এখনো ডুবে যায়নি। সে খুঁজে চলেছে ভাষা ও সংস্কৃতির নতুন নতুন বন্দর দেশে ও দেশের বাইরে নানান প্রান্তে।

দেশের একশো কোটি মানুষের ভাষা এবং আন্তর্জাতিক ভাবে আরও কয়েক লক্ষ ভারতবাসীর ভাষা আজ আর শুধু বাংলা ও হিন্দী ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বাংলা ভাষা দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত, তামিল, ওড়িয়া, অসমীয়া, সাঁওতালী (দেশীয়) আর আরবী, ফারসী, তুর্কী, ফরাসী, ওলন্দাজ ও নানান উপজাতীয়দের ভাষা, শব্দ ও উচ্চারণ ভঙ্গিমার সংমিশ্রনে বয়ে চলেছে। আবার বাংলা ও দেশের বহু প্রান্তিক ভাষাও তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বেঁচে আছে। কেমন বাংলারই এক প্রান্তে প্রাচীন ভাষা লেপচা, সুদূরে গারোদের ভাষা, কোঙ্কনী ও কাশ্মীরীদের একেবারে স্বতন্ত্র স্বাধীন এক ভাষা তাদের মাথা উঁচু করে চলেছে—সব মিলিয়েই ঐক্য। রবীন্দ্রনাথ, রোমাঁ রলাঁ, কবীর, দাদুরে বা আদিবাসী জগতের ভাষাশিল্পী ও সুফীরা যে হৃদয়ের মিল দেখতে চেয়েছেন দেশের ভেতরে ও দেশের সীমানা পেরিয়ে।

বর্তমান অন্ধকার রক্তমাখা নখর দাঙ্গা অধ্যুষিত বিচ্ছিন্ন সময়েও দোয়েল, শ্যামার সঙ্গে সিন্ধু সারস গান গেয়ে ডানা মেলে উড়ুক কোনো নতুন দিগন্তের সন্ধানে।

সম্পাদক অনুবাদ পত্রিকা

সূচিপত্র

ইংরেজী কবিতা
আমজাদ আলি / তোমার সুরেদ
অনুবাদ : সুভাষ বসু

সুকৌকবিতা
দাদু
অনুবাদ : অতুল কুমার দত্ত

মালয়েশিয়া : আধুনিক সাহিত্য
অনুবাদ : স্বরাজ সেনগুপ্ত

ফরাসী কবিতা
রাসেল এডসনের গদ্যকবিতা
অনুবাদ : আনন্দ ঘোষ হাজরা

উর্দু কবিতা
আলী সরদার জাফরী
অনুবাদ : তরুণ দীর্ঘাঙ্গী

জার্মান কবিতা
কমলা লেবুর রস করার যন্ত্র / ফলকার ব্রাউন
অনুবাদ : রেবা ঘোষ

উর্দু গল্প
রাজা ইন্দ্রের দূত / কৃষণ চন্দর
অনুবাদ : কমলেশ সেন ১১

তামিল গল্প
সদাভিষেকম / জি. এস. বালকৃষ্ণন
অনুবাদ : সৌরভ চক্রবর্তী

সুইটজারল্যাণ্ডের কবিতা
রেইজ সেঁদ্রারস ও তার কবিতা
অনুবাদ : কমলেশ চক্রবর্তী

ওড়িয়া কবিতা
রাজা / প্রদ্যুম্নকেশরী সেনাপতি
অনুবাদ : অনুরাধা মহাপাত্র

ইংরেজি কবিতা
ঘুম / এগওয়ার্ড টমাস
অনুবাদ : কল্যাণী ঘোষ ৩৩

প্রাচীন রাজস্থানী দোহা সাহিত্য
অনুবাদ : জ্যোতির্ময় দাশ

হ্যামলেটের দুর্গ / হাইড প্রেসটন
অনুবাদ : দিলীপ ঘোষ ৩৮

গ্রন্থ-সমালোচনা

আমজাদ আলি

তোমার সরোদ

সুভাষ বসু

তিরিশ কোটি ক্ষুধার্ত আত্মা
মেঘমল্লার রাগের মূর্ছনায়,
তোমারই সরোদে, আমজাদ,
ভালো বর্ষার প্রার্থনা জানায়—
আনুক তোমার সরোদের তারগুলো
পেটভরা খাদ্য সঙ্গীতের সুরে সুস্বরে
বর্ষা নামুক, ওস্তাদ !

কান খাড়া করে শোনে ন্যাংটো ছেলেটাও,
পেটে ওর নাড়িভুড়ি ছেড়ে ক্ষুধার্ত হাঙ্গর—
স্বর্গের সুরগুলো
গ্যালোক্সির ফাঁক থেকে ছেলে নিয়ে আস
বুঝি তুমি ?
ধন্য তোমার সরোদের মীড়গুলো !
মহাকাশে গুপ্ত গহ্বরা নড়ে—
অনাহারী পেটগুলোও ক্ষুধা ভোলে
মুহূর্তের জন্য, আমজাদ আলি !
বিবর্ণ ক্ষুধাকে উড়িয়ে দাও
তুমি হাওয়ায়, আকাশে,
মহাকাশ জুড়ে
এঁকে মায়া তোমার আঙুলের, ওস্তাদ !

কখন আবার ধরলে রাগদরবারী, গুরু ?
জানতেও দাওনি—আমাকে ?
ন্যাংটো ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল
তোমার নতুন রাগের আলাপে।
কোরার মা বৃথাই চেষ্টা করে
বুনো শেকড়গুলো সেদ্ধ করে নিতে,
হাঙ্গর ওর হাঁড়িতে নেই এক ফোঁটা জলও যে !
যাবে নাকি এখনই সে

দুক্রোশ দূরে অন্ধকারে
ছোট্ট নদীটির কাছে
জলের প্রার্থনা নিয়ে ?

নাকি তোমার রাগ দরবারীর সুরে
যে বারিধারা ঝরে তার চোখে
সেই নোনা জলেই সেচ হয়ে যাবে ওর বনা বাগান ?

অথবা ধরবে নাকি আবার মেঘমল্লার, ওস্তাদ,
ডেকে আনবে সজল ঘন মেঘ, শুধু ওরই জন্য,
আর ভিজিয়ে নিতে তোমার ছোট্ট সরোদের তারগুলোও
সেই সঙ্গে ?
আর তা যদি না হয় ? যদি তা না হয়—
ন্যাংটো ছেলেটা জেগে উঠবে নাকি
ওর হাঙ্গর-পেট ক্ষুধা নিয়ে—
চোখে ওর জ্বলবে নাকি আগুন—
যখন তোমার সরোদ মধ্যলয়তালে স্বপ্ন ছড়িয়ে যাচ্ছিল মুঠো মুঠো,
তখন,
রক্তে ভাসিয়ে দেবে নাকি সে
মহারাজের বৈঠকী দরবার ?

আর আমি ?
আমি কি ঘুমাব, ওস্তাদ আমিতে ?
আর স্বপ্ন দেখব এক জোড়া পায়ের
হাড্ডিসার রোগা—
যারা তোমার সরোদের তারে তারে
সিঁড়ি বানিয়ে চাঁদে চলে যাবে বলে,
সেই চাঁদ—যে কোন মনোহরা স্বপ্নের দেশে
একখানা গোল ঝলসানো রুটির রূপ নিয়ে
হেসে যাচ্ছিল, আকাশের কোণে ?
ঘুমাব, ওস্তাদ,
যখন দ্রুত ত্রিতালে রাগ দরবারী বাজিয়ে যাচ্ছিল—
আমজাদ আলি, তোমার সরোদ ?

[লেখকের Foot steps of the First Ray of Light কাব্যগ্রন্থের Amjad Ali, your Sarod কবিতার অনুসৃতে অনুবাদ]

দাদূ

অনুবাদ : অতুলকুমার দত্ত

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ও ক্ষিতিমোহন সেনের গ্রন্থার্থ ও উপক্রমণিকা সহ দাদূ গ্রন্থটি ২৫শে বৈশাখ ১৩৪২ বাংলা কবিগুরুর ৭৫ তম জন্মদিনে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি তারও প্রায় দুশ্বর আগে রচিত।

দাদূ ছিলেন অক্ষর পরিচয়হীন সাধক। কারো কারো মতে দাদূর জন্মস্থান আমেদাবাদে কিন্তু সেখানে তাঁর চিহ্ন মাত্রও নেই। উইলসন সাহেবের মতে দাদূ ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁর প্রধান গ্রন্থ দাদূ পন্থী গ্রন্থ। ফরাসী অধ্যাপক টাসীর মতে দাদূ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং আকবরের রাজত্বকালে এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। জাতিতে তুলা ধুনকার ছিলেন। বার বছর বয়সে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করে সহরে যান এবং সেখান থেকে নারায়না বা নিরানা গ্রামে বাস করেন এবং জীবনের শেষ ভাগ সেখানেই যাপন করেন। সাধনায় তাঁর গভীরতম সত্যের উপলব্ধি হয় এবং সেই সত্যকে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি দ্বারা প্রকাশ করেন।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, দাদূ মোট সেলাই করা সূচির বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম কাশীর কাছে জৌনপুরে। দাদূর পূর্ব বা স্বপ্রদত্ত নাম "মহাবলী"। মতান্তরে মুসলমান ধুনোবংশে দাদূর জন্ম। ধুনির মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই আছে। মুসলমান ধুনকর শাখা মুসলমান ও হিন্দু ধুনকর বংশ থেকে হিন্দু হয়ে যায়। উচ্চশ্রেণীর মুসলমান হলেও কোরান, হাদিস প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র, মুসলমান দর্শন ও সাধন শাস্ত্রাদি প্রচলিত থাকত। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি প্রদেশে মুসলমান ধুনকরদের বলে ধুনিয়া বা পিঞ্জারা। এই পিঞ্জারাগণও অনেকেই দাদূভক্ত। তুলসী দাস ব্রাহ্মণ ; কমাল ও দাদূ উভয়েই নিম্নকুলে উৎপন্ন সাধক।

দাদূর মৃত্যুকাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ।—আত্মিক ও তাত্ত্বিক উপলব্ধ সত্য তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন ও কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশে শিষ্যই তা শুনে কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন। সৌভাগ্যক্রমে দুই এক জন শিষ্য তাঁরই সেই অনেক বাণী মুখ কণ্ঠ থেকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অনেকজনের কাছ থেকে সংগৃহীত বাণী নানা আকার ধারণ করেছে। কাজেই শেষ পর্যন্ত পদ-সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তার মোট ছয়টি প্রকরণ নিম্নরূপ :—

প্রথম প্রকরণ—জাগরণ। গুরু, সাধু ও চেতনী এই তিনটি অঙ্গ থাকে।

দ্বিতীয় প্রকরণ—উপদেশ, নিন্দা নিরোতন, পারিখ দায়, নিরবলতা ও জীবিত মৃতক এই পাঁচটি অঙ্গ থাকে।

তৃতীয় প্রকরণ—তত্ত্ব। কাল, সাচ, বিচার (সিদ্ধ সত্য) কস্তুরিয়া, মৃগ ও সবদ এই পাঁচটি অঙ্গ থাকে।

চতুর্থ প্রকরণ—সাধনা। প্রথমে সাতটি বাধার অঙ্গ : ভেক, ঘন, মায়া, সূক্ষ্ম জন্ম, উপজ, নিরকুণিয়া, হৈরান—
এবং সাতটি সহায়ক অঙ্গ : বিনতি, বিশ্বাস, মধ্য, সারগ্রাহী, সুমিরন, লয়, সজীবন।

পঞ্চম—পরিচয়। জরণা, পরচা, অবিহড়, সাখীভূত, বেলী, সমরথাই, পীর পিছান। মোট সাতটি অঙ্গ।

ষষ্ঠ—প্রেম। বিরহ, সুন্দরী, নিহকর্মা পতিব্রতা। তিনটি অঙ্গ।

ভক্তদের বিভাজনমত এই ছয় ভাগের মধ্যে প্রথমেই হল জাগরণ। জাগরণের মধ্যে প্রথমে গুরু অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে গুরু অঙ্গের কয়েকটি দোঁহার অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হল।

দাদূ

গুরু অঙ্গ বাণী

(১)

ইন্দ্রিয়-অগম্য স্থানে মিলেছেন গুরুদেব, তাঁর পেয়েছি প্রসাদ।
মস্তকে আমার তিনি হাত রেখে দীক্ষা দিয়েছেন অগম্য অগাধ॥
সেই সদ্‌গুরু মিলেছেন সহজেই নিয়েছেন কণ্ঠে লাগিয়ে।
দয়ালের হল দয়া এ-প্রদীপ তিনি দিলেন জাগিয়ে॥
দাদূ, দয়াল-দেবের পথ গুরু দেখিয়ে দিলেন।
তালার চাবিটি এনে সকল কপাট খুললেন॥
সকল অঞ্জন ক'রে দূর, সদ্‌গুরু খুললেন যত নয়ন পটল।
বধির যে দুই কানে শোনে, বোবা মুখে কথায় অটল॥
মনকে ফিরিয়ে দিয়ে সদ্‌গুরু করলেন একেবারে আরেকটি রূপ।
দাদূ, পঞ্চেন্দ্রিয় পালটিয়ে কি জানি কেমন করে হয়েছে অনূপ॥

(২)

দাদূ, এমনি পেয়েছি গুরু, মুখ থেকে কাড়েন মৃত্যুকে, অন্ধকে লোচন দেন।
দাদূ, মিলেছেন এমন গুরু জীবকে ব্রহ্ম করে নেন॥
দাদূ, মুখ থেকে কাড়েন মরণকে শ্রবণে শুনিয়ে নানা গান।
দাদূ, এমনি সে গুরু মিলেছেন, মৃতকে তোলেন বাঁচান॥
দাদূ, এমনি সে গুরু মিলেছেন যিনি সদা সুখে সমাহিত।
দাদূ, এমনি সে গুরু মিলেছেন, মহিমা যে বর্ণনাতীত॥
দাদূ, মিলেছেন গুরু খেয়ামাঝি, চড়িয়ে নিলেন তাঁর গায়।
আসনটি অমর-অলেখ ছিল, নিয়ে রাখলেন সেই ঠাঁয়॥
কৃত্রিম লঙ্ঘন করে সেইখানে নিরঞ্জন স্থান।
সত্য সহজেই নিয়ে, সেই প্রিয়তম স্থানেই মেলান॥

(৩)

বাইরে সম্পূর্ণ দগ্ধ, ভিতরেতে চূর্ণ করেছেন।
সদ্‌গুরু সভাতে যখন মারেন, দরবাসী সবুজই থাকেন॥
যখন শব্দ গুরু গাইলেন মুখে, তাঁর কাছে কিই বা নিকট কি বা দূর।
দাদূ, শিষ্য শুনেছে শ্রবণ ভরে, স্মরণে রইল জেগে সুরে॥
কায়া-রূপ ঘট, কামধেনু মাঝে রয়, মূঢ় দুর্বল দিনে দিনে হয়।
ধাবক সে গুরুজ্ঞান অনুপেক্ষিত অথবা মণ্ডিত, নষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়॥
মন্থনে প্রদীপ জ্বল, সব ঘট হয়েছে প্রকাশ।
হে দাদূ সে দীপ হাতে, গেলাম যে নিরঞ্জন পাশ॥

(৪)

আমার মাঝেই মালিক আমার, পর্দা খুলে গুরু যে দেখায়।
দশ দিশ ভরা সরোবর, পক্ষী পিপাসী উড়ে যায়॥
মান-সরোবর মাঝে জল, পিপাসী যে এসে করে পান।
প্রেম-রসের পেয়ালা ভ'রে ভ'রে গুরু পান স্বহস্তে করান॥

(৫)

দেন তিনি বেদনার সুতীব্র আঘাত, ছিঁড়ে গেলে জুড়ে দেন তার।
দাদু প্রেমধ্যান এভাবেই সাধন করান, গুরু-পীর তিনিই আমার॥
সদ্‌গুরু সন্ধান করে নাও, সত্য সাধন করে নাও।
সত্য স্বামীকে সন্ধান করে, অগাধ ভক্তি কর লাভ॥
কতলেও বহু চন্দ্রোদয়, কিংবা অসংখ্য সূর্যের প্রকাশ।
এক নিরঞ্জন নাম বিনা হয় না কোনই আলোকিত মহাকাশ॥
কবে এ অহংকার যাবে চলে, কবে আর সকলের বিস্মরণ হবে।
সৃষ্টিতত্ত্ব কবে হবে এর, কবে এ পাড়াতে স্থান পাবে॥
দাদু, পেয়ালা প্রেমময়, প্রেম-অমৃতের জল পান।
দ্রবীভূত হলে তবে পাবে, সেই সুনিকট স্থান॥
নয়ন তো দেখেনা নয়ন অন্তরও তো কিছু দেই।
হাতে দিলে দর্পণ সদ্‌গুরু অরূপ-পরূপ মেলে হৃদয়-মাঝেই॥

(৬)

সোনার সঙ্গে রৈবী কিসের, মারে সুতীব্র হাতুড়ি আঘাত।
দাদু, তার সব কলঙ্ক কেটে কষ্টে লগন রাখে॥
জলের মধ্যে রাখ যদি তাকে, স্বর্ণকলঙ্ক যাবে না কখনো।
তাই দাদু গুরুজ্ঞান অনুসারে, সুতপ্ত করা অগ্নিতে নিক্ষেপ॥
অন্তরে মধুর প্রেম, বাইরে রাখেন কটুভাব।
সদ্‌গুরু এইভাবে শিষ্যকে শেখান, সব সাধু সাক্ষ্য দেন শুধু একথার॥

(৭)

ব'লে ব'লে জিহ্বা আমার, শুনে শুনে তোমারি দুকান।
সদ্‌গুরু সে কোরা করবে কি বল, চেলাই যে মূঢ় অজ্ঞান॥
পঞ্চদিকে পঞ্চবাদ, পঞ্চ দিশা পঞ্চের পঞ্চটি ঘাট।
ততক্ষণ এ-বিষয়ে বোলো না কিছুই, যতক্ষণ গুরু না সেথান ঘাট॥
জ্ঞান সব শুনে নিয়ে শিষ্য শিখল সব, তোল না তো ময়লা মনের।
তবে দাদু, করবে কি তুমি, ব্যর্থ বাষাই শুধু মনের ভিতর॥

(৮)

হে দাদু, অন্ধে অন্ধ মিলে চলে, বেঁধে কাতারে কাতার।
কূপে পড়ে দেখি আমি, অন্ধরা যত সারে সার ॥
শরীরকে করে না শুদ্ধ, দেহের মধ্যে খোঁজে না মোটেই, সবাইকে দেয় উপদেশ।
আশ্চর্য দেখি যে দাদু, এরা যাবে কোন্ দেশ ॥
মায়ায় কেড়ে এরা আবার মায়াতে দেয় ফেলে।
হে দাদু, সামনে সৃজনকর্তা, সত্য গুরু যদি মেলে।
"তুমি আমার আমি তোমার" গুরু-শিষ্য মন্ত্র জপেছেন ॥
উভয়েই ভুলে যান, হে দাদু, কাহাকে ভুলে গেছেন ॥

(৯)

জ্ঞান-কর্মে বেঁধে এ জগৎ, ভুলিয়ে দিলেন পণ্ডিত।
দাদু সৎগুরু মেলেন নি মোটে যিনি পথ দেখিয়ে দেবেন ॥
পাপ পথ-নির্দেশ দেন, জ্ঞান-করম-বিশ্বাস।
নিকট নিরঞ্জন যিনি রয়েছেন, তাঁর কথা কেন না বলেন ॥
স্ব-স্বার্থে সবাই আপন, প্রাণের প্রেমিক প্রয়োজন।
দুঃখের সাথী এক স্বামী, প্রেম-ভক্তি বিশ্রাম আপন ॥

(১০)

জ্ঞান, কর্মে বেঁধে এ জগৎ পণ্ডিত দিলেন ভুলিয়ে।
দাদু, সৎগুরু মেলেন নি মোটে যিনি পথ দেখিয়ে দেবেন ॥
পাপ-পন্থা গুরু উপদেশ দেন, জ্ঞান কর্মে বিশ্বাস করেন।
নিকটে নিরঞ্জন রয়েছেন যিনি তাঁর কথা কেননা বলেন ॥
স্বার্থে সবাই আপন, প্রাণের প্রেমিক প্রয়োজন।
দুঃখের সাথী শুদ্ধ স্বামী, প্রেম, ভক্তি বিশ্রাম ॥

মালয়েশিয়া ঃ আধুনিক সাহিত্য

স্বরাজ সেনগুপ্ত

ইওরোপ বা আমেরিকার মাপকাঠিতে লেখা আধুনিক সাহিত্যের প্রচলন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বেশী দিনকার নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বরং বলা যায়। ডাচদের শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত ইন্দোনেশীয় লেখকেরা বিশ দশকে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন ('আজব দান সংসার') 'বালায় পুস্তক সভা'র দৌলতে। 'আজব দান সংসারকে' মালয়ী উপন্যাসের জনক বলা যায়। আধুনিক কবিতার প্রচলন করেন মহম্মদ যামিন 'জং সুমাত্রা' পত্রিকায়। এ কবিতাকে মালয় ভাষায় বলা হয় 'সাজক'। প্রচলিত চার-পংক্তির 'পানতুন' কাব্যরীতির ব্যতিক্রম।

মালয়ে অবশ্য এই আধুনিক সাহিত্যের ঢেউ এসে পড়ে আরও পরে। মালয়ের লেখকেরা 'পানতুন', 'জয়ের' (S' Jair), 'সেলোকা', 'গুরিং দাম' ইত্যাদি ছন্দের মামুলি ধারার লোকগাথা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে প্রগতিশীল ইন্দোনেশীয় লেখকদের অনুপ্রেরণায়। প্রকৃত উপন্যাসের সূচনা করে সৈয়দ শেখ আল্ হাদির 'হিকায়ত ফরিদ হানুন' ও আহম্মদ বিন মোহম্মদ রসিদ-এর 'কওয়ান বেনার'। সৈয়দ শেখ আল্ হাদির উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খৃস্টাব্দে আর 'কওয়ান বেনার' প্রকাশিত হয় ১৯২৭-এ। মনসুরী এস. এন-এর 'আওয়ান পুতে' পানতুন ছন্দে রচিত হলেও তা সমকালীন সাহিত্য-স্বীকৃতি লাভ করে। যুদ্ধপূর্বে মালয় উপন্যাসগুলিতে প্রায় পানতুন শ্লোকের উপস্থিতি লক্ষ্য করবার মত। ইন্দোনেশীয় লেখক আরমিন পানির 'বলেনগু' (শৃঙ্খলিত), মোইস-এর 'সালে আজুহান' (ভুল প্রতিপালন), আলি বনের 'লায়ব টেক্সকেমবাং' (পালতোলা জাহাজ) কিংবা মাহ্রু রাসলির 'সিতি মুরবাজা' (নারী মুক্তি) প্রভৃতি গ্রন্থ আধুনিক মালয় উপন্যাসের পথপ্রদর্শক বলা যায় এক কথায়।

পাশ্চাত্য আঙ্গিকের ছোটগল্পও উনিশশ' পঞ্চাশের আগে মালয়ী তামিল বা মালয়ী চীন ভাষায় লেখা হয়নি। তবে ইতোমধ্যে তারা ইন্দোনেশীয় ভাষায় প্রচলিত হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশীয় খুব কংগ্রেস ও বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টা মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে সাড়া জাগায়। জাপানী সামরিক অধিকারের সময় মাতৃভাষা মালেয়ু স্বীকৃতিলাভও করে। মালয় ও সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ লেখক ও বুদ্ধিজীবী যারা এতকাল ইংরেজিতে লিখতেন, তাঁরা এবার মালয় ভাষায় লিখতে শুরু করেন। এবং 'বাজার মালেয়ু' লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বা জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

এই স্বীকৃতি মালয়ী লেখকদের মাতৃভাষায় নতুন নতুন রচনা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানের সামরিক শাসন খুব বেশি দিন ছিল না। তবু এ স্বল্প কালের মধ্যে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্ন রূপ প্রকট হয়ে ওঠে। ইন্দোনেশীয় কবি ও লেখক কারিরিল আনোয়ার, বিভাই আশিম, আসরুল সানি, সিতু মোরাং, উতি. টি সন্তানি প্রমুখ বিভিন্ন কবি, লেখক ও নাট্যকারদের অনুপ্রেরণায় মালয়েশীয় কবি মাসুরী এবং টেকাত ওয়ারন প্রমুখ কবিরা পুরাতন রচনারীতি ছেড়ে স্বাধীন ইন্দোনেশীয় লেখকদের অনুসরণে ব্রতী হন নতুন সাহিত্য রচনায়। কবি মাসুরীর 'আওয়ান পুতে,' টেকাত ওয়ারনের 'জেলমু বং' প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পুইসি মেলায়ু বারু (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) এবং সাজক মেলায়ু বারু [১৯৪৬-১৯৬১]—আধুনিক মালয় কবিতা গ্রন্থে এই প্রচেষ্টার স্বাক্ষর

পাওয়া যায়। যুদ্ধোত্তর মালয় সাহিত্যের নতুন ভাণ্ডারায় গল্প সৃষ্টির, কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের বান ডাকে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—বিশেষ করে সংবাদপত্রে এই সকল রচনা প্রকাশিত হত। সহজ অনাড়ম্বর এই ধারা প্রচেষ্টা জাতীয় উন্মেষের সহায়তা করে অনেকখানি। কেবল ইন্দোনেশীয় নতুন সাহিত্যের অনুকরণ নয়, পাশ্চাত্য ও মার্কিন কবি ও লেখকদের রচনার সার্থক অনুবাদের কাজও চলতে থাকে সমানে। ইন্দোনেশিয়ার জাত ডাচ কবি দু পেরন কিংবা টি. এস এলিয়টও বাদ যাননি। গল্পে মোপাসা ও এন্টন চেকভের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কেরিল মাস তার 'পাতে ভুম' প্রভৃতি গল্পে কিংবা রুগলি তার উপন্যাস 'এনক দান কেমানেকন' প্রভৃতি রচনায় সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার কষ্টিপাথরে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরিবর্তনের ধারা রূপায়িত করার চেষ্টা করেন তিনি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে।

উতাই উতাই, টি সন্তানির নাটক 'আওয়াল দান মিরা' স্বাধীনতা উত্তর ইন্দোনেশীয় সরকারী গলদের মুখোশ খসিয়ে দেয়। মোচতার লুবিস তাঁর উপন্যাস 'তিদক আদ্ ইসক'-এ (আগামী কাল নয়) জাকার্তার সমকালীন ইন্দোনেশীয় জীবন ধারার নগ্নরূপ তুলে ধরেন। তিনি তাঁর ঐ উপন্যাসে একটির পর একটি গল্পের সাহায্যে উপন্যাসিক ঘটনা পরম্পরার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। প্রমুদ্যা অনন্ত তুর 'পরিবার' কিংবা তাঁর দীর্ঘ উপন্যাস 'বিকলাঙ্গ যারা' এবং ইদ্রুস আজ্জিদিয়াৎ, কে, মহাজা-এর 'এক্সিস্' প্রভৃতি ইন্দোনেশীয় উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিবেশী মালয় লেখকদের উপর দেখা যায়। মালয়ী ঔপন্যাসিক আহমদ লুতফি, ইশাক বিন হাজি মহম্মদ এবং হারুণ বিন মহম্মদ আমিন প্রমুখ অনেকেই ইন্দোনেশীয় উপন্যাসিকদের অনুসরণে লিখতে শুরু করলেও আঙ্গিকের দিক থেকে তাদের লেখা উপন্যাস-সংজ্ঞা লাভ করেছে কিনা ঠিক বলা যায় না। উপন্যাসের বৃহৎ কলেবরও লাভ করেনি তাদের অনেকে। আহমদ লুতফির কাহিনীগুলি অনেকটা পর্যায়ভুক্ত ঘেঁষা শয়নকক্ষের কেচ্ছা কাহিনীতে পর্যবসিত। অবশ্য, তাঁর 'বেংকাই বাঙ্গিয়াওয়া' ও 'সিসা মেরাকা দুনিয়া' প্রভৃতি উপন্যাসে জাপ অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী নির্যাতন ও নিপীড়নের নিষ্ঠুর কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—বিশেষ করে যুদ্ধবন্দী ও শ্রমিকদের উপর জাপানীদের অকথ্য অত্যাচারের কথা। ইশাক তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস 'পুতেরা গুনং তাহান' ও 'এনাক মাত লেলা গিলা'প্রভৃতিতে ব্রিটিশ শাসকপুষ্ট মালয়েশিয়ার অভিজাত ও আমলাতান্ত্রিক সমাজের রূপটি প্রতিফলিত করেছেন শাণিত ব্যঙ্গ পরিহাসের অস্ত্রে। অবশ্য, তিনি তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'যুডি কারেন' 'বুদক কো' ও 'পৈনগানতিক বারু'তে সামাজিক বিপ্লবের জিগির তুলেছেন। হারুণ বিন মহম্মদ আমিনের বাদল গল্পের সংকলন 'চেরিতা পেনডেক' আধুনিক বহু মালয় গল্প সংকলনের পথিকৃত বলা যায়। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'পারলিমা আওয়াং' আনন্দিক মাগেলানের প্রথম বিশ্ব পরিক্রমার পটভূমিকায় রচিত। ইশাক বিন হাজি মহম্মদ ও আহম্মদ লুতফি যদিও সমাজ সচেতন রাজনৈতিক পটভূমিকায় প্রচুর মূলক একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তবুও কিন্তু তাঁদের লেখা অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক বকবকানিতে পর্যবসিত। মালয়ী উপন্যাসের অগ্রগতির পথ হয়েছে তাতে ব্যাহত।

বর্তমান রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া আজ দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ভাষা ও সংস্কৃতির মিলনও দুই দেশের মধ্যে অনেক খানি বিদ্যমান। মালয়েশিয়ার প্রাচীন সাহিত্য ও ইন্দোনেশীয় পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে—একথা বলা যায়। সুতরাং সমকালীন মালয় সাহিত্যকেও আধুনিক ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের ধাঁচে ঢালাই করাই বিধেয়। (T. Wignesan-তাঁর সম্পাদিত Bunga Emas-গ্রন্থে এই মত পোষণ করেছেন।)

ছোট গল্প

ছোটগল্প মালয়-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইংরেজিতে এই ছোটগল্প ত্রিশ দশকের [illegible] থেকে লেখা শুরু হয়। ইওরোপীয় ও মার্কিন সাহিত্যই মালয়েশিয়ার এই সকল কথা-সাহিত্যিকদের গল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। স্থানীয় আচার ব্যবহার ও জীবনধারা প্রতিফলিত করেছিল তাদের এই সকল গল্প কাহিনী। এই লেখকদের সকলে প্রায় ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত। ইংরেজি পড়ুয়াদের জন্যই বিশেষ করে এঁরা লেখনী ধারণ করেছেন। সৃষ্টিসের এই সকল পাঠকেরাই ছিল এঁদের সমর্থক। কারণ, কোনো সংবাদ প্রতিষ্ঠান বা বড় পত্রের প্রকাশনের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে তাঁরা ছিলেন বঞ্চিত। এমন কি, কোনো সাহিত্যপত্রও সে সময় প্রকাশিত হয়নি। ফলে হয়ে এই সকল লেখকদের তখন বিদেশী পত্র-পত্রিকায় নিজেদের রচনা প্রকাশের জন্য ধরণা দিতে হত। ফলে একটা লাভ হল যে, মালয়েশিয়ার ছোট গল্প সুলভ প্রচারের অভাবে আপন বৈশিষ্ট্য হারাতে পারেনি।

ইংরেজিতে মালয় ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে এস রাজরত্নম, লিলিক লিয়াং, আংও কেন্ডুয়া প্রমুখ কথাশিল্পীরা প্রসিদ্ধ। রাজরত্নম সিঙ্গাপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তারপর ছোটবেলা থেকে তিনি মালয়ের বাসিন্দা। ইংলণ্ডে উচ্চ শিক্ষার জন্য ছিলেন দীর্ঘকাল। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে তিনি সিঙ্গাপুরে পি এ পি সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ফলে লেখনী তাঁর স্তব্ধ হল। তবু তিনি সার্থক কথাশিল্পী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর 'ফেমিন', 'দি লোকাস্ট', 'হোয়াট হ্যাভ উই বি ডান' প্রভৃতি কাহিনীগুলি তার প্রমাণ। প্রবীণদের মধ্যে লিলিক লিয়াংই এখন পর্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর গল্প সংগ্রহ 'মিডটস ইন দি সান এ্যান্ড আদার স্টোরস' ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। এর অনেকগুলি কাহিনী বিশেষ করে 'বার্থডে', 'আমি তোমু' ও 'রিটার্ন টু মলয়' প্রভৃতি রচনা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। 'এনকাউন্টার', 'চান্স', 'প্রেজেন্ট এপিনিয়ন' 'মাম' ইত্যাদি কাগজে তাঁর ছোট গল্প স্থান লাভ করেছে। 'মাম' পত্রিকার তিনি সম্পাদকও ছিলেন।

মালয়েশিয়ার এই সকল আধুনিক লেখক পাশ্চাত্য রীতি ও আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যকর্মে। তাঁদের সাহিত্য সাধনার অধিক কালও কেটেছে বিদেশে। রাজরত্নমের কেটেছে যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে। ব্যারিস্টার লিলিক লিয়াং-এর কেটেছে অস্ট্রেলিয়ায়। আর ওয়াং কেন্ডুয়ার জাতীয়তাবাদী চীন ও বিদেশের নানা স্থানে। এস রাজরত্নমই প্রথম ইংরেজি ছোটগল্পের অঙ্গসৌষ্ঠব মালয়েশিয়ায় প্রবর্তন করেন। দেশের গরীব, অনুন্নত ও পদদলিত সম্প্রদায়ের মৌন ভাষা মুখর হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টিতে। সাধারণ মানুষের এই হাসিকান্নার কথা মানবিকতার কষ্টিপাথরে তিনি প্রতিফলিত করেছেন—সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছেন। এ জন্য তিনি প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতেও দ্বিধা করেননি। তিনি তাঁর 'ধর্ম' গল্পে ধর্মভীরু সাধারণ মানুষের প্রতি ধর্ম-সংস্কারকের অবিচারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। 'দুর্ভিক্ষ' কিংবা 'কেবল তারদের জন্য' কাহিনী নীচের তলার গরীব মানুষদের উপজীব্য করে রচিত। তাঁর এইসকল গল্প কাহিনী কেবল অনুন্নত দেশ মালয়েশিয়ায় নয়, ভারতের জনগণের মধ্যেও নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। ''পঙ্গপাল', 'কী করা হবে' প্রভৃতি গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাজরত্নমের মানবতন্ত্রী রাজনীতি ও সমাজসচেতন সাহিত্যবোধের সার্থক উত্তর—সাধক বাস্তববাদী লিলিক লিয়াং।

এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে শক্তিধর এই গল্প লেখক উচ্চ শিক্ষার্থে অস্ট্রেলিয়া চলে যান। মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তিনি প্রথম গল্প লিখতে শুরু করেন এবং ছোট গল্পের টেকনিকটি আয়ত্ত করেন। রাজরত্নমের মতো তিনিও সমাজের নীচের তলার লোক—পঙ্গু, অন্ধ, বুদ্ধিহীন, অসুস্থ, অবহেলিতদের নিয়ে কাহিনী ফেঁদেছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি কেবল বাস্তবপন্থী নন, আশাবাদীও। 'জন্মদিন', 'একটি বালিকা মাত্র', 'আমি টুমু' প্রভৃতি

গল্পে এই স্বাক্ষর রয়েছে। কাশিম আহমেদ-এর ছোটগল্পেও বিশেষ করে এই রাজনৈতিক চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। 'একটি সাধারণ গল্পে' এই সম্ভাবনার প্রভূত স্বাক্ষর রয়েছে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, আধুনিক মালয়েশিয়ার অধিকাংশ কথাশিল্পী বিত্তশালী মধ্যবিত্ত সুখী পরিবার থেকে এসেছেন। এবং সমাজের নীচের তলার লোকদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক অনেকটা পুঁথিগত। নাড়ীর সম্পর্ক তেমন নেই। ওয়াং কেদুয়াও এমনি এক শক্তিধর লেখক, যদিও তাঁর অধিকাংশ গল্পে ব্রয়েডীয় যৌন বিশ্লেষণের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি নরনারী চরিত্র চিত্রণে তাদের পূর্ব সংস্কার, নৈতিক নিয়মকানুন ও যৌনবোধের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। নতুন সমাজগঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। অধিকাংশ চরিত্রই তাঁর বারবনিতা, পতিতা 'দেবদাসী' আর কুমারী মাতা বা কন্যাদের নিয়ে রচিত। 'কোনো সিঁড়ির নীচে মঞ্চিরাণী', 'একটি নতুন অনুভূতি' প্রভৃতি গল্প কাহিনীতে তাঁর সমাজ সচেতন নতুন সাহিত্য সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মালয়েশিয়ার বাসিন্দা ইন্দোনেশীয় লেখক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরই ছদ্মনাম হলো ওয়াং কেদুয়া। ওয়াং কেদুয়ার মতো আর একজন প্রসিদ্ধ গল্পলেখক হলেন উই বুম সেঙ। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কুয়ালালামপুরে তাঁর জন্ম। সিঙ্গাপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্রের স্নাতক তিনি। মালয়-বেতারে নিয়মিত গল্প পাঠ করেন। 'অড্ অবসেশন' গল্পে তিনিও ওয়াং কেদুয়ার অনুসৃত গল্প শৈলীর পথ বেছে নিয়েছেন।

রাজরত্নম, লি কক লিয়াং বা ওয়াং কেদুয়ার অনুকরণে নতুন একদল গল্প লেখক—লেখিকারও আবির্ভাব ঘটে। স্থানীয় স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এঁরা গল্প লেখায় হাত মকস করেন। এঁদের অধিকাংশ হল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক বা অধ্যাপক কিংবা সাংবাদিক। তরুণ এ সকল গল্পলেখকের মধ্যে লিম থি এন সু, তান হক সেনঙ, লয়েড ফার্ণান্ডো, বাদা লিম, সো ইং লিম, বালাম সুন্দ্রাম, গো সুতিয়ান, পৈত্তক ইং কা ওন, ওস্যারি ইয়াং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই অন্তত একটি না একটি রসোত্তীর্ণ রচনা সৃষ্টি করার দাবী রাখেন।

অবশ্য এঁদের মধ্যে লিম থি এন সু, সো ইং লিম, পৈত্তক ইং কা ওন ও গ্যারি ইয়াং ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি লাভ করেছেন গল্প লেখক হিসেবে। গ্যারি ইয়াং এর রচনা যদিও পরিণতি লাভ করেনি তবুও তাঁর সৃষ্টিশীল লেখনীর বিরাম নেই। অতি সাধারণ ছোটখাট বিষয় নিয়ে তিনি গল্প ফাঁদতে পটু। তান হক সেনঙ, লয়েড ফার্ণান্ডো বা কাসিম আহমেদ কেবল গল্প বলার জন্য গল্প লেখেন না বরং তাঁরা নিজস্ব মতবাদ প্রচারের জন্য গল্পের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ফার্ণান্ডোর 'পেইড্ ইন ফুল' আর 'দি রিটার্ণ' এখানে স্মরণীয়। তিনি তাঁর প্রতিটি গল্পের শেষে চমক বা সারপ্রাইজের আশ্রয় নেন। 'Twixt cup and the Lip' গল্পে তিনি মালয়ের অসাম্প্রদায়িক বিবাহকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা আজকের সমাজে দেখা দিয়েছে তাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তান হক সেনঙ, লয়েড ফার্ণান্ডোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন গল্প লেখায়। তবে তিনি ফার্ণান্ডোর চাইতে শক্তিধর। এখনও তিনি গল্পে কানু সম্পাদকের মত টীকা-টিপ্পনি প্রয়োগ করতে ছাড়েন না।

তরুণ লেখকদের মধ্যে বাদা লিমের 'স্লেট অব অ্যাফেয়ার্স' প্যাট্রিক ইং-এর 'ইন্টারভিউ', বালাম সুন্দ্রমের 'স্যাটারডে নাইট' প্রভৃতি গল্পে মার্কিন সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ছাপ রয়েছে, বিশেষ করে 'অ্যাডি'-তে হেমিংওয়ের বিখ্যাত কাহিনী 'ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দি সী'র প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করবার।

আধুনিক মালয়েশিয়ার কথাসাহিত্যের আলোচনা অসমাপ্ত হয়ে থাকবে যদি না আর একজন শক্তিশালী কথা-শিল্পী ও কবির উল্লেখ না করা হয় এখানে। তিনি হলেন টি. উইঙ্গলেশান। মালয়ের কুয়ালালাইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার কোনো ছাপ তাঁর নেই। কিন্তু আধুনিক মালয়-সাহিত্যে তাঁর স্থান প্রথম সারিতে। 'ওয়ান মোর ওয়ান', 'দি অল্টার বয় অ্যান্ড দি পোপ' এবং 'দি বগি ইন দি বৈটি অব দি লঙ নেম' প্রভৃতি গল্পে তিনি তাঁর স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'টাকল অব এ ট্রাম্প' শিরোনামায় তিনি তাঁর কবিতার একটি

সংকলনও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান হল 'বাঙ্গাইমাস' / সোনালী ঝুল ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সমকালীন মালয়েশীয় গল্পকবিতা ও নাটকের এ সংকলনটি সম্পাদিত করে—প্রকাশ করেন তিনি. Rayrath (Ray books) publications Malaysia। এই সংকলনটি মালয়েশিয়ার সাহিত্যের একটি সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরেছে।

সহায়ক গ্রন্থ-পঞ্জি :

বাঙ্গাইমাস বাঙা ইমাস : টি উইংফিলান

এশিয়া : এ হ্যাণ্ডবুক : গাই উইন্ট-সম্পাদিত

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার ইন টোয়েন্টিয়েথ সেনচুরী খণ্ড ১—৩

য়েজারী অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার : ভগোবার্ট দা' ব্রুয়েন। সম্পাদিত

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত আঠাশ বছরের একটি অমল উজ্জ্বলতা।

অনুবাদ পত্রিকা

বার্ষিক ১০০ টাকা দিয়ে চার সংখ্যার গ্রাহক হোন।

পত্রিকা সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনদাতারা এর মাধ্যমে পৌঁছে যান। লেখা পাঠান।

দেশ থেকে দেশের বাইরে।

বিজ্ঞপ্তি ॥ সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে।

রাসেল এডসনের কবিতা

অনুবাদ : আনন্দ ঘোষ হাজরা

গদ্য-কবিতা লেখকদের মধ্যে ফরাসী দেশে খুবই বিখ্যাত ছিলেন ফ্রানসিস্ পঁজ (১৮৯৯—১৯৮৮)। সুররিয়ালিজম্, কমিউনিজম্, অস্তিত্ববাদ, সব কিছুতেই আগ্রহ ছিল তাঁর। কবিতাতেও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর একটি বইয়ের নাম— 'Le Parti Pris de Choses'। ইংরেজিতে অনুবাদ করলে হয়ত দাঁড়াবে 'taking sides with things'। তিনি সেই সব বিষয়ে নিমজ্জিত থাকতে ভালোবাসতেন যা লেখকের 'ইগো'কে বিনষ্ট করে। আর এক ফরাসী গদ্য-কবিতা লেখক Rene Char (১৯০৭—৮৮) ভালোবাসতেন গ্রাম্যজীবন, ভূমধ্যসাগরীয় ঐতিহ্যের ধারা ইত্যাদি।

এঁদের গদ্য-কবিতার ধারায় পুষ্ট রাসেল এডসন। জন্ম ১৯৩৬। ফরাসী গদ্য-কবিতার এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। কনেকটিকাটে থাকেন। তিরিশ বছর পরে ১৯৯৪ সালে তাঁর একটি সংকলন বের হয়েছে যার ইংরেজি নাম দাঁড়াবে 'The tunnel'।

এডসনের কবিতার অনুবাদ ইংরেজি অনুবাদ থেকে।

বিকৃত প্রাতরাশ

ছোট ছোট চাকায় তীক্ষ্ণ শব্দ করতে করতে আর সব কিছুকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে অগ্রসর হ'তে হ'তে একটা বিশাল জুতো দিগন্তের দিক থেকে উঠে আসছে। ঠিক সে সময় এক ভদ্রলোক তাঁর বারান্দায় প্রাতরাশ সারছিলেন। প্রায় রাত্রি-আকারের একটা বৃহদাকার ছায়া তাঁকে ঢেকে ফেললো।

তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা ভারী কৌণাল জুতো পৃথিবী ফুঁড়ে যেন বাইরে আসছে।

জুতোটির উপরের দিকের অগ্রভাগে যিতে ধাঁধা নেই ; সেখানে বিরাট ওলটানো জিবটার ঠিক পিছনেই এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে জিনিসটাকে চালনা করছেন। মোটা যিতেগুলো জাহাজের দড়ির মতো ভূমির ওপর ঘষটাচ্ছে আর ওই বিপুলাকার পাদুকা আর্তনাদ করতে করতে ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকে শিশুদের দল ; কেউ কেউ যিতে গলানো গর্তের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে, আবার কেউ কেউ বৃদ্ধা রমণীর চারদিকে ভিড় ক'রে রয়েছে। এবং ওই রমণী পৃথিবীর উপর দিয়ে বিরাট জুতোটাকে চালনা ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন·····

শিগ্গি ওই বিশাল জুতোটাকে উল্টো দিকের দিগন্তে ধীরে ধীরে নামতে দেখা গেল, যেন অতিকায় একটা শামুক তীব্র শব্দ ক'রে পৃথিবীর ভেতরে খুঁড়ে খুঁড়ে ঢুকছে·····

ভদ্রলোক আবার প্রাতরাশে মন দিলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন প্রাতরাশটি বিকৃত হয়ে গেছে। একটা ডিমের কুসুমে ছিদ্র হয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

আলী সরদার জাফরীর কবিতা

অনুবাদ—তরুণ দীর্ঘাঙ্গী

উর্দু ভাষার কবিদের মধ্যে আলী সরদার জাফরী (১৯১৩ -২০০০) নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য কবিদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের একজন অন্যতম। তাঁর গ্রন্থভুক্ত সংকলনের মধ্যে এইগুলি খুবই জনপ্রিয় : 'নই দুনিয়া কো সালাম', 'পাথর কি দিওয়ার' এবং এক 'খোয়াব আউর'।

সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার, পদ্মশ্রী, ইকবাল সামান্না এবং জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের মত অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মান তিনি পেয়েছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে ঈশ্বর চেতনা ও সমাজ চেতনা বড় সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

রক্ত

কি দরকার এই রক্তে তোমার
যে রক্ত
চুম্বনের মত উষ্ণ
গোলাপের মত লাল
সদ্যোজাত শিশুর হাসি
বর্ষাক্ষত ওষ্ঠের আশীর্বাণী
আধফোটা চোখের কাজল
কোমল হাতের হেনা
রবাবী গান আর কবির আহ্বান
বিরামহীন ভালবাসার প্রতিশ্রুতি ?
এ' রক্ত
নয় কোন নাস্তিকের
নয় কোন বিশ্বাসঘাতকের
নয় কোন মুসলমানের।
এ' রক্ত
কোন ও গীতার সঙ্গীত
পবিত্র গ্রন্থের মধুর গুঞ্জন
গ্রন্থের পাতার প্রথম অক্ষর
আকাশের প্রথম সুর
গস্পেল-এর উৎস
তোরা আর সামস্-এর অন্তর।
এই জলন্ত অঙ্গার
পারবে কি হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাতে ?

কি দরকার এই রক্তে তোমার
যে রক্ত
যৌবনে ভরপুর টগবগে লাল ?
জেনে রেখো—
এর কিছুমাত্র ভূমি স্পর্শে
ধরিত্রীর জরায়ু জ্বলে হবে ছারখার
আকাশ থেকে আশীর্বাণী
নিম্নতলে আসবে না আর
গজাবেনা না কোন বীজ
হাসবে না কোন কুঁড়ি
ফুলগুলি হবে গন্ধবিহীন।
এই বুঝিরেই অধরের সুবাস
চোখের জ্যোতি
কপোলের লজ্জা রাঙা লাল
হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।
ফারান পাহাড়ের এই সেই সূর্য
টার ও সীনাই-এর মহিমা
শঙ্খ-সতোর ঝলক
সান্ত্বনাহীন হৃদয়ের জ্বলন্ত বাথা
কিংবা বিশ্বের দীপ্তি
আলোর প্রকাশ।
এই সেই রক্ত
যা তোমার আমার সবাকার।

কমলালেবুর রস করার যন্ত্র

ফলকার ব্রাউন

অনুবাদ : রেবা ঘোষ

কবির জন্ম ড্রেসডেনে ১৯৩৩ সালে। ছাপাখানাতে, গৃহনির্মাণ ও কারখানাতে দক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছেন। লিপ্‌টিজিনোতে দর্শন শাস্ত্র পড়েছেন। BERLIMER ESEMBLE নামের বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকার সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৬৭ সাল থেকে স্বাধীনভাবে লেখার কাজে নিযুক্ত আছেন।

পানীয় বিপণী, ঘুরছে যন্ত্র সেথা।
শীতল চায়ের পেয়ালা হচ্ছে ধৃত
রমণী দেহের অঙ্গ অনাবৃত,
চোরা চোখে দ্যাখে বিপণীর বিক্রেতা।
'দারুণ গরম'—বলেও পুরুষ জানে
বাড়তি এ কথা বাহুল্য শুধু আনে।
উন্মাদনার লাবণ্যে ভরা নারী—
কাঁচের টেবিলে রাখলো পেয়ালা তারই।
বাহুমূলে তার স্বেদের গন্ধ মাখা
লোমশ অঙ্গ রহস্যে আছে ঢাকা।
স্নান কাল ঘুচে যায়, তক্ষুনি লহমায়,
যদিও চিত্তা থেকে যায় সনাতন।
একথা সকলে বুঝেছে নিজের মনে
ওই রমণীটি অঙ্গ সঞ্চালনে
নিভৃত হৃদয়ে আনন্দ উৎসব।
পার করে এক বিলম্বে গত ক্ষণ
বিক্রেতা হবা শুরু করে তার কাজ।
সারা ঘরে আর নেই কোনো গুঞ্জন—
ঘূর্ণায়মান যন্ত্র তোলে আওয়াজ।।

রাজা ইন্দ্রের দূত

কৃষণ চন্দর
অনুবাদ : কমলেশ সেন

১ রাজদূত হোটেল
ডিপ্লোমেটিক এনক্লেভ
নতুন দিল্লি
১০ ৮. ৬৩

দেবনায়ক মহারাজ ইন্দ্রদেব,

আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনার শ্রীচরণের দাস ৮ জুলাই. ১৯৬৩ তে স্বর্গীয় রকেটে সওয়ার হয়ে প্রতি সেকেন্ডে ন' কোটি মাইল গতিতে, আজ পুরো এক মাস একদিন পরে নতুন দিল্লিতে এসে পৌঁছেছে। যাত্রাকালীন কোনো অসুবিধা হয়নি। আপনি যাত্রার সময়ে আমাকে হুইস্কি দিয়েছিলেন, যে-হুইস্কি একজন ভারতীয় স্বর্গে আসার সময় সামলে করে এনেছিল। আর আপনার আদেশে যে-হুইস্কি আটক করা হয়েছিল, সেই হুইস্কি এই দীর্ঘ সফরকে খুব মনোরম করে তুলেছিল। স্বর্গে যদি ভাজা ছাতুর সঙ্গে একটু হুইস্কি পাওয়া যেত, তবে ভগবানের গুণগানে আমাদের মনে পরিবর্তন সাধনে অনেকটা সাফল্য পাওয়া যেত। একথা আমি নিজের একান্ত অনুভব থেকে বলছি।

আমি এখানে রাজদূত হোটেলে আছি। হোটেলটি ডিপ্লোমেটিক এনক্লেভে অবস্থিত। এখানে শুধু বিদেশী রাজদূতেরা থাকেন। আর স্বর্গ যেহেতু এই মানব সমাজের কাছে একেবারে বিদেশ, সেজন্যে আপনার রাজদূত হিসেবে এই ভব্য হোটেলে আমার স্থান হয়েছে।

এয়ারপোর্টে আমাকে নেয়ার জন্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনেহরু, মোরারজী দেশাই, গুলজারীলাল নন্দা এবং এস, কে. পাতিল। এঁরা সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, স্বর্গ কেমন দেশ ? আমি বলি, গিয়ে প্রত্যক্ষ করুন। এর পরে কেউ আর কিছু বললেন না।

আমার ধারণা, এঁরা ভেবেছিলেন, আমি স্বর্গ থেকে আসিনি। বললেন, 'স্বর্গে যে যায়,সে আর ফিরে আসে

আমি বললাম, আমি দেবাদিদেব, সপ্তলোকের দেব মহারাজ ইন্দ্রের দূত। স্বর্গ থেকে এসেছি।'

মনে হলো, আমার উত্তর শুনে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। তাঁরা আমাকে রাজদূত হোটেলে থাকার ব্যবস্থা তো করলেন, কিন্তু আমার পেছনে, সি. আই ডি লাগিয়ে দিলেন। তাঁরা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আমার বিচিত্র রকেটের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। তাঁদের ধারণা, আমি স্বর্গ থেকে নয়, অন্য কোনো লোক থেকে এসেছি।

সন্ধ্যা ছ'টার সময়, স্নানটান সেরে লাঙ্গুড়ে ধোয়া পরিচ্ছন্ন ধুতি পরে, কপালে চন্দন লাগিয়ে হাতে কমণ্ডলু নিয়ে পুজোর জন্যে বের হলাম। নিচে নেমে কাউন্টারে গিয়ে ক্লার্ককে মন্দিরের কথা জিজ্ঞেস করলাম। আমার প্রশ্ন শুনে সে হাসতে লাগল। তারপর বলল, 'এ-এলাকার বহুদূরে পর্যন্ত কোনো মন্দির নেই।

আমি রেগে গেলাম। বললাম, কি বলছ ? এ হচ্ছে ভারতবর্ষ, ধর্মের ভূমি, মীরা তুলসী সুরদাস বাল্মিকীর জন্মস্থান। এখানে মন্দির এতোই বিরল।

ক্লার্ক বলল, এ হচ্ছে ডিপ্লোমেটিক এনক্লেভ। এখানে কোনো মন্দির নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে পুজোর জন্যে আমি কোথায় যাব ?'

বলল, 'একটা নাইট ক্লাব আছে, সেখানে যান।'

আমি রাগ করে আমার কামরায় ফিরে এলাম। আর হুইস্কি খেতে লাগলাম। কারণ হুইস্কি খেলে বুকের বোঝা হাল্কা হয়। এ-ও আমার এক নিজস্ব অনুভূতি।

আগামীকাল প্রাতরাশের সময় নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর কথা আছে। কালকে সে বৃত্তান্ত লিখব।

চন্দ্রশেখর পাস

দেবরত্ন

নতুন দিল্লি

১১. ৮. ৬৩

দেবাধিপ দেবেন্দ্র

আজকে প্রভাতে প্রাতরাশের সময় নেহেরুর সঙ্গে দেখা হয়। প্রথমে তিনি আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, স্বর্গে যে-সব ভারতীয়রা এসেছে, তারা অভিযোগ করেছে, এ-সময়ে ভারতবর্ষের ধর্মসংকট অত্যন্ত গভীর। তারা সব ধর্মকর্ম ভুলে গিয়েছে। তারা ভগবানকে স্মরণ করে না। আর সারাটা দিন মুনাফা ঘুষ এবং ভ্রষ্টাচারের মধ্যে ডুবে আছে। তাই মহারাজ ইন্দ্র খুব চিন্তিত। সেজন্যে এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে তিনি আমাকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছেন।

পণ্ডিত নেহেরু আমার কথা শুনে বললেন, 'ধার্মিক অবস্থা সম্পর্কে আমার জ্ঞান বিশেষ কিছু নেই। আপনি শ্রীলালবাহাদুর নন্দার সঙ্গে দেখা করুন। কারণ তিনি বোম্বের ভারতীয় সাধু সমাজের সভাপতি, ছিলেন। আর ভারতবর্ষের রি-আর্মামেন্ট আন্দোলন সম্পর্কে খুবই আগ্রহী, বা আগ্রহী আছেন। মনে হয়, তিনি এ-ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলতে পারবেন। আমি কিছু বলতে পারব না। এ-ব্যাপারটা খুবই গভীর। কিন্তু এর চেয়েও আরও অনেক কিছু আছে, যা খুব জটিল। আর সেসব আরও জটিলতর হচ্ছে, কিন্তু কতোখানি তা বলতে পারব না।

আমি অমলেট খেতে খেতে বললাম, 'সুন্দর বলেছেন।'

তারপর নানা ধরনের কথাবার্তা হলো। পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করলেন, স্বর্গে কটা ইস্পাত কারখানা আছে ?'

বললাম, 'একটিও নেই।'

জিজ্ঞেস করলেন, 'মানুষ কি খায় ?'

বললাম, কিছুই খায় না।

জিজ্ঞেস করলেন, স্বর্গের 'প্রধানমন্ত্রী কে ?'

'কেউ নেই।'

বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তবে কি ভাবে কাজকর্ম চলে ?'

'বললাম, সেখানে কোনো কাজই হয় না।'

একটু হাসলেন। একটুখানি চুপ করে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তবে কি স্বর্গরাজ্যে কোনো প্রব্লেমই হয় না ?'

বললাম, 'একটি প্রব্লেম আছে।'

'কি ?'

'চীন।'

সচকিত হয়ে কুর্শি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'তবে সেখানেও চীনের প্রব্লেম আছে ?'

বললাম, 'আজ্ঞে, আছে। স্বর্গে যতো চাইনিজ আছে, সবাই মাও সে-তুংয়ের চেলা হয়ে যাচ্ছে। দিন রাত মাও সে-তুংয়ের নামে স্লোগান দিচ্ছে। বলছে, স্বর্গে যেহেতু অন্যান্য জাতির চেয়ে চীনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেজন্যে স্বর্গে চীনের পতাকা উড়বে।—ভগবানের কাছে এই একটি বড়ো সমস্যা যে, স্বর্গ এবং নরকের উপর চীনারা ওদের অধিকার কায়েম করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে ভগবান কি করবেন ভেবেছেন?

ভগবান ভেবেছেন, চীনের কিছু বড়ো বড়ো নেতাদের স্বর্গে ডেকে আলাপ-আলোচনা করবেন।'

একথা শুনে পণ্ডিতজী মুচকি হাসলেন। ইণ্টারভিউ শেষ করে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে বললেন, ফিরে যাওয়ার আগে অবশ্যই দেখা করবেন।'

আপনার দাস

দেবরাজ

নতুন দিল্লি

২৩. ৮. ৬৩

দেবরাজ দেবেশ্বর

শ্রীগুলজারিলাল নন্দা আমাকে বললেন, 'ভারতবর্ষে, কোনোরূপ ধর্ম-সংকট নেই। ভারতবর্ষে পনেরো লক্ষ সাধু আছেন। এসব সাধুসন্তরা থাকতে ভারতবর্ষে কোনোরকম ধর্ম-সংকট হতেই পারে না! এ-ছাড়াও আছেন মৌলভী, খ্রীশ্চানদের পাদরি, বৌদ্ধ ভিক্ষু, জৈনগুরু এবং ইহুদি মহাত্মারা। পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে ভারতবর্ষে এঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই, এঁরা থাকতে, এ-কথা ভাবাই যায় না, ভারতবর্ষে ধর্ম এবং জাতপাতের সংকট আছে। বস্তুত ভারতবর্ষের ধার্মিক অনুভূতির ওপর খোলাখুলি আইন জারি আছে। আমার ধারণা, স্বর্গে কিছু কমিউনিস্টরা উপস্থিত হয়েছে। তারাই গল্প ছড়াচ্ছে'।

আমি বললাম, 'স্বর্গে কোনো কমিউনিস্ট প্রবেশ করতে পারবে না। মহারাজ ইন্দ্রের এ-ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি আছে।'

গুলজারিলাল নন্দা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, 'কমিউনিস্টরা বড়ো চতুর। প্রতিটি জায়গায় পৌঁছে যায়।' গুলজারিলাল নন্দা আমাকে উপদেশ দিলেন, যদি বাস্তবিক আমি ভারতবর্ষের ধর্মীয় অনুভূতিগুলিকে নিয়ে যাচাই করতে চাই, তাহলে যেন আমি ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করি। উনি স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকে ফোন করে আমার সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত করে দিলেন। পরশু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আজকে সন্ধ্যায় রাশিয়ান রাজদূত ডিনার দিচ্ছেন। পরশু ব্রিটিশ হাই কমিশনার লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। খুব ব্যস্ততা যাবে, সেজন্যে দু-তিন দিন কোনো চিঠি লিখতে পারব না। ক্ষমা করবেন।

আপনার দাস

দেবরাজ

নতুন দিল্লি

২৮ ৮. ৬৩

P19056

ইওর এক্সেলেন্সি মহারাজ ইন্দ্ররাজজী,

ভারত সরকার ভারতবর্ষের ধার্মিক অবস্থা বিচার বিবেচনা করার জন্যে এক ধার্মিক কমিশন গঠনের কথা ভেবেছেন। আর আমাকে সেই কমিশনের সভাপতি নির্বাচন করছেন। মাসিক বেতন দু'হাজার টাকা। এ-ছাড়া

P19056

অতিরিক্ত পাব যাতায়াত এবং হোটেল খরচ। ছ'মাস ধরে ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াব। একজন লেডি স্টেনো এবং একজন আর্দালিকে আমার সেবায় নিয়োজিত করা হয়েছে। বিমানে যাতায়াত করব। যেখানে বিমানের ব্যবস্থা নেই, সেখানে এয়ার কণ্ডিশন্ড কম্পার্টমেন্টে যাব। ভারতবর্ষের যে-সব অঞ্চলে প্রোহিবিশন আছে। সেখানে আমার জন্যে হুইস্কির বিশেষ কোটা মঞ্জুর করা হয়েছে। কারণ হুইস্কির এক অদ্ভুত নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে। ভেবে মনে হয়, স্বর্গে আছি। নিজের দেশ থেকে এতো দূরে আছি বলে হুইস্কি খাই।

আমি কমিশনের সভাপতির পদ গ্রহণ করেছি। ভারত সরকার ঠিক করেছেন, যদি অনুসন্ধান কাজের জন্যে আমাকে রুয়েপে যেতে হয়, তার জন্যে ফরেন এক্সচেঞ্জও মঞ্জুর করা হবে। শ্রী ১০৮ স্বামী উদ্বেদানন্দের ভাষায় বলা যায়, 'ভারতবর্ষে' অন্নের সমস্যা তো আছেই, কিন্তু ভগবান না করেন, যদি কোথাও ধর্ম-সংকট শুরু হয়ে যায়, তাহলে আমাদের সংস্কৃতির দেউলেপনা দেখা দেবে।

ভারতবর্ষকে এই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচানোর জন্যে আমি এই কমিশনের সভাপতির পদ গ্রহণ করেছি। আশা করি, আপনি আশীর্বাদ করবেন।

হ্যাঁ, এ-কথা তো বলতে ভুলেই গিয়েছি, ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। অনেক বড় দরের ফিলসফার এবং বিদ্বান। আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু গ্রন্থ চেয়ে নিয়ে এসেছি। সম্প্রতি দিনে আমি সেসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করছি। নয়তো নাইট-ক্লাবে যাই। খুব ব্যস্ত জীবন নতুন দিল্লির। যদি পরবর্তী দু-তিন সপ্তাহ আমার চিঠি আপনি না পান, তাহলে ভাববেন না। আমি ঠিক তেমনি আপনার কাজ করছি।

আপনার দাস

দেবব্রত

নতুন দিল্লি

২০ ১০ ৬০

মহারাজ ইন্দ্র

আপনার চিঠি পেয়েছি। সে-চিঠিতে আপনি আমাকে ভর্ৎসনা করার চেষ্টা করেছেন। আপনার ধারণা আমি ভারতে এসে নিজের কর্তব্য ভুলে গিয়েছি। সারাক্ষণ অফিসারদের সঙ্গে লাঞ্চ এবং ডিনার খাচ্ছি। বিমানে যাত্রা করছি। বড়ো বড়ো দামী হোটেলে থাকছি। আর সরকারের কাছ থেকে ভবল ভাতা চার্জ করছি। কিন্তু এসব তো সবাই করে। যদি আমি করি, তাতে এমন কি গর্হিত অপরাধ করেছি? তাছাড়া একথাও তো ঠিক, আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে বড়ো রাজদূত। সেজন্যে আমাকে আমার পজিশন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।

আপনি লিখেছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমি যেন মেলামেশা করি। গরীব মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত ভারতবর্ষের ধার্মিক অবস্থা কি রকম। আমি আপনাকে জানাচ্ছি, গত তিন মাস ধরে আপনি সে-কাজই করছি। আমি আমার স্টেনো কোকিলাকে নিয়ে ভারতের অন্যান্য শহরে, শহরের অলিতে-গলিতে ঘুরেছি। ঘুরে অবস্থা যাচাই করছি। আর মাঝে-মধ্যে কোকিলার জন্যে শাপিং করছি। ('মিস কোকিলা খুব ভালো মেয়ে। লিপস্টিকের চিত্র কালার হাল্কা গোলাপি।) তিন মাস ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি রিপোর্টও তৈরি করে ফেলেছি। সে-রিপোর্ট কোকিলা ইংরেজিতে টাইপ করছে। কারণ, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা তো হিন্দি, কিন্তু সব কাজকর্ম ইংরেজিতে হয়। এই রিপোর্ট দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। প্রস্তুত হলে, একটি কপি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। পরবর্তী পত্রে তার বিবরণও পাঠাব। অপেক্ষা করুন। এখন খুব ব্যস্ত। 'গ্র্যান্ড হুইন' থেকে মিস কোকিলা একটি

শাড়ি কিনবে। তাছাড়া আমাকে ব্যাংকে যেতে হবে। তারপর প্লেনে করে কলকাতায় যেতে হবে সেখানে অল ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্ কনফারেন্স হচ্ছে। সেই কনফারেন্সের সভাপতি আমাকে নির্বাচন করা হয়েছে।

সেবক

দেবব্রত

বোম্বে

৭. ১১. ৩৩

মাই ডিয়র ইন্দু,

গতকাল শ্রীযুক্ত নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। একটু কিলিত মনে হচ্ছিল। আবার একটু খুশি খুশি ভাবও ছিল। কিলিত এ-জন্যে ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন বড়ো বড়ো নেতাদের নীতি পাঠ দেবার জন্যে। কিন্তু এখানে এসে তিনি বুঝতে পারেন, এ-ব্যাপারে তার জ্ঞান একেবারে আউট অফ্ ডেট হয়ে গিয়েছে। নীতির বিষয়ে এখানকার খুব সাধারণ মানুষও নারদজীর কান কেটে দিতে পারে। খুশি তিনি এজন্যে যে, তিনমাস মাদ্রাসে কাটিয়ে, শ্রীরাজগোপালাচারীর চরণের কাছে বসে অনেক কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন। এখন তিনি নির্ণয় করেছেন, স্বর্গে গিয়ে এই নতুন বিদ্যা ব্যবহার করবেন, এবং আপনার সিংহাসন ধরে নাড়া দেবেন। সচেতন থাকবেন।

আমি আমার পূর্ণ রিপোর্ট নারদজীর ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে পাঠাচ্ছি। বিবরণ এই পত্রে দিচ্ছি ঃ

ভারতবর্ষের ধার্মিক অবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গরীবরা ভগবানকে ভুলে গিয়েছে। আর সারাক্ষণ ডাল-ভাতের সমস্যা নিয়ে চক্কর কাটছে। মন্দিরে উপাসনায় না গিয়ে মূল্যবৃদ্ধির জন্যে হা-হুতাশ করছে। এমন স্বার্থপর মানুষ কিন্নলোকে আর দেখিনি। আমার মনে হয়, স্বার্থের জন্যে ওদের সাজা পাওয়া এবং ওদের দরিদ্র বানানো দরকার। ভারত সরকার আমার এই বক্তব্যকে অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করছেন।

বড়ো বড়ো মন্দিরে সিনেমার মতো টিকিট করে দেয়া হয়েছে। ভগবানের মূর্তিকে যা দূরত্ব থেকে দেখার জন্যে শুধু চার আনা লাগবে। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে লাগবে আট আনা। কিল গজ দূর থেকে দেখতে লাগবে এক টাকা। দশ গজ দূর থেকে স্তুতির জন্যে লাগবে পাঁচ টাকা। যে-ভক্ত ভগবানের চরণ স্পর্শ করে প্রার্থনা করতে চায়, তাকে কুড়ি টাকা দিতে হবে। কিন্তু গরীবরা তাদের ধর্মের ওপর এতো তিত বিরক্ত যে, দেড় টাকা খরচ করে সিনেমাতে যাবে, কিন্তু মন্দিরে যাবে না।

দেখার মতো মন্দিরের এখানে কমতি নেই। অনেক মন্দিরে টেলিফোন আছে। ইচ্ছে করলে ডাইরেক্ট ট্রাঙ্ক-কল করে ভগবানের সঙ্গে কথা বলতে পারে। এখন তুলসীদাসের সময় নয় যে, যে কোনো সময়ে মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে বিরক্ত করবে। সম্প্রতি প্রতিটি মন্দিরের দ্বার একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত বন্ধ থাকে। যাতে এই সময়টুকু ভগবান বিশ্রাম করতে পারেন। রাত্রে মন্দিরের দরজায় তালা দেওয়া হয়। যাতে ভগবান নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন। পূর্বে ভারতবর্ষে ভগবান এক মুহূর্তের জন্যে ঘুমোতে পারতেন না।

সম্প্রতি দয়া-ধর্মের ভাব শুধু পয়সাওয়ালা মানুষের মধ্যে থেকে গিয়েছে। যে কয়েক লক্ষ টাকা কামাতে পেরেছে, সে মন্দির তৈরির অর্ডার দেয়। মন্দিরের জন্যে এদেশে পারমিট এবং কোটা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। এটাই এখানকার রেওয়াজ। কিন্তু মন্দির বানাতে বানাতে এতো সিমেন্ট বেঁচে যায় যে, মন্দিরের মালিক তার নিজের বিলিডংও এর সঙ্গে বানিয়ে নেয়। সেজন্যে অসংখ্য মন্দির তৈরি হচ্ছে! কিন্তু এসবকিছু উঁচু তলার মানুষের শুভ ইচ্ছের জন্যে হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষের মন থেকে ধর্মবিশ্বাস ক্রমেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এ-ই কয়েক দিন

আগেকার কথা, এক সিন্ধি মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সম্প্রতি তিনি তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে নাইরোবি থেকে এখানে এসেছেন। যখন তাঁদের দু'কামরায় এক ছোট্ট ফ্ল্যাটে গেলাম, দেখলাম, কোণের এক তাকে ভগবানকে রেখেছেন। জিজ্ঞেস করলে বড়ো উদাস হয়ে বললেন, হাঁ, একে তাকে রেখে দিয়েছি, নাইরোবিতে আমার খুব বড়ো বাংলো ছিল। সেখানে ভগবানকে একটি কামরা দিয়েছিলাম। এখানে, বোম্বেতে মাত্র দু' কামরার ফ্ল্যাট, সেজন্যে একটিতে তাকে রেখে দিয়েছি। এখন আমি কি করি? যেমন জায়গা উনি আমাকে দেবেন, তেমনি স্থান স্বয়ং তিনি পাবেন। আমি ভগবানকে একথা সাফ্ বলে দিয়েছি।

সম্প্রতি সব জিনিসের মতো ধর্মও ভারতবর্ষে বিকোচ্ছে। কিন্তু তার দর বেশি নয়। বাজারে একটি টমেটো বিক্রি করতে গেলে দু'আনা পাবে। কিন্তু সত্যনারায়ণের কথা বেচতে যাও তো কেউ তিন আনাও দেবে না। সেদিন এক ছোট্ট মন্দিরে আমি সত্যনারায়ণের কথা শোনাই শুধু আড়াই টাকায়। বেচারা পুরোহিতের অবস্থা খারাপ, কান্না দেয়ে গিয়েছিল। বলল, আমি মন্দির বন্ধ করে দিয়ে মদের স্মাগলিং করব, তা না হলে কিভাবে বাঁচব?

ধর্মের দাম পড়ে গিয়েছে, বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকাবাজির দাম অনেক বেশি। মাস তিনেক আগের কথা, দিল্লির কাছে গাজিয়াবাদে এক বৃদ্ধার সতেরো বছরের ধর্ম-পাগল ছেলেকে কিছু ভগবান ভক্ত যোগী বলে প্রচার করে দেয়। আর তাকে চল্লিশ দিনের জন্যে মাটির নিচে সমাধি দেয়! উপর থেকে মাটি দিয়ে বেশ ভালো-ভাবে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। যাতে ভেতরে কোনোভাবে হাওয়া-বাতাস যেতে না পারে। আর প্রচার করে দেয়, চল্লিশ দিন বাদে সে সমাধিস্থল থেকে বেরিয়ে আসবে।

তারপর কি হলো, প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ দেখতে আসে, আর সমাধির উপর পয়সা ছুঁড়তে থাকে। প্রথম দিন আশি টাকা পড়ে, দ্বিতীয় একশ টাকা, পঞ্চম দিন দেড় দেড়শ' টাকা। তারপর আড়াইশ', তিন শ' টাকা প্রতিদিন পড়তে থাকে।

চল্লিশ দিনের মাথায় সমাধি খোলা হলো। সমাধি থেকে বেরুল হতভাগ্য ছেলেটির পচাগলা লাশ। মানুষ পূজারীকে খুঁজল, দেখল, সে সব টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। ঐ ছেলের বৃদ্ধার মা ভুকরে ভুকরে কাঁদতে লাগল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ছেলেটি তার নিজের নয়। কারও কাছ থেকে চেয়ে সে তাকে নিজের ছেলে করে নিয়েছিল। আসলে বুড়ি তার ছেলের জন্যে কাঁদছিল না, ভগবানের ভক্তরা তাকে এক কানাকড়ি না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে বলে। এ ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। আর এ-খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্ণ রিপোর্ট নারুজীর সঙ্গে পাঠাচ্ছি। পড়ে, আপনার মতামত জানাবেন। আমি কমিশনের কাজে কাশ্মীরে যাচ্ছি, কারণ এখানে খুব গরম পড়েছে। কাজকর্ম ঠিকভাবে হবে না। আর কোকিলাও আজ পর্যন্ত কাশ্মীর দেখেনি, এই উপলক্ষে সেও কাশ্মীর দেখবে। (কোকিলা খুব মিষ্টি মেয়ে। এমন সুন্দর ট্রেইট নাচে, যদি আপনি দেখেন তবে অনেককে ভুলে যাবেন।)

আপনার

দেবরাজ

স্বর্গ থেকে দেবরাজের নামে মহারাজ ইন্দ্রদেবের টেলিগ্রাম—

'সত্বর স্বর্গে চলে এস।'

ইন্দ্রের নামে দেবরাজের টেলিগ্রাম—

যেতে পারছি না, কারণ কোকিলা স্বর্গে যাওয়ার জন্যে রাজি নয়। সুতরাং, আমি অপারগ।

দেবরাজ

অজেন্ট টেলিগ্রাম—

'সত্বর ফিরে আসার খবর দাও, তা না হলে স্বর্গ থেকে বহিস্কার করা হবে।'

দেবদূত দেবরাজের মহারাজ ইন্দ্রের নামে শেষ টেলিগ্রাম—

'এ-পৃথিবী তার সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও খুব সুন্দর, সেজন্যে যেতে পারছি না··· ! !'

দেবরাজ

'সারে জহাঁ দরাজ হ্যায় অব মেরা ইন্তজার কর···'

'সসেরের কাজ দীর্ঘ, এখন আমার জন্যে অপেক্ষা করো।

উর্দু সাহিত্যের একক অসাধারণ, জীবনধর্মী কথাশিল্পী কৃষ্ণচন্দর। অসংখ্য গল্প এবং উপন্যাস লিখেছেন। ব্যঙ্গধর্মী গল্পের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। বিশে শতাব্দীর চারের দশক থেকে যারা উর্দু কথাসাহিত্যে নতুন প্রাণ এনেছিলেন, তারা হচ্ছেন সাদাত হোসেন মন্টো, রাজেন্দ্র সিংহ বেদী, ইসমত চুগতাই,, কৃষ্ণচন্দর। জন্ম পাঞ্জাবে।

With Best Compliments from :—

A

WELL

WISHER

সদাভিষেকম

জি. এস্. বালকৃষ্ণণ
অনুবাদ : সৌরভ চক্রবর্তী

আমার কাল্লিক্‌কোট্‌টাই কলেজের সহকর্মী ডক্টর বাসুদেব রাওয়ের সদাভিষেকম্ !

তিরুভনন্তপুরমে থাকতে গিয়ে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবো বলে বিজয়ার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গেলাম।

নিউজার্সি থেকে আসা বড়ছেলে ডক্টর পদ্মনাভন পাত্তু এগিয়ে এসে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলো। সিঁদুর পরা মাঝারি ভঙ্গিতে শাড়ি পড়া বিদেশিনী এক মহিলার সঙ্গে 'আমার স্ত্রী বারবারা' বলে পরিচয় করিয়ে দিলো। সে বললো 'নমস্তে'। ভিতর থেকে তাড়াহুড়ো ক'রে এলো দ্বিতীয় ছেলে আনন্দমোদ্। "আসুন, আসুন" বলতে বলতে একটুও না থেমে পায়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। ও আমার একসময়কার ছাত্র। ওর পাঞ্জাবি স্ত্রী বললো "আপনার সম্বন্ধে উনি অনেক কথা বলেছেন।" ভালো না মন্দ, কে জানে !

বাসুদেব রাওয়ের একমাত্র মেয়ে ঝুনো এতটাই বদলে গেছে যে চেনার মতো কোনো লক্ষণই আর নেই। চুল 'বব' ক'রে ফেলেছে, কিংবা মোটা হয়ে গেছে। ওর সিডনিতে যাওয়ার দশবছর হয়ে গেলো। যেখানে পড়তে গেছিলো সেখানকার এক কৃষ্ণ অধ্যাপককে বিয়ে করায় ওর বাবা মা খুব রেগে গেছিলেন।

"আচ্ছা, বাবা কোথায় ?"

"স্নানে আছেন। এখনই এসে যাবেন।"

"ক্লাস ?"

"বাবা এখনও GOING STRONG !" দারুন লেকচার দিচ্ছেন। ওঁর মনটা ভালো থাকার জন্য ওটা দরকারি। ডাক্তার আরাভমুদনের সুপারিশেই এই ব্যবস্থা। পাশের ঘরটাই হলো ক্লাসরুম। প্ল্যাটফর্ম, বোর্ড, সব আছে। আসুন দেখাচ্ছি।" এই বলে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল।

ওখানে খালি চেয়ার টেবিলগুলোকে নিয়ে হাত পা নেড়েচেড়ে 'হারানো স্বর্গ' রচনা করছেন অধ্যাপক রাও। দৌড়ে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখছেন, রসিকতা করছেন। কাছে দাঁড়ানো কাল্পনিক ছাত্রছাত্রীদের সন্দেহ নিরসন ক'রে ব্যাখ্যা করছেন। প্রশ্নের গান ছড়িয়ে দিচ্ছেন……।

বিশ্রামের সময় শেষ হতেই বিজয়াকে আর আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে গেলো পাত্তু।

"এনাকে চিনতে পারছেন ? বালকৃষ্…"

"চিনবো না মানে ? আমার মেমারি কবে খারাপ হলো ? অন্য বুড়োদের মতো আমার কি মতিভ্রম হয়েছে ? আমার পুরনো ছাত্র চাক্কো তো ? আয়াঙ্গার বাড়ির মেয়ে সেদু নিসার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে সোরগোল ফেলে দিয়েছিলো সে অপদার্থটা, তাকে ভুলে যাবো ? তোমাকে কলেজ থেকে বার ক'রে দেবার চেষ্টা হচ্ছিলো যখন, আশি বছর বয়সী ঠাকুরমাকে ডেকে নিয়ে এসে কাকুতি-মিনতি করেছিলে…ওহো…ঠাকুরমাও এসেছেন ? নমস্তে ঠাকুরমা !" বলে বিজয়াকে সম্মান দেখালেন। বয়স বিষয়ে এই হঠাৎ 'প্রোমোশান' পাওয়ায় বিজয়া অত্যন্ত বিব্রত হল।

ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে প্রোফেসরের স্ত্রী চন্দ্রপায়, চোখগুলো কুঁচকে "বালকৃষ্ণ তো ?" বললেন। আমায় চিনতে পারায় আমার বেশ আনন্দ হল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই বিরাট একটা বিস্ফোরণ ঘটালেন।

"বিবাহবিচ্ছেদ করেছো তো ? তিন্টি কী করছে ? এই বুঝি নতুন বৌ ? কোথাকার মেয়ে ?" বিজয়াকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"বিবাহবিচ্ছেদ ? জীবনে বিয়ে নামক ভুলটা আমি একবারই করেছি। দ্বিতীয়বার করার আমার কী দায় ?"

"সময় হয়ে গেছে ; এবার যাওয়া যাক।" এরকম একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকালো বিজয়া। আমিও বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

রাত্রের জন্য কিনে আনা উপহার সামগ্রীগুলো (আর কি, কতগুলো বই) ছেলে পাতুর কাছে দিয়ে বললাম তোমাদের সকলকে একসঙ্গে দেখে বড় আনন্দ হলো। সদাভিষেকমটা বড় উৎসবের আকারে করেছো। দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। বৈদিক আচার, রান্নাবান্না, ভিডিয়ো—সবরকম আড়ম্বরই আছে। বাবা মায়ের ওপর তোমাদের যে অপরিমিত স্নেহ আছে তা এসবের মধ্যে দিয়েই প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু আমার একটা চিন্তা হচ্ছে। সব কজন ছেলেমেয়ে বিদেশে আছো। দুহাতে প্রচুর আয় করছো। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছো। সবই ঠিক আছে। কিন্তু বৃদ্ধ বাবা-মাকে এখানে যত্ন ক'রে কে দেখে বাবা ? দুজনেরই স্মৃতিশক্তি কমে গেছে। এই অবস্থায়, শরীরের কিছু হলে, কে সাহায্য করবে ?"

"আপনিও যেমন। বাবা-মাকে দেখাশোনা করার জন্য পন্ডরিপায় আছেন—এই ভরসাতেই তো আমরা বিদেশে আছি। পন্ডরিপায় তো শুধু কাজের লোকই নয়। নিজের লোক। বাবা মায়ের ওপর খুব টান। নিজের ইচ্ছাতেই ঘরসংসার না ক'রে পঞ্চাশ বছর ধরে উনি আমাদের বাড়িতে সবার সঙ্গে মিলেমিশে আছেন…" বললো পাতু।

আনন্দমোদ আর যমুনাও একসঙ্গে হাসলো। সব বিষয়ে তিনজনের একই অভিমত বলে মনে হল !

"বাবার টিচিং করার ইচ্ছা, মায়ের পুজো। দুটোরই দারুন ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনি যেমন ভাবছেন, বাবামার ব্যাপারে আমরা তেমন উদাসীন নই। আর সবার মতো 'ওল্ডহোমে' নিয়ে গিয়ে ফেলে আসিনি। সব চাহিদাই সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করছি। স্নেহ-ভালোবাসা সব কিছুই প্রয়োজনীয়। তবে, সবকিছুই পরিমাণ মতো থাকা দরকার। সেকেলে লোকের মতো ভালোবাসা নিয়েই কে'দেকেটে গেলে টাকা পয়সা হবে কী ভাবে ? জীবনে উন্নতি হবে কীভাবে ?" মুখের ওপর একটা চড় মারার মতো, জিজ্ঞেস করলো পাতু।

বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছি যখন, তখন আমাদের কিছু দেওয়ার জন্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এলেন পন্ডরিপায়। "আমরা ওখানে যাচ্ছি" বলে ভিড়ের দিকে গেলাম। আমাকে একটা কমলালেবু দিলেন, বিজয়াকে সিঁদুরের সঙ্গে ব্লাউজ পিস, পান ইত্যাদি দিলেন।

"আপনাদের কি আর কখনো কোথাও দেখতে পাবো ? আমার শরীরের যা অবস্থা আজ যাই কি কাল যাই। পঞ্চাশ বছর এই বাড়ির জন্য খাটা হলো। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে রিটায়ার করা যাবে বলে ভেবেছিলাম। নাতনি নাগারকোয়িলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ করে। ওর সঙ্গে এসে থাকতে বলে। দুঃখ ক'রে ক'রে ডাকে। কিন্তু ছেড়ে পারলে তো ? প্রফেসর স্যারকে আর মামিকে একা ফেলে দিয়ে কীভাবে যাবো ? ছেলেমেয়েগুলো এসব কথা বুঝলে তো ? ওরা শুধু টাকাপয়সা, পদমর্যাদা—প্রসবের পিছনে ছুটে বেড়ায়। মাসে মাসে ঠিকঠাক চেক পাঠানোই যথেষ্ট ? টাকা না ঢেলে ভালোবাসা, কাছাকাছি থাকা…। আমি অবশ্য কিছু বলিনি। বলা যায় না। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা—এসবের মোহ আমাদের সংসার গুলোর একেবারে সর্বনাশ করছে। কাকে নিন্দা করতে যাবো ? যুগের ধর্ম…এই আর কি !" বলে চোখ দুটো মুছলেন।

রেলে ফিরবার সময় মনে হল আর দশ বছরের মধ্যে আমারও সদাভিষেকমের বয়স এসে যাবে। কথাটা মনে আসতে মনটা বিষন্ন হয়ে গেল।

[(১) সদাভিষেকম—কোনও ব্যক্তির আশি বছর বয়স পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান।

(২) মাডিসার – শাড়ি পড়ার একটি বিশেষ দেশজ ভঙ্গি।]

ব্লেইজ সেঁদ্রারস ও তাঁর কবিতা

অনুবাদ : কমলেশ চক্রবর্তী

[এখানে সুইটজারল্যান্ডের কবি ব্লেইজ সে'দ্রারস-এর জীবন ও লেখার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় রাখা হল। সঙ্গে তাঁর কবিতা ও টুকরো গদ্যের অনুবাদ]

ভূমিকা

ফ্রেডেরিক-লুইস সোসের জন্মেছিলেন ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে সুইটজারল্যান্ডের নিউসাটেল নামক প্রদেশের লা সো-দা- ফোদে'। একজন সুইস লেখক জা বুহলের লিখেছেন এই যে জন্মের কথা আমরা জ্ঞাত আছি তা তিনি নিজের জন্ম হিসেবে মানা করতেন না। তার নিজের নাম দিয়েছিলেন ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে, যে নামে তাকে আমরা জানি, ব্লেইজ সে'দ্রারস, পারিতে, তাঁর কবিতায় 'ও কুতর দু সোঁড' অর্থাৎ 'পৃথিবীর হৃদয়ে এবং' এবং জন্ম স্থান তাঁর মতে ২১৬ দা লা রু স'াৎ-জাক, রোতেল দেসে'ন্ট্রাজের-এ এবং এই দাবিই ফরাসি ভাষার আলোড়ন ঘটানো কবি করেছেন। আমেরিকার বিখ্যাত লেখক হেনরি মিলার তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'সব কিছুই লিখেছেন শোণিত দিয়ে, কিন্তু সে শোণিত নক্ষত্রের আলোয় স্নাত। তার মধ্য দিয়ে তুমি নিজেকে দেখতে পাবে পরিচ্ছন্ন। দেখতে পাবে ঘূর্ণায়মান তারকামণ্ডল। তাঁর সৃষ্ট নৈঃশব্দে কানে তালা লাগে। মনে হয় যেন পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিনটিতে ফিরে গিয়েছি। ফিরে গেলাম এমন শব্দহীনতায় যা রহস্যের মুখমণ্ডলে খোদিত ছিল।' ফরাসী সাহিত্যে তখন প্রধান কবি গীওম আপোলনীয়র। সে'দ্রারসের সঙ্গে তাঁর ছিল এক অলৌকিক আকর্ষণ তথা বিকর্ষণের টানাপোড়েন। কবিতার নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করার জন্য দুজনেরই কলম প্রসবময়। সে'দ্রারসের ছিল পরস্পর বিরোধী প্রকৃতি। র'্যাবোর ন্যায় ছিলেন পলায়নপর, ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে, পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে, আর এই ভ্রমণের পদধ্বনি প্রতাক্ষত হতো তাঁর প্রতিটি রচনায়। বলা উচিত প্রতিটি রচনায়, গদ্য ও পদ্য উভয়ের প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি অনুষঙ্গে। তাঁর নবজন্ম পারিতে, এক নূতন নাম, সংঘটিত হয়েছিল পারিতে আর সে সংবাদ, জা বুহলেরের ভাষায়, 'দিক পরিবর্তন করেছিল, হয়ে উঠেছিলেন ব্লেইজ সে'দ্রারস এবং জন্ম নিলেন ···কবিতার কাছে'। এটাই তাঁর নূতন ফরাসি পরিচিতি, সর্বদাই অস্থির অস্থৈর্য, যা তাঁর ইচ্ছানুসারেই বিচিত্র দিক-রূপে তাঁর চরিত্রকাহিনী গড়ে তুলছিল। সে'দ্রারস বলতেন, 'রচনা একঘরণের অধিকার পরিহার করা···' যাঁর লেখক হিসেবে মহত্তা সাক্ষ্যেকেই প্রত্যক্ষ করা যেত। যা নিজের থেকে ছিন্ন করে দিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তন পারিকে, কবিতাকে, মনে হবে যেন তাঁর ঐকান্তিক বাসনা নিজেকে নিঃশব্দের নিকট সমর্পনের যা তিনি নিজের উপর প্রস্থাপিত বলে মনে করতেন বিশেষ করে যখন তাঁকে তাঁর দক্ষিণ হাত যুদ্ধে যোগদানের ফলে হারাতে হয়েছিল। লিখেছেন, 'মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে অনাবাদী ক্ষেত্রে শারিত থাকার মধ্য দিয়ে আর কবির ক্ষেত্রে নৈঃশব্দের নিকট প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে।' তথাপি এই 'রচনাকর্ম নামক দানব', যেমনটা তিনি বলতেন, তাঁকে অপসরণের অনুমতি প্রদান করবে না এবং তাঁর নিজেকে সরিয়ে আনার পর তাঁর গ্রন্থের স্রোত আর তেমন বেগবান হয়ে ওঠেনি। তাঁর সমগ্র রচনাবলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিণত সৃষ্টি অবশ্যই তাঁর চার খণ্ডের আত্মজীবনী, 'লোমে দুদ্রোয়ার', '

স'্যা কুপে', 'বুরল'াকুয়ের' এবং 'ল লোতিসেসো দু সিয়েল'. এই চারখানি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। কিন্তু এই রচনাবলির মূল প্রকরণ অন্বেষাই লক্ষ্য করা যাবে ১৯২৫, ১৯২৬ এবং ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তিনটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে অবয়ব ধারণ করেছিল। অন্যপক্ষে পুনরায় লক্ষ্য করা যায় এই এক একটি সৃষ্ট দল এমন এক বৃত্তাকারে বিন্যস্ত প্রকরণের অনুগত যা আমাদের স্মরণে আনে তাঁর ১৯১২, ১৯১৩ আর ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের প্রগাঢ় কাব্যিক চর্চার সময়ের অনুসারী। আর তখনই সে'দ্রারস রচনা করেছিলেন তাঁর তিন বিখ্যাত দীর্ঘতর কবিতা। কবিতা সে'দ্রারসের আবেগপ্রবণ বিপর্যয়কে পরিচালনা করেছিল, তাঁর পরিবারের কাহিনী সমূহের ধ্যান সম্পন্ন করেছিল, ধ্যান করেছিল তাঁর নিজের জীবনের, তাঁর বান্ধবদের জীবনের, আর তাঁর পায়ের তলায় সরিয়া নিয়ে ক্ষণের বিচিত্র চিত্র সমূহে। তাঁর কাব্যিক 'আমি' অবশ্যই ছিল তাঁর পরিচালনার উপযোগী শক্তি, যা বিভিন্ন প্রকারের উপাদান সমূহের একত্রীকরণের, নিয়মানুবর্তীতার অনুসারীকরণের প্রধানতম প্রবেগ। তবে তাঁর তিনটি উপন্যাসেই তিনি, আন্তরিক প্রয়াস করেছেন তাঁর আপন চরিত্রকে নিমজ্জিত রাখতে এবং শৈল্পিক নিস্পৃহতা কাহিনীর বুনটে প্রকাশমান দেখাতে। পরিতাপের বিষয় তিনি এখানে যথার্থ ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা সে'দ্রারসের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি তাঁর অস্তিত্বের দুই মেরু ঃ পৃথিবীজাত একজন কর্মক্ষম, সৃষ্টিশীল মানুষ এবং অন্যপক্ষে তপশ্চর্যারত, ধ্যানময় নির্জনতাপ্রিয় অন্যজন। 'সাধারণভাবে বলতে গেলে', সে'দ্রারস তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'লেখকরা বস্তুত অন্তর্বাসী'।

সে'দ্রারসের প্রায় প্রতিটি কবিতায় এমন এক একটি আর্তচিৎকার শ্রুত হয় যা আমাদের সকল প্রকল্পের আনন্দকে নস্যাৎ করে দেয়। অর্থাৎ কাব্য আনন্দ প্রদান করে, এই বিশ্বাস থেকে আমাদের যে দীর্ঘদিন ধরে শ্রুত অপসারণ ঘটছে আচড়ুয়া এক কাব্যজগতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'প্রভু, আমি এসেছি ফিরিয়া, ক্লান্ত, সঙ্গীহীন, আর অনুতপ্তিত···
আমার আবাস সমাধির মতো নিরাবরণ···
ভাবিনা তোমাকে আর। ভাবিনা তোমাকে আর।'

আমরা এখানে তাঁর কবিতার অনুবাদ নিবেদন করলাম।

এখানে এই শেষ লাইনটি দিয়ে শেষ করুন।

গীতম আপোলনায়রের সম্মানে

পাউন্ডটি উদিত হয়েছে
ক্লাস
পারি
এক পরিপূর্ণ প্রকল্প
যে সব কবিরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের আমিই বলবো
বন্ধুগণ
আপোলনায়রের হনলি প্রয়াত
আপনারা খালি একটা শব্দাধার করেছেন অনুসরণ
আপোলনায়রের বস্তুত একজন জাদুকর
বাতায়নগুলিতে উড্ডীন সকল নিশানের রেশমি ভাজেভাজে তিনিই তো হাস্যময়

আপনাদের দিকে পুষ্প আর মালিকা নিক্ষেপ মজার মজেন তিনি
আর যখন আপনি এবং সবাই তাঁর শধাধার করছেন অনুসরণ
একটা ছোট্টো তিনরঙা ফিতের গোলাপ তিনি কিনেছেন তারপর
আমি তাঁকে সেই অপরাহ্নে দেখেছি খেলা দেখাতে বুলেভারে বুলেভারে
তিনি দুপা ছড়িয়ে আছেন দাঁড়িয়ে মার্কিন ট্রাকের ছাদেও
করছেন আন্দোলিত বিশাল একটা আন্তর্জাতিক নিশান
উড়ছ যেন একটা উড়োজাহাজ
দীর্ঘজীবী হোক ফরাসি দেশ

সমর বহিয়া যায়
বসন্তকালে যেন মেঘেদের মতো পলায়নপর
সৈন্যরা সবাই ফিরেছে আবার
তাদের আপন গৃহে
তাদের আপন দেশে
আর সেখানে নতুন এক প্রজন্ম নিচ্ছে জন্ম
বুকের জনের স্বপ্ন হয়েছে সফল !
সাধারণ ফরাসি মানুষ, অর্ধেক ইহুদি, অর্ধেক নিগ্রো, অর্ধেক মুলিম,
কেউ কেউ বেলজিয়ান, ইতালিয়ান, আনাসাইট, চেক,
একজন কানাডিয়ান কথায় টানে, অন্যজন দুইচক্ষু হিন্দুর মতন
দস্তরাজি মুক্তমণ্ডল হাড়গোড় গ্রন্থিসব বক্তৃতা চলন হাস্যরেখা
এইসব কিছুরই আছে কিছু কিছু বৈদেশিকী তথাপি সবই আমাদের কাছ থেকে
এসেছেই আকাশখানে, আপোলনারির, নীল নদের বিখ্যাত মূর্তির মতোই,
জলেরই পিতা, ছড়িয়েছে শিশুদের নিয়ে সর্বত্র প্রবহমান তাঁর থেকে
তাঁর দুই পায়ের ফাঁক থেকে, তাঁর কানের তলা থেকে, তাঁর অশ্রু থেকে,
তারা যেন তাদের পিতার অনুরূপ এবং পূরক
আর তারা সব কথা বলে আপোলনারিরের নিজস্ব ভাষায়

রাস্তা

প্রদ্যুম্নকেশরী সেনাপতি
অনুবাদ : অনুরাধা মহাপাত্র

এই রাস্তা এখন কারো নয়
সেই গাড়ির সারি আর ঘোড়াটানা গাড়ির সওয়ারি
এই রাস্তায়—
আমার বুড়ী ঠাকুরমার নয় কেশের ঢালের মতো
আঁকাবাঁকা এই রাস্তা
উৎসুক সকালের নরম সূর্যের আলোর শিহরনে শুদ্ধ
এখানে স্নানের পরে দাহভূমি শুয়ে রয়
অজ্ঞের এই পথ নিজে নিজেই

একাকী সুন্দর একটি কালো লোক
এ-পথে হেঁটে যেত
একটি পাথর ছুঁয়েছিল তার পায়ের পাতাটি
রুক্ষমাসের পুতুল যেখানে হয়েছে পাথর
একদা এই পথে বীণা-বাদনে সন্ন্যাসী
ধরা পড়েছিল ডাকাতের হাতে
আর ডাকাতকে সেই বীণাবাদক শিখিয়েছিল
বাজাতে বীণা !

এখন এই দিনে
হাঁটেনা কেউ আর এই পথে
এমনকি এই রাস্তা জানেনা তার বুকে
কোথায় হয় স্নান—স্নানের পরে
কোথায় সেই জ্বলা ভূমি শয়ান

জানালা খুলে পথ দেখতে পারে আজ
সংখ্যাহীন সব ক্লান্ত ধূলি-পা
অনাদৃত ওই আঙুলের আঙা
অথচ অনেক আশা-বাঞ্ছার পদচারণার
শেষ হয়ে গেছে এইখানে

কে রেখেছে গুনে ?
কিছু অঙ্গন, নব করতল, পাম্পের পাতা
আর ধূলিমাটি ভেজে অবিরল অশ্রুতে !

অজস্র স্মৃতি-চিরফুট ভরা এই রাস্তা
ফিরিয়ে দিয়েছে রক্তের দাবী
বিশ্বাস আর সংকল্প-স্তূপ
অজান্তে গড়েছে সব দুঃখের আকৃতি
আর নীল চিঠিগুলি উড়ে উড়ে পড়ে
এই রাস্তায়
নববধূটির আনন্দভরা রাতে

এখন প্রতিজন প্রশ্নের মুখোমুখি
এখানে, ধূলোঢাকা না-চেনা পাম্পের পাতা
ধূতি, জামা আর ছাতা
সরে গেছে সব—
পূজোবাড়ী আর মন্দির, কাশা-ধানক্ষেত
দূরে সরে গেছে জিজ্ঞাসা-স্বর
মানুষের দামে

শুধু নেমে আসে এই নির্দেশ :
উড়ে যাও
যদি পাও কোনো ডানা
উড়ে যেও
এমন কি পা-রাখার মাটি টুকু ছেড়ে দিয়ে ।

এগওয়ার্ড টমাস (১৮৭৮—১৯১৭)

অনুবাদ : কল্যাণী ঘোষ

এগওয়ার্ড টমাসের জন্ম ১৮৭৮ সালের লণ্ডনের ল্যামবেথ অঞ্চলে। তাঁর কবিতার আলোচ্য বিষয় ছিলো ইংল্যাণ্ডের গ্রামের ইতিকথা। যদিও তিনি লণ্ডনে জন্মেছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন তথাপি গ্রামের প্রতি ছিলো তাঁর এক দুর্নিবার আকর্ষন ও প্রগাঢ় ভালোবাসা। তিনি জীবনের অনেকটা সময় পশ্চিম ও দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে কাটিয়েছেন। তাঁর রোজকার অভ্যাসের মধ্যে ছিলো গ্রামের পথ ধরে অনেকখানি হেঁটে বেড়ানো। বড় রাস্তা ছেড়ে, গ্রামের মেঠো অজানা পথ ধরে হেঁটে চলতেন তিনি—জীবনের সদামাটা চোখ এড়িয়ে যাওয়া অবহেলিত জিনিসের মধ্যে খুঁজে পেতেন এক অদ্ভুত সৌন্দর্য। কবির সঙ্গে এই সময় একসাথে পথ চলা ছিলো যে কোন মানুষের কাছে এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। অনাবিষ্কৃত, উপেক্ষিত ছোট ছোট জিনিসের মধ্য থেকে তিনি সংগ্রহ করতেন তাঁর আনন্দের নির্যাসটুকু।

খনন

আজ বুঝি শুধু—
সুবাসের দিন—করাপাতার গন্ধ
গন্ধ পর্শের, ঘুনো গাজরের আর
চোকোঠে সর্ষে তেলের।

উঠে আসে সুবাস—
কোদালের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত শিকড় থেকে
গোলাপ, শুকনো আঙুর, নানা ভারের ছোট ফল
চীনেলতা আর সেলারি পাতার।

ধোঁয়ারও বুঝি গন্ধ আছে—
ভেসে আসে বহোসবের আসর থেকে
যা কিছু মৃত, অব্যবহার্য, ভয়ঙ্কর
সবই মিশে যাক এক মিষ্টতার স্পর্শে।

গ্রামের অফুরন্ত উপকরণ আছে।
ঐ গুঁড়িয়ে যাওয়া গাঢ় মাটির ওপর
যখন রবিন গেয়ে চলে গান
তার বিষাদের মূর্ছনায় লুকোনো হেমন্তের আনন্দ।

প্রাচীন রাজস্থানী দোঁহা প্রসঙ্গে

জ্যোতির্ময় দাশ

প্রাচীন রাজস্থানী দোঁহা বা দু-ছত্রের ছন্দোবদ্ধ কবিতা ভারতের এই পশ্চিমপ্রান্ত প্রদেশের লোকসাহিত্যের এক বৈচিত্র্যময় নতুন দিগন্তের সাথে আমাদের পরিচয় করায়। কোনো দেশের সাহিত্য শুধুমাত্র তার সাক্ষর মানুষের শিল্প সম্ভারে পুষ্ট নয়। সে তার নিরক্ষরের অনুভাবনার ফসলেও ধন্য। আধুনিক নগর সভ্যতার আলোকে শিক্ষিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি-মানসের প্রাজ্ঞতা যেমন দেশের সাহিত্যকে বলিষ্ঠ করে তেমনি আপাত-অশিক্ষিত অজ্ঞাত কুলশীল গ্রাম্য মানুষেরা পালাগান, ভজা, পাঁচালিতে সাহিত্যকে সাধ্যমতো সমৃদ্ধ করেছে। চিরায়ত সাহিত্যের মূল্যবিচারে সেই প্রখ্যাত স্রষ্টাদের সৃষ্টির কালজয়ী গুণ কিছু কম নয়। রাজস্থানী দোঁহার ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

লোকনীতি, লোকগাথা ও দোঁহা প্রাচীন রাজস্থানী সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তৃত অংশ অধিকার করে রয়েছে। এই তিনটি শাখার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বোধহয় দোঁহা—দু'ছত্রের ছন্দোবদ্ধ এক শ্রেণীর চারণ কবিতা। সংস্কৃত যেমন অনুষ্টুভ না হোক, প্রাকৃত ভাষাসাহিত্যে যেমন গাথা তেমনই রাজস্থানী, গুজরাতী এবং হিন্দীতে দোঁহার বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

দোঁহা বলতে দু-ছত্রের ছন্দোবদ্ধ এক শ্রেণীর চারণ কবিতা বোঝালেও হিন্দী সাহিত্যে দোঁহা আবার এক ধরনের ছন্দেরও নাম। ভাবকে সংক্ষেপে এবং রসসিক্ত ভাবে প্রকাশ করতে দোঁহাছন্দ বিশেষ উপযোগী। রাজস্থানের অধিকাংশ লৌকিক সাহিত্য এই ছন্দে রচিত। লোকমুখে প্রচলিত ও প্রচারিত বহু প্রাচীন দোঁহা বর্তমানে প্রবাদের রূপ গ্রহণ করেছে। বহু প্রাচীন লৌকিক দেবদেবী, ব্রত-আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি এবং জনপ্রিয়াত বীর নায়কদের কীর্তিকাহিনী দোঁহায় গ্রন্থিত হয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। পুরনো দিনের কোনো কাহিনী বলতে বসে আজও রাজস্থানী প্রবীণেরা অনেকেই গল্পের মাঝে মধ্যে ভাবপূর্ণ দোঁহার প্রয়োগ করে শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করে থাকেন। কিন্তু প্রাচীন পুঁথি ও সারা দেশ জুড়ে আবাল-বৃদ্ধবণিতার মুখে ও স্মৃতিতে যে অসংখ্য দোঁহা ছড়িয়ে আছে তার স্রষ্টাদের সকলের পরিচয় জানার আজ আর কোন উপায় নেই। সেকালে লিখিতভাবে প্রতিলিপি সংরক্ষণের রেওয়াজ না থাকায় (শিক্ষার অনগ্রসরতা ও তার কারণ হতে পারে) বহু দোঁহাই বিস্মৃতি অন্ধকার গুহায় কালক্রমে হারিয়ে গেছে। সম্প্রতি এইসব দোঁহা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চলছে।

প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ ও সাহিত্যিক পণ্ডিত রামনিবাস হারীতের মনে, দোঁহা শোনাবার কিংবা শোনার সময়ে একটা আশ্চর্য অনুভূতি জাগে—মনে হয় এ যেন মানব-কল্পনা প্রসূত কোন শিল্পরচনা নয়, এ যেন প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দান। সিংহের গম্ভীর নিনাদ, সজীব শ্যামল উপত্যকা বা সুন্দরী রমণীর দেহ-সুষমার মতো দোঁহার অমৃতবাণীকে নৈসর্গিক সৃষ্টি বলে ভাবতে ভালো লাগে।"

রাজস্থানী সাহিত্যে দোঁহার ভাণ্ডার অফুরন্ত—এই নিবন্ধে বীরত্ব ও বীররস বিষয়ক কিছু জনপ্রিয় দোঁহার উল্লেখ করা হল। দোঁহাগুলি অনুবাদের প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন—রাজস্থানী দোঁহা রূপক ও প্রতীকী কল্পনায় এবং আঞ্চলিক অর্থে বহুক্ষেত্রেই ব্যর্থ ভার বহন করে। সেগুলির যথাযথ আঞ্চলিক ভাষান্তর করলে অনুবাদটি অনেক সময় অর্থহীন বা দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। তাছাড়া রাজস্থানী ভাষার ব্যাকরণ, পঠনরীতি ও ছন্দ রক্ষা করে তার ভালো অনুবাদ দোঁহায় করা সম্ভব নয়। তাই আঞ্চলিক অনুবাদ না করে দোঁহার মূল ভাবার্থটিকে সহজ গদ্য-রূপান্তরে প্রকাশ করা হল তার অন্তর্নিহিত মাধুর্যটি রসগ্রাহী পাঠকদের আস্বাদনের জন্যে। সেই সঙ্গে মূল দোঁহাগুলির ও উল্লেখ থাকল কিছুদের জন্য।

রাজস্থানী জীবনের দুটি প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল তার বীরত্ব এবং স্বাধীনতা—আর এই দুটি ভাবনাধারাই রাজস্থানী সাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে মিলে মিশে রয়েছে। এদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন করণীমাতা—দেবী দুর্গার অবতার হিসেবে সকলে তাকে মান্য ও পূজো করে। আর দুর্গা তো বীরত্বেরই দেবীরূপ। কিম্বদন্তী এই জগজ্জননী দেবী করণীর বীরোচিত স্বরূপটি সুন্দরভাবে একটি দোহায় ফুটে উঠেছে :

বড়কে ডাঢ় বরাহ, বড়কে পীঠ কমঢ়ঠরী।
ধড়কে নাগ ধরাহ, বাঘ চঢ়ে জদ বীসহথ ॥[১]

কিম্বদন্তী দেবী করণীমাতা বাঘের পিঠে আরোহণ করেন তখন একদা পৃথ্বীকে ধারণকারী বরাহের গজদাঁত এবং কচ্ছপের পিঠের ঢাল কড়কড় শব্দে ফেটে যায় আর পাতালে অনন্তনাগ ও সারা পৃথিবী ভয়ে থরহরি কাঁপতে থাকে।

রাজস্থানে এক নবজাতকের জীবনের সূত্রপাত কেমন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়ে থাকে তার একটি নমুনা নিচে উদ্ধৃত করা হল। মমতার সঙ্গে বীররসের এমন অতুলনীয় সংমিশ্রণ সাহিত্যে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় :

ইলা ন দেনী আপনী, রণ খেতী ভিড় জায়।
পুত সিখাবৈ পালনৈ, মরণ বড়াই মায় ॥[২]

[মা নবজাত শিশুকে দোলনায় দোল দিতে দিতে সেই শিশুকাল থেকেই বীরোচিত মৃত্যুর মহিমা যে অপার, তার শিক্ষা দিতে থাকে—মা ছেলেকে বলে, হে পুত্র যুদ্ধে প্রাণ যদি যায় সেও ভাল তবু নিজের মাতৃভূমিকে অপরের হাতে যেতে দিও না।]

যে শিশু আলেলব তার ঘুমপাড়ানী গানে এমনভাবে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এবং নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার পাঠ গ্রহণ করতে থাকে সে যে ভবিষ্যতে দেশের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে কিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না তা বলাই বাহুল্য। বীর সন্তানকে গড়ে তোলার কাজটি এবং জাতির গৌরবকে রক্ষার দায়-দায়িত্ব যে বীর মাতাদের হাতেই প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল সমাজতত্ত্ববিদ সমেত কেউই হয়তো তা অস্বীকার করতে পারেন না।

রাজস্থানী জীবনযাত্রায় পুরুষের বাহ্যিক রূপ বা চেহারার কোন মূল্য নেই। পুরুষের প্রকৃত রূপের পরিকাঠামো বা মাপকাঠি হল তার নির্ভীক হৃদয় এবং বীরত্ব। রাজস্থানী জীবনধারা তারই মুখাপেক্ষী :

ভূড়ল তো ভূড়া জনৈ, হিরণী জনৈ সুগউ।
পাত খড়কৈ উঠ চলৈ, থাপড় চালৈ খট্ট ॥[৩]

[শূকরীর বাচ্চা কুরূপে দেখতে হয় এবং হরিণী সুন্দর সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু এই সুন্দরতা মূল্যহীন কারণ হরিণ শিশুর জীবন সর্বদাই আশঙ্কা ও আতঙ্কের মধ্যে কাটে। গাছের পাতা খসে পড়ার তুচ্ছ শব্দেই সে ভোরা ভয়ে কেঁপে মরে, প্রাণ বাঁচাতে ছুটে পালায়। আর শূকরীর বাচ্চাদের দেখো কেমন নির্ভয়ে বাপটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।]

সরল সাধাসিধে গোকোরো এক ছেলে ছিল। তার কাকিমা তাকে কোন কাজের উপযুক্ত মনে করত না। কিন্তু হঠাৎ একদিন যুদ্ধ বেধে যেতে তার কাকিমা অবাক হয়ে লক্ষ করে যে তার বড় জায়ের সেই ভালোমানুষ ছেলেটিই সকলের আগে শত্রুর হাতিদের আক্রমণ করছে। যাদের সামনে অনাদের যেতে সাহসে কুলোচ্ছে না তাদেরই সে কেটে দুটুকরো করে ফেলছে :

দিন দিন ভোলো দীসতো, সদা গরীবী সুত।
কাকী কুঞ্জর কাটতা, জানবিয়ো জেঠুত ॥[৪]

[বড়জায়ের ছেলেকে তার কাকিমা বরাবরই সাধাসিধে ভীরু স্বভাবের বলে মনে হত : আজ তাকে হাতিদের কাটতে দেখে কাকিমা তার স্বরূপ জানতে পারে। (বীর মায়ের বুকের দুধের গুণ কি কখনো বিফলে যেতে পারে ? রাজস্থানীরা মাতৃকুল রেখে জীবন বিসর্জন দিতে কার্পণ্য করে না)]

সাধারণত কষ্টে বা আপদের মধ্যে পড়লে আমরা মাকে স্মরণ করে থাকি। আকস্মিক বিপদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের মুখ থেকে 'ও : মা গো' শব্দদুটি বেরিয়ে আসে। বীর রাজপুত তেমন পরিস্থিতিতেও মাকে স্মরণ করা পছন্দ করে না কারণ তা হৃদয়ের ভীরুতার পরিচয় বহন করে :

মাদেরা, মত রোয়ে, মত কর রত্তী আঁখিয়া।
কুলমে লাগৈ খোয়, মরতা মা ন স'ভারজে ॥[৫]

[হে মাদেরা, কেঁদোনা, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল কোরো না। মৃত্যুকালে মাকে ওভাবে ডেকে কুলের কলঙ্ক আর বাড়িও না। (অর্থাৎ মরতে হলে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করা ভালো, ভয়ে কাতর হয়ে মৃত্যুকে লজ্জাকর করে তুলো না।)]

ওপরের এই দোহাটির একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। জুনাগড়ের রাজা খেঙ্গার চুড়াসার রাণী রাণকদেবী তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী ছেলেকে একথা বলেছিলেন। রাজা খেঙ্গারের সঙ্গে গুজরাতের রাজা সিদ্ধরাজ জয় সিংহের শত্রুতা ছিল। আপন ভাগ্নের বিশ্বাসঘাতকতার যুদ্ধে খেঙ্গাররাজ জয় সিংহের হাতে মারা যায়। জয় সিংহ প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে বালক যুবরাজ মানে তার ছোট তলোয়ার দিয়ে সিদ্ধরাজকে আক্রমণ করে অকুতোভয়ে—সিদ্ধরাজ প্রবীণ ও নিপুণ যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও বালকের প্রতি বীরত্ব দেখানোর প্রয়োজনবোধ করে না, সে নৃশংসের মতো রাণকদেবীর চোখের সামনে যুবরাজ মণেরাকে হত্যা করে। মৃত্যুকালে অসহায় বালক তার মাকে কাতর স্বরে ডাকতে তার মা ঐ দোহার শব্দগুলি উচ্চারণ করেছিলেন।

জনৈকা বীর রমণীকে তার অসহায় কর্তব্যবিমূঢ় দেওরকে ওজস্বী ও প্রভাবশালী শব্দে কর্তব্য পথের নির্দেশ দিতে দেখা যায় নিচের দোহায় :

রাহব ! উঠ কমাণগড়, মহ মরোড় ন রোয়।
মরণা মরণা হক হৈ, রোণো হক ন হোয় ॥[৬]

[রাহব তুমি কাঁদছো কেন ? ওঠো, না কেঁদে গেঁথে তা দাও। পুরুষ মানুষের মৃত্যুবরণ করার অধিকার আছে কিন্তু কান্নার নয়। (কান্না তো নিরুপায় অবলার কাজ।)]

এইসব বীরাঙ্গনা রমণী ও তাদের বীর সন্তানদের বীরত্বের অন্য কয়েকটি উদাহরণ এখানে প্রাসঙ্গিক হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বারো বছরের রাজপুত বালক বাদল দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হলে তার মা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, "বাদল, এ তুই কি করতে চলেছিস বাছা, তুই যে এখনো ছেলেমানুষ মাত্র।" 'ছেলেমানুষ' (বালক) শব্দটি শুনে বাদল রেগে যায়। ঐ শব্দটি তার অত্যন্ত অপমানজনক বলে মনে হয়। সে জবাব দেয় :

মাতা, বালক কোঁ কহো ? রোই ন যাগো গ্রাস।
জে খগ মারূ সাহ-সির, তো কহিয়েটে সাবাস ॥[৭]

[মা, আমাকে বালক বলছো কেন ? আমি কি কোনদিন তোমার কাছে খাবার জন্যে কান্নাকাটি করেছি ? আজ সম্রাটের মাথায় যখন তরোয়ালের আঘাত করব তখন বাহবা দিও।]

চেহারায় বা আকৃতিতে ছোট হলেই কেউ ছোট হয়ে যায় না, তাদের কাজের পরিধি দিয়েই সে মানুষকে পরিমাপ করা উচিত সেটি নিচের দোহায় আমরা দেখতে পাই

সিংহ সিঁচালো সাপুরুষ, ঐ লহুরা ন কহাই।
বড়ো জিনাবর মারিকৈ ছিনমেঁ লেয়ঁ উঠাই ॥[৮]

[সিংহ, বাজপাখি আর বীরপুরুষে—এরা কক্ষনো ছোট বা ছেলে মানুষ হয় না। চোখের পলকে বড় পশুকে বড় পশুকে নিহত করে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার ক্ষমতা এদের রয়েছে।

কবির এই প্রামাণিক উক্তির পর রাজপুত বালকদের সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রতি পাঠক হিসেবে আমাদের আর কোনো দ্বিধার অবকাশ থাকে না। এই বালকেরাই যে একদিন ভীমসেন ও পার্থের মতো বীর যোদ্ধা অথবা রাণা প্রতাপের মতো অনমনীয় দেশনেতা হয়ে উঠবে তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কেননা তাদের পেছনে তাদের বীরাঙ্গনা মায়ের পরিচয় তো আমরা শুরুতেই জেনে যাই।

তথ্যসূত্র :

নির্বাচিত রাজস্থানী দোহা : জ্যোতির্ময় দাশ
রাজস্থান রা দুহা : পণ্ডিত নরোত্তম দাস স্বামী
রাজস্থানী দোহা সংগ্রহ : রাণী লক্ষ্মীকুমারী চুণ্ডাবত।

SPACE DONATED BY :—

A

WELL

WISHER

হ্যামলেটের দুর্গ-প্রাসাদ

অনুবাদ : দিলীপ ঘোষ

সংকীর্ণ প্রণালীটির মধ্য দিয়ে সুইডেনের দিকে তাকালে দেখা যাবে দাঁড়িয়ে আছে এলসিনোর দুর্গঘেরা প্রাসাদ, হ্যামলেট নাটকের দৃশ্যপটটি। শেকসপীয়র কি প্রামাণিক একদল অভিনেতা নিয়ে দুর্গ প্রাসাদটি পরিদর্শন করেছিলেন? সমুদ্রের তীরে প্রাসাদটির অবস্থান, এর অপূর্ব সুন্দর কক্ষগুলি, সেই মঞ্চ যেখানে প্রেতাত্মাটি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারতো, সমস্ত কিছুই ইঙ্গিত করে তার ট্রাজিক-নায়কের বাসস্থান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন……

পৃথিবীর বিখ্যাত দৃশ্য-স্থানের অনেকগুলিরই প্রবেশ পথ অনুজ্জ্বল। ভাসহিতে আপনি পৌঁছবেন পারীর নোংরা শহরতলীর মধ্য দিয়ে, আর জিব্রাল্টারে যাবেন স্পেনের অত্যন্ত তুচ্ছ শহরের পথ ধরে; এমনকি রোমনগরীর অলৌকিক দেবমন্দিরটিও আটকা পড়েছে গতি-ব্যাহত ও ট্রাফিক রুদ্ধ ছোট ছোট রাস্তার মধ্যে। কিন্তু কোপেনহেগেন থেকে আঠারো মাইলের গতিপথে এলসিনোর ওরেসুন্দের নীল জলরাশির ধার দিয়ে, অপর পার্শ্বে সুইডেনের উপকূলভূমি, এবং তার অসংখ্য জাহাজ নিয়ে দাঁড়িয়ে—পৃথিবীপৃষ্ঠে সবচেয়ে কুহক মন্ত্রের অন্যতম একটি।

যিনি আসল হ্যামলেট কখনোই তিনি এলসিনোর দেখেননি; মোরস দ্বীপে আপন সমাধিতে তিনি শায়িত ছিলেন। উত্তর জুটল্যান্ডের অনুপম লিমফজোরড-এ কুরকর্ণ দুর্গপ্রাসাদটি নির্মাণের প্রায় সাত শতাব্দী আগে। তাঁর আসল নাম আমলেথ আর তিনি ছিলেন উপজাতি-শাসনকর্তার একমাত্র সন্তান, যে শাসনকর্তা নাকি ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছিলেন ক্ষমতা ও নিজের স্ত্রীর কারণে। উনিশ বছরের রাজপুত্র উপলব্ধি করলেন যে তিনি নিজের কাকার ষড়যন্ত্রের ফাঁদে এবং হতে চলেছেন মৃত্যুর শিকার; ফলে হঠাৎই তিনি শঠতার পথ বেছে নিলেন। ভান করলেন যেন নিজের বুদ্ধিলোপ পেয়েছে। সারাটাদিন বসে রইলেন বিশাল অগ্নিকুণ্ডের ছাইয়ের মধ্যে আর সমস্ত প্রশ্নের নির্বোধ উত্তর দিলেন। কিন্তু অন্যায়ভাবে ক্ষমতাসীন শাসনকর্তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের তখনো আমলেথের প্রতি একটা উষ্ণস্নেহ মনোভাব জেগে ছিল আর হয়তো তার রহস্যটিও তাঁরা অনুমান করতে পারেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা তিনি তাঁদের সকলকে মাতাল করে দিলেন। আর তাঁরা যখন নিদ্রায় ঘোরে তখন একখানি তরবারি চুরি করলেন এবং কাকার নিজস্ব কক্ষে লুকিয়ে ঢুকে তাঁকে হত্যা করলেন। তারপর জনসমক্ষে হাজির হলেন। তাঁদের জানালেন পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে নিজের ধৈর্যশীল চতুরতার গোটা কাহিনীটি। আর তাঁরাও উল্লসিতভাবে তাঁকে নিজেদের শাসকরূপে অভ্যর্থিত করলেন।

সূক্ষ্মতা-বিহীন আদর্শ একটি লোকাকাহিনী এটি। এখানে কোন ওফেলিয়া নেই। তবুও ডেনমার্কের মানুষ তাঁদের শিশুদের কাছে এই সংকল্পে-দৃঢ় যুবক রাজপুত্রের কথা এবং কিভাবে তিনি জয়ী হলেন সেই কাহিনীটিও বলতে ভালোবাসতেন। আর শিশুরাও আবার তাঁদের পরবর্তী শিশুদেরকে বলতে ভালোবাসতেন। বহু প্রজন্ম ধরে এটি ছিল একটি প্রিয় গল্প।

ডেনমার্ক পরবর্তী তিনশো বছরে দীক্ষিত হয়ে উঠলো নতুন একটি ধর্মে, যার নাম খ্রীস্টধর্ম—যে ধর্ম জনগণকে তাদের সরল-উদ্ভবের দিকে পেছন ফিরিয়ে দাঁড় করাতে চাইছিল। নবা আলোকপাতের একজন ডেইন-সন্তান স্কাংকো গ্রামাটিকাস আতঙ্কিত হলেন যে তাঁর স্বদেশভূমির পুরনো বীর-গাথাটি ধর্মের উত্তেজনার মধ্যে বিস্মৃত হয়ে যাবে। কাজেই সবচেয়ে বিখ্যাতগুলি তিনি সংগ্রহ করলেন আর সেগুলি মোটা টেকসই কাগজে সুবিদিত ল্যাটিন ভাষায় লিখে রাখলেন। কেন্দ্রগুলি তিনি লিখে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে একটি তরুণ যুবরাজ আমলেথ ও তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনীটি। সে ছিল খ্রীস্টীয় শতকের কাছাকাছি সময়ে।

১৬০১ খৃষ্টাব্দে শেকসপীয়রের প্রতিভার সৃষ্টিশীল লেখনীতে, শতাব্দী বছরের প্রাচীন বীরত্বাখ্যানটি মানবজাতির দর্পণ এবং ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে বিখ্যাত ট্রাজেডি হয়ে উঠলো। সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার বিষয়ে এক হাজার বইও এতটা শিক্ষদায়ী হয়ে উঠতে পারে না যেমনটি পেয়েছে নাকি হ্যামলেটের সঙ্গে সাক্সোর লোকবাহিনীর নিছকই অস্থির তুলনাটি। যা কিছু উৎসাহ-বর্ধক নয় সেগুলিকে শেকসপীয়র বাদ দিলেন। তাঁর যুবরাজকে মনোগ্রাহী করে তুললেন। তাঁর নাটকের অত্যুজ্জ্বল খেয়ালীপনাকে কাজে লাগালেন, নিজের বিস্ময়কর প্রতিভার দর্পণে রূপান্তরিত করে।

শেকসপীয়র যখন হ্যামলেট লিখতে শুরু করলেন দৃশ্যপটটি বেশ কিছুটা অলৌকিকভাবেই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়েই ছিল। ডেনমার্ক তখন ইউরোপের অন্যতম একটি শক্তিমান ও সম্পদশালী শক্তি, বাল্টিক সাগরের প্রবেশ দ্বার সেই অপূর্ব সুন্দর দুর্গ ও প্রমোদ-প্রাসাদের পুনর্নির্মাণ শেষ করেছে—যেটি নামাঙ্কিত হয়েছিল ফ্রেডারিক দ্বিতীয়-রাজকীয়-দুর্গপ্রাসাদ—রাজ্যের মণিভূষণ। এটির রেখাঙ্কণ করেছিলেন, আন্তর্জাতিক একজন লিওনার্দো-সুলভ ব্যক্তিত্ব, পরে যিনি চতুর্থ খ্রীস্ট নামে পরিচিত হয়েছিলেন, মদ ও সুন্দরীদের প্রেমিক, হৃদয়হরণকারী, বোদ্ধা, ভাষাতাত্ত্বিক, বাদ্যযন্ত্র-নির্মাতা এবং অত্যন্ত উঁচু স্তরের একজন স্থপতি। আজকের কোপেনহেগেনেও বেশির ভাগ বড় রাজপ্রাসাদগুলি বহন করে চলেছে বিখ্যাত থ্রিফরমালা, চার অঙ্গটিকে ঘিরে বড় হাতের সি অক্ষরটি, যেটি দিয়ে তিনি নিজের সমস্ত কাজে স্বাক্ষর করতেন। কোপেন-হেগেন খ্রীস্টানদের শহর, তিনিই একে ছোট একটি বাণিজ্যিক বন্দর থেকে উত্তরের বিরাট রাজধানীতে রূপান্তরিত করে তুলেছিলেন। সঙ্গীত ও থিয়েটারে তিনি আনন্দ পেতেন এবং কনসার্ট-সংধ্যায় এলসিনোরের ছোট্ট অভ্যর্থনা গৃহে মোমের আলোয় চতুষ্টয় সুরসঙ্গীত বাদনের আয়োজন করতেন। গ্রীষ্মকালে সমগ্র ইউরোপ থেকে অভিনেতারা আসতেন, মধ্যস্থিত ছোট অঙ্গনে নাটক অনুষ্ঠানের জন্য, যেখানে কিনা তিন হাজার দর্শকের জায়গা হোত। তাঁদের মধ্যে থাকতেন প্রেব থিয়েটারের অভিনেতারাও।

আমি যখন এলসিনোর পরিদর্শন করলাম, দুর্গ-প্রাসাদের অধিপতি কর্নেলের গাবেল জোরজেনসেনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলাম প্রশস্ত ঘাসে-ঢাকা উঁচু সমতলে শেকসপীয়র যেখানে হ্যামলেটকে পিতার প্রেতাত্মার সাথে বাক্যালাপ করিয়েছিলেন। কর্নেলেল আমাকে দেখালেন ইটের ফোকরে ছেড়ে রাখা লতাটি, সমগ্র ডেনমার্কে কেবল এই একটি জায়গায় লতাটি জন্মায় বলে জানা গেছে। আর বললেন ব্যাপারটি অদ্ভুত লাগে যে শেকসপীয়র লতাটির ডেইন শব্দটি জানতেন, Rude (কোমল স্বরে বললে হয়ে ওঠে Roodha) যদিও নাটকে এর বানান দেখিয়েছেন Rood। গাবেল জোরজেনসেন গগনভেদী দুর্গ-প্রাসাদটির দিকে এক পলক তাকিয়ে নিলেন, বললেন—'এ যাবৎ একজন মহৎ শিল্পী অন্যদেরকে সবচেয়ে যে বিস্ময়কর সৃষ্টিটি উপহার দিয়েছে তা শেকসপীয়র কর্তৃক সৃষ্ট—এই অনিন্দ্য রাজপ্রাসাদটি যখন তিনি হ্যামলেটের দৃশ্যপটের জন্য পছন্দ করলেন।

আর অবিশ্বাস্য রকমের এটি. স্যালমন শঙ্খের মতন চূড়া ও অট্টালিকা. সোনালী ইঁটের উঁচু উঁচু প্রাচীর-শীর্ষ তপ্ত রোদের প্রাচীর-সদৃশ আর বিস্তৃত সবুজ-তামাটে ছাদগুলি যেন আকাশের পটে ঢালু তৃণক্ষেত্র। সামুদ্রিক দুর্গ-প্রাসাদটি এমন একটি ভূখণ্ডে গড়ে উঠেছে যা কিনা ওরেসুন্দে সে'ছিয়ে গেছে। এটির দুধারেই সমুদ্র আর আবহও সামুদ্রিক মেজাজের। এটিকে আমি দেখেছি নানা আবহাওয়ায়—কোন ধূসর ইলশেগুড়িতে যখন নিচু আর ভারাবহ দেখায়, আবার উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় যখন এর সবুজ শঙ্খিল চূড়াগুলিকে মনে হয় উচ্চতায় নিজেদের আসল রূপকে ছাপিয়ে চলেছে আর গৌরবে দীপ্তি ছড়াতে থাকে। পূর্ণ চাঁদের আলোয় সমুদ্র থেকে একে আমি দেখেছি যখন বিশাল দুর্গের উপরের অতিকায় আধার-প্লাবিত পরিসরটির উপর দিয়ে ছাদটি স্বপ্ন দেখে চলে নবীন তৃণের মতই সতেজভাবে. আর সে প্রশান্তি ভেঙে যায় শুধু আপন বাতিঘরের চকিত-আলোর ঝলকানিতে।

ডেনমার্কের পূর্ব উপকূলে ওলন্দাজ-নকশাগঠনের এই সুন্দর প্রাসাদটিকে যে মানুষটি সবথেকে বেশি তাড়িত করেন তিনি হলেন মুখচোরা, খেয়ালী, উদাসী তরুণ, যুবরাজ হ্যামলেট। ক্রোনবর্গের অসংখ্য কক্ষের মধ্যে দিয়ে চলতে গিয়ে, দেখা যাবে প্রতিটিরই নিজস্ব, একান্ত শৈলী আর তাদের কয়েকটি তো ভীষণই অন্ধকার। আর হ্যামলেট যে কখনোই সেখানে বাস করেন নি, নিজেকে একথা বিশ্বাস করানোর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে ইচ্ছাশক্তির অসম্ভব প্রচেষ্টার।

দুর্গপ্রাসাদটি ছিল স্বয়ং একটি গ্রাম—কিন্তু কোন তুচ্ছ গ্রাম নয় তা। বর্তমান এলসিনোর শহরটি তার চারপাশে প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে উঠেছিল। ব্যাপারটি বিশ্বাস করানো এখন কঠিন যে ক্রোনবর্গ এমন বিচিত্র প্রকৃতির এত অসংখ্য মানুষকে আশ্রয় দিতে পেরেছিল—সম্রাট খ্রীশ্চিয়ান ও মহিষী, চাঁদের সন্তান-সন্ততি ও তাদের গৃহশিক্ষকদের (তাঁদের তেইশটি সন্তান সন্ততি ছিল) রাজসভাসদ, বন্ধুবান্ধব, রাষ্ট্রীয় অতিথি, প্রণয়িনী, নৌ ও স্থলসেনাদের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এবং শত শত চাকর-বাকরদের। আমরা এখন আশ্চর্য হতে পারি যে কোথায় ছিল পোলোনিয়াসের গৃহে শেক্সপীয়র যেখানে প্রাথমিক অনেকগুলি দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। এটি হতেও পারে অতীব সুরক্ষিত তিনটি পরিখার মাঝে অবস্থিত আলাদা কোন অট্টালিকা' ওফেলিয়া নলখাগড়ার সেই জলাশয়ে যেখানে নিজেকে নিমজ্জিত করেন। অথবা তা হতেও পারে প্রাসাদের একেবারে অন্দরে, কারণ হ্যামলেটের যখনই ইচ্ছা হোত ওফেলিয়াকে দেখবার, তার জন্য সানানাই বেগ পেতে হোত—অন্ততপক্ষে যতক্ষণ না ওফেলিয়ার পিতা বাধা দিয়েছেন। আর ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়ায় ওফেলিয়ার পক্ষ থেকে হ্যামলেটকে খুঁজে বের করা।

কর্নেল গাবেন জোহানসেন আমাকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে শেক্সপীয়র কখনোই, দুর্গপ্রাসাদটিকে এমন নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করতে পারতেন না যদি না তিনি এলসিনোরে গ্লোব থিয়েটারের অভিনেতাদের সঙ্গে না আসতেন। তিনি দুর্গপ্রাসাদটির সবকিছুই জানতেন, প্রতিটি কক্ষ কেমন দেখতে, এমন কি বহু নিচের মৃত্যুবৎ-ভয়ঙ্কর গোপন সুড়ঙ্গ কক্ষগুলিও জানতেন। আমি প্রতিবাদে যখন জানালাম যে শেক্সপীয়র এলসিনোর-এর বিবরণ দিয়েছেন—"খাড়া পাহাড়ের সেই ভয়ঙ্কর শিখরে—অথচ বাহিরে প্রাচীরশীর্ষ-চাতালটি উঠে এসেছে প্রকৃতপক্ষে পাথুরে সমুদ্রতট থেকে—কর্নেলের লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন সুউচ্চ সমুদ্র-প্রাচীরের প্রান্ত পর্যন্ত এবং নিচের দিকে দেখালেন। "দেখুন! এটি কী মোটেই খাড়া পাহাড় নয়, কিন্তু শতাব্দীগুলিতে সমুদ্র একটি সৈকতভূমি গড়ে তুলেছে। আগে এখানে কোন সৈকতভূমি ছিল না—ঐ সব ঘূর্ণমান ঢেউগুলি শুধু কাটাপাট ছেকে ছুটে এসে এই প্রাচীরের উপরে ভেঙে পড়তো। অন্য আরেকটি ব্যাপার ; প্রাচীর যে সব ছেইন শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। এই মাত্র আমি বলেছি Rood বা Rue

সম্পর্কে। হ্যামলেটই তাঁর একমাত্র নাটক যেখানে তিনি এইলকে eale বানানে লিখেছেন। যেটি কি আমাদের el এর মতন শোনায় না? অবশ্যই তা শোনায়! আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে শেক্সপীয়র একলা হাঁটাচলা করেছিলেন.. যেখানে ঠিক এখন আমরা হেঁটে চলেছি।"

কলোনেল এর উদ্দীপনা এতটাই সংক্রামক যে সে ঘোরে কিছুটা আচ্ছন্ন না-হয়ে পড়াটাই ছিল কঠিন। শেক্সপীয়রের জীবন সম্পর্কে এত কম তথ্য জানা যায় এমনকি ১৬৪৪ সালে পিউরিটানরা 'পাপেভরাগ্লোব থিয়েটারটি ধ্বংস করে ফেলে, আর তার পাণ্ডুলিপিও নষ্ট হয়ে যায়—অর্থাৎ সবথেকে নীরস পণ্ডিতবাদীরা সন্দেহবাদীই কেবল সন্দিহান থাকবেন যে নাটকার গ্লোব বা ব্ল্যাকফ্রিয়ার কোম্পানীর অভিনেতা-নির্দেশক হিসাবে এলসিনোর-এ এসেছিলেন—যেখানে তিনি প্রথম সারির শেয়ার-অংশীদারদের মধ্যে ছিলেন।

এলসিনোর-এ যাবার অব্যবহিত আগে আপনি যদি হ্যামলেট পুনরায় পড়ে নেন তাহলে সমস্ত স্থানটি আপনার কাছে একটা আশ্চর্যরকম প্রত্যক্ষতা পেয়ে যাবে। শেক্সপীয়র যদিও ঠিকঠাক দৃশ্য অবতারনার ব্যাপারে অসতর্ক ছিলেন—তিনি মাঝে মধ্যেই কেবল বলেন—"দুর্গপ্রাসাদের অন্য একটি কক্ষ"—ঘটনার মধ্য দিয়ে আপনি অনেকটাই অনুমান করে উঠতে পারবেন যে কোন কক্ষ সেটি। তিনি যখন সুনির্দিষ্ট করে বলেন 'একটি হলঘর' বা রাজকীয় একটি হলঘর, তাহলে আপনি আরো সঠিকভাবে জানতে পারেন যে তিনি বুঝিয়েছেন ভোজউৎসব কক্ষ বা সিংহাসন কক্ষ। আর যখন আপনি সেই কক্ষগুলিতে রয়েছেন, যেন শুনতে পাচ্ছেন।

মাঝে মধ্যেই নাটকের চরিত্রগুলি এমনই অভাবিত এবং ঘটনাচক্রে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে পড়ে যেমন তারা করে থাকে কোন একটি বড় বাড়িতে। আর কোথায় তা ঘটছে সে বিষয়ে শেক্সপীয়র খুব সামান্যই ভাবিত—গুরুত্বপূর্ণ যা-তা হোল ঘটনাধারা। তবু আপনি যখন বাতিঘরের নিচে বিশাল মিনার কক্ষে, প্রণালীর উপর দিয়ে সুইডেনের শহর হেলসিংবার্গে আর তারও পরে পাহাড়-শ্রেণী অদূরে বিস্তৃত দৃশ্যপটে, জানবেন যে আপনি পৌঁছে গেছেন 'রাণীর নিভৃত কক্ষে। আপনার চোখদুটি যেন চারদিকে তাকিয়ে খুঁজে চলেছে সেই কারুময় পর্দাগুলি যেগুলির বৃদ্ধ পোলোনিয়াস, তাঁর মায়ের সাথে হ্যামলেটের ব্যক্তিগত কথোপকথন শোনার জন্য নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখানেই বুকে রাজপুত্র তাঁকে আবিষ্কার করেন এবং তরবারি বিদ্ধ করে 'মেরে ফেলেন, একটি স্বর্ণমুদ্রার জন্য, মৃত্যু'। এখন সেখানে কিন্তু কোন কারুময় পর্দা নেই, সেটি শেষ হয়েছে, লোমহর্ষক অগ্নিকাণ্ডে, যা ১৬২৯ খ্রীস্টাব্দে এলসিনোরকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে।

এই কক্ষটির জানালা দিয়ে যদি নিচের প্রশস্ত চত্বরে আপনি তাকান তবে সেই প্ল্যাটফর্মটি, যেখানে একদিন মাঝরাতে হ্যামলেট তাঁর পিতার প্রেতাত্মার সাথে কথা বলেছিলেন। (অস্ত্রধারী প্রহরীরা এখন যারা রাতদিন পায়চারি করছেন, ঠিক সেভাবে বার্ণার্ডো ও মারসেলাস হ্যামলেট নাটকের প্রথম অঙ্ক করতেন। তা কিন্তু পর্যটকদের জন্য নয়। তাঁরা আছেন সজাগ কর্তব্যে, যেমনটি ডেনমার্কের প্রতিটি উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ বাতিঘরগুলিতেই চোখে পড়ে)। শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের মা কাকা যদি হয়ে থাকেন হালকা-ঘুমের মানুষ, তাহলে তাঁরা শুনে থাকবেন সেই কালান্তক কথোপকথন।

সত্যিসত্যিই এলসিনোরে অনেক কিছুই শোনা গেছে। এই কেন্দ্রাতিগ শতাব্দীই প্রথম নয়, যারাই কেবল নিষ্পাপ-দৃশ্যের

অবস্থিত হয়েছে। দর্শকমঞ্চের কোণের উঁচু অট্টালিকা, যেটির মধ্যে রাজার পাঠকক্ষও পড়ে, বৃহৎ কর্কাটকে নজরদারি করার জন্য. তার কোন জানালা নেই। সেগুলি খুবই সজ্জিত কক্ষ। কিন্তু দুটি, যে দুটি মনে হবে পুরু কাঠে তৈরি হয়েছে সূক্ষ্মতম চিত্রিত সিল্কে। শুধু এদের একটি সিল্কের কামরার কাছে আপনাকে দাঁড়াতে হবে আর তাহলে শুনতে পাবেন দর্শকদের কক্ষের প্রতিটি উচ্চারণ।

যখনই নাটকের কোন একটি দৃশ্যের সূচনা ঘটবে ট্রাম্পের বাজনা এবং সাড়ম্বর ভেরীর আওয়াজে, আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে এটি ঘটছে এই দর্শকদের কামরা অথবা রাজার পাঠককে, যেখানে সেই যুগে একজন সম্রাট নিজের পড়ার টেবিলে বহুপ্রহর কাটাতেন। ট্রাম্প ও ভেরী যথাসময়ে সংকেত জানাতো. রাজপুরুষদের পোষাক পরানো, জুতো পরানোর জন্য. কোন মর্যাদাবান ব্যক্তির আবির্ভাবের আগে।

বেশিরভাগ কক্ষ প্রস্তুতই রাজকীয়। ছোট হলঘর নামেই শুধু ছোট ছিল—অর্থাৎ শেক্সপীয়রের হ্যামলেট আপন বক্তব্যদীর্ণ পদচারণার বেশিরভাগই করেছিলেন কোন একটি জানালার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে. বিশাল কামানের সারিগুলির দিকে দৃষ্টিক্ষেপের জন্য. যেগুলি বাল্টিক সাগরের অপরিসর প্রবেশ পথটিকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এখানে দেয়ালগুলি চোদ্দ ফুট পুরু, জানালাগুলি অপরিসর. নৌ-কামানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কারণে। কামরাগুলি যেহেতু বাবস্তুত হোত বেশির ভাগ সময়ে রাষ্ট্রীয় ভোজ-উৎসবের অনুষ্ঠানে। সাধারনতঃ এটি পড়ে থাকতো, যদিও হাঁটাচলা ও সোচ্চার ভাবনা চিন্তার জন্য একটা উত্তম জায়গা। ঠিক এখানেই পোলোনিয়াস রাজাকে বলেন, 'আপনি কি জানেন যে. কখনো কখনো, এখানে তিনি, এই চত্বরে. একটানা চারঘণ্টা পায়চারি করে থাকেন, আর রাণীর গুপ্তচরেরা যারা সকলসময়েই সজাগ, হাস্যস্বরে বলে ওঠেন, 'সত্যই সে এমন করে। তখনই সেই বিষাদগ্রস্ত যুবরাজ একখানি বই পড়তে পড়তে ভিতরে ঢুকে পড়েন। চতুর ছলে পোলোনিয়াসকে তিনি শহরের একজন মাছের ব্যবসায়ী বলে ভাবেন, আর উদ্ভ্রান্তভাবে কথা বলে-সেই বৃদ্ধ মানুষটিকে বিশ্বাস করাতে চান যে তিনি স্বয়ং উন্মাদ হয়ে গেছেন।

অকস্মাৎ ভেরীর আওয়াজ থেমে ওঠে আর অপ্রত্যাশিত একদল অভিনেতা বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকে পড়ে। হ্যামলেট, যিনি জানেন আর মঞ্চ ভালোবাসেন (আর এখানে স্বয়ং শেক্সপীয়রকে আমরা এক ঝলক দেখতে পাই. নাট্য নির্দেশককে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে) তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং রাজসভাসদদের সম্মুখে, তিনি লিখবেন ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত একটি হত্যাকাণ্ডকেন্দ্রিক একটি নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয়ের জন্য প্ররোচিত করেন। যখন তাঁরা রাজী হলেন, নিজের প্রতি বিরূপ ক্রোধ তাঁর মধ্যে আনন্দের রূপ নেয়, যেহেতু নিজের মহান ভাবনাটিকে তিনি উদ্ভাসিত করে ফেলেছেন—

নাটকটিই সেই ঘটনা
যার মধ্যে রাজার বিবেক আমি ধরে নেবো।

সেই বিরাট রাজসিংহাসন কক্ষেই (অন্যভাবে বললে পারিষদদের হল ঘরে) একটি ভোজ উৎসবের পরে হ্যামলেট তাঁর মাকে ও খল কাকাকে প্রথম উদ্ভূত বিনোদন উপহার দেন। রাজপুত্র সকোপে সাবালক হয়েছে, যা নাকি ভণ্ড রাজার কাছে তাঁকে অত্যন্ত বিপজ্জনক করে তুলেছিল. আর বাহ্যিক স্নেহের এমন একটি উপহার কিন্তু প্রয়োজনীয়ই ছিল। বিনোদনটি কিন্তু ছিল সেই সর্বনাশা নাট্যানুষ্ঠান।

নাট্য-অভিনয়ের জন্য কী আশ্চর্য জায়গা ; এর বিরাট বিরাট সোনার বাতি ঝাড়গুলি, আর অপূর্ব সুন্দর গোবেলিন কারুকার্যময় পর্দা, সমস্ত ইউরোপের সব থেকে চমকপ্রদ সৌন্দর্যের অন্যতম একটি নিদর্শন। অপ্রস্তুতাবস্থিত আপনি বিপরীত একটি ছোট্ট কক্ষ থেকে এখানে এসে পড়বেন, সাধারণ আকৃতির কোন একটি দরজা দিয়ে, আর আকুল হয়ে পড়বেন। আপনার সম্মুখের কামরাটি মনে হবে যেন উপরে উঠে যাচ্ছে, চোখধাঁধানো শুভ্র একটি ঔজ্জ্বল্য সূর্যালোকে বিস্তৃত হয়ে চলেছে। বিশাল এই কক্ষটির মধ্যস্থল থেকে আপনি যখন পেছনে প্রবেশদ্বারের দিকে তাকাবেন, এটিকে দেখতে লাগবে কোন পুতুলঘরের দরজার মতন। বিরাট জানালাগুলি মেঝে থেকে উঠে গেছে ওকেল কড়িকাঠের প্রায় ছাদ পর্যন্ত। গভীর, নির্জন কামরাটি আপন সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে বিস্ময়-উৎপাদক হয়ে ওঠে। সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে, অথবা তুষার ও সমুদ্রের চোখ ধাঁধানো আলোয়, গভীর জানালা আর তাদের চুন-পাথর-সাদা দেয়ালগুলি থেকে ঠিকরানো খাঁজ আলোর ঔজ্জ্বল্য বিহ্বল করে তোলে।

সে-ছিল এই ঘরেই সন্ধ্যাকালে, বিশাল বিশাল বাতিদানে শত শত মোমবাতির আলোকে ঝলমলে, হ্যামলেট যখন তাঁর মা ও কাকাকে বিনোদিত করলেন। আর তাঁরা আনন্দিত শান্তচিত্তে বসে আছেন। মঞ্চে প্রবেশের জন্য অভিনেতারা, যখন তৈরি, মোমবাতিগুলি একের পর এক নিভে যেতে লাগলো আর মঞ্চটিই শুধু আলোকিত হয়ে রইলো। একজন অভিনেতা-রাজা ও একজন অভিনেত্রী-রাণীকে একসঙ্গে বাগিচায় দেখানো হোল। রাজা বোঝালেন যে তিনি একটু ঘুমিয়ে নিতে চান, আর তাঁর নারী তাঁকে একলা রেখে দিয়ে চলে গেলেন। তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়লেন, একজন কৃষ্ণবর্ণ অভিজাত চুপিসারে সেখানে প্রবেশ করলেন, আর ঝুঁকে পড়লেন রাজাকে বিষ প্রয়োগের জন্য। আসলে রাজা ব্যাপারটি কোনমতেই বেশিক্ষণ দেখতে পারলেন না। তিনি উঠে পড়লেন আপন অপরাধের মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারে। আর কাঁপতে কাঁপতে জায়গাটি ছেড়ে চলে গেলেন। প্রেতাত্মা তাহলে সত্যি-কথাই বলেছে। আর হ্যামলেট অবশেষে আপন করণীয় বিষয়ে নিশ্চিত হলেন।

বীয়সের এই একই সভাঘরে, দুটি অঙ্কের পরেই, ডেনমার্কের যুবরাজ, হ্যামলেট পৌঁছে যান রুধিরাক্ত অন্তিমে—ঘরটি ভরে ওঠে মৃতদেহে। এমনও মনে হতে পারে যে শেক্সপীয়র নিজেও এমন একটি রাজকীয় সভাগৃহে যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়ে ফেলেছেন হয়তো তার দ্বারা কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন—কারণ তিনি স্বয়ং বেরিয়ে পড়েন এমন ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে মন্তব্য জানানোর জন্য। একজন নবীন নরওয়ের রাজপুত্র ফরটিনব্রাসের মুখে সংলাপ যুগিয়ে দেন, চোখদুটি যাঁর নাকি রক্তপাতের দৃশ্যে অভ্যস্ত। রাজকীয় সেই কক্ষে, দৃশ্যটি তাঁকে আড়ষ্ট করে তুলে, স্থান-কালের বোধকে ঘুলিয়ে দিল, আর শুধুই বললেন তিনি।

শবগুলি তুলে নাও। এমন একটি দৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই
শোভা পায়, কিন্তু এখানে তেমন কিছুই নেই।

[• মূল লেখাটির শিরোনাম Hamlet's Castle]

গ্রন্থ আলোচনা

মণিমেখলার ডায়েরি / মায়া সিংহাল্ক
দে'জ পাবলিশিং। মূল্য—৫০'০০

১৯৯৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী ম্যান-অব-ওয়ার জেটি থেকে থেকে ছোট্ট এক কাঠের নৌকোয় জ্যোতির্ময় দত্তের নেতৃত্বে লঙ্কা অভিযান শুরু করেছিলেন লেখিকা মায়া সিংহাল্ক ও আজিজুর রহমান। মণিমেখলার ডায়রি সেই দুঃসাহসী অভিযানেরই রোমাঞ্চকর ফসল, প্রতোক পদে বিপদ, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আর অদম্য উৎসাহের রসে ভরপুর এই গ্রন্থটি অভিযানকারী ও পাঠকদের নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করবে।

অনেকটাই ডায়েরির পাতা থেকে উঠে আসা এই অভিযানের কাহিনীতে লেখিকা নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। যদিও বার্ষ এই অভিযান তবু সাবলীল সহজ সরল ভাষায় লিখিত এই ডায়েরির পাতা তাই নিছকই গল্প নয়, হয়ে উঠেছে অভিযানকারীদের কাছে এক মূল্যবান তথ্য সামগ্রী. ভবিষ্যতে লেখিকার কাছে আরো প্রত্যাশা রইল।

সম্প্রতি লেখিকা এই গ্রন্থের জন্যে ন্যাশনাল আওয়ার্ড লাভ করেছেন।

Phone 5556099
3509785

ORIENTAL JEWELLERS

Astralogical Dept.

81, BIDHAN SARANI
KOLKATA-4
HATIBAGAR MARKET

Sunday Open Thursday Closed

अनुवाद पत्रिका

मई-सितम्बर संख्या, २००२

सम्पादक : वैशम्पायण घोषाल

युग्म सम्पादक : अनुराधा महापात्र

सह सम्पादक : बितस्ता घोषाल

सुचि

रवीन्द्रनाथ टैगोर –३ कविता

अनुवाद : फुल्लरा मुखर्जी

अलोकरंजन दाशगुप्ते – २ कविता

अनुवाद : रणजीत कुमार साहा

गल्प

एकाकी नक्षत्र – पुष्पा महांति

ओड़िया से अनुदित : राजेन्द्रप्रसाद मिश्र

छोटे मालिक – शरदिंदु वन्दोपाध्याय

अनुवाद : चक्रधर आचार्य

लालु – शरतचन्द चट्टोपाध्याय

अनुवाद : कमल

डॉक्-मजदूर – चन्द्रकान्त बक्षी

गुजराती से अनुदित : जेठमल

आटोग्राफ (तेलुगु से अनुवाद) – लेखिका : वोम्मदेवर नागकुमारी

अनुवाद : कोम्पा शिवशंकर रेड्डी

जाने की दिन्

- रवीन्द्रनाथ टैगोर

हिन्दी अनुवाद - ✍ फुल्लरा मुखर्जी

जाने की दिन मैं कहुँगी, वस यही !
जो भी देखा, जो भी पाया तुलना उसका नही !!
उस ज्योति समुद्र के बीच में जो श्वेत पदम् विराजे !
उसी की मिठारा पान करके धन्य हुई हुँ में !!
जाने की दिन उसीबात को कह कर जाना है !
संसार रूपी खिलोना घर में बहुती खेले खेल !
अपरूप को देखते गई दो नैनन् के मेल !!
स्पर्श जिसे नही कर सकते, सर्व शरीर में घर ही सकते
उस स्थान पर समस्त करे, यदि समाप्त करदे
जाने की वेला में यही बात करकर जाना है !!

रूपनारायण के तीर पर

रुपनारायण के तीर पर ।
जाग उठें है उम् ॥
मालुम हुआ, यह विश्व
स्वप्ना नही ।
खून के अहार में हमने देखा
हमारा अपना रूप -
पहचान सकी अपने आपकी
आघात में आघात में
दर्द मे, दर्द मे,
सच बहुत कहवा है,
कठवा को हमने प्यार किया
वह कभी भी नही करते वेवफाई ॥
मौत खेद की तपस्या यह जीवन्
सच की दारुन मुल्य प्राप्त करने के लिए
मौत में सभी कर्ज को चुका देते हुवे ॥

पहला दिन का सूरज

पहला दिन का सूरज ।
प्रश्न किया था ॥
सत्ता के नव उदय में ।
तुम कौन हो ?
मिला नही कोई उत्तर ।
वर्षो-वर्षो बीत गऐ ॥
दिन का अन्तिम सूरज
शेष प्रश्न किया ।
पश्चिम समुद्र के तीर पर ।
सन्नाय भरी सन्ध्या में
तुम कौन हो ?
पाया नही कोई उत्तर ।

अलोकरंजन दाशगुप्त - जन्म ६ अक्तूबर १९३३, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में डाक्टर की उपाधि। बाँग्ला के लब्धप्रतिष्ठ कवि। अब तक बहु पुस्तक रचयिता।

सृष्टि

बाँग्ला से अनूदित - ✍ रणजीतकुमार साहा

अब और मेरी कोई सृष्टि नहीं,
जब लोग बाग सो जाते हैं
तो अभी-अभी
मुर्दा पड़ी उनकी उस बस्ती के बीचोबीच
गुजरते हुऐ
मैंने महसूस किया है –
अनन्त निर्माण का सुख
मानो देवदूतिकाएँ मेरे मुँह में उड़ेल रही हों अमृत…
आ :
मुझे नींद आ रही है
और मेरे दोनों ओर
क़तार-दर-क़तार
खटिया बिछाकर
सोये पड़े औरत और मर्द
और उनके बीच से गुज़रने वाली राह ही
अब मेरी निर्मिति है।

गहरा हरा शोक गीत

ये सारे के सारे पैदल चलने वाले
नन्हें नन्हें चप्पे
जिन्हें मैंने ढेर सारा प्यार दिया है
मैं इनसे कहता हूँ
तुम सब चलते चलो···बढ़ते चलो
आकाश में नहीं···आकाश की ओर
जहाँ किसी कुंज में एक वेदी पड़ी हुई है
झीनी झीनी फुहारों से भीगी हुई
ठीक इसी समय, मैं यह भी देख रहा हूँ –
सैंकड़ों शहीद आकाश से नीचे उतर आये हैं
पैदल चलने वालों से ही भर गयी है, सारी धरती

बीच सड़क पर ही भेंट हो गयी
यह कोई सप्तर्षि की प्रज्ञा नहीं
और न किसी मुखिया की –
दीमक का पता लगा लेने वाली जानकारी
लम्बे वियोग के बाद –
इधर-उधर थोड़ी-सी बातचीत
जिसके बीच सन्धान की
और साथ ही, जिज्ञासा भरी विनम्रता भी
न्युट्रान बम से नष्ट हो जाने के बावजूद
मैंने उन्हें प्यार किया है
एक नन्हें से पत्र पटल पर
आज भी उत्कीर्णित है
मेरा गहरा काला
शोक गीत

पुष्पा महांति - जन्म ५ जनवरी १९५५, टेनकानाल, उड़ीसा। ओड़िया की चर्चित कवयित्री एवं कहानी लेखिका। पत्र-पत्रिका ओर में समान रुप से लेखन। संप्रति मासिक पत्रिका 'संजोग' (भुवनेश्वर) से सम्बन्ध।

एकाकी नक्षत्र

✍ पुष्पा महांति

ओड़िया से अनूदित राजेन्द्रप्रसाद मिश्र

बहुत दिन''बहुत दिन हुए उस शहर को छोड़कर चली आयी हूँ जहाँ तुमसे मेरी मुलाक़ात हुई थी। यातना भरे दिनों की ख़ुशी को मन से चाहा था। उस वक़्त मुझे लगता था कितनी सुन्दर है यह पृथ्वी, नीला-नीला आसमान, पुनम का चाँद, कितना मीठा है यह सफ़ेद सबेरा अनजान, अनसुने पक्षियों के कलरव-सागर का मधुर कंपन। तुम्हें देखते ही जेठ मेरे लिए बसंत हो जाता था। असमय में कोयल का स्वर मुझे बेचैन कर देता था। फिर भी... फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने कोई पाप किया है, नारी जाति के लिये एक इतिहास बनाया है। जो इतिहास मेरे लियें नफ़रत और तिरस्कार के हमदर्दी भरे स्वर छोड़ जायेगा। न जाने कितने सालों से मैंने तुम्हें नहीं देखा है, लेकिन पल-पल में मैंने तुम्हें अनुभव किया है। तुम मेरे क़रीब हो, बिल्कुल क़रीब। जीने के लिये बारंबार प्रेरणा देते हो। याद दिला देते हो कि मेरा भी एक संसार है। कुछ कर्तव्य हैं।

नारी''संसार''संसार''नारी। सब कुछ तो प्रहेलिकामय है।

यातना की नीली नदी में हमेशा से डोंकी जाकर भी वह अपने कर्तव्य के प्रति हर पल जागरुक है। यातना से ही उसका जन्म है और यातना में ही उसकी मौत है। दुःख के साँस रोक कर वह पहाड़ी झरने की तरह कल-कल का संगीत सुनाती है। डरपोक कलेजा लेकर दिल की बात कह सकने का साहस उसमें नहीं है।

इस शहर में आने के बाद निशिकांत और भी बदल गये हैं। अभी कल ही की तो बात है न जाने तुम्हारे बारे में कैसी-कैसी बे-सिर पैर की बातें कह रहे थे। कह रहे थे कि अब तुम शराबी हो गये हो, सरकारी डाक बंगले में विभिन्न लड़कियों के सान्निध्य में तुमने रात बितायी हैं। इस तरह की अनेक बातें उन्होंने मुझसे कई बार कही हैं। कहने के बाद वे मुझे ग़ौर से देखने लगते थे, मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करते थे। मुझे कष्ट होता है या नहीं, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ या नहीं वे इन बातों के ज़रिये जानना चाहते थे। पर निशिकांत कैसे समझेंगे कि जिस शरीर की नस-नस में फल्गू की धारा की तरह जिसका नाम बह रहा है, वह समय के प्रवाह में कभी मिट नहीं सकता। तुम भले ही मेरे पास न रहो, लेकिन इतना तो मैं समझती ही हूँ कि जीने का एक दूसरा नाम तुम हो।

मुझे आज भी याद है। जिस दिन निशिकांत मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से धक्का मारकर कमरे के बाहर मुझे पटक गए थे, ठीक उसी वक़्त तुम वहाँ आए थे। मैं बेहोश होकर तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ी थी। उस वक़्त तुम मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी आँखें खुली तुम वहाँ नहीं थे। मैं अपने बिस्तर पर पड़ी थी। मेरे सिर पर बैंडेज बँधा था। निशिकांत अंदर आये थे। डर के मारे मैंने आँखे बंद कर ली थीं। इंतजार कर रही थी कि वे कब मुझे धक्का मारकर बाहर कर देंगे। दर्द के मारे मेरे सिर के अंदर झनझनाहट-सी हो रही थी।

"कैसा लग रहा है?" एक रुखा प्रश्न कमरे भर में छा गया। उनकी ओर डरते-डरते असहाय-सी देखती। होंठों में जलता हुआ सिगरेट, लाल-लाल आँखें।

"कैसा लग रहा है?" उसी प्रश्न की पुनरावृत्ति । प्रश्न नहीं बल्कि एक जहरीला बम ।

"ठीक" बाध्य होकर बोली ।

"वे लोग आयेंगे । खाने-पीने का इंतजाम रखना । नौकर/रसोइयों को घर भेज देना ।" वे चले गये। विरोध नहीं कर सकी । किया था इसीलिए तो यह हालत हुई है । वे लोग आयेंगे । इकट्ठे मिलकर नशे में झूमेंगे । एक ही कमरे में पड़े रहेंगे । सुबह होने से पहले ही उठ-उठकर चले जायेंगे । उसके बाद वही बंधा काम मेरा है । भिनसारे से उठकर उस कमरे से चूड़ियों के टुकड़े इकट्ठा करूँगी, रूमाल, पर्स सब सहेज कर रखूँगी । बिस्तर से सिमटी चादर हटाकर उसके बदले दूसरी चादर बिछाऊँगी । नौकर रसोईया आने से पहले बोतल, गिलास उस कमरे से निकालूँगी । जूठे प्लेट, प्लेट में भरी उल्टियाँ साफ करूँगी ।

बाहर से कार की जाने की आवाज़ आयी । उनके जाते ही तुम आ पहुँचे थे । ड्राइंग रूम में बैठने के बाद तुमने नौकर से ख़बर भिजवायी थी । बहुत मुश्किल से पैर घसीटते-घसीटते ड्राइंग रूम तक आयी । सारा बदन दर्द से टूट रहा था । तुम्हें देखकर मैं सिमट गयी थी । तुमने अपना परिचय दिया था । निशिकांत के दोस्तों में से हो । उस दिन तुम्हारे आने का कारण मैंने नहीं पुछा था, न ही तुमने बताया था । भीगी-भीगी आवाज़ में तुमने पूछा था, "तबीयत कैसी है?" जाने तुम्हारी आवाज़ में क्या था कि मैं रो पड़ी थी क्योंकि इतना अपनापन भरा स्वर मैंने कभी नहीं सुना था । मेरे दुःख में दुःख प्रकट करने वाला कोई नहीं था । किसी बाहरी व्यक्ति के आगे मैं पहली बार रोयी थी । मेरी दयनीय हालत न सह पाकर तुम्हारा हाथ मेरे आँसू पोंछने को बढ़ आया था पर न जाने क्या सोचकर तुमने उसे लौटा लिया था । शायद तुम अपनी हैसियत को लेकर एकाएक सजग हो उठे थे । तुमने चुप रहने का अनुरोध किया था । कई बार कुछ कहने की कोशिश की पर बगैर कुछ कहे तुम चले गए थे ।

तुम तो चले गये । मैं उसी तरह काफ़ी देर तक निश्चल बैठी रही । निर्जीव साफ़े को देखकर तुम्हें अनुभव करने की कोशिश करती रही । तुम्हारे भीगे-भीगे दर्द भरे स्वरों के झोंके आ-आकर मेरे कानें से टकराते रहे । न जाने क्यों तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे । उस रोज़ आराम नहीं कर सकी । अत्यधिक परिश्रम ने मेरे कमज़ोर शरीर को बीमार कर दिया । जिस समय निशिकांत अपनी सहेली के साथ हँसी मज़ाक कर रहे थे मैं काँपते-काँपते उन्हें पुलाव और चिकन करी परोस रही थी। जिस वक़्त वे लोग अपने होंठों से सूप लगा रहे थे, अपने सूखे होंठों को भिगोने के लिए मैं पानी तक नहीं ले पा रही थी। कमरे की सारी चीज़ें मेरी आँखों के आगे घूमने लगीं । बहुत मुश्किल से मैं बेड रूम तक पहुँची । निशिकांत चिल्ला-चिल्लाकर मुझे बुला रहे थे किंतु उनकी आवाज़ मेरे लिये अस्पष्ट होने लगी थी । असह्य गर्मी की वजह से मुझे बुख़ार आ गया ।

कुछ दिनों तक बुख़ार में पड़ी रहने के बाद जिस रोज़ मैं ज़रा स्वस्थ हुई, उसी रोज़ निशिकांत दौरे पर चले गये थे । दफ्तर संबंधी किसी काम के सिलसिले में तुम उनसे मिलने आये थे । "वे नहीं हैं" यह कहते हुए जब ड्राइंग रूम में आयी, तुम्हें देखकर सकपका गयी थी और तुम भी तो अवाक् रह गये थे । मेरे रोगीले शरीर को तुम बार-बार देख रहे थे । मैंने बैठने को कहा था । काफ़ी देर के बाद तुमने पूछा, "निशिकांत !"

"दौरे पर गये हैं" सिर झुकाये हुए मैंने जवाब दिया था ।

"अकेले – या कोई साथ था?"

"नहीं – शायद अकेले ।" मैंने जान-बुझकर झूठ कहा था । तुम्हारे आगे उनके विरुद्ध मैं कैसे कुछ कह सकती थी !

तुम्हारे छोटे ललाट पर उभरे कुछ संकुचित रेखाओं को पढ़कर मैं समझ गयी थी कि तुम्हें मेरी बातों पर

विश्वास नहीं हुआ है ।

"क्या आप बीमार थीं ?"

ज़रा मुस्कराते हुए दुबारा झूठ बोली थी और ठीक उसी वक़्त एकड़ी भी गयी थी । रसांइए ने आकर दवा खाने की याद दिलायी थी । तुम गंभीर हो गये थे । काफ़ी दुःखी हुए थे । पहले ही दिन की घटना ने हमारे पारिवारिक संबंधों के महत्त्वपूर्ण पृष्ठों को तुम्हारे सामने खोलकर धर दिया था । इधर-उधर की बातें कर के तुमने काफ़ी समय तक मुझे भूलाये रखने की कोशिश की थी । जाने के पहले मेरे क़रीब खड़े होकर तुमने बड़ी आत्मीयता से तबीयत का ख़याल रखने को कहा था ।

उसके बाद तुम कई बार आये हो। मेरे उदास चेहरे पर तुमने मुस्कराहट देखनी चाही । मेरी आँखों से आँसू पोंछने में अब तुम्हें संकोच नहीं होता था । यातना के ताप-घर में जलते-जलते मेरा नीरस जीवन यक-ब-यक सरस और सुन्दर हो गया था । मैंने तुममें भगवान का ही रूप पाया था । निशिकांत का मुझ पर अत्याचार बढ़ने के साथ ही साथ तुम्हारे सात्विक मनोभाव, ममताभरे स्पर्श मुझमें जीने की शक्ति भर रहे थे । तुम्हारे चौड़े सीने पर सिर रख कर मैं ज़ार-ज़ार रोयी हूँ । मेरे क्षत-विक्षत शरीर को देखकर तुमने सांत्वना दी है । एकांत समय मैंने तुम्हारे साथ गुज़ारा है । आहिस्ता-आहिस्ता मैं यह अनुभव करने लगी थी कि तुम्हारे साथ मेरा कोई अटूट रिस्ता जुड़ गया है । रिस्ता, शरीर का नहीं बल्कि दो दिलों का । मेरे ख़्वाहिशमंद दिल ने काफ़ी दिनों तक ममता का स्पर्श नहीं पाया था । तुमने ही उसे अपना बनाया । उसके बदले में तुमने मुझसे कुछ भी तो नहीं चाहा । तुम्हारे संयमित मनोभावों ने तुम्हारे प्रति मेरे दिल में अथाह प्यार और श्रद्धा भर दिये थे । तुम्हें देखते ही मैं खुशी से झूम उठती थी । हालाँकि मैं जानती थी कि यह समाज मुझे भ्रष्टा, पतिता कहेगा, पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी । तुम्हारे पवित्र, प्रतिभामय जीवन धारा में बहकर मैं भला कौन सा पाप कमाती ? तुम्हारी हर बात में आदर्श था । मेरे पारिवारिक सुख, मेरे दुःख-दर्द की समाप्ति ही तुमने हमेशा चाही थी । मानो मेरे सुख के लिये तुमने अपनी पूर्णाहुति देने का संकल्प कर लिया था । तुम्हीं थे मेरे सूने जीवन के एकमात्र बंधु, सुख-दुःख के साथी । मेरे डरपोक मन की एकमात्र शक्ति ।

मेरे मानसिक परिवर्तन से निशिकांत के दिल में शक पैदा होने लगा । कई बार वे तुम्हारी ओर इशारा करके तरह-तरह की बातें कहते थे । तुम्हारा आना उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि तुम उनकी सारी कमज़ोरियाँ जानते थे । कहीं तुम्हारा साथ पाकर मैं उनके अत्याचार का विरोध न करने लग जाऊँ इस बात का भी भय उन्हें होने लगा था। तुम्हें भी इस बारे में बतला चुकी थी । मैं जानती थी निशिकांत मुझे ठीक से कभी नहीं समझ सकेंगे । भुकम्प आने के पूर्व सूचना पाकर भी हम दोनों चूप थे । उस एक दिन की प्रतिक्षा करने की मानसिक तैयारी हमने कर ली थी ।

वह दिन आ गया । मुझ पर बिजली आ गिरी । निशिकांत को सही रास्ते पर लाने की तुम्हारी सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं । मेरी तक़दीर में तो दुःख और यातना ही लिखा है, सुख भला क्यों चाहूँ । गेट पर तुम्हारी गाड़ी देखकर उन्होंने अपनी कार खड़ी कर दी थी, जिसके कारण हम दोनों को उनके आने का पता तक नहीं चल सका । तुम मेरी हथेली देखकर मेरे भाग्य-रेखा के बारे में कुछ बतला रहे थे । वे एकाएक अंदर घुस आये । तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ देखकर उन्होंने ग़लत समझा । उनकी आँखें फास्फोरस की तरह जल उठी थीं । मुझे खींच कर एक तरफ़ करते हुए उन्होंने निहायत ही गंदे लफ़्ज़ों में तुम्हें गालीगलौज किया था । उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आँखों के सामने दहकता हुआ गुज़र जाता है । जिस तरह के दृश्य में तुमसे मेरा परिचय हुआ था उसी तरह के दृश्य में ही उसकी यवनिका गिर गयी । पर रह गयीं कुछ मधुर स्मृतियाँ और जीने की अभिलाषाएँ ।

वे मुझे घसीट कर ले गये और मेरी खूब पिटाई की। गुस्से से आगबबूला हो टेबल पर से बोतल उठाकर मेरे सिर पर दे मारी और मुझे लहूलुहान करके तुम्हारे पास लाकर डाल गये थे। यह तुम्हारे लिए उनकी एक खामोश चुनौती थी। इस समाज ने उन्हें मुझे लहू लुहान करने का अधिकार दिया है, पर मेरे शरीर से खून पोंछने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया, यह बात वे तुम्हें जता गये थे। दर्द से व्याकुल हो तुम्हारे पैरों पर सिर रख लिया था। कहीं वे तुम पर कोई आफ़त न ढा बैठें, यह सोचकर तुमसे मैंने चले जाने का अनुरोध किया था। मेरे सिर से खून पोंछकर तुमने बड़े यत्न से वहाँ रुमाल लगा दिया था। मुझे पकड़कर बेड रूम तक ले गये थे। तुमने कहा था, "नंदिता, मेरे आने से तुम्हें मानसिक शांति मिल सकती है लेकिन शारीरिक यातना का अंत नहीं होगा। यदि बार-बार ऐसा होता रहा तो तुम नहीं बचोगी। मैं तुम्हारे लिये कुछ भी नहीं कर सका। भगवान तुम्हें शांति दे।" उसके बाद तुम जाने को हुए। जाते वक़्त तुम तो चुप थे पर तुम्हारी आँखों से तुम्हारे दिल की वेदना मैं समझ गयी थी। ऐसे लहू लुहान माहौल में ही हमारी मुलाक़ात और जुदाई हुई। तुम चले गये, फिर कभी नहीं आये। तब से मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे कमज़ोर नहीं बनाया था। मेरी दृढ़ मानसिक शक्ति ने मुझमें साहस और प्रेरणा भर दी थी। मुझे धीरे-धीरे ज़िद्दी बना दिया था। तुम्हें न देखने पर मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। निशिकांत की बेइंतिहा नफ़रत, असह्य यातनायें मुझे मार रहे थे। उस समय आँखें मूँदकर तुम्हें अनुभव करती थी। तुमसे कल्पना में मिलती थी। ठीक तुम्हारी वही भीगी-भीगी दर्द भरी आवाज़ मेरे कानों में गुनाई देती थी। तुम्हारे हाथों के स्पर्श का एहसास मैं अपने मस्तक पर करती थी। विराट लंबे खालीपन के बीच तुम्हारी स्नेहभरी आँखों की गहराई को मैं अच्छी तरह से समझ सकती थी, वही तो थी मेरे लिए चरम सांत्वना। मेरी आँखों से आँसू बहकर खुद-ब-खुद सूख गए थे, कई सूनी घड़ियों में अकेले बैठकर तुम्हारी यादों में खो जाती थी। हर रोज़ की तरह सवेरा होता है और फिर रात होती है। उसी के बीच घर का अशांत माहौल, बवंडर के साथ-साथ कप-प्लेट पटकने की तूफ़ानी आवाज़, मेरे शरीर पर अकथनीय अत्याचार और फिर कुछ समय के लिए सब कुछ शांत। अस्थिर माहौल स्थिर हो जाता है फिर भी इतना समय कैसे बीत जाता है, मैं जान ही नहीं पाती। तुम्हारे जाने पर जिस तरह चहक उठती थी ठीक उसी तरह लगता है, जब तुम मेरी मानसिक आँखों में उतर आते हो। बगल वाले कमरे में अपनी सहेलियों के साथ जब निशिकांत मशगूल होने लगता है, मैं अपने कमरे की खिड़की से शांत स्निग्ध चाँद को देखा करती हूँ। उसमें तुम्हारी छवि साफ़ झलकती है। बगीचे के फूलों की खुशबू सूँघने पर उनमें तुम्हारी गंध आती है। सुबह की मंद-मंद हवा जब मेरे दर्दभरे बदन पर तिर जाती है, मैं चुपचाप दोनों आँखें मूँद लेती हूँ। हरसिंगार के पेड़ से टप-टप ओस की बूँदें चूने पर तुम्हारी आँखों से आँसू चूने रहे हैं सोचकर अंजलि भरकर अपने मस्तक पर लगाती हूँ। मेरी मानसिक दृढ़ता निशिकांत के संदेह को बढ़ाने लगी। हर तरह की ताड़ना, जलन के बीच मेरे व्यवहार ने उन्हें पलभर भी शांति से बैठने नहीं दिया। वे आग में जल रहे थे और मैं आग के घेरे के भीतर अपनी शांति का महल बना रही थी।

अचानक एक दिन पता चला कि निशिकांत शहर छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस शहर से कहीं दूसरी जगह ले जाकर वे मुझे तुमसे दूर रखना चाहते थे। यही उनकी धारणा थी। उन्हें कौन समझाये कि तुम्हारी हर साँस में मेरी साँसें, तुम्हारी आँखों में मेरी आँखों के सपने न जाने कब से खो चुके हैं, गड्डमड्ड होकर अज्ञात नदी की धारा में बह चुके हैं। जिसका मतलब सिर्फ़ जीवन है। इसकी शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है जान पाना आसान नहीं। वह शहर मेरे लिए सपनों का शहर हो सकता है पर तुम्हारे अन्य किसी यादों के शहर में तुम्हारी यादें मुझे अकेले छोड़कर भला चली कैसी जायेंगी ?

यातना''यातना''यातना ।

निशिकांत सिर्फ़ मुझे यातना देना जानते थे । वे सोचा करते थे कि मेरे जीवन का दूसरा नाम जीने का दूसरा रूप यातना हो । पुराना शहर छोड़कर चले आने से पहले तुम्हारा फ़ोन आया था ।

"तुम''''तुम्हारी आवाज़ काँप उठी थी, आः...सोच नहीं सकते । काफ़ी दिनों के बाद तुम्हारी आवाज़ सुनकर आँखें बंद करके पूरी सख्ती से रिसीवर दोनों हाथों में जकड़कर खड़ी हो गयी । आँखों से लगातार आँसू निकल रहे थे, मेरी खामोशी ने तुम्हें संदेह में डाल दिया था ।

"कहो" रुँधे गले से बोली थी मैं ।

"तुम रो रही हो''समय बहुत कम है, निशिकांत किसी भी वक़्त घर पहुँच सकता है । आज वह रिटीव हो रहा है, तुमसे फिर कब मुलाक़ात होगी कह नहीं सकता । हम दोनों का मिलना ना मिलना एक जैसा है । पर एक बात है''खुदकुशी कभी न करना, निशिकांत के अत्याचार से हारकर कोई ग़लत फ़ैसला न कर बैठना, तुमसे इतनी सारी बातें कहने के बाद मेरी समझ में नहीं आता आख़िर तुम जीवित रहोगी कैसे ?"

"मैं जाऊँगी, ज़रूर जीऊँगी" मैंने कहा था ।

"मैं इतना ही चाहता हूँ । भगवान तुम्हें शक्ति दे । जाने बाद कब तुम्हें अच्छी तरह समझ सकेगा...कहीं भी रहूँ पर सिर्फ़ उतना भर सुनने से न जाने मुझे कितनी खुशी होगी''तुम चली जाओगी, तुम्हारी आवाज़ भी मैं नहीं सुन सकूँगा''''

"हर रोज़ तुम मुझे सांत्वना देते थे, उस रोज़ मैंने दी थी । तुम अपने अन्दर मेरी आवाज़ सुन सकते हो" ऐसा मैंने कहा था। तुमने रिसीवर रख दिया था ।

वही हमारी आख़िरी बातचीत थी । मेरा उसके बाद का जीवन इस शहर में शुरू हुआ । उन दिनों वे घर आया करते थे अब लगभग उसका सारा समय बाहर ही बीतता है । जब लौटते हैं तो घर में चीखते-चिल्लाते हैं । घर पर मैं अकेली बिल्कुल अकेली हूँ । कई बार जीने को दिल नहीं करता । आख़िर क्यों ज़िन्दा रहूँ? लेकिन तुम्हारी परछाया मुझे राह दिखलाती है । फिर रुक जाती हूँ । नहीं मर पाती । तुम्हें कैसे बतलाऊँ इस चारदीवारी के भीतर मुझे कितनी घुटन होती है । दर्द के मारे मेरा लहू-सांस सब टूट-टूटकर चुने लगता है । कोई भी दिन मेरा आख़िरी दिन हो सकता है । ज़िंदगी में कुछ न पा सकी । पत्नी बनकर भी उस अधिकार से वंचित रही । नारी जीवन की पूर्णता नहीं पा सकी । अपनी सहेलियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कामना की यज्ञ वेदी पर उन्होंने अपने पितृत्व की यति चढ़ा दी थी । फिर भी मैं ज़िंदा रहूँगी निशिकांत के मतवाले आसमान की तरह कुशादा सीने पर एकाकी नक्षत्र बनकर टिमटिमाती रहूँगी ।

छोटे मालिक

- शरदिंदु बन्दोपाध्याय

अनुवाद - चक्रधर आचार्य

आभा की शादी के समय दुल्हा व दुलहिन – दोनों पक्षों में किसी एक कारण से मतविरोध हुआ था। पर दोनों पक्ष के लोग सज्जन थे, इसलिए उसका परिणाम हुज्जत तक पहुंच नहीं पाया। बराती लोग श्यामा को लेकर चले गये थे और उसके बाद पन्द्रह सौ तक श्यामा मैके पर नहीं आई। दोनों परिवारों के सभी योगसूत्र छिन्न हो गये थे।

उन पन्द्रह सालों के दौरान दोनों परिवारों में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया था। मालिक जो थे सिधार गये, जवान अब मालिक बने और जो कि बच्चे थे अब जवानीपर आ गये। आभा की शादी के समय किसलिये छेड़छाड़ हुई थी – वह शायद अब किसी के मन में नहीं है। तो भी दोनों परिवारों में जो दूरी थी वह मनमिलाप के अभाव से जैसी कि तैसी रह गई।

आभा का छोटा भाई देवू आभा से सात-आठ साल का छोटा था। अब उसकी उम्र पच्चीस-छब्बीस साल की है और फौजी लेफटेनेन्ट होकर इस समय वह पूने में रहता है। एकाएक किसी काम के लिए उसे कई दिनों के लिए कलकत्ता आना पड़ा। आते ही उसे याद आई कि दीदी की ससुराल कलकत्ते में है।

हालांकि देवू ने अपना जीवन पश्चिम भारत में ही बिताया फिर भी कलकत्ता उसके लिए अजान नहीं था। बचपन में कई बार आया था। पर उस समय वह स्वतन्त्र नहीं था। अब तो स्वतन्त्र है। दीदी से मुलाकात करने को वह उत्सुक हुआ।

दीदी की ससूरालका पता उसे मालूम था। वह थी शोभा बाजार का एक मशहूर खानदान। वह हाटल में अपना सामान रखकर बाहर निकला। मनमें यह संदेह था कि दीदी की ससुराल में उसे अगवानी मिलेगी कि नहीं। उस अगवानी न मिली तो क्या सिर्फ दीदी से एकबार मुलाकात करते लौट आयेगा – यही इरादा था। शादी के समय के दीदी का वह नाजुक मुखड़ा उसके मनमें शङ्कित था। कौन जाने कि दीदी का चेहरा अब कैसा हुआ। देवू का चेहरा बहुत सा बदल गया – दीदी उसे कतई पहचान नहीं सकेगी।

सार्विक जमाने का दोतल्ला मकान काफी बड़ा था। मकान के मालिक दो भाई एक ही परिवार में रहते थे। करीब दस साल हुए आभा के ससुर सिधार गये थे। पितृकर्म का मुद्रित निमंत्रण पत्र देवू ने देखा था। वे उसके उपरांत इस परिवार में क्या क्या हो गया सो उसे मालुम न था। शायद अभी भी एक परिवार में होंगे और छोटा भाई परिवार के मालिक होंगे।

देवू ने दरवाजे की कुंडी को खटखटाया। थोड़ी ही देर में एक लड़को ने दरवाजा खोल दिया। पर फौजी पोशाक पहने हुए एक अनजान आदमी को देखते ही उस के मुँह की हँसी निवट गई और वह दरवाजा खुला छोड़कर हो फौरन अन्दर भाग गई। देवू झिझकता हुआ खुले दरवाजे के बाहर खड़ा रहा।

जब पता चला कि घरमें परिजनों की तादाद कम नहीं है। दो चार बालिग और अनेक कच्चे बच्चे दरवाजे के पास आकर बड़े कौतुक के साथ देवू को ध्यान से देखने लगे। देवू का मुँह सा होने लगा पर उसकी समझ में नहीं आया कि क्यों कर अपना परिचय देंगे।

'तुमलोग हट जाओ' बोलकर नाटे-मोटे चेहरे की तरह एक महिला दरवाजे पर आ पहुँची. देवू को क्षणभर ध्यान से देखकर बोल पड़ी – 'अरे, देवू आये है, आ जा, आ जा !' देवू का हाथ पकड़कर खींचती हुई उसे अन्दर ले गई और उसके गाल पर चुमा खाया। शरम से लाल बनकर देवू ने उन्हें प्रणाम किया और समझ पाया कि ये नाटे मोटो महिला हो उसकी दीदी । पन्द्रह सालों में दीदो के स्वास्थ की बड़ी तरक्की हुई है।

आभा उसके बदन में हाथ फेरती हुई बोलो – अरे तू कितना बड़ा हो गया रे, फिर फौजो पोसाक पहना। तो भी क्या मेरी आखों में धूल झोंक सकेगा ? देखते ही पहचान लिया।

देवू की घेरकर घर में तो खलिर का बड़ा धूम लग गया। घर में परिजन तो बहुत थे – अपनी सास, चचेरी सास, देवर, ननद – आभा ने सबके पास ले जाकर देवू का परिचय बताया, देवू ने देखा कि आभा ही घर की मालकिन है। उनकी सास, चचेरो सास आदि तो सिर्फ ठाकुर घर में बैठी माला फेरती हैं।

इतने में आभा के स्वामी परिमलबाबू घर लोटे। वे थे हाई कोर्ट के वकोल, बड़े मजलिसी आदमी थे। तो देवू के साथ बड़ी भोज से हँसी – मजाक करने लग गये। देवू के साथ बड़ी मौज से हँसी – मजाक करने लग गये। देवू अवाक होकर शोचने लगा – इस तरह के लोगों से इतने दिनों तक जुदाई क्यों जारी था ?

गपसप के दौरान शाम हो गई। आभा आकर बोली – 'देवू, आज तू लौट नहीं पायेगा। रात को यहीं भोजन करके सो जायेगा। कल सवेरे जहाँ जाना है जायेगा।

देवू ने सङ्कोच से कहा – लेकिन तुमलोगों की अगर असुविधा हो –

कुछ भी असुविधा नहीं होगी – बोलकर आभा स्वामी की ओर ताककर बोली – ऊपर चचेरे ससुरजी के कमरे मे देवू को शोने का बन्दोवस्त कर दूँ ?

परिमलबाबू ने चकित होकर कहा – ठीक है। पति पत्नियों की आँखों में कुछ इशारा खिल गया – देवू की समझ में आया नहीं। उसने कहा – लेकिन कपड़े कमीज कुछ तो लाया नहीं।

आभा बोली – बायरूम में कपड़ा व कमीज रखे है, तू चला जा, तेरा फौजी पोशाक छोड़ दे।

देवू बाथरूम चला गया। मुँह हाथ धोकर सफेद धोती व कमोज पहनकर जब लौटा तो देखा कि जीजाज़ी और जीजी गूपचूप कुछ सलाह कर रहे हैं। उसके आते ही जीजी हँसकर वहाँ से चल पड़ी।

जिस लड़की ने देवू को दरवाजा खोल दिया था वह बैठक में चाय और नास्ता दे गई। उसकी उम्र सतरह या अठारह साल की थी। रंग गौरा और आँखे खिली हुई चमकीली थी।

परिपलबाबू ने कहा – मेरी चचेरी बहन रानी है।

गपशप करते हुए रात बढ़ गई। देवू को साथ लेकर परिमलबाबू भोजन के लिए पाकशाला गये। रानी पूरियाँ बेल रही ती और आभा पूरियाँ छान छान कर गरम गरम थाली पर परोस रही थी। रानी को पूरियाँ बेलतो हुई देखते हुए देवू ने मन ही मन शोचा – यह लड़की तो बहुत अच्छो है।

भोजन के उपरांत मुँह धोते समय देवू के कानों में आया – दिदि रानी से आहिस्ते बोल रही है – ऊपर जाकर चचेरे ससुरजी से कह दे कि मेरा भाई आया है – आज रात के लिए अपना कमरा छोड़ दें।

सुनकर देवू समझा कि उसके लिए किसी वृद्ध को अपने कमरे से निकला जा रहा है। मन ही मन कुछ सङ्कोच अनुभव किया पर उस समय मना करना भी फिजूल था।

रानी सोढ़ियाँ होकर ऊपर चली गई और जल्दी उतरकर आभा की तरफ कंघा हिलाया। आभा बोलो – देवू, रात हो गई, जा सो जा। मेरे भाई माटी हूँ, सीढ़ी चढ़ कर नहीं जा सकूंगी। अरी रानी जा मेरी प्यारी, फिर ऊपर

जाकर देवू को कमरा दिखाकर आ ।

रानी देवू की तरफ तिरछी निगाह में ताक कर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी, देवू उसके पीछे पीछे चला सीढ़ियाँ काफी चौड़ी नहीं थीं, आधी दूरी पर दूसरी दिशा में घूम गई थीं । देवू ने आधे तक तय करके देखा कि एक वृद्ध ऊपर से उतर रहे हैं । रानी सीढ़ियों के बीच चौड़ी जगह पर खड़ी हो गई, देवू भी खड़ा हो गया ।

वृद्ध के बदन पर बैंगनी रंग की चदर और पैरों में कटकी चप्पल था – माथे के बाल सफेद । धीमी रोशनी में मुखड़ा स्पष्ट नहीं नजर आया । वे देवू के ऊपर निगाह डालते हुए चुपचाप सीढ़ियाँ पार कर नीचे उतर गये ।

रानी फिर ऊपर चढ़ने लगी तो देवू उसके पीछे पीछे चला । दोतल्ले पर जाकर रानी ने कुछ कहा नहीं, केवल उंगली उठाकर एक दरवाजा दिखा दिया और झट-पट उतर गई ।

कमरे में बत्ती का प्रकाश था । देवू ने अंदर घुसकार देखा कि कमरा अच्छी तरह से सज्जित है । चारपाई पर सफेद बिस्तर बिछाया हुआ है । पैरों के स्थान पर एक रंगीन सुजनी तपेट कर रखी गई है । दीवार पर एक बड़ा फोटोग्राफ टंगा हुआ है । देवू ने नज़दीक जाकर देखा कि जो वृद्ध अभी अभी उतर गये उन्हीं का फोटो है । शांत प्रसन्न मुखमंडल – जीती जगाती निगाह । वे जरूर वही हैं जिन्हें दिदि पचेर समूर बोली थीं ।

लेकिन कमरे की एक विशेषता पर नजर आई तो वह मन ही मन थोड़ा विस्मित हुआ । हवा का प्रवेश नहीं था । कमरे की हवा में कुछ मटिया वास था । बहुत दिनों तक कमरा बंद रहने पर जैसा वास निकलता है वैसा ही था । देवू ने खिड़की खोल दी और किवाड़ बंद किया । फिर बिस्तर पर बैठकर सिगरेट जलाया । आज का जानकारियाँ वह अपने मनमें बटोर लेना चाहता था ।

दिदि तो आराम से हैं, ससुराल मे अपने को बराबर बना लिया । बस रे, कैसी मोटी बन गई, परिमलबाबू भी बड़े खुशदिल आदमी हैं । और रानी ? बंगाल की लड़कियाँ बड़ी भोली भाली होती है । ये सभी स्वाभाविक है – यह बड़े मेलजोल का सुखी संसार है । देवू ने लम्बी सांस छोड़ी – फिर कब उनसे मिलूँगा क्या मालुम ।

सिगारेट खतम कर देवू ने बत्ती बुझाई । सुजनी को बदन पर खींच लिया – फिर सो गया । खुली खिड़की से रास्ते की बत्ती का तिरछा प्रकाश चोरी चोरी जसे कमरे में घुस रहा था, सो कमरा बिलकुल अंधियारा नहीं था । देबू नींद गया ।

आभा और परिमलबाबू भी सोचते रहे थे । आभा उत्सुक गले से बोली – अगर होता तो अच्छा ही होता क्यों न ?

परिमलबाबू ने कहा – देवू को परखकर देखा – लड़का तो बड़ा भला है ।

आभा धमंड से बोली – मेरा ही तो भाई है, क्यों न भला होगा । अब ससुरजी अगर राजी हों तब ।

परिमालबाबू ने कहा – सो तो सही है, बहुत से संबंध लगाये पर एक भी उनको पसन्द न आया । अब फिर देवू कहकर पास फेरकर सो गये ।

रात करीब तीन बजे – देवू की नींद टूट गई । उस मालूम हुआ कि कोई कमरे में घूम रहा हों । कुछ देर तक लेटने के बाद वह बिस्तर पर उठ बैठा । हल्के अंधियारे में उसे मालूम हुआ मानो कोई किवाड़ को जरा सा खोलकर चुपके से बाहर निकल गया ।

और भी कुछ देर तक बैठ कर देबू ने बत्ती जलाकर देखा कि कमरे मे कोई नहीं है । तब वह किवाड़ में चटकनी लगाकर बत्ती बुझाकर फिर सो गया ।

दुबारा देवू की नींद टूट गई । तब चार बज गये थे । पौ फट रही थी । उसने आँखें खोलकर देखा कि सोई

पर जिन वृद्ध को देखा था वे चारपाई के पास झुककर उसीके मुखड़े का देख रहे हैं। देवू घबड़ाकर उठ बैठा तो फिर उन्हें देख नहीं पाया।

चारपाई से उतरकर देवू ने स्वीच आन करके बत्ती जलाया। घर में कोई नहीं था। किवाड़ पर चटकनी जहरी की तैसी लगी हुई थी।

अचानक देवू का शीर सिहरने लगा। वह चटकनी खोलकर बाहर झांकने लगा। बाहर कोई नहीं था सारा मकान नींद में डूबा हुआ था। तब उसने वृद्धका फोटो को देखा। उसे लगा कि वृद्ध प्यारभरी एकटकी निगाह उसपर डाले हुए है।

सिगरेट जलाकर देवू खिड़की के पास खड़ा हुआ। यह कैसी घटना है। क्या कोई भौतिक व्यापार तो नहीं! हो सकता है कि अपनी स्नायुमंडली की उत्तेजना के कारण ऐसी अवास्तव कल्पना की सृष्टि हो रही है।

खिड़की के बगल में एक आराम कुर्सी थी। सिगरेट फेंककर देवू उसीपर लम्बा हो गया। अब और नींद की सम्भावना नहीं – पौ फटने ही वाली थी।

क्या रे! रात को नींद नहीं आई?

देवू ने आँखें खोलकर देखा – कमरे में प्रभात का प्रकाश झलमला रहा है और दीदी चाय का प्याला हाथ लेकर उसे बुला रही हैं।

आँख पोंछकर देवू ने चाय का प्याला पकड़ा और एक घूट पीकर –जीजी वे कौन है – बोलकर दीवार पर फोटो की तरफ उंगली उठाई।

आभा घबड़ाकर बोली – वे? वे मेरे चचेरे ससुरजी थे। रानी के पिताजी।

देवू ने पूछा – 'थे' का क्या माने?

आभा थककर नीचे बैठ पड़ी और बोली – दो साल हुए वे सिधार चुके।

देवू ने फौरन कहा – यह कैसी बात है? उन्हें तो कल रात को ही मैंने देखा?

देखा है? – आभा कुछ देर ताककर बोली – सिधार तो गये हैं पर वे रहे भी हैं। यह कमरा उसका था – उसी कमरे में रहे हैं। किसी तरह का झमेला नहीं। घरमें कोई मेहमान आता तो उन्हें पता होने पर वे घर छोड़ देते हैं। तो क्या तुझे डर लगा है?

देवू ने कहा –नहीं नहीं, डर की बात क्या, पर वे सचमुच रहे हैं, यानी सचमुच सिधारे है? मैं तो अपनी आँखों से देखा।

आभा धीरे से बोली – हम सभी ने उनको देखा है, वे जभी चाहते है दर्शन दे सकते हैं। पर बात नहीं करते हैं – इशारे से अपना भाव व्यक्त करते हैं। मत के भागे रानी की शादी के लिए वे बड़े उत्सुक थे पर उनके वासना पूरी नहीं हुई। पीछे हमलोग रानी की शादी के लिए बहुत से सम्बन्ध लाये पर एक भी उनको नहीं भाया।

देवू की समझ में नहीं आया कि अब क्या कहना हैं, आखिर कहा – क्या मुशकिल की बात हैं!

आभा उत्सुक होकर बोली – आज चाचाजी ने सूचना दी है कि वे तुझे बहुत पसंद करते हैं। क्या तू रानी को ब्याह करेगा? चाचाजी ने जताया कि रानी की शादी हो जाने पर वे चले जायेंगे, फिर इस घर में नहीं रहेंगे। क्या तू ब्याह करेगा? वह तो बड़ी भली लड़की है रे, ऐसे लड़की आजकल तो नजर में नहीं आया करती।

देवू का सिर चकरा रहा था। उसने दीवार की तरफ आँखे उठायीं। देखा – उस वृद्ध की आँखों में तनिक हँसी खिल रही हैं।

लालु

- शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय

अनुवाद - ✍ कमल

बचपन में मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था लालु । अर्द्ध शताब्दी पूर्व अर्थात यह इतने दिन पहले की बात है, जिसका आप ठीक तरह अनुमान भी नहीं लगा सकते । हमलोग एक छोटे से बंगाली स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे । हमलोगों की उम्र तब दश-ग्यारह साल की होगी । लोगो को डर दिखाने, जब्द करने का और न जाने कितनी ही शैतानियाँ उसके दिमाग में घूमता रहता, जिसका ठिकाना ही नहीं । एकबार अपनी माँ को एक घर का साँप दिखाकर उन्हें ऐसी विपत्ति में डाल दिया कि उनके पैर में मोच आ गया और वे मोचवाले पैर से प्रायः सात आठ दिनों तक लंगड़ाकर चलते रही थे । वे गुस्से में आकर बोलता है – एक मास्टर ठीक कर दिया जाय । शाम के समय आकर पढ़ाने से उसे और शैतानी करने का समय नहीं मिलेगा ।

यह सुनकर लालु के पिताजी ने उत्तर दिया – नहीं । उन्हें पढ़ाने के लिये कभी मास्टर नहीं था, बहुत कष्टों को सहते हुए अपनी चेष्टा से पढ़ना-लिखना सीखकर अब वे एक बड़े वकील बनें । उनकी इच्छा थी लड़का भी उसी तरह पढ़े । किंतु शर्त रखखा गया कि, जब लालु कक्षा मै प्रथम न आये, तब उस समय से घर में उसे पढ़ाने के लिये एक ट्यूटर लगेगा । इस बात से लालु को राहत तो मिली, पर मन ही मन वह मा पर नाराज़ हुआ, क्योंकि वे उसके सिरपर मास्टर रखने की चेष्टा कर रही थीं । उसके लिये घर में मास्टर बुलाना, तो पुलिस बुलाने के समान है ।

लालु के पिताज़ी धनी हैं । कई साल पहले पुराने मकान को तुड़वाकर तीन मंजिला मकान बनवा लिया था। उसी समय से गुरूदेव की इस मकान में लाकर उनके पंर की धुली लेने की लालु की माँ की दिली इच्छा थी । किंतु वृद्ध होने के कारण फरीदपूर से इतने दूर आने के लिये वे राज़ी नहीं होते थे, पर इसबार संयोग मिल ही गया । सूर्यग्रहण के उपलक्ष में स्मृतिरत्न काशी आये हैं । वहाँ से उन्होंने लिखा है कि लौटते समय नन्दरानी को आशीर्वाद देने आयेंगे । लालु की माँ खुशी से समायीं । उनकी अगवानी के आयोजन में व्यस्त हो गये, कारण इतने दिनों की मनोकांक्षा पूर्ण होने जा रही है, गुरूदेव का चरण-रज पड़ेगा । मकान पवित्र हो जायेगा ।

नीचेवाले बड़े घर से सामान वगैरा हटाया गया, नये फोते की खाट, नया गद्दा बनकर आ गया – गुरूदेव इसपर शोयेंगे । इसी घर के एक कोणे में उनके पूजा करने का स्थान बनाया गया है, कारण, तीसरे तल्ले में बन भगवान के पूजा घर में आने-जाने में उन्हें तकलीफ होगी ।

कई दिनों बाद गुरूदेव आ ही गये । लेकिन दुर्योग का क्या कहना । आकाश काले मेघों से ढक गया, जैसा तुफान वैसा ही बारिस – लगता है यह अविरत गति से बरसता ही रहेगा ।

इधर मिठाई वगैरह तैयार करते, फल-फूल सजाते हुए लालु की माँ को साँस लेने की भी फूर्सत नहीं है । इसी बीच अपने हाथ से झाड़-झूड़कर मसहरीढाँगकर बिछापन बिछा गई । नाना प्रकार की बातचीत में रात हो चली, दूर से आने के कारण क्लान्त गुरूदेव खाना पीना खतम करके बिछौने पर सोने गये । नौकरों की छुट्टी हो गयी । मुकोमल

शय्या की सुन्दरता पर प्रसन्न होकर, गुरुदेव ने मन ही मन नन्दरानी को आशीर्वाद दिया।

किंतु, काफी रात गये अकस्मात उनकी नींद टूट गई। मच्छड़दानी के भीतर छत से चूकर उनके गाल-मटोल पेट पर पानी चूआ – अँ ! कितना ठंडा पानी ! बहुत बेज़ार होकर बिछौने से बाहर निकले, पेट को उन्होंने पोंछ डाला और कहा – नया मकान नन्दरानी ने बनवाया, लेकिन लगता है पश्चिम की कड़ी धूप की वजह से छत इसी बीच फट गया, फौरन ही बुनी हल्के पलंग को मसहरी सहित घर के एक कोने में खींचकर फिर सो गये। आधा मिनट भी बीता नहीं बीता था कि उसी समय की लगी आँखें पुनः दो-चार बूँद ठंडे पानी के कारण खुल गयी, यह भी पेट के ठीक उसी स्थान पर गिरा। फिर स्मृतिरत्न उठे, पुनः खाट खींचकर दूसरी तरफ ले गये, बोले – हूँ ! देखता हूँ छत इस कोने से उस कोने तक फट गया है। फिर सोये, फिर पेट पर पानी गिरा। पुनः उठकर पेट का पानी पोंछा, खाट खींचते हुए और एक तरफ ले गये, किंतु सोते ही उसी प्रकार पानी की बूंदे। फिर खींचते हुए एक तरफ ले गये, पंतु वहाँ भी वही। इस बार देखा बिछौना भी गीला हो गया था, सोने का कोई भी उपाय नहीं। स्मृतिरत्न विपत्ति में पड़ गये। बूढ़ आदमी, अनजान जगह, दरवाजा खोलकर बाहर जाते भी डर लगता है, फिर आकाश की दशा भी खराब है। क्या पता टूटा छत टूटकर कब गाये पर गिर जाय। डरते डरते दरवाज़ा खोलकर बाहर आये, वहाँ एक लालटेन तो जल रहा था, पर कहीं कोई नहीं था – घोर अंधकार।

जैसी बारिस वैसी ही तुफानी हवा। खड़े होने का कोई उपाय नहीं। कहाँ गये नौकर-चाकर, किस घर में सोते हैं – कुछ भी तो नहीं जानते थे। चिल्लाकर बुलाया, किंतु किसी का भी उत्तर नहीं मिला। एक तरफ एक बेंच पड़ा था, जिसपर सालु के पिता के गरीब मुवक्किल ही आकर बैठते थे। मजबूरन गुरुदेव उसी पर बैठ गये। मन ही मन उन्होंने अनुभव किया कि आत्म-सम्मान तो गया, किंतु कोई चारा भी नहीं था। उत्तरी हवा के झोंकों के कारण बारिश के छाटे भी आ रहे थे – ठण्डे से शरीर काँप रहा था – पहनी हुई धोती के आधे हिस्से से उन्होंने अपने शरीर को ढँक लिया, यथासम्भव दोनों पैर ऊपर उठा लिये। शायद इससे कुछ आराम पा सके, ऐसा कुछ उपाय उन्होंने कर लिया। नाना भाँति की क्लांति – कष्टों के कारण शरीर अवश, मन खट्टा, आँखों की पलके नींद से बोझिल अनाभ्यस्त गरिष्ठ भोज़न व रात्रि जागरण के कारण उन्हें एक-दो-चार खट्टे डकार आए। इस प्रकार उनके कष्ट की सीमा नहीं रहीं। हठात ऐसे समय एक नया उपद्रव देखा गया। पश्चिम से आकर बड़-बड़े मच्छर कानों के पास आकर गुन-गुन करने लगे। नींद से बोझिल आँखों ने तो पहले उत्तर देना नहीं चाहा। किंतु मन शङ्कित हो उठा। न जाने इनकी कितनी संख्या हो, केवल दो-एक मिनट में ही अनिश्चिता का बोध हो गया। गुरुदेव समझ गये कि इन मच्छरों की संख्या अनगिनत हैं। इनकी सङ्गठित सेना की उपेक्षा तो दुनिया का कोई वीर-पुरुष भी नहीं कर सकता। उनके काटने से जैसी जलन होती थी, वैसी ही खुजलाहट भी। स्मृतिरत्न ने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया, किंतु वे सब उनके साथ ही चले। पानी की वजह से घर की जैसी अवस्था थी, उसके बाहर भी मच्छरों के मारे वैसी ही परेशानी। हाथ पैरों पर उनका काटना निरन्तर जारी रहा। गमछे के जल्दी -जल्दी घुमाने पर भी वे नहीं भागे। स्मृतिरत्न जल्दी जल्दी इधर दौड़ते रहे। ठंडे के समय भी उनके शरीर से पसीना निकल आया। उनकी इच्छा हुई कि खुब जोर से चिल्लाये, लेकिन यह बालकोचित लगेगा, सोचकर निराश हो गये। उन्होंने कल्पना किया कि नन्दरानी सुकोमल शय्या पर मसहरी के भीतर आराम से सो रही है। मकान में जो जहाँ है, एकदम निश्चिन्त सो रहा है – सिर्फ उन्हीं के भाग -दौड़ का अंत नहीं है। कहीं की घड़ी ने चार का घंटा बजाया, उन्होंने कहा – काटो बेटा, जितना सको काटो

– मैं तुमलोगों से नहीं सकूङ्गा, इतना कहकर बरामदे के एक कोने में अपनी पीठ को बचाते हुए टेक लगाकर बैठ गये। बोले, सुबह तक यदि मेरे प्राण बच गये, इस अभागे प्रदेश में फिर नहीं रहना। पहली गाड़ी मिलने से ही अश भाग जाऊँगा। यहाँ उनका मन क्यों नही आना चाहता था, उसका कारण अब समझ में आया। सोचते सोचते ही सुबह की नींद ने उनके सारे दुःखों को हर लिया – स्मृतिरत्न प्रायः अचेत से हो गये।

सुबह होने के पहले नन्दरानी उठ गयीं – क्योंकि अब गुरुजी की सेवा जो करनी थी। रात के समय गुरुदेव ने सिर्फ नास्ता ही किया था – यद्यपि उनका परिमाण काफी था – तब भी उनके मन में क्षोभ था कि वह उन्हें अच्छी तरह नहीं खिला सकीं। आज दिन में विभिन्न प्रकार का भोजन बनाकर खिलायेंगी।

नीचे उतरकर नन्दरानी ने देखा – दरवाजा खुला है। गुरुदेव उनके पहले ही उठ गये है, सोचकर उसे थोड़ी लज्जा लगी। घर में झूककर देखी कि गुरुजी नहीं हैं, पर, यह क्या ? दक्षिण का बिछा पलंग उत्तर में पड़ा है। कपड़े का बैठा खिड़की की तरफ से हटकर घर के बीच में पड़ा है। कुश-आसन और हवन पूजा की सामग्री आदि अपने स्थान से हटकर बिखरे हुए पड़े हैं, कारण, कुछ समझ में नहीं आया। बाहर आकर नौकरों की आवाज़ लगायीं, वे लोग उस समय भी सो रहे थे। तब अकेले गुरुदेव कहाँ गये ? अचानक ही उनकी दृष्टि एक तरफ गयी, वह क्या है? इस उजाले अंधेरे के एक कोने में मनुष्य रूप में न जाने कौन बैठा है। साहस के साथ थोड़ा पास आये हुऐ झुककर देखती हैं कि यह तो उन्हीं के गुरुदेव हैं। किसी अव्यक्त आशंका से ग्रसित हो चिल्ला उठीं, ठाकुरमशाय ! ठाकुरमशाय!

उनींदी आँखों से स्मृतिरत्न ने देखा, तब धीरे धीरे सीधे होकर बैठे। नन्दरानी भय, भावना, लाज से ह्रँआसी होकर बोली – ठाकुरमशाय, आप यहा कैसे आये ?

स्मृतिरत्न उठते हुए खड़े होकर बोले-सारी रात दुःखो का आर-पार जो नहीं था माँ।

क्यों बाबा ?

नया मकान अवश्य बनवाई हो माँ, किंतु छत तो पूरा ही फटा है। सारी रात बारिस बादल बाहर न गिरकर मेरे ही ऊपर गिर। खाट जहाँ भी खींचा, वहीं पर बारिस का पानी मिला। छत कहीं टूटकर माथ पर न गिरे, इसी भय से भागकर बाहर आ गया। किंतु उसपर भी क्या मैं बच सका माँ। पूरी रात बड़े बड़े मच्छरों के एक झुंड मुझे काटते रहे – इधर से भागकर उधर और उधर से भागकर इधर आता। शायद मेरे शरीर का आधा खून तो वे ही पी गये, माँ !

अनेक प्रयत्नों और बहुत कहसुनकर घर में लाये वृद्ध गुरुदेव की इस अवस्था को देखकर नन्दरानी की दोनों आँखें भर आई। उन्होंने कहा, परन्तु बाबा, मकान तीन तल्ले की बनी है, आपके घर के ऊपर और भी दो तल्ले हैं, बारिस का पानी तीन तीन छत छेदकर कैसे गिरेगा, यह बोलते बोलते सहसा ही उन्हें शैतान लातु की कारस्तानियों का ख्याल आयि। भागकर बिछौनेपर हाथ लगाते हुए देखीं कि चादर बीच में बहुत भींगा है एवं तब भी मच्छरदानी से बूँद बूँद पानी गिर रहा है। जल्दी जल्दी उसे उतारते हुए देखा एक कपड़े के बड़े टुकडे में बँधा हुआ एक बड़े बर्फ का टुकड़ा। जो पूरी तरह पिघला नहीं था अभी भी एक भाग रह गया था। पागलों की भाँति दौड़कर बाहर गई, जो भी नौकर सम्मुख मिला, उसे ही डाँटते हुए हुक्म दीं – हरामजादा लेलो कहाँ है? काम को चूल्हें में झोंको, दुष्ट को जहाँ भी पाओं, मारते मारते पकड़ कर लाओ।

लालु के पिताजी उसी समय नीचे उतर रहे थे, पत्नी का यह कांड देखकर विमूढ़ से हो गये – क्या कर रही हो ? हुआ क्या ?

रुलाई से भरे-हुए कष्ट से नन्दरानी ने कहा – चाहे लालु को घर से निकालो, नहीं तो मैं आज गङ्गा में डूबकर इस महापाप का प्रायश्चित्त कर ही डालुँगी ।

क्या किया है उसने ?

बिना मतलब उसने गुरुदेव की क्या दशा की है ? आकर अपनी आँखों से देखो । तब सब घर में मन्दर आये । नन्दरानी ने सबकुछ बताया, सब दिखलाया । पति से बोलीं – इस दुष्ट लड़के के कारण कैसे घर चलाऊँगी, तुम्हीं बताओ ?

गुरुदेव बस समझ गये । अपनी बुद्धिहीनता पर दूढ़ – बाबा हाः हाः, कर हँसने लगे ।

लालु के पिता दूसरी तरफ मुँह घुमाकर खड़े हो गये ।

नौकरों ने आकर बताया - लालू बाबु, कोठी में नहीं हैं । और एक ने आकर कहा वह मौसी के घर में बयठकर खाना खा रहा है । मौसी उसे नहीं आने देती । मौसी यानि नन्द की छोटी बहिन । उनके पति भी वकील हैं और दूसरे मुहल्ले में रहते हैं ।

इसके पश्चात करीब पन्द्रह दिनों तक लालु उस मकान के आस-पास भी नहीं फटका ।

चन्द्रकान्त बक्षी जन्म २० अगस्त १९३२, पालनपुर, उत्तर गुजरात । कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। गुजराती के महत्वपूर्ण कहानी लेखक । अब तक ३२ किताबें प्रकाशित । 'पड़छा डूबी गया', 'रोमा', 'आकार', 'मेकलताना' किनारा', मेक अने अेक एवं पेरेलिसिस उपन्यास, 'प्यार', एक सांजनी मुलाकात एवं 'मीरा', कहानी संग्रह प्रमुख रचनाए है ।

डॉक-मजदूर

- ✍ चन्द्रकान्त बक्षी

गुजराती से अनुदित : जेठमल

पोर्ट रेलवे की पटरियाँ लांघ कर समूद अहमद नदी के किनारे की छोटी सड़क पर आया । बाई ओर रेल का लकड़ी का पुल था । समूद पत्थर की सीढ़ियाँ उतर नदी के किनारे पत्थरों पर आकर खड़ा हो गया । उसकी पुरानी चतरी में से लोहे की एक छड़ कपड़ा फाड़कर बाहर निकल गई थी । हुगली की चिकनी माटी में छाता खोंस कर नदी की तरफ़ देखते हुए उसने जोर से हाँक लगाई, "नंबर पचपन···!"

नदी के चौड़े पाट पर धुँए से काली पड़ी हुई बोंगियाँ, छोटी-बड़ी नावें, पोर्ट कमिश्नर की बोटें सटी-सटी, स्थिर खड़ी थीं । मेन-ऑव-वॉर जेटी के पास तीन दिन पहले आई हुई ब्रिटिश कुजर एच. एम. एस. 'गॉम्बिया' पर मस्त गोरे खलासी चक्कर लगा रहे थे । सामने की एक छोटी नाव में एक छोटे चुल्हे पर एल्युमीनियम की पतीली में चावल पक रहे थेक और पास में लाल तुंगी पहने हुए एक माँझी बड़े चाकू से मिर्चें काट रहा था ।

"पचपन नंब···र !"

सामने से नदी के पानी पर तुड़कती-सी फीकी आवाज़ आई, "हाँ···"

मसूद ने देखा कि दूर एक नाव पर एक लड़का हाथ ऊँचा कर रहा था । उसने जवाब में हाथ हिलाया । क़तार तोड़कर दूर से नाव निकल रही हो ऐसी कल-कल की आवाज़ आई । मसूद ने जेब में से बीड़ी निकाल कर सुलगाई और आसपास नजर डाली । कुछ दूरी पर रजबअली की नाव में तम्बाकू के बोरे लादे जा रहे थे । रजबअली उसके ही गाँव का माँझी था । अच्छे खासे पैसे कमा रहा था । पाकिस्तान में ज़मीन-जायदाद थी । यहाँ उसकी तीन नावें चलती थीं । पर उसमें एक बड़ी खामी थी – बिरादरी में उसने कभी किसी की मदत की नहीं थी । पिछले साल का ही क़िस्सा है । छह नंबर के वेरहाउस में जब क्रेन से कपड़े की गाँठ असलम के पैर पर गिर पड़ी थी तब असलम ने घर भेजने के लिए उससे पंचास रुपये माँगे थे, पर वह कमबख्त एक पैसा भी कैसे दे ? और असलम की टाँग टूट गई तो सरकार ने भी क्या दिया ? अस्सी रूपये देकर घर बैठा दिया । उसकी मज़दूरी ख़त्म हो गई ...जवान आदमी था, अभी और पच्चीस वर्ष मेहनत कर सकने के क़ाबिल था । पर तक़दीर गरीब की लाया, क्या हो ? आजकल कपड़े की मिल में नये कपड़े के थानों पर बैठे-बैठे जिलेटिन पेपर लगाता है ।

पानी काटती काटती नाव सामने आ गई । नाव खेने के चप्पू चलाते-चलाते लड़के ने पूछा, "क्यों मसूद ?"

नाव किनारे आई । मसूद बाएं हाथ से तुंगी ऊँची करके टिके हुए फट्टे पर आसानी से चढ़ गया । नाव में एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था । उसकी सफेद दाढ़ी धुँआसे रंग की हो चुकी थी । पास ही कोने में एक पुराना देशी हुक्का खड़ा किया हुआ था, जिसके नालचे में तुरन्त भरी हुई चैंस के मुँह पर फेन सूख गये हों उस तरह राख जमी

हुयी थी ।

"कैसे है अब बच्चा के ?"

"अभी-अभी ही के हुई है । मैं तो कहता हूँ देश चले जाओ, हवा बदलेगी । यहाँ तो सारे दिन कुहरा और धुंआ...और रात को धुंआ नीचे उतरता है तब तो अच्छा खाँसते-खाँसते इतने थक जाते हैं कि पूछो मत । कल मैं जरा भी गफलत में रहा होता तो ये पानी में गिर जाते ।" नदी में थूकते हुए उसने कहा, "बीमारी और बुढ़ापा दोनो एक साथ आ गए हैं ; बड़े ज़िद्दी हो गए हैं ।"

मसूद ने बूढ़े के कृश हो चुके शरीर की ओर देखा । कोने में टिन की सन्दूक पर दो नई लूंगियाँ पड़ी थीं ।

बहुत अधिक श्रम करने से सुखकर सख्त हो चुके लड़के के शरीर की ओर देखते हुए मसूद ने कहा, "अख्तर, मैं तुझे कहने आया था कि ...मेरी बीवी के आज सुबह गर्भपात हो गया है ।"

"क्या ?" अख्तर चौंक कर बोला ।

"सुबह बस्ती में पानी के लिए भीड़ लग गई थी । वह पानी भरने के लिए ट्यूबवेल पर गई थी । वहाँ झगड़ा हो गया । धक्का मुक्की हुई होगी । मुझे तो लोगों ने ख़बर दी । हॉस्पिटल ले गया । डॉक्टर सा'ब ने कहा, यहीं रख नहीं तो ज़हर फैल जाएगा और तेरी औरत मर जाएगी । इस समय हॉस्पिटल में है...खर्च में फँस गया हूँ, भाई !"

"बीवी को बचाना है और ख़र्च की चिन्ता करनी है यह कैसे होगा ? बीवी मर जाएगी तो ऐसी दूसरी नहीं मिलेगी ।"

"सौ रुपये तो अब तक लग चुके हैं । और न जाने कितने खर्च होंगे ? तिस पर यूनियन हड़ताल किए बैठी है।"

"पर तू यूनियन में है कहाँ ?"

"ठीक है, मैं नहीं । पर इससे क्या ? गोदियों पर काम ठप्प हो गया है । क्रेनों में कई दिनों से जंग लग रहा है । पूर्जों में तेल देने वाले भी हड़ताल किए बैठे हैं । यदि हड़ताल लम्बी चलेगी तो..."

अख्तर देखता रहा । "रोटी का क्या...? मज़दूर रोटी बिना कितने दिन बैठा रहेगा ?"

मसूद ने बीड़ी का आख़िरी कश खींचकर बीड़ी पानी में फेंक दी । धुंआ निकालते हुए वह बोला, "भूखों मरेगा तब तक । यूनियन के लीडर रोज़ शाम को मीटिंगें करते हैं, बेकार कामदारों के लिए चंदा उगाहते हैं – और उन पैसों से शराबखोरी करते हैं । लीडरों के लिए टैक्सियाँ दौड़ती हैं और मजदूर के पास बस्ती के किराए के तीन रुपये भी नहीं बचते ।" और मसूद पुनः फूसफूसाया, "मीटिंगों में नारे लगाने से पेट थोड़े ही भरता है ।"

"तू कितने दिनों से बेकार चल रहा है ?" अख्तर ने पूछा ।

"आज चौबीसवाँ दिन है । देखता हूँ दो-तीन दिन तक हड़ताल ख़त्म नहीं होती है तो काम पर चढ़ जाऊँगा। एक तो औरत की बीमारी का खर्चा चालू ही है और साथ ही कल रात से बच्चे को भी बुखार आ रहा है । यदि मैं कमाऊँगा नहीं तो खिलाऊँगा क्या – अपना सिर ?" मसूद ने आँखें पैनी करके सामने के किनारे की ओर देखा ।

"इस समय तुम्हारे पास कितने पैसे हैं ?"

"पिछले तीन महीने सीजन थी इसलिए सौ रुपये बच गए थे । वे तो एक ही झपट्टे में साफ़ हो गए । काम पर चढ़ने के सिवा मेरे लिए अब और कोई चारा नहीं ।"

अख्तर चुप रहा । उसने रेल के पूल पर जा रहे एक खूबसूरत जोड़े की ओर देखा और नजर हटा ली । कुछ

देर बाद वह बोला, "अभी तू पन्द्रह रुपये ले जा । फिर डॉक पर काम शुरू हो जाए तब दे देना ।"

अख्तर ने उठ कर तहखानेनुमा खुत्ते में से एक पुरानी सन्दूकची निकाली । सन्दूकची खोल कर एक मैले बटुए में से पाँच-पाँच के तीन नोट निकाले और मसूद की हथेली में थमा दिए । मसूद कमीज़ की जेब में नोट रखते हुए उठ खड़ा हुआ । अख्तर ने कहा, "बीवी का इलाज ठीक तरह से कराना । आज तो लॉंच सर्विस चालू है इसलिए मुझे फूर्सत नहीं मिलेगी । कल बंद है, हो सकेगा तो बस्ती में आ जाऊँगा ।"

मसूद सिफ़्त से किनारे पर उतर गया । उसने छाता एक पत्थर पर टिका कर हाथ ऊँचा किया, "खुदा हाफिज, अख्तर भैया !"

"खुदा हाफिज !" एक बड़े पत्थर से चप्पू भिड़ाकर नाव पानी में धकेलते हुए अख्तर ने कहा ।

दो दिन बाद मसूद डॉक्टर की सलाह से अपनी बीवी को हॉस्पिटल से घर ले आया । बीवी में अत्यधिक कमजोरी आ गई थी और बच्चे का बुखार भी कम न हुआ था । रात को घर लौटा तब तक बच्चा सो गया था । उसने रज़िया की चारपाई की ओर नज़र डाली । रज़िया एक फटी हुई चादर ओढ़े लेटी थी। मसूर ने चारपाई के पास बैठ कर निकट पड़े लालटेन को तेज किया । रज़िया ने करवट बदली । मसूद ने उसके रूखे बालों में हाथ फेरते हुए धीरे-से कहा, "रज़िया !" रज़िया ने आँखें खोलीं । कुछ बोले बिना वह केवल ताकती रही ।

"कैसे हैं ?"

"ठीक ।"

एक मिनट दोनों चूप हो गये । मसूद ने धीमी आवाज़ में कहा, "मैंने कल से काम पर जाने का विचार किया है ।"

"क्यों ? एकदम !"

"बस । कब तक बेकार बैठा रहूँ ?... और पैसे कहाँ हैं ?"

रज़िया की सूखी आँखों में चमक आई, "पर हड़ताल चल रही है, उसका क्या ? यूनियन वाले तुम्हें हैरान-परेशान कर डालेंगे ।"

"मेरा और यूनियन का क्या लेन-देन ? मैं यूनियन का मेम्बर नहीं, यूनियन के फंड में एक पैसा भी नहीं देता हूँ ।" मसूद तन गया । "प्रत्येक मजदूर को काम करने का हक़ है । मुझ में मज़दूरी करने की ताकत है और हिम्मत होगी तो कौन रोक सकेगा ?"

रज़िया समझे बिना ताकती ही रही । फिर उसने कहा, "पर हड़ताल तो यूनियन ने ही कराई है न ?"

मसूद तफ़रत से हँसा, "यूनियन ! ...यूनियन मेरे बीवी-बच्चों को रोटी देती है, क्यों ?" उसने बहुत तेज जलते हुए लालटेन को मन्द करते हुए कहा, "रज़िया, डॉक के कामदार तो बिल्लो के बच्चों जैसे हैं, बिल्कुल मूर्ख-अनपढ़ । मोहम्मद इजरायल नचाता है वैसे नाचते हैं । अभी तक इजरायल को कोई मर्द मिला नहीं । उसे पता नहीं डॉक-वर्कर क्या चीज़ है ?"

"हम ठहरे ग़रीब, वह है बड़ा आदमी । उसका सामना करने का विचार ही कैसे आया है ?"

मसूद चूप रहा । उसके चौड़े, खुरदरे हाथों की मुट्ठियाँ भिच गईं । खड़े होकर उसने एक लोटे में ठंडा पानी भर कर पिया । बाहर अंधेरा था एल्यूमीनियम की एक कटोरी में दवा डाल कर उसने रज़िया को पिलाई और फटी शतरंजी बिछा कर वह सो गया ।

दूसरी सुबह मसूद ने बगलों में छेद पड़ चुका पट्टीदार ब्लू टी-शर्ट और तेल के चकतों वाली पैंट पहन ली। पैंट की जेब में छोटा लाल कंघा और डॉक-वर्कर का पीला कार्ड डाला। गले में पान के दागों वाला रेशमी रूमाल बाँध लिया। बच्चे के बुख़ार से गरम गाल पर चुम्मी लेकर उसने अपना हथोड़ा उठाया और डॉक की तरफ़ चल पड़ा।

रास्ते में चाँदनी होटल के बाहर दो आदमियों को उसने केम्पाकोला पीते खड़े देखा। एक था डॉक-वर्कस यूनियन का सेक्रेटरी मोहम्मद इजरायल। उसके ठिगने, वजनदार शरीर पर बड़ा सिर भयंकर लगता था। उसकी पेंडुक जैसी दो गन्दी आखें बाहर की ओर बढ़ आई थीं और कान के नीचे का गाल जल जाने से एक बड़ा दाग़ बन गया था। दूसरा उसका शागिर्द था – विसु चटर्जी। इजरायल ने मसूद की ओर आँखें घुमाते हुए पूछा, "मसूद भैया, कहाँ जा रहे हो ?"

मसूद खड़ा रह गया। कतराती आँखों से उसने दोनों को भाँपा। हथोड़ा नचाते हुए वह ठंडेपन से बोला, "डॉक पर !"

"ओहो ! हड़ताल ख़त्म हो गई...!" इजरायल जोर से हँसा। अपने साथी की तरफ़ आँख मिचकारते हुए उसने कहा, "विसु, मसूद सा'ब को अब यूनियन का मेम्बर बनाओ, और क्या ?"

विसु सुस्ती से हँसा। उसके ऊँट जैसे सड़े हुए पीले दाँत देखकर मसूद ने घृणा से ज़मीन पर थूका और कदम उठाकर चलने लगा।

विसु दौड़ता आया। मसूद का कंधा पकड़कर उसने कहा, "बेवकूफ ! क्या कर रहा है ? मज़दूर होकर मज़दूर के पैर में कुल्हाड़ी मारता है ?"

मसूद ने कंधे से एक ज़ोरदार धक्का मारा, "दूर हट, कुत्ते !" विसु धक्का खाकर खिसक गया।

मसूद एक क़दम आगे बढ़ा। इतने में ही केम्पाकोला की एक खाली बोतल उसके पैर के सामने जोर से आवाज़ करती फूटी। मसूद ने चौंककर पीछे देखा। मोहम्मद इजरायल मन्द-मन्द मुस्करा रहा था। विसु एक खाली रिक्शे की ओट में खड़ा रह गया था।

मसूद के हाथ की नीली नसें फूल गईं। काँपता हथोड़ा उसने ऊँचा किया और भरिये स्वर में कहा, "इजरायल बेटे ! मुझे डराने की कोशिश की तो याद रखना, इसी हथोड़े से तेरा सिर फोड़ डालूँगा !"

होटल के दरवाज़े पर तीन-चार आदमी आकर खड़े हो गए थे। इजरायल दूसरे ही क्षण होटल के भीतर अदृश्य हो गया। विसु का तन काँप रहा था। उसकी तरफ़ एक सुलगती नज़र डालकर मसूद फटाक से डॉक के रास्ते की ओर मुड़ गया।

दो दिन बाद मसूद नदी के किनारे अख्तर से मिला और कहा, "मैं काम पर हाजिर हो गया हूँ यूनियन भी मिल गई है। मुझ अकेले को दिन से काम पर जाते देखकर दूसरे भी तीन-चार वर्कर कल आने वाले हैं।"

"पर यूनियन ने तुम्हें रोका नहीं ?"

"यूनियन तो मुझे डराने-धमकाने की बहुत ही कोशिश कर रही है, पर मैंने इजरायल को जता दिया है कि बच्चू, यह दूसरी माटी है !"

अख्तर ने गंभीर होकर कहा, "मेरी बात मानेगा ? तू यूनियन का मेम्बर बन जा।"

"क्यों ?"

"यदि तू यूनियन में शामिल हो जाएगा तो तुझे यूनियन के फंड में से इस बेरोज़गारी के दिनों के पैसे मिल

जाएंगे..."

"देख अख्तर, मैं यूनियन की भीख पर नहीं जीता। मुझे रोजी मिलती है अपनी मजदूरी की, यूनियन या इजरायल की इबादत करने की नहीं मिलती। इजरायल मजदूरों के फायदे के लिए हड़ताल करा रहा है, क्यों ? डॉक-वर्कर्रों को वह डर से काबू में रख रहा है। उसके पास पैसे हैं, छह: महीने हड़ताल चलेगी तो भी उसे दिक्कत नहीं होगी। मेरी हालत अलहदा है। मैं अपने हक़ का कमाता हूँ, हक़ का खाता हूँ। मजदूरी करता हूं पर इज्जत से..." मसूद ने सफाई से बात आगे बढ़ाई, "इजरायल के विरुद्ध किसी को सिर ऊँचा उठाना हो पड़ेगा। वह डॉकलेबर की जान से खिलवाड़ कर रहा है।"

"सरकार..."

"सरकार क्या करने को थी ? सेक्रेटरी को बुलाएगी, सलाह-मशविरा करेगी, चाय-पानी पिलाएगी, ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ पैसे खिलाएगी और हड़ताल खत्म हो जाएगी !...और डॉक-वर्करों के लीडर मोहम्मद इजरायल साब के साथे पर चार चाँद लग जाएंगे !...रोजी किसकी जाएगी, पता है ? तेरे-मेरे जैसी मजदूरों की !" मसूद गरम हो गया।

अख्तर चुप हो गया। उसने बात बदलते हुए पुछा, "मसूद, उस दिन तो मैं आ नहीं सका। अब बीवी की तबीयत कैसी है ?

"ठीक है।'

"बच्चे का बुखार कम हुआ ?"

"हाँ", मसूद ने कहा, "कल से बुखार उतर गया है।"

कुछ बातें करके मसूद चल दिया।

सूर्य की पहली किरण के आने से पहले संकरी बस्ती में चहल-पहल मच गई थी। रोते बच्चों और ट्यूबवेल पर झगड़ती औरतों की आवाज़ ने मसूद को नींद में से जगा दिया था। उसने खड़े होकर बच्चे के ललाट पर हथेली रखी। बुखार न था। रज़िया अभी तक नींद में थी। उसकी ओढ़ी हुई चादर खिसक गई थी। मसूद ने चादर ठीक की और एक कमरे वाली अपनी छोटी-सी दूनिया पर संतोष की नज़र डालकर वह बाहर निकल गया।

बाहर से आया तब भी रज़िया नींद में सोई हुई थी। उसने डॉक पर जाने के लिए चूप-चाप कपड़े पहने-खाकी पैंट और नया कत्थई टी-शर्ट। डॉक-वर्कर का मुड़ा-तुड़ा हुआ पीला कार्ड उसने सीधा करके पैंट की जेब में डाला और हथौड़ा लेकर तैयार हो गया। मसूद का मन हुआ कि रज़िया के साथ कुछ बातें करे, पर रज़िया गहरी नींद में थी। उसे नींद में से जगाना उचित ना लगा। धीरे-से बाहर निकलकर उसने दरवाज़ा बन्द किया।

मसूद बस्ती में से निकलकर सड़क पार करके डॉक के रास्ते पर आया। दूर पेड़ के नीचे चाँदनी होटल की एक मेज़ पर दो मजदूर बैठे थे। पास वाली पान की दुकान का रेडियो शान्त था। मसूद होटल की ओर देखे बिना डॉक की दिशा में आगे बढ़ा। तभी पीछे से एक हाथ मसूद के कंधे पर धीरे-से पड़ा, "क्यों दोस्त, डॉक की ओर ?"

मसूद ने देखा। यिसु सफ़ेद कुर्ता और धोती पहने खड़ा था। एक मिनट दोनों की आँखें सवाल-जवाब करती रहीं।

"आ मसूद, चाय पियें। मैं तेरे साथ कुछ देर बात करना चाहता हूँ।"

"क्या बात करनी है ? जो कुछ कहना हो वह यहीं पर कह दे।" मसूद ने सख़्ती से कहा।

"विश्वास रख मुझ पर। मैं भी मज़दूर हूँ। बस पाँच ही मिनट, अधिक नहीं। चल..." विसु ने नरमी से मसूद को होटल की तरफ़ खींचा।

दोनों होटल में घुस। दो आदमी एक टेबल के आसपास बैठे-बैठे बातें कर रहे थे। बाक़ी होटल ख़ाली था। मसूद ने हथौड़ा सख़्ती से पकड़ा।

एक कोने की टेबल के पास दोनों बैठे। विसु ने चाय का ऑर्डर देकर कहा, "मसूद मुझे इजरायल ने भेजा है तेरे साथ बात करने के लिए। देख, मैं तुझसे खुले दिल से बात कर रहा हूँ। तू बस एक सप्ताह तक काम पर जाना स्थगित रख। सरकार तंग आ गई है। और अब दो-तीन दिन में ही लेबर कमिश्नर इजरायल की वार्त्ता के लिए बुलाने वाला है।"

मसूद के चेहरे पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ा। वह देखता रहा।

"देख, तू काम पर जाता है तो दूसरे वर्कर कमज़ोर पड़ जाते हैं। तू समझादार है।" विसु ने आँखें छोटी करते हुए कहा, "मज़दूर के पेट पर लात क्यों मार रहा है ?"

"मैं ?" मसूद गुर्राया, "मैं मज़दूर के पेट पर लात मार रहा हूँ ? तुम लोग मजदूरों को भूखों मार रहे हो...तुम्हारे स्वार्थ के लिए, तुम्हारी टैक्सियाँ दौड़ाने के लिए..."

"देख मसूद, होश में आ।" होटल के छोकरे ने चाय के दो कप टेबल पर रखे। विसु ने कहना शुरू किया, "पागल मत बन। तुम्हें इन दिनों की तुम्हारी बेकारी के पैसे मिल जाएँगे। बोल, तुझे और क्या चाहिए ?"

मसूद ने मुँह तक आया हुआ कप ज़ोर-से प्लेट में रखा। उसकी भौंहें तन गईं, "विसु, मुझे ख़रीदने के लिए यहाँ लाया है ?"

"ख़रीदने नहीं, दोस्ती बढ़ाने।" विसु ने सहजता से कहा।

"जा, सेक्रेटरी से जाकर कहना कि डॉक-वर्कर मुर्ग़ियाँ नहीं कि भरे बाज़ार में ख़रीद ली जाएँ।" मसूद चाय छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसने हथौड़ा दाएँ हाथ में ले लिया।

विसु ने खड़े होकर मसूद का हाथ पकड़ा, "सुन-सुन। यदि तू काम करने लगेगा और हड़ताल टूट जाएगी तो मजदूर तबाह हो जाएँगे। और पता है मेरी और इजरायल की क्या हालत होगी ? दो-दो वर्ष की ठूक जाएगी।"

मसूद खिलखिलाकर हँसा, "ठीक है। फिर जेल में केम्पाकोला पीना...तू और तेरा सेक्रेटरी।" मसूद पैर से कुर्सी पर लात मारकर आगे बढ़ा। सामने मोहम्मद इजरायल सिगरेट पीता हुआ खड़ा था।"

"क्यों बेटा, केम्पाकोला पीना है ?" इजरायल के चेहरे पर बर्फ़ जैसी ठंडक थी।

"हट, बदमाश !"

मसूद ने देखा कि इजरायल ने आँख मिचकायी है। वह पूरी तरह सावधान हो उससे पहले ही पीछे से किसी ने ज़ोर से लोहे की छड़ से मसूद के दाएँ हाथ की कलाई पर दे मारी। हथौड़ा एक आवाज़ के साथ जमीन पर गिर पड़ा। मसूद ने चीखकर बाएँ हाथ से दाएँ हाथ की ज़ोर से काँपती कलाई थाम ली। सामने से एक मोटे-जगड़े आदमी से आकर मसूद के पेट में एक मुक्का जमा दिया। मसूद का मुँह खुल गया। मुँह खुलते ही किसी ने उसके मुँह में कपड़े का एक बड़ा गोला ठूँस दिया। मसूद का सिर चक्कर खा रहा था और हाथ में से सारी ताकत निचुड़ गई थी। पीछे से किसी ने ओट लगाई। मसूद लड़खड़ाया और पीठ के बल गिर पड़ा। क्षणों में ही लातों की बरसात

हो गई। कुछ देर में मसूद शरीर का हिलना-डुलना बन्द हो गया तब इजरायल ने सफाई से कहा, "बस दोस्तो, मसूद सा'ब के लिए इतना प्यार काफी है !"

बिसु ने हाँफते-हाँफते कहा, "इजरायल तू भी कैसी आदमी है ? अपने दोस्त को कैम्पाकोला पिलाना भूल गया !"

"आहो !" इजरायल ने मोटे-ताजे आदमी की तरफ़ देख, "लखन ! एक कैम्पाकोला इन सा'ब के मुँह में उँड़ेल देना...और फिर इनको सम्भालकर नदी के किनारे की ठंडी हवा में सुला आना।" इजरायल बिसु का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। उसने थमककर कहा, "और देख, वह हथौड़ा भी साथ ही रख आना। इजरायल का सिर फोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी न ?"

"और जरूरत पड़ेगी तब कफन में कीलें ठोकने के लिए भी काम आएगा !" बिसु बोला। सभी हा-हा करके हँसे – नीलामी में खड़े हुए क़साइयों की तरह

चारपाई पर बैठी-बैठी रज़िया काले बुर्के की जाली में से देख रही थी। सामने मसूद का पट्टियों में बँधा हुआ शरीर था। पैरों के पास रोते-रोते सोया हुआ बच्चा था। छोटी कोठरी में तीन-चार आदमियों के आने से भीड़ बढ़ गई थी। आदमी आपस में बातें कर रहे थे, "करनी मजदूरी और खुमारी रमनी लाट सा'ब की – यह कैसी चले?" रजबअली कह रहा था।

"डॉक में तो यूनियन हो सरकार है। लेबर कमिश्नर भी यूनियन से घबराता है, फिर साधारण मजदूर की तो बिसात ही क्या ? मैंने तो मसूद से भी कहा था कि समझदार आदमी की तरह यूनियन का मेम्बर बन जा और इजरायल का मतबा रख। इजरयाल चाहे तो मालामाल कर डाले। देखता नहीं बिमिया को ? महीने में पचास रुपये भी बमुश्किल मिलते थे। आज आराम से पांच सौ रुपये की आमदनी करता होगा, इजरायल ने जरा-सा सहयोग दिया इसीलिए।" अख्तर ने कहा।

एक मिनट शांति छा गई। एक बूढ़ी आवाज़ आई, "यह सब तो ठीक है, बेटा ! पर लड़का मर्द था। तनहा इसने इजरायल का मुक़ाबला किया। इजरायल को अपनी ज़िन्दगी में ऐसा जिगरवाला न मिला होगा।" अख्तर के पिता ने थकी-हारी आवाज़ में कहा। मसले-कुचले बुर्के की ओट से आ रही सिसकियों के स्वर ने सबका ध्यान खींचा और फिर चुप्पी छा गई। कुछ देर में आदमी उठ खड़े हुए। अख्तर के पिता ने रज़िया के पास आकर ढांढस बंधाते हुए कहा, "घबराने की जरूरत नहीं, बेटी ! यह कुछ देर बेहोश रहेगा। डॉक्टर ने कहा है कि चोटें लगी हैं वे तो आठ-दस दिन आराम करेगा तब तक में ठीक हो जाएँगी। पर हाथ टूट गया है। महीना दो महीना लग जाएगा...खैर, शुक्र खुदा का, जान बच गई।" धीरे-धीरे, अनमने मन से सभी बाहर निकले। अख्तर के पिता ने बुझी-बुझी आवाज़ में कहा, "मैं यहीं रहूँगा।"

पाँच-छः दिन गुज़रे। धीरे-धीरे मसूद के घाव भरने लगे। सप्ताह बाद हड़ताल खत्म हो गई। मजदूर काम पर चढ़ गए और लेबर कमिश्नर देवराज खन्ना ने कामदारों की यूनियन के नेता विश्वनाथ चटर्जी और सेक्रेटरी इजरायल को बार्ता के लिए बुलाया। चर्चाएँ चलीं और अन्त में समझौते का मसविदा तैयार हुआ। दोनों पक्षों की धारणा थी कि स्वयं की विजय हुई थी। अखबारों ने समझौते की खबरें प्रकाशित कीं। अन्त में – हड़ताल खत्म होने के एक सप्ताह बाद – एक बड़ी आम सभा हुई। डॉक-वर्करों और हार्बर-वर्करों की रहनुमाई में सभा हुई थी। लेबर

कमिश्नर खन्ना इ सभा के अध्यक्ष थे !

मसूद चलने-फिरने के क़ाबिल हो गया था। केवल उसका टूटा हुआ हाथ अभी तक प्लास्टर में बन्द था। वह सभा में पहुँचा तब सेक्रेटरी इजरायल ने अभी-अभी ही भाषण पूरा किया था। सभा के आख़िरी छोर पर खड़ा रहकर उसने देखा कि मंच पर लेबर कमिश्नर, बिसु आदि बैठे थे। मजदूर दुनिया के श्रमजीवियों की एकता के नारे लगा रहे थे। एक-दो स्थानों से 'मोहम्मद इजरायल ज़िंदाबाद !' के नारे उठे। एकाएक शांति छा गई। लेबर कमिश्नर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। कोलाहल शांत हो गया। खन्ना ने भाषण की शुरूआत में मजदूरों को सुलह-समझौते की सफलता के लिए धन्यवाद दिया। मजदूर-नेताओं की बाहोशी और खासकर मोहम्मद इजरायल की श्रम विभाग के साथ सक्रिय सहकार की नीति की प्रशंसा की। मसूद के मुँह का स्वाद कड़ुवा हो आया। वह सभा छोड़कर, हारे हुए देश के युद्धबन्दी की तरह स्वदेश वापस लौटता है, घर की तरफ़ चल पड़ा। पीठ पीछे सभा थी, मजदूर थे, मजदूरों के नेता थे, सरकार के प्रतिनिधि थे...।

लाउडस्पीकर में से खन्ना की कर्कश आवाज़ आ रही थी, "सरकार डॉक-मज़दूरी के हकों के लिए पूरी तरह सचेष्ट है। आने वाले कल की दुनिया मज़दूरों की है। मज़दूर मालिक बनेगा – काम उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाएगा। मजदूर का खूद का स्वाभिमान होगा, स्वयं का व्यक्तिगत स्वातंत्र्य होगा – जब कोई मज़दूर को उसकी इच्छा के विरुद्ध मेहनत नहीं करह सकेगा, जब अपने भविष्य पर मजदूर का खूद का क़ाबू होगा ..."

मसूद दौड़ा। आवाज़ पीछे डूब गई। यकायक उसे ख्याल हो आया कि सामने है। एक मिनट वह स्थिर खड़ा रहा। आहिस्ते-से अपने दरवाज़ा खोलकर भीतर देखा। चारपाई पर रजिया और उसका बच्चा लेटे हुए थे। बच्चा रो रहा था। रज़िया ने बच्चे को एक चपत लगाई और गालियाँ बड़बड़ाने लगी। बच्चा ज़ोर से रो उठा। रजिया ने रोते बच्चे को अपनी छाती से चिपकाया...बच्चे की रूँधती आवाज़ धीरे-धीरे बन्द हो गई।

मसूद ने धीरे-से दरवाज़ा बन्द किया। चाँदनी खुशनुमा थी, हवा में बेफाम मस्ती थी ... अँधेरे में बैठे हुए कबूतर की तरह मसूद छटपटा उठा।

आटोग्राफ़

(तेलुगु से अनुवाद)

लेखिका बोम्मदेवर नागकुमारी

अनुवादक- ✍ कोम्मा शिवशंकर रेड्डी

"माता जी दूध।"

घंटी की खनक जैसी दूधवाले की आवाज सुन कर फौरन जाग उठी और जा कर दूध ले आयी।

हमारे श्रीमान् जी और दोनों पुत्र रत्न अभी नींद से जागे नहीं। हों आज उन के लिए रविवार की छुट्टी है न।

मेरे जिम्मे तो रविवार को काम का बोझ और बढ़ जाता है।

रविवार को कालेज नहीं रहता। "कृपया लिख कर दीजिये" कहते हुए कोई पत्र-संपादक या साप्ताहिक संचालक की माँग। क्या करती। मन मसोस कर हाँ कहना पड़ता है।

"माँ, इस रविवार को तुम घर पर ही रहती हो न ? खाने के लिए क्या बनाती हो ? पकौड़ी, पुड़ी या मिठाई ?" बच्चों के पुछने पर मैं बड़ी प्रसन्नता से कहती हूँ "बेटे तुम्हें क्या चाहिए ?"

"इस रविवार को ओवरहेड़ टैंक साफ़ करना है न?" श्रीमान् जी का सवाल। मैं यह समझ कर मान जाती हूँ कि शायद छा दोनों मिल कर सफ़ाई करेंगे। काम शुरु करने की देर है कि कोई फ़ोन कात के आते ही श्रीमान्जी श्रीमहालक्ष्मी को छोड़ कर रफ़ू चक्कर हो जाते हैं।

गृह लक्ष्मी की हैसियत से मुझे ही सब अतिरिक्त कार्य करने पड़ते हैं। घी बनाने से लेकर बच्चों के नाखून काटने तक। घर का हर काम मुझे परेशान करता रहता है कि मुझे पहले देखो, मुझे पहले पूरा करो।

मुँह में तेजी से ब्रुश चलाते-चलाते अख़बार के हेड लाइन्स देख लेती हूँ। सब के जागने पर वह मेरे हाथ नहीं लगता।

स्ट्रांग काफ़ी पी कर भिगोई मूँग की दाल, हरी मिर्च अदरख़ के टुकड़े और नमक ग्रैंडर में डाल कर ग्रैंड किया। अदरख़ की चटनी भी बनायी।

नानवेज करी के लिए मसाला तैयार किया। प्याज काट कर रख लिया। घर बुहार कर, बर्तन माँज कर आयी नौकरानी को चाय बना कर दी।

जमाते-जमाते बड़ी अनिच्छा से श्रीमान् जी और बच्चे उठ बैठे।

उन तीनों के टी. वी. के सामने चिपक जाने के पहले ही मैंने यह कह कर उन को भगा दिया कि "जल्दी ब्रश कर के आइये, स्नान-पान और जलपान सब जल्दी निबट जाना है। तुम्हारी माँ के सिर आज ढेर-सा काम पड़ा हुआ है।

"आज का नाश्ता क्या है ?" छोटे ने पूछा।

"आज रविवार है न भाई। मूँगचीला।" बड़े ने जवाब दिया।

"हाँ भई, भूल गया। हायों हाथ उपमा भी बना डालो। उपमा और मूँगचीला बढ़िया कांबिनेशन है।" यह श्रीमान् जी का अजीबो-गरीब स्वाद है।

मैं मुस्कुराते हुए हामी भर रही थी। इतने में बाहर से आवाज सुनाई दी "मछलियाँ अम्मा मछलियाँ।"

"चिकेन चाप जा कर क्यू में खड़े रहने की बला तो टल जायेगी। मछलियाँ ले लो।" उन्हों ने सुझाया।

"हाय भगवान, उन्हें धो-धो कर साफ़ करते-करते मेरी जान निकल जायेगी।"

"अपने पतिदेव और समाज को धो-धो कर सुखाने वाली तुझे नाचीज मछलियों को धो डालना कुछ मुश्किल नहीं है।" व्यंग्य-बाण कसते हुए श्रीमान् जी ने मछुवे को आवाज दी।

अब तक उछलती मछलियों को देख कर खुशी से उछल-कूद करते बच्चों को देख कर मैं ने मछलियाँ खरीद लीं।

"देखो बहुत दिन हुए। मछलियों का शोरवा न बनाना डीपफ्रै बनाओ।" खान-पान के विषय में श्रीमान् जी के निर्दिष्ट निर्णय होते हैं।

"कहते हैं, करोड़ों विधाएँ कोख भरने के लिए हैं। अगर आहार-विहार का पालन न कर सके, तो जीना कठिन है" मैं अकसर सचेत करती रहती हूँ कि आपका पेट बढ़ता जा रहा है थोड़ा कम खाना बेहतर है।"

भोजन की मेज पर श्रीमान्जी और बच्चों के बैठते ही मैं ने मूँग चीले बनाना शुरू कर दिया। चार-पांच चीले बनाना पूरा हुआ कि तभी फ़ोन बजने लगा। स्टौ कम कर के फ़ोन उठाया, बाँये हाथ से।

"हलो।"

"हलो कौन बात रहे हैं ?" बड़े सवेरे जब कि मैं अपनी गृहस्थी में डूबी हुई हूँ। उस का बेतुका सवाल सुन कर मैं बड़ी परेशान हुई।

"आप कौन हैं ? जरा गुस्से से पूछा मैं ने।

"मैं ने पहले पुछ कि कौन बोल रहे हैं।

"अरे, मेरे घर फ़ोन कर के मुझ से ही पूछे कि कौन बोल रहे हैं। यह क्या तमाशा है ? मैं क्या जवाब दूँ ? आप हैं कौन ? किस के लिए फ़ोन किया ?" मैं ने लड़ने के लिए कमर कस ली।

"सालों बाद भी वही घमंड, वही अकड़। कोई परिवर्तन नहीं तुझ में।"

उस ओर से हलकी-सी हँसी की आवज।

मुझे थोड़ी-सी झेंप हुई। जरा नरमी से बोलना था। क्यों उतना कड़ापन दिखाया ? कोई जानी-पहचानी और आत्मीय लगती हैं। कौन होंगी ?

"कौन....हैं.... जी ?"

"पहचानिये देखें। रचयित्री जी।"

"बाप रे, आप को यहाँ तक मालूम है कि मैं रचयित्री हूँ। ज़रूर आप मेरी परिचित हैं। कोई संदेह नहीं।

"हाँ....जी हाँ।"

मैं ने हँसते हुए पूछा "प्लीज़, ज़रा बताइये।"

बहुत साल पहले की आवाज़ को मैं पहचानने का प्रयास करने लगी।

"मैं....मैं....तेरी रचयित्री हूँ।"

हाय भगवान, उद्विग्नता में मेरे मुँह से बातें भी निकल नहीं रही थीं। वे मेरी प्रिय लेखिका हैं। इस साल पहले । जब मैं रचना-क्षेत्र में डग-मग कदम बढ़ा रही थी, वे बड़ी मशहूर थीं। मेरी पथ-निर्देशिका थीं। उन के प्रेम और सहयोग को मैं कैसे भूल सकती हूँ।

अचानक वीसा के पंख लगा कर अमेरिका उड़ गयीं। रचनाएँ और स्नेह बंधन सब को पूर्ण विराम लगा कर, सारा कार-बार मेरे जिम्मे सौंप कर, नदारद हो गयीं। फिर आज कई सालों बाद।

"कहाँ से ?"

"नक्षत्र-लोक से।"

"छत पर चढ़ कर देखूँ ?"

उस ओर से उन की हँसी।

"सच बताइये, कहाँ से ?"

अपने आवास फ़ेव स्टार होटल का नाम बता दिया।

"हाय, होटल में रहती हैं ?" मैं ने दुःख के साथ प्रश्न किया।

उधर से जवाब मिला। "हाँ यहीं हमारे नायक

प्रबंध मिल सकते हैं। घर, गृहस्थी में इतना आराम और इतनी राजसी ठाट कैसे मिल सकते हैं।

"आज हमारे घर भोजन के लिए आइये। भोजन और नयी ख़बरें।"

"नहीं, नहीं, इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। समय नहीं है। तुम यहीं पर आ जाओ।

"क्या आज ही ?"

"हाँ आज ही। कल बंगलौर जा रहे हैं। वे अपने मित्रों से मिलना चाहते हैं। बाद को पैरिस, उस के बाद अमेरिका।"

"तब तो, आज ही आ रही हूँ।"

"आज नहीं, अभी तुरन्त चली आ। आ रही हो

"हाँ अभी आ रही हूँ।"

"इंतज़ार करती रहूँगी।"

"बॉय" फ़ोन रख दिया।

मन में बड़ी उतावली भरी थी। श्रीमान् जी को सारा किस्सा सुना दिया। ऐसा लगा कि एक बारगी मेरी दस साल की उम्र घट गयी है। उन दिनों, जब मेरी आदी बच्चे, जिम्मेदारियाँ आदि कुछ नहीं थे।

वे मुझ से बड़ी, आदी-शुदा, एक बच्ची, पतिदेव इंजिनीर। वे खुद अंग्रेजी में प्राध्यापिका थीं। मैं रसायन शास्त्र की प्राध्यपिका। दोनों एक ही कालेज में काम करती थीं।

मैं उन से छोटी और कुँवारी होने के कारण मुझ पर विशेष प्रेम दिखाती थीं। प्यार-मुहब्बत से देखती थीं।

उन के पति को विलायत जाने का मौका मिलने से वे भी उचानक चली गयीं। पत्र व्यवहार तक बंद हो गया।

उस समय अपनी लिखी नही कविता पहले मुझे ही सुनाती थीं। आर्द्रता भरा वह कविता-सौरभ मेरे मन से दूर नहीं होता था।

"क्यों, आज तुम्हारा कार्यक्रम क्या है ?" श्रीमान्जी के पूछने में अपनी दुनिया में लौट आयी।

"सब कार्यक्रम रद्द कर दीजिये। मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ।"

"पर...वे मछलियाँ...

"डीप फ्रिज में डाल दीजिये।"

"भोजन ?"

"आप की मर्जी। होटल जाइये या " इतने में फ़ोन की आवाज़।

तुरन्त फ़ोन उठाया "हैलो।"

"क्या अब तक वहीं हो ?"

"यह लो अभी निकली।"

"कितनी देर में आओगी ?"

"चालीस पैंतालीस मिनट में।"

"शाबाश, रूम नंबर वाईस। याद रखो।" फ़ोन रख दिया।

श्रीमान् जी ने धीरे से पुछा "क्या मैं तुम्हें पहुँचा दूँ?"

"कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों आराम से बातें कर लेंगी। आप के आने से दिक्कत होगी।"

"कितने बजे आओगी ?"

"क्यों, बात क्या है ?"

"चाचा जी के यहाँ जाने की ....।"

"फ़ोन कर के बता दीजिये कि नहीं आ रहे हैं।"

झट पट तैयार हो कर निकल पड़ी। आटो में होटल पहुँच गयी।

वह फ़ैव स्टार होटल, मैं कभी नहीं गयी। बड़ा अमीराना ठाट।

पूछ-ताछ कर गयी और कालिंग बेल दबाया।

दरवाजा खुलने के पहले ही बड़ा उद्वेग। दरवाजा खुला।

सामने खड़ी व्यक्ति को पहचानने में मुझे थोड़ा

समय लगा।

"हौ डू यू डू" कहते हुए मुझे बाहों में समेट लिया।

मुझे साथ ले जा कर मुलायम सोफ़ पर बिठा दिया। मैं उन्हीं को देखती रही।

वे बदल गयीं। पूर्ण रूप से बदल गयी हैं।

उन के काली और लंबी चोटी थी। अब वे बाल सिर्फ़ कंधों तक है। न काले न सफ़ेद। सुतलियों जैसे रंग और उसी आकार में लटक रहे हैं।

पहले अच्छी मोटी ताजी सिनी अभिनेत्री सावित्री जैसी थीं। अब अंग्रेजी फ़िल्मों में भूमिका निभाने वाली प्रौढ़ महिला जैसी दुबली-पतली हैं।

चेहरे में कीमती सजावट, आँखों में मस्कार, ढीले गालों में रोज, ओंठों में लिपस्टिक, बिंदी ना पता, गले में पतली जंजीर, हीरे जड़ा लाकेट, कानों में रत्न जटित कर्ण फूल, ढीला और पूरे आस्तीनों का टीशर्ट, जीन्स पतलून यही उन की शानदार वेष भूषा थी। आवश्यकता से अधिक हाव-भाव प्रदर्शन के साथ बोलते उन को देख कर, मुझे लग रहा था कि मैं किसी विदेशी महिला को देख रही हूँ। मैं ने जिन्हें देखना चाहा, मैंने जिन की कल्पना की, ये, वे नहीं थीं।

स्त्रियाँ दस साल की उम्र बढ़ जाने के बाद अपने ज्ञान और अनुभव के कारण परिणत हो कर भव्य और भद्र महिलाओं के रूप में दिखाई देती हैं।

एक ज़माना था, जब ये कितनी आकर्षक थीं! लंबी चोटी, सूती साड़ियाँ, गोल बिंदी के साथ, देखते ही बड़ी बहन-सी, आत्मीय-सी लगती थीं। शायद रोम में रह, तो रोमन की तरह, अमेरिका में रहे, तो अमेरिका की तरह रहना चाहिये।

कहीं किसी कोने में आशा का दीपक टिमटमा रहा था। मैं ने पूछा "इस बीच में आप ने कुछ लिखा ?"

"यू मीन रैटिंग ?" दायें हाथ से अभिनय करते हुए पूछा।

"उन्हीं रचनाओं ने हम को आत्मीय बनाया।"

"हँ...हँ... इट इज लेबोरिअस प्रोसेस, डेम हेड्डेक।" नफ़रत के साथ जवाब दिया।

"दो दिन भोजन न करें, तो भी कोई तकलीफ़ नहीं। कविता पढ़े बिना चैन नहीं मिलता। लिखने का भाववेश आ जाये, तो उँगलियों ही कलम बन जाती हैं।" कहने वाली वह महिला और यह महिला क्या दोनों एक ही हैं?"

"तुम अब तक लिख रही हो ?"

मैं ने "हाँ" में सिर हिला दिया।

"क्या लोगी ? कूलड्रिंक, काफ़ी, टी ?" अचानक पूछा।

"चाय।"

फ़ोन उठा कर रूम सर्वर को आदेश दिया।

मैं उन्हीं को देखती रही। उन का अंग्रेजी बोलने का तर्ज़ ही बदल गया है। अंग्रेजी में लिटरेचर, स्टूडेंट होने की वजह से अंग्रेजी ही अधिक बोला करती थीं। पर अब उनकी अंग्रजी किसी दूसरे ढँग की मालूम होती थी।

"छी छी यहाँ के लोग अब तक कुछ नहीं बदले। वही स्टोन एज मनुष्यों से लगते हैं।" हाथ तेजी से हिला हिला कर बोल रही हैं। जब हाथ हिलते हैं, उन की हीरे जड़ी अँगूठियाँ दमक उठती हैं।

"रात को किसी के न्योते पर डिन्नर में गये। बुलपिट। लेडीस एक जगह और जेंट्स दूसरी जगह। केवल उन्हीं को हाट ड्रिंक्स। सारा मज़ा किरकिरा। मेरी समझ में नहीं आया कि वह कैसी गेट टु गेदर है ? औरतों के परदे नहीं हैं बस। हाय गाड, यह डामिनेशन कैसे सहन करती हैं ?" जोर से हँसती हुई पूछा।

मैं चुप रही।

"हाँ, देखो ; तुम ने अमेरिका के लिए क्यों ट्राई नहीं किया ?"

मैं ने सिर्फ़ हँस दिया।

"कितनी भी मेहनत करो । यहाँ क्या रखा है ? अमेरिका लांड़ आफ़ गोल्डन आपर्च्युनिटीस । अगर तुम आ सको, तो चौबीसों घंटे और तीन सौ पैंसठ दिन काम रहता है । यहाँ काम भी नहीं और कोई पहचान भी नहीं। पैसे भी नहीं । ऐ हेटिट ।"

"आप यहाँ काम करती हैं ?"

"हाँ कंप्यूटर प्रोग्रामर की हैसियत से ।"

ये जब कीट्स की कविता थीं, विद्यार्थी तादात्मिकता में सब भूल जाते थे । वह भव्य चित्र मेरी आँखों के सामने घूम गया । चिंता ने मुझे घेर लिया ।

रूम सर्वर ने ट्रे में फ्लास्क और प्याले ला कर चाय दे दी । चाय पीते-पीते पूछा "तुम्हारा मोबैल नंबर क्या है ?"

"मेरे मोबैल नहीं है ।"

"मोबैल के बिना कैसे रहती हो ?"

मैं हँस कर रह गयी ।

"एकबार ऐसी दुनिया में एक्सपोज होने के बाद यहाँ का पोजिशन देखने से बेहद खीज होती है । आफ्टर्ल एक छोटा सा लाइसेन्स चाहे, तो भी यहाँ प्राबलम है ।"

मैं चुप रही ।

"यहाँ सब कुछ घुटकियों में हो जाता है । वे समय का मूल्य जानते हैं । "करते हैं टाइम इज मनी ।" यहाँ तो हेल है । सड़के और ट्राफ़िक हारिबुल । यह डस्ट बाप रे बाप एनर्जी । क्या तुम्हें मालूम है ? वहाँ एक भी मक्खी या मच्छर नहीं । न धूल न कूड़ा कचरा । यहाँ होटल के कारिडार जैसे हैं वहाँ की सड़कें वैसी होती हैं।"

मैं ने सुनना बंद कर दिया । उन को कहीं से फ़ोन आया ।

"एक्सक्यूज मी" कहते हुए फ़ोन में बात कर के आयीं ।

"हाँ तुम कैसे आयी ?" मैं क्या जवाब देती ?

"यह क्या, अब तक फ़ोर वीलर भी नहीं खरीदा ? छी छी यहाँ फ़ोर वीलर खरीदना और उस को मेंटेन करना भी मुमकिन नहीं है । यहाँ फ़ोर वीलर के बिना एक मिनट भी चलता नहीं । मेरा अलग, हब्बी का अलग और पिंकी, वही मेरी बेटी का अलग ।"

"क्या पिंकी इतनी जल्दी कार चलाने लायक बन गयी ?" मैं ने अचरज के साथ पूछा ।

"ओ गाड़, वी ईज सो इंडिपेंडेंट । उस की दुनिया ही अलग । उस का फ्रेंड सर्किल अलग । यह और उस का कंप्यूटर चाटिंग, पार्टियाँ । मैं उस के कमरे में जाती हूँ, तो चुप हो जाती है । उस का कोई काम मुझे करने नहीं देती । उसी कलचर में बह पली है न । वही ब्राटप ।

मैं समझ गयी कि उन का लालन-पालन कैसा है ।

"कुछ दिन पहले हम ने एक घर बनवा लिया है । समझो, वह एक अचीयमेंट है । रियली इट ईज ब्यूटीफूल। पिंकी जिद कर के बैठ गयी स्विम्मिंगपूल ज़रूरी है ।" बेहद खुशी से हँसती जा रही हैं ।

वे उसी जोश में बोलती रहीं ।

उन की बातों के अनुकूल या प्रतिकूल अर्थ ढूँढने की कोशिश मैं ने नहीं की । केवल सुनते बैठ गयी ।

अमेरिका जा कर वे कैसा शानदार जीवन बिता रही हैं । यह कहने का ही उन का प्रयास था ।

इस बीच में रूम बोय, विज़िट-बुक में दस्तख़त कराने के लिए आया । उन्हों ने कंधे हिलाते हुए पूछा "क्या कलम है ?"

उस ने सिर हिला कर बता दिया कि नहीं है ।

वे उठीं अपने पर्स से कलम ले आयीं और दस्तख़त कर के दे दिया ।

फिर बताने लगीं कि उस कलम की कीमत भारतीय मुद्रा में बीस हजार रुपये से कम नहीं है ।

मैं आधा घंटा बैठ गयी ।

इस भावना से बोलीं कि "भारत में जीना नरक में जीने के बराबर है ।" मुझे बड़ा पछतावा हुआ । सब को

धता बता कर बड़ी जल्दबाजी से आयी। एक तरफ़ चिंता और दूसरी तरफ़ अपने आप पर गुस्सा।

बहुत धीरे-धीरे बड़े संकोच के साथ केवल एक ही प्रश्न पूछा, सीधे उन की आँखों में देखते हुए "यू आर हेपी ?"

उन के चेहरे में एक प्रकार की बेकली और बेसबी।

"हेपी समझें ....तो हेपी ही है।"

"अफ़कोर्स सम टैम्स ऐ मिस यू मिस यू आल। किसी किसी रात को याद आते रहते हैं। लिटरेचर, पोयट्री सब को मिस कर लिया। मूड़ी बन जाती हूँ। नींद ख़राब हो जाती है। सवेरे उठते ही बस, वही, यांत्रिक जीवन का चक्कर।

मैं उठ खड़ी हुई। उन का अंतरंग मैं समझ गयी।

ऐडिंटिटी क्रैसिस। अपने आप को खोने के बाद दुनिया को जीत कर भी क्या प्रयोजन ?

उन से छुट्टी ले ली।

यह कहती हुई कि "नीचे तक आऊँगी" वे मेरे साथ आयीं। दोनों लिफ़्ट के निकट आयीं, मैं ने बटन दबाया। लिफ़्ट रुक गया।

उस में वही रूम बोय था। हमें देखकर विनय के साथ जरा एक ओर हट गया। लिफ़्ट में जाते ही दरवाजे आप ही बंद हो गये।

रूम बोय ने कहा " आफ़ कीजिये मेडम।"

उन्हों ने इस शाने में उस की ओर देखा कि क्या बात है ?

उस ने मेरी ओर देखते हुए याचना के स्वर में कहा "मेडम, आटोग्राफ़ प्लीज।"

किताब और कलम मेरे हाथ में थमा दीं।

बेचारी उन का चेहरा फ़क पड गया।

उन के इस तिरस्कार के जवाब में कि यहाँ काम भी नहीं, पहचान भी नहीं, यहाँ कहती क्यों हो ? मैं ने उस रुम-बोय को आटोग्राफ़ दे दिया। मेरे मन का गुबार निकल गया।

SPACE DONATED BY :—



A

WELL

WISHER

—অন্তত তারা যারা খ্যাতি প্রতিষ্ঠার মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের মতাদর্শে অটুট থেকে নিঃশব্দে সাহিত্যকর্ম চালিয়ে যায়, তাদের ধনিষ্ঠ আন্দোলন যে তরঙ্গ তোলে তা প্রথমে যত ছোট বৃত্তই রচনা করুক মিলিয়ে যাবার আগে তা স্পর্শ করে যায়—এই কারণেই ছোট পত্রিকার কাছে আমাদের প্রত্যাশা থেকেই যায়। বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের অপ্রাচুর্য বিস্ময়কর। বহুল পত্রিকাগুলিতে অনুবাদের স্থান সংকুচিত হয়ে গেছে অনেকদিন থেকেই।

—প্রচার এবং আর্থিক সঙ্গতির অভাবে ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ ঘটাতে না পারলেও দীর্ঘ সময় ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে একটি লিটল ম্যাগাজিন অনুবাদে আত্মনিবেদিত হয়ে রয়েছে এ খবর অনেকেরই অজানা—এবং আনন্দের কথা এই পত্রিকার নীরব কর্মোদ্যোগ ১৯৮১ সালে 'আনন্দ' পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিল। সেন

—আশ্চর্য শহর কলকাতা। কলেজ স্ট্রীট পাড়া থেকে নিয়মিত বেরিয়ে যাচ্ছে ওই ত্রৈমাসিক (অনুবাদ পত্রিকা)।
—অথচ এক গ্রামে এক ছোট স্কুলের শিক্ষিকার প্রশ্ন ছিল আঞ্চলিক সাহিত্য সম্পর্কে।
তার সুন্দর জবাব এই অনুবাদ পত্রিকা— আনন্দবাজার

—পাঞ্জাবীদের সাহিত্য বাঙালীদের কাছে গ্রীক। বাঙালীদের সাহিত্য তামিলভাষীদের কাছে ল্যাটিন।—
অন্যান্য সাহিত্যে কি আছে সে বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল হব। এমনি করে ভারতের লোক এক সংস্কৃতির অধিকারী হবে। যে সংস্কৃতি আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি।—
আমি আশা করি সরকার এদিকে একটু দৃষ্টি দেবেন। প্রকাশনা ব্যয় আজকাল সাধারণের নাগালের বাইরে। এই অনুবাদ পত্রিকাটির আয়ু নির্ভর করছে সরকারী অনুদানের ওপরে।— অন্নদাশঙ্কর রায়

—গুজরাতের সুসাহিত্যিক সুরেশ জোশী 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন—
এটাই একমাত্র পত্রিকা যা গুজরাটী সাহিত্যকে বাংলায় অনুবাদ করেছে, এই অনুবাদ পত্রিকা দীর্ঘজীবি হোক।—
সুরেশ জোশী

Best Wishes :

Karamjeet Singh & Co.

শিবনারায়ণ রায় / সিলভিয়া প্লাথের কবিতা ঃ শঙ্খ ঘোষ / আমেরিকার কবিতা ঃ শিবরাম হালদার / সুধীন্দ্রনাথের চিঠি
অতুল দত্ত / দাদুর কবিতা ঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত / গুন্টার আইস-এর নাটক ঃ স্বরাজ সেনগুপ্ত / বাংলোচ লোকগীতি
কমলেশ চক্রবর্তী / সেনেগালের কবিতা ঃ নবনীতা দেবসেন / পাকিস্তানের কবিতা
জ্যোতির্ময় দাশ / হিমাচল প্রদেশের কবিতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / কিউবার কবিতা
সুনীলবরণ রায় / আলবেয়ার কামুর গল্প

এবা দে / ফরাসি কবিতা
শাঙ্খশীল কর্মী / (দুটি) ডোগরী কবিতা
সলিলকান্তি দাশগুপ্ত / ইংরেজী কবিতা
অরুন্ধতী ভট্টাচার্য / স্প্যানিশ গল্প
ননী ভৌমিক / হিন্দী গল্প

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / গ্রিক কবিতা
অমলতারুণ শিকদার / নেপালী কবিতা
সোমক দাস / আমেরিকার কবিতা
অনুরাধা মহাপাত্র / পাঞ্জাবী কবিতা
সীমন্তিনী গুহ / গুজরাটী গল্প

সমকাল প্রবাহ

তিতাস মিত্র / গোয়ার গল্প
দিলীপ ঘোষ / এডওয়ার্ড সঈদের লেখা

রবিন পাল / উর্দুগজলের কবিতা
তরুণ দীর্ঘাঙ্গী / উর্দু কবিতা
অনসূয়া মল্লিক / তামিল কবিতা
কমরেশ সেন / অনুগল্প (নেটি ভাষা)
বেলা বসু / অসমীয়া গল্প

সুতনুকা সোম / মলয়ালম কবিতা
বর্ষা ভৌমিক / ওড়িয়া কবিতা
মাধুরী সিংহ / মারাঠী গল্প
গৌতম সেনগুপ্ত / গুজরাটী গল্প
বিজয়া ঘোষাল / লেপচা সংস্কৃতি

অমিতাভ গুহ / কবীর-এর কবিতার রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজী থেকে অনুবাদ

With best Compliments of :—



M/s. MOKALBARI KANOI TEA ESTATE PVT. LTD.

13/2 BALLYGUNGE PARK ROAD

CALCUTTA-19

ANUBAD PATRIKA :

A BENGALI HINDI QUARTERLY JOURNAL OF TRANSLATION

October-January : 2002—2003

অনুবাদ পত্রিকা

শরৎ-হেমন্ত সংখ্যা : ২০০২

সম্পাদক : বৈশম্পায়ন ঘোষাল
যুগ্ম সম্পাদক : অনুরাধা মহাপাত্র
সহ সম্পাদক : বিতস্তা ঘোষাল

মুখ্য উপদেষ্টা : স্বরাজ সেনগুপ্ত

৫৪ তম নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে (১৯৮১) অভিনন্দিত এবং 'আনন্দপুরস্কার', আন্তর্জাতিক 'মাতা কুসুমকুমারী' পুরস্কারে সম্মানিত।

Editor—Baishampayan Ghoshal
Joint Editor—Anuradha Mahapatra
Asst. Editor—Bitasta Ghoshal

Chief Adviser—Swaraj Sengupta

Registration No. N 27088/75
Anubad Patrika

Otober-January—2002—03
Rs. 40·00

'ভাষা সংসদ' এর পক্ষে

প্রচ্ছদ-শিল্পী : হিরণ মিত্র

সম্পাদক, প্রকাশক : কৈলাসপতি মোদক
ভাষাসংসদ প্রকাশন, ৮নং, নটবর দত্ত রো, কলকাতা-৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত।
অনুবাদ পত্রিকা, ৩ শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন—২১১-২১৭৮ (অফিস), ৫৫৭-৬৬৯০, ৫৪৬-১৩০৮
219-2178 (Office), 557-6690, (Resi) 546-1308

সম্পাদকীয়

'অনুবাদ পত্রিকা'র ২৮ বছর চলছে। 'শরৎ-হেমন্ত সংখ্যা' প্রকাশিত হল। ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয়ের আলোতে আমরা পথ হাঁটছি। এখনও ভারতীয় ও বিশ্বসাহিত্যের অনেক জনপদ সাহিত্য, শিল্প ও সাধনার বিশিষ্ট দিকগুলি আমাদের কাছে অনালোকিত। সপ্তসিন্ধু, দশদিগন্তের স্বপ্ন আমাদের চোখে। ইওরোপীয় সাহিত্যের পাশাপাশি হয়তো অনেকবেশি নব মানবতার সূর্যোদয়ে অগ্রসরমান ল্যাটিন আফ্রিকান, এশিয়ান সাহিত্য। অনেক বেশি প্রখর জীবন দর্শনে প্রশ্নার্ত এডওয়ার্ড সঈদ, ইমরে কার্তেজ প্রমুখ লেখক।

ভারতীয় ভাষার সাহিত্যও এখন বদলে গেছে। একজন বাংলাভাষী সাহিত্যরসিকের আজ আর অজানা নেই অরুন্ধতী রায়ের লেখা, ইসমৎ চুগতাই অথবা ভীষ্ম সাহানী, ভৈকম মুহম্মদ বশীর, আয়াপ্পা পানিক্কর, অনন্ত মূর্তি, আর. কে. নারায়ণ, আলি সর্দার জাফরী, জি. নাগরাজ, সীতাকান্ত মহাপাত্র, অবতার সিং সান্ধু, মনোজ দাস, গোপীনাথ মহান্তি, ইন্দিরা গোস্বামী, আবদুল মালিক, হোমেন বরগোহাঞি, উদয়নারায়ণ সিং, কে জি. শঙ্কর পিল্লে, সুরেশ যোশী, ইন্দিরা পার্থসারথী, বাসুইয়া, এ কে রামানুজম, গোপীচাঁদ, বোম্বানা বিশ্বনাথন, সাদাত হোসেন মান্টো, কৃষণ চন্দর, অমৃতা প্রীতম, দলীপ চিত্রে, গিরিধর রাঠে, সচ্চিদানন্দন, সিদ্ধেশ, কদমনিতন সুব্রহ্মণ্যম ভারতী প্রমুখের সাহিত্যের বিচিত্র নদীধারা। আজ আর বাংলাভাষা একক নয়—লেপচা, খাসি, কুকী, গারো, ওঁরাওঁ, মুন্ডা, শবর, সাঁওতাল আর হিমালয় থেকে কন্যাকুমারীকা, গঙ্গা-যমুনা-কাবেরী-পূর্ণা-তিস্তার মহাসম্মেলন ঘটেছে এই বঙ্গোপসাগর ঘেরা বঙ্গীপ বাংলায়। পাকিস্তানের সাহিত্য, বালোচভাষার লেখার আস্বাদনও সমস্ত সীমা পার করে আমাদের হৃদয়ের তটে আছড়ে পড়েছে—মানবসভ্যতা, সংস্কৃতি, ভালোবাসা, মানবতার কোনো সীমা নেই—আমরা তাই নবমানবতার পথিক। আমরা অন্বিষ্ট গণপ্রজাতন্ত্রী আর এক মানবজমিন বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রতি। সামনের সংখ্যাগুলিতে আমরা বাংলাদেশের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দেব। মার্কেজের লেখার পাশাপাশি গুজরাটী, গোয়ানিজ লেখার আস্বাদনও করবো এই সংখ্যায়। সুফী সাধক কবিয়েরও আমাদের আজ জরুরী প্রয়োজন—দেশের এই বিচ্ছিন্নতাকামী দাঙ্গা, মানবতাহত্যার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে—ঘরে-বাইরে-সমাজে দেশে এই সামূহিক কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নতুন করে চিন্তা, সৃষ্টি, ভালোবাসার ভাবসমন্বয়ই আজ আমাদের নতুন আকাশ ও নতুন মাটি পৃথিবীর মুক্ত সকালে পৌঁছে দিতে পারে—অন্ততঃ অনুবাদপত্রিকা তারই পথিক।

'অনুবাদ পত্রিকা' হার্দ্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছে সমস্ত সহৃদয় বন্ধু, কবি লেখক, পাঠক ও বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি, যাঁদের ভালোবাসা ছাড়া এই পত্রিকা প্রকাশ করা দুরূহ হয়ে পড়তো।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুদীর্ঘ সময় ভাষা, সাহিত্য ও নতুন মানবতা, বিবেকের ইতিহাস তৈরি করে শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় প্রয়াত হলেন। 'পথে প্রবাসে'-র অন্নদাশঙ্করকে বাঙালি সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ মাত্রই স্মরণে রেখেছেন। বাঙালি পাঠক পড়েছেন তাঁর 'রত্ন ও শ্রীমতী', 'ক্রান্তদর্শী' ও 'সত্যা-সত্য' উপন্যাস। বাংলা ভাষার স্মরণীয় ছড়ার জগৎ আলোকিত হয়ে আছে তাঁর ছড়ার মাধুর্য, বুদ্ধিদীপ্তি, সরস হৃদয়বত্তা ও প্রাণবন্ত উচ্চারনের সহজ ছন্দে—'তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো'—সারা বাংলার আপামর মানুষের প্রাণের সম্পদ।

'অনুবাদ পত্রিকা' তাঁকে স্মরণ করছে পরম শ্রদ্ধাভরে। প্রায় ২৮ বছর আগে 'অনুবাদ পত্রিকার' জন্ম লগ্নে, প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার উদ্বোধন করেছিলেন কলেজস্ট্রীটে অবস্থিত কফিহাউস-এর ওপরতলায় ঐতিহাসিক র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হলে স্মরণীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীঅন্নদা-শঙ্কর রায় ও তাঁর পত্নী শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী লীলা রায়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আরও কয়েকজন প্রখ্যাত মনীষী ও পন্ডিত সুধীজন। সেদিনের সন্ধ্যা আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'অনুবাদ পত্রিকা' সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাঁর কথায় "পাঞ্জাবীদের সাহিত্য বাঙালিদের কাছে গ্রীক। বাঙালিদের সাহিত্য তামিল ভাষীদের কাছে ল্যাটিন। অন্যান্য সাহিত্যে কি আছে সে বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল হব। এমনি করে ভারতের লোক এক সংস্কৃতির অধিকারী হবে। যে সংস্কৃতি আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি।' তাঁর শিল্পের আলোর কণাধারায় স্নাত হয়ে আমরা তাঁকে গভীর মননে স্মরণে রাখবো চিরকাল।

ANUBAD PATRIKA

From Editorial Desk

A Homage to Annadashankar Ray

A Letter of Poet Sudhindranath Datta

POEMS

Sylvia Plath. Ungaretti : Sibnarayan Ray

Allen Dick : Shankha Ghosh

Poems of Dadu : Atul Datta

Senegalese Poems : Kamalesh Chakraborty

Pakistani Poems : Nabanita Debsen

Poems of Himachal Pradesh : Jyotirmoy Das

Poems of Kuba : Manabendra Bandyopadhaya

French Poem : Esha Dey

Two Dogri Poems : Santadip Bakshi

A Tamil Poem : Anasua Mallik

An Urdu Poem : Tarun Dirghanig

A Greek Poem : Biswanath Banerjee

An English Poem : Salilkanti Dasgupta

An Oriya Poem Barsha Bhoumik

Bengali Version of Kabir's Doha Translated by Tagore : Amitava Gupta

American Poems : Somak Das

A Punjabi Poem : Anuradha Mahapatra

Poems of Uruguay : Rabin Pal

A Malayalam Poem : Sutanuka Som

A Nepali Poem : Analtaran Sikdar

STORY

Albert Camus : Sunil Baran Roy

Marqueiz : Arundhati Bhattacharya

Goanese Story : Titas Mitra

Hindi Story : Noni Sur

Nine Short Tales Kamalesh Sen

Spanish Story : Goutam Sengupta

Assamese Story : Bela Basu

Marathi Story : Madhuri Sinha

Gujrati Story : Simantini Gupta

ESSAY

Lyrics of Baluchistan : Swaraj Sengupta

Edward Said : Dilip Ghosh

DRAMA

Guntar Aiech : Alokranjan Dasgupta

Cultural Reflection :

Nobel Prize winner Imre Carteiz

Lepcha Language and Culture :

Bitasta Ghosal

Cover : Hiran Mitra and others

হাঙ্গেরিয়ান ইমরে কার্তেজ

Nobel Prize Winner IMRE CARTEIZ

২০০২-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন হাঙ্গেরির কথাশিল্পী ইমরে কার্তেজ (জন্ম ১৯২৯)। নোবেল সোসাইটির প্রশস্তিবচনে বলা হয়েছে তাঁকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হল "for writing that upholds the fragile expereince of the individual against the barbaric arbitrariness of history.

কার্তেজ-এর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, মানুষ ও মনুষ্যত্বের বিরোধী বর্তমান পৃথিবীর নানা অশুভ শক্তির দুশ্চিন্তের রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই সব অন্ধকারাচ্ছন্ন শক্তির আঘাতে আঘাতে ব্যক্তি মানুষ দিনে দিনে কি ভাবে তার স্বাধিকার ও স্বাধীনতা হারিয়ে সত্যার্থে সর্বহারা হয়ে পড়ছে সেই অকরুণ করুণ পরিণাম আবার এই পরিণতির প্রতিরোধে ব্যক্তির বুদ্ধি, মেধা ও বিবেকের ভূমিকা কার্তেজ-সাহিত্যে প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর অধিকাংশ চরিত্রই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এই ভূমিকা পালনে শান্ত অবিচল সংগ্রামে।

অনুবাদ পত্রিকা'র এই সংখ্যাটির ছাপার কাজ যখন শেষের দিকে তখন ইমরে কার্তেজ-এর নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ আমরা পেয়েছি। তাঁর সাহিত্য নিয়ে দীর্ঘ কোনো লেখা এই সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করার সুযোগ পেলাম না। পরবর্তী কোনো সংখ্যায় নিশ্চয় একটি দীর্ঘ বিচারধর্মী আলোচনা আমরা প্রকাশ করব।

'অনুবাদ পত্রিকা' ইমরে কার্তেজ-কে সশ্রদ্ধ সহৃদয় অভিনন্দন জানাচ্ছে।

জিউসেপ্পে উনগারেত্তি

অনুবাদ ঃ শিবনারায়ণ রায়

১॥ পাহারা

সারারাত
বিক্ষিপ্ত হয়েছি পড়ে
পাশে নিয়ে
নিহত বন্ধুর লাশ
তার পাটি দাঁত
পূর্ণিমার দিকে মেলা
তার দুই হাতের খিঁচুনি
আমার নৈঃশব্দ্য ছোঁয়া
আমি চিঠি লিখি
ভালবাসা ভরে

জীবনের দিকে
এমন আকণ্ঠবোধ
কখনো করিনি ॥

বিকল্প ২॥

নজরদারি

বন্ধুর নিহত লাশ নিয়ে
সারারাত হুমড়ি খেয়ে আছি
পাটি দাঁত পূর্ণিমার মেলা
মরা দুই হাতের খিঁচুনি
আমার নৈঃশব্দ্যে সন্তারিত
আমি
রাশি রাশি প্রেমপত্র লিখি

জীবনের টান
এমন বুঝিনি কোনো দিন

Giuseppe Ungaretti-র কবিতা 'Veglia-র দুটি সম্ভাব্য বাংলা রূপান্তর ॥

পার্সিফোনির দুই বোন

সিলভিয়া প্ল্যাথ
অনুবাদ : শিবনারায়ণ রায়

তারা দুটি মেয়ে। ঘরের ভিতরে
বসে একজন, বাইরে অপরা
সারা দিনমান আলো আর ছায়া
খেলাচ্ছে গায় ভিতরে তাদের ॥

কাঠের দেয়াল ঘরের আঁধারে
গলনাঙ্কে কষছে প্রথমা
সমাধান যত কঠিন আঁকের ॥

হিসেব রাখছে শূন্যে টিক্‌টিক্‌
এক একটি আঁক কষা হয়ে গেলে ॥

কষ্যা সাধনে মগ্ন মেয়ের
টেরা চোখ হয় ইঁদুর-চালাক
শীর্ণ শরীর, ফ্যাকাশে চামড়া ॥

অপরা মাটির মতন তামাটে
আপিং ফুলের ক্ষেতে শুয়ে শোনে

দীন হাওয়ায় টিক্‌ টিক্‌ ধ্বনি
ঝড়ে যেন রেণু কনকচাঁপ ॥

দেখে সূর্যের তীক্ষ্ণ ফলায়
পড়ছে ফুলের রক্ত পাপড়ি
খুলেছে তাদের রেশমী আগুন ॥

কন্যা তখন সবুজ বেদিতে
শয়নকক্ষে সে সূর্যের বধূ
উর্বর তনু দ্রুত বীজবতী
তুলালিচায় প্রসবে পুত্র
রাজটীকা ধারী ॥

এবং অপরা
কঙ্কালসার রেখা বিরস তিক্ত
অকৃতযোনি চলেছে কবরে
কীটস্বামী সেথা শয়নসঙ্গী।

নারী হওয়া তার ভাগ্যে ঘটেনি।

Sylvea Plath : Collected Poems
Poem 13, "Two Sisters of Persephone. 1950

ডিক অ্যালেন

কবিতা পড়ুয়ার স্বার্থপরতা

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

মাঝে মাঝে মনে হয় আমেরিকায় আমিই একমাত্র লোক
যে কবিতা পড়ে
আর যে শহরগুলিতে হেঁটে বেড়ায় রাতবিরেতে,
নানা নামে ডাকে চাঁদকে।

আর আমি ঠিকই জানি যে আমিই একমাত্র, যার
বুকশেলফওয়ালা একটা বাড়ি আছে,
সমুদ্রের ধার দিয়ে লম্বা পথের পাড়িতে
কাজে যাবার সময়ে যার গাড়িতে সিডিপ্লেয়ার থাকে না।

গোটা আমেরিকায় আর কেউই আমার মতো
আক্ষরিক বলতে পারে না উইলিয়াম মেরেডিথ
হ্যাম আর ডিম খেতে খেতে আওড়াতে পারে না লেদোল আর লেবেটফ,
বিছানার পাশে রাখে না 'এক্সপ্রেস' বা 'অ্যাস্টওয়ার্ডস'।

মাঝে মাঝে মনে হয় জীবিত আর কোনো মানুষই
কবিতা পড়ে আমার মতো এমন পালটে যায় না,
'সানডে মর্নিং' নিয়ে কেউই আমার মতো এত লড়াই করেনি,
আর শপথ নেয়নি পাউন্ডের মতো কঠিনদের ভালোবাসবার।

আর কেউই আয়ওয়ার ওপরে উড়তে দেখেনি
আলোর পোকা, কিংবা দেখেনি কীভাবে
একটি নারীর হাত জল থেকে তুলে আনে সাতরঙা মাছ,
আর মিনেসোটার খামার বাড়িতে কীভাবে ঝরে পড়ে তুষার।

এই দেশ জুড়ে আমিই একমাত্র মানুষ
আলোচিত সহ কইপত্র কিনে যে বেপরোয়া
টাকা ওড়ায়, কাউন্টারের মেয়েদের প্রশান্তিভরা লম্বা চাউনির
স্বাদ নেয় তারিয়ে তারিয়ে।

আমেরিকার কীভাবেই-বা আর কেউ জানতে পারে
জানলায়-মেলে-দেওয়া কাপড়জামা কেন হাসে,
আর গ্রামের স্বাদ কেমন, আর গাড়ি ভেঙে পড়লে
কেমন লাগে—কিংবা কোনো জলযান ?

মনে হয় আমিই একমাত্র লোক যে একই নিশ্বাসে
বলে পশুলোম আর চুনাপাথরের কথা,
যার জন্য অ্যান স্যাক্সটন ডুব দেয় গ্রিমের লেখায়,
সপ্তাহান্তে অতিথিদের হাইকু না শুনিয়ে যে থাকতে পারে না।

গোটা আমেরিকায় এই একমাত্র লোক, যে বেঁচে থাকে
রাজনীতির চেয়ে অন্যো অন্যকার কিছু নিয়ে,
মার্জিনে যে মন্তব্য লিখে রাখে, পৃষ্ঠা সংখ্যা চিহ্নিত করে রাখে,
গোটা আমেরিকায়, আমিই একমাত্র মানুষ।

ইংরেজি থেকে

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চিঠি—এম. এন. রায়কে

অনুবাদ : নিরঞ্জন হালদার

সুইট-৬
৬, রাসেল স্ট্রীট
কলকাতা-১ অক্টোবর, ১৯৪৪

প্রিয় মিঃ রায়,

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়[১] এইমাত্র চলে গেলেন। আমার মনে হচ্ছে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যাপারে তিনি এখনও পর্যন্ত কোনো ভাল প্রেসকে মার্কসিয়ান ওরে ছাপানোর জন্য রাজী করাতে পারেননি। মনে হচ্ছে, এখানকার প্রতিটি প্রেসে এখন কাজের চাপ খুব বেশী, সেজন্য আগামী ছয় মাসের মধ্যে ছেপে দিতে হবে, এমন অর্ডার তারা প্রত্যাখ্যান করছে।

আমার ধারণা শ্রীমতী কল্যাণী সেনকে এখন কোনো কাজের জন্য পাওয়া যাবে না। তিনি সদ্য এক শিশুর মা হয়েছেন, এটাই একমাত্র কারণ নয়, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত এবং ডাক্তারেরা তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। সেজন্য আগামী কয়েক মাস তিনি একেবারেই চলাফেরা করতে পারবেন না। বিকল্প হিসাবে তিনি যাঁর কথা জেনেছেন, তিনি হলেন এক তরুণী এবং পুরোপুরি অনভিজ্ঞ এবং পত্রিকা ছাপানোর নানাধরনের কাজ করতে অনিচ্ছুক। যেমন, সম্ভাব্য লেখকদের নিকট থেকে লেখা আদায়ের জন্য তাগাদা দেওয়া, প্রেসকে খোঁচানো, প্রুফ সংগ্রহ করা, সেগুলি অন্যদের দেওয়া, ইত্যাদি।

এই পরিস্থিতিতে আমি বুঝতে পারছি না, এই বছরের মধ্যে ত্রৈমাসিকটি কী ভাবে ছাপিয়ে বেরুবে। তবে বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় বা আমি যদি ছাপানো ও পত্রিকার সংগঠনের দায়িত্ব নিতে পারি, তাহলে পত্রিকাটি এই বছরের মধ্যে বের হতে পারে। আমি জানতে পারলাম, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো সময় দিতে পারবেন না। আমিও আপনাকে প্রথম জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, আমি নিজে ঐ ধরনের দায়িত্ব নিতে অক্ষম। পত্রিকাটি যদি আপনি সম্পাদনা করেন এবং কোনো পক্ষ বাস্তি সবদিক থেকে পরিচালনার দায়িত্ব নেন, তা হলে আমি সাধ্য মতো সাহায্য করতে রাজী আছি। কিন্তু আমি কোনো অবস্থাতেই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে বা পত্রিকার ম্যানেজার হতে রাজী হতে পারব না। দুটো বিকল্পের একটা আমার ঘাড়ে চাপানো শোভন হবে না।

পাঁচ বছর যাবৎ একটি ত্রৈমাসিক চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, পত্রিকার পরিচালন ব্যবস্থার জন্য অনেক বেশী সময় ও শ্রম দিতে হয়, আমার হাতে এখন অত বেশী সময় নেই। পত্রিকাটির জন্য একটি নিয়মিত অফিস চাই। যেখানে একজন বুদ্ধিমান কার্যালিক পূর্ণ সময়ের জন্য কাজ করবেন এবং সারা দিন কাজ করার মতো একজন সৎ ও সক্রিয় পিওন থাকবে। এক্ষেত্রে সম্পাদক যেহেতু দূরে থাকবেন, সেহেতু কাজের জন্য অনেক বেশী শ্রম ও উদ্যোগের প্রয়োজন হবে।

পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে আপনি মার্কসিয়ান ওরের পথ দেখাতে পারেন।

আমার লক্ষ্যহীন বাক্য এখানে ওখানে ছাপ রাখবে মাত্র। কিন্তু আমার লক্ষ্যহীন ক্রমণ এবং উদ্দেশ্যমূলক লক্ষ্য এক ধরনের ব্যাপার ভাল করাটা হবে নির্ভেজাল অসততা। যাইহোক, আমি আমার আগের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভবিষ্যতেও আপনার সম্পাদকীয় পরিশ্রম কিছুটা লাঘব করতে রাজী আছি। যেমন, আপনার জন্য কিছু লেখা সংগ্রহ করে

সেগুলি পড়া. দরকার হলে আপনার চূড়ান্ত নির্বাচনের আগে লেখাগুলির প্রাথমিক নির্বাচন. মধ্যে মধ্যে প্রুফ সংশোধন এবং সময় পেলে পত্রিকার জন্য লিখতেও পারি। এর বেশী প্রতিশ্রুতি দিলে জরুরী পরিস্থিতিতে আপনাকে বিপদে ফেলা হবে। (let you down in an emergency)

পাঁচ বছর আগে আমার সঙ্গে যত লোকের যোগাযোগ ছিল, এখন আর তা নেই। প্রথম সংখ্যা যবেই বের হোক না কেন, আমি এ পর্যন্ত সুশীল[৩] ও সাইপ্রাস রাকডেবের[৪] কাছ থেকে দুটি বড় লেখার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। আগামীকাল এক বিমান চালক তাঁর কয়েকটি বই নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। যদি তাঁর বই আকর্ষণীয় হয়, তাহলে তাঁর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করব। বই সত্যিই দুষ্প্রাপ্য এবং আমি এখনও পর্যন্ত কোনো পুরুষ সমালোচনা পাইনি।

আপনি ইতিমধ্যে কটা লেখা পেয়েছেন ? অন্ততঃপক্ষে আপনাকে প্রথম দুটি সংখ্যার মান উঁচু রাখতে হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুত লেখার তালিকা (অথবা যাঁরা লিখবেন দেখে মনে হয় না লেখাগুলি উঁচু মানের হবে। আমার মনে হয় না। আপনি প্রথম সংখ্যার জন্য কোল[৫], লাস্কি[৬] প্রাইসঙ্কইনটিহ্যাম[৭], গ্রিন্টলে[৮] প্রমুখের লেখা পাবেন এবং রেড্ডী[৯], এইচ-সি-মুখার্জি[১০] এবং ত্রিপুরারী চক্রবর্তীর লেখা পরিতৃপ্ত হওয়ার মতো বুদ্ধিদীপ্ত হবে বা উন্নাসিকমণ্ডলী আকর্ষণ রাখতে পারবে ? আমরা আমাদের পত্রিকার প্রচারিত ঘোষণাপত্রে বিতর্কহীন রাজনৈতিক আলোচনা ছাপানোর প্রস্তাব করেছিলাম। অধ্যাপক ওয়াদিয়া[১১], আম্বেদকর[১২], জিন্না[১৩] অথবা সাভারকর[১৪] কি পত্রিকার উদ্দেশ্য অমান্য করার প্রবণতা দেখাবেন না ?

আমরা এই মুহূর্তে যে-সব লেখা পেয়েছি, সে-সব আমরা প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারি না। বিশেষত এই কারণে যে, আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথম সংখ্যা যেন নানা ধরনের রুচিসম্পন্ন মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে। মানের দিক থেকে প্রথম সংখ্যা প্রথম শ্রেণীর হওয়া দরকার। নইলে, আপনার মত প্রকাশের জন্য যখন অজস্র পত্রিকা আছে, তখন আর একটি বাড়তি ত্রৈমাসিকে কী দরকার ? পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যার লেখাগুলিও সুনির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। আমার মনে হয়, এই পরিস্থিতিতে পত্রিকা প্রকাশের আগে সমস্ত লেখাগুলি নিয়ে আমাদের একত্রে বসা খুবই জরুরী।

ব্যক্তিগত বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। রাজেশ্বরীর[১৫] স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, তবে ধীরে ধীরে। রাজেশ্বরী এখন দার্জিলিং-এ। একটি পুলিশ কেসে আমার সাক্ষ্য শেষ হলেই আমি ওখানে চলে যাব। সরকারী কর্মচারী[১৭] হিসাবে আমি ঐ কেসের প্রধান সাক্ষী। আমাদের পরিচিত বন্ধুরা ভাল আছেন। আমিও ভাল আছি। কলকাতা অঞ্চলের মতোই ভীষণরকম নিরানন্দময় এবং ডিসেম্বর মাসে আপনাদের কলকাতায় আসার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনি ও এলেন[১৮] কেমন আছেন ? আপনাদের দুজনকে আমার ভালবাসা। আপনাদের

সুশীল

পুনশ্চঃ শিঙ্কলকেকে[১৯] ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার আদেশ হয়েছে। কারণ এই আবহাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না এবং ভারতীয়দের সঙ্গে সে খুব ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। একথা দ্বিতীয় কারণটি প্রধান হলেও তা কখনও প্রকাশ করা হয়নি।

পত্র-পরিচয়

১ বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। এম এন. রায়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থায় কাজ করেছেন।

২. কল্যাণী সেন (১৯১১-২০০২) পরবর্তীকালে কল্যাণী কার্লেকার হিসাবে পরিচিতা। শিক্ষাবিদ, লেখিকা, পত্রিকা-

সম্পাদক, রাজনৈতিক কর্মী, পরে সমাজের দরিদ্র অংশের উন্নয়নে সক্রিয়। ১৯৩৫ সালে অধ্যাপনার কাজ শুরু, ১৯৬১ সালে অবসর গ্রহণ। নারীর সমানাধিকারের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি তিরিশ দশকে বোন নলিনী দলের সঙ্গে "মেয়েদের কথা" পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এম এন রায়ের সহকর্মী হিসাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ। ১৯৭২ সালে ক্যালকাটা সোশাল প্রোজেক্ট গঠন করে দক্ষিণ কলকাতার বস্তিতে ও ধাপায় গরিবদের মধ্যে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জার্মান লেখক গুন্টারগ্রাস তাঁর "দশুজার ক্রিড কার্টো" বইটি কল্যাণী কার্লেকার, শ্রী জি-ডি কার্লেকার ও ক্যালকাটা সোশাল প্রোজেক্টকে উৎসর্গ করেছেন।

৩ সুশীল দে—আই-সি-এস। তিনি সিকান্দার চৌধুরী ছদ্মনামে মার্কসিয়ান ওয়েতে লিখতেন।

৪ সাইপ্রাস ব্ল্যাকডেবের পরিচয় জানা যায়নি। তিনি কোনো লেখা দেননি।

৫ কোল—জি-ডি-এইচ কোল (১৮৮৯-১৯৫৯ —ইংরেজ শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও লেখক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সোশাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল থিয়োরির অধ্যাপক। যৌবনে সমাজতন্ত্রী হন, শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন, ফেবিয়ান সোসাইটির চেয়ারম্যান, কুড়ি বছরের বেশী বামপন্থী সাপ্তাহিক নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার ডিরেক্টর। তাঁর বইগুলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে. An Introduction to trade unionism (1918), Out of work : An Introduction to the study of unemployment (1923) History of Socialist thought, (1953-1960) স্ত্রী মর্গারেট কোলের সঙ্গে ৪০টির বেশী রহস্য উপন্যাস লিখেছেন।

৬ লাস্কি—অধ্যাপক হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কি (১৮৯৩-১৯৫০)। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২০ সাল থেকে আমৃত্যু লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ফেবিয়ান সোসাইটির কর্ম-সমিতির সদস্য (১৯২২-২৬ ব্রিটিশ শ্রমিক দলের চেয়ারম্যান ১৯৩৫-৪৬ থাকার সময়ে তিনি ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য তাঁর দলীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর "গ্রামার অব পলিটিকস" নতুন প্রজন্মের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করে। কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোর শতবর্ষে অধ্যাপক লাস্কির কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোর ১০০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসিয়ান ওয়ের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় অধ্যাপক লাস্কির Faith, Reason and Civilisation বইটির সমালোচনা ছাপা হয়।

৭ প্রাইসঙ উইনটিং হ্যাম—পরিচয় জানা যায়নি।

৮ প্রিস্টলে—জে-বি-প্রিস্টলে (১৮৯৮—১৯৮৪) ইংরেজ লেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার। ৩০টি উপন্যাস ও ৩০টি নাটক লিখেছেন। শ্রমিক পরিবারের সন্তান। মার্কসবাদ-বিরোধী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। ১৯৫৭ সালের ২ নভেম্বর নিউ স্টেটসম্যান-এ পারমাণবিক বোমার বিরুদ্ধে লেখা ক্যাম্পেন ফর নিউক্লিয়ার ডিসআর্মামেন্ট (CND) সংগঠনের জন্ম দেন। তিনি ১৯৭৭ সালে 'নাইট' ও লর্ড খেতাব নিতে অস্বীকার করেন। আর্ট সম্বন্ধে তিনি লেখেন, the state exists for art, not art for the state.

৯ ডঃ সি-আর রেড্ডী অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর লেখা At Random মার্কসিয়ান ওয়ের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

১০ এইচ-সি-মুখার্জি—হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। স্বাধীন ভারতে গণ-পরিষদের সদস্য হন। পরে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় রাজ্যপাল, যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার জন্য সক্রিয় ছিলেন। তাঁর সমস্ত অর্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে যান।

১১ অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। পরে অনুশীলনের প্রজা

সমাজতন্ত্রী দলের প্রার্থী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১২ অধ্যাপক ওয়াদিয়া—বোম্বের একজন সিনেমা প্রযোজক।

১৩. আম্বেদকর। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর সমকালীন রাজনীতিকদের মধ্যে সবচেয়ে পণ্ডিত ছিলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস থেকে দুটি পি এইচ ডির অধিকারী। লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়া ছাড়া জার্মানিতে উচ্চতর অর্থনীতি নিয়ে চর্চা করেছেন। অস্পৃশ্য মাহার বংশে জন্ম, দলিতদের মুক্তির পথ-প্রদর্শক, স্বাধীন ভারতে আইনমন্ত্রী ও ভারতের সংবিধান রচয়িতাদের কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

১৪ জিন্না—মহম্মদ আলি জিন্না (১৮৭৬—১৯৪৮)। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এবং পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল। ১৯২১ সালে খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালে লাহোরে 'পাকিস্তান' প্রস্তাব পাশ হয় এবং ৪৬ সালের দাঙ্গার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়।

১৫. সাভারকর—বীর বিনায়ক সাভারকর। প্রথম জীবনে বিপ্লবী। ইংলণ্ড থেকে বন্দী হিসাবে ভারতে আনার সময় তিনি জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ফ্রান্স সরকার তাকে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করে। নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আন্দামানের সেলুলোর জেলে নির্বাসন সহ্য করতে না পেরে আর রাজনীতি করব না মুচলেকা দেওয়ায় তাঁকে বোম্বে প্রদেশের রত্নগিরি জেলায় অন্তরীণ করা হয়। তিনি হিন্দুদের জঙ্গী করার জন্য 'হিন্দুত্ববাদ' প্রচার করেন এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন। তাঁর এক ভাবশিষ্য নাথুরাম গডসে গান্ধীজীকে হত্যা করে। তিনি গান্ধী হত্যা ষড়যন্ত্র-মামলায় অন্যতম আসামী হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভা এবং নাথুরাম গডসের পত্রিকা-অফিসের কেউ সাক্ষী না দেওয়ায় তিনি বিচারে নির্দোষ সাব্যস্ত হন।

১৬. রাজেশ্বরী—পাঞ্জাবের আই-সি-এস কন্যা রাজেশ্বরী বাসুদেব এক বছরের জন্য শান্তিনিকেতনে গান শিখতে এসে-ছিলেন; তাঁকে লাহোরে ফিরতে না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্য শান্তিনিকেতনে প্রাইভেটে সংস্কৃতে এম এ পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। পরে তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে বিয়ে করেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের লেকচারার ছিলেন। ১৯৭৬ সালে গবেষণার কাজে ভারতে এসে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে কলকাতায় মারা যান।

১৭ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বম্বের সময়ে সরকারের এ-আর-পি'র ওয়ার্ডেন ছিলেন।

১৮ এলেন রায় এম এন. রয়ের দ্বিতীয় স্ত্রী। ১৯৮০ সালে দেরাদুনে এক কাজে এক আততায়ীর হাতে নিহত হন।

১৯ স্কিলহর্ন—সম্ভবত একজন আই-সি-এস। তাঁর আগে কম্যুনিস্ট পার্টির গোপন কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি আই-সি-এস মাইকেল ক্যাডিট ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে আই-সি-এস থেকে পদত্যাগ করেন। ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টি মাইকেল ক্যাডিটের মাধ্যমে ভারতের বে-আইনী কম্যুনিস্ট পার্টিকে টাকা, কম্যুনিস্ট সাহিত্য ও নির্দেশ পাঠাত।

অনুবাদক ও সম্পাদনা—নিরঞ্জন হালদার. (এই চিঠিটি পুনর্মুদ্রণ করতে হলে অনুবাদকের অনুমতি দরকার হবে।)

দাদূর কবিতাগুচ্ছ

অনুবাদ : অতুলকুমার দত্ত

প্রাক্‌কথন

অনুবাদ পত্রিকার মে-সেপ্টেম্বর—২০০২ সংখ্যাটির মুদ্রণ পরিকল্পনার সময় সম্পাদক মণ্ডলীর নিকট জানতে চেয়েছিলাম যে দাদূর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত কিছু কবিতার অনুবাদ দিলে, মুদ্রণের জন্য গৃহীত হবে কি না। সম্পাদক মণ্ডলী অনুগ্রহ করে পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের সম্মতি জানান। সেই সময়ের কিছু আগে থেকেই প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা ও দুঃসময় নেমে আসে। সকলের মনেই মর্মান্তিক বেদনার আঘাত। কিন্তু পঞ্চদশ বছর ধরে ভারতের সুফী সম্প্রদায় ও অন্যান্য সাধকেরা জাতিভেদপ্রথার তীব্র নিন্দা করে এসেছেন। তা সত্ত্বেও এসব ঘটনা অবশ্যই দুঃখকর। সে কথা ভেবে হিন্দু মুসলমানদের আদর্শ, ধর্ম ও আচরণ সম্বন্ধে দাদূর রচিত কয়েকটি কবিতার অনুবাদ এই সঙ্গে প্রকাশিত হল।

সংগৃহীত মোট এগারটি কবিতার মধ্যে প্রথমটি মূলতঃ 'শব্দ' অর্থাৎ সঙ্গীত ; বাকিগুলি 'বাণী'। 'বাণী' শব্দটি মাধুকরী। মাধুকরী কোন প্রকরণ বা অঙ্গ নয়, সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। বৃন্দাবন বা অন্যান্য তীর্থে সাধুরা এঘর-ওঘর ঘুরে কিছু কিছু সংগ্রহ করে দিন কাটান। মধুকরের মত এই সংগ্রহ বলেই নাম মাধুকরী। বর্তমান রাগ গৌরী।

এই ভূমিকাটির শেষে মোট দশটি বাণী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সেগুলির অঙ্গ এই : প্রথম দুটি কবিতা : উপদেশ—দয়া, নির্বৈরতা, তৃতীয়টি : কাল অঙ্গ, শেষের সাতটি : ভেক-সাচ অঙ্গ।

আলা রাম ছুটেছে যে ভ্রান্তি আমার।
হিন্দু তুরুক ভেদ কিছু নেই, পেয়ে গেছি দর্শন তোমার ॥
সেই প্রাণ সেই দেহ সেই লোহী মাসা।
সে নয়ন, নাসিকা সেই সহজেই এ কোন্ তামাসা ॥
দুই শ্রবণে সঙ্গীত' বাজে শুনি, জিহ্বার, শুধু মিঠা লাগে।
এক ক্ষুধা সর্বস্বে প্রবল, একই ভাবে ভোর আর জাগে ॥
সেই একই সন্ধি, পুনরায় বন্ধও একই, সেই একই সুখ একই পীড়া।
একই হুজ্জ, একই পন, পুনরায় একই শরীরা ॥

লোহী মাসা—রক্ত মাংস। রাগ—গৌরী
শরীরা—শরীর সহযে।
অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান কোন ভেদ নাই, সবাই সমান,

দাদু, যে মানব ভগবৎ মহামন্দির, অজরামর সন্ধান।
দাদু, কেন তাকে বিনষ্ট কর, প্রভুর যা নৃপতি-নিশান ॥
এ মন্দির তিনি নিজেই চেনান, নিজেই করেন যতন।
প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর-সৃষ্ট সেই জীব, তাকে বলে জীবের রতন ॥
মানুষে রচিত মসজিদ, সকলেই করে যে সেলাম।
আপন সন্তানরূপ মন্দির ভগবৎসৃষ্ট সেটি ধ্বংস করে মুসলমান ॥

—উপদেশ—দয়া নির্বৈরতা

২)

জবাই এর চাকুর মুখে কালি দিয়ে হৃদয়ের থেকে সেটি দূর কর।
সবাই তো পবিত্র স্বরূপ মূর্তি মোল্লা, মূর্খ না মার ॥
নির্দয় হৃদয়ে তাই শত্রুতায় জীবাঘাত কর।
রামমূর্তি প্রাণীটিকে দেখি ছুটে গিয়ে মার ॥
ভাবহীন যে পৃথিবী দয়াবিহীন যেই দেশ।
ভগবৎ-ভক্তি নেই সেখানে কি উপায়ে প্রবেশ ॥

—(উপদেশ—পূর্বোক্ত।)

(৩)

মুসো পালালেন মৃত্যু থেকে, যেখানেই যান, শুধু গোর।
দাদু, স্বর্গ-পাতাল সবখানে কঠিন কালের হুমকোড় ॥
মাতাল মরণ-জ্বালায় সর্বজগৎ জ্বলে, বাইরে কেউ না পালায়।
দাদু, শরণকারী, অভয়ামৃত পদ সেই শুধু পায় ॥
এ জগৎ প্রলয়ের পথে গতিশীল দেখে দাদু করেন চীৎকার।
সময়ের মুহূর্ত চলনা বুঝতে পারবে শুধু সিরজন-হার ॥
দাদু, মারা যাবে রাম বিনা, বাঁচি যদি রামের সামাল।
অমৃতপায়ী আত্মা, বেঁচে থাকে সুদীর্ঘকাল ॥

—তত্ত্ব—কালজয়

টীকা ঃ
মুসো ঃ ইহুদী, খ্রীষ্টান ও
মুসলমানদের এক
সম্প্রদায়ীন সাধক।
গোর—কবর।

লোভার্থে সবাই করে রোজা, আজান, নামাজ।
কোন্ পথে যাব বল, সাহেবের সাথে শুধু কাজ ॥
হররোজ হাজির রয়েছ, তবু কেন বৃথা সংলাপ।
মোল্লা সেখানে সজোরে ঘোষণা কর, অরুস ইলাহী-আপ ॥
হরদম হাজির হবেই বাবা যতক্ষণ বেঁচে থাকে বান্দা।
যতক্ষণ প্রাণ, স্বামী সঙ্গ প্রমাণিত, দিনে পাঁচ নামাজ কি ধান্দা ॥

—তত্ত্ব—সাচ অন্ন,
এইটির ও পরবর্তী পদগুলির।

গলা কাটে, কলমা পড়ো করে, আহা, কোরী কি দীন!
পাঁচ নামাজ শুধুভাবে লেখ অন্ধ সে সত্যনিষ্ঠাহীন ॥
নিজেকে তো মারে না কখনো, পরকেই মারতে শুধু যায়।
দাদ, নিজেকে না মারলে কখনো কি করে সে মিলবে খোদায় ॥
তনুমন মেরে রূপ সই সত্যসহ, তাকে দেখি করতে তাজির।
এ মহৎ বোধ আমি কোথা থেকে পাব, এমন আপন হত্যাকারী আউলিয়া পীর ॥
নিবাজ—নমাজ,
তাজির—তহজির—নিত্যনিষ্ঠা

অরুস ইলাহী আপ—
শ্রেষ্ঠ সুবিশাল তুমি।

যে কাফের সে বলে শুধু কাফ।
আপন দিলকে সে রাখে না তো সাফ ॥
সইকে সে কখনো না চেনে।
ক্রুর কপটতা যত তারি মাঝখানে ॥
সই-এর না ফরমান মানে।
কোথায় যে পীর, ঐ ভাবে জানে ॥
নিজের মধ্যে মন পারে না বুঝতে।
নিরন্তর ছুটে চলে আপন ছায়াতে ॥

অন্যকে জুলুম করে দুঃখীকে কাঁদায়।
হৃদয় ভরে না তার কোনই দয়ায় ॥
স্বামীর সঙ্গে তার নেই কোন স্নেহ।
অতি গর্ব করে নিয়ে আপনার দেহ ॥
এ-সব কথায় কেবা পায় পীর।
পরধন উপরে সে বাঁচায় শরীর ॥
জোর ও জুলুমে করে। কুটুম্ব সহ খায়।
সেই তো কাফির শুধু দোজখেই যায় ॥

কাফ—মিথ্যা. কাফ শব্দ আরবী ও পারসী ভাষার
একটি অক্ষর। বাক্যার্থ সেই কাফের যে মিথ্যা বলে
এবং আপন হৃদয় অনির্মলই রাখে।
ফুরমান—ফরমান—আদেশ
পীর—চিরতন
দুসকিন—দুঃখ
ছাঁহী—ছায়া
দোজখ—নরক।

(৭)

হিন্দু বলে. আমাদেরি সত্যপথ, তুর্কী বলে পথ আমাদেরি।
কোথায় সে পথ অন্বেষের. বল তাই হেরি ॥
দাদু, ভ্রান্ত দুজনেই, হিন্দু তুর্কী, গোঁয়ার।
যে দুজন বিধাভক্ত, তারা জ্ঞানহীন, নাও শুধু সে তত্ত্ব বিচার ॥
খণ্ড খণ্ড করে ব্রহ্মকে পক্ষে পক্ষে নিল বাঁটি।
দাদু পূর্ণ ব্রহ্ম ত্যাগ করে বাঁধে শুধু-জাতির গাঁঠি ॥

(৮)

ধরিত্রী, আকাশ. সেবকেরা সব কার পথে রয়।
জল, বায়ু. দিনরাত্রি, চন্দ্র, সূর্য বহু দয়াময় ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু. মহেশের কোন সম্প্রদায় গুরুদেব।
স্বামী-সৃজনকর্তা, তুমি বল অলখ-অভেদ ॥
মহাম্মদ কার ধর্মমতে, জিব্রাইলেরি বা কোন্ গ্রাহ।

মুরশিদ পীরকে এঁদের বল এক অলাহ্ ॥
এঁরা যে ছিলেন কার দলে, এ-প্রশ্ন আমার মনে হয়।
অলখ-ইলাহী জগৎগুরু, দ্বিতীয় অপর কেউ নয় ॥
অলখ-ইলাহী=
দৃষ্টির অতীত
সুকিলাল।

(৯)

আমি পূজো-নামাজ যদি নাই করি, তোমার কি ভাই!
স্বয়ং প্রণত নাই হলে শির, প্রণাম করবে শুধু তোমার কথাই?
আসন ভাঙিদে ছোটে, নয় অন্য কারো কথাতেই।
অন্তরে কেনা-দাতা, চীৎকার করবে শুধু সেই ॥
নিজের সহেবই কাজ, ভেবে আমি সেদিকেই যাই।
যা ছিল আমার, নিয়েছি, লোকের কি তাতে যায় ভাই ॥

(১০)

দেহ-অব্দির নাকি শুনো, পণ্ডিত ব্রহ্ম পূত।
অগম নিগম সব বলে, ঘরের মাঝেই নামে ভূত ॥
পাঠে না পায় পরমাগতি, পাঠে না লঙ্ঘন করে পার।
পাঠে না সেঁছে প্রাণীকুল, দাদু করু অন্তর্বেদনা পুকার ॥
দাদু, শিরে নাম বিনা সেটি ব্যর্থ বলেছে যে জ্ঞান।
ব'সে শির খালি করে পণ্ডিত বেদ ও পুরাণ ॥
আমি সব দেখেছি জিজ্ঞাসায় বেদ ও কোরাণের মাঝে।
পাব যেথা নিরঞ্জন, সে দেশ অদূরে, এখানেই কাছে ॥
পঠনে পাঠনে ক্লান্ত পণ্ডিতেরা, কিন্তু কেউ পার নাই পার।
কালি-কাগজের ভরসায় কেনই বা ছোটে সংসার ॥
কাগজকে কালো করে মরেছে কত না বেদ ও কোরাণ।
শুধু এক প্রেমাক্ষর করেছেন পাঠ রসিক সুজান ॥
মৌন-গ্রহিতা পাগল, বহুভাষী আরও অজ্ঞান।
যে সহজে রামরত, সেই দাদু, যথার্থ সজ্ঞান ॥

গ্যুন্টার আইশ্-এর জার্মান স্মৃতিনাট্য 'স্বপ্ন' (Traeme/১৯৫৩) থেকে

প্রথম স্বপ্ন

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আমি ঈর্ষা করি তাদের যারা ভুলে যেতে পারে,
ভোরা নিরুদ্বেগে যারা ঘুমোতে যায়, যাদের কোনো স্বপ্নই নেই,
আমি তো নিজেকেই ঈর্ষা করি আমার চরিতার্থ অন্ধ মুহূর্তগুলির জন্য :
উপ্‌লে-করা ছুটি উজাড়, নর্থ-সী-তে স্নান, নতুন দাম,
গেলাসে ভরা লাল বুর্গুন মদ, মাইনে-পাবার দিন।

এ সব সত্ত্বেও কিন্তু মনে হয় নিশ্চিত থাকাটাই শ্রেষ্ঠ নয়,
যে-ঘুমের দোলনে আমরা স্পন্দমান তার ধরণ ধারণ বিষয়েও আমিও সন্দিহান,
কিসের সৌজন্য ব'লে কিছু নেই (ছিল নাকি কোনো কালে ?)
বড়ো ইচ্ছে করে কোনো একজন কি অন্যজন ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে
বলে উঠি, হ্যাঁ, সেই তো ভালো।

তুমিও কি প্রেমের আসল থেকে আচমকা জেগে ওঠো নি,
কেন না সে-কান্না ঠিকই পৌঁচেছে তোমার কানে,
যে-কান্না মৃত্তিকা কাঁদে নিরন্তর,
যা তোমার মনে হতে পারে
বৃষ্টি কিংবা বাতাসের স্বর।

চোখ খুলে দ্যাখো, কী ওখানে আছে : কারাগার, অত্যাচার
এবং অন্ধতা আর অন্ধ দশা, মৃত্যু ছড়িয়ে আছে
নানাভাবে, বিদেহ যন্ত্রণা আর
ভয়, যার অর্থ এ জীবন।
মাটি নানা কণ্ঠ থেকে দীর্ঘশ্বাস জড়ো করে,
আর তুমি যত
মানুষকে ভালোবাসো সবার চোখেই এই বাঁচার বিস্ময়।
যা-কিছু যেখানে ঘটে, তুমি তার সাক্ষী মনে রেখো।

প্রথম স্বপ্ন

পয়লা থেকে দোসরা আগস্ট, রাত্রি, ১৯৪৮। হিটলারোত্তর যুগের অন্তর্গত গ্রাগেনবাগের, সম্প্রতি ওয়েস্টফালিয়া অঞ্চলের গুটোয়েহ্-নিবাসী, কারিগর উইলহেল্ম সুলৎজ স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেবার দরকার নেই, কেননা দেখা যাচ্ছে অদূরদর্শিতা সুলৎজের পেটের অসুখ ছিল। একথা বলাই বাহুল্য, পেট কখনোই নিরেট শূন্য বা ভীষণ ভরাট থাকা উচিত নয়, কেননা উদরাময় থেকেই হতো দুঃস্বপ্নের উদ্ভব।

মন্থর একটি ট্রেন। কামরার মধ্যে বিভিন্ন কণ্ঠ

বৃদ্ধ। ভোর তখন চারটে, ওরা যখন বিছানা থেকে তুলে দিল আমাদের। পেণ্ডুলাম ঘড়িতে বেজে উঠল চারটে।

তার নাতি। সেই একই কথা তুমি বারবার বলছো। ভীষণ একঘেয়ে লাগে, দাদু।

বৃদ্ধ। কিন্তু কে—কে আমাদের নির্বাসন দিল।

নাতি। চার-চারজন লোক, থমথমে তাদের মুখ। বলো, তাই না? কিন্তু তুমি কেন এমন ক'রে প্রতিদিন আমাদের অতীত মনে করিয়ে দিচ্ছ। একটু স্থির হয়ে ঘুমোও তো দেখি।

বৃদ্ধ। ওরা তবে কারা? ওরা কি পুলিশের লোক নয়? যাই বলো, ওরা যেরকম ইউনিফর্ম পরেছিল ঠিক তেমনটা আমি কখনো দেখিনি। কিন্তু না, সেটা ঠিক পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম নয়, ওদের চারজনেরই পরনে ছিল একরকম স্যুট।

বৃদ্ধা। আমার যেন মনে হয় ওরা দমকলের লোক।

বৃদ্ধ। ঐ এক কথা তুমি সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করছো। দমকলের ওদের কী দায় পড়েছে শুনি যে রাত্তিরে এসে সব্বাইকে সুদ্ধু মালগাড়িতে তুলে দেবে?

বৃদ্ধা। পুলিশরা যা করেছে তার চেয়ে এমন কী আর আশ্চর্য হতো ব্যাপারটা?

বৃদ্ধ। সবই দেখো সময়ে সয়ে যাবে। যে জীবনটা আজ পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম সেটা কম আশ্চর্য ছিল না তো!

নাত-বৌ। ভগবান জানেন, হয়তোবা আশ্চর্যই ছিল।

বৃদ্ধ। সব-কিছুর শেষে কি সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল একটা মালটানা গাড়ি? এই কি তবে জীবন?

বৃদ্ধা। থামো তুমি। তোমাকে আর বাজে বকতে হবে না।

নাত-বৌ। হ্যাঁ, চুপ করুন তো আপনারা। এই সমস্ত বকর বকর আর ভাল লাগে না। (মৃদুস্বরে) কাছে এসো না গুস্তাভ্, আমাকে একটু গরম করে দাও।

নাতি। এই যে আসছি।

বৃদ্ধ। সত্যি বড্ডো ঠাণ্ডা পড়েছে। কই গো, তুমিও একটু কাছে আসবে নাকি?

বৃদ্ধা। আমি এখন আর গরম ক'রে দিতে পারি কই?

বৃদ্ধ। সেই কখন আমরা আমাদের আস্তানা ছেড়েছি। কতক্ষণ থেকে আমরা এই গাড়িটার মধ্যে আছি।

বৃদ্ধা। ঘড়ি নেই, এমন কি একটা ক্যালেন্ডারও নেই—অথচ দ্যাখো যারা একদিন ছোট ছিল কীরকম বড়ো হয়ে উঠেছে। আমাদের নাতিরাও তো বেশ বড়ো হয়েছে। যদি একটু আলো এসে পড়ে, যদি—

বৃদ্ধ। তুমি কি সকাল হওয়ার কথা বলছো?

বৃদ্ধা। যদি আরেকটু আলো এসে পড়ে তোমার মুখটা দেখতে পাই। মুখের ভাঁজগুলো দেখে বুঝে নিতে পারি যে

তুমি বুড়ো হয়ে গেছ আর আমিও বুড়ি হয়ে গেছি।

বৃদ্ধ। তা প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশি তো কেটে গেল, কী বলো ?

বৃদ্ধা। হ্যাঁ, তা তো হবেই। তোমার মাথাটা আমার কোলের ওপর রাখো। বড্ডো শক্ত জায়গায় তুমি শুয়ে আছো।

বৃদ্ধ। এই যে।

বৃদ্ধা। তোমার মনে পড়ে ? সেদিন কিছু-কিছু ব্যাপার ছিল যাদের আমরা আকাশ বলতাম, গাছ বলতাম।

বৃদ্ধ। আমাদের বাড়ির পিছনে একটা রাস্তা উঠে গিয়েছিল বনের কিনারা ঘুঁষে। এপ্রিল এলে ড্যাণ্ডেলিয়ান ফুলে মাঠ ছেয়ে যেতো।

বৃদ্ধা। ড্যাণ্ডেলিয়ান—তুমি কেমন যেন অচেনা শব্দ বলছো !

বৃদ্ধ। মনে করতে চেষ্টা করো তো, হলুদরঙের একটা ফুল, সারা মাঠ হলুদে ক'রে আছে, দুধের মতো শাদা রস লেগে আছে বোঁটায়। তার বেলা যখন ফুরিয়ে যেতো, আস্তর খসে গিয়ে বোঁটার ওপর শুধু উলের সাদা বলের মতো কোষটা থাকতো, ফুঁ দিলেই তার রেণুগুলো উড়ে যেতো।

বৃদ্ধা। একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম, এখন মনে পড়ছে।

বৃদ্ধ। আমাদের সেই কুঠুরিতে রাখা ছাগলটাকে মনে পড়ে তোমার ?

বৃদ্ধা। খুব মনে পড়ে। রোজ সকালে দুধ দোয়াতাম।

বৃদ্ধ। শোবার ঘরে আমাদের কাপড়-চোপড় রাখবার দেরাজটাতে ঘন নীলরঙের একটা চমৎকার স্যুট ছিল আমার। কিন্তু কেন আমি খামখা সে কথা ভাববো ? ঘন নীলরঙের স্যুট এমন কী জরুরি, এমন আর কী আশ্চর্য !

বৃদ্ধা। তবে কী ছিল সবচেয়ে আশ্চর্য !

বৃদ্ধ। সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল বাড়ীর পিছনে সেই আকেশিয়া ফুল। আর বেড়ার কাছে-কাছে র‍্যাসপ্‌বেরি ফল।

বৃদ্ধা। আমরা সুখী ছিলাম এটাই কি সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল না ?

বৃদ্ধ। তখন কিন্তু সেটা বুঝিনি।

বৃদ্ধা। তুমি যেন একটু আগে কী-একটা হলুদে ফুলের নাম বললে ?

বৃদ্ধ। ড্যাণ্ডেলিয়ান।

বৃদ্ধা। ও হ্যাঁ, ড্যাণ্ডেলিয়ান, মনে পড়েছে।

[একটি শিশু কান্না জুড়ে দিল

বৃদ্ধা। বাচ্চাটার হঠাৎ কী হলো ?

নাত-বৌ। কী হলো তোর, ক্ষীতা ?

শিশু। ওরা সব সময় কেন হলুদে-হলুদে ফুলের কথা বলে !

নাতি। ওরা সব সময় এমন এক-একটা জিনিসের কথা বলে যার ন্যাগাল কোথাও পাওয়া যায় না।

শিশু। উঁ—উঁ, আমার একটা হলুদে ফুল চাই।

নাতি। দাদু, তোমরা সারাক্ষণ গুজুর গুজুর করছো বলেই এটা হলো। ও এখন একটা হলুদে ফুল চাইছে, নাও সামলাও, জিনিসটা যে কী তাতো আমরা জানিই না।

নাত-বৌ। কোনো হলুদে ফুল কোথাও নেইরে, সোনামণি।

শিশু। ওরা যে খালি-খালি সেই জিনিসটার কথাই বলছে !

নাত-বৌ। সোনা আমার, ও শুধুই আজগুবি গল্প।

শিন্টু। শুধু গল্প ?

নাত-বৌ। গল্প কখনো সত্যি হয় না।

বৃদ্ধ। ছোট্ট একটা মেয়েকে তোমার একথা বলা উচিত নয়। এটাকে তুমি মিথ্যে বলতে পারো না।

নাতি। তবে দেখাও তোমার হলদে ফুল।

বৃদ্ধ। তুমি জানো, সেটা আমি পারি না।

নাতি। তাহলে বলো সেটা তাহা মিথ্যে !

বৃদ্ধ। তাহলেই বুঝি সেটা তাহা মিথ্যে হয়ে গেল ?

নাতি। তোমার কথাবার্তায় শুধু ছোটোদেরই নয়, আমাদেরও পাগল করে তুলেছো। আমরা তোমার গালগল্প শুনতে চাইনি, তুমি রাত্রিদিন কী-কী স্বপ্ন দ্যাখো তা-ও আমাদের জানতে বয়ে গেছে।

বৃদ্ধ। এ তো কোনো স্বপ্ন নয়। আমি যে-জীবনের মাঝখান দিয়ে এসেছি, এ তাই। কী গো, তোমারও কি তাই মনে হয় না ?

বৃদ্ধা। হ্যাঁ, তাইতো মনে হয়।

নাতি। সে যাই হোক না, সত্যি হোক কি মিথ্যে হোক, এর চেয়েও একটা ভালো সময় ছিল, এর চেয়েও একটা ভালো জায়গা কোথাও আছে—তুমি যদি অনবরতই সেই কথা বলতে থাকো, আমরা কি খুব বেশি-একটা সুখী হতে পারবো ব'লে তুমি মনে করো ? তুমি যাকে বলো হলদে ফুল, কিংবা একটা প্রাণী কি একটা জন্তু, তুমি যদি বলো যেখানে তুমি শুয়ে ছিলে সেই বিছানাটার কথা, যে-মদ খেয়েছিলে তার কথা—আমাদের কী এসে যায় বলতে পারো ? কথা, শুধুই কথা, শুধু-শুধু কথা দিয়ে আমরা কী করবো ?

বৃদ্ধ। তবু এসব কথা জানতে হবে বৈকি ! আসলে পৃথিবীটার খবর ছাড়া একজন কী ক'রে বড়ো হয়ে উঠবে ?

নাতি। এই জায়গাটুকুর বাইরে পৃথিবী ব'লে কিছু নেই।

বৃদ্ধ। এই যে পিঁজরেটা যার মধ্যে আমরা আছি ? একঘেয়ে ঘর্ঘর রেলগাড়ীর এই কামরাটুকু ?

নাতি। আলো থেকে অন্ধকারের দিকে একটু কদম—আর কিছু না।

বৃদ্ধা। আর ঐ ফ্যাকাশে আলো, কোথা থেকে এল ?

নাতি। কামরার ঐ ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে ওরা আমাদের বরাদ্দ রুটি রেখে যায়।

বৃদ্ধ। ঐ নষ্ট বাসি রুটি ?

নাতি। রুটি তো সব সময়েই নষ্ট, বাসি।

বৃদ্ধ। তুমি অন্যরকম দ্যাখোনি ব'লেই এই কথা বলছো।

বৃদ্ধা। কিন্তু দাদুভাই, কে আমাদের এই রুটি দিচ্ছে তা বলতে পারো ?

নাতি। আমি জানি না।

বৃদ্ধা। তাহলে দেখছো, আমাদের এই ঘরটার বাইরেও আরো-কিছু রয়েছে ?

নাতি। আছে, কিন্তু এখানকার চেয়ে সেটা ভালো না-ও হতে পারে।

বৃদ্ধা। এখানকার থেকে ভালো তো বটেই।

নাতি। আমরা অন্তত সে সম্পর্কে কিছু জানি না। আর তাই সে সম্পর্কে কোনো আজগুবি কথা শুনতেও চাই না।

এই আমাদের জগৎ যেখানে আমরা রয়ে গেছি। চার দেয়ালে ঘেরা অন্ধকার নিয়ে কোথাও গড়িয়ে-গড়িয়ে চলেছে। আমার মনে হয় বাইরেও এ রকমই কতকগুলো অন্ধকার ঘর, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলার ঘর।

নাত-বৌ। ওর কথাই ঠিক।

অনেকগুলি স্বর। হ্যাঁ, ওর কথাই ঠিক।

নাত-বৌ। যে-জগতটার কথা আপনারা সমস্ত সময় বলছেন তার ওপর আমাদের বিশ্বাস নেই। ওটা আপনাদের স্বপ্ন শুধু।

বৃদ্ধ। হ্যাঁ গো, তোমারও কি মনে হয় আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম?

বৃদ্ধা। জানি না আমি।

নাত-বৌ। চারদিকে তাকান, আপনাদের পৃথিবীর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

বৃদ্ধ। ওদের কথাই এখন ঠিক হতে চললো! হা ভগবান, কতো আগের কথা এসব। হয়তো সেই নীল স্যুট, সেই পোষা ছাগল আর সেই ভ্যান্ডেলিয়ান শুধুই স্বপ্ন।

বৃদ্ধা। আমি এই সব খবর তোমার কাছ থেকেই যা পেয়েছি।

বৃদ্ধ। কিন্তু কী করে আমরা এই গাড়ির বগীতে এলাম? ওরা কি আমাদের রাত চারটে থাকতেই বিছানা থেকে তুলে দিয়েছিল? পেত্রুলাম ঘড়িতে চারবার ঘন্টা বাজলো।

নাতি। দাদু, আবার তুমি তোমার পুরোনো পাঁচালি গাইতে শুরু করে দিলে?

[শিশুটি আবার কান্না জুড়ে দিল

নাত-বৌ। কী হয়েছে রে তোর, বাছা আমার?

শিশু। দ্যাখো ঐ মেঝের উপর কী যেন ওটা।

নাতি। একটা গনগনে, জ্বলজ্বলে আগুনের গলা, কিন্তু কেউ ছুঁতে পারে না—ওটা একেবারেই ফাঁপা।

বৃদ্ধ। রশ্মি এসে পড়েছে। দেয়ালের কোনোখানে একটা ছিদ্র খুঁজে রশ্মি এসে পড়েছে।

নাত-বৌ। রশ্মি, রশ্মি কী?

বৃদ্ধা। হয়তো এখন তুমি বুঝতে পারছো বাইরের জগতটা এখান থেকে আরেক ধাঁচের?

বৃদ্ধ। দেয়ালে কোনো ফুটো থাকলে বাইরে তাকানো যাবে না?

নাতি। বেশ, তাহলে আমি একবার দেখি।

বৃদ্ধ। কিছু কি ওখানে দেখতে পাচ্ছো?

নাতি। এমন সব জিনিস দেখছি যার কিছুই ঠাহর করতে পারছি না।

নাত-বৌ। কী দেখছো তার একটা অন্তত আঁচ দাও।

নাতি। কী করে বুঝিয়ে বলবো বুঝে উঠতে পারছি না।

নাত-বৌ। আরও একটু বাইরে নজর করতে চেষ্টা করছো না কেন?

নাতি। না, আমার ভয় করছে।

নাত-বৌ। তুমি যা দেখছো তা কি সুন্দর নয়?

নাতি। ভয়ংকর।

বৃদ্ধ। কারণ তা নতুন, এইতো?

নাতি। গর্তটা বুজিয়ে দিতে হবে এবার।

বৃদ্ধ। কী, সাঁতাকারের জগৎটাকে তুমি দেখতে চাও না?

নাতি। না, আমার ভয় করছে।

বৃদ্ধ। আমাকে তবে একবার বাইরেটা দেখতে হচ্ছে।

নাতি। বাইরেটা দ্যাখো। দ্যাখো তুমি যার কথা সব সময় বলে থাকো এ সেই জগৎ কিনা।

ঈষৎ স্তব্ধতা

বৃদ্ধা। কী দেখছো?

বৃদ্ধ। বাইরে ঐ সংসারটা দেখছি, সরে-সরে যাচ্ছে;

বৃদ্ধা। আকাশ দেখতে পাচ্ছো? গাছ দেখতে পাচ্ছো?

বৃদ্ধ। দেখতে পাচ্ছি ড্যাণ্ডেলিয়ান ফুল। সারামাঠ হলদে হয়ে গেছে, আর ঐ তো পাহাড়, বন—হা ভগবান।

নাতি। এইসব দেখেও তুমি শিউরে উঠছো না?

বৃদ্ধ। (দ্বিধান্বিত) কিন্তু কী যেন—কী যেন বদলে গেছে।

নাত-বৌ। আপনি কেন বাইরে তাকাচ্ছেন না আর?

বৃদ্ধ। মানুষের ধারা কেমন বদলে গেছে।

বৃদ্ধা। মানুষ কী হয়েছে?

বৃদ্ধ। হয়তো আমারই ভুল। এই, তুমি একবার দ্যাখোতো।

বৃদ্ধা। এই যে, দেখছি। (ঈষৎ স্তব্ধতা)

বৃদ্ধ। কী দেখছো।

বৃদ্ধা। (ভয়ার্ত) আমরা মানুষ বলতে যাদের জানতাম ওরা একেবারেই তাদের মতো নয়।

বৃদ্ধ। তুমিও তাহলে তাই দেখছো?

বৃদ্ধা। না আমি আর বাইরে তাকাব না। চাপা গলায়) ওরা দানব, গাছের মতো কেপ লম্বা, ভয় করছে আমার।

বৃদ্ধ। গর্তটা আমরা বুজিয়েই ফেলবো।

বৃদ্ধা। হ্যাঁ বুজিয়ে দেবো ওটা এক্ষুনি।

নাত-বৌ। আহ্ ভগবান। এখন আমার সব আগের মতোই লাগছে।

বৃদ্ধ। না আগের মতো আর লাগছে না।

বৃদ্ধা। হলুদে ফুলের কথা ভাবতে গিয়ে এখন আমি শিউরে উঠছি।

বৃদ্ধ। এখন তাহলে আমরা কী নিয়ে ভাববো?

বৃদ্ধা। মনে করতে বললেই যেন যতো ভয় ঘিরে আসছে।

নাতি। চুপ, তোমরা কিছু শুনতে পাচ্ছো?

বিরতি

নাত-বৌ। কী?

(শিশুটি আবার কাঁদতে শুরু করে)

বৃদ্ধা। ছাঁড়া, আবার কী হলো তোর?

নাতি। তোমরা কেউ লক্ষ্য করোনি যে একটা জিনিস কমে গেছে।

বৃদ্ধ। হ্যাঁ, বাইরের জগতে।

নাতি। না, আমাদেরই ভিতরে।

(ঈষৎ যতি, তার মধ্যে শুধু চাকা ঘোরার স্পষ্ট শব্দ)

নাত-বৌ। কেন কাঁদিস রে, সোনা!

শিশু। জানি না, জানি না।

নাত-বৌ। কিছু-একটা যে কমেছে বাচ্চাটাই ধরতে পেরেছে।

বৃদ্ধা। কী হয়েছে আমি জানি। তুমি বুঝতে পারছো না?

নাত-বৌ। (ত্রাস-তাড়িত চাপা গলায়) আমরা এখন আরও জোরে চলেছি।

বৃদ্ধা। তাই তো, আমরা এখন আরো জোরে চলেছি।

(ঈষৎ যতি, ঘূর্ণমান চাকার শব্দ বাড়তে থাকবে)

বৃদ্ধ। এর মানে কী?

নাত-বৌ। জানি না, কিন্তু মানেটা নিশ্চয় খুব সুন্দর নয়।

বৃদ্ধ। গাড়ির এই চলন একই রকম থাকবে কিনা, জানতে হবে—নইলে—

নাতি। নইলে—

বৃদ্ধ। আরও বাড়বে কিনা।

বৃদ্ধা। ঐ শোনো!

(ঈষৎ যতি, ঘূর্ণমান চাকার শব্দ আরও বাড়ছে)

বৃদ্ধ। (চাপা গলায়) বেড়েই চলেছে যে।

নাত-বৌ। কী হবে, বেড়েই চলেছে যে।

ঘূর্ণি চাকার শব্দ আরও বাড়ছে

বৃদ্ধ। দুর্ঘটনা ঘটবে নাকি! কে আছো, কে আমাদের সাহায্য করবে?

নাতি! কে?

ট্রেনের শব্দ এক সময় তীব্রতম হয়ে উঠে ক্রমশ দূরে থেকে দূরে মিলিয়ে যায়

বালোচ লোকগীতি

স্বরাজ সেনগুপ্ত

প্রাকৃতিক কারণে বালোচিস্তানের অধিবাসীরা জন্ম থেকেই কষ্টসহিষ্ণু ও কঠোরচিত্ত হয়ে গড়ে ওঠে। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে নয়, এদের দৃঢ় অস্থি, সবল মাংসপেশী এবং ততোধিক কঠোর মনোবৃত্তি অনবরত নিয়োজিত রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে। এ সংগ্রামে কোনো বিরতি নেই। কোনো ফাঁক নেই। কিন্তু প্রকৃতি যখনই এঁদের প্রতি একটু সদয় হয়ে দেখা দেয়, তখনই এ-সব সরল সাহসী ও উদারচেতা প্রকৃতি-সন্তানেরা আনন্দে ও হাসোচ্ছল-প্রমোদে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তখন লাফ-ঝাঁপ নাচ-গানের তালে সমগ্র বালোচভূমি আন্দোলিত হতে থাকে। প্রকৃতি আবার যখন নির্মম মূর্তি ধারণ করে, তখন এরাও সাহস এবং সহিষ্ণুতার অফুরন্ত সম্ভার নিয়ে তার মোকাবিলায় দাঁড়ায়।

বালোচজাতির কোনো কোনো সম্প্রদায় শহর বা গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করে। তারা সাধারণত ছোটো খাটো ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে। অথবা ক্ষুদ্রায়তন চাষভূমি বা খামার পত্তন করে ছাগ, মেষ চরায়। কৃষি, পশুপালন, দোকান-পাট করা অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য এসব হলো গৃহস্থ বালোচদের সাধারণ পেশা। কিন্তু যাযাবর বালোচদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের জীবন বিপদসঙ্কুল ও সংকটবহুল। আবহাওয়ার ইঙ্গিত ও জীবিকার্জনের তাগিদ অনুযায়ী তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং এতেই তারা গর্ববোধ করে। কিন্তু স্থায়ী বসবাসে এখন ক্রমশ আরাম-আয়েশ বৃদ্ধির ফলে বালোচজাতির অনেকে ইদানিং যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করতে শুরু করেছে।

বালোচদের সাধারণ পোষাক হলো পাশ্‌ক-নামীয় লম্বা কামিজ, ঢিলা পায়জামা বা শালওয়ার, বিরাটাকার পাগড়ি (দাস্‌তার) এবং সাণ্ডেল (সিওরান)। এই বেশভূষায় এবং ঘন শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারায় এই বিরাটকায় আদম-সন্তানেরা যখন নিজেদের তৈরি বাঁশি হাতে পাহাড় পর্বত উপত্যকাময় পথে পথে আনন্দ-উজ্জ্বল গতিতে গান গেয়ে ও সঙ্গীত লহরী তুলে ঘুরে বেড়ায়, তখন তাদের দেখে মনে হবে যে, এ জগৎ ও জীবগোষ্ঠী যেন কোনো আলাদা পৃথিবীর অংশ। বালোচ মেয়েদের বেশভূষায় রয়েছে হাতে তৈরী পোষাক, বাহুতে, কানে নাকে ও পায়ে অলঙ্কারাদি যথাক্রমে থাওয়াখ (বালা), দর্‌ (কানবালা) পুলাক (নোলক) এবং পায়জের (খাড়ু)। তাদের কর্তব্য কৃষিকর্মে সহায়তা, ছাগ-মেষ চরানো এবং করণা বা কুয়ো থেকে কলসী, বালতি বা ভেড়ার চামড়ায় তৈরি মশকে করে জল তোলা। এই শেষের কাজের জন্যে তাদের দল বেঁধে অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে হয় ঝিরণ করণা বা কুয়োর উদ্দেশে। বালোচ যুবকেরা এখন পর্যন্ত প্রাচীন চাকরীয়যুগের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ও তার প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত। গোলাগুলি ছোঁড়া, শিকার করা, ঘোড়াদৌড়ানো, ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতা, ঘেরাও করা, তীর ছোঁড়া এবং কুস্তি প্রতিযোগিতা হলো এদের প্রিয় ক্রীড়া। গান ও নাচ এদের জীবন যাপনের একটা স্বাভাবিক অঙ্গের মতো।

বালোচ লোকগীতিতে এ-সবের পরিচয় সুস্পষ্ট। বালোচ লোকগীতির শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায়—এতে রয়েছে অধ্যাত্মচিন্তা ও সুফীবাদের প্রভাব, নৈতিকতা ও উপদেশাত্মক বাণী, বাস্তবতা, স্ফূর্তিজনক বাক্যালাপ এবং পানোৎসবমত্ততা ও স্তুতিমূলক বাগাড়ম্বর। কোনো কোনো গানে রয়েছে বালোচ বীরদের দুঃসাহসিকতা ও অস্ত্র-চালন কৌশলের প্রশস্তি এবং তাঁদের প্রণয়িনীদের প্রেম ও রূপের খ্যাতি।

বালোচী সঙ্গীতাবলীর মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানীয় হলো 'লারোগা'। এর কথা ও সুর স্ফূর্তি-উদ্দীপক। মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে ঢোলক সহযোগে এ-গান গেয়ে থাকে। বিবাহ বা উৎসব আনন্দ দিনে এ গানের মারফত সমবেত

জনতার মনোরঞ্জন করা হয়। এতে গীত হয় বনের সৌন্দর্য ও কুমারিদের প্রশস্তি, বরের শৌর্য ও সাহসিকতার কাহিনী, শিশুর জন্মে আনন্দোচ্ছ্বাস ইত্যাদি।

লারোগ-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। অতীতে বালোচ জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ—বিবাদ অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যখন তখন যুদ্ধ ঘোষণা করতো এবং দু'পক্ষের যোদ্ধারা অতুলনীয় সাহসিকতার সঙ্গে পরস্পর সংহারে নিয়োজিত হতো। এ সব উপলক্ষে বালোচ রমণীরা তাদের স্বামীদের শত্রু নিপাতে উৎসাহিত করবার জন্যে 'লারোগ' গানের অনুষ্ঠান করতো। এখন এ সব যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে যাওয়ায় লারোগ গীত হয় বিবাহ ও অন্যান্য আনন্দ উৎসব উপলক্ষে, কিন্তু এর সুরে সেই যুদ্ধং দেহি মনোভাবের প্রতিধ্বনি রয়ে গেছে। এ গানের ভাষা সরল ও স্পষ্ট।

'আমি অপেক্ষায়, হে প্রিয়তম
আমার কোলাহলহীন একাকী ঘরে।
আমার বন্ধু একজন বীর যোদ্ধা,
ওঁর - নিশানায় তার জুড়ি নেই
তার হামলা—তিনি বন্দুক দিয়ে
যাকে নিশানা করেন, তার মৃত্যু নিশ্চিত
তাঁর চলনেরই ধরন এমন যে
মনে হয় তিনি যেন বলেছেন শত্রু-দুর্গ জয় করতে।
যখন তিনি শত্রুদের দিকে তাকান—
তার দৃষ্টি পলকেই ভয়ে কাঁপতে থাকে।
তিনি প্রতিজ্ঞা আমার কাছে ফিরে আসতে,
নিঃসন্দেহে তিনি ফিরে আসবেন, আসবেনই—
তার রৌপ্যোজ্জ্বল বন্দুক হাতে নিয়ে
লীলাভরে হেলে দুলে—
কেন না, বালোচ রক্ত তার শিরায় সঞ্চরমান।'

'মাহ্ঈরোক্' কোনার গান। এতে রয়েছে বিরহের সুর এবং এ গীত হয় একক কণ্ঠে, কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যতিরেকে। স্বামী চলে গেছেন বহুদূর দেশে জীবিকা বা ব্যবসার উপলক্ষে। বিরহিনী স্ত্রী তাকে স্মরণ করছে। তিনিই ছিলেন তার সমস্ত সুখের উৎসমূল। তার প্রতি ছিলেন আসক্ত ও কর্তব্যপরায়ণ। এখন সংসার জীবনের কঠিন পীড়নে হয়রান ও পরেশান হয়ে সে বন্ধুর স্নেহ ও প্রেম ফিরে পাবার জন্যে আকুল আবেদন জানাচ্ছে এবং তার উদ্দেশে নিবেদন করছে নিজের নিরানন্দ ও দুর্দশার করুণ কাহিনী।

'আমার নয়ন দু'টি অবিরাম তোমাকে খোঁজে,
তুমি যে নেই!
দুঃখের মেঘমালা দিগন্ত থেকে দিগন্তে ঘুরে বেড়ায়,
তুমি যে নেই!
আমার কপোল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে,
তুমি যে নেই!

কোথায় আমার শান্তি ও সান্ত্বনা,
তুমি যে নেই !
আমার হৃদয়ের গভীর রোদন শোনে না কেউ,
তুমি যে নেই !
আমার হৃদয় বিরহ—বেদনায় ভারাবনত
তুমি যে নেই !

দূর-দূরান্তর মরুভূমির বুকে বা সীমাহীন প্রান্তরে এক উষ্ট্রারোহী একাকী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে চলেছে। তার মনে পড়েছে ঘরে ফেলে আসা সুন্দরী, সরলা, সংস্কৃতভাষা বধূর মুখ। সে বিরহাকুল হয়ে মীর চেরখান রিন্দ—এর বীর সহচর মীরান-এর ন্যায় একটি কবুতর মারফত তার বেদনাময় বাণী পাঠাচ্ছে :

'ওহে কবুতর ! প্রিয়তমাকে আমার হাল জানিয়ো,
এ দীর্ঘ পথ তুমিই করো অতিক্রম।
সুন্দর উঁচু পাহাড়-চূড়ায় তুমি রাত কাটাও,
সে শৈলবাস থেকে হে অনিলবাহী পাখি !
উড়ে যাও আমার প্রিয়ার কাছে
এবং তার শয্যার ডানপাশে গিয়ে বসো,
সে তোমাকে তার আঙ্গিনে নেবে জড়িয়ে।
তোমার তীক্ষ্ণ নখরের ছোঁয়ায় তাকে শঙ্কিত করো না,
আমার প্রিয়াকে আঘাত দিয়ো না,
শুধু আমার মনোবেদনা তাকে জানিয়ো !'

জনৈক প্রেমিক নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে প্রিয়তমা থেকে বিচ্ছিন্ন। সে তার দলবল নিয়ে অসমা সাহসে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়েছে। শত্রু তার চারণভূমি ও ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করে দিয়ে তার প্রেয়সীকে বন্দী করেছে। সে এখন নিতান্ত সম্বলহীন। কিন্তু হতোদ্যম নয়। প্রেয়সী তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে ফিরে এসে শত্রুকে আবার যুদ্ধে আহ্বান করবে এবং পরাস্ত করবে। প্রিয়তমাকে মুক্ত করবে। সে প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'কেঁদো না, ধৈর্য হারিয়ো না' :

'প্রেয়সী আমার ! কেঁদো না, দুঃখ করো না,
যে মুহূর্তে অবস্থার পরিবর্তন হবে,
তোমার কাছে ফিরে আসতে আমি এক মুহূর্তও বিলম্ব করবো না।
আমি ছুটে আসবো ভেসে আসা মেঘ যেন
মিলন-দিনের স্মরণ স্পর্শে দু'চোখের ধারা বইয়ে।
আমি আসবোই তোমার কাছে আমার যে প্রতিজ্ঞা
তা পালন করবোই।
আমার পাগল অশ্ব এগিয়ে চলবে
হ্রেষাধ্বনি করে, গর্জন করে এবং

পাহাড় ও প্রান্তর মথিত করে,
সেই স্বর্ণ-দুর্গের দ্বারপ্রান্তে
যেখানে আমার প্রিয়তমা আছে বন্দিনী।

'সোয়াত' হলো গ্রামবাসীদের জনপ্রিয় উৎসব-সঙ্গীত। বিবাহ বা অন্যান্য উৎসব—আয়োজনে এ সঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। কৃষকদের শস্য—আহরণের সময়ও মাঠে প্রান্তরে এ গান গাওয়ার রেওয়াজ আছে। সরল—প্রাণ চাষী ও খামারীরা এ গানের সুরে বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করে।

প্রিয়তমার উদ্দেশে চিরাচরিত অতি প্রশংসাবাদ, বিরহী প্রেমিকের অনুবেদনা, প্রিয় সাহচর্যে অতিবাহিত দুর্লভ মুহূর্তগুলির স্মরণ, অতীত প্রেমের স্মৃতি ইত্যাদি এ গানের বিষয়বস্তু :

'আমি বুলবুল-এর মতো কেঁদে কেঁদে উড়ে বেড়াই,
হে প্রিয়! কী আমার অপরাধ?
আমি তপ্ত বালু-বেলার জ্বলন্ত সূর্যের নীচে দাঁড়িয়ে
তোমার জন্যে অপেক্ষায়,
হে প্রিয়! আমার কী অপরাধ?
কাল রাতে ঘুমে-ঘোরে
স্বপ্নে তোমাকে দেখলাম
হে প্রিয়! কী আমার অপরাধ?'

আর একটি 'সোয়াত'-গানের হুবহু অনুবাদ দেওয়া হলো :

'আজ থেকে আমি আর তাকে মনে করবো না,
এ-আমার কোনো শপথ।
সেই সে নিষ্ঠুর, অবিশ্বাসিনী, মিথ্যাবাদিনী প্রিয়াকে
আমি ত্যাগ করলাম
চিরতরে ত্যাগ করলাম।
সেই উড়ন্ত বলাকাকে ধরে নিতে
আমি শূন্যে করতল ছুঁড়ছি,
আমি এক উন্মাদ।
এই বোকামি আর নয়, আর কিছুতেই নয়
আর এ হয় না।
এই পৃথিবীর বাগিচায় ঝরো ঝরো ভরা ফুল
রঙহীন, গন্ধহীন,
ভুল করে আমি খোলসের খোঁজে ঘুরেছি
এখন এ আর নয়।
কত প্রণয়ীর স্বর্ণ-প্রাসাদ পুড়িয়ে করেছে ছাই
আমার হৃদয়েও প্রণয় দাবানল জ্বলছে,
কিন্তু আর না।'

হলো এক ধরণের নৃত্য-গীতি। এ গান তারা নেচে নেচে গায়, আবার এ গান গাইতে গাইতে তারা নাচে। গ্রামের মোড়লের বা মহল্লার সর্দারের সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। তিনি দরিদ্রদের নিমন্ত্রণ দিলেন। তারা গান গেয়ে গেয়ে নেচে নেচে আসলো মোড়লের বাড়িতে। করলো দলপতিকে আনুষ্ঠানিক অভিবাদন। এ উপলক্ষে ঘোড়দৌড় বা অন্যরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন হলো। তারপর তারা চক্রাকারে সমবেত হয়ে নেচে নেচে 'হালো'—সঙ্গীতের আসর জমালো। দলনেতার বা তাঁর গৃহে কারুর বিবাহ উপলক্ষেও 'হালো' গীতি-নৃত্যের আয়োজন হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া গেলো।

'কী সুন্দর আজকের দিন,
বর-সাজে চলেছেন আর আমাদের সর্দার,
আজকে তিনি ধরা দেবেন বিবাহ-বন্ধনে
আজ থেকে আর তিনি একাকী নন।
এই শুভদিনে
প্রতিটি দম্পতি স্মরণ করছে
তাদের বিবাহ-দিবস,
তাদের মনে পড়ছে হেনা ফুল ও সেজ রাঙানোর কথা,
মনে পড়ছে ঘোড়া ছুটিয়ে চলার কথা,
আর দ্রুত বহমান স্রোতস্বতী পেরিয়ে চলবার কথা,
এই জন্যেই আজ
প্রতিটি পুরুষ সেজেছে প্রতিটি
ফুলের তোড়ার মতো,
প্রতিটি মেয়ে সেজেছে রাজ— দুহিতার মতো,
আমাদের বালক যেন আজ মস্ত-মাতাল
ফোটা ফুলের বাগিচায় বুলবুল-এর মতো
হাতে পায়ে যার জোর আছে সে-ই
আজ নাচছে চকোরের মতো।'

'লাইলী মে'র যেন মরুভূমির বুকে সুরের রাজকন্যা। এ গানে ধ্বনিত হয় বিচ্ছেদের হা-হুতাশ এবং বিরহী প্রণয়ীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ক্রন্দন। এ গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর করুণ সুর।

'দেহী' হলো বালোচ রাখাল ও মেষচারণদের গান। এ গান গেয়ে গেয়ে তারা মাঠে প্রান্তরে চারণভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। বসন্ত সমাগমে তাদের মনে পড়ে ঘরে ছেড়ে আসা তাদের চন্দ্রমুখী প্রিয়াদের কথা। তাতে তাদের মন হয়ে ওঠে বেদনাভারাক্রান্ত। এতে আরও জোগান দেয় কোপ-কাড়ে ফুটে ওঠা ফুলের ঝোকা, আকাশে ভাসমান মেঘপুঞ্জ এবং গাছে গাছে ভীড় জমানো গায়ক পাখিরা। এসব রঙের খেলা, গান এবং নাচের সমারোহে তাদের মনে পড়ে গোলাপী পোষাক-পরিহিতা, নাক, কান ও গায়ে অলংকার ঝলমল তাদের নববধূদের কথা। মাররী ও বুগতী উপজাতিদের এবং দেরা ইসমাইল খান—এ বসতি স্থাপনকারী বালোচ সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে 'দেহী' গান অতি জনপ্রিয়।

বিষয়বস্তু ও আকারে 'দেহী' গান পাঞ্জাবী লোকগীতি 'মাহিয়া'র মতো। 'মাহিয়া'র মতো 'দেহী'রও প্রথম লাইনের কোনো অর্থ থাকে না। 'মাহিয়ার মতো 'দেহী'র ভাবসম্পদও বিচিত্র। কোনো 'দেহী'তে যদি প্রিয়ার দৈহিক সৌন্দর্য কল্পনা থাকে তবে অন্য এক 'দেহী'তে থাকবে তার মানস-রূপের বিশ্লেষণ। প্রেয়সীর সঙ্গে মিলন এবং বিচ্ছেদের উত্থানপতনময় মুহূর্তগুলির কল্পনাও এতে পাওয়া যাবে :

'কে বলে যে প্রেম সুখের ?
আমি জানি, বিরহরাত্রি কি ভাবে কাটে !
খোদা তোমাকে আবার কবে ফিরিয়ে আনবেন ?
যাতে আমি আবার তোমাকে দেখতে পাই।
যে মনোলীনার বিরহে আমি যাতনাময়
যাপন করছি কাল
জানি না সে আজ কোথায় !
তাহার জন্যে আকুল আমার হৃদয়
গতকালও আমি দেখেছি তার চাঁদমুখ
কেনার আর্ত দিশেহারা।
প্রিয়তমা ! আমার অনুযোগ কি তোমার কাছে পৌঁছয় ?
তুমি কি শোনো, শুনতে পাও আকুল আক্ষেপ ?
কবে তোমাকে আবার দেখবো আমার আঁখিতে !
আমার হৃদয় বিচ্ছেদ-বেদনায় পাগল,
কিন্তু অনুরাগিনী সে থাকবেই চিরকাল।'

'লাকো' হলো সরলচিত্ত উট—চালকদের গান। নিবাস ছেড়ে যখন তারা বহু দূরে চলে যায়, তখন 'লাকো' গানে তাদের অন্তরের অকপট বেদনাধারা বেরিয়ে আসে। সামনে-পিছনে বিশাল মরুভূমি, খাদ্য নেই, পানীয় নেই, আশ্রয় নেই—নেই, নেই, নেই। একা মানুষ আর তার মরুবন্ধু উট—এই দু'য়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে চলেছে। চলার পথে কোনো বৈচিত্র্যও নেই। এই একঘেয়েমির মধ্যে ক্লান্ত পথিকের কণ্ঠে ধীরে ধীরে ভরে ওঠে 'লাকো'র ছন্দ ও সুর। সুর চড়ে উঠলে এ গানের রেশ প্রতিধ্বনিত হয় কন্দরে কন্দরে। বাংলাদেশের দীর্ঘপথবাহী গো-শকট চালকদের 'চটকা-গানে'র সঙ্গে 'লাকো'র সাদৃশ্য রয়েছে।

'লাকো' যে শুধু সারবান বা উট চালকের গান—তা নয়। বালোচ নারীরাও এ গান গেয়ে থাকে। বসন্ত সমাগমে দূর-প্রবাসী উষ্ট্রচালক স্বামীদের মনে করে তারা এ গানের ধ্বনি তোলে। 'লাকোর' বিষয়বস্তু ব্যাপক। সাধারণত এতে থাকে উটের প্রশংসা, প্রিয়তমার স্মৃতিকথা, বিরহ-বেদনার প্রকাশ, শত্রু-সম্প্রদায়ের যুবকদের প্রতি শ্লেষোক্তি, আপন দলের শৌর্যকীর্তনা ও বীরত্ব কাহিনী ইত্যাদি। মেয়েরা যখন এ গান গায়, তখন গানের বিষয়বস্তুতে থাকে স্বামীর সাহস, শৌর্য ও বীরত্বের কাহিনী এবং প্রশস্তি।

একজন উট চালকের মুখে আমরা শুনতে পাই :

'আমি চারণ-ভূমি ও ঝাড়িতে ঝাড়িতে ঘুরে বেড়াই
আমার মানস-প্রিয়ার সন্ধানে।

তারা তাকে নিয়ে গেছে দূর সারওয়ান প্রদেশেই।
তার অলকগুচ্ছ নিয়ে আমি পাগড়িতে সাজাই,
তার বিরহে আমি বিন্ধ্য আর আর্ত
যাযাবর দল পাহাড়ের পথে চলেছে হেঁকে।
এসো, হে মোর প্রিয়তমা!
ওই শৃঙ্গের আড়ালে একটু বসি।
তোমার আর আমার মাঝে দাঁড়িয়ে
একটি পাহাড় শিখর অজ্ঞহীন।
তুমি আসো না আমার কাছে।
তোমার কোনো বার্তাছও আসে না।
আমার উটের মহিমা ও সাজ তুলনাহীন,
তার সুঠাম শরীর ও গতি-লাবণ্য অনুপম,
আমার প্রিয়ার নাম বরজান (রূপসী-শ্রেষ্ঠা)।'

জনৈক নগরবাসীর ভাষায় :

'সোনারুকে আমি অনুনয় করে বলি,
আমার প্রিয়ার অনুপম হাতের মাপে কলস গড়তে।
এসো এসো, হে বল্লভা
তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় বেদনাসিক্ত
তোমার বিরহে আমার প্রাণ ওষ্ঠে আর্ত।

একটি নারী কণ্ঠে :

'সেই যে তুমি চলে গেলে,
তারপর কতদিন আর আমাদের দেখা নেই,
বিরহ-বেদনা আমার দৃষ্টিকে ঢেকে দিয়েছে।
আমার হৃদয় যেন ছিল একটি একলা ফোটা ফুল,
নিরালা বন-প্রান্তরে
নির্জনে রঙ ছড়াও আর সুবাস বিতরণ,
আজ উষ্ণ মরুপ্রবাহ তাকে জ্বালিয়ে দিলো।
বিরহের দাহভরা বায়ু স্পর্শে
লাজুক ফুল কতক্ষণ ফুটে থাকবে?
সে শুকিয়ে গেলো, ঝরে গেলো।
আমার হৃদয় এখন একটি উষর ভূমিখণ্ড,
কোনো সবুজ শষ্প গজায় না আর
কঠিন মাটি, পাথর এবং ধুলোয়

সব জীবন-স্পন্দন ঢাকা পড়েছে।
প্রাণের কোনো চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই—
শুধু উষ্ণপ্রবাহ চলেছে বয়ে চারিদিকে
আর প্রান্তরে-প্রান্তরে দীর্ঘশ্বাস আর ক্রন্দন পড়ে-ছড়িয়ে।

'লাঙ্কো' সঙ্গীতে এ ধরণের বেদনাদায়ক কথা ও ভাবের সমাবেশ।

'দাঙ্গানাহ্' হলো মূলতানী দোহরা, 'পোশতু মিসরা' বা সিন্ধী 'সানয়ারো' সঙ্গীতের সমতুল্য। এ গানগুলো ক্ষুদ্রকায়। গীত হয় পাঞ্জাবী ওয়াজলী বাঁশি সদৃশ নায়হ্ বলে কথিত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র সংযোগে। গায়ক ও বংশীবাদক এক সঙ্গে বসে পাহাড়ী পশুচারণ দলের প্রিয় এই সঙ্গীত গায়। যেমন—

'আমি চলি দ্রুতগামিনী ঘোটকীর পিঠে
আমার প্রিয়া বসে করে চন্দ্রাননা কুমারীদের সঙ্গে।
আমি বিশ্রাম করি পাহাড়ী সবুজ জলাধারের ধারে
মাত্র কিছু নিমেষের জন্যে।
তারপর ছুটে যাবো
আমার প্রিয়ার অনুপম মুখ দেখতে।
মরুপ-চিহ্ন হলো তাপজর
বৃষ্টির-চিহ্ন হলো বুলিকড়
আর ভালোবাসা হলো অপরূপে স্মিত।

'মোরা' হলো একপ্রকার ছোট-আকারের রাখালী গান। এ গীত হয় দুই কণ্ঠে, সওয়াল ও জবাবের ভঙ্গিতে। প্রথম লাইনে এক গায়ক অন্যকে একটি প্রশ্ন করে। দ্বিতীয় লাইনে অন্য গায়ক তার উত্তর দেয়।

একই গায়ক কখনো কখনো প্রশ্ন-উত্তর দুটিই গানের সুরে শোনায়।

অতীতকালে যখন বালক-বালিকাদের মেলামেশায় বাধা ছিল না, তখন 'মোরো' সঙ্গীত অতিশয় জনপ্রিয় ছিল। এখন এ রকম মেলামেশাকে সমাজে অপছন্দ করা হয়। যে কারণে 'মোরো' এখন কতকটা কাল্পনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন প্রেমিক আর অন্যজন প্রিয়ার অভিনয় করে এ গানের আসর জমায়। এ ভাবেই প্রান্তরে, পাহাড়ে ও মরুবক্ষে 'মোরো' গান গীত হয়।

এই চুটকি—গানের সুর বেদনাদায়ক। প্রিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা, প্রণয় ভঙ্গ ইত্যাদি এর বিষয়বস্তু। বিরহী প্রেমিক ভাবাবেশ জড়িয়ে চাপাকণ্ঠে প্রথম লাইন গান করে, তারপর প্রিয়ার ভূমিকায় অন্য গায়ক জবাবে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। যেমন—

'তুমি তো জানো, প্রিয়া!
তোমার স্মৃতিস্পর্শে আমার হৃদয়
কুয়াশার মতো ঝরে।
তা সত্যি, বন্ধু!
কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির সাথে
যুদ্ধ করে কি ফল?'

'লোলী' একপ্রকার ঘুমপাড়ানি গান। একে মেকরানী বালোচীতে বলা হয় 'লীলু'। পৃথিবীর সব ভাষাতেই ঘুম পাড়ানি গানের প্রচলন রয়েছে। এর বিষয়বস্তু হলো, মায়ের জননী সুলভ স্নেহমমতার প্রকাশ এবং সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলকামনা। বালোচী ঘুম পাড়ানি গানে এই মমতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এদের জাতীয় মনোভাবের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসূতি মনে করেন যে, তার সন্তান হবে যুদ্ধক্ষেত্রে দলের অগ্রণী ও অমিতবিক্রম শিরাজ-এর তলোয়ার চালাতে অদ্বিতীয়। যেমন, —

'আমার সন্তান যখন যৌবনে উপনীত হবে,
তখন তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে।
আর দুই অস্ত্রে সে সজ্জিত থাকবে
ঢাল, বন্দুক, ছোরা, তূণভরা তীর ও ধনুক
আর শিরাজী তলোয়ার।
সে চলবে সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোটকীতে,
আর হরণ করে আনবে তার রূপ-গুণে মুগ্ধা শত্রু কন্যাকে।'
'ঘুমাও ঘুমাও আমার ছোট্ট খুকুটি,
সে ডাকে তার বাবাকে, চাচাদের,
ভাইকে আর ভাইয়ের সুন্দর বন্ধুদের,
আর তার সিংহের মতো সাহসী চাচাতো ভাইদের।
'এসো, সকলে এসো আমার ভাবুতে।
কেন না, আকাশে মেঘ ঘনিয়েছে
তোমাদের ক্বরধার ঢালা অঙ্গের, আর পূর্ণ তূণ-তীর
বৃষ্টিতে ভিজে সোদা হয়ে যাবে।'
গাস-বালিকারা কাজে চলে গেছে,
গাই আর বাছুরগুলি গেছে জঙ্গলে,
গুজার রাখাল দল গেছে গরু চরাতে,
ঘুমাও, ঘুমাও আমার ছোট্ট খুকুটি।

বালোচী 'নারিক' গানের মধ্যে পড়ে ঘুমপাড়ানি গান, দোলনার গান এবং খেলাধুলোর গান। পূর্ব-বালোচিস্তানে 'লোলী' প্রচলিত আর মেকরান, খারান, লাসবেলা অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে 'নারিক'। 'লোলী'র তুলনায় 'নারিক'-এর বিষয়বস্তু অনেক বেশী ব্যাপক। 'লোলী' গান মায়ের গান। কিন্তু 'নারিক' গীত হয় নবজাতকের মা ও বোন— উভয়ের পক্ষ থেকে। বাগদান, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক উৎসবাদি উপলক্ষে সমবেত মহিলা ও বালিকাদল ঢোলক সহযোগে একতানে 'নারিক' গান করে থাকেন ঃ

'খোদা জানেন সেদিনের কথা
যেদিন আমার প্রভু ফুলের মতো একটি কন্যাকে
বিয়ে করে আনবে।
কঠোর পরিশ্রম করে

সে জমা করবে পাহাড়-প্রমাণ সোনা রুপো।
খোরাসান থেকে এমন একটি বৃক্ষ সে নিয়ে আসবে
যাতে ফল ফলবে সোনা রুপোর
আর ফুল ফুটবে রঙিন হীরা-মুক্তার।'

'মোদক' হলো বালোচ শোকগীতি। পরিবারের প্রিয়জনের মৃত্যু হলে এ গান সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। এতে থাকে সোজাসুজি ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত শোকবর্ণনা – দুঃখ-বেদনার একান্ত অকপট প্রকাশ। মৃতের প্রতি শোকবাক্যও এর বিষয়বস্তু। মৃতের জীবনকাহিনী এবং চরিত্রাদর্শ নিয়েও এতে অনেক কথা বলা হয়।

সর্দার মুহম্মদ খান বালোচ বলেন : মৃতের ঘোড়া, বর্শা ও তলোয়ারের বর্ণনা, সভাসদ ও বন্ধুদের নিয়ে তাঁর আড্ডা, প্রণয়কাহিনী, তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য, সাহস, শক্তি, ঔদার্য, দুঃসাহসিক অভিযান, যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠন—এসব কিছুই 'মোদক'-এর বিষয়বস্তু।

সাধারণ নর-নারীর শোকগাথা হয় স্বভাবতই সহজ সরল। এতে থাকে বালোচজাতির সাধারণ গুণাবলীর ব্যাখ্যান, যেমন, সাহসিকতা, অধ্যবসায়, আতিথেয়তা ইত্যাদি। কোনো মহিলার মৃত্যু হলে তাঁর সম্পর্কে 'মোদক'-এ উল্লিখিত হবে নারীসুলভ গুণাবলী, যথা, রূপ, সারল্য, অনাড়ম্বরতা ইত্যাদি। পুরো তিনরাত তিন দিন ধরে মৃতের গৃহে 'মোদক' গীত চলে।

জনৈক সর্দারের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত একটি প্রসিদ্ধ মোদক গীতির অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

'এ কিসের শোরগোল ?
পৃথিবী কেন কেঁপে কেঁপে উঠছে ?
আকাশে দাবাগ্নির ঝলক,
বৃষ্টিতেও যেন আগুনের জ্বালা,
ওপরে আকাশে উড়ন্ত চিলদের সারিতেও
যেন আগুন জ্বলছে।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

(ক) বুলবুল অ্যান্ড দি রোজ : আহম্মদ আলি
(খ) বালোচ লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য : নাসির আহম্মদ ফারুকি (সম্পাদিত)
(গ) এশিয়া : এ হ্যান্ড বুক : গাই উইন্ট (সম্পাদিত)
(ঘ) ভয়েসেস ফ্রম দি ইস্ট : জুলফিকার আলি খান।

আমার নৃত্য

ব্লেইজ সেঁদ্রারস

অনুবাদ : কমলেশ চক্রবর্তী

প্রেটো কবিদের দেন নাই নাগরিকত্ব নবরাষ্ট্রে
জনপ্রিয় ইহুদি
দার্শনিক ডনজুয়ান
কথুগো, আত্মীয়স্বজন
তোমরা ভুলেছ রীতিনীতি যথা নূতন অনার্জিত স্বভাব
পত্রপত্রিকার অত্যাচার থেকে আবশ্যিক পলায়ন
সাহিত্য
নিঃস্ব জীবন
ভুলে যায় আত্মাভিমান
মুখোশ
নারী, নাটসে আমাদের যে নৃত্য শেখাতে চেয়েছিলেন, যে নৃত্য
নারী
অথচ তা ব্যাজস্তুতি ?
সর্বদা আসে যায়
তুলনারহিত সৃষ্টিছাড়া
জনতা গণেশ, দেশ দেশান্তর দেশ
তাই নও এখন তেমন বৃহৎ বোঝার মতো
ভারহীন
আমি একজন ভদ্রলোক, ঘুরি এ-মুড়ো ও-মুড়ো য়ুরোপের
বিখ্যাত সেসব দ্রুতগতি ট্রেইনে
দুচোখ জানালা ছেড়ে বেদনা বাইরে
দৃশ্যে আর তেমন টানে না দুচোখ
তবু দেখি দৃশ্যের নাচ
নৃত্যপরা ভূপ্রকৃতি
ডিডাং ডিডাং ডিডাং ডিডা
দিকে দিকে আমি ঘুরছি ফিরছি।

অনুবাদক লেখক কমলেশ চক্রবর্তী গত ২রা জুলাই, ২০০২ প্রয়াত হন। মৃত্যুর আগে তিনি আমাদের ব্লেইজ সেঁদ্রারস-এর কবিতাগুচ্ছ অনুবাদ আকারে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর মৃত্যুর পরে অনুবাদ পত্রিকা' মে—সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হওয়ার পরে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারিনি। বর্তমান সংখ্যায় উক্ত কবিতাগুচ্ছের একটি কবিতা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হল। তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

সম্পাদক—অনুবাদ পত্রিকা

লুকোচুরি

কিশ্বর নাহিদ (পাকিস্তানের মহিলা কবি, জন্ম ১৯৪০, লাহোর)
অনুবাদ : নবনীতা দেবসেন

খুব মজা অন্ধকারে দেখতে
যখন ছায়ারা শরীর নেয়, আকার নেয়,
তোমার কল্পনা অন্বেষণী।
অন্ধকারে হাঁটতেও খুব মজা—
কাউকে ধাক্কা মারলেও সে তখন
মাপ করে দেয়।
অন্ধকারে কাঁদতেও খুব মজা
তোমাকে এখন চোখ ঢাকতে হয় না।
হাসিটা ঠোঁট দিয়ে—
যদিও কান্নার শব্দটা কিন্তু
হাসির খিলখিলের মতো
শোনানো চাই!
অন্ধকারে দৌড়াতেও মজা
যখন জীবনের সঙ্কেত সুতোর হালকা ঘেরো ছিঁড়ে যায়
আর গাছ থেকে তাড়িয়ে দেয় পাখিদের।
তোমার পড়া উচিত আমার হাতের অন্ধকারের রেখা
অন্ধকারেই।
আলো জ্বেলে
কলঙ্কিত হাতের
কলঙ্কিত ভাগ্য কীরকম।

দাঙ্গার পটচিত্র

ভূমিকা ও অনুবাদ : জ্যোতির্ময় দাশ

সুন্দর লোহিয়া (জন্ম ১৯৩৩) : কবি এবং গল্পকার। হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট পত্র পত্রিকার নিয়মিত লেখক। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম 'নঈ কাহানী'। হিমাচল প্রদেশের একজন বলিষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর রচনা মারাঠি, গুজরাতী ও পাঞ্জাবী ভাষায় অনূদিত। নিজের বিপন্ন সময়ের মানবিক সমস্যা ও ভাবনা তাঁর লেখার মূল প্রতিবাদ্য বিষয়। 'দাঙ্গার পটচিত্র' কবিতাটি সমকালীন সময়ের চিন্তাধারার এক বলিষ্ঠ প্রতিফলন।

দাঙ্গা : এক

তারা আমাদের কাছে এল
তারা বক্তৃতা দিল
এবং তারপর
তারা চলে গেল

তারা অন্তর্হিত হবার পর
পোড়া বাড়ির নিকষ কালো থামটি
বিধ্বস্ত জানলাদের জিজ্ঞাসা করল :
তারা চলে গেছে কী ?

একটা পোষা কুকুরের মতো
তারপর সে
তার চোখ বুজিয়ে ছিল।

দাঙ্গা : দুই

কিভাবে যেন কথা চালাচালি হয়েছিল
পাতা আর ডালপালাদের
নিজেদের মধ্যে

একটি চড়ুই তার বাসা থেকে বেরিয়ে
তার ডানাহীন বাচ্চাদের জন্য
ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল
ঠিক সেই সময়েই

একটা উন্মাদ ডাল
তাকে গলা টিপে মেরে ফেলল।

দাঙ্গা ঃ তিন

যখন
একটা কুকুরের অবিশ্রাম ঘেউ ঘেউ চিৎকার
শহরের ঘুম ভাঙিয়ে দিল
কুমারী মেয়েরা খোলা জানলা থেকে
বাইরে ঝাঁপ দিয়েছিল
এবং আত্মহত্যা করেছিল।

দাঙ্গা ঃ চার

একটা শকুনি
দেখল একটি শিশু
মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে বসে কাঁদছে

সে তাকে উঠিয়ে নিয়ে
পালিয়ে গেল।

দাঙ্গা ঃ পাঁচ

মৃত্যুযাত্রী মানুষটি
তার সমস্ত পুঞ্জীভূত ঘৃণা নিয়ে
থুতু দিয়ে ছিল হত্যাকারীর মুখে

এবং সমস্ত জীবন
সেই হত্যাকারী
ব্যর্থ হয়েছিল তার মুখ মুছতে।

দাঙ্গা ঃ ছয়

রাজাটি
কিংবদন্তির খাদককে জিজ্ঞাসা করেছিল
ওরা এই মৃত দেহগুলো
উঠিয়ে নিয়ে গেল না কেন বলত ?

সেসার লোপেস-এর কবিতা

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এ-বছর জানুয়ারি মাসে ভোপালের ভারত ভবন আয়োজিত বিশ্ব কবিতা সম্মেলনে কুবা থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কবি সেসার লোপেস (জ ১৯৩০)। গোড়ায় আসার কথা ছিল নার্সিস মোরেহনের ; নার্সিস মোরেহন লা হাবানার কাসা দেস্ লাস্ অমেরিকাস-এর ক্যারিবিয়ান দফতরের পরিচালনা করেন—ঠিক সেই সময় তাঁকে আফ্রো-ক্যারিবিয়ান দফতর আয়োজিত একটি সংস্কৃতি মেলার উদ্‌যোগ করতে হচ্ছিল বলে ন্যার্সিস মোরেহনের পক্ষে শেষ অব্দি ভোপাল আসা সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর বদলেই বলা যায় ভোপালে এসে পৌঁছেছিলেন সেসার লোপেস।

সেসার লোপেস বিপ্লবোত্তর কুবার প্রধানে কবিদের একজন, কুবার লেখক সংঘের সদস্য—কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রকে। তাঁর সব কবিতাই, অলঙ্কৃতভাবে, নিঃসংকোচে, রাজনৈতিক কবিতা ; কিন্তু কখনও সেটা ঠিক উগ্র আওয়াজ বা জিগির তোলে না ; তিনি বরং সূক্ষ্ম সংবেদনশীলভাবে এটাই খুলে দেখাতে চান বিপ্লবের আগে, ১ জানুয়ারি ১৯৫৯-এর আগে, কুবা কী ছিলো আর এখন কী হয়েছে বা কী হতে চলেছে। কোনো কিছুই চরম বা পরম নয় —সবকিছুই আপেক্ষিক ; তার ফলে তুলনার জন্যে বিপ্লবের আগে-পরের কুবাকেই তিনি কবিতায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেন তা নয়—কুবার সঙ্গে তুলনায় আসে বিদেশও। যারা বিপ্লবের পরে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে, সেই দেশান্তরীদের করুণ পরিণামও তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই লা হাবানা অর্থাৎ একটি নগরকে কেন্দ্র করে লেখা 'নগর-পুঁথি'—প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ইত্যাদি। এমন আশ্চর্যভাবে হয়তো বই হাবানার কথা—অতীতের আর এখনকার—আর-কোনো কবির লেখায় ফুটে ওঠেনি। তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে প্রচুর মগজ নর্দমার জল দিয়ে ভেসে চলে যায় পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যে—এটা নিছক কুবারই সমস্যা নয়। অনুবাদ করবার সময় আমার মনে হচ্ছিল সেই সব ভারতীয়র কথা যারা স্বর্ণমৃগের সন্ধানে বেরিয়ে পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলোয় সারা জীবনের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব বেছে নিয়েছে।

এখানে যে-সব কবিতা অনুবাদ করা হলো সেসার লোপেস সেগুলি ভোপালের কবিতা সম্মেলনে পড়ে শুনিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ইংরেজিতে তর্জমা পড়ে শুনিয়েছিলেন গুজরাতি কবি ও শিল্পী প্রবোধ পারিখ।

নগর-পুঁথির প্রথম ভাগ

(অংশ)

বৃষ্টি ধুয়ে যায়

বৃষ্টি ধুয়ে যায় নগর সাফ করে, যেন যা ছিলো যত ময়লা।
সেই পেলাইয়োর রাস্তা ধরে ছোটে বাদলধারা, সব ঝপঝপ,
সমস্ত যত-কিছু ধুয়ে করেছিলো একটু সেরা তাকে বললে,
এবং সাথে-সাথে দু-পাশে গড়ে তোলে কাদার পিচ্ছিল স্তূপকে ;
বিপদে ফেলে সেরা বাচ্চাদের যত শৈলব সুকুমার জন্য ঃ
হাত-পা-মুখই শুধু নয় তো, সারা গায়ে ছিটকে এসে লাগে কাদার ছোপ ;
বাচ্চাদের কেউ ঐ যে লাফ দিলো, কেউ-বা পই-পই ছুটছে,

চপল-চঞ্চল যেন-বা ছাগশিশু হঠাৎ কেন ছোটে ঠিক নেই।
স্বচ্ছ প্রাঞ্জল বাদলধারা—সে যে দারুণ নদীদেরও প্রভু
যে-সব নদীজলে অনেক আছে নাকি গল্পে-পড়া-যায় এমন মাছ,
(তারা যে নেই তাতে কিছু কি এসে যায় ? তবু তো তারা রূপকথাতেই আছে)
আর যা পড়ে আছে বাদামখোলা কিছু, ছেঁড়া কাগজ, চিঠি রহস্যের,
কত-যে ঝরা পাতা হরেক রঙে মাখা, মরা বেড়াল দুটি ভাসছে,
এখানে-সেখানেও আরো তো পড়ে আছে অকথা সব কন্তু।
ছোটোরা ছোটোরাই, আমরা জানি তা তো, নদীর সুতরাং ফাঁক খোঁজে,
অপেক্ষায় থাকে, আর ততক্ষণ সাদরে প্রশ্রয় একটু দেয়,
অন্ধ রাখে তার নিজেরও ছাপ ; বলে, 'এই-যে এসে পড়ে সদলে
বালির পথ ধরে ডাইনি-জাদুঘর, ছিনিয়ে নেবে ঠিক—দেখবে—
বাচ্চাদের এই স্বচ্ছ রাজবাড়ি, চমৎকার চকমেলানো।'
কেই-বা জানে বলো হাওয়ার মিনারের কখন কী যে হয় কোন মানে,
পুরোটা গড়বার আগেই সে মেলায়, চোখেরই বিভ্রমে সুন্দর,
ভুলেছে মাথা যেন আকাশে স্পর্ধায় মেঘকে ছোঁবে এই নেই-নিশ্চয়।
বৃষ্টি নিয়ে আসে বাইরে ছোটোদের যখন জমজম করছে ;
তা বলে এটা নয় বৃষ্টি না-ই হলে ছোটোরা এ-নগরে থাকে না—
তবে সুনিশ্চিত বর্ষা নামলেই বেরিয়ে আসবেই ছোটোরা।
(ঝিনু এবং ছোটো—এ দুয়ে মনে রেখো। তফাৎ আছে খুব সত্ত—
এ-কথা অন্তত আমার আবুয়েলা আমাকে বহুবার বলেছেন,
তাছাড়া আছে কত ত্যাদড়, ডানপিটে, কিনু, বেআদব, চ্যাংড়া)।
তাদের শোরগোল উপচে ওঠে সব কাঁচামাটির পথে রাস্তায়
এ-ধার থেকে যদি ও-ধার যাও তুমি মস্ত নদীর কিনারে
শুনবে হুল্লোড় হাওয়ার চমকায় নগরসীমানাকে ছাড়িয়েও।
কী আর মানে হয় না-হলে বৃষ্টির, যদি-না দাও তুমি ভাসিয়ে
কাগজতরীগুলো—অজানা ইচ্ছার হালকা সব ভেলা— অন্ধ কিংকিং বিনিয়ে
ছুটিয়ে দিতে পারো সেই-দেশের পানে কাগজ ভাঁজকরা নৌকো।
এই-তো মরুদ্যম কত-কী ভাববার বলা-ছেড়ে-দেয় কল্পনার
যেখানে রেদলান—দিগ্‌বিজয়ী সে তো—কিম্বজরে বুঝি বেরুলো,
কিংবা 'টারজান' হেঁকেছে বুনো সুরে সে-কোন দুর্গম বনে যে,
কেননা বিকেলে তো ক্রিয়াকর্মেতে আর ছোটোরা আসতেই পারে না।
ছোটোরা, এটা ঠিক, সিনেমাহলে ঢুকে যা-খুশি তা-ই বলে হাসবে,
কিন্তু টিপ্পনী, অন্ধ গালাগাল, ধমক, বকুনির রাগি বুলি

শেষে তো ছেলেটাদের বুঝিয়ে দেয় ঠিক তাদের স্থান হলো বাইরে,
দিবিা প্লেন এমনভাবে তারা বাইরে গাছে গিয়ে চড়ুক না,
পড়ুক গাছ থেকে ভাঙুক খাড়াপিঠ, কারই বা তাতে কিছু এসে যায়
না-হলে, কেন, তারা হাঁ করে বসে থাক কখন বৃষ্টিরা নামবে।
—খোকা! কী? কানে গেলো? বলছি পই-পই নিগারদের সাথে খেলবি না।—
অথচ পরে তুমি যখন কলেজে বা বিশ্ববিদ্যার আলয়ে,
কাফেয়, রাস্তায়, যে-কোনোখানে যাও কেমন করে তুমি এড়াবে
কালো মানুষদের? মুলাটো-মেস্তিসো? নগর থেকে মেরে তাড়াবে?
ধরো না একদিন যখন তুমি এক মস্ত ডাক্তার হয়েছো—
হঠাৎ রাস্তায় সামনাসামনিই দেখলে থাকে তাকে চিনতে···
খুশিতে মেতে ঐ ছেলেটারা ঢিল ছোড়ে, ছিঁড়ছে জুঁইফুল বাগানে,
পেয়েছে বাগে, এক কুকুর পাকড়েছে, ক্যানেস্তারা বাঁধে লেজুড়ে,
অথচ দোলোরেসের কাছেই ধনীদের জাঁকালো নবোদয় ইস্কুলে
অপাপবিদ্ধের রাজার মাথাটায় মুকুট পরানোর উৎসব।
বলয়বিভা কিবা, প্রজ্বলিত মোম, সাজানো জমকালো শোপ যে,
নথর পুষ্ট সে, সোনালি চুল তার, সপ্রতিভ ধুব, পদক-ঝোলঝুষা টলমল,
পালক, মখমল, সবাই এসে দ্যাখে গোলাপি-সাজপরা রাজাকে।
রাজা—সে ছোট্টই, কোমল দুর্বল, কেমন থরথর কাঁপছে।
আমার মনে হয় পারলে বুঝি সেও এক্ষুণি দিতো চোঁ-চা চম্পট
বাইরে রাস্তায় খেলা ও হুল্লোড়ে মাতলে তারও ভালো লাগতো।
অথচ জেসুয়িট চেলারা বা পুরুৎ ছাত্রদের গড়ে কিম্ভূত,
এবং আমাদের মাঝে-মাঝেই দেয় হাওয়া ও আবহাওয়ার বার্তা,
এখন ঐ দ্যাখো মুষলধারে ঝরে অঝরঝর ঝরে বৃষ্টি।
এখন ছেলেটাদের নতুন ধারাজলে নেয়ে নেবার এলো লগন
আর যে বাড়িগুলো নিচু জমির পর, সেগুলি হেনোজলে ভাসবে।
চাঁচাবে হুড়োহুড়ি, ঘণ্টা ঢং ঢং আসবে দমকল কত যে!
ছাতা বা বর্ষাতি কিছুই নেই কারু, সব্বাই জানে সালু সেন্ট্রিতোর
হয়তো ছাতও নেই এসব চালাঘরে, কিংবা নেই বুঝি মেঝেটাও।
যদি-বা ডাকে যান কী করে দমকল—ছেলেটারা কেউ কিছু জানে না।
সজোরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে শুধু আগুনেই জ্বলজ্বল জ্বলছে,
বন্যা এলে, বলো, এ-সব দমকল না হলে কোন কাজে লাগবে?
কারণ যদি ধরো আগুনে ঝ'রে যায় লোহার জিনিসের দোকানে
অথচ যদি লাগে ভীষণ দাউদাউ সিনেমাহল ঐ প্রাচীতে,

সে তবে নিশ্চয়ই কাণ্ড হৈ-হৈ, উত্তেজনা তবে তুঙ্গে।
মায়েরা ব'সে-ব'সে কুশিকাটা বোনে, গল্প জুড়ে দেয় কত-কী,
কেউ-বা মনে-মনে আউড়ে যায় জপ, কেউ-বা ভাবে মেলা বসাবে
যাদের দুর্গতি সবার চেয়ে বেশি তাদের তরে টাকা তুলতে—
সেখানে বিক্রিতে যা-টাকা পাওয়া যাবে দেবে তা সবই তারা খয়রাতে ;
কেমন অদ্ভুত চোখের জল ফ্যালে, কেউ-বা খেলে তাস, কেউ-বা
দু-এক পাত্তর টেম কলিন্‌স খায়, এটা তো ঠিক জেনো আমাদের
সকল সত্ত্বেও বাঁধতে হবে বুক, চলে না বিচলিত হওয়া যে।
আসলে এ-শহর নিজেই বর্বায় করছে ঝমঝম অঝোরে,
মুষলধারে জল করছে জানলায় অথবা নালা খানা গর্তে।
কবে যে হবে বড়ো কিশোরী বা কিশোর, ছোটোরা দ্যাখে সেই স্বপ্ন।
কিশোর-কিশোরী, অথচ, এটা ঠিক, কোনোই স্বপ্ন তো দেখে না—
এ-সব পুরোপুরি নিষিদ্ধই ছিলো সেদিন ছমছমে শহরে।

নগর-পুঁথির দ্বিতীয় ভাগ

বেশির ভাগের কাছে সে ছিলো বিস্ময়। কিছুই যায় না এসে এতে।
এত চেনা অচেনা মানুষে—সব ধরনের লোক—
বদ্ধপরিকর ছিলো এ-নগর ছেড়ে যাবে বলে। এত-সব লেনদেনা, কাজ,
কত-যে কাগজ, কিউ, শীলমোহর, জটিলতাভরা ছাপ, লাঞ্ছনা, নিগ্রহ
অথবা কখনও বিবিধ বিপদে ভরা দিনগুলি
অনিশ্চিত কেটেছিলো আশ্রয়ের খোঁজে
অচেনা গন্তব্যে গিয়ে। কিংবা হয়তো যায়নি কোথাও, পায়নি আশ্রয়,
রাত্রি আর ঠাণ্ডায় হারানো, যেন সিন্ধুজলে তার কেটে গেছে 'দীর্ঘ' চিরকাল,
হাঙরের নৈশভোজে
(না-হয় উহাই রহিলো যত প্রতারণা, কোনো বা চরম ক্ষেত্রে খুনজখম)
নগরী বিক্ষত হয় প্রস্থানে-প্রস্থানে, ক্লান্ত হয়, অবসন্ন হয় ;
যারা তবু বাস করে, হাতে তার বুকে সুকঠোর
ধারা থেকে যায় তবু, শুধু তো তারাই এই নগরীর সত্য অধিবাসী।
যখন, কাজেই, তুমি জাঁক করে বলো ঃ থাকবো না এখানে আর,
অন্য দেশে চলে যাবো, অন্যকোনো সমুদ্রে যাবোই,
এর চেয়ে ঢের ভালো অন্যকোনো নগর জুটবেই—
তখন তোমার

সমস্ত গভীর বোধ ভাগ হয় দুই দলে (যথার্থ বন্ধুতো বাঁচে চিরকাল—
প্রকৃতি এ-কথাই বলেছিলো) যারা মাঝে-মাঝে এসে
তোমার সাথেই সব ভাগ করে নিতো
নগরীর বিভিন্ন ঘটনা, কত ত্যাগ, বিসর্জন, কত-কিছু প্রত্যাশা-অধীর।
এটা তো এমন নয় এখন দেয়ালগুলো অথবা কিচারিলয়গুলো
কিংবা কিছু বই পুঁথি তোমাকে নিবেদিত করে রায় দেয়।
এটা নিয়ে কিছুই ভেবো না তুমি। হাঁদা!
যারা আছে অপেক্ষায়, যারা সব খরচ দিয়েছে এই পালিয়ে যাবার
তোমায় সান্ত্বনা দেবে তাদেরই বাহবা।
তবে যতক্ষণ হাওয়া থাকে এরকম, সে তো পেড়ে নেবে সব ফল,
পপলারবীথি থেকে, সে দেবে ছড়িয়ে সব গান রাতভর
যখন যথার্থ যত ঝুগলেরা কেবল সংগ্রাম করে রাখে বা বিক্ষোভে,
সে হয়তো সব শুনে প্রতিবাদই ক'রে উঠবে,
যারা সারাক্ষণ নগরীকে গ'ড়ে তুলবে ব'লে কাজ ক'রে যায়
অন্তরঙ্গ কী-গভীর ধাক্কা খাবে তারা,
তাছাড়া জানাই আছে "আস্থা ও বিশ্বাস—
যে-আস্থা করে না দ্বিধা, সংশয়ে ছেঁড়ে না কোনোদিন
সে তো মরা-বাঁচন জানে না—"
যাদের পেছনে ফেলে চ'লে গেলে তোমাদের সেই ছেলেমেয়ে
তোমাদের ভুলে যাবে কিংবা হয়তো মনে রাখবে সেনিওর কী নাম তোমার?
নগরী তো একই থেকে যাবে—কপালে যা থাক তার—
যারা তাকে ছেড়ে চ'লে যায়, যারা খোঁজে অন্যকোনো দেশ,
আরো প্যারী, অথবা সুন্দর
তাদের নগরী হয়তো মনেও রাখবে না।
আমাদের পক্ষে, তবু মোটেই হবে না ঠিক রটে চড়ানো—
এমনও তো হ'তে পারে তারা পেলো যা তারা চেয়েছে।
হয়তো আছেও কোনোখানে
চমৎকার পরিবেশ, ছোট্ট শহর, কিংবা যদি চাও কোনো রাজধানী,
আশ্চর্য, মায়াবী,
আর অনা ছেলেমেয়ে যারা গিয়ে নৌকোয় উঠেছে, ভুলে যাবে,
কিংবা হয়তো পরে কোনোদিন
কোন চেষ্টা না-করেই তোমাদের মনে পড়ে যাবে
বিদেশে কারুরই কোনো বাড়ি নেই (বাসা থাকতে পারে),

ভিনদেশে তুমি তো নেহাৎই
অচেনা খাপ-না-খাওয়া আগন্তুক শুধু,
ফেরার সকল পথ রুদ্ধ যার, বে-দেয়াল বন্ধ হ'য়ে আছে
তাতে শুধু মাথা কোটা ছাড়া অন্যকোনো সম্ভাবনা নেই যার।
স্মৃতিহীন এ-সব সন্ততি দেবে একদিন নালিশ জানাবে,
ডিরস্কার, ভর্ৎসনা, তাদের মৃত্যুর জন্যে তোমরাই দায়ী।
নগরী কখনও যদি রসাতলে চ'লে যায় দ্রুত,
ধ'রে নাও ঘ'টে গেছে অভাবিত এমন কিছু-বা,
যারা থেকে যাবে সেই রসাতলে তারা থেকে যাবে
আত্মসম্মানের সাথে, মর্যাদায় ভরে
বুকি নেবে ইতিহাস।
আর তোমরা
পাবে না নতুন দেশ, পালাবে না অন্যকোনো সমুদ্রের জলে।
এ নগর চিরকাল হানা দেবে তোমাদের, জেনো!
অদ্ভুত সজীব কোনো প্রাদুর্ভাবের সমূহ বন্যার
চারপাশে পাক খাবে বিস্মিত, আহত—
তোমরা এখন যাও অনিশ্চয়ে সন্দেহদোলায়
যেখানে সমস্তক্ষণ ছটফটই করে যাবে শুধু।
তোমাদের এটাই নিয়তি—
জানো না সামান্য এই সহজ কথাটা?
মেনে নাও তর্ক না করেই :
'এইভাবে সেইখানে, এখানে যেমন, বাঁচন তোমরা দেবে ধ্বংস করে,
ঐ ছোটো মোড়টায়, এবং বিশাল এই সারা পৃথিবীতে
সত্যানাশ সর্বনাশ হয়ে গেছে তোমাদের আজ।'
হয়তো কখনও তোমরা এ কথাটা মানবে না, বিশ্বাসও করবে না,
বারে বারে স্বপ্ন দেখে যাবে
রেশ রেখে যাবে কোনো করুণ কারনিভাল বুকি,
বেশ তবে, দুঃখ কেটে যায়,
নগরী সেলাম ঠোকে তোমাদের তোমরা তাকে ছেড়ে যাচ্ছো বলে,
তারপর রাস্তায় কেউ থুতু ফালে, একবার, নিজের কাজে সে চলে যায়।
দিন কেটে যায় তারপর। আরো, আরো, আরো দিন কাটে।

স্টিল-লাইফ

ম্যানুয়েল সি. রোড্রিগুয়েজ

অনুবাদ : তিতাস মিত্র

বাগানটা যেন জীবনে ভরে আছে। বাগানটা পরিচর্যা করার সময় গুন গুন করতে করতে ফুলে ছেয়ে থাকা গাছ-গাছালিতে মালি জল ছিটোচ্ছিল। আমগাছগুলো যেন আনন্দে ভরপুর। সেই আমডালেই কাঠবেড়ালীগুলো অগোছালো ভাবে আনন্দময় ভঙ্গিতে পরস্পরের পেছনে দৌড়দৌড়ি করছে আর চড়াইপাখির কচকচানিতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। কিন্তু মিঃ ফেলডনের খাবার ঘরে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। ঘরটা যেন জীবন্ত নয়, যেন একটা জাদুঘর। টানটান সাদা পোশাকে খানসামাটি মূর্তির মত ঘরের এক কোণে ফলভর্তি প্লেট আর গোলাপে ঠাসা ফুলদানিটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফেলডন ও তাঁর স্ত্রী নিঃশব্দে চা পান করতে বসেছিলেন, যেন নদীর বিপরীত তীরে বসে থাকা দুই অপরিচিত পথিক। শ্রীমতী ফেলডনের কাছে এই নিস্তব্ধতা অসহনীয় নয়, কিন্তু চাকরটা কি ভাববে? "তুমি একটুকরো কেক খাওনা গো? এটা বেশ ভালো। খেতে পার।" অবশেষে শ্রীমতী ফেলডন নিস্তব্ধতা ভাঙলেন।

তাঁর কথাটা অপরপক্ষে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না।

"আমি মনে করি, এখন থেকে আমার ভালো মন্দটা আমিই ভালো বুঝতে পারব।" তাঁর স্বামী কথাটা বলেই হাতের বইটা টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে যখন ফিরলেন তখন বাইরে বেরোবার জন্য তিনি তৈরি। শ্রীমতী ফেলডন আরো সাবধানে তাঁর উদ্বেগ দেখালেন। "বেশি দেরী কর না গো, রাত্তিরে (বইটো) এমনিই স্যাঁতস্যাঁতে থাকে। তাতে তোমার শরীর খারাপ হতে পারে।"

ফেলডন কোনো উত্তর দিলেন না। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে মালাবার হিল ঘুরে সোজা মেরিন ড্রাইভে গিয়ে থামলেন। অনেকক্ষণ সমুদ্রের দিকে মগ্ন হয়ে তাকিয়ে বসে রইলেন যেন সাগর প্রিয়তমের মতো অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিল।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল দেখা করার কথাটা। পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে ঠিকানাটা খুঁজে গাড়িটা সোজা শহরাঞ্চলের দিকে চালালেন। পুরনো তিনতলা একটা বাড়ির কাছে গাড়িটা রেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা একটা দুয়ারের ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়লেন।

"মিঃ রেগো কি আছেন?"

মিসেস রেগো যিনি দরজাটা খুলেছিলেন, তাঁর ছেলেকে ডাকলেন।

"ভেতরে আসুন না।"

আগন্তুক শিল্পীর স্টুডিও কাম শোবার ঘরে ঢুকলেন। ঘরের এককোণে একটা কাঠের আলমারি। তাতে সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীতের ওপর বেশ কয়েকটি বই। আলমারির পাশের টেবিলে শিল্পীর আঁকার কিছু সরঞ্জাম আর— তার প্রথম স্থাপত্যের নিদর্শন রাখা আছে।

আমার নাম ফেলডন—মার্টিন ফেলডন' আগন্তুক তাঁর পরিচয় দিলেন।

'বসুন বসুন' চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে আলভারো বলল।

"ধন্যবাদ। ঐ কাজটা কি আপনার?" দেয়ালে টাঙানো একটা দৃশ্যপট দেখিয়ে ফেলডন জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ ঐ সব ছবিই আমার আঁকা।"

"সত্যি সুন্দর! মহাবালেশ্বরে করা?"

"না, মাথেরন।"

"একদম ঠিক! মনে পড়ছে, আর্টিস্ট পয়েন্ট। তাই না? এটা দেখে আমার ভেনিসে এক বন্ধুর বাড়িতে দেখা একটা ল্যান্ডস্কেপের কথা মনে পড়ছে।"

এরপর ফেলডন একটু চুপ করে থাকলেন। পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে অ্যালভারোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ধূমপান?' 'ধন্যবাদ।'

মিঃ ফেলডন সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে আস্তে আস্তে একের পর এক কুণ্ডলাকৃতি ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

তারপর হঠাৎই উঠে পড়ে আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। যেন টগবগ করে একটা কিছু তাঁর ভেতরে ফুটছে। একমাত্র কিছু করলেই যেন তার থেকে মুক্তি পাবেন।

"মিঃ রেগো, মনে হয় আপনি বইটই পড়েন।"

"না আমি সেরকম বেশিকিছু পড়ি না। পছন্দসই কিছু পেলে তবে।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি বাইবেল পড়েন।" তাঁদের আলমারিতে এক কপি বাইবেল দেখে ফেলডন বললেন। "আপনি কি গিটারও বাজান?" কি করে স্প্যানিশ গীটার বাজাতে হয়—আলমারিতে রাখা এই বইটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

"সে রকম নয়। কিছুটা পারি।" শিল্পী জবাব দিল, "সঙ্গীত ও বাইবেল আমার প্রেরণার অনুপ্রেরণা।"

"তাই বুঝি! আমি মনে করি এরা অশান্ত মন আর দুর্বল হৃদয়ের জীবনদায়ী ওষুধ।" ফেলডন শিল্পীর দিকে ফিরে, একটা ঘোলাটে দৃষ্টি ছুড়ে করে কথাগুলো বললেন।

"আমি আপনার কাছে এসেছি আমার একটা পোর্ট্রেট আঁকানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। আপনি কি তা করবেন?

"আমি জানি। আর সেটা একটা মহৎ কাজও।" "কিন্তু আমি আপনাকে দিয়ে যে পোর্ট্রেটা করাতে চাইছি সেটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এবং হয়তো কঠিনও। কিন্তু তার জন্য আমি যে কোনো মূল্য দিতেই প্রস্তুত।" বিতর্ক মূলক কথা! শিল্পী জানে না কথাটা সে প্রশংসার্থে নেবে না ব্যঙ্গার্থে। প্রতিটি পোর্ট্রেটই আকার, ধরন ও রঙের ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ধরনের হতে পারে। কিন্তু কঠিন! এর দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চাইছেন? শিল্পী দ্বিধায় পড়ল। ফেলডন বলতে লাগলেন "আপনার এক বন্ধু ও এক সতীর্থ শিল্পীর মুখে শুনেছি, আপনি সৃজনশীল ও নিজস্ব ধারার বিশ্বাসী। আমি এরকমই একজন শিল্পীকে খুঁজছিলাম, যার একদিকে থাকবে রোমান্টিক কল্পনাশক্তি আবার অন্যদিকে বাস্তববোধও। কথা বলার সময় শ্রান্ত-ক্লান্ত দৃষ্টিটা তাঁর জানলার বাইরেই নিবদ্ধ রইল। "আপনি আমার একজন মৃত হিসেবে ভাবতে পারবেন, মিঃ রেগো? অথবা একজন মৃত ব্যক্তি এখনও জীবিত? যেভাবে আপনি চান।" অ্যালভারো থতমত খেয়ে গেল। খুন, অপহরন অথবা কোন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবার আশঙ্কায় ভয়ার্তস্বরে সে বলল "আমি আপনার কথা বুঝলাম না।"

"ভয় পাবেন না মিঃ রেগো।" বিশ্লেষভঙ্গিতে বললেন ফেলডন, "আমি কেবল এটা আমার স্ত্রীকে উপহার দিতে চাই—মাত্র একটা উপহার, আমাদের বিবাহবার্ষিকীতে।" "যতদূর জানি" মিঃ ফেলডন বলতে লাগলেন "আমার স্ত্রীর ছবি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু সেটা সে পছন্দ করে কারণ অন্য কেউ এটা করেছে বলে। যাইহোক, আমি

ভেবেছি আমার একটা পোর্ট্রেট ভালো উপহার হবে। আমি নিশ্চিত এটা বেশ মজারও হবে। আপনার কি তাই মনে হয় না ?"

মিঃ ফেলডন শুকনো হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিঃ রেগো, আপনি কি ছবিটা আঁকবেন ?"

এরকম একটা প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করা মুশকিল।

এ পর্যন্ত সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য মাঝেমধ্যে সে যা উপার্জন করেছে, সে কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিল। তবে তার ছবি কত দামে বিক্রি হল এর থেকে তার শৈল্পিক প্রতিভা নিয়েই বেশি আলোচনা হয়—এটাও ভাবল।

আলভারো প্রতিশ্রুতি দিল—সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

"ধন্যবাদ, আমি আপনাকে দিয়ে বড় কিছু করাতে চাই। শিল্পী মরলশীল, যার ছবি সে আঁকবে সেও মারা যাবে, আপনি জানেন, কিন্তু তার সৃষ্টি অবশ্যই বাঁচবে। সৃষ্টি সর্বদাই সময় ও সীমাকে লঙ্ঘন করে বাঁচে···শতাব্দী ধরে নিজের গল্প বলে চলে সে—কিন্তু সেটা কোনো সান্ত্বনা নয় শিল্পীর কাছে। আমার তাই মনে হয়।" তার ভাবনাটা যেন পালটে গেল পরমুহূর্তেই, "জীবন কতকগুলো ছোট ছোট পরিহাসে ভরা। বিশেষ করে, এই পৃথিবী মনে করে যে একজন শিল্পীর মৃত্যুই কাম্যিত, তার বেঁচে থাকার চেয়ে। তাই নয় কি ?···হ্যাঁ, ভুলে যাবার আগে এই নিন আমার ছবি।" এই বলে ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা খাম তিনি শিল্পীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

"আর এই কথাটা যেন আপনার আর ঐ বরফের পোস্টবাক্সটার মধ্যেই থাকে, বুঝলেন তো—"

যখন তিনি টুপিটা পরলেন তার সমস্ত অস্বস্তি যেন একটা স্নিগ্ধ ভাব। একটা একশ টাকার নোট আলভারোর হাতে দিয়ে, যাবার জন্য তৈরি হলেন।

"আপনার একটা সিটিং এর দরকার" শিল্পী বলল, "সেটা অবশ্য খুব একটা জরুরী নয়। আমার কাছে আপনার ছবিই তো আছে। কিন্তু আমি আপনার মুখের কতকগুলো অভিব্যক্তির ভাষা বুঝতে চাই।"

"তাই ? এখন ?···কাল ?"

"না এত তাড়াতাড়ি নয়। প্রথমে আমি একটা প্রতিকৃতি আঁকব, আপনার ছবির সাহায্যে। সেটা করতে আমার প্রায় এক সপ্তাহ ঐরকম লাগবে—ঠিক আছে,···আপনি আমায় বুধবার বা তারপরে ফোন করতে পারবেন ? এই ধরুন, বিকেল চারটের দিকে ?"

ঠিক নির্ধারিত সময়ে, আলভারো দেখল মিঃ ফেলডন তাঁর গাড়ি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলেন।

"আমার মনে হয়, আমি আপনার জন্য দারুন কাজ করেছি—" কথা বলতে বলতে শিল্পী তাঁকে ঘরের দিকে নিয়ে এল।

"এর মধ্যেই। দেখি" "না এক্ষুনি নয়। দেখি দয়া করে এই চেয়ারে একটু বসুন। আমি জিনিসটা আরেকটু ঠিক করে নিই।"

আলভারো ছবিটা ইজেলে রাখলো। কাঠের বাক্স থেকে বার করলো প্যাকেটটা। টিউব থেকে কয়েকটা রঙের টিউব টিপে রঙ বার করল প্যালেটে।

"আমি আপনার ছবিতে কয়েকটা রঙের আধিক্য দেখেছি।" ফেলডন, দেওয়ালের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন। "আপনি কি আধুনিকদের উত্তরসূরী ?"

"না ঠিক তা নয়, যদিও আমরা তাঁদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি।" নিশ্চয়ই। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, ভারতের নিজস্ব শিল্পপদ্ধতিও আছে।—রাজপুত ঘরানা, মোঘল ঘরানা···

"সেটা ঠিক। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কোন ঘরানায় বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি প্রতিটি যুগেরই তার একটা নিজস্ব ঘরানা তৈরি করা উচিত, যদি সেটার আদৌ দরকার হয়। আমি বিশ্বাস করি তাতে…"

"দয়া করে এদিকে একটু তাকান। না। আর একটু। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ যা বলছিলাম, আমি পুরনো গ্রুপদী মহৎসৃষ্টি এবং আধুনিক সৃষ্টিশীল আবিষ্কার এই দুয়ের মিশ্রনে বিশ্বাস করি।" "সেটাই ঠিক, আপনার চিন্তাটা আমার ভালো লাগল। কিছু ধরনের উন্মাদ আছে যারা এটা ঠিক বোঝে না জানেন। আমি অস্বীকার করছি না যে একজন ভারতবাসীর তার দেশ সম্বন্ধে জানা উচিত। আপনি জানেন—অজন্তা, ইলোরা, এলিফান্টা বৈদিক স্থাপত্য। কিন্তু মাইকেল আঞ্জেলো, লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চি, ভেলাসকুইজ, মনেত, পিকাসো ভ্যানগগ্ ডেগা' গঁগা—এঁরাও তো অমর! দুটি জগৎকেই গ্রহণ করে এক জন শিল্পী তার যুগের মহৎ শিল্প সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্যই তাকে একটা সংবেদনশীল মনন ও আদর্শগত ভাবধারার অধিকারী হতে হবে।"

"হ্যাঁ" অ্যালভারো বলল, "কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না একজন শিল্পী একজন কারিগরের ওপরে। আমার মনে হয় আপনি যাদের আধুনিক বলছেন তাদের বেশিরভাগই তা নয়। তাছাড়া তাদের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিও ছিল না। গ্রুপদী শিল্পীরা যারা ঐতিহ্যকে ভেঙেছিলেন তাদের যে শুধু রঙ আর রেখাঙ্কনের অব্যর্থ জ্ঞান ছিল তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষ কারিগরও ছিলেন, সেটাই জরুরি কথা, তাঁরা যেমন শিল্পের নিয়মকানুন জানতেন তেমনি তা ভাঙতেও জানতেন। এই কারণেই তারা চির আধুনিক।"

"আচ্ছা। তাই বুঝি…"

"আপনি কি শিল্প নিয়ে পড়াশুনো করেছেন মিঃ ফেলডন?"

"হ্যাঁ, আমার ইচ্ছা ছিল, জানেন।"

"আপনি আমার থেকে শিল্প সম্বন্ধে বেশি জানেন।"

"তা মোটেই নয় মিঃ ডেগো। আমি শুধুমাত্র তার সম্বন্ধে বলতে পারি। আপনি সেটা করতে পারেন। সেখানেই পার্থক্যটা।"

"আপনার কথা বলার ভঙ্গিটা আমার ভালো লাগে।"

অ্যালভারো বলল, "কিন্তু আপনি অত কথা বলবেন না মিঃ ফেলডন। আপনি আমাকে ভুলিয়ে দিচ্ছেন যে আপনাকে আমার মৃত হিসাবে আঁকতে হবে।" এই বলে তুলিটা তারপিন তেলে ডুবিয়ে গালের ওপরটা আলোকিত করার জন্য সবুজ আর গাঢ় বেগুনী মিশ্রিত করল।

"আপনার চোখের ভাষা কথা বলে মিঃ ফেলডন। কিন্তু আপনার চিবুকটা দৃঢ় ও কঠিন।"

"তাই কি? আমার মনে হয় এটা আমার চরিত্রেরই একটা বৈশিষ্ট্য।"

"হতে পারে." শিল্পী হুবহু গালে আর এক পরত গাঢ় রঙ দিয়ে বলল "আপনি এটা বললেন কেন?" ফেলডন জিজ্ঞাসা করলেন।

"কারণ আমার মনে হয় আপনি যা করবেন ভাবেন তা আপনি করতে পারেন না।"

"আপনি কিভাবে সেটা নিশ্চিত বুঝলেন?" ফেলডন আবার জিজ্ঞাসা করলেন। এক মিনিটের জন্য দয়া করে চুপ করুন…আপনার ঠোঁটের স্বচ্ছ নম্রতা আপনার চিবুকের ঠিক বিপরীত।" শিল্পী ঠোঁটদুটো ঘনগোলাপী রঙে আঁকল সূক্ষ্ম সুষম প্রতিফলন আনার জন্য।

"হ্যাঁ বলুন?—"

অ্যালভারো জবাব দিল না। তার মন তখন মানব চরিত্রের অসীম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঘুরছিল—সূর্যালোকের দ্রুতলয়ে পালটাতে থাকা আলোকরশ্মির মত, এ মুহূর্তে এক, পরমুহূর্তেই অন্যরকম। আর এই সবের সামনে তার মানসচোখের সামনে একে একে সরে যাচ্ছিল ফ্রেড, জ্যাক, হেমস্, ভরেল, লোমব্রোসো, তাদের বিভিন্ন শরীরী ও মনোভঙ্গিতে।

"ভালো কথা" একটি নিশ্বাস ছেড়ে সে বললে "আমার মনে হয় প্রত্যেকেরই মুখের আড়ালে একটি মুখোশ থাকে। আর আপনারটা এখানে, মিঃ ফেলডন।" ইজেলটা তাঁর দিকে ঘুরিয়ে বলল "পছন্দ হয়েছে এটা?" ব্রাশটা একটা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলল। মিঃ ফেলডন গুটিয়ে গেলেন পোর্ট্রেটটা দেখে। কি ভয়ঙ্কর পরিবর্তনটা ধরা পড়েছে।

"আমি এটা নিতে পারি?"

"না, আজকে নয়। এটা এখনও ভিজে। ছবিটা শুকোলে এর ওপরে আমি আরও কিছু কাজ করতে চাই।"

পনেরদিনের মধ্যে মিঃ ফেলডনের খাবার ঘরে ছবিটা ঝুলতে লাগল, বেশিটাই তার স্ত্রীর সংকোচের কারণ এবং অনেকটাই তাঁর খুশীর কারণ হয়ে। "এটা একটা অত্যন্ত সুন্দর শিল্পসৃষ্টি বলে প্রশংসিত হয়েছে, যদিও দেখতে যেমন ভয়ঙ্কর। শিল্পী নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছিল ছবিটা আঁকার সময়।" মার্টিন্স পরিবারের এক প্রতিবেশিনী যিনি চা পানের আসরে এসেছিলেন, বললেন মার্টিনকে একজন মৃত হিসেবে আঁকা যা তোমাকে সম্পন্ন করবে এবং সেটা তোমাদের বিবাহ-বার্ষিকীতে উপহার দেওয়া। কি অসাধারণ চিন্তা! তুমি মার্টিনকে বলবে অবশ্যই এটা ছিঁড়ে ফেলতে।" মিসেস হোয়াইট বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বললেন।

মিসেস ফেলডন দুঃখ পেলেন। তার গালদুটো রক্তিম আভায় ভরে গেল। লজ্জা, ক্রোধ, একটা বিশ্রী অস্বস্তি তাঁর হৃদয়কে দুর্বীভূত করল। কিন্তু শীঘ্রই একটা সংকল্প তার মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করল। মিসেস হোয়াইট চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মনোচিকিৎসক ডা ব্লাককে ফোন করলেন এবং তাঁকে তার স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করলেন। এবং তিনি যে এ ব্যাপারে আগ্রহী তাঁর স্বামীকে জানাতে বারণ করলেন।

"আপনি দেখবেন সে ভীষণই অদ্ভুত ধরনের এবং আপনার তাকে চিন্তাশীল গম্ভীর বলেও মনে হবে।"

"হুঁ"

"কিন্তু কখনই বিরক্ত হবেন না। আসলে আমি ওঁকে কোনো পাগলাগারদে যেতে দিতে চাই না আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন।..."

"আপনার কি মনে হয়, আপনি তাকে সাহায্য করতে পারবেন ডাক্তার?...হ্যাঁ, দয়া করে করুন, তাতে যত টাকাই লাগুক।"

"আমি এরকম অনেক মনোরোগ সামলেছি ম্যাডাম ফেলডন।"

ডাক্তার ভরসা দিয়ে বললেন, "আপনি ওঁকে আমার ওপর ছেড়ে দিন—হ্যাঁ? হ্যাঁ চিন্তা করবেন না। ঠিক আছে, ছাড়ছি।"

মিসেস ফেলডন ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে দেবার টক্ শব্দটা শুনতে পেলেন। ফোনটা নামিয়ে হাসতে হাসতে তার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। দিনে দিনে তিনি যেন খুশিতে ভরে উঠতে লাগলেন। কখনো রান্নাবান্না দেখাশুনো করেন কখনো বা বাজার দোকান করেন; যেমন—স্বামীর জন্য টাই-রুমাল, প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্য অনেক জিনিস। কাল্পনিক মিষ্টতা ঢেলে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন; বারবার জিজ্ঞাসা করেন যদি তার কিছুর দরকার হয়; এবং স্বামী ঘরে ফেরার পর চুম্বন করার জন্য এগিয়ে যান।

এরকম বেশ কিছুদিন চলতে লাগল যতদিন না একরাতে বেসামাল মাতাল অবস্থায় মিঃ ফেলডন বাড়ি ফিরলেন।

মনোচিকিৎসকের তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার কাছে কেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি ভাবলেন, এটা নিশ্চয়ই মার্টেলের কাজ। সে সম্ভবত সবার কাছে একটা অন্য ভাবনার সৃষ্টি করতে চাইছে। নিশ্চয়ই তাই হবে। আমাকে সেটা দেখতেই হবে।

ফেলডন বাড়িতে ঢুকেই, সোফাতে টুপিটা ছুড়ে ফেলে দিলেন, তারপর ভয়ংকর দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো, এবার চুপ্ যাও, মার্টেল।' ভয়ার্ত স্ত্রী তখন চেয়ারের পেছনে লুকিয়েছে। কারণ এই প্রথমবার মার্টেল মাতাল অবস্থায় তাকে দেখছে। টেবিলটা আঁকড়ে ধরে ফেলডন চীৎকার করে উঠলেন, "কেন এবার? এবার এগিয়ে এস? হাঃ হাঃ! আসতে পারছ না—না? কারণ তোমার চঙ দেখার জন্য কেউ নেই বলে।" গলার স্বরটা তখন কর্কশ নিনাদে গম্‌গম্ করছে।

দেওয়ালে টাঙানো ছবির ভূতটার মতোই ফেলডন সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীত কম্পিত স্ত্রী দৌড়ে তার শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভয়ে মুখটা বালিশ দিয়ে ঢেকে ফেলল। মিঃ ফেলডন কাঠের আলমারি ধরে নিজেকে সামলালেন। ব্রান্ডির বোতল খুলে খানিকটা পানীয় একটা গ্লাসে ঢেলে পুরোটা গিলে ফেললেন।

"তুমি একটা ইতর, ভড।" তার পেছন পেছন ঘরে এসে বললেন "আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করব না। তোমার রক্তে আমার হাতদুটো নোংরা করতে চাই না। আর আমি নিজেকেও মেরে ফেলতে পারি না।—" কথাগুলো বলার সময় তার দৃষ্টিটা যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঘুরতে লাগল।

ক্লান্ত ফেলডন জুতো ও জামা সমেতই বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে ঢলেও পড়লেন। প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে জল পিপাসায় তাঁর গোঙানি শোনা গেল।

"উঠে পড়" হাতটা এমন ভাবে ছুঁড়লেন যে তা তার মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। মার্টেল বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং একটু পরেই এক গ্লাস জল নিয়ে এসে কাঁপা হাতে স্বামীর মুখের ওপর ঢেলে দিলেন।

আলোর ঢাকনাটা তার চোখের ভাষাটাকে যেন লুকিয়ে রাখল।

পরেরদিন সকালে বাড়িতে একটা বিভীষিকার মৃত্যুশ্বাস পরিস্থিতি—চাকরবাকররা চুপিচুপি, ফিসফিস আলোচনায় ব্যস্ত। মিঃ ফেলডনের লাশটা সেরকমই জামাকাপড় পরিহিত অবস্থায় বিছানাতেই পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মিসেস ফেলডন ও আর সকলের বয়ান নিল।

সবথেকে পুরনো ও বিশ্বস্ত চাকরটি আবেগময় ভাষায় সরলভাবেই তার মনিব, তার মৃত বাবামা, তার মেমসাহেব সম্বন্ধে সে যা জানে তাই বলতে লাগল।

তার বয়ানটা আসলে ভালোবাসার স্বগতোক্তি ছাড়া কিছুই নয়।

তার নিজের সন্তানের মতোই সে তার সাহেবকে ভালোবাসে এই কথাটা বলার সময় চোখদুটো তার জলে ভরে গেল। তার চেয়ে বেশী কেউ তাকে ভালোবাসে নি। তার এই কথায় ইনস্‌পেকটর রেগে বললেন, "আমরা যেটা জানতে চাই, সেটা হল তারা কি পরস্পরকে ভালোবাসত?"

"কেন বাসবে না? তারা মাত্র একবছর হল বিয়ে করেছে।"

পরের জন এল মালি। তার বয়ান যে ও ক্ষেত্রে খুব মূল্যবান একথাটা বলা হলে, মালি ভাবল নিজেকে নিরপেক্ষ রাখাটাই যুক্তিযুক্ত। সেই সময় তার দৃষ্টি অবশ্য একদিকে তার ভবিষ্যৎ ও তার লাভের দিকেও ঝুঁকে ছিল। তাই মৃতের থেকে জীবিতের হয়ে কথা বলাটাই সে সমীচিন মনে করল।

সমস্ত রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচারে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই সাব্যস্ত হল। মৃতকে কাটাছেঁড়া করে আর্সেনিক বিষের চিহ্নও প্রমাণিত হল। স্বয়ং করোনারও আত্মহত্যা বলেই তাঁর সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করলেন।

তার স্ত্রীর পক্ষে কী মর্মান্তিক ! লোকেরা বলাবলি করতে লাগল। একটি তরুণীকে একবছরের মধ্যে বিধবা করে দেওয়া ! "কে এখন তাকে দেখবে ?" খুবই দুঃখজনক।

"যেদিন থেকে ঐ ভয়ংকর পেন্সিলটা ও নিয়ে এসেছে, সেদিন থেকে আমি জানি লোকটার মধ্যে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে।" মিসেস হোয়াইট বললেন।

মার্টেলকে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করতে নিষেধ করে প্রতিদিনই আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছ থেকে চিঠি আসতে লাগল। কয়েক সপ্তাহ পরে মিসেস হেলডন একজন পুরনো জিনিস কেনাবেচার লোককে ডেকে বাড়ির যা যা জিনিস বিক্রি করা যায় তা যে দাম পেলেন তাতেই বিক্রি করে দিলেন। যা রয়ে গেল তা জরিপুরানওয়ালাকে ডেকে বিক্রি করে দিয়ে তার বিশ্বস্ত চাকরদের মধ্যে টাকা ভাগ করে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

এপ্রিলে বোম্বে শহর যথারীতি গরমাক্রান্ত। মিসেস রেগোর রান্নাঘরটা প্রায় অসহনীয়। চুল্লীতে কয়লা জ্বলছিল, বিকেলের চা তৈরির জন্য। দরজাগুলো বন্ধ, আর দক্ষিণের যে ছোটবারান্দাটা খোলা রাখা হয়েছে সেটা দিয়েই একমাত্র আলো আসছে। মিসেস রেগো নির্বাক দৃষ্টিতে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে একটা চেয়ারে বসে আছেন।

তাঁর ডানদিকে এক ঝলক সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে। আর চুল্লীর লাল আভার মিশে সেটা তাঁর ধূসর চুলে একটু সোনালী রঙ ছড়াচ্ছে।

তাঁর ছেলে উল্টোদিকে বসে তারই পোর্ট্রেট আঁকছে। শিল্পীর স্টুডিওটার ঠিক কাজ করা যাচ্ছে না। চারপাশের কাঁচের জানলা-ভাঙা ঘুলঘুলি দিয়ে এত আলো আসছে স্টুডিওতে। বসে থাকা মানুষটার মুখটা সেই আলোয় যেন কাঁচের বাটির মতো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সবদিক থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় মুখটার স্টাডি করা যাচ্ছে না। যদিও রান্নাঘরে রান্না হচ্ছে, কিন্তু এটাই সম্ভবত একমাত্র আদর্শ জায়গা পোর্ট্রেট আঁকার জন্য।

মিসেস রেগো ধৈর্যসহকারে এতটুকু নড়চড়া না করে বসে আছেন, তাঁকে যেভাবে বসে থাকতে বলা হয়েছে। যখন অ্যালভারো মনে করল তার প্রণামের উজ্জ্বলতাটা তার চোখে সে ফোটাতে পেরেছে, তখন মিসেস রেগো উঠে আগুনের মধ্যে আরো কয়লা ঠেলে দিলেন। এবার জল ফোটার শব্দ হচ্ছে। কেটলিটা থেকে ধোঁয়াও বেরোচ্ছে। তাঁকে উঠতে হবে।

'মা, দয়া করে উঠো না' অ্যালভারো বলল। 'ওখানে যেভাবে আছ, সেভাবেই থাক···আমি শেষ করে ফেলেছি —আর দু এক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

ছবির প্রদর্শনীর জন্য শিল্পী তার মায়ের ছবি আঁকল। মুশকিলটা হল তাকে বাঁধানো। কাঠের দাম এত চড়া। মাউন্ট ও কাঁচের দামও তথৈবচ। সে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পরল চোরবাজারের দিকে। যখন তার পয়সার টানাটানি পড়ে তখনই জিনিস কেনার জন্য সে ওখানে গিয়ে হাজির হয়। একটা পুরনো আসবাবপত্রের দোকানে ঢুকে একটা ফ্রেম পছন্দ করল। 'সাহেব, আপনি এটা নিতে পারেন' দাড়িওলা লোকটা বলল। 'আপনি এটা ছবিসুদ্ধ নিতে পারেন আর গ্লাসটার দাম পাঁচ টাকা। আমার কাছে আর একটা পছন্দসই ফ্রেম আছে। যদি আপনার পছন্দ হয় আমি সাত-আট-টাকায় দুটোই আপনাকে বিক্রি করতে পারি।

যখন ওপরের তাক থেকে দ্বিতীয় ছবিটা আনা হল অ্যালভারো হতচকিত হয়ে গেল। যাইহোক, সে সঙ্গে সঙ্গে টাকটা দিয়ে ছবিটা নিয়ে দৌড়ে বাড়ি এল। একটা ফ্রেম সে যোগাড় করল তার মায়ের পোর্ট্রেটটা বাঁধাতে। আরেকটা করতে সে দ্বিধাবোধ করল। সেটাতে আছে হেলডনের পোর্ট্রেট—তার শ্রেষ্ঠ কাজ। যদিও একটু জীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে সে কি করবে ? তার কাছে এটা না থাকাই ভালো। সবাই বলছে মিঃ হেলডন আত্মহত্যা করেছেন। সে এটা বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দিতেও পারে না, কোন সম্ভ্রান্তপ্রকৃতির ব্যক্তি তাকে সন্দেহ করতে পারে। বেঁচে থেকেও মৃত, মরে গিয়েও

জীবিত ? ঠিক এই কথাগুলোই মিঃ হেলডন বলেছিলেন যখন তিনি প্রথমবার তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এক অক্ষয় প্রেমে বাঁধা এক জীবন—"বেঁচে থেকেও মৃত, মরে গিয়েও জীবিত! মৃত্যুর পরেও জীবন!" হঠাৎ তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং একটা উন্মাদগ্রস্ত মানুষের ওপর সে একটা স্টিল-লাইফ আঁকল।

ডিসেম্বরে দুটো ছবিই প্রদর্শনীতে দেওয়া হল। তার মায়ের পোর্ট্রেটটা সোনার মেডেল পেল। এটা বিক্রির জন্য ছিল না। স্টিল-লাইফটা দারুন প্রশংসিত হল এবং একজন ছবি সংগ্রহকারী সেটা কিনে নিলেন।

মিঃ রুচ ছবিটা দেখে খুবই মুগ্ধ হলেন—ছবিটা রঙের ছটায় ঝলমল করছে। আছে আধুনিক ছাপও। যদিও ঐ স্থানেই চেকে এক হাজার লিখে দিতে মিঃ রুচ একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না। স্পষ্টতই তিনি জানতেন যে তিনি কি মূল্যবান জিনিস কিনেছেন. এত খুশি হলেন যে সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে একটা টেলিগ্রাম করে তার নতুন সংগ্রহটি সম্বন্ধে জানিয়ে দিলেন।

বর্তমানে মিসেস রুচের ছবির প্রতি একটা অপছন্দ ভাব তৈরি হচ্ছিল।

তিনি মাত্র কয়েকমাস হল বিয়ে করেছেন। কিন্তু তার বিয়ের পর থেকে একপ্রকার ইচ্ছা করেই তিনি তার শোবার ঘরে কোন ছবি টাঙাতে দেন নি। "আমি সুন্দরের থেকে মোটেই চোখ ফিরিয়ে নেই" তার এই অপছন্দের কারণ. দর্শাতে গিয়ে বললেন, "আমি সুন্দরকে ভালোবাসি। কিন্তু সৌন্দর্য—নৃশংসতার মধ্যে" মিঃ রুচ বললেন। "কিন্তু এই স্টিল-লাইফটা গ্রহণ কর" তার স্বামী তাকে কোন কথা না বলতে দিয়েই বলতে থাকলেন" এই স্টিললাইফটা সৌভাগ্যের প্রতীক। দেখো, এই ছবি একদিন অমূল্য হবে। আমরা এটা খাবার ঘরে টাঙিয়ে রাখব।"

"না. ওখানে নয়, দয়া করে। তুমি এটা একান্তই চাইলে হলে টাঙাতে পার।"

"স্টিললাইফ টাঙাবার সবসময় সব থেকে উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে খাবার ঘর, বুঝলে প্রেয়সী!" তার স্বামী জোর করতে লাগলেন। কেন! তোমার এই আপেলগুলো পছন্দ হচ্ছে না! উৎসাহসহকারে মিঃ রুচ জিজ্ঞাসা করলেন। 'এগুলো কি সুন্দর—পাকা গন্ধে যেন ভরপুর. একদম গোল।' আঙুল দিয়ে তাঁর গালদুটো ঠেকে বললেন, 'তাই নয় কি ?'

"ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে—'আপেল অব ডিসকর্ড' জানোতো, মানে হল বিবাদ-ঘটানো আপেল।"

"তুমি সবসময় এত বিবাদের কথা বল কেন ? তুমি কিসের জন্য এত ভীত মার্টেল ?"

"আমি সত্যিই জানি না, প্যাট। কিন্তু আমার একটা পূর্বধারণা আছে যে, আমি কখনো সুখী হতে পারব না। আমি কোনদিনই মার্টিনকে ভালোবাসতে পারিনি, সেটা তুমি জানো। কিন্তু এখন সে মৃত। তাহলেও আমি অসুখী বোধ করি যতটা অসুখী আমি তার সঙ্গেও ছিলাম।"

"তোমার তা করা উচিত নয়" মিঃ রুচ ক্ষমার সুরে বললেন অতীত এখন মৃত। আর তোমায় সেটা ভুলতেই হবে। আমরা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে কখনোই আক্ষেপ দিয়ে ভরব না। পুরনো পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেল আর একটা নতুন পাতা লেখ। মৃত কখনই জীবনে ফিরে আসতে পারে না। আর এখন আমি আছি তোমার সব ভার নেওয়ার জন্য।

"হ্যাঁ, সেটা আমি জানি। আর তাই আমি আমার শান্তি ত্যাগ করেছি।"

"কিন্তু সেটা কি সত্যিই মূল্যবান ?"

"কিসের মূল্য ?"

"কিছু নয়" আমতা আমতা করে তিনি বললেন। "একটা মেয়েলি ভয়। আমার মনে হয়" নিজেকে ধাতস্থ করে তিনি বললেন ও অনেকক্ষণ ধরে স্বামীর ঠোঁটে চুম্বন করলেন।

মিঃ প্যাট্রিক রুচ নিঃশব্দে এই দেহভঙ্গিমা বুঝতে পারলেন এবং কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাইলেন না। তিনি

ঘুমনোর সময়ই ধীরে ধীরে তার স্ত্রীর মন থেকে সব কালো স্মৃতিকে মুছে দেবে। কিন্তু যতদিন না তার হৃদয় শান্ত হয় ততদিন রুচের পক্ষে স্ত্রীকে আগলে থাকা সম্ভব নয়। কারণ তিনি একজন ক্রমকারী এবং প্রায়শই সেই কারণে তাঁকে বাইরে থাকতে হয়। কখনো বেশ কয়েকদিন, কখনো বা কয়েক সপ্তাহ। সেই রকমই একজায়গায় ঘুরতে গিয়ে শাঁয় বাড়ি ফেরার বার্তা নিয়ে একটি টেলিগ্রাম পেলেন। তার স্ত্রী কোনো কিছু না বলেই পলাতক হয়েছে। কেউ তাকে দেখে নি। সি আই. ডি কে ডাকা হলে তারাও বলল কোনো সংবাদ জানে না। রুচ বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। 'কেন সে পালিয়ে গেল? সে কি তাকে ভালোবাসতে পারছিল না।' সেটা হতেই পারে না। তাহলে সে কেন পালাল! কেউ ধরে নিয়ে গেছে? অথবা সে —না!' তিনি আবার বললেন "আত্মহত্যা করার সম্ভাবনা।" তিনি চিন্তাও করতে পারছেন না। সত্যিই এটা অস্বাভাবিক।

খাবার ঘরের টেবিলের ধারে বসে রুচ ক্রমাগত ধূমপান সহযোগে পান করতে লাগলেন। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। প্রকৃতি অস্বাভাবিক রকম শান্ত। তাঁর দৃষ্টি স্টিল লাইফটার দিকে নিবদ্ধ। সেটা প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না। কেউ কি ওখানে কিছু করেছে? কিংবা তিনি কি নেশাগ্রস্ত? অপর্যাপ্ত আলো ছবিকে ভালো করে দেখতে দিচ্ছে না। শীঘ্রই অস্তমিত সূর্য কয়েকক্ষর নিচে নেমে গেল. জানলার সামনের ক্যাসিয়াসের শাখাগুলোর মধ্য দিয়ে। আর একঝলক লাল্চে আলো দেওয়ালের ওপর যেন জুড়ে দিল। মিঃ রুচ চশমাটা ভালো করে পরলেন ছবিটা পরীক্ষা করার জন্য। পশ্চাৎপটের ঘন নীলটা ফ্যাসা হয়ে গেছে এবং আপেলের গায়ের উজ্জ্বল লাল সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত। এবং কিছু জায়গায় ছবির ভাঙাচোরা রঙ যেন খসে পড়ে গেছে. সূর্যের আলো. জলকণা. কোড়ো বাতাস ছবিটাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিয়েছে। রঙের এই বিধ্বংসী পরিণামে মিঃ রুচ কেদনার্ড হলেন। এ যেন তাঁর নিজেরও অনিবার্য পরিণাম—নিজেকেও তিনি অভিযুক্ত করলেন। সূর্যের আলো, জলকণা, বাতাস, ঝড় সব ধ্বংস করে দিয়েছে রঙের। এই বিধ্বংসী রূপে মিঃ রুচ কেদনার্ড হলেন। তাই তিনি নিজে ছবিটার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। আবার এবং আবার। এই রকম করতে করতে তাঁর মনে হল মিঃ ফেলডন যেন জীবন ফিরে পেয়েছেন। তাঁর এই ধারণাকে দূর করার জন্য তিনি চোখ মুছলেন। কিন্তু তা সরল না। একটা শীতলতার অনুভূতি তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। এই প্রথম তিনি মুখোমুখি কারুর সঙ্গে মিলিত হতে বিব্রত বোধ করলেন। তিনি নিজেই লজ্জিত হলেন আর মনটা অন্যপথে ঘোরাতে জানলার বাইরে চেয়ে রইলেন। তবুও অবয়বটা তাকে ভূতের মত তাড়া করে ফিরল। একটা অদ্ভূত ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলল। মৃত্যুর ভয় সেটা নয়—মৃত্যু—সে তো কোনো না কোনোদিন অবশ্যম্ভাবী কিন্তু। একটা নির্বাক অনুভূতি—তাকেও ছড়িয়ে ধরল। তিনি আর একবার ছবিটার দিকে ফিরলেন এবং মনে হল মিঃ ফেলডন তখনো সেখানে আছেন—আরো যেন জীবন্ত। তিনি যেন রঙের আস্তরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসার জন্য যুদ্ধ করছেন এবং তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন—আস্তে আস্তে, ইঞ্চি করে, কাছে আরও কাছে যতক্ষণ না দুটো ঠান্ডা হাতের স্পর্শ তিনি অনুভব করলেন। মিঃ রুচ তাঁর চোখ বন্ধ করলেন, টেবিলটা ধরলেন এবং একটা শস্য ফলের মত কি যেন গিলে ফেললেন।

[]

' ম্যানুয়েল সি. রোড্রিগুয়েজ (১৯২৮—১৯৯৬) ইংরেজি, মারাঠি এবং কোঙ্কনী ভাষার মনোবিশ্লেষকমূলক গল্প লিখে গোয়ার কথাসাহিত্যকে একটি নতুন দিগন্তে প্রসারিত করেছেন। জন্ম সূত্রে তিনি মহারাষ্ট্রের মানুষ। কিন্তু মহারাষ্ট্র—গোয়ার লেখক গোষ্ঠির সংগঠন The 'Quest'-এর তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। 'স্টিল লাইফ' গল্পের চরিত্রগুলির ক্ষোভ, দুঃখ, বিষাদ ও যন্ত্রণা আমাদের সাধারণ বোধ বুদ্ধিকে আকস্মিক অভিঘাতে আলোড়িত করে দেয়। ;

ফরাসী গল্প

কথা নেই কারও মুখে

অনুবাদ : সুনীল বরণ রায়

(আল্‌বের্‌ কাম্যু)

আল্‌বের্‌ কাম্যুর জন্ম ১৯১৩ খৃস্টাব্দে আলজেরিয়ার মোন্দোভি শহরে। প্রবন্ধ সিসিফাসের উপাখ্যান ., নাটক (কালিগুলা ', উপন্যাস আগন্তুক, মহামারী ., ছোটগল্প (নির্বাসন ও রাজ্য সাহিত্যের প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্পে ফরাসী অধিকৃত আলজেরিয়ার পটভূমিকায় বসবাসকারী ফরাসী সমাজের একটি বর্ণাঢ্য চিত্ররূপ প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬০ খৃস্টাব্দে একটি পথদুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

শীত পড়েছে জাঁকিয়ে ; কলমলে একটি দিন উঠেছিল তবু এরি মধ্যে কর্মচঞ্চল শহরের ওপর। জেটির প্রান্তে সমুদ্র আর আকাশ চোখ-ধাঁধানো একটি আলোর মিলেমিশে একাকার। কিন্তু ইভার্স-এর সেদিকে খেয়াল ছিল না। জাহাজঘাটের ওপরে বুলভার ধরে সে তখন আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। সাইকেলের নিশ্চল পাদানিতে আড়ষ্টভাবে তার খোঁড়া পা রেখে আর পায়ে প্যাডেল করে রাতের হিমে তখনো ভিজে সেঁদল রাস্তার অনেক কষ্টে সামাল দিয়ে চলছিল। মাথা নিচু করে সাইকেলের সিটে বসে ছোটখাটো লোকটি পুরনো টায়রলাইন এড়িয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ হাওয়ার ঘুরিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল তার পাশ কাটিয়ে যাওয়া মোটরগাড়ি বা কনুইয়ের ঠেলায় যথাস্থানে আবার সরিয়ে রাখছিল। দুপুরের পুটলিটি ফের্নান্দে বেঁধে দিয়েছিল। আর তা করার সময় পুটলির ভেতরে যা ছিল সেই ভাবনায় তার মন বিভিন্ন উঠছিল। দুটিতে ভুসো মোটা রুটির মধ্যে তার পছন্দমত স্পেনিশ অমলেট বা তেলে ভাজা বীফস্টেকের কলে চীজ ছাড়া আর কিছুই না।

কারখানায় যেতে এতক্ষণ ধরে এতটা রাস্তা পেরোতে হয় আগে তার কখনো মনে হয়নি। বয়স অবশ্য বাড়ছিল তার। চল্লিশ বছর বয়সে অন্তরঙ্গতার মত লিকলিকে রোগা শরীর থাকলেও সেই বয়সে লোকের মাংসপেশী সহজে গরম হতে চায় না। খবরের কাগজে কানু খেলোয়াড় বলে অখ্যাত ত্রিশ বছরের কোন খেলোয়াড়ের কথা পড়ে সে কাঁদ কাঁদো ; ফের্নান্দেকে বলতো 'ত্রিশ বছরের ছোকরা যদি কানু হয় আমার তবে তো প্রায় হুইলচেয়ারে চলাফেরা করার অবস্থা।' কিন্তু রিপোর্টার লোকটা যে একেবারে মিথ্যে বলেনি তা সে জানতো। ত্রিশ বছর বয়সে যে কোন লোকেরই দম একটু একটু করে ফুরিয়ে আসতে চায়, তা সে টের না পেলেও। চল্লিশ বছর বয়সে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করার মত অবস্থা না হলেও তখন থেকেই তার আগাম প্রস্তুতি। পিপে-তৈরীর কারখানা যেখানে শহরের ওপ্রান্তে সেখান দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতে ঠিক সেই কারণেই কি সে অনেক দিন থেকে সমুদ্রের দিকে আর চোখ ফেরায় না ? ত্রিশ বছর বয়সে সমুদ্র দেখায় তার ক্লান্তি ছিল না। কারণ তার মধ্যে প্রত্যাশিত একটি আনন্দ ছিল সমুদ্রের ধারে সপ্তাহান্তে কটা দিন কাটাবার। খোঁড়া পা সত্ত্বেও কিংবা সেই কারণেই, সাঁতার কাটা ছিল তার চিরকালের সখ। তারপর কত বছর পেরিয়ে গেল, ফের্নান্দে এল, ছেলের জন্ম আর সংসার চালাতে শনিবার কারখানায় ওভারটাইম, রবিবার পত্রের ফাইফরমাশ খেটে কিছু উপরি রোজগার। গভীর তৃপ্তিদায়ক তার সেই দুরন্ত দিনগুলির অভ্যাস সে আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলল। সেই স্বচ্ছ গভীর

জল সূর্যের তাপ, নারীদলিত শৈল্পিক জীবন এদেশে তা ছাড়া আর কোন রকম সুখস্বাচ্ছন্দে ছিল না। আর যৌবনের সঙ্গে বিদায় নিল সেই সুখও। সমুদ্র টানত তাকে অন্যদেরই মত। কিন্তু দিনের শেষে যখন একই শ্যামলা রঙ ধরত জলে তখনই শুধু। দৈনিক কাজকর্ম মিটে যাবার পর বাড়ির সামনে খোলা বারান্দায় যখন সে বসত সে সময়টা তার খুব ভালো লাগত। ফের্নান্দের নিপুণ হাতে ইস্তিরি করা কাপড়-জামা গায়ে, হাতে বরফ ঠাণ্ডা এক গ্লাস আনিসেৎ নিয়ে আকাঙ্ক্ষিত সব কিছু পাওয়ার আনন্দে মন ভরে উঠত। সন্ধ্যা নামত, মেঘের আকাশে নরম অন্ধকার ঘনিয়ে আসত, ইভার্স-এর প্রতিবেশীরা তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে আনত। সে সময় ইভার্স ঠিক বুঝে উঠতে পারত না। সে সুখী না কি তার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। তার মনে হত সেই মুহূর্তে অন্তত কারও সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই। চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই তার করার নেই। যদিও কিসের জন্য তা সে ঠিক জানত না।

সকালবেলায় আবার যখন সে কাজে বেরোত তখন কিন্তু তার সমুদ্রের দিকে তাকাতে আর ভালো লাগত না। সমুদ্র ছিল সেখানেই যেখানে যার থাকার কথা কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ সন্ধ্যের আগে নয়। সেদিন সকালে মাথা নিচু করে সাইকেল চালিয়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছিল যেমন তার চেয়ে বেশি আর মনটাও ভারভার লাগছিল। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যখন সে মিটিং থেকে ফিরে এসে জানাল তারা আবার কাজে লাগবে, ফের্নান্দে তখন খুশি হয়ে বলল 'মালিক তবে মাইনে বাড়াতে রাজি হয়েছে তোমাদের ?' মাসিক মাইনে বাড়ায়নি মোটেই : ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছিল। তারা যে ঠিকমতো ধর্মঘট চালাতে পারেনি তা স্বীকার করতেই হবে। রাগের মাথায় হঠাৎ কাজ ফেলে বেরিয়ে আসা, ইউনিয়ন সঙ্গত কারণেই তা পুরোপুরি সমর্থন করেনি। তা ছাড়া জন্য পনের মজুর ধর্তব্যের মধ্যে নয় অন্য কোন পিপে তৈরির কারখানায় ধর্মঘট হয়নি ইউনিয়নকে সে কথাও ভেবে দেখতে হয়েছে। ইউনিয়ন নেতাদের খুব বেশি দোষ দেওয়া চলে না। বাজারে ট্যাঙ্কার আর ট্যাঙ্কলরির আমদানি হতে পিপে তৈরীর ব্যবসার আর তেমন রমরমা ছিল না। বড় সাইজের পিপে ও ব্যারেল তৈরীর কাজ আস্তে আস্তে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুরনো মাল মেরামতির কাজই চলছিল বেশির ভাগ। মালিকরা অবশ্য পিপের বাজারে সংকট ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরেছিল। তবু তাদের লাভের বখরায় যাতে টান না পড়ে সেজন্য তারা ভেবেছিল একটাই সহজ পন্থার আশ্রয় নেওয়া সম্ভব—মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও মজুরী না বাড়ানো। পিপের চাহিদা না থাকলে পিপে-কারখানার মালিকদের আর কিই বা করার ছিল ? কারিগরী কোন পেশায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দক্ষতা অর্জন করার পর কেউ তা কলাতে চায় না। পিপে-তৈরীর কাজ বেশ শক্ত এবং সে কাজের শিক্ষানবিশী করতে হয় অনেকদিন। পিপে তৈরীর বাঁকানো কাঠ যারা জোড়ে আর লোহার খাটো দিয়ে আগুনে সে কাঠগুলি ঘুটোফাটার রাক্ষিয়ার আঁশ বা দড়ির ফেঁসো না গুঁজেও প্রায় বাতাস চলাচল না করতে পারে এমন শক্ত করে আঁটে, সেরকম সুদক্ষ কারিগর পাওয়া দুষ্কর। ইভার্স তা জানত এবং তাই নিয়ে মনে মনে গর্ববোধ করত। পেশা বদল করা তেমন কিছু নয়, কিন্তু যে কাজ কারও জানা, যে কাজে কেউ ওস্তাদ পর্যায়ের দক্ষতা অর্জন করেছে তা লুইকার ছেড়ে দেওয়া সহজ নয়। কোন সুস্থ কারখানায় যদি কাজকর্ম না থাকে। কেউ যদি সেকারণে কোণঠাসা হয়ে পড়ে তবে পদত্যাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু পদত্যাগ করাও সহজ নয়। যেমন সহজ ছিল না মুখ বুজে থাকা, আলাপ-আলোচনার সীতাকার কোন সুযোগ না পাওয়া আর রোজ সকালে পুঞ্জীভূত ক্লান্তির সঙ্গে সেই একটা রাস্তায় চলাফেরা সপ্তাহকে মালিক খুশি হয়ে যা দেয়, দিন দিন অপ্রচুর থেকে আরও অপ্রচুর হলেও, হাত পেতে তাই যারা গ্রহণ করতে।

সুতরাং রাজি হল তারা। তাদের মধ্যে দুচারজন ইতস্তত করলেও মালিকের সঙ্গে প্রাথমিক কয়েক দফা

আলোচনার পর মেজাজ গরম হল তাদেরও। মালিক সোজাসুজি বলে দিয়েছিল, নেবে তো নাও, না পোষালে যে যার পথ দেখতে পারো। এভাবে কেউ কথা বলে না। 'কি ভেবেছে মালিক' এসপানিওলো বলল, 'আমরা কি পড়ে পড়ে মার খাব ?' মালিক কিন্তু লোক খারাপ ছিল না। ব্যবসাটি ছিল তার বাপের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, এই কারখানারই তার জন্মকর্ম আর শ্রমিক কর্মী প্রায় সবার সঙ্গে অনেক বছর থেকেই তার পরিচয় ছিল। কখনো কখনো সে কারখানায় তাদের জলখাবারে নেমন্তন্ন করত ; কাঠকাঠরায় আগুনে শার্ডিন মাছ আর সসেজ ভাজা হত, তার সঙ্গে থাকত মদ। সত্যি লোক ভালো ছিল মালিক। বছরের প্রথম দিন শ্রমিক কর্মী সবাইকে পাঁচ বোতল করে নামী ব্র্যান্ডের মদ উপহার দিত আর প্রায়ই, কেউ অসুখে পড়লে অথবা কারও বিয়ে কিংবা খৃষ্টযাগে প্রথম যোগদান বা সেইজাতীয় কোন অনুষ্ঠানের বেলায়, নগদ টাকাও দিত। তার মেয়ের জন্ম উপলক্ষে সবাইকে চিনি দেওয়া কাগজি বাদাম বিলিয়েছিল। ইভার্সকে দুতিনবার সমুদ্রের ধারে তার যে ভূসম্পদ ছিল সেখানে শিকার করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কারখানার শ্রমিকদের সে ভালোবাসত আর প্রায়ই বলত তার বাবাও কর্মজীবনের শুরুতে অগ্নিম নিয়েছিলেন শিক্ষানবিস হিসেবে। কিন্তু শ্রমিককর্মীদের বাড়িতে সে কখনো যায়নি, তাদের সাংসারিক জীবনের খবর রাখত না ; নিজের কথাই ভাবত শুধু, কারণ নিজেকে ছাড়া আর কিছুই সে জানত না। আর এখন "নেবে তো নাও আর না পোষালে যে যার পথ দেখতে পারো।" অর্থাৎ তারও সেইরকম জেদ চেপে গিয়েছিল, তার মত লোকের অবস্থায় যা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

মালিকই ইউনিয়নকে সংগ্রামের পথে ঠেলে দিয়েছিল কারখানার দরজায় তালা পড়ল। "তোমাদের আর কষ্ট করে পিকেটিং করতে হবেনা," মালিক বলল তাদের, "কারখানা বন্ধ থাকলে আমার বরং খরচ বাঁচবে।" কথাটা সত্যি না হলেও সমস্যা মিটল না, কারণ শ্রমিকদের মুখের ওপর মালিক প্রকারান্তরে এই কথাই জানিয়ে দিল যে তারই দাক্ষিণ্যে তাদের চাকরি। এসপানিওলো রেগে আগুন হয়ে তাকে বলল, সে মানুষ নয়। মালিকেরও রক্ত গরম, হাতাহাতির উপক্রম হতে তাদের দুজনকে টেনে ছাড়িয়ে দিতে হল। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রমিকদের মনেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কিছু দিনের ধর্মঘট বাড়িয়ে মেয়েদের মন খারাপ তাদের মধ্যে দুতিনজন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল আর সবশেষে ইউনিয়নও পরামর্শ দিল, সালিশী এবং ধর্মঘটের কয়েকদিনের মজুরী ওভারটাইম খেটে পুষিয়ে নেওয়া চলবে এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আপোস করে নাও। তারা কাজে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল, অবশ্য সদর্পে বলে বেড়াতে লাগল যে ব্যাপারটা এখনো মেটেনি, আরও ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু সেদিন সকালে পরাজয়ের গ্লানির মত এই ক্লান্তি, বীয়ারস্টেকের বদলে চীজ, তার সঙ্গে এই অলীক কল্পনায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। আকাশ আলো করে সূর্য উঠলেও সমুদ্রের কাছে আর প্রত্যাশা কিছুই ছিল না। এক পায়ে সাইকেল ঠেলে যেতে যেতে ইভার্স-এর মনে হল প্রতিবার সাইকেলের চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ক্রমশ আরও বুড়িয়ে যাচ্ছে। কারখানা, তার সহকর্মী অন্যান্য শ্রমিক এবং যে মালিকের সঙ্গে শীগগিরই আবার দেখা হবে তাদের কথা ভাবতে তার বুকের মধ্যে কেমন যেন ভারভার লাগছিল। যেপর্যন্তও চিন্তায় পড়েছিল : "মালিককে কি বলবে তোমরা ?" "কিছুই না" সাইকেল চেপে ইভার্স মাথা নাড়ল। দাঁতে দাঁত ঘষল, সুন্দর নাক-চোখ বিশিষ্ট তার ছোট ভাঁজ-পড়া মুখে কাঠিন্যের লক্ষণ দেখা গেল। "আমরা কাজে ফিরে যাচ্ছি, তাই যথেষ্ট।" তারপর সাইকেল চালিয়ে তার এই পথযাত্রা, তখনো দাঁতে দাঁত চেপে, মনের মধ্যে বিষণ্ণ শূন্যে আকাশ পর্যন্ত কালো করা একটি রাগত ভাব নিয়ে।

বুলেভার আর সমুদ্র ছেড়ে এবার সে পুরনো স্পেনিশ পল্লীর ভিজে রাস্তায় সাইকেল ঠেলে এগোতে লাগল ! সে রাস্তা দিয়ে যে একাকার গিয়ে পড়ল সেখানটায় শুধু চালাঘর লোহালক্কড়ের আড়ত আর গ্যারেজের ছড়াছড়ি। কারখানাও সেখানে - নিচু একটি চালাঘর, অর্ধেকটা পাথরের বাঁধনি, টিনের ছাউনি পর্যন্ত বাকি অংশ কাচের। কারখানার সামনে পিপে তৈরীর পুরনো কারখানা, চালাঘরবেষ্টিত একটি খোলা জায়গা ; ব্যবসাবুদ্ধির সঙ্গে সেটি

পরিত্যক্ত হয়েছিল, এখন ব্যবহার করা হয় শুধু ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি ও পুরনো পিপের আড়ত হিসেবে। তার ওদিকটায় মালিকের বাগানের শুরু মাঝখানে পুরনো টালির একটি রাস্তা, বাগানের শেষ প্রান্তে মালিকের বাড়ি। বিশাল নিসঙ্গ একটি বাড়ি, বাইরের সিঁড়ি ঘিরে জড়ানো ভার্জিনিয়া ও হনিসাকলের মহিমায় তবু আকর্ষণীয়।

ইভান্স তখুনি দেখতে পেল কারখানার দরজা সব বন্ধ। দরজার সামনে এক দল শ্রমিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে। এতকাল কাপ্পের অভিজ্ঞতায় এখানে এসে এই প্রথম সে দেখতে পেল কারখানার দরজা বন্ধ। কর্তৃত্ব যে তার হাতে শ্রমিকদের নাকের ডগায় আঙুল উঁচিয়ে মালিক সেকথাই বোঝাতে চেয়েছিল। ইভান্স বইয়ে ফিরে সেদিকে কারখানা সংলগ্ন একটি চালাঘরে তার সাইকেল রাখল, তারপর সদর দরজার দিকে পা বাড়াল। দূর থেকে লম্বা কালো লোমশ তার সহকর্মী এসপজিতো টেনর গীতকারের মত মুখাকৃতি ইউনিয়নের প্রতিনিধি মার্কু আর কারখানার একমাত্র আরব কর্মী সৈয়দকে দেখতে পেল। তারপর আরও সবাইকে যারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল তাকে এগিয়ে আসতে। কিন্তু ইভান্স তাদের কাছে না পৌঁছতেই সবাই হঠাৎ দরজার দিকে চোখ ফেরাল, কারখানার দরজা তখন সবে খুলতে শুরু করেছে। দরজার ফাঁকে ফোরম্যান বালেস্তারকে দেখা গেল। সে ভারী একটি দরজা খুলে শ্রমিকদের দিকে পেছন করে আস্তে আস্তে সেটা লোহার রেলের ওপর ঠেলে দিল।

শ্রমিকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বালেস্তার ধর্মঘটের পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু সে মালিকের স্বার্থ দেখছে এসপজিতো এই ধরনের মন্তব্য করায় আর মুখ খোলেনি। দরজার কাছে নীল জার্সি গায়ে বেঁটে মোটা লোকটি খালি পায়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সৈয়দ ছাড়া একমাত্র সেই খালি পায়ে কাজ করত শ্রমিকদের একে একে কারখানায় ঢুকতে। রোদে পোড়া মুখে নিষ্প্রভ বিবর্ণপ্রায় দুটি চোখ, ঘন ফোলা ঠোঁটের নিচে বিষণ্ণ মুখ। শ্রমিকদের কারও মুখে কথা নেই, লেজ গুটিয়ে আবার এই ফিরে আসায় হতমান নিজেদের নীরবতায় নিজেরাই ক্ষুব্ধ অথচ এই নীরবতা অবলম্বন করে থাকা যতকাল তাদের পক্ষে তা ভঙ্গ করা ততই শক্ত। সবাই একে একে কারখানার ভেতরে ঢুকল। বালেস্তারের দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না। কারণ তারা জানত যে মালিকের আদেশমতই বালেস্তার তাদের এইভাবে কারখানায় ঢুকতে দিয়েছে আর তার বিষণ্ণ বিবর মুখের ভাবেই তারা বুঝতে পেরেছিল সে কি ভাবছে। ইভান্স কিন্তু তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। বালেস্তার পছন্দ করত তাকে, কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়ল।

প্রবেশপথের ডানদিকে কাপড় বদলাবার ছোট ড্রেসিংরুমে সবাই এসে জড়ো হল। রঙ না করা কাঠের পার্টিশন দেওয়া খোলা কয়েকটি শেল্ফ, তার দুদিকে আঁটা তালা দেওয়া ছোট ছোট আলমারি ; প্রবেশপথ থেকে সব চেয়ে দূরের যে শেল্ফটি ছিল চালাঘরের দেয়াল ঘেঁষে সেখানে মাটির মেঝের নালা কেটে ধারাস্নানের একটি জায়গা করা হয়েছিল। কারখানার মাঝখানে এদিক ওদিক ছড়িয়ে সমাপ্ত বা অসমাপ্ত নানান কাজের নমুনা, লোহার আটোয় আলগাভাবে জড়ানো বড় বড় পিপে শক্ত করে আঁটবার জন্য আগুনে দেবার অপেক্ষায়, লম্বা বাঁজ কাটা পুরু কাঠের বেঞ্চি (তার কয়েকটার মধ্যে কাঠের গোলাকার সব পিপের তলি রেঁদাঘষে চেঁচে ক্ষুরধার করার অপেক্ষায়) আর সবশেষে নিভে যাওয়া আগুন। প্রবেশ পথের বাঁদিকে দেয়াল বরাবর সারি সারি কারিগরী বেঞ্চ। তার সামনে চেঁচে মসৃণ করার অপেক্ষায় রাশিকৃত পিপে তৈরীর বাঁকানো কাঠ। ড্রেসিংরুমের কাছেই ডানদিকের দেয়াল বরাবর অপেক্ষাকৃত তেল মাখানো বিশাল দুটি যন্ত্রচালিত করাত বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় নীরবে দাঁড়িয়ে ঝকমক করছিল।

কারখানাটি বেশ কিছুদিন আগেই মৃষ্টিমেয় যে কজন লোক সেখানে কাজ করত তাদের তুলনায় স্থানসঙ্কুল হয়ে পড়েছিল। তাতে গ্রীষ্মকালে যেমন সুবিধে শীতকালে তেমনি অসুবিধে। কিন্তু আজ বিশাল এই জায়গায় ফেলে যাওয়া অর্ধসমাপ্ত কাজ, একেগে সেকেগে পরিত্যক্ত পিপে, বাঁকানো কাঠের তলার দিকটা একটি মাত্র লোহার আটোয়

জোড়া আর ওপরের দিকটা পাপাড়ি ছড়ানো ফুলকপি কাঠের গুঁড়োর মত, করাত কাটা কাঠের গুঁড়োয় ঢাকা বেঞ্চ, হস্তপাতির বাক্স আর কলকব্জা—কারখানার সবখানে সবকিছুতেই অযত্নের ছাপ। পোশাক পালটে পুরনো সোয়েটার গায়ে, রঙচটা তালি-দেওয়া প্যাণ্ট পরনে তারা এখন দাঁড়িয়ে দেখছিল সেসব আর ইতস্তত করছিল। বালেস্তারের নজর ছিল তাদের দিকে। বলল, 'এবার তাহলে কাজে হাত দেওয়া যাক।' একটি কথা না বলে সবাই একে একে যে যার কাজের জায়গায় গেল। বালেস্তার একজনের থেকে আরেকজনের কাছে গিয়ে তাদের সংক্ষেপে মনে করিয়ে দিল কোন্ কাজটা শুরু বা শেষ করতে হবে। কেউ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল লোহার ফলকযুক্ত কাঠের গোজে প্রথম হাতুড়ি-পেটার আওয়াজ একটি আংটা নামিয়ে পিপের পেটমোটা মাকের অংশটায় লাগাবার জন্যে। কাঠের গিঁটে কোথাও ঠেকতে একটি রে'দাস্ত্রে গোঙানির আওয়াজ উঠল আর এসপর্জিতো সুইচ টিপে একটি করাত চালিয়ে দিতে ফলার ঝড়বড় আওয়াজ তুলে সেটি চলতে লাগল। সৈদের কাজ ছিল ফরমাশমত পিপে তৈরীর বাকানো কাঠ বয়ে আনা অথবা কাঠচাঁচা পুড়িয়ে আগুনে জ্বালানো, লোহার পাতজড়ানো পিপেগুলি সেই আগুনে দিয়ে ফোলাবার জন্য। কোথাও ডাক না পড়লে একটি কারিগরী বেঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে সে জংধরা বড় আটোগুলি হাতুড়ির লম্ব ঘায়ে আরও আঁট করে লাগাত। পোড়া কাঠচাঁচার গন্ধ উঠল কারখানায়। ইভার্স রে'দাস্ত্রে এসপর্জিতোর চেরাই করা কাঠের পাতগুলি চেঁচে সমান করে একসঙ্গে জোড়া লাগাচ্ছিল, চেনা সেই গন্ধ নাকে আসতে মনে মনে কিছুটা হালকা বোধ করল। সবাই চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু কারখানায় আস্তে আস্তে ঐক নতুন একটি জীবনের সঞ্চার দেখা গেল। চওড়া জানলা দিয়ে আসা সকালের নতুন আলো কারখানার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। সোনালী রোদে ধোঁয়া উঠল নলিচে হয়ে। ইভার্স তার কাছেই একটা পোকার গুনগুনানিও শুনতে পেল।

সেই মুহূর্তে চালাঘরের ওদিকটায় পুরনো কারখানায় যাবার দরজা খুলে মালিক মিঃ লাসাল চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। রোগাটে কালো চেহারা, বয়স সবে ত্রিশ পেরিয়েছে। বাদামী গ্যাবেরডিন সুটের ওপর বুকের কাছে প্রায় সবটাই খোলা একটি শাদা ওভারঅল জড়ানো, চলাফেরায় বেশ একটি সহজ ভাব। ছুরির ফলার মত হাড্ডিসার গড়নের মুখ হলেও সাধারণত সবাই তাকে পছন্দ করত, হাসিখুশি খোলামেলা প্রকৃতির বেশির ভাগ লোকদের যেমন সবাই করে থাকে; শুধু দরজা পেরিয়ে আসতে তার মধ্যে যেমন একটা বিব্রত ভাব দেখা গেল। তার সম্ভাষণে আগের মত ধ্বনিময় সেই স্নিগ্ধতা ছিল না, সে যাই হোক কেউ তার সম্ভাষণের জবাবও দিল না। হাতুড়ির আওয়াজ ইতস্তত করল একটু, তাল কেটে গেল, তারপর আবার ঘটাং ঘটাং করে আরও জোরে আওয়াজ উঠল। লাসাল অনিশ্চিতভাবে কয়েক পা এগোল, তারপর পা বাড়াল ছোকরা ভালেরির দিকে। ভালেরি মাত্র বছরখানেক হল এই কারখানার কাজ নিয়েছিল। সে তখন বিদ্যুচ্চালিত করাতের কাছে ইভার্স-এর থেকে খানেক ফুট দূরে একটি বড় পিপের তলা জুড়ছিল। মালিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল খানিকক্ষণ। ভালেরি চুপচাপ কাজ করতে থাকল। মালিক বলল, "হ্যাঁরে, কেমন চলছে সব!"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কারখানার গোল্লগোল ছাপিয়ে ঘণ্টা বাজল দুবার। বালেস্তার কিছুক্ষণ আগে একটা সিগারেট পাকাতে বসেছিল, ঘণ্টার আওয়াজ কানে যেতে কোমর সোজা করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল আর কারখানার ওপ্রান্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সে চলে যাবার পর হাতুড়ি পেটার আওয়াজ কেমন যেন একটু কিমিয়ে গেল, এমনকি বালেস্তার যখন ফিরে এল একজন শ্রমিক তখন কাজ থামিয়ে বিস্ময়ের মত তাকিয়েছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বালেস্তার শুধু বলল, "মালিক ডাকছে তোমাদের, মার্কু, ইভার্স।" ইভার্স-এর প্রথম প্রতিক্রিয়া হল হাত ধুয়ে আসবে, কিন্তু মার্কু পাশ দিয়ে যেতে সে হাত ধরে তাকে আটকে নিল, তারপর মার্কুর পিছে পিছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ইভার্সও বেরিয়ে গেল।

বাইরে কারখানা সংলগ্ন খোলা জায়গায় সূর্যের আলো তখন অমল তরল ধারায় এমনভাবে গলে পড়ছিল যে

ইভার্স তার মুখে, বাইরের অন্ধকার অংশে সেই আলোর ছোঁয়া অনুভব করছিল। বাইরের সিঁড়ি বেয়ে তারা ওপরে উঠে গেল, সিঁড়ির ওপরে হলিসাকল লতার এরি মধ্যে কয়েকটি ফুল ধরেছে। ভেতরের গলিবারান্দায় সারা দেয়াল জুড়ে সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্র, তারা সেখানে ঢুকতে একটি বাচ্চা মেয়ের কান্না আর লাসান-এর গলার আওয়াজ শুনতে পেল, "খাওয়া হয়ে গেলে শুইয়ে দাও ওকে। অবস্থা যদি ভালোর দিকে না যায় তবে ডাক্তারকে খবর দেব।" তারপর মালিক হঠাৎ গলিবারান্দায় এসে তাদের দুজনকে তার ছোট অফিস ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। অফিস ঘরটি তাদের পরিচিত। নকল গ্রাম্য ডিজাইনের আসবাবপত্রে সাজানো আর দেয়ালে খেলাধুলোর পাওয়া নানা রকম ট্রফির অলঙ্করণ। টেবিলের পেছনে নিজের জায়গায় বসে লাসান তাদেরও বসতে বলল। তারা দাঁড়িয়ে রইল। 'তোমাকে ডেকেছি, মার্কু' কারণ তুমি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি'। আর তুমি, ইভার্স, বলেস্তারের পর তুমিই আমার সব চেয়ে পুরনো কর্মী, আলোচনা যা হয়ে গেছে আমি তার জের আর বেতে চাই না। তোমরা যা চাও আমার পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়, একেবারেই নয়। ব্যাপারটা মিটে গেছে, আমরা আবার কাজে লাগার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার ওপর রাগ হয়েছে তোমাদের বুঝতে পারছি। সেজন্য আমি দুঃখিত। আমার মনের কথাই তোমাদের বলছি। আমি শুধু আর একটি কথাই বলতে চাই। আজ আমার পক্ষে যা করা সম্ভব নয় ব্যবসা আবার জমে উঠলে তা করা হয়তো সম্ভব হতে পারে। আর তা করা যদি সম্ভব হয়, তোমরা না চাইতেই আমি তা করব। ততদিন পর্যন্ত আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে দোষ কি?' কিছুক্ষণ থেমে মালিক কি যেন ভাবল মনে মনে, তারপর আবার চোখ তুলে তাকাল তাদের দিকে। বলল, 'কি বলো তোমরা?' মার্কু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। ইভার্স দাঁতে দাঁত চেপে কি বলতে চেয়েছিল কিন্তু মুখে কথা সরল না। 'লোন', লাসাল বলল, 'তোমরা সবাই গোঁ ধরেছ: আমার কোন কথাই কানে তুলবে না। মনের এই অবস্থা তোমরা সামলে উঠবে। ব্যাপারটা খতিয়ে যখন বুঝতে পারবে তোমরা কেভাবে চলেছ তার মধ্যে কোন যুক্তি নেই তখন আমি যেসব কথা তোমাদের বললাম তা যেন ভুলে যেও না। মালিক উঠে দাঁড়াল, মার্কু'র কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, চিয়ারস। মার্কু'র মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, টেনার গীতকারের মত সেই মুখে কাঁদনের ভাব ফুটে উঠল এবং মুহূর্তের জন্য বিদ্বেষেরও: তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বেরিয়ে গেল। লাসাল তেমনি বিবর্ণ মুখে হাত না বাড়িয়ে ইভার্স-এর দিকে চোখ ফেরাল। চিৎকার করে বলল, "চুলোয় যাও তোমরা।"

তারা যখন কারখানায় ফিরে এল আর সবাই তখন টিফিন করছিল। বালেস্তার বাইরে গিয়েছিল। 'ফাঁকা কথা ছাড়া আর কাজের কথা কিছু হয়নি, মার্কু' শুধু এই বলে নিজের কাজের জায়গায় ফিরে গেল। এসপজিতো বুটি কামড়ানো বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, তারা সেসব কথার কি জবাব দিয়েছে। ইভার্স বলল, তারা কোন জবাব দেয়নি। তারপর তার খাবারের কৌটো আনতে গেল, ফিরে এসে তার কাজের জায়গায় একটি বেঞ্চের ওপর বসল। খেতে শুরু করে দেখল একটু তফাতে সৈদ এক রাশ কাঠচাঁচার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে। সে তখন ফ্যাকাসে আলোর দীপ্ত আকাশের নীলে নীলবিম্বিত জানলার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। ইভার্স তাকে জিজ্ঞেস করল, তার খাওয়া হয়েছে কি না। সৈদ বলল, তার শুকনো ঝুমুর সে খেয়েছে। ইভার্স খাওয়া থামাল। লাসাল-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর যে অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি তার মনের মধ্যে তখনো খচ খচ করছিল তা হঠাৎ মিলিয়ে গেল, তার বদলে সুখকর একটি উষ্ণতায় তার মন ভরে উঠল। তার স্যান্ডউইচ ভেঙে টুকরো করতে করতে সে উঠে দাঁড়াল আর সৈদকে প্রত্যাখ্যানের সুযোগ না দিয়ে বলল 'সামনে সপ্তাহে অবস্থা ভালোর দিকে যাবে তখন তোমার পালা আমাকে খাওয়াবার।' সৈদ হাসল একটু তারপর স্যান্ডউইচের টুকরোর কামড় দিল কিন্তু আলতোভাবে যেন তার খিদে নেই।

এসপজিতো একটা পুরনো সসপ্যানে কাঠচাঁচা আর টুকরো কাঠের ছোট আগুন জ্বালল। বোতলে করে আনা

কিছু কফি গরম করল সেই আগুনে। বলল, ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছে জেনে তার মৃদী কারখানার শ্রমিকদের জন্য এই উপহার পাঠিয়েছে। গোল রাই-সপ্তয়ের একটি শিশি হাতে হাতে ফিরল। এসপাজিতো যতবার চিনি-দেওয়া সেই কফি ঢালল সেন তা খাবার জিনিসের চেয়ে আরও তৃপ্তি করে সবটাই গলায় উপুড় করে দিল। কফি যেটুকু পড়ে ছিল আগুনে-গরম সসপ্যানে মুখ দিয়ে এসপাজিতো গালমন্দ করতে করতে ঠোঁট চুকচুক করে তাও খেয়ে ফেলল। সেই মুহূর্তে বালেস্তার কারখানায় ঢুকে কাজে ফিরে যাবার নির্দেশ দিল।

তারা উঠে দাঁড়িয়ে যখন যে যার কোলায় কাগজপত্র আর কাপড়চোট রেখে দিচ্ছিল বালেস্তার সে সময় হঠাৎ তাদের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বলল, ব্যাপারটা সবার পক্ষেই কষ্টকর, তার পক্ষেও, কিন্তু তা বলে ছেলেমানুষের মত আচরণ করায় কোন যুক্তি নেই, মুখ ভার করে থেকেও কোন লাভ নেই। সসপ্যান হাতে এসপাজিতো তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তার লম্বাটে রুক্ষ মুখে রক্তের আভাস লাগল। সে কি বলতে যাচ্ছিল ইভার্স তা জানত—আর সবাই ঠিক সেই সময় মনে মনে যা ভাবছিল—তারা মুখ ভার করে নেই, তাদের মুখ বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের বলা হয়েছে নেবে তো নাও নয়তো যে যার পথ দেখতে পারো আর অসহায় ক্রোধ কখনো কখনো এত কষ্টকর যে মুখ ফুটে তা প্রকাশ করাও যায় না। তারা মানুষ বই তো নয়, এ অবস্থায় হাসতে পারবে না, মুখে কপট হাসি টেনে খুশি খুশি ভাবও দেখাতে পারবে না। কিন্তু এসপাজিতো সেসব কিছুই বলল না। তার মুখের ভাব খেকটায় নরম হয়ে এল। আস্তে একবার বালেস্তার-এর পিঠ চাপড়ে দিল তারপর সবাই যে যার কাজে ফিরে গেল। আবার হাতুড়ির আওয়াজ উঠল, কারখানা জুড়ে কর্মব্যস্ততার সেই পরিচিত কোলাহল, কাঠচাঁচার আর ঘামে ভেজা পুরনো কাপড়ের গন্ধ ছড়িয়ে গেল। কিশোর করাত যন্ত্র গোঁ গোঁ করতে করতে এসপাজিতো যে কচা কাঠের পাত সামনে ঠেলে দিচ্ছিল তাতে দাঁত বসাল। যেখানটায় দাঁত বসাল সেখানে ভিজে কাঠের গুঁড়ো ছিটকে উঠে করাতের দুধারে কাঠের পাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরা লোহার দুটি বড় হাতে বুটির গুঁড়োর মত ছড়িয়ে পড়ল। কাঠ চেরাই হয়ে যাবার পর শুধু ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে বাজছিল।

রেঁদাযন্ত্রে তক্তা দিয়ে কাজ করতে গিয়ে ইভার্স তার পিঠে টান টান একটা যন্ত্রণা অনুভব করল। সাধারণত কিছুক্ষণ কাজ করার পরে এরকম ক্লান্তিবোধ হত। এই কয়েক সপ্তাহ বেকার থাকার ফলে কাজের অভ্যাস সে হারিয়ে ফেলেছে সন্দেহ নেই! কিন্তু সে বয়সের কথাও ভাবল, কেবল মাত্র সক্ষম কাজ না হলে বয়স বাড়ার সঙ্গে হাতের কাজ আরও কষ্টকর হয়ে পড়ে! এই ক্লান্তিবোধ ও সূচনা। যেখানে মাংসপেশীর চালনা করতে হয় তেমন সব কাজ শেষ পর্যন্ত অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়, তার পরেই মৃত্যু আর অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের পর রাতের ঘুমও এক ধরনের মৃত্যু। ছেলে স্কুলমাস্টার হতে চেয়েছিল, সে ভুল করেনি! কায়িক শ্রম নিয়ে যারা সস্তা বাজারে বুলি কপচায় তারা সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

ইভার্স যখন দম নিতে আর এই সব দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে উঠে দাঁড়াল, সে সময় আবার ঘণ্টা বাজল। ঘণ্টা বেজেই চলল, কিন্তু এমন অদ্ভুত ভাবে থেমে থেমে আবার থমকে উঠে হঠাৎ খুব জোরে যে শ্রমিকদের কাজে ছেদ পড়ল। বালেস্তার অবাক হয়ে শুনল, তারপর মনস্থির করে আস্তে আস্তে দরজার দিকে পা বাড়াল। সে কয়েক সেকেণ্ড চোখের আড়াল হতে ঘণ্টার আওয়াজ থেমে গেল। শ্রমিকরা আবার কাজে হাত দিল। কিছুক্ষণ পরে বালেস্তার দরজা ঠেলে আবার ভেতরে ঢুকল আর ড্রেসিংরুমের দিকে ছুটে গেল। ক্যানভাসের জুতো পায়ে বেরিয়ে এল আর গায়ে কোট চাপাতে চাপাতে ইভার্স-এর পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তাকে বলল, 'ছোট সেক্রেটার হঠাৎ অসুখের মত হয়েছে। আমি জেরম্যাঁকে আনতে যাচ্ছি।' এই বলে সে সদর দরজার দিকে ছুটে গেল। কারখানার কারও অসুখবিসুখ হলে ডাঃ জেরম্যাঁই দেখাশোনা করতেন। তিনি শহরপ্রান্তে এই অঞ্চলেরই অধিবাসী। ইভার্স বিনা মজুরো খবরটা আর সবাইকে

জানিয়ে দিল। শ্রমিকরা ইভার্স-এর চারদিকে জড়ো হয়ে হতবুদ্ধির মত একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। যান্ত্রিক করাতের শুধু শুধু চলতে থাকা ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া কারখানার কোথাও আর কোন আওয়াজ নেই। 'তেমন কিছু নয়' বেমক্কায় একজন বলল। তারা আবার যে যার কাজে ফিরে গেল. নানারকম আওয়াজ উঠল আবার কারখানায়. কিন্তু সবাই যেন অনিশ্চিত কিসের প্রতীক্ষায় আস্তে আস্তে কাজ করতে লাগল।

মিনিট পনের বাদে বালেস্তার ফিরে এসে তার কোট ঝুলিয়ে রাখল আর কিছু না বলেই ছোট দরজা দিয়ে কারখানার বাইরে চলে গেল। জানলায় দিনের আলো ফিকে হয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ পরে করাতযন্ত্রে কাঠচেরার সাময়িক বিরতির ফাঁকে ফাঁকে একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির চাপা ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল. প্রথমে দূরে থেকে. তারপর আরও কাছে আর শেষে কারখানার ঠিক বাইরে। তারপর সব চুপচাপ। একটু পরে বালেস্তার ফিরে আসতে সবাই তার কাছে গিয়ে ভিড় করল। এসপাজিতো করাতের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছিল। বালেস্তার বলল. মেয়েটা তার ঘরে কাপড় ছাড়তে গিয়ে কাটা গাছের মত হঠাৎ উলটে পড়ে যায়। মার্কু বলল, "সে আবার কি !" বালেস্তার মাথা নেড়ে হাতের ইশারায় সবাইকে কাজে ফিরে যেতে বলল. কিন্তু সে যে বেশ ঘাবড়ে গেছে তাকে দেখেই বোঝা গেল। অ্যাম্বুলেন্সের ঘণ্টাধ্বনি আবার শোনা গেল। নিস্তব্ধ সেই কারখানার কাচের জানলা দিয়ে আসা হলদে আলোর নিচে তারা সবাই দাঁড়িয়ে রইল. কাঠের গুঁড়োয় ঢাকা পুরোনো প্যান্টের দুপাশে কেঠো খরখরে তাদের নিষ্ক্রিয় হাত ঝুলিয়ে।

বিকেলের বাকি সময়টা যেন আর কাটতে চাইছিল না। ইভার্স এখন শুধুই ক্লান্তি অনুভব করছিল আর বুকের মধ্যে তখনো একটা ভারভার বোধ। কথা বলতে পারলে হয়তো তার কিছুটা লাঘব হত। কিন্তু তার কিছুই বলার ছিল না, অন্যদেরও না। তাদের নীরব মুখে শুধুই বিষাদ আর এক ধরনের গোঁ ছাড়া আর কোন ভাবের অভিব্যক্তি ছিল না ! ইভার্স-এর মনের মধ্যে কখনো কখনো "বিপর্যয়" কথাটা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল. কিন্তু অস্পষ্টভাবে. কারণ বুদ্বুদের মত উঠেই সেটা তখুনি আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল। তার মন চাইছিল বাড়ি ফিরে যেতে. মেরীদের আর ছেলের সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে আবার বসতে। ঠিক সেই সময় বালেস্তার সেদিনকার মত কাজের ছুটি ঘোষণা করল। কলকব্জা থেমে গেল। ধীরেসুস্থে তারা আগুন নেবাতে লাগল আর বেঞ্চের ওপর সবকিছু আবার ঠিকঠাক সাজিয়ে রাখতে। তারপর সবাই একে একে ড্রেসিংরুমের দিকে পা বাড়াল। সৈদ রয়ে গেল, তার করণীয় ছিল কাজের জায়গাগুলি ঝাড়পোছ করা আর জল ঢেলে মেঝে ধুইয়ে দেওয়া। ইভার্স যখন ড্রেসিংরুমে গেল, লোমশ ও বিশালদেহ এসপাজিতো তখন করিডরের নিচে তাদের দিকে পেছন করে গায়ে সাবান ঘষছিল হুমহাম করে। ভালুকের মত বিশালদেহ এই লোকটি ছিল লাজুক প্রকৃতির, গোপনাঙ্গ সব সময় সযত্নে আড়াল করে চলত। কারখানার অন্য শ্রমিকরা তাই নিয়ে প্রায়ই তাকে ঠাট্টাতামাশা করত। কিন্তু আজ সেদিকে কারও নজর ছিল না ! করিডর থেকে পিছু হটে এসপাজিতো লেংটির মত করে কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিল। তারপর আর সবাই একে একে স্নান করতে গেল। মার্কু যখন করিডরের নিচে খুব জোরে জোরে খালি গায়ের এপাশ ওপাশ চাপড়াচ্ছিল, সেসময় লোহার চাকার ওপর গড়াতে গড়াতে আস্তে আস্তে সদর দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। লাসাল ভেতরে ঢুকল।

প্রথমবার যেভাবে এসেছিল তার পরনে সেই একই পোশাক কিন্তু চুল উসকোখুসকো। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সে বিশাল জনহীন কারখানার ভেতরটায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল. কয়েক পা এগোল, আবার থামল. তারপর ড্রেসিংরুমের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এসপাজিতো তখনো কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে গা মুছছিল. তার দিকে মুখ ফেরাল। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় অপ্রস্তুতভাবে একবার এপায়ে তারপর ওপায়ে ভর করে সে দাঁড়াচ্ছিল। ইভার্স ভাবল, কিছু বলতে হলে মার্কুরই তা বলা উচিত। কিন্তু মার্কু তার চারপাশে জলের ধারার আড়াল সৃষ্টি করে জলক্রীড়া করে গেল। এসপাজিতো যখন চটপট

একটা শার্ট তুলে নিয়ে সেটা গায়ে দিচ্ছিল, লাসাল সে সময় বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে শুকনো গলায় বলল, "গুড নাইট।" তারপর ছোট দরজার দিকে পা বাড়াল। ইভার্স-এর যখন খোলা হল তাকে ডেকে কারও কিছু বলা উচিত, দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

ইভার্স হাতমুখ না ধুয়েই পোশাক পালটে নিল, লাসাল-এর মত সেও "গুড নাইট" বলল, কিন্তু গভীর শ্লথতার সঙ্গে আর তারাও সবাই সাগ্রহে সেইভাবে জবাব দিল। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল, চালাঘর থেকে তার সাইকেল বার করল আর সাইকেলে চাপতে গিয়ে পিঠে আবার সেই টান টান যন্ত্রণা অনুভব করল। শেষ বিকেলে এখন সে যান-বহুল শহরের ভেতর দিয়ে এক পায়ে সাইকেল ঠেলে যাচ্ছিল। তার সেই পুরনো বাড়ি আর বারান্দায় ফিরে যাবার তাড়ায় খুব জোরেই প্যাডেল করছিল, কখন কলতলায় হাতমুখ ধুয়ে সমুদ্র দেখতে বারান্দায় গিয়ে আরাম করে বসবে। তার সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছিল সেই সমুদ্র বুলভারের রেলিং-এর ওপার দিয়ে সকালের চেয়ে আরও শ্যামলা হয়ে। কিন্তু সেই ছোট মেয়েটি ও তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল, মেয়েটির ভাবনা মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না।

বাড়িতে গিয়ে দেখল ছেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে ছবির বই পড়ছে। ফেলাশে ইভার্সকে জিজ্ঞেস করল, কাজকর্ম সব ঠিকমত চলছে কি না। সে কোন জবাব দিল না। কলতলায় হাতমুখ ধুলে, তারপর বারান্দার নিচে দেয়াল ঘেঁষে যে বেঞ্চি পাতা ছিল সেখানে গিয়ে বসল। মাথার ওপর তারের টানায় শুকোতে দেওয়া কাচা কাপড় দুলছিল, ধোঁয়াটে ভাব কেটে গিয়ে আকাশ স্বচ্ছ নির্মল হয়ে আসছিল। দেয়ালের ওপর দিয়ে সন্ধ্যাবেলার নরম সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। ফেলাশে আনিজেৎ নিয়ে এল, সঙ্গে দুটি গ্লাস আর ঠান্ডা জলের একটি ফ্লাস্ক। স্বামীর পাশে এসে বসল। ইভার্স তাকে সব কথা বলল, নতুন বিয়ের পর প্রথম সেই কয়েকদিনের মত নিবিড় অন্তরঙ্গতায় তার হাত ধরে। কথা ফুরোল, ইভার্স তবু সেখান থেকে নড়ল না, চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। সেখানে তখন দিগন্তের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি গোধূলির আবছা নেমে আসছিল। "যে, এ সবই তো তার নিজের দেশের", ইভার্স বলল। সে যদি আবার যৌবন ফিরে পেত, আর ফেলাশেও, তবে সমুদ্র পেরিয়ে অনেক দূরে কোথাও চলে যেত।

BEST WISHES FROM

A
WELL
WISHER

অভ্যন্তরের কথা

এডওয়ার্ড সঈদ
অনুবাদ : দিলীপ ঘোষ

এডওয়ার্ড সঈদের লেখাটির উপজীব্য বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই জানাতে হয় ফিলিস্তিনি মানুষের জন্য তাঁর দরদী ভূমিকার কথা। যুগে যুগে ধরে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে বসবত জনজাতিকে উচ্ছেদ করে ইসরাইলী রাষ্ট্র সেখানে কর্তৃত্ব কায়েম করতে চেয়েছে। গৃহ থেকে, জন্মভূমি থেকে উৎপাটিত মানুষ শরণার্থী হয়ে, আকাশের নিচে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। আর একদল মানুষ যারা ভূখণ্ডে থাকলেই নিয়ত ইসরাইলী কর্তৃপক্ষের নিপীড়নের বলি হয়ে চলেছেন। যারা অধিকৃত ফিলিস্তিনের বাসিন্দা তারাই হলেন এখানে অভ্যন্তরবাসী। আর যারা দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের মাটি থেকে উচ্ছিন্ন তারা হলেন বাইরের মানুষ। এদের দুটি দলের কথোপকথন, পরস্পরের প্রতি মনোভাব, বেদনা, যন্ত্রণা এ সমস্ত কিছু নিয়েই সঈদের এই উন্মোচন। প্রকৃত অর্থে এ বিষয়ে সঈদের থেকে অবহিত আর কেই বা আছেন!

সূত্র : After the Last sky Palestinian Lives / Edward Said Photographs by—Jean Mohr vintage—1993 বইটির Interiors অধ্যায়ের প্রথমাংশের অনুবাদ।

ফিলিস্তিনীদের কাছে 'মিন-আল-দাখিল' অর্থাৎ 'অভ্যন্তর থেকে' এই শব্দসমষ্টির একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা রয়েছে। সব থেকে আগে এটির অর্থ ইসরাইলের ভিতরের অঞ্চলগুলি। ইসরাইলের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও সেসব ভূখণ্ড ও জনগণ এখনো ফিলিস্তিনী। কাজেই ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত শব্দসমষ্টি বোঝাতো সেই সব ফিলিস্তিনিদেরকে যারা ইসরাইলের মধ্যে বসবাসরত। ১৯৬৭ সালের পর থেকে এটি পশ্চিমতীর, গাজা ও গোলান হাইটসের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য সম্প্রসারিত হয়। আর ১৯৮২ থেকে এটি দক্ষিণ লেবাননের ফিলিস্তিনিদেরও (এবং লেবানীয়দের) বোঝাচ্ছে। আল দাখিল'এর এমন অর্থের সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিকটি হোল বাচ্যার্থের এই পরিবর্তনটি যা কিনা ভাবার্থের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে পড়েছে। আমি স্মরণ করতে পারি যে ১৯৭০ এর প্রথমভাগের মত সাম্প্রতিক সময়ে ইসরাইলের ফিলিস্তিনিদের একটি বিশেষ জাতের বলে বিবেচনা করা হোত। এখন মানুষজন যাদের সম্পর্কে সহজেই সন্দিহান হয়ে উঠতে পারতেন যদি কিনা আপনি ইসরাইলের বাইরে বসবাসরত নির্বাসিত অথবা শরণার্থী একজন ফিলিস্তিনি মানুষ হয়ে থাকেন। আমরা সর্বদাই অনুভব করতে পারতাম এই মানুষগুলির গায়ে ইসরাইলের শীলমোহর। তাদের পাসপোর্ট, তাদের হিব্রু ভাষার জ্ঞান, ইসরাইলের ইহুদিদের সাথে বাস করার ফলে আত্মসচেতনতার অপেক্ষাকৃত অভাব, এবং জায়নবাদী পরিচিতির ফলে ইসরাইলকে একটি সত্যিকার দেশ হিসাবে উপলব্ধ করা। তাদেরকে করে দিয়েছিল। আরবীয়রা যেমন আরবদুনিয়ার বাস করেন, আরব জাতীয়তাবাদের প্রচণ্ড সাফল্য ও কল্পনাতুর দুঃখেরও অধীন এমন বিবেচনাবোধে তারাও আমাদেরই মতন ছিলেন। অর্থাৎ আমরা জীবনযাপন করে চলেছিলাম সাম্রাজ্যবাদ ও জায়নবাদের থেকে স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে। নিঃসঙ্গতার অর্থেই কেবল তারা পৃথক ছিলেন।

বর্তমানেও তারা এখনো স্বতন্ত্র। যদিও সুবিধাভোগী। অভ্যন্তরের এ সমস্ত মানুষজন গণিত হন ফিলিস্তিনি হিসাবে। বলতে গেলে ইতিমধ্যেই সেখানে বলতে হয় ফিলিস্তিনি মানুষজন, জীবনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন, বন্দুকের নিচে, ঘেরাটোপে আর Kasbah'য় মধ্যে বন্দী। অর্থাৎ এক ধরনের মহিমার অধিকারী আমাদের বাদবাকিদের জীবনে যেটি নেই। হা ঈশ্বর, একথাও সত্যি যে ১৯৭০ সাল থেকে আমাদের সমষ্টিগত ইতিহাস ছিল খারিজদের (বাইরের) অথবা মানফা ও ঘুরবার (নির্বাসনে এবং বিচ্ছেদের মধ্যে হয়ে রয়েছে অননারূপে অসফল। একটানা দীপ্তিবিহীন, অসবিত, বেশি বেশি রকমে উদ্বাসিক, বি-কেন্দ্রিত ও বিচ্ছিন্ন। আমরা ফিলিস্তিনিরা জর্ডন, লেবানন, সিরিয়া ও মিশরি নিজেদের পদমর্যাদা হারিয়েছি। অবশ্য পি. এল. ও ফিলিস্তিনিদের মুক্তি সংগঠন) এরচেয়েও বেশি দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। আর ইউ এন (সম্মিলিত জাতিসংঘ সনদের একটা গুচ্ছ রয়েছে আমাদের পক্ষে। তবুও বহিষ্কৃত হিসাবে আমাদের বাস্তব অবস্থা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতার বিষয়ে কারোরই কোন বিভ্রান্তি নেই। আমাদের ক্ষেত্রে হিসাব নিকেশের দিকে একবার তাকালেই বেরিয়ে পড়ে অগণিত হতা।. বহিষ্কার হানাবদ্ধায় নামানো রয়েছে এই হিসাব-খাতার একদিকে আর বাস্তবিক পক্ষেই অন্যদিকে প্রাপ্তির খাতায় শূন্যতা। অন্য আরেকটি উপমা দাঁড়ায় যে কেবল দেয়ালের লিখনই অদ্ভুত নয়, উপরন্তু আমরা নিশ্চিত নই কে সেটি কি বলতে চাইছে।

যারা ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে আছেন, যাদের ইসরাইলী শাসনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তাদের চাইতে যে তিনি ভালো আছেন একথা জানেন, শুধু জায়নবাদ নিয়ে কথাবার্তা বলতে পারেন, বাইরের আমাদের মতন আরব ভাইদের অসহ্য-উৎকণ্ঠার ভাগীদার হয়ে চলেছেন। একথা উল্লেখ করাটা জরুরী যে ফিলিস্তিনি কার্যক্রম এখনো মূলতঃ রাজনৈতিক ভবে উদ্দিষ্ট ও নিবদ্ধ অভ্যন্তরের বিষয়কে ঘিরেই। অন্তত ১৯৮২ পর্যন্ত লেবাননে ইসরাইলী আক্রমন, বাইরের সমস্যাগুলি ও রাজনীতিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেত।

আল-বাখিল-এর দ্বিতীয় অর্থটি আরও জটিল। তা একান্ততার দিকে ইঙ্গিত নির্দেশ করে। অভ্যন্তরের সেই ভূখণ্ডটির প্রতি যা গড়ে উঠেছে আর টিকে থাকে গোষ্ঠী সদস্যদের সহমর্মিতার পাঁচিলে। আর আমাদের চারদিকে যে বিপজ্জনক আবেষ্টনী তৈরি হয়েছে অপেক্ষাকৃত শক্তিবানদের দ্বারা। দুজন ফিলিস্তিনি সর্বপ্রথম মুখোমুখি হোলেন। এক বা দুমিনিটের মধ্যেই অন্য কোন স্পষ্টভাষিত প্রশ্ন বা উত্তর ছাড়াই তারা একে অপরের আদি বাসস্থান, তাদের কাজকর্মের ধরণ, রাজনৈতিক মত বিশ্বাস (এমন কি তার অযোক্তার ভিন্নতা বা প্রচলিত ধারা সম্পর্কেও) এবং তাদের মূল্যবোধের ধরণ-ধারণ ঠিক বুঝে উঠবেন। এ সমস্ত কিছুই নিহিত রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু শব্দের আদলে কিংবা শব্দগুলির মধ্যে, নামের মধ্যে, সুরারোপে এবং স্বরলাঘবে, কেবলমাত্র ফিলিস্তিনিদের কাছে যেটি চেনা। কিন্তু অভ্যন্তর-জন হওয়ার অর্থ এমন নয় যে আপনি স্বয়ং বাইরের মানুষও। আপনাকে সেদিকের অলভাগ হতে হবে এবং বাইরের জগতের ভাষার কথা বলতে হবে,—যার মানে হচ্ছে যে আপনাকে তাদের সাংকেতিক চিহ্নগুলিকে ব্যবহার করতে হবে, যদিও একেবারেই ভিন্ন কিছু একটা বোঝানোর জন্য।

কিন্তু অভ্যন্তরের সমস্যাটি হোল যে তা অভ্যন্তরীন। একান্ত নিজের আর কখনোই প্রকাশ্য বা অন্যের কাছে স্পষ্ট করে তোলা যাবে না। এমনকি তা হয়তো আপন গোষ্ঠীর সভ্যদের কাছেও না। গোপনতার এই জগতটির ব্যক্তিক অস্তিত্ব, গুপ্ত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের দিকটি বেশির ভাগ সমাজের ক্ষেত্রেই সত্যি। আরবীয় মুসলিম ও খ্রীষ্টিয়ান উভয়ের ঐতিহ্যেই সর্বদাই এটি কিছুটা ধর্মের দ্বারা রঞ্জিত, এবং তা এমন একটি ধরণের যে আমার মনে হয় যেটি বেশির ভাগ প্রচারবাসীদের (অথবা বহিষ্কৃতের) থেকে বহুমাত্রায় সূক্ষ্ম এবং পার্থক্য বাঁধা। এমনকি যখন মনে হয়, অভ্যন্তরবাসী অথবা আরক্ষকারীরা সাংকেতিক ভাষাটি জানেন, কিন্তু কখনোই নিশ্চিত নন যে এসমস্ত সাংকেতিক চিহ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে যা টিঁকে আছে সেই স্থিতিকে নিশ্চিত করতে অথবা সমগ্র গোষ্ঠীর সম্মতি আদায় করতে পারবে কিনা ! এভাবেই যদিও ফিলিস্তিনিদের কাছে বর্তমানে ফিরে যাওয়া (awaali) শব্দটি খুবই নির্মম এবং আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অন্বেষণের একেবারে হৃদকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে তবু কারো কারো কাছে এটির অর্থ হোল ফিলিস্তিনিদের ইসরাইলের পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্রসীমায় ফিরে যাওয়া। যদিও অন্য একদলের কাছে এর অর্থ হোল সার্বিকভাবে ফিলিস্তিনি কোন একটি রাষ্ট্রে ফিরে যাওয়া।

এমন অর্থে অভ্যন্তরের দিকে থাকা মানে হোল, ভেতরে থাকা, সেখান থেকে কথা বলা। এমন একটি অবস্থা যেটি কিনা বাস্তবার্থে বললে আপনি নিজে নিয়ন্ত্রণ করেন না। তার সত্যি সত্যিই নির্দিষ্ট হতে পারবেন না এমনকি যখন কিনা আপনি বিশেষ বাকরীতিও গড়ে নিয়েছেন। যে বাকরীতি মধ্যেধোই কৌশলে এড়িয়ে চলার মতন, সর্বদাই যা নাকি খেয়ালি—অর্থাৎ শুধু আপনি এবং আপনার মতন যারা তারাই বুঝে উঠতে পারবেন। আপনার অবস্থার প্রকৃতিটি এমনই যে ভেতরে বাস করাটা যেন একটা সুবিধা। যেটি আসলে একরকমের দুর্দশাগ্রস্ততা। অর্থাৎ আপনি যে বাড়িটির মালিক, তার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা। অথচ অভ্যন্তর ও বাইরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য একটি খোলা দরজার প্রয়োজন রয়েছে। অথচ সেটি এমন প্রশস্ত একটি রাস্তা যেটি অন্যদের প্রবেশের জন্যও ব্যবহৃত হবে। এমনকি আমরা যদিও ভেতরেই রয়েছি, সেখানে আমাদের জগতে অন্যদেরও ঢুকে পড়তে বাধা নেই। আমাদের কথাবার্তা শুনতে, আমাদের ভাবনাকে উন্মোচন করতে, আমাদের একান্তভাবে বিঘ্নিত করে তুলতে। ফিলিস্তিনীদের ইতিবৃত্তকে সেভাবেই আমরা পাঠ করে থাকি,—ক্রুসেডের যুদ্ধ থেকে বালফোর এবং জেইজমান, অর্থাৎ তা আমাদের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ঢুকে পড়েছে, নিজেদের পৃথকচেতনা থাকা সত্ত্বেও ভিতরে বাহিত হয়ে চলেছে।

তাহলে আপনি কি করবেন ? যারা বহিঃস্থ তাদের পাশাপাশি বসবাসে অভ্যস্ত হতে থাকবেন আর অভ্যন্তরে আপনার যা কিছু রয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করার জন্য একনাগাড়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। আমরা হলাম গিয়ে সংকেত ও ব্যাখ্যাপক হেঁয়ালি এবং পরোক্ষ ভাবপ্রকাশের মানুষজন। একে আমরা অন্যকে বাইরে পেতে চাই। কিন্তু যেহেতু আমাদের অভ্যন্তর সবসময়েই অন্যদের দ্বারা কিছু পরিমাণে অধিকৃত ও বিঘ্নিত হয়ে চলে—যেমন ইসারাইলী ও আরবীয়রা। কথা বলার জন্য একটা কৌশল আমরা বিকশিত করে তুলেছি। প্রসঙ্গ যা-কিছু আছে তার মাধ্যমে। বিষয়কে তির্যকভাবে প্রকাশ করে। আর তা আমার মতে এতখানি রহস্যময়তায় যে তা কিনা আমাদেরকেও বিহ্বল করে তোলে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, শারীরিক শক্তিপ্রদর্শন, শরীর গঠনের প্রতি মুগ্ধতায়, ক্যারাটে, বক্সিং, বেগুলি কিছুকাল ধরে ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে জীবনের উল্লেখযোগ্য বিষয়। আর তা অবশ্যই শক্তিবানদের প্রতি শক্তিহীনদের, কার্যত অন্যের উপরে কর্তৃত্বকামী মনোভাব, ও প্রত্যুত্তর। কিন্তু এটি আকর্ষক ব্যাপারও। সাধারণ অভিজ্ঞতায় গ্রন্থিত করে তোলা যেন একটা সৌন্দর্যবর্ধক পন্থা। এবং আমাদেরকে শক্তিবান করে তোলার চেয়েও বহুগুণে বেশি একটা কিছু। এটি হচ্ছে সত্তার একরূপ দৃঢ় ঘোষণা। যে কোন যুক্তিসিদ্ধ লক্ষ্যের সীমা-অতিক্রান্ত কিশলতার জন্য গোঁ-ধরা মনোভাব। কিন্তু বহিঃস্থদের কাছে এটি মনে হতে পারে চূড়ান্ত মূঢ়তা—তা কিন্তু আমাদের কাছে অতি সামান্যই গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অর্থাৎ অভ্যন্তরের কাছে তা যেমন ছিল, সেই একেবারেই প্রায় অনধিগম্য মাত্রা।

এই কাহিনীটি আমার বক্তব্য অর্থটিকে স্পষ্ট করে তুলবে। ইউরোপের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের স্ত্রী বেশ কিছুদিন আগে তাঁদের জেরুজালেম পরিদর্শনের কথা জানান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করছিলেন আর তাঁর স্ত্রীও একই কাজে রত ছিলেন। দু' সপ্তাহের জন্য তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন উল্লিখিত সময়কালে তাঁরা দু'বার ফিলিস্তিনিদের সাক্ষাৎ পান। তার মধ্যে একটি সাক্ষাৎকার বর্তমান চিঠিটির উপলক্ষ্য।

ডেভিড স্ট্রীটে দোকানের মালিকের (সূচিশিল্প বিক্রেতা) সাথে পণ্য দামাদামির ফাঁকে তাঁরা কথাবার্তা বলেন। তাঁরা দেখতে পান যে তিনি আমার সুপরিচিত ও গুণগ্রাহী। আমার কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার যে মহিলাটির উত্তর দানের সূত্রে মালিক এ তথ্যটিকে স্বেচ্ছায় জানিয়েছিলেন। আর তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে যদিও অপ্রাসঙ্গিক কারণে যে মহিলাটি এডওয়ার্ড সইদকে চেনেন। তিনি তখন দায়িত্ব নেন "ভেতরে পাঠানো সংবাদটিকে পৌঁছে দেবার" যা কিনা স্পাইরাল নোটখাতার এক টুকরো ছোট কাগজে আরবি ভাষায় লেখা। আমার বন্ধু এমনও জানিয়েছেন মানুষটির মনোভাবের কথা অর্থাৎ আরবদের চেয়ে ফিলিস্তিনিদের সমস্ত বিষয়ে যেমন বুদ্ধি, সামরিক কৌশল, ব্যবসা-বাণিজ্যের দক্ষতার কথা। তার কথায় এমন শ্রেষ্ঠত্বভাবনা ব্যক্ত হয়েছে এই বাক্যবন্ধে "আমরাই হলাম আরব দুনিয়ার ইহুদি।" এসব কিছুর মধ্যেই আমার সংবাদ দাতা সঠিকভাবেই অনুমান করেছেন "অসার বাগাড়ম্বরপূর্ণে অতি সূক্ষ্ম বাঁক ও জটিলতা যা বুঝে ওঠার পক্ষে আমি (তিনি অত্যন্ত অনবহিত।" বিশেষ করে এজন্যে যে তিনি একজন ইসরাইলী বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলেন, মালিকটির বেশির ভাগ ভাবভঙ্গী তাঁরই সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে চালিত হয়েছিল।

এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে আমার জন্য কী বার্তা উদ্দিষ্ট ছিল ? আমি স্বীকারোক্তি করছি যে কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে যেই মাত্র আমি সেই কাগজখানি খুললাম এবং কিছুটা আত্ম-সন্তাষণপূর্ণে অনুভূতি যেভাবে ঐ জনগণ আমাকে সম্মান জানিয়েছেন, আমাকে যাঁরা চেনেন না, অথচ আমার ভূমিকাটিকে তাঁরা মূল্যবান বলে ভাবেন, সে কারণটি আমাদের লক্ষ্যের জানাই করে চলেছিলাম। বার্তাটির আরম্ভ হয়েছে রোমান হরফে আমার নামটি শিরোনামে লিখে। তারপরে পাঁচ লাইনের আরবি ভাষায় লেখা রয়েছে পত্রলেখার ক্যারাটেতে দারুণ দক্ষতার কথা। আর বিশ্ব ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় তাঁর "ফিলিস্তিন" নামে অংশগ্রহণের কথাও। অন্য বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম ফিলিস্তিনিদের অভ্যন্তর বাসীদের সংবাদ জ্ঞাপন কেমন অদ্ভুত—সত্যি সত্যিই কোন পরিহাসের ছলে নয়, সেই অদ্ভুত বাহাদুরি প্রদর্শন। নিজেদের অবস্থাটিকে বুঝে নিলে আমাদের দুজনের মধ্যে যে বার্তা বিনিময়ের পালা তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঠেকেছিল। তিনি তো ছিলেন অভ্যন্তরে। আর একজন সহানুভূতিশীল বহিঃস্থের শুভ চেতনাকে হিসাব করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ গড়তে চেয়েছিলেন। এমন একজন অভ্যন্তরবাসী যিনি কিনা এখন আমাদের উভয়েরই উৎসভূমি জেরুজালেমের বাইরে থাকেন। তা ছাড়া তিনি যে আমার নামটি ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলেন তা ছিল তেতখানিই প্রতীকী অর্থাৎ আমি যে জগতে বাস করছিলাম তার সাথে যোগাযোগে তিনিও সক্ষম। এমন কথাও তিনি বলেছেন যে আমি যা কিছুটা গর্বের সাথে করে চলেছিলাম, হয়তো এমন একজন মানুষের স্বস্তি নিয়েই, যিনি কিনা বহুকাল ধরে পশ্চিমী বুদ্ধিজীবী-দের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে এসেছেন, যাদের অতীত কাজকর্ম কোনদিনই বিশেষ ভালো নয়। এমন একটা স্বাস্থ্যকর ইঙ্গিত দেখানোর সময় হাজির হয়েছিল যে এডওয়ার্ড সইদদেরকে একথাটি ভালোমতন স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য—অর্থাৎ আমরা ক্যারাটে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। হয়তো কিছুটা অনুমোদন ধরনের মত, একই সঙ্গে সতর্কভাবে পরিলক্ষিত হয়ে চলেছিলাম। চেহারা কিংবা তাঁর শারীরিক কুশলতার বিষয়টি, (আমার মতে / তার হাস্যকর জিদ্ যেন একই বিষয়কে উদ্ঘাটিত করে যে প্রায় অননুপ্রেরিত আত্মঘোষণা আমাদের সকলেরই মধ্যে রয়েছে। ইতি মধ্যেই তিনি আমার বন্ধুর কাছে তাঁর অতি-ফিলিস্তিনি হয়ে ওঠার কাজটা সম্পন্ন করে ফেলেছেন। এবং তা করেছেন হয়তো একথা জেনেই যে তিনি কথাগুলি আমার জানাবেন। আরও একথা জেনে তিনি কাজটা পুনরায় করেছিলেন যে গল্পটিকে আমি পুনরাবৃত্তি করব। এবং তা আমি করেওছি।

এমন দৃষ্টান্তের প্রমাণপঞ্জী ও নানান রকমের অফিকায় চেতনা আমাদের ছড়িয়ে থাকা জনসম্প্রদায়ের মাঝের যোগ-সূত্র, আমাদের আত্মঘোষণাকে জোরালো করে তোলে। আর তা এমন জিদের মধ্য দিয়ে যা নাকি সদর্থকভাবে দেখলে

হতবুদ্ধিকর। বহিঃস্থদের কাছে এমন আত্মঘোষণা হতাশাকর কেননা তার অসমাপ্তির জন্যই শুধু নয়, বরং একারণেও যে তা নিজেকে অবিরাম পুনঃসৃজন করে চলে। কখনোই নতুন কোন কিছু উৎপাদন না করেই। অথবা বাইরের কোনকিছু যে আলোকপাতী হয়ে উঠতে পারে তা না মেনেই। আমার কাছে এবং আমার মতই অন্যান্যদের কাছেও, যিনিই নির্বাসনে (Manfa) অথবা বিচ্ছেদে আছেন (Ghurba), যদিও কিছু একটা আশাব্যঞ্জক ব্যাপার সেখানে রয়েছে কিছুটা শূন্যগর্ভ অভ্যন্তরবাসীদের জন্য—ফিলিস্তিনে অথবা আরবজগতে যা কিনা নিউইয়র্ক বা বার্লিনের চাইতে আল-দাখিলের অনেক কাছের—পরিচিত রীতিনীতির পুনরাবৃত্তি করে চলেছে এমন একটা মাত্রা পর্যন্ত, যেখানে পুনরাবৃত্তি হয়ে দাঁড়ায় অধিক জরুরী—অর্থাৎ যা নাকি পুনরাবৃত্ত হয়েছে তার থেকেও। যেমন আমার ক্যারাটেকি সম্পূর্ণভাবে জানেনা সেই পুনরাবৃত্তির কঠোর শৃঙ্খলায় আপনি এর থেকে বাইরে যেতে পারবেন না। এ থেকে মুক্তি পাবেন না। সহজভাবে এটিকে অনাকিছুর প্রতিরূপে কাজে লাগাতে পারবেন না। ক্যারাটে আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে সহায় হয়ে ওঠে না। একজন ফিলিস্তিনি ক্যারাটেকিদের শুধুমাত্র পুনরাবৃত্ত কাজের অনুষ্ঠান ছাড়া। বিষয়টি এমনই যে পুনরাবৃত্তির কার্য-ক্রমকে তা বাধা দিচ্ছে। আর অন্যদেরকেও নিজেদেরকে এড়িয়ে যাবার ক্ষেত্রে অথবা তা পুরোপুরি উপেক্ষা করে ওঠার ক্ষেত্রে।

পুনরাবৃত্তি এমন ব্যাপার। ফিলিস্তিনিদের সমস্ত শ্রেণীর মানুষদের গৃহের অভ্যন্তরেই লক্ষ্য করা যায়। একই রকম খাবার আর খাদ্যগ্রহণের রীতি একটি টেবিলের চারপাশে সাজানো। অথবা মধ্যভাগ জুড়ে গোছানো। পাগল-করা নিয়ম নিষ্ঠার খাবার পরিবেশনের অনুষ্ঠান চলে। আতিথেয়তার অনুষ্ঠান, আমার মতে, রূপায়িত হয়ে বাড়াবাড়ির মাত্রায়। একজন অতিথির সামনে যতটা দরকার তার থেকেও বেশি খাবার, যতটা খাওয়া সম্ভব তার থেকেও বেশি করে পরিবেশন। যতটা কুলিয়ে ওঠা যায় তার থেকেও বেশী করে আয়োজন। যেখানেই ফিলিস্তিনিরা আছেন একই রকম আতিথেয়তার লক্ষণ আর সন্ধান দেখানো হয়। একই রকমের প্রত্যাশিত অত্যুক্ততা। একই ধরণের স্নেহ-মমতার প্রদর্শন। আর দৃশ্যের ক্ষেত্রে ওমর মসজিদের ছোট প্রতিরূপ ভেতরের প্লেটগুলিতে মুদ্রো, ক্ষুদে ফিলিস্তিনি পতাকা—সুরক্ষার জন্য একই রকমের সামাজিকতাও অধিকৃত হয়ে পড়েছে। স্বভাবতঃই তারা দ্বিধাহীনভাবে মানাতে চান, ঘোষণা করতে চান এই বিষয়টি যে আপনি ফিলিস্তিনিদের গৃহে রয়েছেন। ব্যাপারটি তবুও যেন তার থেকে একটু বেশি। এটি বৃহত্তর কোন এক পুনরাবৃত্তি-রীতিরই অংশ। সেখানে আপাতভাবে মুক্ত এবং জাগতিক আমিও অংশ নিয়ে থাকি। যতক্ষণ আমরা পুনঃসৃষ্টি করে চলি। টেবিলগুলি সাজানো হয়, দোরার ঘর পরিপাটি করা হয়। ছোটোখাটো আসবাব সাজানো হয়। ছবিগুলো টাঙানো হয়। তবুও সেসমস্ত অসতর্কভাবেই তুলে ধরে এবং টিকিয়ে রাখে সেই ভাঙন বা চিড়টিকে যা কিনা আমাদের জীবনে অঙ্গস্বরূপ। আপনি তা লক্ষ্য করতে পারবেন যদি চোখের সম্মুখে যা কিছু রয়েছে সেগুলি সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। সর্বদাই যেন ঈষৎ কোন একটা কিছুর অভাব। সর্বদাই যেন কোন কিছু একটা ঠিকঠাক কাজ করছে না। ফিলিস্তিনি ছবিগুলি সবসময়েই একটু উঁচুতে টাঙানো হয়। আর মনে হয় যেন বক্রভাবে। সর্বদাই যেন কিছু একটা বাড়াবাড়ির কারণে হারিয়ে যায়। এমন আমি বোঝাতে চাইছি না যে এর ফলশ্রুতি দুঃখের বা বিষাদের। বিপরীতে সেই চিড়টি সাধারণভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এমন ব্যাঙ্গাত্মক স্থানচ্যুতি হোল অতি ছোট জায়গার মধ্যে বড় বেশির অথবা অতি চমৎকারিত্বহীন কোন একটি উপলক্ষ্য। একখানি টেবিলে, বড় বেশি দর্শনীয় বস্তু, বড্ড বেশি আহার্য, বড় বেশি ছবি, বড্ড বেশী লক্ষণীয় বস্তু। আমার নিজের দিক থেকে এমন মনোভাবের মামুলি বিবরণ তা হয়তো অসামঞ্জস্যের প্রতি। আর পুনরাবৃত্তি হোল গিয়ে এমন একটা কিছু যেন আমি সর্বদাই বড় বেশি লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠছি—বেশির ভাগই তাদের মধ্যে অব্যবহৃত। আমি যখন জমা করি, মাঝে মধ্যেই তো তা আমি করে থাকি। যখন তা আমার

ক্ষেত্রে ঘটে. পুনরাবৃত্তি সচেনা করে একটা অননুভূত প্রকরণ। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সকলেই নিজের নিজের মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যেই সেই মনোভাবটিকে চিনে উঠতে পারেন। যদিও সদাসর্বদাই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রকৃতির বৈচিত্র্য ভরা একই রকমের প্রসামঞ্জস্য শেষপর্যন্ত অভ্যন্তর স্তরের বাইরের পর্যবেক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে—যেভাবে তা জাঁ মোর-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমার কিন্তু সন্দেহের উদ্রেক হয় যে এর পেছনের গভীরতর কারণগুলি সহজভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। ঠিকই, এ সমস্ত নড়াচাড়ির এবং অপ্রতিসম ধরণগুলি অপরিহার্যভাবেই অনাদ্দনিক ফলাফল নিয়ে আসে। তাদের স্থাপিত নিরাপত্তাহীনতা যেন নির্বাসনকে প্রতীকায়িত করে তোলে। কোন স্থান থেকে নির্বাসন, কোন এক অতীত থেকে, কোন গৃহের চৌহদ্দি থেকে। তথাপি আরও একটি সমস্যা পুনরাবৃত্তির এই ধরণটির মধ্যে প্রকাশ পায়।

ফিলিস্তিন একটি ছোট জায়গা। এটি নানান জনগণের দাবি ও স্মারক নিয়ে অবিশ্বাস্য রকমের ঘনবসতিপূর্ণ। এর উত্তরাধিকার কেবলমাত্র নিছক বিজয় ও পুনর্বাসনে নয়। বরং বারংবার খনন কার্য ও ইতিহাসের পুনর্লেখনেও নিহিত। ব্রুপেশী ঐতিহাসিক গ্রেন বোভারসক এই ইতিহাসের যথার্থভাবে বর্ণনা দিয়েছেন "মূলগতভাবে ঐক্যবদ্ধ ভূখণ্ডের উদ্দেশ্য প্রণোদিত খণ্ড বিখণ্ডীকরণের দ্বারা।" বোভারসকের দৃষ্টিভঙ্গীর মহত্তা এখানে নিহিত যে তিনি জাহলপর্বে ও প্রাক-ইসলাম পর্বে ফিলিস্তিনিদের উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। সমস্ত রকমের ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলিকে টপকে গিয়ে তিনি একথা অনুভব করতে সমর্থ হয়েছেন। একটি আরবীয় রাষ্ট্রের বাস্তব সত্যতা এবং পরবর্তীকালে আরও বেশি প্রসারমান একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের মধ্যপ্রচ্যের ক্ষেত্রে সত্যতা, অর্থাৎ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর থেকে ইসলামের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়পর্ব জুড়ে।

সেই ভূখণ্ডের মূল প্রসারতা হারিয়ে গেল। খ্রী ঈশ্বর, উনিশ ও বিশ শতকে ফিলিস্তিনে বিদেশী দাবিদারদের সমস্ত বাহিনীর আক্রমনের ফলে। এর বদলে স্থানটি সম্পোনিকভাবে এবং এমনকি বিবরনের কিনারেও হয়ে উঠলো অকল্পনীয় রকমে বিভক্ত, ঘনবসতিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খলায় ভরা। ফিলিস্তিনের একখানা মানচিত্র টেকে ফেলুন পুরাকথা, ম্লানচিত্রের রেকর্ডে আর যারা সেখনে বাস করতেন সেই সমস্ত মানুষের যাতায়াতের পথজালে, তাহলে দেখতে পাবেন আপনার জন্য আর কোন স্থান থাকবে না, কোন ভূখণ্ডের স্থানও অবশিষ্ট থাকছে না। আর যতই বেশি সাম্প্রতিককালের জনমণ্ডলী তত্ই জোরালো তাদের দাবি। তার পরেও প্রতিটি দাবিই আপনাপন ঐতিহ্য আবিষ্কার করে বসে। তার একেবারে নিজস্ব সন্তানসন্ততা, আরও বেশি বেশি বিপদগামিতার সৃষ্টি করে বসে, মিলগুলিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে এবং স্থানচ্যুতি ঘটিয়ে। ইতিমধ্যেই অতি-জন-অধ্যুষিত মানচিত্র বর্তমানে, বিপজ্জনকভাবে ক্ষয়রত শক্তির দ্বারা উত্তোলিত হয়ে চলেছে। ভূখণ্ডের উপর দিয়ে তা উদ্যত ছোটাছুটি করে চলেছে।

আমরাও স্থানের চেতনা হারিয়ে ফেলেছি। ফিলিস্তিনকে আমরাও ভাবিনা "একটি বিস্তৃত রাষ্ট্র রূপে।" বরং ছোট একটি নিবিড় জনঅধ্যুষিত ভূখণ্ড হিসাবে ভাবি, যেখানে থেকে আমরা বহিস্কৃত হয়েছি। নিজেদের ফিলিস্তিনি পরিচয় উদ্ধারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকেই গ্রহণ করি সেই মানচিত্রে ফিরে আসার একটি উদ্যোগ রূপে। সেই সমস্ত al-Jakhil সাহায্য করে বিপজ্জনক অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখতে। এটি জাগতিক একটি প্রচেষ্টা—ঠিক যেমন আমাদের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের বেশির ভাগ লড়াইগুলিও। আর আমি জোরের সাথে বলব যে ধর্মীয় বিবেচনার মাত্রাগুলি এখানে গৌন ফলাফল মাত্র, সেগুলি কারণ নয়। কিন্তু ভূখণ্ডের মতনই মানচিত্রখানাও, অথবা আমাদের ঘরের দেয়ালের মতনই ইতিমধ্যেই এতখানিই পরিপূর্ণ ও ভিড়ে ঠাসা যে আমাদের ইতিপূর্বেই ভিড়ে-ঠাসা বহু ব্যবহৃত স্থানের মধ্যেই কাজ করার জন্য অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হোত। উদ্ভাবক হওয়া তো দূরের কথা, আমরা হলাম দেরীতে-আসা, বিপদক্রমের শেষ-

ভাগের একদল মানুষ। আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অন্য সকলের ক্ষেত্রেই যেমনটি রয়েছে (এমনকি ফকল্যান্ডবাসীদেরও অন্তত আইনগতভাবে তা রয়েছে, অথচ আমরা এখনো অর্জন করতে চাইছি।) সকলেই যা করে থাকেন আমরাও তাই করছি। সেজন্যেই আমাদের কোন মহত্তা নেই। আমাদের প্রচেষ্টাগুলি যেন প্রলম্বনের মতই, যা-কিনা ইতিমধ্যেই অলঙ্কৃত হয়ে আছে।

অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রতিটি সোজা রাস্তাই, অভ্যন্তর আপনা থেকেই পরিণতির দিকারে হয় অবরুদ্ধ না-হলে আগে থেকেই অধিকৃত। আমরা সবচেয়ে বেশি যেটুকু প্রত্যাশা করতে পারি, তা হোল প্রান্ত খুঁজে পাবার। গতানুগতিকভাবে অবহেলিত উপরিতল, আর তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন, অনিয়মিত স্থানিক চিহ্নগুলিকে খুঁজে পেতে। যেখানে আমাদের নিজেদেরকে স্থাপন করতে হবে। আর সে কাজটি আমরা করে উঠতে পারি গভীর অধ্যবসায় ও পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে আমাদের আগেও বহু মানুষই একাজটি করে গেছেন। এবং তা এমন ভাবনায় যে আমাদের বিশিষ্টতা হয়তো শেষপর্যন্ত ভালোরকমই দৃশ্যগ্রাহ্য হয়ে উঠবে। আর তা হোল বহু প্রচেষ্টার গড়ে তোলা একটি ছোট খাঁজের মতন। নিশ্চয়ই একটি ক্ষুদ্র কার্টুনির মতই। ব্যাঙ্গচিত্র, অবরোপন, অদ্ভুত ভদ্রতা।

আমাদের অবস্থা যতই খারাপ হয়েছে নিষ্ক্রিয়ভাবে-নিরাশ্রিত আত্ম-প্রতিষ্ঠার কাজকর্মও ততবেশি অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। আরো বেশি বিদ্রূপাত্মক, আরো অন্ধকারময় হয়ে পড়েছে। লেবাননে ইসরাইলী আক্রমনের দিনগুলিতে, বিজেতারা সাময়িক পর্বের জন্য অধিকৃত অঞ্চলে একটি ফিলিস্তিনের ঘোষণা জানায় সমর্থ পুরুষ সম্ভাব্য জঙ্গী-সৃষ্টি-কারীদের রেডিওতে কথা বলানো হোত। আর তাকে বাধ্য করা হোত ফিলিস্তিনিদের সুবিধার জন্য পায়চারী করে যেতে। এ ছিল প্রচারমূলী অনুশীলন, যার মধ্যে পড়তো পশ্চিমতীর ও দক্ষিণ লেবানন (সেই এলাকাগুলি, যেখানকার বাসিন্দারা এই অনুশীলনের লক্ষ্য ছিল) ফিলিস্তিনিদের সাথে তুলনা টানলে কোন প্রত্যুত্তর বা প্রচারমূলক হাতিয়ার নিজেদের ছিল না। যে মাত্রায় তারা প্রত্যুত্তর জানাতেন, তা চালিয়ে যেতে হোত প্রচলিত সংলাপের সত্যিকার ইসরাইলী জিজ্ঞাসাবাদের কারণায়। আর যে সংলাপ এখানে থাকছে তা কথা আরবি থেকেই রূপান্তরিত; উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই কুটিল। ভাড়াটিয়রা কোন দুর্ভাগার, যদিও তিনি কোনভাবেই বেরসিক বন্দী নন।

ইসরাইলী ঘোষক—আপনার নাম?

বন্দী ফিলিস্তিনি গেরিলা—আমার নাম আহমেদ আবদেল্ হামিদ্ আবু সিত্।

ইঃ—আপনার সংগঠনের নাম কি?

ফিঃ—সংগঠনে আমার নাম মিঃ আবু লেইল—"রাত্রির জনক"।

ইঃ—মিঃ আবু লেইল আমরা বলুন কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে সঙ্গে আপনি যুক্ত।

ফিঃ—আমি সাধারণ মুক্তিফ্রন্টে (তাইরিয়া)। অর্থাৎ বলতে চাইছি সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী (ফিলিস্তিনি);

ইঃ—আচ্ছা, এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে কখন আপনি যুক্ত হলেন?

ফিঃ—যখন সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে প্রথম জানতে পারলাম।

ইঃ—আর দক্ষিণ লেবানন কি আপনার লক্ষ্য ছিল?

ফিঃ—আমার লক্ষ্য সন্ত্রাসবাদ···অন্যভাবে বললে, আমরা গ্রামে ঢুকতাম নিছকই আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য। আর যখনই শুধু মহিলা ও শিশুরা থাকতো আমরা আতঙ্ক ছড়াতাম। আমরা যা কিছুই করিনা কেন সবকিছুই ছিল সন্ত্রাসবাদ।

ইঃ—তাহলে আপনি যে সন্ত্রাস চালালেন তা কেন বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করে, নাকি নিছকই অর্থের জন্য ?

ফিঃ—না, ঈশ্বরের নামে শপথ কেবল অর্থের জন্যে। এটি কি করে কোন একটা কারণ হতে পারে! কেনই বা হবে ? এখন কি কোন কারণ বহাল আছে ? আমরা তো বহু আগেই তা বেচে ফেলেছি।

ইঃ—সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি কোথা থেকে অর্থের জোগান পায় তা আমায় বলুন ;

ফিঃ—তেমনই কারোর থেকে, অন্যভাবে বললে যাদের সন্ত্রাসবাদের পিছনে খরচ করার মতন অর্থ আছে। সন্ত্রাসবাদের জন্য আরব রাষ্ট্রগুলি থেকে যারা সন্ত্রাসবাদকে মদত দিয়ে চলে।

ইঃ—সন্ত্রাসবাদী আরাফত সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় ?

ফিঃ—আমি হলফ করে বলতে পারি সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী। তিনিই আমাদের ভবিষ্যৎ বেচে দিয়েছেন। আর কারণটিও হারিয়ে গেছে। তার গোটা জীবনই তো সন্ত্রাসবাদ ;

ইঃ—ইসরাইলী প্রতিরক্ষা বাহিনী যেভাবে আচরণ করেছে সে ব্যাপারে আপনার কী মনোভাব ?

ফিঃ—সম্মান জানিয়ে বলছি যে প্রতিটি সন্ত্রাসবাদীর প্রতি ভালো ব্যবহারের জন্য ইসরাইলী প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ধন্যবাদ।

ইঃ—অন্যান সন্ত্রাসবাদী, এখনো যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন, ইসরাইলী প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আক্রমণ করেছেন, তাদের প্রতি কি আপনার কোন উপদেশ আছে ?

ফিঃ—তাদের প্রতি আমার উপদেশ অস্ত্র সমর্পনের। ইসরাইলী প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছে। আর তাদের কাছে যা পাবেন সেটিই হচ্ছে সব থেকে ভালো ব্যবহার।

ইঃ—সবশেষে, সন্ত্রাসবাদী মহাশয়, আপনি কি আপনার পরিবারের উদ্দেশে কোন বার্তা পাঠাতে চান ?

ফিঃ—আমার পরিবার ও বন্ধুদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমি বেশ ভালো আছি। আরও আমি শত্রুদের বেতার সংবাদ প্রেরণ ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ জানাই, আমাকে এভাবে কথা বলবার সুযোগ করে দেবার জন্য।

ইঃ—আপনি কি বোঝাতে চাইছেন KOL ISRAEL অর্থাৎ ইসরাইলের কণ্ঠ ?

ফিঃ—ঠিক তাই। আপনাকে ধন্যবাদ স্যার, স্বাভাবিকভাবেই স্যার।

আপনি যদি একজন সন্ত্রাসবাদী খুঁজে পেতে চান তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে সমস্ত ফিলিস্তিনি যারাই লেবাননে ইসরাইলের বিরুদ্ধতা করেন সকলেই তারা সন্ত্রাসবাদী। তাহলে তো যে কোন ফিলিস্তিনিকেই আপনি পাবেন একজন সন্ত্রাসবাদী হিসাবে। একটি প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে একজন সন্ত্রাসবাদী। প্রশ্নকর্তাদের ভাবনার মতাদর্শগত দস্তানা এমনই শক্তিশালী যে ফিলিস্তিনিদের যে কোন রকম সতর্কতাকেই সন্ত্রাসবাদের উপহাসে দূরে ঠেলে দেবেন। যা তিনি বলেন তার প্রতিটি লাইন, পুনরাবৃত্তি করেন, বাগ্মিতার আতিশয্য মিশিয়ে, তার প্রশ্নকর্তা সে সমস্ত কিছুকেই মাত্রাতিরিক্ত চেহারা দিয়ে বসেন। এই কালো প্রহসনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার বার্তা, যা কিনা সরাসরি বলা যায় না। যদি তিনি অপেক্ষা করে থাকেন অন্যদের কাছে বোধগম্য হবার অভিপ্রায়ে। এই কাহিনীটি এবং এটির মতনই বহু কাহিনী ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ঘুরে ফিরে চলেছে, মহাকাব্যের আদলে। এমনকি একদিনের সান্ধ্য বিনোদনের ক্যাসেটেও মিলে যেতে পারে।

(চলবে)

মূল ভাষা : ফরাসি

আফ্রিকা

ডেভিড ডিওপ

অনুবাদ : এষা দে

আফ্রিকা, আমার আফ্রিকা
পূর্বজদের ধূ ধূ প্রান্তরে দৃপ্ত যোদ্ধাদের আফ্রিকা
আফ্রিকা যাকে নিয়ে গান গাইত আমার ঠাকুমা
বহুদূরে নদীর তীরে
তোমাকে আমি কখনো জানি নি,
তবু তোমার রক্ত আমার ধমনীতে
তোমার সুন্দর কালো রক্ত যা সিক্ত রাখে ক্ষেতজমি
তোমার ঘামের রক্ত
তোমার মেহনতের ঘাম
তোমার গোলামির মেহনত
তোমার পুরুষানুদের গোলামি
আফ্রিকা আমার আফ্রিকা

তুমি কি এই বেঁকে যাওয়া পিঠ
অপমানের ভারে নুয়ে পড়া পিঠ
লাল ক্ষতচিহ্নে থর থর কাঁপা পিঠ
দুপুরে রোদের নিচে চাবুকের ঘায়ে হাঁ্যা বলা পিঠ
কিন্তু এক গম্ভীর কণ্ঠ আমাকে জবাব দেয়
ওরে অবাধ্য ছেলে, ওই যে তরুণ বলিষ্ঠ গাছটি
ওই যে গাছটি ওখানে
অপরূপ একাকিত্বে, সাদা বিকর্ণ ফুলের ঘরে
ওই আফ্রিকা, তোর আফ্রিকা
সর্বংসহা নতজানু আবার পুষ্পিত হয়
এবং তার ফল ধীরে ধীরে অর্জন করে
স্বাধীনতার তিক্ত স্বাদ।

আফ্রিকার পশ্চিম উপনিবেশের কয়েল কৃষ্ণাঙ্গদের ইয়োরোপীয় ভাষায় সৃজন। ফরাসি অধিকৃত এলাকায় প্রথম শোনা যায় আধুনিক কণ্ঠ। সেনেগালের লিখনে জন্ম নেয় কৃষ্ণ অভিজ্ঞতা যা নিয়োজিত একটি বাসনাবাসনা। এছাসেনটির পরবর্তী সাহিত্যে যার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডেভিড ডিওপ (১৯২৭—১৯৬০) সেনেগাল-ক্যামেরুন মিশ্রিত রক্তের একজন বিদ্বান কবি। তার বিখ্যাত কবিতা আফ্রিকা একাধারে ব্যক্তিগত সৃষ্টির প্রতিনিধিত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত এবং আফ্রিকার ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার এক মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি।

দুঃখময় ছায়া

অনুবাদ : নরবিন পাল

হুলিয়ো হেরেরা ই রেইসিগ ১৮৭৫—১৯১০ উরুগুয়ের মেদেলিন্জা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি স্থানীয় কবি। শরীরী সম্বেদনে তাঁর অনেক কবিতা শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে বুদ্ধি গুরোত্তি। ফরাসী প্রতীকবাদী কবিদের মতোই তিনি বিশেষ মনোযোগী নৈশ মানসিকতায়, স্বপ্নে, অযৌক্তিকতার সংসর্গ আবিষ্কারে, অবচেতনের ইমেজিস্ট সুলভ আবভাব প্রকাশে। উরুগুয়ের গ্রামজীবন ভিত্তিক চিত্রকল্প প্রচুর তাঁর কবিতায়। তাঁর কয়েকটি কবিতার বই—Las pascuas del tiemp (১৯০০, তাঁর প্রথম বই), Los maitines de la noche (১৯০২), Los e'xtasis de la montana (১৯০৪,১৯১০, হয়তো তাঁর সেরা কবিতার সংকলন এবং La torre de las Esfinges (১৯০৯) তাঁর কবিতা সমগ্র বেরিয়েছিলো বুয়েনোস ইরিস, লোসাদা থেকে ১৯৪২-এ

১ ।। দুঃখময় ছায়া ।।

ভেড়ার পাল ব্যা ব্যা করে ; রাজাগুলোর
ভিড়ভাট দুঃখময় জনসাধারণে
প্রাচীন এক হোমাহুতির যাতনা
শ্বাসরোধী হওয়া ছড়ায় নীরব গা ঘরে।

রহস্যময় সুরুচি ভরা ওড়নার আড়ালে
ডাক দিয়েছো তুমি হতবুদ্ধি প্রতীক গুলোকে,
হে সন্ন্যাসিনী, হাত অথচ দাবিদার, ওই দূরে
তোমার আর্দ্র অথচ মরনোন্মুখ চাউনিতে।

এমনকি তোমার দুষ্ট ভাই সেও যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, কিন্তু
ইতিমধ্যে তোমার হাতে—এক চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসে
জড়িয়ে ধরে আমার হাত ; বাধ্যতা হয়ে ওঠে নীরব পরশে,

আর ওই দূরের বৃষ্টি, দুঃখের বিলাপ
চলে যায় অনুপস্থিতির দিকে, দাগ ফ্যালে
অসীম সায়াহ্নের স্বচ্ছ স্বপ্নালুতায়।

২ ।। জুলাই ।।

ভূদৃশ্যের কির্মতার ওপর
থাকে প্রশান্তি আর সাঁতসেঁতানি, ভাসে মাথার যন্ত্রণা ;
আর ওইখানে ছায়ার ছায়ায় ব্যাঙেরা উদযাপন করে,
অদ্ভুত এক নকল স্বর নিয়ে।

পর্বতের মন—তার ধ্বসের ভারব দৌর্বল্য—
সঙ্গে যার আজব এক টেলিপ্যাথি
জাগিয়ে তোলে তার ঘনিষ্ঠ অথচ মনমরা ভঙ্গিমা
যেন ভীমরতি ভরা শিক্ষালয় ব্রিটেনের।

এইসব অধ্যাস যোগফলের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য
বাঁশুরে নৈশ ভোজের দলবলকে দিতে হবে মিশিয়ে
যেন জর্ডনের কর্তিত পলম, তুষারের মতো শুভ্র,

আর দূরে আছে চিত্রা নিমগ্ন কাক
স্বপ্ন দেখছে, হতে পারে, কোনো বিমূর্ত নিশ্চিলের
যেন এক রুক্ষ ও আতঙ্ক বিথারী চাঁদ

।। পর্বতের ওপর বাড়িটি ।।
উচ্চনদী হলুদে হাসি ছড়ায় মঙ্গলের, হাসে আকাশ, মুগ্ধ আর সুন্দর
আসমানী রং হাসে, হাসে, উষা, স্টুবেরীর দীপ্যমান বর্ণ ভরা হাসি।
শসা হাসে তুষকাড়া উঠানে সোনালী আর নীলকান্তমনি রঙে রঙে
তারুণ্যদীপ্ত ঘোটকী নিঃসরণ করে প্রফুল্ল বর্ণালী।

গিরিসঙ্কটে রক্তলাল বিকাশী হাসি আমাদের দৃষ্টি সীমানায়,
সূর্যালোকে জয়ধ্বনি, গান পাখিদের, হাসে এমনকি সবুজে-বাড়ন্ত কবরখানা ও ;

গরীব মানুষের আস্তানা ওঠে হেসে ঝকঝকে ও পরিষ্কার টেবিল ;
কাছে দূরে জমি ওঠে জ্বলে, পর্বতচূড়ায়, হাসি শুধু চিরন্তন।

কিন্তু আর কিছুই হাসে না এমন পুলকে, এতো স্বকীয় সম্ভোষে,
ওই কুঁড়ে ঘরটির মতো যে জামা চড়িয়েছে মিষ্টি গোলাপের লাল আর উজ্জ্বল,
টালি টুপি পরা, আর সপ্রতিভ, দুদাটির পাশে, দুলে দুলে ছাওয়া।

কে থাকে ওখানে ? জানি না আমরা। রহস্য আর লাজুকতার মোড়া,
ধরিত্রীর থেকে দূরে থাকে বসে ওই পাহাড় চূড়ায়,
আর হাসে এমন ভঙ্গিতে, তুমি ভাববে, এ এক কুমারী, আর কেউ নয়।

প্রত্যেক সকাল

মোহন সিং
অনুবাদ : শান্তনীপ বক্সী

প্রথম প্রভাত
প্রতিটি সকাল
মন্দিরের ঘণ্টা
মসজিদের আজান
(গ্রন্থসাহিব) গ্রন্থির পদ্যপাঠ
চড়ুইয়ের কিচিরমিচির
বাছুরের হাম্বারব
সূর্যের আলোকরশ্মি
আগুনোন শহর
এসব কিছুই আমাকে জাগাতে পারে না
জাগ্রত হওয়া, চেতনার ফেরার মত
কিছু নেই এসের ভেতর

আমাকে জাগিয়ে তোলে
বাচ্চার স্কুলের বেতন
মহাজনের বকেয়া
গোয়ালার দুধের দাম
ইলেকট্রিকবিল
মায়ের ওষুধ
বউয়ের শাড়ি
বোনের বিয়ের পণ
এবং রাত
প্রত্যেক রাত
আমি না ঘুমোতে পারি যদি দীর্ঘকাল
আমার অতিজাগ্রত দেশে

টি. ভি. ফিল্ম
কুকুরের ঘেউ ঘেউ
চৌকিদারের 'জাগতে রহো'
অথবা বউয়ের শরীর-সান্নিধ্য
কোনো নির্জনতা নেই
স্থান আছে এসবের :
গল্পনার
বেতন কমানোর
ডিয়ারনেস আলোওয়েন্স বাড়ানোর
যৌবন ধ্বংসের
বিপন্নতা বাড়ানোর
আগামী দিনে
বাচ্চার বেতন
মহাজনের সুদ
গোয়ালার দাম
বিদ্যুতের বিল
ঘরভাড়া
মায়ের ওষুধ
বউয়ের শাড়ি
কন্যাদান
শালিকার 'সগুন' (মাঙ্গলিক)
প্রথম ভোর
প্রতি সকাল
প্রত্যেক রাত

আমার বিচরণ

ঈদ কবিতা

আলি সর্দার জাফরী / অনুবাদ : তরুণ ভট্টাচার্জী

তখনই একটা দিন আসবে
চোখের শিখা হবে অবলুপ্ত
হাতের পদ্ম যাবে শুকিয়ে
জিহ্বার মায়া ভুলে
উড়ে যাবে শব্দ-প্রজাপতির দল
ফুটন্ত কুঁড়ির মত
কলমলে ফুলের মত
মুখগুলি লুকাবে যেথায়
রক্ত-সায়রের বুকে ছায়া ঘেরা শয্যায়।
ধমনির রক্ত থামবে
হৃদয়ের মৃদু কম্পন
আর সুরের মধু গুঞ্জন
তখনই হবে তার অবসান।
আলমোনি রঙা মখমলি মসৃণ দুনা
উর্ধ্বে যার হীরক-দ্যুতি টিকলি
এই পৃথিবী, এই স্বর্গ
তার দিন, তার রাত্রি
অনুতাপে করাবে যত অশ্রুকণা
জনগণ
অজানা অসুখে এক মুঠি-বন্ধ ধূলিকণা
সমস্ত যাবে হারিয়ে বিস্মৃতির অতলে
অপূর্ব স্মৃতি-সৌধের অন্তর থেকে
বস্তুপুঞ্জ হবে বিলীন
তখন কেউ জানতে চাইবে না
'সরদার' কোথায় এই মহাসমাগমে।
কিন্তু আবার আমি আসব এখানে
বলব কথা শিশুর কলকণ্ঠে
গাইব গান পাখীর কলতানে
বীজেরা হাসবে পৃথিবীর অন্তরে
চারা গাছের ছোট্ট অঙ্কুর
যখন স্পর্শ করবে ভূমিতল
তখন আর কি দেখব চেয়ে
কত আছে কুঁড়ি কত আছে পাতা
করতলে রাখব আমি
স্বচ্ছ তুষারকণা
রূপান্তরে সেই তো হবে
হেনা-রঞ্জিত আভা
গজলের মধুর মূর্ছনা
আমি হব নব্যভাষার রূপকার
নববধূর লজ্জা-রাঙা কপোলের মত
উঁকি দেব উড়িয়ে যত ওড়না
হিমেল হাওয়ার ডানায় ভর করে
শরতের ফসল কাটার সময়
ধরণীর বুকে স্বর্ণালী স্রোত ধারা
আকাশের বুকে নীল সরোবর
আমার 'আমি'-তে হবে পূর্ণ
সমস্ত জগৎ দেখবে চেয়ে
প্রতিটি গল্প আমার গল্প
প্রতিটি প্রেমিক 'সরদার' এখানে
সকল প্রেমিকা সুলতানা
পথিকের পদচিহ্নে শুকনো পাতা থেকে
উঠে আসবে আমার হাসির কলরোল
ঐকাহিক সময়ের জাদু-গৃহে
আমি এক বিলীয়মান মুহূর্ত
আমি এক অশ্রুর ক্ষুদ্র বিন্দু
বিচরণ করি অতীত-জঠর থেকে
ভবিষ্যতের কোলে—
কখনও ঘুমিয়ে পড়ি
কখনও জেগে উঠি
পুনরায় কখনবা ঘুমের কোলে ঢলে পড়ি
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধাপী
এই আমার ক্রীড়া-প্রাঙ্গন
মৃত্যুতে যার অর্জিত হয় অবিনশ্বর খ্যাতি অর্জন।

রবার্ট ফ্রস্ট

তুষার সাঁঝে বনের পাশে থামা

অনুবাদ : সলিলকান্তি দাশগুপ্ত

এ বনানী যার, মনে হয় চিনি তাকে,
গ্রামের ভিতর বাড়িতে যদি বা থাকে।
থেমেছি এখানে, দেখছে না সে তো জানি ;
দেখি তার বন তুষার কুয়াশা মাখে।

ঘোটক আমার ভাববে, অবাক প্রাণী,
কেন থামা ? পাশে নেই তো খামার খানি !
বনরাজি আর হিমানী হ্রদের মাঝে
বছরের ঘনতম দিনার, মানি।

সে ঝাঁকায় তার সাজোয়া, ঘণ্টি বাজে।
জিজ্ঞাসা যেন, অবেলায় ভুল সাজে ?
তুষার পতন মৃদু ধ্বনি তোলে বন,
তা ছাড়া অন্য শব্দই শুনি না যে।

স্নিগ্ধ, গভীর এবং গাঢ় এ বন।
কিন্তু আমার রুকেয়া যে বহু পণ,
আর পাড়ি দেওয়া বিনিদ্র বহু যোজন,
ঘুমোবার আগে পেরুনো বহু যোজন।

বিশ্বাস

বীরভদ্র কাকীদেলী
অনুবাদ : অনসূয়া মল্লিক

আমার ঘর। খুব বড়ো ছাদ।
ছাদের ওপর আরামচেয়ার।
আকাশ। বাড়ন্ত অন্ধকার
মুখোমুখি তার, জোনাকি
গলির ছোকরার দিকে পলক ফেলে,
কটাক্ষ করে, খিলিক তোলে তারা।

বারান্দা, খিলান, উঠোন।
সামনের দিকে অনেক ঘর
এখন, আকাশের দিকে বেড়ে যাচ্ছে।
লোহার শিকে বেঁধা।
কত কিছু বদলে গেছে।
কীভাবে সব বদলে গেছে!

আকাশ, ছিন্ন মেঘ।
পৃথিবীতে ছায়া নামে।
প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মানুষ।

বাসনা। তৃপ্তির পরেও।
প্রথমবার তৃপ্ত হওয়ার পরে বলল :
ভগবানেরও হয়ে থাকে পাপ—
নারীজাতি।

চিরন্তন চলে যায়।
পৃথিবীর পরে নামে আঘাত।
আমার শরীরে ঘা।

আমাকে বাজী রাখা হয়েছে।
রক্ত দিয়ে আমার বিগ্রহ পুজো করা হয়।
যুদ্ধ ছিঁড়ে টুকরো করে আমার নাম
অপহরণকারীর কাছ থেকে আমাকে ছাড়ানো হয়েছে।

গজল

শিবরাম দীপ

অনুবাদ : শান্তদীপ বক্সী

হিমেল হাওয়া বাইরে আর হিম করেছে এই গভীর ধমনি-আগুন
লাল হয়ে আসে রুক্ষ মন, আঙুলে তাকে ধরে,
পর্বতমালা রুখে দাঁড়িয়েছে তাহার পথ, মেলে ধরে বুক
তবু হাওয়া বয়, উড়িয়ে গায়ের শাল

বান্ধবী খুঁজে চায় শুধু এক হলুদ রাখী
যে কাননে সে গোল করে নেয় ফুলের দলকে

হাওয়া গুনে গুনে বয় সেই স্থির কনাতায়
নিজের রুক্ষ কেশের কেন্দরে সে আজ সিহৌ-হৃদয়

কিছু বাবাবর প্রেমিক দেখে তাকে উল্কে দিতে
সেই নারী ধায় দেশ থেকে দেশ অন্বেষনে, উড়িয়ে ধুলো

ও ফুল, কী করে লুকোবে সুরভি, তাহার থেকে
হাওয়াতো হায় মর্মসঙ্গী বসন্ত কারাভানের

আবার ঘুমোয় লোকেরা, দিয়ে তালা চাবি চিন্তায়
হাওয়া কড়া নাড়ে তাদের, তাহাদের দরজায়

স্প্যানিশ গল্প

ভূতুড়ে জাহাজের শেষ যাত্রা

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস
অনুবাদ : অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি। জন্ম ১৯২৮ সালে কলম্বিয়ার আরাকাতাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু। El Heraldo (অগ্রদূত) কাগজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। এই কাগজেই তাঁর বিখ্যাত গল্প 'মাকোন্দোয় বৃষ্টি দেখে ইসাবেলের শকুনোক্তি' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম ছোট উপন্যাস 'La Hojazasca' (ঝরাপাতা)। এর পর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক গল্প ও উপন্যাস, যেমন—'La mala hova' (খারাপ সময়), 'El coronel no time Quien le escriba' (কর্ণেলকে কেউ চিঠি লেখে না), 'Un dia de estos' (এমনি এক দিন), 'En este pueblo no hay ladrones' (এ গাঁয়ে চোর নেই), 'Un dia despnes de sabado' (শনিবারের পর একদিন), 'Los funerales de Mana Grande' (মাতামহীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া)। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'Cien anos de soledad' (একাকীত্বের একশ বছর)। ১৯৮২ সালে মার্কেস নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বর্তমানে তিনি মেক্সিকোর বাসিন্দা। যদিও তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ, তবুও তাঁর লেখনী আজও নতুন কথা বলে।

এবার ওরা দেখতে পাবে আমি কে, যেন নতুন মানুষের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই নিজেকে বলল, বহু বছর বাদে সে প্রথম দেখতে পেয়েছিল সেই বড় জাহাজটাকে, আলোহীন, শব্দহীন, জনহীন এক প্রাসাদের মতো রাতের অন্ধকারে বয়ে যাচ্ছিল গ্রামের পাশ দিয়ে, গোটা গ্রামটার চেয়েও বুঝি বড়, চর্চের ওই উঁচু চূড়ার চেয়েও যেন লম্বা, গহন অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছিল উপসাগরের জল পেরে, ওই শহরটার দিকে, যে শহর একদিন বুকানিয়রদের মুখে দিয়েছিল, তার ক্রীতদাস-কন্যার, তার ঘূর্ণায়মান আলো, যে আলোর আবছায়া রেশ পালটে দেয় গ্রামের রূপ, ঠিক পনের সেকেন্ড অন্তর আলোমাখা বাড়িগুলো আর আলোময় পথগুলি হয়ে ওঠে কোনও এক চন্দ্রাহত কল্পলোক, এমনকি যখন সে ছোট্ট বালকটি ছিল, যখন তার কণ্ঠস্বরে পুরুষের আদল আসেনি, তখন সে থাকে বলে গভীর রাত পর্যন্ত বসে থাকত সাগরবেলায়, রাতের বাতাস যে বাঁশী বাজায় তা শুনবে বলে, এখনও সে স্পষ্ট মনে করতে পারে, যেন বা চোখের সামনে দেখছে, ওই ঘূর্ণায়মান আলোর রেখায় গ্রামটা একবার ভাসছে, একবার ডুবছে, আলো পড়তেই সে অদৃশ্য, আবার আলোকরেখা সরে যেতেই সে দৃশ্যমান, এক খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া, দেখা না-দেখা, ঘুমের মধ্যে টলোমলো পায়ে হাঁটা, উপকূলের প্রণালী চিনিয়ে দিচ্ছে যে বয়াগুলো তার দিকে, যতক্ষণ না কম্পাসের কাঁটা ভুল করবে এবং জাহাজটা প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যাবে আর একটাও শব্দ না করে তলিয়ে যাবে অতল গহ্বরে, যদিও এই প্রবল ঘর্ষণে বীভৎস ধাতব স্বর উত্থিত হওয়া উচিত, ইঞ্জিন ধ্বনির যে শব্দ প্রাগৈতিহাসিক জঙ্গলে ঘুমিয়ে থাকা প্লাগনকেও নিস্পন্দ করে দিতে পারে, যে জঙ্গল শুরু হয়েছে গ্রামের পথ ফুরিয়ে যাওয়ার পর আর যার শেষ পৃথিবীর অন্য প্রান্তে, আর তাই সে ভাবছে, এ শুধুই স্বপ্ন, বিশেষত পরের দিন যখন সে দেখেছিল উপসাগরের তীরে উজ্জ্বল বাটির মতো উপকূল, তীরভূমি থেকে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের উপর

নিগ্রোদের জন্যে জংলী বস্তি, গিয়ানা থেকে আসা পাল তোলা ছোট ছোট স্মাগলারের জাহাজ, যার মধ্যে আছে কিছু অসহায় পাররা, যাদের তুলতুলে পেটের মধ্যে হাঁরে সাজানো, সে ভেবেছিল, আমি বোধহয় তারা গুনতে গুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর নিশ্চয়ই বড় জাহাজটাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, এতটাই নিশ্চিত ছিল যে সে কাউকে কিছু বলেনি, আর ভাবেওনি সেসব কথা, অন্তত পরের বছর মার্চ মাসের সেই রাত্রি পর্যন্ত, যে রাতে আবার সে সাগরবেলায় বসে ডলফিনের নাচ দেখছিল আর ঠিক তখনই আবিষ্কার করল সেই অপার্থিব জাহাজ, আবছায়া, নিশ্চিন্ত এবং প্রথমবারের মতো সেই একই ভুলপথে এগিয়ে চলেছে, শুধু একটাই ব্যতিক্রম এবারে নিশ্চিত সে জেগে আছে এবং ছুটে গিয়ে মাকে সব বলেছিল, তার মা আতঙ্কিত হতাশায় তিন সপ্তাহ শোকাচ্ছন্ন ছিলেন, বলেছিলেন, উল্টোপাল্টা কাজ করে করেই তোমার মাথাটা বিগড়ে গেছে, চোর-ডাকাতদের মতো সারাদিন ঘুমনো আর সারারাত জেগে থেকে এই দশা হয়েছে তোমার, তারপর যখন তাঁকে চেয়ার কেনার জন্য শহরে যেতে হয়েছিল, যে চেয়ারে বসে তিনি মৃত স্বামীর কথা ভাবতে পারবেন, বৈধব্যের এগার বছর পর তাঁর চেয়ারটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর তাই চেয়ার কিনতে যাওয়ার সুযোগে তিনি মাকিকে নিয়ে উপকূলের কাছে গিয়েছিলেন যাতে তার ছেলে দেখতে পায় আসলে সে কি দেখেছিল সমুদ্রের স্বচ্ছ আয়নায়, বসন্তের দিনগুলোর মাঝারে মাছের প্রণোচ্ছল লীলা, জলের মধ্যে গোলাপী ম্যাপার ও নীল কার্ডিনালের আরও গভীর জলতলে ঝাঁপ দেওয়া, ঔপনিবেশিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষে ডুবে যাওয়া মানুষের ভাসমান চুলেরা, সেই শুধু সেই জাহাজডুবির কোনও চিহ্ন, তবুও সে এতটাই নির্বোধ যে এর পরেও তার মাকে কথা দিতে হল সে পরের মার্চে তিনি সেই জাহাজদৃশ্য দেখবেন, অবশ্য তিনি জানতেন না ভুকী নিলাম ঘর থেকে কেনা স্যার ফ্রান্সিস ডেকের আমলের সেই চেয়ারটাই হবে তাঁর অবধারিত নিয়তি, যে চেয়ারে মার্চের সেই রাতে তিনি বসেছিলেন আর ভাবছিলেন, ও আমার ওলোফেরনেস, যদি তুমি দেখতে পেতে ভেলভেট মোড়া চেয়ারে কেমন রাণীর মতো বসে আমি তোমার কথা ভাবছি, কিন্তু যতই তিনি মৃত স্বামীর কথা ভেবেছেন ততই তাঁর হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে, রক্ত জমাট বেঁধেছে, যেন তিনি বসে নেই, প্রাণপণে ছুটছেন, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর জ্বরের আচ্ছন্নতায় তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস যখন ধুলোময়, তখন সে ভোরবেলা বাড়ি ফিরল, সে দেখল আরামকেদারায় শায়িতা তাঁর মা মৃত, তখনও উষ্ণ, কিন্তু অর্ধেক শরীরে যেন সর্পদংশনের গরল, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল পরবর্তী আরও চারজন মহিলার জীবনে, তারপর যাতক চেয়ারটা দূরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল, সেই দূরে যেখান থেকে আর কোনও অভিশাপ কারও জন্যে বয়ে আসবে না, হতে পারে শতাব্দী ব্যাপী ব্যবহারের ক্ষয় শুষে নিয়েছে ওর বিশ্রাম বিতরণের শেষ শক্তিটুকু, আর তাই সে অনাথ বালকের দিনযাপনে বেড়ে উঠতে লাগল, আশেপাশের মানুষদের দয়াদাক্ষিণ্য ছাড়াও তার দিন কাটত প্রধানত নৌকা থেকে মাছ চুরি করে, তারপর তার গলার স্বর পরিবর্তিত হল, সেই জাহাজদৃশ্য মন থেকে উধাও হল, যতক্ষণ না আরেক মার্চ মাসের রাতে যখন সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসেছিল এবং হে ভগবান! এই তো, সেই বিরাট অ্যানকেটসের তিমি, সেই ভয়ানক জন্তু, সবাই দেখবে এসো, সে পাগলের মতো চীৎকার করে উঠল, মহিলাসুলভ আতঙ্কে হিস্ত্র কুকুরের মতো চীৎকার, যাতে সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটারও তার বাপ ঠাকুরদাদের ভয়ের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল, গুঁড়ি মেরে ঢুকে গেল বিছানার নীচে, এই ভেবে যে উইলিয়ম ডাম্পিয়ার আবার ফিরে এসেছে, কিন্তু যারা সেই চীৎকার শুনে রাস্তায় ছুটে গিয়েছিল তারা কেউই সেই অদ্ভুত কলকব্জার বাস্তবিক ধ্বংস কাহিনী দেখার চেষ্টা করল না, বরং তাকে ঘুঁষি মারতে মারতে এমন আধমরা করে ফেলল যে সেই মুহূর্তে রাগে গজ্জাতে গজ্জাতে সে নিজেকে বলল, এবার ওরা দেখতে পাবে আমি কে, কিন্তু কাউকে কিছু বলল না, একটা বছর ধরে শুধু এক লক্ষ্যে স্থির হয়ে রইল, এবার ওরা দেখতে পাবে আমি কে, শুধু সেই লক্ষ্যে ভুতুড়ে জাহাজের আবির্ভাব ঘটার আগের মুহূর্তে সে একের পর এক নিখুঁতে কাজ করে গেল, প্রথমেই একটা নৌকা চুরি করল, উপসাগর পার হল, এবং ক্রীতদাস

বন্দরে ঢোকার পথে পুরো সন্ধেটা কাটিয়ে দিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায়, চারপাশে ক্যারিবিয়ানদের কলোচ্ছাস, সে ময় তার অভিজ্ঞানের কল্পনায়, এতটাই বুঁদ হয়ে ছিল যে ভারতীয় দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হাতির দাঁতের জিনিষ দেখতে ভুলে গেল, এমনকি পঙ্গু ডাচ নিগ্রোদের সঙ্গে মজা করতে কিংবা সরাইখানার ব্রাজিলীয় মেয়েদের মাংসের রোস্ট বিক্রি করতে দেখেও তামাটে মানুষরা তাদের দেখে ভয় পেতেও ভুলে গেল, যতক্ষণ না তারার দলের সঙ্গে রাত কাটিয়ে এল ততক্ষণ কিছুই তার মনে ছিল না, জঙ্গলের মিষ্টি সুবাস, পচা স্যালামান্ডারের গন্ধ ধরে এল আর সে সেই চুরি করা দাঁড় বেয়ে চলে এল উপসাগরের মুখে, আলো নেভানো যাতে কাস্টমের পুলিশরা টের না পায়, প্রতি পলের সেকেন্ড অন্তর ঘুরে যাচ্ছে আলোকরেখার সবুজ পাখনা আর অন্ধকারের মধ্যে আরও একবার সবকিছু জীবন্ত হয়ে উঠছে, বুঝতে পারছিল সে পৌঁছে গেছে সেই উপকূলের কাছাকাছি, চাপা ঔজ্জ্বল্য গম্ভীর হয়েছে বলে নয়, আসলে সমুদ্রের জল হয়েছিল আরও বিষন্ন এবং সে এইভাবে দাঁড় টেনে চলেছে। নিজেকে ঠেকে রেখে, কেন না কোথা থেকে সেই ভয়াল হাঙরের নিঃশ্বাস হঠাৎ তার কাছে এল তা সে বুঝতে পারেনি আর কেনই বা রাত এত গভীর হ'ল, কেন সহসা তারার দল নিঃশেষ হয়ে গেছে, আসলে সেই অসম্ভব জাহাজটা সেখানে ছিল, হে ভগবান! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জিনিষের চেয়েও সে বড়, জলস্থলের সব অন্ধকারের চেয়েও বেশি ঘনান্ধকার, তিনশো হাজার টন হাঙরের নিঃশ্বাস যেন তার নৌকার কোণ ছুঁয়ে গেল, সে দেখতে পেল ধাতব কিনারের সর্বোচ্চ চূড়া, সেখানে জানালার অন্য অন্ধকারে প্রজ্বলিত কোনও শিখা নেই, না কোনও ইঞ্জিনের শ্বাস, না কোনও প্রাণ, ঘরে চলেছে নিজস্ব নীরবতার এক বৃত্ত, নিজস্ব মৃত বাতাস, জন্তু সময়, বিপথগামী সমুদ্র যার জলে মৃত জন্তুদের একটি বিশ্ব ভাসমান এবং আলোর হঠাৎ ঝলকে সমস্তই উধাও এবং মুহূর্তের জন্য সেই স্বচ্ছ ক্যারিবিয়ান উপসাগর আরেকবার দেখা দিল, সেই মার্চের রাতে, পেলিকানদের নিত্যদিনের ক্রীড়ামত্ততা আর বরাগুলোর মাঝখানে সে একা বসে রইল, জানে না কি করার আছে, নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, যেহেতু সে জেগে আছে তাই সে স্বপ্ন দেখছে না নিশ্চয়ই, কিন্তু যতক্ষণ না সে নিজেকে প্রশ্ন করল ততক্ষণ উপকূলের বরাগুলো থেকে বেরিয়ে আসছিল রহস্যঘন নিঃশ্বাস, আর সেই আলোকরশ্মি সরে গেল, আবার সেই জাহাজ ভেসে উঠল দৃশ্যে এবং তখন তার কম্পাস নষ্ট হয়ে গেছে, বোঝবারি সমুদ্রের ঠিক কোথায় রয়েছে তাও তার জানা নেই, সেই অদৃশ্য প্রণালীর দিকে এগিয়ে চলেছে, আসলে তা ধাক্কা খাবে উপকূলে, তাই সে নৌকায় আলো জ্বালিয়ে দিল, ছোট্ট লাল আলো, পাইলটকে সূর্যের মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আর তাই, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, জাহাজ তার ভুল শুধরে নিল, চ্যানেলের মূলে পোতাশ্রয়ে মুখ ঘুরিয়ে লাভ করল পুনর্জীবন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল সব আলো, বরফার চালু হয়ে গেল, তারার দল ফিরে এল স্বস্থানে, মৃত জন্তুর দল তলিয়ে গেল সমুদ্রতলে, রান্নাঘর থেকে ভেসে এল বাসনপত্রের আওয়াজ, লবঙ্গ সসের গন্ধ, ডেকের উপর থেকে শোনা গেল অর্কেস্ট্রার মৃদুমন্দ ধ্বনি, নাবিকদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রক্তস্রোত, কিন্তু এমন এক ক্লেদ তাকে পেয়ে বসেছিল যে সে ভয়ও পেল না, উদ্ভ্রান্তও হল না, শুধু আরও দৃঢ়ভাবে উচ্চারিত হল সেই স্বগতোক্তি, ভীতুর দল, এবার ওরা দেখবে আমি কে এবং সেই অতিকায় জাহাজের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ এড়িয়ে তার সামনে সামনে চলল, কারণ এবার ওরা সত্যি সত্যিই দেখতে পাবে আমি কে, আলো দেখিয়ে সঠিক নির্দেশে চালিত করল জাহাজ, সেই নিশ্চিত জাহাজ তার নির্দেশ মেনে চলছে, সেই অদৃশ্য চ্যানেল পার হয়ে গেছে এবং পোষা ভেড়ার মতো সে তাকে নিয়ে চলেছে ঘুমন্ত গ্রামের দিকে। এক প্রাণবন্ত জাহাজ, প্রতি পলের সেকেন্ড অন্তর আলোকরেখার ধারায় আর যা অদৃশ্য হবে না, বরং হয়ে উঠবে রক্তাভাস, চার্চের ক্রস, বাড়িগুলোর সৈনা, অসীমের অনুভূতির শেষ, তাকে অনুসরণ করছে সমুদ্র-জাহাজ, তার ইচ্ছাশক্তি রয়েছে ওর অন্দরে, কাপ্তেন ঘুমিয়ে রয়েছে তারই হৃদয়প্রান্তে, রান্নাঘরের বরফে শুয়ে রয়েছে লড়াইয়ের ষাঁড়গুলো, হাসপাতালে একজন রোগী, বলে আরও অনাথ জল,

চেড়াগুলোকেই ভুল করে ভেবে ফুল করত সঙ্গে সঙ্গে পাইপটি এবং সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে হুইসেল বেজে উঠল একবার এবং সে বাঁশি ভিজে গেল. চুরি করা নৌকা প্রায় ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে. কেননা সেটা ছিল উপকূলের অগভীর অংশ, রাজার পাথর, অবিশ্বাসীদের দরজা, গোটা গ্রাম প্রজ্জ্বলিত হল জাহাজের আলোয় এবং পরিত্রাণের জন্য যখন আর সামান্যই সময় রয়েছে, তখনই সে চীৎকার করে উঠল, ভাঁড়ের দল, এই দেখ সেই জাহাজ, আর ঠিক এক সেকেণ্ড পর মাটি কাঁপিয়ে ভেঙে পড়ল সেই বিশাল লোহ সিন্দুক, একটা একটা করে সাড়ে নব্বই হাজার শ্যাম্পেনের গ্লাস ভাঙার শব্দ, আলোয় ভরে উঠল চারদিক, যেন চার্চের কোনও ভোর নয়, যেন বা উজ্জ্বল বুধবারের দুপুর তখন, এতদিনে সে পারল, তৃপ্তির চোখে দেখল অবিশ্বাসীদের হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ, এই গ্রহ এবং অন্য সব গ্রহের মধ্যে সর্ববৃহৎ এই জাহাজ পড়ে রয়েছে চার্চের সামনে, যে কোনও কিছুর চেয়ে শুদ্ধ, চার্চের চূড়ার থেকে কুড়ি গুন বেশি উঁচু এবং লম্বায় গোটা গ্রামের চেয়ে সাতানব্বই গুণ বড়, গায়ে লোহ অক্ষরে খোদাই করা রয়েছে নাম—'আলাইকসিলিয়াগ' আর মৃত সমুদ্রের বহু প্রাচীন ও শ্রান্ত জল ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে তার গা থেকে।

বাইরে কুরুক্ষেত্র

ঘরে কুরুক্ষেত্র

কুরুক্ষেত্র মনে।

কৃষ্ণ কিছু বলছেন

অর্জুন তা শোনে॥

অনুবাদ পত্রিকা দীর্ঘজীবী হোক।

বিশ্বমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ "অনুবাদ পত্রিকা"র

(জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতীয়তা বোধের মূর্ত

প্রতীক) জয় হোক।

—অনেক শুভার্থী

অনুগল্পগুচ্ছ

অনুবাদ : কমলেশ সেন

প্রেমের মৃত্যু

বিষ্ণু নাগর

একজন যুবক ছিল, সে প্রেমের জন্যে সারাক্ষণ উতলা থাকত। যে কোনো কারণেই হোক, সে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারে না। কিন্তু প্রেম তো তাকে করতেই হবে। ফলে দারিদ্রকে সে ভালোবেসে ফেলল।

মশায়, প্রেম তো এক নেশা। যেমন তা ঊর্ধগামী হয়, তেমনি তা হু হু করে নেমেও যায়। একদিন প্রেম নেমে গেল।

প্রেমে পড়লে কিভাবে মারা পড়ে?

সে চাকরি-বাকরি খুঁজতে লাগল। ইতিমধ্যে ওর বিয়ে হয়ে যায়। ঘরে স্কুটার টি ভি আসে। ফ্রিজও আসে। এসব কিছু আসতে আসতে সে বাবা হয়। তারপর পদোন্নতি হয়। তারপর মৃত্যু হয়।

মশায়, এই সবে ওর অন্তিম সৎকার করে ফিরে আসছি। আমি কাউকে ঠাট্টা করছি না। নিজেকেও নয়।

[হিন্দী গল্প থেকে অনূদিত]

কসাইখানার শেয়াল

হয়ে তাং হুওরেন

কসাইখানায় যে শেয়ালটি কাজ করত, সে সব ক্রেতাদের সমভাবে সেবা করত। কিন্তু একদিন তার মনে ঈর্ষা জন্মালো।

একটি বেড়াল এসেছিল মাংস কিনতে। সে ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, মাংস নেই, সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে!

একটি কুকুর এসেছিল মাংস কিনতে। তার সামনে কয়েকটি হাড়ের টুকরো ছুড়ে দিয়ে সে বলল, ব্যস, এটুকুই অবশিষ্ট আছে।

এরপর এলো নেকড়ে। তাকে কিছু পচাগলা মাংস দিয়ে সে বলল, আমি আপনার জন্যে এটুকু মাংস সরিয়ে রেখেছিলাম।

ঠিক সেসময় সেখানে বাঘ এলো। বলল, 'এ-ই আমাকে শূয়োরের চর্বি দে।'

শেয়াল ল্যাজাতে ল্যাজাতে বাঘের কাছে এলো। 'আমি আপনার জন্যে অনেক কষ্টে এই মাংসটুকু বাঁচিয়ে রেখেছি।' তারপর চাপল্যের মতো মিষ্টি হেসে বলল, 'আপনি এই এতো মাংস কিভাবে বাড়িতে টেনে নিয়ে যাবেন! আমি আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি, চলুন।'

[চীনা গল্প থেকে অনূদিত]

পথপ্রদর্শক

হেরমন হেস

সে-সময় আমার বয়স ছিল দশ বছর। যে-পরিবারে আমার জন্ম, সে-পরিবার ছিল নিষ্ঠাবান এবং ধার্মিক। পুরোতনপন্থী। প্রতিদিন গির্জায় যাওয়া তাঁদের কাছে পবিত্র কর্তব্য ছিল।

এমন একটি পরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও আমার মধ্যে তেমন কোনো শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। এই নারানিষ্ঠার বিরুদ্ধে আমার মন প্রায়ই যুদ্ধ ঘোষণা করত। ভাবতাম, ঈশ্বর যদি আমাদের মধ্যে থাকেন, তবে সব কাজ তাঁর ইচ্ছেতেই হয়। শুধু ভালো-খারাপ—সব কাজের জন্যেই তো ঈশ্বরকে দায়ী করা উচিত। একদিন সুযোগ বুঝে আমি বাড়িতে আমার মত ব্যক্ত করি। সবাই চমকে ওঠেন। একদিন আমার পিতৃদেবের এক বন্ধু আমাদের বাড়িতে আসেন। কথায় কথায় পিতৃদেব তাঁর বন্ধুকে আমার 'বিচিত্র' ধ্যান-ধারণার কথা বলেন। বুঝলাম, অভিযোগ শুনে তাঁর বিশেষ খারাপ লাগেনি। বরং অত্যন্ত আদর করে তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। পাশে বসিয়ে বললেন, 'তোমার ভাবনা সঠিক। সত্যি, খারাপ-ভালো দুটি কাজের জন্যে ঈশ্বরই দায়ী। কিন্তু খারাপ-ভালো জিনিসটা কি? যার প্রতি মন সায় দেয়, ভালো বা খারাপ বলে স্বীকার করে নেয়, তাই না?

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তোমার মন যা চায়, তা-ই করো। গির্জায় ইচ্ছে করলে যেও, না ইচ্ছে করলে যেও না। ইচ্ছে হলে উপাসনা করো, না-হয় করো না! যা কিছু করবে, তার আগে বুঝে নাও, মন কি বলছে!

[জার্মান গল্প থেকে অনূদিত]

পরিবর্তন

জেরাল্ড মাইকেল

আমি ছিলাম এক অতিমানব। আমার কাঁধ মেঘকেও ছাড়িয়ে যেত। দু'হাত তুলে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র স্পর্শ করতে পারতাম। গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে দুহাতে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতাম। একলাফে আমি তাকাশ অতিক্রম করতে পারতাম। দুটি বাহু মেলে ধরলে দুদিকের দুই দিগন্তকে অতিক্রম করত। আমি মুহূর্তের মধ্যে রাষ্ট্রের সীমানাকে দু'চোখ ভরে দেখতাম। লোকে আমাকে ভয় পেত। বোধহয় সে জন্যেই আমাকে সমীহ করত।

তারপর, একদিন আমি নিজেকে একটি ঘরের মধ্যে দেখলাম। ঘরের ছাদটি আমার মাথার অনেক ওপরে ছিল। দু'হাত তুলে আমি কিছুতেই ছাদের কড়িবরগায় ঝোলানো ঝাড়বাতিকে ছুঁতে পারলাম না। লাফিয়ে ছোঁব এমন শক্তিও আমার মধ্যে ছিল না। দু'বাহু প্রসারিত করে দিলাম, কিন্তু ঘরের দেয়ালকে স্পর্শ করতে পারলাম না। এ-ঘর থেকে আমি প্রতিবেশীদের দেখতে পেতাম না। লোকে আমাকে আর গ্রাহ্য করত না। হয়তো পেছনে সবাই হাসি-ঠাট্টা করত।

আমার একজন নারী ছিল। লোকে তাকে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু মনে করত না। আমার দু-তিনটি সন্তান ছিল। নারীটি বলত, তারা আমার সন্তান। আমি অবাক হলাম। আমার ঘরে একটি আয়না ছিল। সেই আয়নায় আমি আমার চোখে জল দেখলাম। বুঝলাম, আমি খুব, খুব সাধারণ একজন মানুষ।

এবার, আমি তেমন অবাক হলাম না।

[ব্রিটিশ গল্প থেকে অনূদিত]

সমস্ত জ্ঞান

আনাতোল ফ্রাঁস

প্রাচ্য ভূখণ্ডে একজন রাজা ছিলেন। খুব অল্প বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন। সিংহাসনে আরোহন করে তাঁর ইচ্ছে হলো, রাজকর্ম সুষ্ঠু এবং ন্যায়ভাবে চালাবেন। তাই তিনি রাজ্যের সমস্ত জ্ঞানীগুণিদের ডাকলেন। সারা পৃথিবীর জ্ঞান পুস্তকে লিপিবদ্ধ হোক।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বান এবং জ্ঞানীগুণিরা জ্ঞানকে একত্রিত করার জন্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। তিরিশ বছর পরে প্রত্যেকে দেশে ফিরলেন। তাঁদের উটের পিঠে পৃথিবীর জ্ঞানরাজি।

রাজা রাজকার্যে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, পুস্তকগুলি পড়ার তিনি আর সময় করে উঠতে পারলেন না। তিনি বিদ্বানদের আদেশ দিলেন, এই জ্ঞানরাশিকে আরও সংক্ষিপ্ত করতে।

আরও পনেরোটি বছর অতিক্রান্ত হলো। বিদ্বানরা এবার পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডারকে দশখণ্ডে লিপিবদ্ধ করলেন। কিন্তু রাজা বড়ো ব্যস্ত।

বই পড়ার সময় কোথায়! তাই তিনি এই জ্ঞানকে আরও সংক্ষিপ্ত করতে বললেন।

দশ বছর ধরে, খুব পরিশ্রম করে বিদ্বানরা এই সমস্ত জ্ঞানকে আরও দশগুণে সংক্ষিপ্ত করলেন। ইতিমধ্যে রাজা বেশ বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। রাজা বললেন, খুব প্রয়োজনীয় জ্ঞানকে একখণ্ডে লিপিবদ্ধ করুন। বিদ্বানরা আবার তাঁদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

পাঁচ বছর ধরে তাঁরা সমস্ত জ্ঞানের নির্যাস নিয়ে এক খণ্ডে লিখলেন। তারপর তাঁরা রাজাকে তা নিবেদন করলেন। তখন রাজার জীবনে মৃত্যুর ঘন্টা বাজছে। একটি গ্রন্থও পড়ার এখন তাঁর আর সময় নেই।

[ফরাসী গল্প থেকে অনূদিত]

খিদে

বরিস পাস্তারনাক

একটা লম্বা-চওড়া, এবড়ো-খেবড়ো প্রান্তর। সেই প্রান্তরের শেষ প্রান্তে ছোট ছোট গাছগাছালির একটা সবুজ ঝাড় ছিল। সেই ঝাড়ের একটা গাছে দুটি ঠ্যাং তুলে দিয়ে একটা বকরি পাতা চিবুচ্ছিল। এমনভাবে চিবুচ্ছিল, যেন সে খুব ক্ষুধার্ত।

আমি নির্নিমেষ মনে ওর আহার দেখছিলাম। সন্ধ্যার আবছা ছায়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হাওয়াতে একটা মাদকতা ছিল। ভাবছিলাম, এ বকরিটা পেট পুরে খেয়েছে, তবু কেন এতো ক্ষুধার্ত। যদি খিদে না থাকে, তাহলে কি ওর মন এখনও অতৃপ্ত! পেটে খিদে না-থাকলে মানুষ যদি আহার করে, সে আহার শরীরে না লেগে, মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। শরীরের সঙ্গে তুলনা করলে, মনের খিদে অনেক বেশি। মনের এই খিদেকে কি একটা সীমানা পর্যন্ত বেঁধে রাখা যায়! বেঁধে রাখা কি মানুষের পক্ষে মঙ্গল হবে! আর এর ফলে কি আত্মার প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে না?

বকরিটি তেমনি হাপিত্যেশে খেয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে আসছিল। এতে ওর কোনো চিন্তা ছিল না। অথচ আমি ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে আমি শেষ পর্যন্ত এখানে উপনীত হলাম—মনকে বেঁধে রাখ, কিন্তু মনের আনন্দকে কখনও বেঁধো না। কারণ, আনন্দের কখনও অন্ত হয় না। উদয় হয়। চিরকাল ধরে উদয় হয়।

[রুশ গল্প থেকে অনূদিত]

আংটি

নুট হ্যামসুন

একটি পার্টি চলছিল। সেই পার্টিতে প্রেম-উন্মত্ত এক তরুণীকে দেখলাম। ওর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিল। ও ওর উন্মত্ত-প্রেমকে আর সামাল দিতে পারছিল না। জানি না, কার সঙ্গে ওর প্রেম। যিনি এই পার্টি দিয়েছেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে ? ছেলেটি তখন একটা দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটির পরনে ছিল দামী এবং সুন্দর পোশাক। আর ওর কণ্ঠস্বর ছিল ভারিক্কারি।

হাঁ, ঐ তরুণীটি তার দিকে স্থির তাকিয়েছিল। আর ও নিজের মধ্যে সমাহিত ছিল।

'আজকে আবহাওয়াটা কি সুন্দর !' সেদিন বাড়ি ফেরার পথে একথা কয়টি আমি বলেছিলাম আমার প্রিয়তমাকে। বললাম, 'আজকের পার্টি ভালো লেগেছে ?' কিন্তু ওর উত্তরের প্রতীক্ষা না করে, প্রিয়তমার উপহার দেয়া আংটিটা আমার আঙুল থেকে খুলে ফেললাম। তারপর আংটিটা ওকে দেখাতে দেখাতে আমি বললাম, 'এই আংটি তুমি আমাকে দিয়েছিলে, আংটিটা আমার আঙুলে কেটে বসে গিয়েছে। একটু ঘষে করে দেবে ?'

ও আংটিটা নিয়ে বলল, 'খুব শিগগীরই করে দেব।'

একমাস পরে, ওর সঙ্গে আমার আবার দেখা হলো। আমি আংটিটা সম্পর্কে ওকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চুপ হয়ে গেলাম।

আমি মনে মনে বললাম, 'এতো তাড়াহুড়ো কিসের ! ওকে আরও কিছুদিন সময় দেয়া উচিত।

[নরওয়ের গল্প থেকে অনূদিত]

BEST WISHES

A

WELL

WISHER

হিন্দি গল্প

মা-ধাইমা

ভীষ্ম সাহনি

অনুবাদ : মনী শূর

পনের নম্বর ডাউন ট্রেন ছাড়তে তখনও মিনিট দুয়েক দেরি। সবুজ বাতির সংকেত হয়ে গেছে। সিগনালের হাতা কাত হয়ে গিয়েছে। যাত্রীরা যার যার কামরায় গিয়ে বসেছে। এমন সময় আচমকা চালচুলোহীন দুটো মেয়ে মানুষের মধ্যে মারামারি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। একটা মেয়ে আর একজনের কোল থেকে একটা বাচ্চাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিল আর বাচ্চা কোলে মেয়েটা এক হাত দিয়ে বাচ্চাটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে ওই মেয়েটার সাথে লড়তে লড়তে গাড়িতে গিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল।

ছাড়, ছাড়, মর তুই! ছাড় আমারে। গাড়ি ছাইড়া দিতাছে···।

—না, না, দিমু না, মইরে গেলেও আমি দিমু না···। অন্যজন বাচ্চাটাকে ছো মেরে ছিনিয়ে নেবার জন্য আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই কিছুক্ষণ আগেই মেয়ে দুটো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। আর এখন দুজনেই কাড়াকাড়ি মারামারি শুরু করে দিয়েছে। আশেপাশের লোকজন তো দেখে থ। মজা দেখতে লোকজন জমা হতে লাগল। উর্দিপরা প্ল্যাটফর্মের হাবিলদার জল খেতে কলের দিকে যাচ্ছিল, কাড়া মারামারি দেখে সে ঘাড় উঁচিয়ে তেড়ে এল।

—কী, কী হয়েছে রে? হল্লা করছিস কেন? ধমকে উঠল সে।

হাবিলদারকে দেখে মেয়ে দুটো থমকে থেমে গেল। দুজনেই হাঁপাচ্ছিল আর জানোয়ারের মতো একজন আর একজনের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল।

দু-একজন যাত্রীকে গাড়িতে গিয়ে উঠতে দেখে বাচ্চাকোলে মেয়েটা আবার পিছি পিছি করে গাড়ির দিকে ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জাপটে ধরে টানতে টানতে প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে নিয়ে এল। লটর পটর করা কালো রোগাটে বাচ্চাটা মেয়েটার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল। মেয়ে দুটোর মারামারি হাতাহাতিতে লম্বাটমতন ঘাড়টা তার কাঁকুনি খেয়ে কখনো এপাশে কখনো ওপাশে গড়িয়ে পড়লেও ঘুম তার ভাঙছিল না।

—অ্যাই, হল্লা করবি না। কী ব্যাপার তোদের? হাতের লাঠিটাকে উঁচিয়ে হাবিলদার চেঁচিয়ে উঠল। দুজনের মাঝখানে বেতের লাঠিটাকে ঠুসে দিয়ে সে তাদের ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

যে মেয়েটা বাচ্চাটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিল সে তার বড়ো বড়ো কেনাকাতর দুটি চোখ মেলে হাবিলদারের দিকে তাকিয়ে কাতরকণ্ঠে বলে উঠল—আমার ছেলেটারে ও নিয়া যাইতেছে। আমি দিমু না, দিমু না আমার ছেলেরে। বলেই ছেলেকে ছিনিয়ে নিতে আবার সে ছুটে গেল।

—গাড়ি ছাইড়া দিতেছে যে লা হতচ্ছাড়ি, ছাড় আমারে; বলেই ছেলেকোলে মেয়েটা হাউমাউ করে উঠে গাড়ির দিকে ছুটে দিল। হাবিলদার দৌড়ে গিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়াল।

—ওর ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিস কেন? এক ধাতানি দিয়ে জিজ্ঞেস করল হাবিলদার।

—অর ছেলে মানে? ছেলে তো আমার।

—ও যে বলছে ওর ছেলে। সত্যি করে বল কার ছেলে?

—ছেলে আনার গ. আমার। বলেই কমবয়সি মেয়েটা ডুকরে কেঁদে উঠল। বুক, আলুথালু চুলের মাঝখানে মুখটা তার ওম ওম করছিল। চোখে আতঙ্ক। উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল হয়ে আবার সে বাচ্চাটার দিকে ছুটে গেল।

হাবিলদার কটমট কোন্দল মিটিয়ে ফেলতে চাইছে। বাচ্চাকোলে মেয়েটাকে বলল—দিয়ে দে ওকে ওর বাচ্চা।

—কাকে দিমু? ছেলে আমার···

—তুই পেটে ধরেছিস?

শুনে ছেলেকোলে মেয়েটা চুপ মেরে গেল। চোখ পাকিয়ে অন্য মেয়েটার দিকে সে তাকিয়ে রইল।

—বল, এ কি তোর পেটের ছেলে? ধমকে উঠে জিজ্ঞেস করল হাবিলদার।

—প্যাটের ছেলে না হইলে কী হইব? বুকের দুধ খাওয়াইয়া বড় করছি তো আমি। আইজ সাত মাস ধইরা দুধ খাওয়াইয়া আইতাছি।

—দুধ খাইয়েছিস বলে বাচ্চা তোর হয়ে গেল? বাচ্চা তুই জবরদস্তি নিয়ে যাচ্ছিস।

—জবরদস্তি নিয়া যামু ক্যান? ঘাটু ঘাটু আমার নিজের বাচ্চাগুলান রইচা থাউক। অই যে অরেই জিগ্যাস করেন। অই ডাইন মাগি ত সামনেই আছে। বলে অন্য মেয়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—কি লা কালামুখী, রা কাড়ছিস না ক্যান? তর কাছ থেইকা ছেলে আমি কাইড়া নিতাছি? হাবিলদার সাব, অই বেটি নিজে আমার কোলে বাচ্চাটারে দিয়া দিছে। অই মাগি ত বাচ্চাটারে ভাগাড়ে ফেইলে দিতে যাইতেছিল। আমি অরে কইলাম—আহা রে, দে আমারে, আমি অরে পালমু। সেই থেইকা আমি এটারে দুধ খাওয়াইয়া বড় করছি। আইজ অই বেটি আমাকে বাঙ্গিতে তুইলা দিতে আইছিল। এইখানে আইসা বেটি মত পাইলটে ফেলল।

হাবিলদার অন্য মেয়েটার দিকে মুখ করে জিজ্ঞেস করল—কী রে তুই বাচ্চাটাকে ওকে দিয়ে দিয়েছিলি?

যুবতি মেয়েটি উদ্‌ভ্রান্তভাবে অসহায় দুটি বড়ো বড়ো চোখ মেলে অন্য মেয়েটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর চোখ দুটি তার আস্তে আস্তে নুয়ে এল।

—হ্যাঁ, দিয়াছিলাম, কিন্তুক ছেলে আমার। ক্যান দিমু আমি? না, না, দিমু না আমি। বলে অসহায়-ভাবে অন্য মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। একটু আগে তার দু-চোখ ছাপিয়ে যে জল এসেছিল, ভয়ে উৎকণ্ঠায় তা শুকিয়ে গেল।

—দিয়েই যদি দিয়েছিলি তো এখন আবার ফিরিয়ে নিতে চাইছিস কেন?

কাতর দুটি চোখ তুলে সে আবার একবার উপরের দিকে তাকায়। সারা শরীর তার শিউরে ওঠে।

—অ যে ছেলেটারে অনেক দূরে ভিনদেশে নিয়া যাইতাছে গ··· । বলেই সে আবার কেঁদে ওঠে।

—আমি কি চেরটা কাল তর কাছে পইড়ে থাকুম নাকি? বাচ্চা কোলে মেয়েটা হাত নেড়ে নেড়ে আশেপাশের লোকজনদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল—আমাগো ডেরায় বেবাক মানুষ সঙ্গলে চইলে গেছে। অ আমারে ছাড়তে ছিল না। কইতেছিল আর দশটা দিন থাইকা যা, তারপর যাস। আর পাঁচটা দিন থাইকা যা, তারপর যাস। এই কইরে কইরে এক মাস হইয়ে গেল। আর আমি কেমন কইরে এহানে পইড়ে থাকি? আইজ সেই গাড়ি ছাড়ার সময় হইল তো হুতোহাড়ি তার মত পাইলটে ফেলল।

—ও কি তোর কেউ হয়? হাবিলদার জানতে চাইল।

—না, না অ আমার কেউ না। অ কাঠিয়াবাড়ের মানুষ আর আমরা হইলাম বাইদ্যা।

—এখন তুই গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিস কোথায়?

—ফিরোজপুর গ।

—কে আছে তোর ওখানে ?

—আমরা বাইদ্যা. হাবিলদার সাব। পরথমে আমাগো মানুষজন এইখানে জমিন পাইছিল। পুরা দুই সাল আমরা এইখানে খেতি করছি। অখন ফিরোজপুরে আমরা জমিন পাইছি। আমাদের মানুষজন সব চইলে গেছে। কিন্তুক অই বেটি আমারে ছাড়তেছে না।

হাবিলদার ধিধায় পড়ে গেল। একজন পেটে ধরে জন্ম দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে. আর একজন বুকের দুধ খাইয়ে বাঁইয়ে বড় করছে। বাচ্চা কার ?

—তোর নিজের ঘর সংসার নেই ? তুই ওকে তোর বাচ্চা দিতে গেলি কেন ? থাকিস কোথায় তুই ? হাবিলদার বাচ্চাটার মাকে জিজ্ঞেস করল।

— অই বেটি আবার কোথায় থাকব গ ? ওই পোলের কাছে—যে খড়ের কুপড়িগুলোন আছে. অইখানে থাকে আমরাও অইখানেই থাকতাম। অ আমার পড়শি ছিল গ। কামিনের কাম করে। অর নাড়িও কাটছি আমি।

বাচ্চাটার মা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছিল যেন কোনও কথাই তার কানে যাচ্ছিল না।

—ওর স্বামী কোথায় ?

—অর সোয়ামি নাই। অই মাগি ত মরদদের পিছে পিছে ঘুইরে বেড়ায়। অরে কেউ ঘরে নেয় না। সোয়ামি থাকলে অ ক্যান বাচ্চাটারে জন্ম দিয়া ভাগাড়ে ফেলে দিতে যাইব ?

গাড়ি হুইসল দিল।

ভিড় ভেঙে লোকজন নিজের নিজের কামরার দিকে ছুটল। বেদেনিও যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। ছেলের মা ছুটে এসে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরল।

—যাইস না তুই। আমার ছেলেটারে নিয়া চইলা যাইস না।

হাবিলদার দু-পায়ে এগিয়ে এসে বেদেনিকে বলল—যা. ওর ছেলে ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যা। মা যদি ছেলেকে দিতে রাজি না হয় তা হলে তুই তাকে নিয়ে যেতে পারবি না।

কড়া হুকুম হাবিলদারের। এমন জবাব আশা করেনি বেদেনি। সে আঁতকে উঠল। বলল—আমি দিমু ক্যান ? নিজের ছেলেরে কেউ দেয় নাকি ? কারে দিমু ছেলে ? অই মাগির না আছে ঘর. না আছে সংসার···

—গাড়ি এক্ষুণি ছেড়ে দেবে. জলদি কর. ছেলেকে মার হাতে দিয়ে দে. না হলে তোকে আমি হাজতে পুরে দেব —হাবিলদার হুঙ্কার দিয়ে বলল।

ঘাবড়ে গিয়ে মেয়েটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো আগে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মুখের দিকে অসহায় চোখে তাকাতে লাগল। তারপর সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল—হারামজাদি. কুত্তি. এইখানে আইসা মত পাইলটে ফেললি। নে বেশরম মাগি. নে ধর. কের যদি দুধ খাওয়ানোর কথা কবি তো কিব দিমু, অইটারে কিব দিমু, তরেও দিমু। সাত সাতটা মাস আমার নিজের ছাওয়ালরে দুধ না দিয়া অইটারে দুধ খাওয়াইছি···বলে দুম করে বাচ্চাটাকে মেয়েটার কোলে ফেলে দিয়ে বিলাপ করে করে কাঁদতে লাগল।

আজব ব্যাপার। দুটি মেয়ে কেঁদে সারা। দুজনেই একজন আর একজনের দুশমন। দুজনেই একই সন্তানের জননী। চালচুলোহীন এই মানুষগুলোর না আছে হাসির ঠিক না আছে কান্নার ঠিক। এত কাণ্ড, এত ঝগড়া মারামারি যাকে নিয়ে, সেই রোগাপাতলা একরত্তি দুধের বাচ্চাটা এখনও হাত মুঠো করে ঘুমিয়েই আছে।

গালাগালি দিতে দিতে, হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বেদেনি গজর গজর করতে করতে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

ঘুমিয়ে থাকা বাচ্চাটার পিঠে ছড়ি ঠেকিয়ে হাবিলদার এক ধমক দিয়ে বলল—নে, তোর বাচ্চা তুই পেয়ে গেছিস। যা যা, লিগগির ভাগ এখান থেকে···

ছেলেকে বুকে চেপে ধরে মা পিছিয়ে গেল। ভিড় আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল। গাড়ির কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে বেদেনি তখনও গলা ফাটিয়ে গর্জন করে চলেছে—হারামজাদি, তুই অইটার জন্ম দিয়াই মাইরা ফেললি না ক্যান? অইটারে মাইরা ফেললেই আমার বুকটা ঠাণ্ডা হইত, হতচ্ছাড়ি··· ।

বাচ্চাটা বোধ হয় কোলে চিনে গিয়েছিল কিংবা হয়তো হাবিলদারের বকুনি খেয়ে জেগে গিয়েছিল। ছোট মুঠি দিয়ে প্রথমে সে তার নাক ঘষতে লাগল, তার পরে চোখ। কিছুক্ষণ পরে মুঠোটাকে মুখে পুরে দিয়ে চুষতে লাগল। মেয়েটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো পেছনে সরে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

স্তন ভেবে বাচ্চাটা তার মুঠোটাকে চুষতে লাগল, কিন্তু দুধ পাচ্ছে না দেখে একেবারে জেগে গিয়ে পা দুটোকে জোরে জোরে ছুড়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। তার মা ওকে ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধে নিল। কিন্তু বাচ্চাটা আরও তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

নাকাল হয়ে পড়ল মা। বাচ্চাকে সে একবার এ কোলে নেয়, আবার ও কোলে। কখনও ডান কাঁধে মাথা রাখে, কখনও বা কাঁধে।

বাচ্চাটার কান্না শুনে কামরার দরজায় দাঁড়ানো বেদেনি আবার চঞ্চল হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল—মার, মার, মার, মাইরা ফ্যাল। তুই অইটরে শ্যাষ কইরা ফ্যাল। হতচ্ছাড়ি, অইটারে কিষ দিতাছিস না ক্যান? সেই কোন দুপুরে ছেইকা অইটার মুখে এক ফোঁটা দুধ পড়ে নাই। কাঁদব না ক্যান ছেলে?

ছড়ি দোলাতে দোলাতে হাবিলদার চলে গিয়েছিল। দু-একজন কুলি ছাড়া কামরার সামনে কেউ ছিল না। দূরে, পেছন দিকে নীল উর্দিপরা গার্ড সবুজ নিশান দোলাচ্ছে।

হুইসল দিয়ে গাড়ি ছাড়তে চলেছে।

কেঁদেই চলেছে বাচ্চাটা। ছেঁড়া জামার পকেট থেকে কয়েকটা চিনেবাদাম বের করে মা তার মুখে পুরে দিতে গেল।

—অ্যাই হতচ্ছাড়ি, কী দিতাছিস অর মুখে? ছেলেটারে আমার তুই মাইরা ফেলবি নাকি লা? কসাই বেটি···।

বলেই প্রথমে একটা ছোট টিনের বাক্স, তারপরে একটা পুটলি ধুপ করে প্ল্যাটফর্মের উপরে ছুড়ে দিয়ে গজ গজ করে গালাগালি দিতে দিতে সে গাড়ি থেকে নেমে এল।

—হারামজাদি, গাড়িটার আমারে যাইতে দিলি না। ধর, মর তুই হতচ্ছাড়ি··· ।

গাড়ি ছেড়ে চলে গেল। এক এক করে কুলিরাও স্টেশনের বাইরে চলে গেল। নীরব নিস্তব্ধ প্ল্যাটফর্ম। হাবিলদার ছইল দিতে দিতে দূরে প্ল্যাটফর্মের আর এক মাথায় চলে গিয়েছিল। আবার যখন সে ছড়ি দোলাতে দোলাতে ফিরে এল, দেখল প্ল্যাটফর্মের একটি কোণে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে বসে আছে ওই মেয়ে দুটি। বেদেনি বাচ্চাটাকে কোলে শুইয়ে তাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে দুধ খাইয়ে চলেছে আর পাশে বসে বাচ্চাটির মা আস্তে আস্তে সন্তানের চুলে মমতা ভরা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

[অনুবাদক নলীগোপাল শূর ২০০২ সালে হিন্দী ভাষায় অনুবাদ সাহিত্যের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন]

যাত্রা

মামনি রয়ছম গোস্বামী
অনুবাদ : বেলা বসু

শ্রীমতী মামনি রয়ছম গোস্বামী অসমীয়া সাহিত্যে একটি সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। ডালোনাম ডঃ ইন্দিরা গোস্বামী। বর্তমানে ইনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয়-ভাষার অধ্যাপনায় রত। শ্রীমতী গোস্বামীর জন্ম গুয়াহাটীতে। পিতা ছিলেন অসম-সরকার-এর শিক্ষা-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। সেই সময়ের সামাজিক-রক্ষণ-শীলতার ঘেরাটোপ ভেদ করে তিনি ১৯৬৪ সনে এ. এ. আর ১৯৭৩ সনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

পঠ্যাবস্থাতেই তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। একাধারে তিনি গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও গবেষক। 'মামরে ধরা তরোয়াল' উপন্যাসটির জন্য তিনি ১৯৮২ সনে সাহিত্য-আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া আরও ছোট-বড় অনেক সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন অতি সম্প্রতি জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার বিজয়িনী হয়েছেন। তাঁর অসংখ্য মননশীল রচনা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শ্রীমতী গোস্বামীর বেশীরভাগ রচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে অবহেলিত ও অপমানিত জনসাধারণের জীবনযাত্রা। বর্তমান গল্প 'যাত্রা' সেইরকম-ই একটি রচনা। রচনাটি নেওয়া হয়েছে লেখিকার রচনাসংগ্রহ মামনি-রয়ছম গোস্বামী-র প্রিয়গল্প বইটি থেকে। এখানে একটি পরিবারের এক করুণ, পরিণতি এমন দক্ষতায় রূপায়িত হয়েছে যে পাঠকের মন একেবারে গভীর বিষাদে নিমগ্ন হয়ে পড়ে।]

কাজিরঙ্গা অভয়ারণ্য দেখে দেবার পথে আমি আর আমার সহকর্মী অধ্যাপক মিরাকলর একই গাড়িতে আরোহী ছিলাম। আমরা দুজনেই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা বিভাগে অধ্যাপনা করি। ছাত্রদের আমন্ত্রণে আমরা এদিকে এক সভায় এসেছিলাম।

আমাদের অ্যাম্বেসাডার গাড়িখানা খুবই পুরনো। এজন্য দিনে দিনে আমরা গুয়াহাটীতে পৌঁছুতে বাধ্য ছিলাম। মিরাকলর সাহেবের বাঘ-ভালুকে ভয় ছিল না, কিন্তু তিনি সন্ত্রাসবাদীদের খুব ভয় করতেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীরা গুলি করে হত্যা করেছে। তাই পথে যেতে যেতে তিনি প্রশ্ন করলেন—তোমাদের এই অপূর্ব দেশে সন্ত্রাসবাদের সমাপ্তি কি সত্যিই ঘটেছে ?

কিন্তু আমি ওর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলাম না। রাস্তায় আমরা বেশ কয়েকবার মিলিটারী চেকপোস্ট পার হয়ে এসেছি। ওদের হাতের সার্চলাইট আমাদের গাড়িকে ভাল ভাল করে পরীক্ষা করেছে। ড্রাইভার আমাদের আগেই বলেছিল যে কোথায় যেন গুলিতে মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু পথের এরকম নয়নাভিরাম দৃশ্যে হত্যার কথা কিছুতেই মনে আসতে চায় না। দূরে দেখা যাচ্ছে সার সার বিজুলি বাঁশের ঝাড়। কাজিরঙ্গার ট্যুরিস্টলজ-এর বারান্দায় বসে আমি আগেই এই বাঁশঝাড়ের কলকল সঙ্গীত শুনে

মুক্ত হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন মুগাকাপড়ের ধানক্ষেতগুলোকে বার বার আকাশের দিকে উৎক্ষেপন করা হচ্ছে। চড়িয়না কাড়ের একটা ডালে বসে একটি গোলগাল প'্যাচা মাথাটা এদিক সেদিক দোলাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন সদ্যোজাত একটি শিশুর মাথা দোল খাচ্ছে।

মিরাক্কর সাহেবের বদ্ধমূল ধারণা— সরকার যা-ই প্রচার করুক না কেন, উত্তর পূর্বাঞ্চল-এর সন্ত্রাসবাদ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ওর কাছে খবর আছে যে জে কে এল এফ আর বাবর মালসো-র দলের কিছু সন্ত্রাসবাদী এই দিকের অরণ্যে এসে মাটি গেড়ে বসে রয়েছে। আমি অবশ্য মিরাক্কর সাহেবকে সমস্ত পথ বুঝিয়ে এসেছি যে গুয়াহাটী পৌঁছুতে দেরী হলেও ভয়ের কিছু নাই। কারণ, সন্ত্রাসবাদ একরকম শেষ হয়েই গেছে।

জাতীয় সড়কের দুই দিকেই অপূর্ব সবুজের সমারোহ। শেষ দুপুরের নরম রোদ যেন তার উপরে রেশমি চাদর বিছিয়ে রেখেছে।

ধানক্ষেতের ঢেউ খেলানো সবুজে, বনফুলের নানা রং সেই আলোতে আরও উজ্জ্বল, আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। আর শব্দ? ঢেউ খেলানো ধানখেতগুলো যেন এক উন্মত্ত যৌবন-গাথা গেয়ে চলেছে।

মিরাক্কর সাহেব মন্ত্রমুগ্ধের মতই দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। কোথাও বা ছায়াময় গাঢ় নীল পাহাড়, কোথাও বা সূর্যকিরণে সোনালী রূপ নিয়ে, কোথাও বা আধ-অন্ধকার আধ-আলোতে রহস্যময় পাহাড়গুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তা সত্ত্বেও উনি কিন্তু মাঝে মধ্যেই উৎকর্ণ হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের বন্দুকের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছিলেন। আমিও সন্ত্রস্ত—কি জানি কোথাও যদি বন্দুকের শব্দ পাওয়া যায়……

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওনার মন থেকে ঐ ভাবনা বোধহয় মুছে গেল। উনি নিশ্চিন্তমনে বনানীর বর্ণবৈচিত্র্যে মনোনিবেশ করলেন। পথের পাশের শিমুল, ধৈরা, শিশু, হোলং, বকুল, জাম আর সেগুন গাছের নিবিড় অরণ্যও যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই পথ চলছে। অবশেষে বৃদ্ধ সূর্যের শেষরশ্মি সেগুনের অরণ্যে হারিয়ে গেল। শেষ বিকেলের সোনালী আলো যেন ছিন্ন-ভিন্ন রেশমী চাদরের মতই গাছগাছালির সবুজ পাতার ফাঁকে-ফোকরে মুখ লুকিয়ে রাখল। সোনালী রোদের ঝিকিমিকি হরিণের চামড়ার মতই ফুটকি ফুটকি হয়ে ঝুলে রইল।

ততক্ষণে ধানক্ষেতের সবুজের মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। এই সবুজের কোথাও কোথাও অন্ধকারের কালো নেমে আসছে। কিন্তু মাঝে মাঝে গোধূলির সোনালী আলো সোনালী-সুতোর মতই চিকমিক্ করছে। কোথাও বা এই রং বৌদ্ধ ভিক্ষুর গেরুয়া-পোশাকের রং নিচ্ছে। আমাদের বিস্মিত চোখ কিছুতেই এইসব রং-এর খেলা থেকে বিদায় নিতে পারছে না।

গাড়ি একইভাবে চলছে। ড্রাইভার জানাল—এদিকে আর কারুর হাতে বন্দুক নাই। সেবারে এইখানেই গোলাগুলি চলেছিল।—বন্দুক আর নেই? বাক বাবা, কি আরাম! এমন সবুজের গালিচা-ঢাকা প্রান্তরে বন্দুকের শব্দ?… বারুদের ধোঁয়া?…রক্তের ধারা?…সবই কেমন বেমানান। এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধারে গোলাগুলি, বন্দুক বাজি…? মিরাক্কর সাহেব অবশ্য মন্তব্য করতে ছাড়লেন না—সন্ত্রাসবাদীদের বন্দুকবাজী শেষ হলেও পোচারদের বন্দুকবাজী ঠিকই বজায় আছে। চোরাশিকারিদের হাতে বন্দুকের ব্যবহার একইভাবে চলছে…

এসব তথ্য অবশ্য কাজিরাঙার ফরেস্ট-রেঞ্জার আহমেদ-সাহেবের কাছেই শোনা। তিনি বলেন—চোরাই শিকারির হাতেও এখন অত্যাধুনিক অস্ত্র-সম্ভার। পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি, ইউ এস কারবাইন, কাইন্ড হানড্রেড ডাবলবেরেল্ রুগার সেভেন জিরো—এই সব অস্ত্র সহ সম্প্রতি চোরাই শিকারিরা ধরা পড়েছে। কেউ কেউ এনকোউন্টারে মারাও গেছে। বন্দুকের প্রতি মিরাক্কর-সাহেবের জন্মগত কৌতূহল। এজন্য বিভিন্নমানের বন্দুক, বারুদ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রচুর

পড়াশুনো, অনেক কিছুই তিনি বিশেষভাবে জানেন। এবারে তিনি প্রথম মহাসমুদ্রে ব্যবহৃত কিছু অস্ত্র-শস্ত্রের কথা আগ্রহ করে বলতে আরম্ভ করলেন। ড্রাইভার রমাকান্তও কৌতূহলের সঙ্গে দু-একটা প্রশ্ন করতে লাগল। মাঝবয়েসী রমাকান্ত মাথার টাক ঢাকতে একটি নেপালী টুপি ব্যবহার করে। ছোট-খাট গাবদা-গাবদা চেহারার রমাকান্তের ঘাড়-গলা বলতে প্রায় কিছুই নাই। ছোট্ট ছোট্ট কুতকুতে চোখদুটো রাস্তার উপরে নিবদ্ধ। নাকের নীচে পুরুষ্ট গোঁফজোড়া বেশ একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। ড্রাইভার হিসাবেও ওর সুনাম আছে—কাটস-ব্রেক সে প্রায়ই ব্যবহার করেনা।

আমি কিন্তু দূরের প্রাকৃতিক শোভা থেকে কিছুতেই চোখ সরাতে পারছিলাম না। তাই মিরাক্কর সাহেবের কথাগুলো ঠিকভাবে আমার কানে ঢুকছিল না। আহা! দূরের বনানীতে যে কতরকমের গাছ আর কতরকমের রং-এর বাহার! কোন কোন প্রাচীন গাছের গায়ে শ্যাওলা রং-এর ছাল—বাঁদরের লোমের মতই দেখাচ্ছে। কোন কোন বৃক্ষকে সোনালী-লতায় ছেয়ে রেখেছে—যেন মাকড়সার জালে ঢাকা পড়েছে। ঐ পাতাগুলোর রং ঠিক কি ধরণের? দেখতে তো অনেকটা কাঁঠাল-পাতার মতই···আর ঐ গাছটির পাতাগুলো? যেন এক একটি পটিমাছ দোল খাচ্ছে। আবার আর এক গাছের পাতাগুলো রুপোর টাকার মত গোল গোল···মাঝখানটায় যেন ভিক্টোরিয়ার ছবির মতই চিহ্ন দেওয়া। আর নারকেল গাছের পাতাগুলো যেন নীচের কোপ-কাড়গুলোকে ছাতার মতই ছায়া দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আর ওগুলো তো মনে হচ্ছে নিরণা-গাছ—যেন মেঘের সঙ্গে খেলা করতে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে মাটির ওপরে এমন সাদা মেঘের খেলা মীরাক্কর সাহেবের কাছে নতুন বিষয়। দিল্লীর চরম আবহাওয়া থেকে এই সুদূর পূর্বাঞ্চলে এসে তিনি যেন এক অনুপম স্বর্গরাজ্যের সান্নিধ্য পাচ্ছেন···আর এইরকম স্বর্গরাজ্যে বন্দুকের শব্দ! হাতী-মারা বন্দুক! পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি!

ফাইভহানড্রেড সেভেন জিরো?

ইউ এস কারবাইন উইথ্ এ সাইলেন্সার?

এ কিছুতেই হতে পারে না। এই রকম অস্ত্রসম্ভার এখানে থাকতেই পারে না। কোথায় দিল্লী আর কোথায় এই অনুপম প্রকৃতির রাজ্য! দিল্লী এখন আর মানুষের বাসের যোগ্য নয়। আফগান তুর্কী কবির রহস্যময়ী কমনো এখন দুর্গন্ধময় নর্দমায় পরিণত হয়েছে। আর সদর-বাজার মানুষের ভীড়ে যেন এক রুদ্ধশ্বাস। আর সেই রিং রোড—সে তো এখন অ্যাকসিডেন্টে মৃত-মানুষদের শবাগার বললেই হয়।

ধীরে ধীরে সূর্যের আলো নিস্তেজ হয়ে আসছে। একটা প্রকান্ড অজগর-সাপের নানা বর্ণময় খোলসের রূপ ধারণ করে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে সাপের মতই সাঁৎ করে সেটি কোন অন্ধকার গহ্বরে লুকিয়ে পড়ল।

হুর্ হুর্ হুর্রাৎ···গাড়িটা হঠাৎ-ই বিচিত্র শব্দ তুলে রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। পাশেই ডাবের স্তূপ। ড্রাইভার রমাকান্ত তক্ষুনি নেমে গিয়ে বনেট খুলে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। রেডিয়েটর লিক্ হয়ে জলশূন্য হয়ে গেছে। প্রচন্ড গরম রেডিয়েটরের লিকেজ বন্ধ করার জন্য কোন গ্যারাজে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আমরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম। কাছেই দুটি ছোট ছোট দোকান থাকাতে একেবারে খারাপ লাগল না।

মিরাক্কর সাহেব বললেন—খুব বাঁচা গেছে···জঙ্গলের মধ্যে যদি গাড়িটা বিগড়ে যেতো তাহলে কি হ'ত? এদিকে তো অন্ধকার হয়ে এলো।

আজিও ওনার কথায় সায় দি-ই। ওদিকে রমাকান্ত দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাড়ারেজের খবর জোগাড় করার জন্য। রাস্তা থেকে একটু ভিতরে একটা দোকান থেকে একটি লোক এদিক পানেই আসছে। তার হাতে একটি কেরোসিনের লণ্ঠন। গায়ে একটা লম্বা-ঢোলা পাঞ্জাবী ধুতির ঘোট্ হাঁটুর ওপরে তোলা—বয়সে বৃদ্ধই মনে হচ্ছে। লোকটি এগিয়ে এসে গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ভালকরে দেখে বোঝা গেল তার লম্বা চুলগুলো খোপা করে বাঁধা রয়েছে।

আলোটা উপরে তুলে ধরে সে বলল—ওয়ার্কশপের জায়গা তো সেই সাত মাইল দূরে। আমি বরং হাত তুলে কোন গাড়িকে দাঁড় করাই! ড্রাইভার তাতে করে চলে যাক। ওখান থেকেই মেকানিক নিয়ে আসতে হবে। আর আপনারা সেই সময়টুকু আমার দোকানে এসে বসবেন। চা-পান করে একটু জিরিয়ে নেবেন।

বৃদ্ধ লোকটি অদ্ভুত ভাবে রাস্তার মাঝখানের দাঁড়িয়ে আলোটা মাথার ওপর তুলে ধরল আর তার খোপা করা চুলের গুচ্ছ কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

লম্বা চুল, হাঁটুর ওপরে তোলা ধুতি, মাথার ওপরে কেরোসিনের আলো—সব মিলিয়ে লোকটিকে ঠিক একজন ওঝার মতই দেখতে লাগছে।

মিরাক্কর সাহেব আর আমি চালা ঘরের চায়ের দোকানের ভিতরে গিয়ে বসলাম। একটি হ্যারিকেন উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার চিমনিটা কাটা আর কালিমাখানো। একটা কাঠের বেঞ্চির নীচে একটি ভাঙ্গা কেরোসিন স্টোভের ওপরে একটি বড় সস্‌পানে আধাসিদ্ধ কিছু চায়ের পাতা রাখা রয়েছে। বেড়ার গায়ে একজন অভিনেত্রীর ছবি ঝোলানো, তার মুখে একটি জ্বলন্ত সিগারেট, বেঞ্চিটার একেণে সেকেণে পোটলের টিন, ছেঁড়া ন্যাকড়া, নারকেলের মালা ইত্যাদি ইতস্তত পড়ে রয়েছে। কয়েকটা জলের বোতল, ওষুধের শিশি ঘরের কোণে ডাঁই করা রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে চারিদিকে একটা হতাশাব্যঞ্জক দৃশ্য।

আমরা কাঠের বেঞ্চিটাতে সাবধানে বসলাম। বসার সঙ্গে সঙ্গে একজন বৃদ্ধা কেরোসিনের কুপি হাতে এসে সামনে দাঁড়াল। সে তড়বড়িয়ে বলে উঠল—উঃ, আজ একটা দিন গেল বটে। সারাদিন যেন সাগরে মাছ খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু একটাও খদ্দের পাওয়া গেল না।

—খদ্দের আসে না? হঠাৎ করেই আমার মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল।

বৃদ্ধা বলল—এখন রাস্তার ধারেই অনেক দোকান হয়ে গেছে। ওরা লোক ধরবার কন্দি জানে না, মাইক লাগিয়ে গান বাজনা করে···

তারপর আরও কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলে—ওদের জায়গায় অনেক খারাপ জিনিষও বিকিকির হয়। ওরা অনেক কন্দি জানে। এই যে চুরুট-খাওয়া মেয়েমানুষটা নিয়াও অনেক কথা হয়ে গেছে···

আমরা হলি ভদ্রমানুষ, ওদের সঙ্গে কেমনে ভাবে পারব···

বৃদ্ধা এবারে এঁকেবেঁকে দুর্বল হাতে চায়ের সস্‌পানটা হাতে তুলে নিয়ে দোকানের পিছন দিকে চলে গেল। সেটিকে ঘুরে নিয়ে এসে স্টোভটা ধরাবার চেষ্টা করল। বোধহয় ওটাতে তেল কম ছিল, তাই ধরাবার চেষ্টার একটা কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। আমরা দুজনেই একপাপ গরম চায়ের অভাব অনুভব করছিলাম। বৃদ্ধা আমার মতই টলতে টলতে কাচের গেলাস, চা-পাতা, দুধ ইত্যাদি সরঞ্জাম খুঁজেপেতে জড়ো করছে দেখে আমার খুব খারাপই লাগল। দুটো আলোর সাহায্যে এবার বৃদ্ধার অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরনে সুতির মেখলা। চামড়াটায় পাড় বসানো, কিন্তু পায়ের দিকের দাগে ভর্তি। ব্লাউজটাতে অনেক তাপ্পি মারা। ছেঁড়া অংশগুলো দিয়ে বৃদ্ধার শরীরের ঝুলেপড়া চামড়ার অংশবিশেষ

দেখা যাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—দিদিমা, এই বয়সে আপনাকে এইসব কাজ করতে হয় কেন? ঘরে কাজ করার মতন আর কেউ নাই? বৃদ্ধা একেবারে ক'কিয়ে উঠল—থাকবেনা কেন? সবই ছিল! কিন্তু আমার কপালে কিছুই রইলো না। গেল বন্যায় বড় ছেলেটা মরে গেল। কি যে অসুখে গেল তা ডাক্তার ধরবারই পারল না। ডাক্তার নয় তো যেন ডাকাইত। কাড়ি কাড়ি টাকা না ঢাললে ওরা ওষুধই দিবার চায় না। তা সে তো গেলই, কিন্তু বৌটা তখনই পোয়াতি ছিল। সে এটা ছেলে বিইয়েছে। কিন্তু সেদিনের পর থেকে এমনি দুর্বল হয়ে গেছে যে বিছানা থেকে উঠতেই পারেনা. আমার কাজ আর কি করবে? আসলে প্যাট ভরে খাওয়ার দিবার পারিনা তো···

—আচ্ছা দিদিমা. এই বৌ ছাড়া ঘরে আর কেউ নাই?

—থাকবে না কানে! আরো দুটো ছেলে. দুটো মেয়ে আছে। তারা ইস্কুলেও পড়তো। একটা ছেলে উগ্রপন্থীর দলে যোগ দিছে. আর একটা যে কোথায় উধাও হয়ে গেল, কে জানে তা। তার উপরে নদীর উপদ্রব। ফি বছরে বান-ভাসিতে জমি-জমা সবই ভেসে যায়···

এবারে স্বর নীচু করে বৃদ্ধা বলতে লাগল—আমার বড় মেয়েটা একটা মিলিটারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। পাড়ার ছোকরারা তারে মেরে পাও একখান ভেঙ্গে দিয়েছে. আর সেই মিলিটারীটাও দাওয়ের এক কোপ খেয়ে পালিয়েছে···

এখন সময়ে হতে লণ্ঠন বৃদ্ধ এসে দাঁড়াল। সে বোধহয় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে মেকানিক যোগাড় করার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে ফিরল। ঘরে ঢুকেই সে চীৎকার করে বলে উঠল—এ্যাই নির্মলীর মা. পরের কষ্টে কাতর যন্ত্রীটার নিজের দুঃখের কাহিনী বিনাবার নিছস্ নাকি? আগে চা করে দে. দুঃখের পাচালি পরে গাইবি···

হঠাৎ বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগল—আজ মনোহরেরা তারে নাকি রেল লাইনের ধারে দেখছে···

বৃদ্ধ একটু থমকে গিয়ে কথাটার গুরুত্ব কমাবার জন্য বলল—সেবারেও লোকেরা তারে রেললাইনের—ধারে দেখেছে বলে বলেছিল। এইসব বাজে কথায় কান দিবি না তো। যা. না ওনাদের জন্য চা করে আন, রাস্তায় অনেক ধকল গেছে। কাজিরঙা কি একটুখানি পথ? যা চা কর, আর দ্যাখ বিস্কুট আছে নাকি?

—আবার বিস্কুট? চা-চিনির পয়সাতেই কুলায় না. তার উপরে বিস্কুট···

আমি আর মিরাকলর সাহেব একসঙ্গেই বলে উঠি—না, না, বিস্কুটে দরকার নাই। আমরা খালি এক কাপ করে গরম চা-ই খাব।

এবারে বৃদ্ধা চা-তৈরীতে মনোযোগ দিল। শুধু চায়ের গেলাস হাতে তুলে দিতে দিতে সে বলল—বুড়োর আর চিন্তা কি? আমি সে জানি এর পরে কি কি হবে? হরি হে, আর কত দেখাবে। বানভাসীদের জন্য কমিটি হল. তারা কত কত মিটিং করল···রাস্তার পাশে সরকারী কর্মীরা দপ্তর সাজিয়ে বসল···কিন্তু দিদি. আমরা যে অতলে সেই অতলেই রইলাম। আজ সাতবছর ধরে অত অত জমিন নদীর বানে তলিয়ে গেল, আর সরকারী-দপ্তর একশটা করে টাকা দিয়ে খালাস হয়ে গেল।

বৃদ্ধ এবারে যেন গর্জে উঠল—এই বুড়ি, থামবি কিনা বল···

কিন্তু বৃদ্ধার থামবার কোন লক্ষণই দেখা গেলনা—কানে! চুপ করবো কানে? সরকারী অফিসারের পায়ে ধরতে ওনার লজ্জা হয়।

বন্যাত্রাণের টাকা মেরে দিয়ে কত জনে মোড়ল হয়ে উঠল আর উনি তাদের পায়ে ধরে নিজের আখেরটা গুছাবার পারলেন না। আজ সাত সাতটা বছর ধরে সংসারটা কোথায় ভেসে গেল আর নবাবজাদা একটু হাতে-পায়েই ধরতে

পারল না···অথচ নবাবী চালটা ঠিক আছে···বয়সের কে কবে বড় বহুয়া আছিল, সোনার তাবিজ গলায় দিয়ে রুপোর লাঠি হাতে ঘুরে বেড়াতো···রাজা-গজাদের সিংহাসনে বসে থাকতো—সেইসব কথা ওনার মাথায় বোকা হয়ে রয়েছে··· কিছুতেই সরকারী অফিসারের কাছে মাথা নোয়ালো না। আজ সাত বছর ধরে এই ভোগান্তি চলছে···দিদিরা, এই তো আমাদের অবস্থা! তোমরা কাজিরঙ্গা বেড়িয়ে চলে যাও, কিন্তু গাঁয়ের লোকদের অবস্থা জানোয়ারদের চেয়েও খারাপ, তাদের দিকে একবার চেয়ে দ্যাখো···

বৃদ্ধার চোখ থেকে এবার জল্ গড়িয়ে পড়ল। রুদ্ধকণ্ঠে হাতজোড় করে বলতে লাগল—আমাদের কথা একবার ভাবো, আমরা···আমরা···

বৃদ্ধ যেন অত্যন্ত লজ্জায় পড়ে গেল—সে খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলতে লাগল—আপনারা কিছু মনে করবেন না। খদ্দের দেখলেই বুড়ির মাথা খারাপ হয়ে যায়·· খালি উল্টাপাল্টা বকতে থাকে···

বৃদ্ধাকে ধমকে বলল—হাত চালা, বুড়ি। চায়ের জলে একটু আদা থেতলে ঢেলে দে। আদা না থাকলে দুটো তেজপাতাই ঢেলে দে।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল বেড়ার গায়ে একটা দোতারা ঝুলছে। এতক্ষণ খেয়ালই করিনি। ছেঁড়া বস্তা, ভাঙা টিন, নারকেলের মালা আর শিশিবোতল ছড়ানো ঘরটার মধ্যে দোতারাটাকে একটা ব্যতিক্রম বলে মনে হ'ল। ওতে আবার কারুকার্যও করা আছে, রাখাও হয়েছে বেশ যত্ন করে।

—বাদু, এই দোতারাটি কে বাজায়?

প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাদুর মুখময় একটা ঐশ্বরিক হাসি ছড়িয়ে পড়ল। একটু আগেও বোঝা যায়নি যে বৃদ্ধের মুখ এমন হাসিতে ঝলমল করে উঠতে পারে। বলল—ডিমলু-র পাড়ে পাড়ে যতগুলো হরিসভা আছে, তারা সকলেই আমার এই দোতারাটিকে চিনে। ডিমলুর পাড়ে পাড়ে বানের জলে অনেক হরিসভা তলিয়ে গেছে। এখন আর সে সব জায়গায় কোন নাম সংকীর্তন হয় না।

একসময় ডিমলু ছাড়াও জঙ্গলুর পার হয়ে একেবারে বেহালি পর্যন্ত হরিসভার মানুষে আমার গানের সুনাম করতো।

এককোণে বসে বৃদ্ধা তখন একটুকরো আদা থেতো করার চেষ্টা করছিল, গানের নাম শুনে একেবারে তেলেকেলে জ্বলে উঠল—এই সেরেছে, এবার দেখি বুড়ো নক্সাকাটা পাল্কীর গপ্পোও আরম্ভ করব। আজ দুই মাস হল ছেলেটা উধাও হয়ে গেছে। তার কথা যে বুড়ো কানেই তুলছে না। ওরা বলছে তারে লাইনের ধারে দেখা গেছে···

—এ্যাই বুড়ি, চুপ করবি! দুই গেলাস চা বানাতে এত সময় লাগে ক্যানরে?

অধ্যাপক মিরাকলের মধ্যস্থতা করে প্রস্তাব দিলে—আমার কিন্তু একটা গান শুনতে খুবই ইচ্ছা করছে।

এইরকম প্রস্তাব শোনার জন্য বৃদ্ধ একেবারে তৈরী হয়েই ছিল; বলল—হে হে, শুনাব বৈকি, অবশ্যই শুনাব। খদ্দের আসলে, আমার গান তারা শুনবেই। মেকানিক আসতে তো দেরী আছে, আপনাদের বসতে তো হবেই···

বৃদ্ধা আবারও তেড়ে উঠল—আমি খদ্দেরকে চা দিচ্ছি, আপনে লণ্ঠনটা নিয়ে লাইনের ধারটা দেখে আসেন। গপ্পো-গীত আরম্ভ হলে বুড়োর আর খাওয়াই হবে না।

—আরে রাখ, রাখ লোকের কথা। সেবারেও লোকে এমন কথা বলেছিল···

এবারে বৃদ্ধ চায়ের গেলাস দুটো বৃদ্ধার হাত থেকে নিয়ে সন্তর্পনে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে বলল—গান তো শুনাবই, আপনারা চা-টা খেয়ে নিন!

আমরা দুজনেই আগ্রহের সঙ্গে চায়ের গেলাস তুলে নিলাম। বৃদ্ধ এবারে কথা আরম্ভ করল—কাজিরঙাতে বাঘের দেখা পেলেন? ১৯৬৬ সনে কাজিরঙাতে কুড়িটা বাঘ ছিল, এখন নাকি ষাট-টার মতন হয়েছে। গণ্ডারও নাকি তিনশ থেকে দেড়হাজার হয়েছে, হাতীও নাকি পঁচিশ-য়ের উপরে উঠেছে

আমি উৎসাহ নিয়ে বলি হ্যাঁ তো, আমরাও একটা হাতীর পাল দেখেছি। আচ্ছা দাদু, এই দিকেও কি হাতীর পাল আসে? —যান-বাহনের শব্দের জন্য এদিকপানে আর হাতী আসেনা। আগে খেত-খামারে হাতীর দল তাড়াবার জন্য দল বেঁধে পাহারা দিতে হত।

বাঘ অবশ্য এখনও মাঝেমধ্যে বের হয়! এই তো সেদিনই ঘটনাটা ঘটে গেছে। ডিমাগুড়িয়ার মহব্বর হাতীটা রাস্তার ধারে পুকুরের পাড়ে বাঁধা ছিল। হাতীটা খুব শান্তশিষ্ট ছিল, পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করতো। তা সেদিন দুপুরে হাতীটা শুয়েছিল। আচমকাই একটা বাঘ এসে ওর একটা দাপনা কামড়ে নিয়ে গেল। কোন ফাঁকে সে বাঘটা এসেছিল কেউ বুঝতেই পারে নাই।

—আহারে আমরা দুজনেই আর্তনাদ করে উঠি। বৃদ্ধ এবারে আয়েস করে হাতীর গল্প করতে আরম্ভ করল —জানেন তো···হাতী অন্তর্যামী জন্তু। ইতিহাসে অনেকগুলো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ নাকি হাতীর জন্য বেধেছিল। মহারাজ লক্ষ্মী সিং-এর আমলে বৈষ্ণবভক্তদের বিদ্রোহ একটা হাতীর জন্যই হয়েছিল।

—সত্যি? মাত্র একটা হাতীর জন্য?

—হ্যাঁ, একটা চেরেলা-হাতীর জন্য। মা-জননী, আপনারা তো রাজা লক্ষ্মী সিং-এর কথা পড়েছেন, তিনি বেশী-বয়সে রাজত্ব পেয়েছিলেন। কীর্তিচন্দ্র বড়বরুয়ার সঙ্গে তার খুব দহরম-মহরম ছিল। আমাদের দেশের রাজ-রাজড়াদের মধ্যে লক্ষ্মী সিংহ আর গৌরীকান্ত সিংহ দেখতে কুশ্রী ছিলেন। গৌরীকান্ত সিংহ তো আফিং-এর নেশায় চোখই মেলতে পারতেন না।

—কিন্তু দাদু, হচ্ছিল তো হাতীর কথা।

—হ্যাঁ, হাতীর কথা। তা বড়বরুয়ার সঙ্গে বৈষ্ণব-মহন্তদের মারামারি লেগেই ছিল। এইসব যুদ্ধের বীজ অবশ্য অন্য জায়গায় ছিল। যাহোক বৈষ্ণব-ভক্তরা বড়বরুয়াকে একটা হাতী উপহার দিল। হাতী পৌঁছাতে গিয়েছিল নাহরখোয়াই। কিন্তু বড়বরুয়া রেগে গিয়ে নাহরের কানদুটো কেটে নিল।

বৃদ্ধা আর স্থির থাকতে পারিল না, ফোঁস করে উঠল—কান কাটার গল্পো রহখেন তো, বাতিটা নিয়ে ঘুরে আসেন। মিলিটারীর গুলি খেয়ে না জানি কোথায় পড়ে রয়েছে···

দাদু কিন্তু সে কথায় আদৌ কান দিল না। সে আগের গল্পের জের টেনে বলতে লাগল—সেই অজানেই রংপুরে যাচ্ছিলেন রাজা কীর্তিচন্দ্র।

আর পথের মধ্যে নয় হাজার বর্মীসেনা তাকে বিপাকে ফেলে দিল। এই ঘটনার আসল নায়ক ছিল একটা হাতী

আমরা চা খেতে খেতে বৃদ্ধের গল্প শুনেছিলাম। মাঝখানে রমাকান্ত ড্রাইভারও চটজলদি এক কাপ চা খেয়ে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে গাড়ি ঠিক হতে আরও ঘন্টাদেড়েক লাগবে। রেডিয়েটর খুলে ওয়ার্কশপে নেওয়া হয়েছে।

বৃদ্ধা বললে, মা জননী, আর এক গেলাস করে চা-হই? চা-পাতা, চিনি—সবই আছে।

আমরা দুজনেই সাগ্রহে আরও এককাপ করে চায়ের অর্ডার দিলাম। দাদু ইতিমধ্যে দোতারার তার দুটিকে ঠিক

করে গুছিয়ে নিয়েছে—বন্যার হাত থেকে অতি কষ্টে এই দোতারাটি বাঁচিয়ে রেখেছি। এরকম দোতারা তৈরী করার কারিগর এখন আর পাওয়া যায় না। এটাকে আমি প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি। বৃদ্ধা আবারও ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল—আপনের পায়ে পড়ি, আমি ঘরের সামান দিচ্ছি, আপনে বাতিটা নিয়ে লাইনের ধারটা দেখে আসুন গে। সেখানে কি যে হচ্ছে কে জানে

বৃদ্ধ এবারেও ধমকে উঠল—এাই বুড়ি, চুপ করে থাক। ঘুন্দরের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই ওর কলজে পোড়ে আপনজনরা মরে হেজে শাষ হয়ে গেল, কিন্তু তোর চোপা কিছুতেই গেল না।

বৃদ্ধা অসহায়ভাবে আঁচলে চোখ মুছতে লাগল। চায়ের সসপ্যান-ছাকনী ইত্যাদি নিয়ে দুর্বল পায়ে কোন রকমে বাইরে চলে গেল।

বৃদ্ধ এবারে দোতারার দিকে মনোযোগ দিল। বেড়ার গা থেকে একটা পুরোনো নোংরা গামছা নিয়ে দোতারাটা মুছতে লাগল। বৃদ্ধ এবারে প্রায় আমাদের গা ঘেঁষেই বসে পড়ে বলতে লাগল—আঃ, সেইসব দিনের কত কথাই যে মনে পড়ে। আমার বাপ-দাদারা জোৎস্নারাতে পাটি পেতে বসে ছেলে-বুড়া, মেয়ে-মর্দকে কত কাহিনী শোনাতেন। চাঁদের আলোয় ব্রহ্মপুত্রকে যে কি সুন্দর দেখায়, মা জননী

—কেমন দেখতে লাগে ?

—নদী নয় যেন বুড়ি-দিদিমার একগোছা সাদা চুল বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। শোন, মা জননী, আমার এই বুড়িটা আগে এত ছিট্ ছিটে ছিল না···

সেই গৌরীনাথ সিং-এর আমলে বাসন-কোসন তখনও কিছু আছিল। বুড়ি সেগুলোকে তেঁতুল-মাখিয়ে মেজে-ঘষে ঝকঝকে তকতকে করে রাখতো। তখন সাঁজের বেলায় ঝকমকে চায়ের বাটি মুখে তুললে আরামে বুজে আসতো··· আহা, সেইসব দিন যে কোথায় চলে গেল

গামছাটা পুটলি করে বুকের কাছে চেপে রেখে যেন একটা শক্তিকে চাপা দিতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যই, তার পরেই ঝিগুণ উৎসাহে বলতে লাগল—শুন, মা জননী, গৌরীনাথ সিং-এর কাহিনী আমি যতখানি জানি, এই এলাকার আর কেউ তা জানেনা। আফিং-এর নেশায় রাজামশাই তো চোখই খুলতে পারতেন না··· বলতে বলতে বৃদ্ধ গলা নামিয়ে দুচোখে কৌতুকের ঝিলিক তুলে বলতে লাগল—বুঝলেন না, স্বভাবচরিত্তিও বিশেষ সুবিধার ছিলনা। তারা দিদির ঘরের সামনে পাল্কী মজুদ-ই থাকতো। পাল্কীর রূপোর ঝালর দেখেই সকলে বুঝতে পারতো সেটা কোথা থেকে আসতো। শুনেছি আমাদের ব্রহ্মপুত্রের ধারেও একজন স্ত্রীলোক ছিল। তার কাছেও মহারাজার রূপোর কাজ করা পাল্কী আসতো এখন আর আমার স্মরণশক্তি তেমন কাজ করে না। সব কথা ভাল করে মনে করতে পারিনা।

আমি বলি—তাহলে এই সেই রাজা যিনি আফিংখোর ছিলেন, কিন্তু মুগোলেটা খেতে খুব ভালবাসতেন

বৃদ্ধ হো হো করে হেসে উঠলেন - কিন্তু মা-জননী, গাদাধর-এর মতন গোটা মহিষ খাওয়ার ক্ষমতা এনার ছিলনা।

এবারে যেন ভূমিকম্প হ'ল—ব্যাস্, ব্যাস্, আর কোন কথা নয়, রেললাইনের ধারে যান এখন

বৃদ্ধা চায়ের গেলাস আমাদের হাতে তুলে দিতে দিতে চীৎকার করে কথাগুলো বলল।

বৃদ্ধ কিন্তু তার কথায় একটুও কান দিলনা, বরং তড়বড় করে দোতারাটা হাতে তুলে নিল। কাঁচের গামছা-খানা দিয়ে সেটাকে মুছতে মুছতে বলল চোখে ভাল দেখবার পাই না··· বাতি নিয়া কি দেখতে পান। সেদিন রেল

লাইনের ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। এখনও বুকে ব্যথা করে। মা জননী, আমাদের অবস্থা এমনটি ছিলনা। বছরের পর বছর বানভাসিতে এখন আমরা আশ্রয়হীন মানুষ। শেষ-মেষ এই রাজপথে এসে কোনরকমে মাথাগুঁজে রয়েছি।

স্বপ্নের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি। কিন্তু একদিন আমাদেরও সবকিছু ছিল। অতিথিকে জহা-চাউলের ভাতের সঙ্গে পুকুরের কৈ-মাছের ঝাল দিয়ে খাওয়াতাম। আমরা বড়বনুয়ার বংশের মানুষ। গুরুতর অপরাধীকে বাঁশচাপা দিয়ে জলে ফেলে প্রাণদণ্ড দিবার রাজকীয় অধিকার আমাদের ছিল। আমার পিতামহ অবশ্য দরার সাদের ছিলেন। ঠাকুমার রুপোর কাজকরা পানের বাটটা এখনও চিহ্নস্বরূপ হয়ে গেছে। দিনমান হলে দেখিয়ে নিয়ে আসতাম। কারুকার্য-করা আসল, রুপোর কাজ করা পানের বাট। ঢাকা রুমাল—কোথায় সব হারিয়ে গেল। সোনার-বরণ মাধুরী ধান জন্মাতো যে জমিতে—সবই চলে গেছে জলের তলায়।

বৃদ্ধা এবারেও গর্জে উঠল—রাখেন, রাখেন খুঁড়ে খুঁড়ে পচা-মড়া তোলেন ক্যান? এবারে আমিই ভাহলে বনের ধারে যাই···

বৃদ্ধও সমান তালে জবাব দিল—চুপ কর দেখি. জেগেও কতোবার এমুন উড়া-খবর পাওয়া গেছিল। আজ আমার দোকানে এমন সমকদার খদ্দের এসেছে

বৃদ্ধ এবারে কোনদিকে না তাকিয়ে দোতারার তারে হাত রাখলো। লণ্ঠনের আলোতে বৃদ্ধের মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল। নাকটা টিকালো, দাঁত না থাকায় গালটা একেবারেই বসে গেছে। চোখের নীচে মাকড়সার জালের মত অজস্র বলিরেখা। গাত্রবর্ণ গাঢ় কালো বলে বাতির আলোতে সবই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কপালে আড়াআড়ি ভাবে অঙ্কিত রেখাগুলো কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? চিন্তা? জিজ্ঞাসা? দুঃখ আর? আর কি?

অত্যন্ত সুললিত সুরে বৃদ্ধ পদ্মাপ্রিয়ার গীত গাইতে লাগল:

পুত্র-পতি-ধন সবই অকারণ
যেন জলবিম্ব হাসে।
এই আছে, এই নাই, সবই হবে ছাই
সকলি কাল-গরাসে।
জীবন-যৌবন সবই অকারণ
যেন স্বপনের নিধি

শুধুই কি পদ্মাপ্রিয়া? দাদু আমাদের গোপালদেব শ্রীলকের-রাজ-প্রভুর গীতও গেয়ে শোনাল। আমাদের হাতে আর সময় নাই। কিন্তু বৃদ্ধও নাছোড়বান্দা,—বলে—এমন সমকদার খদ্দের আবার কবে পাব যে আশ মিটিয়ে গান শোনা···

আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বৃদ্ধের মধুর সুরের গীত শুনলাম। অবশ্য মাঝে মধ্যে-ই বৃদ্ধার বাধাদানে কিছুটা রসহানি ঘটল। এরপর দিদিমা একেবারেই রুদ্রচণ্ডী মূর্তি ধরে বলল—এাই বুড়া, কানে কথা যে ঢোকেই না··· এই মাত্তর একজনে বলে গেল যে তারে লাইনের ধারে দেখা গেছে·· আমার হয়েছে যত জ্বালা মিলিটারীর গুলিতে ছেলেটার প্রাণটা গেলেও বুড়ার হুশ ফিরবোনা দেখছি।

আমি এবারে হঠাৎ-ই উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—মনে হয় এতক্ষণে আমাদের গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে এখন আমরা গাড়ির কাছে যাই···

এতক্ষণ যেন আমরা এক অপার্থিব জগতে ছিলাম বৃদ্ধের সুললিত গীত আমাদের সেখানে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আর সেই সঙ্গীত-এর সুরে এত মধুময় যে মনে হচ্ছিল ফোটা ফোটা ফুলের মধু আমাদের জিভে ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল। আমরা যেন বসেছিলাম শিউলিতলার শ্বেতশুভ্র ফুলের আসনে।

মিরাক্কল সাহেব এইবার কোটের পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে বৃদ্ধের সামনে ধরে দিলেন। দাদু যেন আর্তনাদ করে উঠল—আরে নির্মলীর মা চায়ের পয়সাটা হিসাব করে কেটে রাখ, বাকীটা সাহেবরে ফিরায়ে দে। বাবুরা, ব্যাও পয়সা দিচ্ছেন কেন? আমরা বরফাবরণের বানভাসী মানুষ আর আমার এই গান? এই গান গুরু জনের আত্মার প্রতিধ্বনি এর জন্য কোন পয়সাই আমি নিতে পারবোনা, এরজন্য পয়সা দিতে চাইলে আমরা মনে বড় কষ্ট পাব। আপনেরা বোঝেন না কেন? আজকাল কেউ-ই আমাদের কথা বুঝতে চায়না···

বৃদ্ধা কিন্তু লোভাতুর দৃষ্টিতে টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু মুখে সে কোন কথা বলছিল না বা টাকাটা তুলে নেবার চেষ্টাও করছিল না। ঠিক এই সময়ে একটি যুবতী মেয়ে ঘোড়াতে ঘোড়াতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। এবারে বুড়োবুড়ি দুজনেই খেঁকিয়ে উঠল—এই হতচ্ছাড়ী, এখানে কি মতলবে?

সে কিন্তু মুখে একটি কথাও উচ্চারণ করল না। সে লাফাতে লাফাতে আমাদের সামনে দিয়েই পিছন দিকের বাসনমোয়ার জায়গাটার কাছে একটা টুলে গিয়ে বসল।

আমাদের বুঝতে বাকী রইলনা যে এই মেয়েটিই মিলিটারীর সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে পরিবারের মুখে চুণকালি মাখিয়ে দিয়েছে।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউ-ই তার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলনা, নিজের কাজেই ব্যস্ত রইল। বৃদ্ধার চোখ অবশ্য বার বারই নোটগুলোর ওপরে গিয়ে পড়তে লাগল। এতগুলো টাকা একসঙ্গে সে বোধহয় অনেকদিনই দেখতে পায়নি।

এমন সময়ে হঠাৎ-ই যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। সেই বিস্ফোরণে আমরা চারজনই যেন ছিটকে পড়ে গেলাম। ঘরের পাশের অন্ধকার থেকে লাফ দিয়ে একটি বিটকেল মূর্তি ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হল। কিছু বুঝে উঠবার আগেই লণ্ঠনের আলোয় তার বীভৎস চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ ··

লোকটি বয়সে যুবক কিন্তু মুখটা ভয়ঙ্কর। ওষ্ঠের কাছ থেকে আরম্ভ করে একদিকের চোখের খানিকটা পর্যন্ত অস্ত্রের আঘাতে সাংঘাতিকভাবে ক্ষয়। ক্ষত এতটাই গভীর যে মুখটা যেমন কুৎসিত, তেমনই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। আমি ভয়ে উত্তেজনায় বৃদ্ধার হাতখানা চেপে ধরলাম। পরনে একটা বিবর্ণ কালো রং-এর জিনস্, একইরকম বিবর্ণ খাকির জ্যাকেট। মাথার দীর্ঘ কেশরাশি এলোমেলো, থুতনির নীচে লম্বা দাড়ি, আর হাতে সেই জিনিষটা—একটা রিভলবার। লণ্ঠনের আলোতে সেটা চকমক করছে।

হঠাৎই ওর চোখ নির্মলীর ওপর গিয়ে পড়ল। এক লাফে গিয়ে ওর পেটে একটা লাথি মেরে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—শালী, বেশ্যা, ছোকরারা মেরে তোর পা ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু মিলিটারীটারে ধরতে পারে নাই। ধরতে পারলে শালারে কেটে দুই-টুকরা করে ফেলতাম। থু থু···

সে মেয়েটার গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিল।

দিদিমা আকুলি-বিকুলি করে তাকে ধরে আনবার চেষ্টা করতে করতে বলতে লাগল—ও আমার গোপাল, খোকা-বাপ আমার, এট্টা শোন্, শোন দেখি···আমি তো ওনারে লাইনের ধারে যাবার বললাম, বারে বারে বললাম·· আহারে, কি হাল হয়েছে রে··· হায়রে কপাল···

দিদিমা চীৎকার করে বিলাপ আরম্ভ করল।

সোনার গোপাল কিন্তু সেদিকে কোনও রকম ভ্রুক্ষেপ করল না। তার দৃষ্টি লণ্ঠনের আলোতে ঝকঝক করা নোটগুলোর দিকে। বেশ কৌতূহল নিয়ে সেদিকে একটু তাকিয়ে রইল। তার পরেই যেন তার চোখ দুটো শিকারী বাজ পাখীর দৃষ্টি পেয়ে গেল। ছোঁ মেরে নোটগুলো হাতে তুলে নিল।

বৃদ্ধ হা-হা-কার করে উঠল—আরে রাখ, রাখ, ওগুলো অতিথিদের টাকা। ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে··· সেই ভয়ঙ্কর মুখ সেই কথায় কর্ণপাত না করে নিজের মনেই বলে উঠল —চোরাই কারবারীরা দুইটা ইউ এস, কারহিন কেতে চায়। আমার হাতে মাত্র কুড়িটা টাকা কম পড়েছে। তা সে টাকাটা এখানেই পাওয়া গেল···

সে যেমন ঝড়ের মত এসেছিল, ঠিক সেইভাবেই অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল। বৃদ্ধের মুখে একটা হাসির রেখা দেখা দিল। মানুষের হাসি এমন হৃদয়বিদারক হতে পারে একথা আগে আমাদের জানা ছিল না।

গুয়াহাটী পর্যন্ত পৌঁছুতে রাস্তায় মিরাকলর সাহেব আর আমাকে কোন প্রশ্ন করেন নাই।

With Best Compliments from :—

A

WELL

WISHER

গ্রিক কবিতা

পেনিলোপির আশাভঙ্গ

য়ানিস্ রিটসস্

অনুবাদ : বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চুল্লির মৃদু আলোয় তাকে চিনতে পারেনি, এমন নয়,
ভিখিরির শতচ্ছিন্ন পোষাকেও ছদ্মবেশ ঢাকা পড়েনি তার ;
সর্বাঙ্গ জুড়ে স্পষ্ট, পরিচিত সব চিহ্ন ঃ
মালাইচাকিতে কাটা দাগ, পেশীদীপ্তি শরীর
আর সেই চতুর চাউনি।

ভীত, চঞ্চ, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে
একটা অজুহাত খুঁজতে চাইল,
যাতে ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে
একটু দেরি করা যায় ;
তাহলে তার মনের কথাটি ধরা পড়বে না আর।

এই লোকটার জন্যেই তবে কুড়িটা বছর
বৃথা চলে গেল
অপেক্ষায়, স্বপ্নের জাল বুনে ?
রক্তস্নাত, শ্বেতশ্মশ্রু
এই হতভাগা আগন্তুকটার জন্যে ?

একটা আসনে ধপ্ করে বসে পড়ল সে
নিস্পন্দ, বাক্যহীন ;
মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা নিহত পাণিপ্রার্থীদের দিকে
এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল,
যেন তার মরে যাওয়া ইচ্ছেগুলোকেই দেখছে।
বলে উঠল, 'স্বাগতম'—
দূরান্ত থেকে যেন ভেসে এল তার গলা,
যেন বা তা আর কারো কণ্ঠস্বর।

এককোণে পড়ে থাকা ঝুলকালিটি
খাঁচার মতো সিলিঙ-এ ছায়া ফেলেছে ;
সবুজে পাতার ভিতর গাঢ় লাল সুতোর বোনা পাখিরা
চকিতে খসর এবং কালো হয়ে
তার দৃষ্টিসীমার নিষ্প্রভ আকাশে
নিদ্রা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

সংতৃপ্ত ব্যক্তি

বালচন্দ্রন চুল্লিকাড়

অনুবাদ : সুতনুকা সোম

এখানে যে কেউ হতে পারে
জীবন কাউকে শান্তি দেয়নি
আরাম নয়
ভূলও নয়
রাত্রি-দিন
অভয় কোনো মুহূর্ত
কিছুই সে দেয়নি।
কিন্তু এখানে ?
জীবনের প্রতি নিমেষের ভয়ে
জীবনই দিয়েছে ভাড়া।
প্রতি শ্বাসের জন্য দিয়েছে কর
অন্যকে কেউ জানেনা
তাই নিজেকে দিয়েছে বেচে
দুঃখ ও সুখ সয়ে সয়ে
তবে জীবন গিয়েছে পেকে।

তবু,
মানুষকে ভালোবেসে
নিরাশ হয়নি তখনও
ভালোবাসা হয় কিছু লোকের সহায়তায়
জেনেছে বলে খুশি হওয়া
এর বেশি কোনো ইচ্ছে না করার কারণ
আত্মহত্যা করেনি কখনও
হামেশা, বাড়িয়েছে পা আগে
শেষে
হেরে গিয়ে ফের খেলে যাওয়া
ওই দাবাড়ুকে
প্রশ্ন করে সাংবাদিক
"প্রাণ এখনো ভরেনি ?"
উনি বললেন,
"আমি তৃপ্ত ধন্যবাদ"।

ইতিহাস কাঁদছে

যদুবীর রাণা

অনুবাদ : অমলতারণ শিকদার

সত্য, হয়তো তোমার ফাঁকা কথা
সত্য, হয়তো তোমার বলা কথাও
কাল এক বুড়ো ইতিহাসের সঙ্গে আমার দেখা
সেও বলল একই কথা
যা তুমি বলে যাও
সে বলে গেল···আমি শুনে গেলাম ··শুনেই গেলাম
ইতিহাস তার ডায়েরী খুলে বলে যায়—
"দেখ, এই দেশের মানচিত্র যখন আঁকা হয়
তখন তোমার ঠাকুরদা ছিলেন
যখন সীমান্ত তোমার ঠাকুরদাকে আঁকল
আর এক প্রান্ত-রেখায় তোমার বাবাকে—
তখন চাই কি পূর্ণিমার উছলে পড়া আলো
অথবা অমাবস্যার প্রগাঢ় রাত
পৌষমাসের হিহিকরা ঠাণ্ডা
অথবা শ্রাবণ-ভাদ্রের বানডাকা বর্ষা,
তোমার ঠাকুরদা যেখানে দাঁড়িয়ে তলোয়ার দিয়ে
আঁকছিলেন মানচিত্র
তোমার বাবাও, ঠিক সেখানেই বসে তা-ই করছিলেন
—বলতে বলতে থেমে গেল ইতিহাস

দেখলাম, ওর দেহের প'রে
চোখ নুয়ে পড়ছে
আর সে কাঁদছে
বললাম, "ইতিহাস, তোমার চোখে অশ্রু ?"
বলল, "ঠিক আমার চোখে অশ্রুই।
যখন মনে আসে
যাতনার ঘরে যাই, বাছা,
তোমার বাপ-ঠাকুরদার, কথার কদর
কে করছে আজ !
যে হাতে সেদিন আঁকা হয়েছিল স্বাধীন মানচিত্র
সে হাত কেটে ফেলা হয়েছে, বাছা !
যে পায়ে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠেছিল দিগন্ত-দেশ
সেই পা কেটে ফেলা হয়েছে
বেজন্মা, ঘুরে ঘুরে ফেরা আত্মীয়দের
লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে কোথায় !
আর এ-জন্য বাছা—আমার চোখে অশ্রু অবিরল !"

অশ্রুধারা মুছতে মুছতে ইতিহাস রেখে যায় ডায়েরী
আমি শুধু দ্রষ্টা ছাড়া কিছু আর নয় !

ওড়িয়া কবিতা

সেইসব নতুন শব্দ

হরপ্রসাদ দাস

অনুবাদ : বর্ষা ভৌমিক

আমি সেইসব নতুন শব্দের সন্ধানে আছি
সেসব শব্দ হাসেনি অথবা কাঁদেনি
এখন অব্দি

সেইসব শব্দ
যারা ভয়ার্ত নয় অথবা ভয়ে মরে যায়নি
তারা
যারা জন্মাতে মরে যায়নি,
তারা
যারা আদপে পরিচিত নয়
সেইসব প্রাচীন কবির টানে
যা আমাদের দুঃখের কাছে
তাদের সেসব শিক্ষা নেই
জ্যোৎস্না-গ্রেডিশিপের
রুপো বা চাঁদির
নয় খেলো লাফালাফির জন্য

তারা ভান্ডার ভেতর গড়ে,
আর প্রতি ধাক্কায় পূর্ণ হয়

যখন আমি সেসব শব্দ পাই
ফিরিয়ে দিই নৈঃশব্দ্যে, বাহুময়—
ফিরিয়ে দিই গোপন অর্থগুলি

তোমাদের রাত্রিতে
তোমাদের অসুখে
তোমাদের নিস্প্রাহীনতায়
তোমাদের উচ্ছৃঙ্খলতায়
তোমাদের পাপে
তোমাদের গণতন্ত্রে
তোমাদের কা কা স্বরে
তোমাদের স্পন্দনে
তোমাদের গানে
তোমাদের সচেতনায়
তোমাদের অবচেতনায়,
তোমাদের সন্দেহে
তোমাদের পাশবতায়
তোমাদের সুখে
তোমাদের ঐশ্বর্যে
তোমাদের নিঃস্বতায়
ভয় পেওনা, ওসব শব্দ
কখনও আঘাত দেবে না,
খুন করে কেউ কখনও মরবে না

অর্থগুলি, নিরপেক্ষ
কোনো জিভ নেই তাদের
সত্যের কর্ণনায়, শুধু
বিশাল বিস্ফারিত চোখ
সাক্ষী সেই খুনের।

ওয়াল্ট হুইটম্যান

তৃষিত তৃণদল

অনুবাদ। সোমক রায়

প্রস্তরচিত্র

এসো—বলে ডেকে ওঠে আত্মা আমার,
এসো লিখে ফেলি আমার দেহের জন্যে এসব কবিতা
(আমিও আমার দেহ আসলে তো একই)
অথবা মৃত্যুর পরে ফিরে তো আসতেই হবে দশাহীন
অথবা, অনেক, অনেক দিন পরে, অন্যভাবে, অন্য কোনো খানে
কোনো কোনো বন্ধুর মুখে শোনা যায় এই মন্ত্রগুলি,
(ধরণীর ধূলি, মাটি, বৃক্ষ ও বাতাসের, ক্ষুব্ধ তরঙ্গের সাথে মিল রেখে)
প্রীত ও প্রসন্ন হাসি মুখে নিয়ে হয়তো এগিয়ে যাবো আমি,
এসব কবিতাগুলি—যেমন এখন, এই আমি, আছি যে এখানে—
শরীর ও আত্মার গান গেয়ে, কেবলি খোদাই করে যাই
নামটি আমার···

ওয়াল্ট হুইটম্যান

শিলালিপি

আমি গাই শরীরের গান

আমি গাই শরীরের গান, সহজসরল এক পৃথক শরীর,
তবু বলি গণতান্ত্রিক, দলবদ্ধ আমার এ গান।

আপাদমস্তক, দেহতত্ত্বের গান গাই,
মুখ ও মস্তিষ্ক শুধু নয়, আমার এ বাগ্‌দেবীর বিষয়
সম্পূর্ণ শরীর—
পুরুষ ও নারীর কথা, সবই।

বাসনা, রমণীর ধ্বনি, ক্ষমতার ঝঙ্কার বিপুলা জীবন
প্রফুল্ল, পবিত্র নীতির নিচে সংগঠিত স্বাধীন আচার—
আমি গাই আধুনিক মানুষের গান।

১৮৬৭

যখন হারিয়ে যাই নৈঃশব্দ্যে, শব্দহীনতায়

কবিতাগুলির কথা ভেবে ভেবে, আমার কবিতাগুলি, অনেকক্ষণ ভেবে,
যখন হারিয়ে যাই নৈঃশব্দ্যে, শব্দহীনতায়,
সমূহ অবিশ্বাস নিয়ে সম্মুখে আমার জেগে ওঠে
অলীক এক ছায়ামূর্তি, বীভৎস সুন্দর, শক্তিমান,
প্রাচীন দেশের কবিদের মত প্রতিভা নিয়ে,
চোখদুটি তার অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল,
অনেক অমর সঙ্গীতে তার অঙ্গুলি নির্দেশ,
সহসা জাগে সে ভয়াবহ চিৎকারে—
কী গান গাইছো তুমি আজ ?
জানো না কি, অবশিষ্ট কবিকুল জানে শুধু একটি বিষয়—
আর সে বিষয় হল যুদ্ধ, সংগ্রাম, সংগ্রাম নিরন্তর, আর
তার পরিণতি, জন্ম দেয় প্রকৃত যোদ্ধার।

তবে তাই হোক, উত্তর দিই আমি,
আমিও যুদ্ধের গান গাই তবে, তবু ছায়া, অন্য সব যুদ্ধের চেয়ে
দীর্ঘতর, বৃহত্তর এক
পরিণতি যার বিচিত্র পথে যায়, কখনো এগোয়, কখনো পেছোয়,
কখনো বিজয় থমকে থেমেই থাকে,
(সুনিশ্চিত, আমি ভাবি, প্রস্তুতও প্রায় সুনিশ্চিত) যুদ্ধক্ষেত্র
বিপুলা এ পৃথিবী,
জীবন ও মৃত্যুর যুদ্ধে, শরীর ও আত্মার রণে—
দেখ, এসেছি এই আমি, এ যুদ্ধের মস্ত আওড়াই
—আমিও জন্ম দিই সাহসী যোদ্ধার।
১৮৭১

সমুদ্রে, জাহাজের কেবিনে

সমুদ্রে, জাহাজের কেবিনে,
সীমাহীন নীল শুধু সর্বদিকে ক্রমবর্ধমান,
বাতাসের শিস্ আর ঢেউয়ের গান, কিলাল সে স্বেচ্ছাচারী ঢেউ,
অথবা এক সঙ্গহীন পালতোলা নৌকা ভেসে আছে সমুদ্রগভীরে,
বিশ্বাসে আর আনন্দে ভরপুর, শাদা পাল রেখেছে ছড়িয়ে,

সকল দিনের দ্যুতির মধ্যে শূন্যতাকে চিরে চলে যায়,
অথবা আঁধার রাতে অনেক নক্ষত্রের নিচ দিয়ে
যুবা ও বৃদ্ধ নাবিকেরা, পূর্ণ সংযোগে
হঠাৎ পাবে কি খুঁজে এ আমাকে, যে আমি
ছল নয়, ধুলোরই-চূর্ণ স্মৃতিসার।

—এখানে রয়েছে কথকতা, সমুদ্রযাত্রীদের কথকতা,
—এখানে তো ভূমি নেই, শক্ত জমি এখানে পাবে না ;
হয়তো তারপর বলে উঠবে তারা পরস্পর ;
এখানে আকাশ ধনুকের মত বুঁকে আছে খোলামেলা, পায়ের তলায়
টলোমলো ডেক কাঁপছে,
আমরা শুনছি ধ্বনিদের গান, জোয়ার ভাটার অন্তবিহীন গতি,
অদেখা কোনো রহস্যের স্বর, লবণাক্ত পৃথিবীর দুর্বোধ, দুর্বার আভাস—
ভাসমান সে তরল বর্ণমালা, অক্ষরের সারি,
ছিঁড়ে যাচ্ছে ঘড়ির বন্ধন, তার গন্ধ, তার সে বিষণ্ণ ছন্দজাল,
সীমাহীন মানসবীথিকা, সুদূর দিগন্ত নিভু নিভু
এখানে এসব নিয়ে, সমুদ্রের সমস্ত কবিতা।
অতঃপর, থমকে যেও না, গ্রন্থ হে, পূর্ণ করো নিয়তি তোমার,
তুমি নও ভূপৃষ্ঠের অবশিষ্ট স্মৃতি শুধু
নিসঙ্গ নৌকার মত তুমিও শূন্যতা চিরে চলে যাও, কি উদ্দেশ্যে
আমি তা জানি না, বিশ্বাসে পূর্ণ কিনা জানি নাকো তাও ;
যে জাহাজ ভেসে যায়, তার গান, তুমিও তো গাও !
তুমিও তো ভেসে ভেসে যাও ;
নিয়ে যাও আমার এ প্রেম, (প্রিয় নাবিকেরা, এ গ্রন্থের
ভাঁজে ভাঁজে যে প্রেম লুকোনো আছে তোমাদের প্রতি)
দ্রুত পড়ো, পড়ে ফেলো আমার এ বই ! তোমাদের শাদা পালগুলি
ছড়িয়ে দাও স্বেচ্ছাচারী এইসব ঢেউদের পাশে, আমার নৌকায়,
গ্রন্থ আওড়াও, পাল তুলে দাও, অসীম নীলের ওপর দিয়ে
আমার কাছ থেকে প্রত্যেক সমুদ্রের দিকে,
গাও এই গান, সমস্ত নাবিকদের উদ্দেশে, তাদের সব জাহাজগুলির উদ্দেশে।

১৮৭১

মারাঠী গল্প

দীপাবলির শাদামাটা গল্প

দি. বা. মোকাশী

অনুবাদ। মাধুরী সিংহ

ছেলেবেলায় দীপাবলির আগের রাত্রে আমাদের, ছেলেপিলেদের কত যে হুল্লোড় চলত তা আজও বেশ মনে পড়ে। ভোরবেলা উঠতে হবে, ভোরবেলা উঠতে হবে, এইভাবে পরস্পরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে বিছানা পাততাম। কিন্তু সে রাত্রে ঘুম কোথায় যে উবে যেত কে জানে। আমরা সব ভাই-বোনেরা কিছু না কিছু নিয়ে বকবক করেই চলতাম। সেই বকবকানির মধ্যে যেমন গত বছরের দীপাবলির স্মৃতিচারণা থাকত, তেমনি এই বছরের দীপাবলি পালনের পরিকল্পনাও চলত। এই সময়ে অন্যের কথা শোনার চেয়ে নিজের আনন্দের আবেগই বেরিয়ে পড়তে চাইত বলে, আমরা সবাই একসঙ্গে কথা বলে যেতাম। তবে মজা এই যে, এর মধ্যেও আমরা কিন্তু পরস্পরের কথা ভালোভাবেই বুঝতে পারতাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের এই বকবকানিতে বিরক্ত হয়ে মা যেই চেঁচাতেন, আমাদের কথাবার্তা আস্তে আস্তে কমে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম তা বুঝতেই পারতাম না।

তারপর পনেরো বছর কেটে গিয়েছে। আমরা সবাই বড় হয়ে গিয়েছি। আমার মাথায় সংসারের দায়িত্ব এসে পড়েছে। এক বোনের বিয়ে হয়ে, তার দুটি ছেলেমেয়েও হয়ে গিয়েছে। গত দীপাবলিতে সে আমাদের এখানে এসেছিল, তার পনেরো ষোলো বছর বয়সের ভাশুরঝিকে সঙ্গে নিয়ে। তার নাম মন্দাকিনী।

দীপাবলির আগের রাত্রি এসে গেল। আগত অতিথি অভ্যাগতরা, আমার মা আর সব ভাইবোনেরা মজার ঘুমে শুয়েছে। ছেলেবেলায় আমাদের যেমন হুল্লোড় চলত এখন এই ছেলেমেয়েরা সে রকমই চালাচ্ছে। তাদের হুল্লোড়বাজি আমি পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে শুনছি।

আর আমার কেবল এই ছেলেমেয়েদের আড্ডায় যোগ দিতে ইচ্ছে করছে। কেন যে করছে, সেটা আমি ভালো ভাবেই বুঝতে পারছি। এরকম মনে হওয়ার কারণ, দিদির ভাশুরঝি-মন্দাকিনী। আমার বয়স তেইশ চব্বিশ হবে। এই বয়সটাতে কোনো মেয়েকে দেখলেই যেমন একটা অন্য রকমের অনুভূতির সঞ্চার হয়, আমার সেই রকমই হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল, বেশ বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা করে তাকে হাসাই। সেই উত্তেজনায়, একটা স্থূলরসিকতা করে, আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। আমার সম্পর্কে তার কি ধারণা হবে, এই ভেবে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

সেই রাতের গল্পের থেকে মন্দার বিষয়ে যা যা তথ্য পেলাম, সব সংগ্রহ করে রাখলাম। কথার তোড়ে দিদি তার নাম উচ্চারণ করা মাত্র আমার কান খাড়া হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে সে কিছু বললে, তার প্রতিটি শব্দের যে কোনো অর্থ আছে, তা বুঝে নিয়ে এই কথাগুলো মনে মনে বারবার আওড়াচ্ছিলাম।

মন্দা ঘুমিয়েছে কি না, না বোঝা পর্যন্ত সে রাতে আমার ঘুম এল না। মাঝে আমার দিদি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'মন্দা ঘুমোলি না কি?' তার দিক থেকে কোনো সাড়া এল না। সে ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝে, আমারও সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে এসে গেল। হঠাৎ মার আর দিদির কথা নীরস ঠেকল। আমি তখনই ঘুমের আশ্রয় নিলাম।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখন চারিদিক থেকে দীপাবলির ভোরের চিরপরিচিত মিষ্টি আওয়াজ কানে এল। বাসনের ঝনঝনানি চলেছে, গামলার শব্দ হল, হুড়হুড় করে গায়ে জল ঢালার আওয়াজ আসছে। ছেলেমেয়েরা কেমন আনন্দে হাসছে, মজা করছে, হুল্লোড় করছে। শব্দগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, এই হাউই উড়ছে, চটপটি ফাটছে,

এই কেউ পটকা ফাটাল, এই চন্দ্রজ্যোতে ফাটাল। আমাদের আর আশপাশের বাড়িগুলোর বাজির আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি এই সব শুনেছি কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, মন্দা কোথায় ঘোরাঘুরি করছে, সেই দিকেই আমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে। আমি ধীরে ধীরে মন্দার ঘরে উঁকিও মারলাম, কিন্তু সে সেখানে নেই। সে উঠে পড়েছে বুঝেই আমারও শুয়ে থাকতে মন চাইছিল না। কিন্তু আমার আলসে স্বভাবের পরিবর্তন দেখে বাড়ির লোকেরা অবাক হয়ে যাবে, নিজের দুর্বলতা বেরিয়ে পড়বে, এই ভয়ে আমি আবার বিছানায় চলে এলাম। একটু পরে আমার আলসেমি নিয়ে গজগজ করতে করতে দিদি ডাকতে এল। কিন্তু এখনই ভাইফোঁটার যোগাড় করতে হবে মনে করিয়ে দেওয়াতে, তার সুর নরম হয়ে গেল। বছরে এই একটা দিনই বোনের কাছে ভাইরা বেশ মেজাজ দেখাতে পারে, সেটা দেখিয়ে তবেই আমি বিছানা ছাড়লাম।

মুখ টুখ ধুয়ে, চায়ের জন্যে হুকুম জারি করে, চা খাওয়ার পর, পায়ে তেল মাখার জন্যে সম্মানিত ব্যক্তির মতো পিঁড়িতে গিয়ে বসলাম। বাটিতে তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল, আমার দিদি সেটা ভরে আনতে পাশের ঘরে গেল। মন্দা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বাড়ির বাচ্চারা স্নান সেরে এক পাশে জামা কাপড় পরছিল। কখন কি বলতে হয় বাচ্চারা তা কি জানে? আমি পিঁড়িতে বসে রয়েছি আর মন্দা পাশে গাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে, তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল।

'মন্দা, দিদি না আসা পর্যন্ত তুমি মামাকে তেল মাখিয়ে দাও না গো।'

ছেলেটির কথা শুনেই মন্দার মুখটা এমন লাল হল! ওই সময়ে সে ঘাড়টা যে ভাবে বাঁকালো সেটা আমার খুব মিষ্টি লাগল। ছেলেটির দিকে চোখ পাকানোর চেষ্টা করতেই তার প্রতি বেশি করে আমার নজর গেল। আমার তাকিয়ে থাকাটা চোখে পড়তেই আমার দিকে সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে জন্য ঘরে চলে গেল।

দিদি গায়ে তেল মাখিয়ে দেওয়ার পর আমি স্নান করতে গেলাম। স্নান করার সময়ে বাইরে খুব জোরে বাজির আওয়াজ হল। স্নান সেরে আমি দীপাবলির প্রাতরাশের জন্যে এলে, সকলের সামনে আমায় ভাগ্নে বলল।

'মামা, তুমি যখন স্নান করতে গেলে, মন্দাদি কী জোরে কালিপটকার একটা বিরাট মালা ফাটাল।'

ছেলেটি কথাটা সহজভাবেই বলল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মন্দার মুখটা দেখার মতো হল। সে ঝট করে বলল,

'আমি জানিও না যে উনি স্নান করতে গিয়েছেন, আমি এমনই পটকা ফাটাচ্ছিলাম।'

তার সাফাই গাওয়াতে আমার হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু দেখলাম তাতে সে খুবই রেগে যাচ্ছে। আমি বেশ অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম। অনর্থক আমার হাসির ভুল অর্থ করায় খারাপ লাগল।

এইভাবে নানারকম ছোটোখাটো ঘটনা ঘটতে থাকল। সব কিছু আমার মনেও নেই। প্রেমে পড়া মানুষের সচরাচর যেমন অনুভূতি হয় সেই রকমই হয়ে চলেছে। খুব তুচ্ছ ব্যাপারও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে যায়। শুধু হাসা না হাসা, বলা না বলা, এই কথা কিংবা ওই শব্দ, এর মধ্যে পরবর্তী সারা জীবনের পাথেয় রয়েছে, এই মনে করে আমি দুশ্চিন্তিত হলাম, আনন্দিত হলাম, নিরাশ হলাম, আশায় দুলতে লাগলাম।

জলখাবার খাওয়ার সময়ে বাড়ির লোকেরা ইচ্ছে করে, ইয়ার্কি ছেড়ে, আমার সামনের পাতটা খালি রেখে অন্যগুলোতে খাবার বেড়ে দিল। আমার মনটা যে তাকে ঘিরেই রয়েছে, যে ভাবেই হোক সকলে জেনে গিয়েছে। এটা স্বাভাবিক। এছাড়াও দুজন বিবাহযোগ্য তরুণ তরুণী এক জায়গায় থাকলে তাদের উস্কে দেওয়াতে সকলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, এদের সেই দশাই হয়েছে। আমাদের নিয়ে ঠাট্টা চলছিল। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে কথা

বলানোর জন্যে প্রবল চেষ্টা চলেছে। সবার মধ্যে এক উত্তেজনা কাজ করছে। আমার সামনে বসানোর কৌশলটা বুঝতে পেরে মন্দা এক কোণে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত সকলের উত্তেজনা থামলে সে এসে পিঁড়িতে বসল। কিন্তু সেই যে সে ঘাড় নিচু করল, খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাথা তুললই না।

তার এই ব্যবহারে আমার খাবারগুলো বিস্বাদ ঠেকছিল। এরকম ব্যবহার করছে কেন বুঝতে পারছি না। অল্প বয়সের কারণে লজ্জা পাচ্ছে না কি? আমার প্রতি তার অনুরাগ জাগানোর জন্যে সকলে মিলে যা প্রয়াস চালিয়েছে, সেটা কি তার ভালো লাগছে না? এটা মনে হতেই আমার কষ্টও হল, বিরক্তও লাগল। আমি মনে মনে বললাম, আমার সামনে বসতে তার ভালো লাগছে না তো, এরাই বা উতাত্ত করে চলেছে কেন তাকে? আমি একা একাই খেতে বসতাম!

কিন্তু কথাটা মনে হওয়ামাত্র আমার মনটা তাতেই ডুবে গেলাম। এই এক মেয়ে। নিজের অজান্তেই সিদ্ধান্ত করে ফেললাম, একেই বিয়ে করতে হবে।

জলখাবার খাওয়ার পর, একটা দীপাবলি সংখ্যা নিয়ে বসব স্থির করে বারান্দায় এলাম। তক্ষুনি আমার পরিচিত একটি ছেলে আমার সামনে এসে উপস্থিত হল। ছেলেটি আমার চাইতে বছর কয়েকের ছোটো। আমাকে দেখে একটু ম্লান হাসল। আমিও হাসলাম। তারপর, সে কাজের জন্যে এসেছে সেটা শোনার অপেক্ষায় আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিন্তু মিনিট পাঁচেক কেটে গেলেও সে মুখ খুলল না। সে এরকম ব্যবহার কেন করছে বুঝতে না পেরে আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। আমার নজরটা সম্পূর্ণভাবে ঘরের দিকেই ছিল। সে যেমনি আমার এক এক মিনিট নিয়ে নিচ্ছে, তেমনি আমার মনটাও ছটফট করছে। প্রতিটি মুহূর্ত কেটে যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে, মন্দাকে বহু খানেক দেখিনি। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম, কাজল করে ইশারা করলাম, কিন্তু সে সেটা লক্ষ্যই করল না। আমি নিজেই কথাটা তুলব স্থির করে বললাম,

'দীপাবলিতে বেশ আনন্দ করছ, না?'

আমার প্রশ্ন শুনে সে সচেতন হল! সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আমার পাঁচটা টাকা দরকার।'

এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে টাকা চাওয়াতে আমি ভাবাচ্যাকা মেরে গেলাম। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে খুবই লজ্জায় পড়ল। মুখটা কেমন একটা করে সে হড়বড়িয়ে বলে ফেলল,

'দীপাবলিতে অতিথিরা এসেছেন। যথেষ্ট পরিমাণে জিনিসপত্র কিনতে পারছিনা। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক অভাব অনটন তো রয়েইছে, কিন্তু ভাবলাম, কছরকার দিনে অতিথিদের যেন কোনো অসুবিধে না হয়, তাই তোমার কাছে এলাম। কিন্তু তোমার অসুবিধে হলে থাক গে—'

এই বলে সে উঠে পড়তে গেল। তাকে বসিয়ে রেখে আমি ভেতরে গেলাম। ভেতরে যেতে আমার অবস্থাটা যাচাই করে নিলাম। আমার অবস্থা ওর থেকে খুব একটা আলাদা নয়। নিজের খরচই আমার মিটছে না। দীপাবলিতে খরচখরচা করতে গিয়ে যে প্রতি পদেই আমি অসুবিধের পড়ব, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। এর মধ্যে আবার ছেলেটিকে পাঁচটাকা দিলে আমি সে কী আতান্তরে পড়ব, সেটা বেশ পরিষ্কার। তা সত্ত্বেও আমি ভেতরে গিয়ে পাঁচ টাকা এনে তাকে দিলাম। সে টাকাটা নিল, খাবারও খেল, কিন্তু মুখটা এমন বিবর্ণ এবং অসহায় লাগছিল যে আমি তার দিকে তাকাতে পারলাম না। কথা বলতে সে সমানে 'তুমি' 'তুমি' না বলে 'আপনি' 'আপনি' করে যাচ্ছে। এ জন্যে আমার খুব অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। আমার খুবই খারাপ লাগছে! ঘর থেকে হাসির আওয়াজ আসছে। বাচ্চারা হুড়োহুড়ি করছে, কারো অনুকরণ করে দেখাচ্ছে। তাই নিয়ে ঘরসুদ্ধ সবাই হাসিতে ফেটে পড়ছে। তবুও আমার ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমার মনটা কেন ভার হয়ে উঠেছে। পাঁচটা টাকা গেল অথবা আমার অসুবিধে হবে, এ নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু উৎসবের

দিলে পাঁচটা টাকার জন্যে একজন এরকম অনেকক্ষণ থাকছে, প্রসন্নমনে থাকার জন্যে পাঁচটা টাকাও তার জুটছে না, এটা আমার ভালো লাগছিল না। মানুষের সুখ দুঃখ এইভাবে টাকার ওপর নির্ভর করে, এই দেখে আমি বিমর্ষ হয়ে গেলাম। টাকার জন্যে মানুষ যে কত অসহায় হয়ে পড়ে, সেটা আমি চোখের সামনে দেখলাম। আমি বহুক্ষণ ওইভাবেই বাইরে বসে থাকলাম।

ঘরে গিয়েও আমার ম্লান মুখটা আড়াল করতে পারলাম না। দিদি জিজ্ঞেস করল,

'কি হয়েছে রে?'

আমি বললাম, 'কিছু না।'

আমি যে পাঁচটা টাকা নিয়ে গিয়ে দিয়েছি, সেটা একটি ছেলে দেখে ফেলেছে। সে বলল, 'মামা এখন কাকেকে পাঁচটা টাকা দিল।'

দিদি জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

আমাকে বলতেই হল, আমার এক বন্ধু এসেছিল। সে পাঁচটা টাকার জন্যে অসুবিধেয় পড়েছে, টাকাটা জোগাড় করতে মুখটা কী অসহায় হয়ে গিয়েছিল, সব কিছু বললাম। আমার কথা শেষ হতেই মন্দা আচমকা বলে উঠল,

'সরল মনের মানুষের প্রায়শই এরকম হয়।'

মন্দার কথা শুনে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। সরল স্বভাবের বলে সে আমার নিন্দে করল না প্রশংসা করল সেটা আমার বোধগম্য হল না

দুপুরে খেলা আমরা তাস খেলতে বসলাম। তখন আবার সেই খাওয়ার সময়কার দৃশ্য হল। বাড়ির লোকেরা মন্দাকে আমার সামনে বসাল। জোরজবরদস্তি করেই সে কোনোমতে বসল। দুতিন দান দেওয়ার পর খেলাটা বেশ জমে উঠেছে, ঠিক সেই সময়েই মন্দা আলস্যমোড়া ভেঙে, হাই তুলে, বিরক্ত লাগছে, ঘুম পাচ্ছে ইত্যাদি কি সব বলে, খেলা ছেড়ে উঠে পড়ল। সবাই তাকে সাধাসাধি করল কিন্তু সে শুনল না। তার জেদ দেখে একজন বলল, 'সেটা না, উঠতে দাও ওকে।'

কথাটা শোনামাত্র মন্দা তার জেদটা বজায় রাখল। উঠে এক কোণে গিয়ে বই পড়তে শুরু করল। সে খেলা ছেড়ে উঠে যাওয়াতে আমারও খেলা থেকে মন চলে গেল। আগে থেকেই আমার একঘেঁয়ে লাগছিল। মনে হয় মন্দার জন্যেই আমি খেলতে বসেছিলাম। কিন্তু সে চলে যাওয়ামাত্র আমি উঠতে পারলাম না। আমার উঠে যাওয়াটা সবার চোখে পড়বে বলে আমাকে বসে থাকতে হল। কিন্তু আমি খেলায় এত ভুল করতে শুরু করলাম যে একজন রেগে তাস ফেলে দিয়ে বলল, 'বাস, এরও খেলার মন নেই।'

একজন খোঁচা দিল, 'কি করে থাকবে?'

খোঁচাটা খেয়ে আমি মন্দার দিকে তাকালাম। বই-এর মধ্যে সে ঘাড়টা আরও গুঁজে দিল। তারপর উঠে অন্য ঘরে চলে গেল।

'মন্দা খেলা ছেড়ে যাওয়াতে, অন্যদের মতো আমার রাগ হয়নি। আমি মনে মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করতে শুরু করলাম যে সে এরকম ব্যবহার করছে কেন? আমাকে কি তার ভালো লাগছে না? এটা বারবার আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রেমে বিভোর হয়ে থাকায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার মনের ছিল না। বোধ হচ্ছিল, আমার জন্যে সবকিছু মাটি হল। আমি এখানে থাকায় সে-ও স্বচ্ছন্দ বোধ করছে না। আমার জন্যে তার অসুবিধে হচ্ছে ভেবে নিজেকে বারবার ধিক্কার দিচ্ছিলাম। স্থির করলাম, এর পর আর হঠাৎ মন্দার সামনে যাবই না। এ প্রতিজ্ঞা একাধিকবার করা সত্ত্বেও তা বজায় রাখতে পারলাম না। তার গলার স্বর শোনামাত্র আমার পা জোড়া আমাকে

তার সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। আমি ফিরেও তাকাব না—এরকম স্থির করলেও সে আমার সামনে আসামাত্র আমার চোখ দুটো তার দিকে ঘুরে একেবারে আটকে যাবে। কিন্তু ওই সব করলে, তার মুখের অসহায়ভাব দেখলে, তার সামনে আসার জন্যে, তার দিকে তাকানোর জন্যে, আমার অনুতাপ হতে শুরু করে।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা গ্রামটার আলোকসজ্জা দেখতে বেরোলাম। আমাদের মতো সবাই দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়ি বাড়ি নানারকমের চিনালণ্ঠন জ্বলছে। কোনোটা ছয়কোণা, কোনোটা গোল, কোনোটা ঘুড়ির, কোনোটা বিমানের মতো সোজা। কোনাকুনি, খাড়া, তেরচা, গোল, সারি সারি করে সাজানো প্রদীপগুলো জ্বলছে, আর সেটা অপূর্ব দেখাচ্ছে। এক এক সময়ে যেমন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারও আনন্দদায়ক হয়ে যায়, সেই সময়ে আমাদেরও সেই রকমই মনে হচ্ছিল। উড়ন্ত বাজি, শব্দবিহীন বাজি, রকেট কিম্বা সবার ভয় উদ্রেককারি চরকি বাজি—এই সব কিছুতে আমরা বাচ্চাদের মতো আনন্দ পাচ্ছিলাম।

এত আনন্দের মধ্যে কোথায় ঘুম? বাড়িতে ফিরেই আবার আমরা গল্পে মেতে গেলাম। মানুষের মন আনন্দে পূর্ণ করার জন্যই বোধহয় ঈশ্বর গল্পের এই অফুরন্ত ভান্ডার দিয়েছেন আমাদের। সেই জন্যে যত গল্পই যে করুক না কেন, গল্পের ভান্ডার অফুরন্তই থাকে। সে রাত্রিতেও আমাদের গল্প অফুরন্তই ছিল। গল্পের মধ্যে সে বিষয়ই আসুক, সেটা কখন, কিভাবে আসবে, সেটা কেউ-ই বলতে পারে না, আমরাও পারি না। একটা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে আমরা কিভাবে সে ঢুকে যাই, তার রহস্য কারো জানা নেই। আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের বিষয়ে বললাম, পরিচিত জনেদের নিয়ে বললাম, বিভিন্ন বয়স্যজনেদের কথা বললাম, বিভিন্ন জায়গার বিষয়ে বলাবলি করলাম। গল্প করতে করতে মানুষ যেমন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সময় সম্পর্কে হুঁশই থাকে না, আমাদেরও সেই দশা হল। এই সব নিয়ে বলতে বলতে আবার আমরা মগ্ন হয়ে গেলাম।

এই কারণেই সে সময়ে, কখন কিভাবে কে কি ধরণের গল্প করল সেটা মনে করে বলতেই পারব না। যাও বা অল্প-স্বল্প কিছু আমার মনে পড়ে তা হল এই গতবছরে যে আত্মীয়ের বিয়ে হল, তাদের সংসার বিষয়ে বলাবলি করলাম। তারপর খানিকক্ষণ বয়সের প্রসঙ্গ উঠল। কার কত বয়স, কে কবে জন্মেছে? বিয়ে কবে হল? সকলে যেন নিজের চলে যাওয়া বয়সের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। প্রৌঢ়রা বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'আমাদের বিয়ের পনেরো বছর হল। সত্যি নাকি?' আমার চাকরিতে যোগ দেবার ছয় বছর হয়ে গিয়েছে তা তো জানতামই, এই চাকরি আমি বেশিদিন করব না, সেটাও আমি বলেছিলাম কি না তা নিয়ে সংশয় উপস্থিত হল।

অমুকে আমার চেয়ে এত বছরের বড়, অমুকের থেকে আমি এত বছরের ছোটো। আজকে দীপাবলির দিনেই অমুকের জন্মদিন, অমুক তারিখটা ভুলে গিয়েছে, অমুকের জন্মপত্রি নেই—এই সব আলোচনা শুরু হল। একজন অন্যজনের অতীতের কথা জিজ্ঞেস করছে, অন্যজন নিজে নিজেই তার স্মৃতিচারণা করছে, আর বলছে, 'ছোটবেলায় আমি এই রকম ছিলাম না কি?' সকলেরই এরকম মনে হচ্ছে।

তারপর কি করে কে জানে, ভূতপ্রেত নিয়ে আমাদের গল্প শুরু হল। এ ব্যাপারে মৃতদের নিয়ে যে যা শুনেছে, সে ব্যাপারে অল্পবিস্তর রং চড়িয়ে বলে গেল। এক অশিক্ষিত মহিলা কি ভাবে বেদ পাঠ করে, আর একজন মহিলার সন্তানজন্মের সময়ে কি ভাবে তার সতিন বালিশের কাছে এসে বসত, অমুক গাছের চারপাশে ভূত কেমন ঘুরে বেড়ায়, অমুকের কাপড়ে কি রকম অলৌকিক কালো কালো দাগ, অমুকের ভয় হলে মুঠো মুঠো সিঁদুর তৈরি করে কি ভাবে দেখায়, এই সব গল্প হতে হতে আমরা ভূত প্রত্যক্ষ করার গল্প করতে শুরু করলাম। কোনো ভূতের পা উল্টো দেখা গিয়েছে, কোনো ভূত জানোয়ারের রূপ ধরে এসেছিল। কোনো ভূত বিশাল বিশাল হাত বাড়িয়ে ভয় দেখায়। ভূতের

ভয়ের কথা থেকে সাহসের কথা উঠল। আমার দিদি বলল, 'সব মানুষের মনেই ভূতের ভয় থাকে, কেউ প্রকাশ করে না, কেউ করে।'

কথাটা শেষ হতেই মন্দা চিৎকার করে উঠল, এটা বাজে কথা। আমার এতটুকুও ভয় করে না। আমি সব জায়গায় গিয়ে দেখেছি, কোথাও ভূতের দেখা পাইনি। এ সব স্রেফ কল্পনার খেলা।'

তার চ্যালেঞ্জটা মেনে নিয়ে দিদি তাকে আমাদের বাড়ির পেছনের খোলা জায়গাটার ঘুরে আসতে বলল। রাত বারোটা বেজে গিয়েছে, বাড়ির পেছনে কিছুটা খোলা জায়গায় গাছ আর পাতাপুতি রয়েছে। আমাদের সকলের বিশ্বাস, ওখানকার বাঁশ ঝাড়ে ভূত ঘুরে বেড়ায়। অতএব স্থির হল যে, সেই ঝাড়ের কাছে গিয়ে মন্দাকে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে আসতে হবে। বাজিও ধরা হল, ভয় না পেয়ে এটা করে আসতে পারলে, দিদি তাকে একটা জরির পাড় দেওয়া ব্লাউসের কাপড় দেবে।

লাড়িটা কাছা দিয়ে মন্দা বাগানে যাওয়ার জন্যে বেরোল। তার এই একগুঁয়েমিতে আমরা সকলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু নিজের জেদ সে কিছুতেই ছাড়বে না। জেদের ফল ভোগ করুগে যা, বলে সকলে চুপচাপ বসে রইলাম।

মন্দা বার হওয়া মাত্র আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। বাগানে ভূতের ভয় আমার কোনোদিনই নেই। কিন্তু এ মেয়ে ওখানে গিয়ে ভয় পেলে কী হবে, সেটাই আমার আতঙ্ক ছিল। তার পায়ের শব্দ যতদূর পর্যন্ত শোনা যায়, আমি বসে বসে শুনতে থাকলাম।

কিন্তু আমি বসে থাকতেও পারছি না। সে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক খাঁ খাঁ করতে লাগল। এতক্ষণ ঘাম হচ্ছিল না, এবার ঘামতে শুরু করলাম। একটু হাওয়া পাওয়ার জন্যে বারান্দায় যাওয়া দরকার বলে, বিড়বিড় করতে করতে বারান্দায় এলাম। বারান্দার ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসেই হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা এসে গেল। এরকম জেদ করে পেছনের দরজা দিয়ে একাই হন হন করে বেরিয়ে যাওয়ার পেছনে কি মন্দার আর কোনো অভিপ্রায় ছিল না কি? বাইরে যেতে যেতে আমার দিকে কোনো ইঙ্গিতবহ দৃষ্টিতে তাকাল না তো? আমি ওখানে যাব। এটাই তার মনোগত ইচ্ছা নয় তো?

কথাটা মনে হতেই মায়ের ঘরের সবার নজর এড়িয়ে আমি চট করে পাশের জানালা দিয়ে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এবার আর এক কারণে বুক ধুকপুক করতে লাগল। আমার ধারণাটা সীতা, না এটা আমার নিজেরই অনুমান? তবু আমার হাঁটা থামল না। আমি নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম। যদি সে আমার প্রত্যাশায় থাকে, তাহলে আমি ঠিকই করেছি। আমার আসাটা যদি তার অভিপ্রেত হয়, তাহলে আমার কী সৌভাগ্য যে তার পেছন পেছন আসার চিন্তাটা আমার মাথায় এসেছে। এই সব বলতে বলতে আমি এগিয়ে গেলাম! দ্বিতীয় কোনো চিন্তা আমি মাথাতে আসতেই দিলাম না।

প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলোর দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি মন্দা এগিয়ে চলেছে। বেড়া দেওয়া জায়গাটার খানিকটা দিয়ে থামল। প্রদীপটা পাশে রেখে, বাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস হল, সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু তার কাছে না গিয়ে তার পাশ দিয়ে গিয়ে পেছনে দাঁড়ালাম। তার চোখ দুটো চেপে আস্তে ডাকলাম, 'মন্দা'।

আমার হাতের স্পর্শ পাওয়া মাত্র সে অসম্ভব চমকে উঠল। তারপর রুষ্ট হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

'এ কি, আমি কী ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ?'

আমি বললাম, 'বাজি ধরার দরকার কি ছিল ? শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলে তো ?'

সে হেসে বলল, ভূত হলে আমি ভয় পেতাম না।'

আমি খপ করে তার হাত চেপে ধরলাম।

সে - আমার দিকে কটাক্ষপাত করে ঘাড় নিচু করে থাকল। তার এই ভঙ্গিতে আমি পাগল হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে তাকে ডাকলাম তারপর কেবল আমরা দুজনেই হারিয়ে গেলাম। প্রথম আবেগ সামলে নিতে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে একপাশে বসে, কথা বলতে শুরু করলাম। মগ্ন হয়ে কথা বলতে বলতে অনেকটা সময় কেটে গেল। আমরা আমাদের কথায় ডুবে রয়েছি, এদিকে আমাদের পেছনে পায়ের আওয়াজ হল, লণ্ঠনের আলো পড়ল। আমরা ধড়মড় করে দাঁড়ালাম। মন্দার এত দেরি হচ্ছে দেখে, সারা বাড়ির লোকজন তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

সকলে আমাদের এই চৌর্যকর্ম ধরে ফেলাতে আমরা একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম। তার-পর যা ঠাট্টা শুরু হল, তাতে আমি লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলাম। মন্দা তো কেঁদে ভাসাল। তারপর যে ছেলেটি লণ্ঠন হাতে ধরে ছিল তার হাত থেকে লণ্ঠনটা এক হ্যাঁচকায় টেনে নিয়ে বাড়িতে ছুটে পালিয়ে গেল।

আমরা যখন বাড়ি এলাম তখন সে চাদরে মাথা ঢেকে ঘুড়িয়ে পড়েছে। তার এই দশা দেখে সকলে হেসে কুটি কুটি হয়ে গেল। আমি অধিকারবোধে এগিয়ে গিয়ে মুখের ঢাকাটা খুলে দিলাম। লজ্জায় তার মুখখানা লাল টুকটুকে হয়ে গিয়েছে। এটা আমার এত সুন্দর লাগল যে, এরা যদি চারপাশে না থাকত—এটুকুই ভাবতে পারলাম।

অতঃপর এক শুভলগ্নে আমাদের যে বিবাহ হল, সেটাও কি বলে দিতে হবে ?

'দিয়ালীচী সাধী গোষ্টী'—দি. বা. মোকাশীর লেখা গল্পটির মূল মারাঠির থেকে অনুবাদ।

With Best Compliments from :—

M/s. Ghosh · Plastic Works Pvt. Ltd.

S S I Units M F G
L. D. P. P. Tube
Block-A
Shibnagar 2nd Lane
Garden Reach
Kolkata-700024

মেয়েরা কি করে ছেলেদের থেকে আলাদা হয়ে গেল

জে রামোন গেন

অনুবাদ : সৌভম সেনগুপ্ত

গ্লোআরেনা ডিগো তুলতে পাঠিয়ে ছিল ইয়াহ বাবাকে ডিগো মানে স্নানের সময় যা গা মাজতে লাগে। ইয়াহবাবা বেরিয়েছিল ভোরের অনেক আগে কিন্তু মাকপথেই সূর্য তাকে টপকে গেল। আর সে ইয়াহবাবারেল থলে অনেকটা নাইটিঙ্গেলের মতো ভোরে গান গাওয়া একটা পাখি হয়ে গেল। ইয়াহবাবা ডিগো নিয়ে ফিরল না দেখে গ্লোআরেনা ঠিক করল যে এবার সে এই কোকিবাজগ্লোর গুহা থেকে ছুটে যাবে।

তাই ওখানকার সমস্ত মেয়েদের ডেকে সে বলল, 'ভাতারদের ছাড়ো, আমাদের সঙ্গে চল, শুধু কিছু গুইইয়ো নিয়ে নাও। বাচ্চাদের ছাড়ো, আমাদের সঙ্গে চল, শুধু ঝিট নিয়ে যাও। পরে নাহয় এই বাচ্চাদের জন্যই আমরা ফিরে আসবো।'

মেয়েদের নিয়ে নতুন দেশের খোঁজে যাওয়ার সময় গ্লোআরেনা গ্লোনিনের এক করণার ধরে বাচ্চাগুলোকে ফেলে গেল। বাচ্চাগুলো খিদের চোটে চেঁচিয়ে কাঁদল। দুধের জন্য ওরা ওরা করে কাঁদল। তারপর এক সময় তারা টোনা থলে ছোট ব্যাঙের মতো একরকম জন্তু হয়ে গেল। তাদের ডাক এখনো অনেকটা বাচ্চার কান্নার মতো। আর এভাবেই মেয়েরা ছেলেদের থেকে আলাদা হয়ে গেল।

কেটে পড়ার আগে বাকিদের মতো, আনা সাদ্রোকেও গ্লোআরেনা জোর ট্রীপ দিয়েছিল। যদিও আনা সাদ্রো ছিল তার বোনের বর। এছাড়াও সে গ্লোআরেনার জন্য তাদের নেতার মেয়েছেলেদেরও নিয়ে এসেছিল। গ্লোআরেনা তাকে, 'ওই দ্যাখ বিরাট শামুক,' বলে অন্যমনস্ক করে দেয়, তার পা ধরে সমুদ্রে ফেলে মাগিগুলোকে গাতিনিনিওতে নিয়ে আসে ও তাদের সেখানেই ফেলে যায়। লোনা খাল মাতিনিনিওতে এখনো শুধু মেয়েরাই থাকে। গ্লোআরেনার গ্লোবাতিনোর কথা মনে পড়ে গ্লোনিন দ্বীপে এসে। কারণ টানা সমুদ্রযাত্রার ফলে তখন তার গামছা ঘা। আর তা পরিষ্কার করা ও শুকোনোর একটা আলাদা কামরা তো বটেই সঙ্গে ওই মাগিটাকেও তার দরকার ছিল। গ্লোবাতিনো আলাদা কামরায় রেখে তাকে সারিয়ে তোলে। আর সে গ্লোবাতিনোকে সমুদ্রে ফেলে দেয় কারণ ওর থেকে যা যা মজা নেওয়ার ছিল ততদিনে সে সবই নেয়া হয়ে গেছে।

এরপর সে নিজের নাম বদলে সে আলবোরেল গ্লোআরেনা করে নেয়। গ্লোবাতিনো তাকে গিনি জাতীয় কিছু দিয়েছিল আর দিয়েছিল সিবাস বলে মার্বেলের মতো একরকম জিনিস। সেগুলো অনেকেই হাতে বাঁধত, আবার অনেকে গলায়। আর ওই গিনির মতো জিনিসগুলো ভরে দেয়া হয়েছিল বাচ্চাদের কানে। (লোকে তো তাই বলে যে গিনি জাতীয় ওই জিনিসগুলোর আদি উৎস হল আলবেবোরেল গ্লোআরেনা ও গ্লোবাতিনো।)

গ্লোআরেনার সঙ্গে ছিল তার বাপ হিয়াউয়েনা। তার বাবার দিকের ছেলের (ছেলে হয়েছিল তার বোন মারফত বোন মানে বাবার মেয়ে) নাম ছিউ হিয়াগ্লোইলি গ্লোনিন। যার মানে হিয়াউয়েনার ছেলে। যদিও সকলেই তাকে গ্লোনিন বলেই ডাকত, আর আজও তাই ডাকে।

এসব গল্পো যারা বলত তারা লিখতে জানত না, পড়তেও না। এমনকি তারা যে এগুলো ভাল করে বলতে

পারত এমনও নয়। তাই অনেক ভেবে আমি যা শুরুতে যাওয়া উচিত তা শেষে লিখেছি আর যা শেষে যাওয়া উচিত তা শুরুতে। ওরা যেভাবে বলত আমি সেভাবেই লিখেছি। আমি তা-ই লিখেছি যা আমি ওদের কাছে শুনেছি।

একদিন ছেলেরা যখন কাচাকাচি করতে জলে নেমেছে তখন তেড়ে বৃষ্টি এল। বৃষ্টির সময় মাঝে মাঝেই তাদের মেয়েছেলের ইচ্ছে হত। তখন তারা প্রাণপনে মেয়েদের অন্তত একটা চিহ্ন পেতে চাইত আর কখনই পেত না! সেদিনও তাদের ওরকমই ইচ্ছে হচ্ছিল। আর তখন তারা দেখল গাছের ডালপাতা থেকে কী যেন সব নিচে নেমেছে। পুরোটা জড় হয়ে একটা আদলও তৈরি হয়েছে মানুষের। অবশ্য সেটা যে ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলে তা বোঝার মতো কোনো কিছুই তার গায়ে নেই। ধরতে গেলে সেটা সিলমাছের মতো পিছলে সরে যাচ্ছে। তখন নেতা হুকুম দিল যে আগে দুতিনটে লোক গুলে আসুক এখানে কজনের হাতে কারাকারা কেবল আছে। ওটা একরকমের পাচড়া যাতে হাতের চামড়া খসখসে হয়ে যায়। সেরকম জনা চারেক লোক মিলে ওই পিছল জিনিষটাকে ধরে ফেলল। তারপর অনেক ভেবে ঠিক করা হল যে এটাকে মেয়েছেলে বানানো হবে। তখন ইনারিরি পাখিকে ডাকা হল। অনেকটা কাঠঠোকরার মতো এই পাখিটাকে পুরাকালে ডাকা হত ইনারিরি সাহেববাবুরেল।

ওই যাকে মেয়েছেলে করা হবে তার হাত পা শক্ত করে বেঁধে গাছে ইনারিরিকে ছেড়ে দেয়া হল। আর ওই মালটাও কাঠঠোরই ভেবে ইনারিরি তার অভ্যাসমতো ধারালো ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে শুরু করল সেইখানে, যেখানে মাগিদের আসলি জিনিষটা থাকে। রেড ইণ্ডিয়ানদের, বিশেষ করে তাদের গাওবুড়োদের মতে ওখানে মেয়েদের উৎপত্তি হয়েছিল এভাবেই।

অনুবাদকের কথা

স্পেনীয় সাহিত্যের একেবারে আদিপর্বের লেখক হলেন ফ্রে রামোন পেন। যদিও পণ্ডিতদের অনেকেই তাঁকে লেখক হিসেবে মানতে চান না। কারণ তাঁদের মতে পেনের এই লেখাগুলো স্প্যানিশ লোকরূপের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাছাড়াও তাঁর স্প্যানিশ ছিল বেশ নড়বড়ে। তিনি ওদেশে যান ১১১৪ সালে কলম্বাসের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার সময়। তাঁর কাজ ছিল স্পেনের অধিবাসীদের বিশ্বাস, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে একটি রিপোর্ট বানিয়ে কর্তৃপক্ষকে পাঠানো। কিন্তু সে রিপোর্টটি পাঠানোর আগেই হারিয়ে যায়। তখন কলম্বাস পেনকে তাঁর বাবার জীবনী লিখতে অনুরোধ করেন। যদিও শেষ অবধি সে জীবনীটিও হারিয়ে যায়।

তখনকার অনুবাদটি সাবা আরাভিওর ইংরিজি অনুবাদের অনুবাদ। সাবা তাঁর অনুবাদে পঞ্চদশ শতকের স্পানিশগুলো মনে ভাষাতেই রেখেছেন আর তার মানে খুঁজতে প্রাণান্ত হয়েছে আমার বন্ধুদের।

অনেক খুঁজেও গুইইরোর খারাপ মানেটা আমরা পাইনি। ভাল মানে হল গাছ। যা এখানে কিছুতেই হবে না। হবে লেগার কিছু। হয়ত তাড়ি, কোকোন বা এরো কড়া কিছু। কিন্তু নিশ্চিন্ত নই বলে ওটাকে গুইইরো-ই রাখা হল। কি'ট কিন্তু বাংলা, ইংরিজিতে তাকে মাস্কিজুয়ানা বলা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভাল যে পণ্ডিতরা যাই বলুন না কেন আমরা পেনের গল্পগুলো তার গড়ন ধরন সবই পছন্দ করি। আর শুধু সেই কারণেই এই অনুবাদটা।

হিমাংশী শেলত : 'অন্য এক মানুষ'

অনুবাদ : সীমন্তিনী গুপ্ত

(তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আয়োজিত তৃতীয় ডি. এল এ অনুবাদ কর্মশালায় মিতা মুখার্জী পাঠের সাহায্যে তৃতীয় অনূদিত।)

Post mortem report এসে গিয়েছিল। কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। চ্যাচামেচি ও নিশ্চয় করেছিল, সেজন্য লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, গলা টিপে দিয়েছিল। এতেও শেষ হয়নি বোধহয়, সেই জন্য এলোমেলো আঘাত করেছিল। সাত বছরের মেয়ে, কতটা সময় আর লাগবে? পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো বলেছে, শকু তাদের সঙ্গেই ছিল অনেকক্ষণ। দিনু বলছে, সে সিঁড়ির কাছেই খেলছিল। ঝড়ভ বলল, ও তো মাঠেই ছিল। চম্পক তাকে কাদেরের দোকানের কাছে শকিনার সঙ্গে বসে কুলপ খেতে দেখেছিল। এতগুলো লোক তাকে দ্যাখতে, খেলা করতে, কথা বলতে দেখেছিল। তারপর কখন যে কোথায় চলে গেল, বোঝা গেল না। আস্তাবলের মত এই বড় ঘরটা এমনিতেও বন্ধ থাকত, সে জন্যই বোধহয় সেই ঘরে খোঁজ করার কথা কেউ ভাবেওনি। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সবার মনে এই ভয় ছিল। খোঁজ খবরও সেই ধরনেরই নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে দুর্গন্ধ পেয়ে ঘরটা খোলা হল। মৃতদেহ শনাক্ত করেই সত্তরাম চোখ ফিরিয়ে নিল। তার মনে হল, সে যেন হঠাৎ উন্মাদ হয়ে যাবে। কিন্তু সে রকম কিছুই হল না। ভাঙা মন নিয়ে সবার সঙ্গে সে বাড়ি ফিরে গেল।

"তোমার সঙ্গে কারুর শত্রুতা, ঝগড়া বা সে রকম কিছু হয়েছে, অথবা কারুর গায়ে হাত তোলার বা ধাক্কা দেওয়ার বা টাকা পয়সা নিয়ে কারুর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হওয়ার কথা কিছু মনে পড়ছে?" সত্তরাম হতবাক হয়ে এক দৃষ্টিতে inspector-এর দিকে তাকিয়ে থাকল। ঝগড়া তো হতেই পারে, তাই ব'লে কারুর মরণ নেওয়ার মতন, তাও এরকম ভাবে···সেরকম কিছুই তার মাথায় আসছিল না।

'যেখানে তুমি কাজ কর, সেখানে কিছু ঘটেছিল অথবা আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে কোনো বাদবিবাদ, কোনো ছোটো খাটো ব্যাপার হলেও মনে করার চেষ্টা করো। এ সবের মধ্যে থেকেও কিছু বের হতে পারে।'

Identification parade-এ সত্তরাম সবাইয়ের মুখ খুব মন দিয়ে দেখতে দেখতে গেল, এ নিশ্চয় নয়, ওটাও বোধহয় নয়, ও তো হতেই পারে না দু'একটা ভয়াবহ চেহারার সামনে একটু দাঁড়াবে, সে মনে মনে ঠিক করল, কিন্তু বেশীক্ষণ সেই ইচ্ছে টিকল না। সে রকম ভয়ঙ্কর কোনো লোক পাওয়া গেল না! শকু-র সাথে কেনই বা কেউ এরকম খারাপ কাজ···ছি, ছি, ওকে বললে ও নিজেই না হয় কোনো কমবয়সী সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আসতো। এতবড় বাজার তো আছেই···যেরকম চাইবে সে রকম পাবে, তা বলে শকুর মত একটা ছোট বাচ্চার সাথে···

সত্তরামের অসহ্য চোখ জ্বালা করতে লাগল। কাজ শেষ ক'রে যখন বাড়ি ফিরত সে, উত্তেজিত শকু ঘূর্ণির মত ঘুরপাক খেত শকু, যে কোনো সাধারণ জিনিসেই খুশি হয়ে উঠত···এক-আধটা ঝিনুক, চুড়ি, বা লাল-হলুদ রিবন। ঢোক ঢোক করে জল খেয়ে কলসীটা নিচে নামাল সত্তরাম। "দ্যাখো, যে কোনো একটা সূত্র পাওয়া খুব জরুরী। শকুর কার কার সঙ্গে ভাব ছিল, সেদিন কার সাথে খেলা করছিল শেষ কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এ সব কথা তোমাকে আমাদের ···।" মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সত্তরাম নিজেকে সামলে নিল। ভেতরে ভেতরে কিন্তু সে তখনও

ফোঁপাচ্ছিল।

শঙ্কুর পায়ের ছটফটানি আর ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ আলাদা আলাদা করে বারবার তার চোখের সামনে ভেসে ওঠায়, সত্যরামের ঘুম কবেই উধাও হয়েছে তার চোখ থেকে। পড়া পড়শি আর বাচ্চাগুলোর সঙ্গে নিচে বসেছিল দীননাথ, দু'বার ডাকা সত্ত্বেও সে ওপরে উঠে এলো না। একদম ভোরবেলায় ক্লান্তিতে যখন সত্যরামের চোখ বুজে আসছিল, তখন দীননাথ আস্তে করে পা টিপে টিপে, এলো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে করে মাটিতে বসে পড়ল। সত্যরামের পায়ের ওপর হাত রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেন প্রথম দেখছে। "বাবলু চম্পক আর আড্ডুর সাথে বসেছিলাম। বাকি সবাইও ছিল, অনেকে।" "তাতে কী?" কিছু খাস বাত বলার আছে আন্দাজ করে সত্যরাম বাস্ত হল। দীননাথের বলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল, শুধু ঠোঁটের নড়াটাই দেখা যাচ্ছিল, আর সত্যরাম তাই পড়ার চেষ্টা করছিল।

"এই লোকগুলো বলছিল যে শঙ্কুকে পাটিয়ে দুটো লোক নিয়ে গেছে। বাইরে থেকে এসেছিল, এদিকের কেউ নয়। বাবলু কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল। সে দেখেছে। তার মনে হয়েছিল লোকগুলো বোধহয় শঙ্কুর চেনা। শঙ্কুকে কিছু দেখাতে সে তাদের সঙ্গে চলে গেল। চম্পক সেই সময়ে সেখানেই বসেছিল, ও-ও তাই বলেছে।"

সত্যরামের ঘুম উধাও হল। জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপতে থাকল তার। সে এখনও জানে না লোক দুটো কে, তবুও এই দুজন অনামী, অজানা লোকগুলোর ওপর সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে লাথি, ঘুসি, চড়-থাপ্পড়ে আধমরা করে দিল তাদের। তাতেও হল না। মজবুত হাত দিয়ে তাদের টুঁটি টিপে ধরে, হারামিদের নিশ্বাস বন্ধ করে দিল। তারপর দু'জনের মৃতদেহ দু'দিকে ফেলে হাত ঝেড়ে ফেলল শালা হা কুত্তা···কিড়া আমার মেয়ের সঙ্গে এই করলি হা ··শুয়োর বার সঙ্গে বলব তার সঙ্গে করতে যা ··আক্রোশে বডি দুটোকে দাঁড় করিয়ে চেপে ধরে পাথরের শক্ত উঁচু দেওয়ালে ঠুকে দিল···যা নিয়ে যা···

"এরা কারা? তাড়াতাড়ি বল এই দু'জন কে?"

"একজন যে 'কালো বোতল', সেটা একেবারে পাক্কা। আর বাবলুর কথা থেকে মনে হয়, দ্বিতীয়টা চেন ··নাম তো শুনেছো চেনের?"

বডিটার মাথা ক্রমাগত দেওয়ালে ঠুকতে ঠুকতে সত্যরামের হাত ঢিলে হয়ে এল, হাতের জোর কমে গেল। অবশ হয়ে হাত ছেড়ে এল, যেন জলের স্রোত। অসহায় সত্যরাম এদিক ওদিক তাকালো। রান্না ঘরের দরজার কাছে দময়ন্তী, পুষ্পা, জগু, মাধু আরও অনেকে ভিড় করে উঁকি মারছিল। স্তব্ধ হয়ে, একমনে, দীননাথের নড়তে থাকা ঠোঁট থেকে বেরোনো প্রতোকটা শব্দ ধরতে চেষ্টা করছিল তারা। সত্যরাম ঘামতে শুরু করল, ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হতে লাগল তার। "কী এমন হচ্ছে, যে এখানে সবাই এমনি করে হুমড়ি খেয়ে পড়েছ। তার থেকে চুপচাপ ভেতরে থাকো।" কান্না ভরা অসুস্থ গলা দিয়ে দময়ন্তীর রাগ যেন ফেটে বেরোল। "শুনতে পেলে না? ভেতরে যাও। একটু ভাবতে দাও। মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে···"

"দীন যে দু'জনের নাম বলছে তাদের নাম পুলিশকে···ওরা তো জিজ্ঞেস করছে

"শোনো, বলে কিনা নাম দিয়ে দাও। এরকম ভাবে কারুর নাম দেওয়া যায়? বাবলু কারুর ওপর দোষ তুলতে যে কারুর নাম বলতে পারে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ের প্রাণ যায়। সে বলল, সে দেখেছিল, আর আমি গিয়ে নাম দিয়ে আসব নাকি?"

দীননাথ সত্যরামের কাঁধে হাতের চাপ দিয়ে ওর কানে এমনভাবে কথাটা বলল যাতে আর কেউ শুনতে না পায়।

"খবরটা ঠিকই। শকুকে পটিয়ে পাটিয়ে আস্তাবলের দিকে নিয়ে যেতে অনেকেই দেখেছে। পুলিশ যদি চায় তাহলে সবকিছুই জানা যাবে, তা না হলে ওদের খাতায় আরেকটা লাশের নাম…"

ঘরের কোনায়, দড়িতে, এখনও শকুর ফ্রক ঝুলছিল। কেউ তাতে হাত দেয়নি। দময়ন্তী আর সন্তরাম, দু'জনেরই চোখ একই সঙ্গে ফ্রকটার ওপর পড়ল আর ফ্রকের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল তাদের চোখের জলে।

"আমাদের অভিযোগ দায়ের করা উচিৎ। যারা যারা দেখেছিল তাদের বুঝিয়ে বলা যাক, আমাদের সাহায্য করতে। আজকে শকুর হয়েছে, কাল অন্য কারুর মেয়ের হতে পারে…রোজ খবরের কাগজ পড় না?"

দীননাথ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

"আমি যাবো, আমরা সবাই যাই। কোনো সংস্থা বা কোনো বড় মানুষের সঙ্গে দেখা করি। কিছু তো একটা হবে, খবরের কাগজের লোকেদের বলা যাবে। কিছু না করলে পুলিশ তদন্তী থেকে কিছুই তেমন বেরোবে না। ততদিনে যদি আর পাঁচটা case এসে যায়, তাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর শকু ফোরি তো…ঐ শয়তানদের তো মজাই হবে…"

সন্তরাম রাগে ফেটে পড়ল। ভেতরের জলন্ত লাভা বেরিয়ে এলো।

"তুই চুপ কর, বেশি পাকামি করিস না। শোধ নিতে ওরা যদি তোকেও পাকড়ায় তাহলে মুস্কিল হয়ে যাবে। এরা তো শালা ছুটকো মাওয়ালী। তুই এর মধ্যে আসিস না।"

"কিন্তু হিম্মৎ না থাকলে তো—"

"এই যে হিম্মৎওয়ালী, এটা ভাবিস না যে শকুর যা হয়েছে তা তোর হতে পারে না। ভাবিসটা কী নিজেকে? লেখাপড়া শিখে দিদিমণি হতে পারিস; কিন্তু এই দল যা, যা বোনকেও বরে বেচে আসবে, এ লোকগুলোর ধান্দা জানিস? এক নম্বরের তৈরী মাল। ছুরি-চাকু তো জলচাত। নিজেই নিজের কবর খোঁড়ার কী দরকার? শকু তো গেছেই, এবার তোকে আমাদের…

সন্তরামের গলা ভেঙে এলো। দময়ন্তী কিছু বলতে গেল কিন্তু কান্নির দমকে কিছুই শোনা গেল না।

'এই চমন হচ্ছে যে রাজকমলের সবে…দীননাথ ইঙ্গিতে হ্যাঁ বলল। সন্তরাম নীচের দিকে তাকিয়ে বসে রইল, আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করে মাছি তাড়াতে লাগল। মাস দশেক আগে এই দলটাই ফালতু কারনে একটা লোককে দিন দুপুরে রাস্তায় খতম করে দিয়েছিল। কথাটা সন্তরামের হঠাৎ মনে পড়ে গেল। যদি ও এই ঘটনার সঙ্গে শকুর কোনো সম্পর্ক নেই।

"তুই যা বলছিস তা যদি সত্যি হয়ও, তাও একটু সাবধানে…

দীননাথ জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল। এই জানলা দিয়ে শকুকে কতবারই হাসতে খেলতে দেখেছে। তারপর নিজের রোমশ প্যাটেরা শরীরের দিকে তাকাল, হাতটা একেবারেই হাড় জিরজিরে। কোথায় বাবলু চম্পকের মজবুত হাত আর কোথায় ওর প্যাকাটির মতো এই হাত…ও তো বরাবর এ'রকমই রয়ে গেল।

"খবরের কাগজ থেকে লোক আসছে, তাকে বলা যায়। খবরের কাগজে বেরোলে পুলিশের ওপর চাপ আসবে। সব কথা পরিস্কার করে না বলতে পারলেও কিছুটা তো আভাস দেওয়া যাবে…"

"আমি সব বলে দেবো…শকুকে মেরে ফেলল, এরকম বিশ্রী অবস্থা করে দিল, সেটা কি চাপা দেওয়া উচিৎ? যাও যাও, আমি সেখান থাকব, দেখো…" পুষ্পা চেঁচিয়ে উঠল।

"আস্তে বল। বেশি চ্যাঁচাস না। চাউর করার কোনো দরকার আছে? যা করবার করিস, এখন তো চুপ

কর্। তোকে পরে বাড়ি থেকে বেরোতে হবে, সেকথাটা মনে রাখিস।"

এ মাসেই শঙ্কুর জন্য একটা দামি ফ্রক নিয়ে আসার কথা পুষ্পীর। আর যখন শঙ্কুকে পাওয়া গেল, তার সমস্ত জামাকাপড়ই লাল।

"পুষ্পী ঠিকই বলছে। কাউকে ছাড়া উচিৎ নয়। আমি দাঁড়াব পুষ্পীর পাশে। আমার ছোট্ট ফোটো মেয়েটাকে···" পুষ্পী দমযন্তীকে জড়িয়ে ধরল। সন্তরাম মুখ ঘুরে উঠল।

আবার আরেকটা সকাল : কোনো কিছুরই বদল হয়নি, সে রকম একটা দিন। লোকজনের সে রকমই যাওয়া আসা ; শুধু পাউরুটিওলা ঠ্যালা নিয়ে আসলে হাতের মুঠোয় পয়সা ধরে সিঁড়ি দিয়ে হুড়বড়িয়ে দৌড়ে আসা শঙ্কু আর নেই।

ভাঙা কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে এত লোকজন কখনও আসেনি। জিজ্ঞাসাবাদ করতে এত লোক এসেছিল যে সন্তরামের ঘরে পা ফেলার জায়গা ছিল না। সন্তরাম দাড়ি কামাবারও সময় পায়নি। সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর ফোলা ফোলা চোখ নিয়েই ছবি তোলা হল, তার, আর বাড়ির বাকি সবাইয়ের। শঙ্কুর ছবি চাইল। পুষ্পী বলে গেল, ওর পেও না, চমনের বাবাকেও না। যা বলবার, যে রকম ভাবে বলতে চাও, বলে দিও সবকিছু। এরা কেউ পুলিশ নয়।

"আপনি এমন কাউকে সন্দেহ করেন যে এই জঘন্য কাজটা করেছে বা করিয়েছে ?"

"সন্দেহ তো হবেই সাহেব, আমরাও তো মানুষ, না হয় ছোট মাপের, তবে আমাদের সাত বছরের মেয়ের ওপরে, সাহেব আপনি তো জানেনই, যেরকম জুলুম···সন্দেহ তো হবেই কারুর ওপর·

"এ ব্যাপারে কারুর নাম কি দেওয়া হয়েছে পুলিশকে ?"

"না দেখে কার নাম দেওয়া যায় ? আর যদি জানাই থাকত, তাহলে কি এটা হতে দিতাম ? আমাদের মেয়ে তো জ্যান্তনা ছিল না সাব·· "

"আইন ঠিক তার নিজের কাজটা করবে। আপনাদের সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ যদি কোনো কাজ না করে থাকে—এরকম কিছু ঘটেছে কিনা সেটাই জানতে চাইছিলাম ·মানে আপনারা যদি কারুর নাম দিয়ে থাকেন তাহলে···"

"দেখুন দুপুরবেলা ঘটেছে, এতবড় বস্তী, কেউ না কেউ তো নিশ্চয় দেখেছে। একজন নয়, তার বেশীই দেখেছে। বুঝতেই পারছেন, খবরটা···"

মনে হল ঘরের দরজায় দেওয়ালের ওপর চাপটা বেড়ে গেল। ঘরে একটুও হাওয়া ঢুকছিল না। নিশ্বাস নিতে ছটফট করছিল শঙ্কু—সন্তরামের কপাল মুছতে মুছতে হাত ভিজে গেল। অচেনা মুখগুলো ওর চারদিকে ভিড় করে ছিল। তার চোখ চাইছিল এদের এড়িয়ে যেতে। ও দমদমদের দিকে তাকালো আর সে তার দৃষ্টি এড়িয়ে জানলার বাইরে। ভেতর থেকে রেগে মেগে বেরিয়ে এল পুষ্পী। মুখটা খুলেছিল, আর তক্ষুণি—

"নালিশ করে বা কারুর নাম বলে কী, হবে সাব ? আমাদের শঙ্কু তো চলেই গেছে, ফিরে তো আর আসবে না। আমাদেরই কপাল খারাপ : মিছিমিছি বিবাদ করে আমরা যাব কোথায় ? সেই তো বসে বসে কাঁদতেই হবে। নাম বলে কী-ই বা আর পাব ? কার দায় পড়েছে শাস্তি পেতে, নাম জানিয়ে নিজের জীবনটা হারাম করতে শত্রুতা করে রক্তপাত করতে কার··আমরা তো ছোট মাপের মানুষ, বিবাদ বাড়ানো আমাদের কাজ নয়·· আমাদের কাজ নিয়ে কথা, আমাদের যেমন কপাল···"

উপস্থিত সকলে ঘাড় নাড়ল। একজন পেন বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল ঃ

"আপনি তো খুব উঁচুর মনের পরিচয় দিলেন। এখনকার দিনে খুব কম লোকই এরকম ভাবে। লোকে তো শুধু সন্দেহ করেই অনেক নাম দিয়ে দেয়। বিশেষ করে তাদের শত্রুদের!"

সন্তরাম হাত তুলল ওপরের দিকে।

"তাঁর Court জজবাড়। ওনার কাছে আর কী ফরিয়াদ করব? উনি যা করেন ঠিকই করেন, ন্যায়-বিচারই করেন, কখনও তাড়াতাড়ি, কখনও দেরীতে

একজন ভদ্রমহিলা কথাগুলো লিখে নিলেন।

"আপনার tender মেয়েটাকে নিয়ে যা হয়েছে তা সমাজের পক্ষে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা, সেটা নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন। এরকম জঘন্য কাজ যারা করেছে, তারা ছাড়া পেয়ে ঘুরে বেড়াবে—এটা কি আপনার ঠিক মনে হয়?

"যা ঘটেছে, তা খুবই খারাপ। আমাদের যে কী গেছে, তা তো বুঝতেই পারছেন। তবে আমরা কি একলা? আমাদের সঙ্গে সবাই আছে, সমাজটাই তো এরকম, তো কী আর করব?"

পুষ্পীর মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে যাওয়া হল। ভিড়ের মধ্যে কেউ খেয়াল করল না।

'আজকাল লোকেরা শুধু প্রতিশোধ নিতে কিছুই না করে, বিচার করে, আর look at this man··· ওর চিত্তার ধরণটা দ্যাখো। গোটা ঘটনাটাকেই ও অন্যভাবে বিচার করেছে।"

"অশিক্ষিত লোকেরাও যে এরকম হতে পারে এত গভীর ভাবে বুঝতে পারে, এটা আমাদের এখানেই সম্ভব, তার কারণ আমাদের লোকেরা সবকিছুই philosophically"

"Right, absolutely right" শব্দগুলো সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের ওপর চাপটা ও কমে গেল, প্রাণজুড়োনো তাজা হাওয়া ঘরে ঢুকল, আর সন্তরাম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। দৈত্যর মতন যে পাগুলো তাকে অনেকক্ষণ ধরে তাড়া করছিল, সেগুলো হঠাৎ থেমে গেল। তারপক্ষে আর এগোনো সম্ভব ছিল না। ভয়, হুড়বড়ানি, বিস্ফারিত চোখ, ঘামে জবজবে শরীর, এলোমেলো নিশ্বাস, ছুরি-চাকু, রক্তের ফোয়ারা, আর এসব নয়··· এ সবের থেকে নিষ্কৃতি আর শান্তি।

ওর খুব তেষ্টা পেয়ে ছিল, এখন সেটা মনে পড়ল।

"এই পুষ্পী, একটু জল দেতো " ভেতর থেকে কোনো সাড়া মিলল না।

সন্তরাম আরও জোরে হাক পাড়ল 'পুষ্পী ··জল আনতে বললাম, শুনলি না?"

পুষ্পী, রাগে গন গন চেহারার পুষ্পী, কুঁজোর থেকে জল ভরে বাইরে আসল, কিন্তু তার আগে সে কলতলায় জোরে থুতু ফেলল ছিটকোনোর পরোয়া না করে। আর সাথে সাথেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল কাপুরুষ ঢামনা···"

সন্তরাম কথাটা শুনল, এমনভাবে যেন অন্য একজন মানুষকে বলা হচ্ছে। আর তারপর সে জল খেতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথের কবীর

ইংরেজী থেকে বাংলা

অমিতাভ গুপ্ত

[রবীন্দ্রনাথের ভাবানুবাদিক One Hundred Poems of Kabir '১৯১৪'-এর কিছু অংশ বর্তমান রচনা প্রয়াসে নিবেদিত। একে ঠিক অনুবাদের অনুবাদ বলা চলে না। One Hundred Poems of Kabir-এর সমস্ত পাঠক-ই জানেন একটি অপূর্ব নাম্পনিক অন্তর্বয়ানে কবীর ও রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা হয়েছিল ভাবসাম্মিলিত, তার প্রতিফলন ঘটেছে বাক্‌প্রতিমায়, এমনকী পুনরুক্তগুলেও ; মূল দার্শনিক ভাবনাটি দর্শনশাস্ত্রের নৈয়ায়িককে তুচ্ছ করে প্রেম-সৌন্দর্য-জ্ঞান-অনুভব ও অনুভবাতীত সবকিছুকেই সংশ্লেষিত করেছে মানবপটভূমির চিরায়ত মহাকিন্নরীকায়। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে খড়্গ, নয় তবু অপরাজেয় এই ভাবসম্মিলন।

গ্রন্থটি প্রকাশ করে, অর্থাৎ কবীরের ভাবানুবাদ প্রচার করে, রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় নিজেকে বিপন্ন করে তুলেছিলেন। মানবসংস্কৃতির মধ্যে লীন অন্তর্বয়ানিক সূত্রকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথকে কবীরের নিছক অনুকরণকারী বলে ধিক্কার জানানো হয়েছিল, 'মোহভঙ্গ' ঘটেছিল 'ইয়েটস, পাউন্ড, মনরো প্রভৃতির। ব্যতিক্রমী হুইটম্যান বা খলিল জিব্রান অবশ্য রবীন্দ্রনাথের তথা কবীরের তথা পূর্ণ মানব ঐতিহ্যের সূত্রকে ছিন্ন হতে দিলেন না। আজ যখন বিশে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলাসাহিত্য আলোচক আবু সৈয়দ আইয়ুব "সখের সখ" শব্দবন্ধটির সূত্রে রবীন্দ্রনাথের "পরাণসখা বন্ধু"-র কথা মনে পড়িয়ে দেন তখন স্বেচ্ছাকাল পটভূমির বিশাল বিস্তারে যে মধুর ঈশ্বরের অন্বেষণ চলে আসে, কবীরের রচনা তারই একটি দ্যোতক। এর কোনো ধর্মসীমা নেই।

কেন আমায় খুঁজছ খুঁজে পাশেই আছি তোমার
মন্দিরে নয় মসজিদে নয় কাবারেও নয় কৈলাসে নয়
রীতি বা উৎসবে কিংবা যোগাভ্যাসে ধ্যানে কোথাওই নেই আমি
আমারই সন্ধানে যদি সত্যিকারের—দেখা হবে আমার সঙ্গে
একটি মহাকালের মুহূর্তেই

প্রতিটি নিশ্বাসের কাছে নিশ্বাসে বিলীন যে-ঈশ্বর
বহু প্রতিধ্বনির মতো বাজে সুরের ধ্বনিতে বিশ্ব শাসন করে
স্রোতের আলোর উজান চতুর্দিকে
সীমিত মানুষ শুধু পারাপার করে
লক্ষ লক্ষ বন্দনাঞ্জলি দাঁড়িয়ে
লক্ষ বিন্দু সহজ নম্রশির
লক্ষ ব্রহ্মা কোপাঠ করে শুধু
লক্ষ শিবেরা ধ্যানেই নিমজ্জিত
লক্ষ ইন্দ্র আকাঙ্ক্ষারা করে

উপদেবতা ও দুর্নিরীক্ষ্যের সংখ্যা গণনাতীত
যেখানে কেবল বন্দিত হয় লক্ষ সরস্বতী
বীণায় বীণায় চন্দনে ভুলে আমার প্রেমিক জাগে

জ্যোৎস্না, সূর্যলোক
নক্ষত্রের দ্যুতিটিও উজ্জ্বল
উজ্জ্বলতম শুধু ভালোবাসা, একটি প্রেমের সুর
থামে না এবং গঙ্গার মতো প্রেমিকস্বর কখনো মিলে যায়
মহা আকাশ, মনন যেখানে আলোকের সুরে দীপ্র
সেখানে একটি পবিত্রশ্বেত গান
প্রেমের অভিবাদন
ব'লে মনে হয়, লক্ষ লক্ষ সূর্যতারার অধিক দীপ্তি নিয়ে
অনুরান সেই প্রেমিকের ঘরে এসো

শ্রেষ্ঠ সারথি, এসেছে স্থিরের কাছে জাগো জাগো জেগে ওঠো
তোমার প্রেমোদ্যানের পায়ের স্পর্শে লুটিয়ে পড়ো
কতযুগ গেল নিদ্রাতুরের, এখনও কি জাগবে না
কোন্ পারাপার ? কোথায় বা পথ ? কী তবে পথিকচিহ্ন ?
কোথায় বা গতি, কোথায় বা বিশ্রাম

জলহারা স্রোত, নৌকোটি নেই, মাঝিও নেই কোনো
নৌকো বেঁধে রাখার মতো কাছিও নেই, নেই যে সহায় নৌকোটি বাঁধবার
পৃথিবী নেই আকাশও নেই কালসীমা নেই দেহ বা মন নেই
কোথায় তবে মিটতে পারে হৃদয়পিপাসা
সহ্যের হোক শান্তি তবু
ত্যাগ করে সব কল্পলোকের দায়

প্রতিটি ঘরেই দীপান্বিতা জ্বলে তুমিই অন্ধ দেখতে পাওনা কিছু
হয়তো কখনো মেলবে দু'চোখ, স'রে যাবে সব মৃত্যুর মতো শোক,
ব্যস্ত অথবা শ্রুত কিছু নেই কর্ম'ও নেই যেন
যে রয়েছে বেঁচে সে আসলে মৃত মৃত্যু হবে না তার আর কোনোদিন

গভীর গহন সন্ধ্যার ছায়া, ছায়াভরা প্রেম ঢেকেছে শরীরমন
পশ্চিমদিকে জানালাটি খোলো, হারাও প্রেমের আকাশে

হৃদয় গভীরে ফুটে ওঠা পদ্মের পাপড়ির পরে করানো মধুর মধু
পান করো আর দেহভঙ্গে দেখাও অভিজ্ঞান
শোনো শঙ্খের ধ্বনি

সবার চেয়ে বড়ো আমার বুকভরা এই ভালোবাসা
যা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে বিশ্ব অসীমে
এ যেন সেই পদ্মফুলের প্রাণ পেয়েছে জলে এবং জলেই ফুটে ওঠে
যদিও জল পারে না তার পাপড়িগুলি ছুঁতে
যেহেতু সব জলের নাগাল সেরিয়ে পাবে পদ্মের বিস্তার

সে যখন লুকিয়ে থাকে তখনই সে উন্মোচিত
সে যখন কঠিনকে দেয় জানে আমার সমস্ত অক্ষমা
সে যখন আনন্দদুঃখের ধ্বনির মতন আঘাত ও শুশ্রূষা
আমি তাকে করব সমর্পণ সকল জীবন সকল দেহমন

আমার পথপ্রদর্শকের দয়ায় আমি জেনেছি সব যা কিছু অজ্ঞেয়
জেনেছি যারা পঙ্গু হয়েও হাঁটা অন্ধ হয়েও দেখতে শিখেছি
চন্দ্রবিহীন সূর্যবিহীন রাত্রি বা দিনহারা
একটি দেশে নিয়ে এলাম ধ্যানের ভালোবাসা

নিরুদ্দেশের কাছেই সন্ধি আছে
তুমি আর আমি একাত্ম ব'লে মুদ্রা স্পন্দিত
এসেছে আমার পথের দিশারী
আমার সামনে মানুষে তার নত
এই তো শ্রেষ্ঠ অপূর্ব বিস্ময়

গোরক্ষনাথ লুকিয়েছিলেন কবীর তোমার সাধন কবে শুরু
কেমন ক'রে প্রেম পেয়েছ প্রাণে
কবীর বলে যখন সে তার মহিমাকে লুকিয়ে রেখেছিল
ক্রীড়ায় ও কৌতুকে
যখন আমার ছিল না কোনো শিষ্য-দিশারী
বিকীর্ণ নয় বিশ্ব যখন একাকী তার কাছেই যখন
পূর্ণ সমর্পণ আমার ভালোবাসার
তখন আমার ছিল কেবল তৃষ্ণা অনন্তের, ছিল তারই দেখা পাওয়ার
সহজ ও সুন্দর

একটি পাখি ব্রহ্মচারী, নৃত্যরত জীবন আনন্দের
কেউ জানেনা তার ঠিকানা। চেনেনা তার সুরের মধুরিমা।
কেউ বলে না নেই পাখিটির কথা যে গান করে আমার গভীরে
ভালোবাসার ছায়ায় যেন সেই পাখি লুকোনো
সেই তো বৃক্ষ সে-ই তো বীজাংকুর
ফুলে ফলে সর্বে ছায়ায় আলোয় আলোকিত
ব্রহ্মা যে সে-ই, জীব ও মায়া, অসীম ক্ষেত্রফলের গঠন সে
ধ্বনি ও নিঃশ্বাস এবং অর্থ, সীমা, অসীম তবু অসীম-অতিক্রমী
সীমায় শুদ্ধ, মনন জীবের চেতনা অন্বিত
তীব্রতম চেতনায় প্রতিচ্ছবি তার

মাটির পাত্রে পূর্ণসৃজনশিল্পী
সাতসমুদ্র অগাধ আকাশের
অন্তর এই মাটির পাত্র যেখানে রয়েছে
রত্ন, স্পর্শমণি
পাত্রে রয়েছে চিরন্তনের ধ্বনি
কলার সুরে সে জাগে, কখু শোনো

কীভাবে গোপন কথাটা জানাতে পারি
কীভাবে বলব সে এমন নয় অন্যতরও নয়
মহাবিশ্বের সংকোচ হয় যদি বলি সে-যে রয়েছে আমার কাছে
যদি বলি নেই সে আমার হ'য়ে তাও অসত্য হবে
গভীর-বাহিরহীন দুটি কিন্তুই বিভাজনহীন, এক
তারই বিভাবে মিলেছে মিশেছে চেতন ও অচেতন
গোপন সে নয়, তবু অপ্রকট কখনো ভেবো না তাকে

ফকির, ভালোবাসার আপনজন
ঘুমিয়ে ছিলাম আমার ঘরে, জাগিয়ে দিলে তোমার মধুর স্বরে
যখন আমি মগ্ন ছিলাম বিশ্বপাথারে বাঁচিয়ে দাও তুমি
আমার দুটি নিমজ্জমান হাত ধরেছে তোমার ভালোবাসার হাতে
একটি মাত্র কথাই থাকুক দ্বিতীয় আর নয়
সকল বাঁধন ছিঁড়ে আমার হৃদয় তুমি যত্নে করো তোমার হৃদয়ে

রাত্রিদিনের খেলা আমার কথ্‌সেখার সাথে শঙ্কাপ্রবণ এখন
এমন উর্ধ্বে প্রাসাদ যে-তার বুক কাঁপে ঐ সোপানশ্রেণী দেখে
তবু সকল লজ্জাকে জয় ক'রে গ্রহণ করি তারই ভালোবাসা
আমার হৃদয় প্রেমাস্পদের অনাবরণ মিলনে উৎসুক
আমার দু'টি চোখের কাছে তারই প্রেমের প্রদীপ-উৎসব
কথ্‌, শোনো, সে জানে তার প্রেমিক সর্বত্যাগী

বলো মরাল, পুরোনো সেই গল্প তোমার
কোন্‌দেশে স্বদেশ
কোন্‌ সে, দেশান্তরের কাছে খুঁজছে আশ্রয় এমনকি ওই সকালবেলা
জাগো মরাল জাগো
অনুসরণ করো আমায়, রয়েছে এক দেশ
যেখানে নেই দুঃখশাসন যেখানে নেই মৃত্যুশমনভয়
ফাল্গুনীবন কুসুমিত আকীর্ণ সৌরভে
হৃদয় যেমন আনন্দ তার খোঁজে
তেমনই চলো তুমি

সৃজনকবি কে তোমাকে বাসবে ভালো
নিজের গড়া দেবতাকেই পূজো করে ওরেরা সব
অবতারে আস্থা তাদের কিন্তু অন্তরের
অবতরণ নেই
সৃজনকবি, বাঁচবে তুমি দেখবে যখন
ভালোবাসার রক্তিমাভাটি

নদীর সকল সমস্ত ঢেউ একটি তরঙ্গই
তফাৎ কোথায় নদী আর ঢেউ-এ তবে
ঢেউয়েরা জাগলে তরঙ্গ জেগে ওঠে
তরঙ্গদ্যুতি জলকে স্পর্শ করে
তফাৎ কোথায় তবে
যেহেতু রয়েছে তরঙ্গনাম, হবে না কি তবে জল আর ঢেউ এক

কোনো প্রশ্নের প্রয়োজন নেই প্রেমিকের নেই শ্রেণীজাতি-বিচ্ছেদ
সন্ন্যাসী আর সৈনিক আর সার্থবাহের মতো
ছুটছে শ্রেণী খুঁজে ফেরে সেই পরম প্রেমাস্পদকে

নশহক খুঁজে ফেরে ঈশ্বর গোপনীও খোঁজে, ছুতোরও সন্ধানী
এমনকী রুহিদাসও ছিলেন ঈশ্বর-অনুসন্ধিৎসু
তেমনই ছিলেন কবি শ্বাপচাও, বর্ণবিচারে তুচ্ছ
হিন্দু ও মুসলিম একই ঐশ্বর্যের অসীমে প্রাগ্রসারী

ফুলের বাগানে বেড়োন।
উদ্যানোপম তোমারই দেহ তারই পদ্মের সহস্রদলে
তোমার আসন নাও
চেয়ে দেখো রূপ অসীম অনন্তের
ছিঁড়েছে সূত্র তবু পরিধের আমাকে জড়িয়ে আছে
বাঁধনি বসন তবু পরিধের আমার শরীর ঘিরে
যেমন যখন ত্যাগ করি মোহ, ক্রোধ যে অনির্জিত
যখন ক্রোধকে পরিহার করি দেখি লোভ-অবশেষ
যখন লোভকে দমন করেছি, অহং-অহংকার
বিবৃত্ত মন মায়াকে যখন দূরে সরিয়েছে তখনো জড়িত অক্ষরে অক্ষরে
প্রকৃত পথটি তাই অভিজ্ঞেয়ভ

শরীরভরা জ্যোৎস্না আমার দু'চোখ তবু অন্ধ
চাঁদ কী আমার গভীরে আর সূর্য আমারই

জন্ম যেন পূর্ণ তারও সুর বেজে যায় আমার গভীরেই
শ্রুতির বধির পায় না তাকে তবু
'আমি' 'আমার' গর্বদ্যোতক সমস্ত উদ্যোগ
সমস্ত কাজ ব্যর্থ ও নিষ্ফল
যখন 'আমি'-র এবং 'আমার' উদ্দেশে সব আত্মরতির
মৃত্যু ঘটে তখনই তার সকল প্রেমের কর্মসূচনা
যেহেতু সব সাধনাপথ জ্ঞানের দিকে যাওয়া
পথোত্তীর্ণ, মিটতে পারে হয়তো কাজের দায়
যেভাবে ফুল ফলের জন্যে ফোটে, ফল এলে যে ফুল শুকিয়ে যায়
হরিণরত তৃণের মতো সুব্যর্থ সন্ধানে

বীজাংকুরে বৃক্ষছায়ায় শূন্যের উদ্ভাসে
অস্তহীনকে পেরিয়ে এই অনন্ত সম্ভার সান্ত, প্রসারিত

লেপচা লোক সাহিত্য

মূললেখক : লেসঙগ্ তাম্সাঙ
অনুবাদিকা : বিভূতা ঘোষাল

প্রত্যেক স্বাধীন সুসভ্য জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি, সাহিত্য বর্তমান থাকে। সেটা তার মাতৃভাষার সংস্কৃতি, মাতৃভাষার সাহিত্য, এটাই তার সভ্যতার ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করে।

সিকিম, দার্জিলিং, ইলাম পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মায়েল লাঙ এর প্রতি প্রাচীন অধিবাসী লেপচাদের ও নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ধারা বর্তমান, এরা নিজেদের "মাতানচি রঙ্ কপ রাম কপ" (Matanchi Rong kup Rum kup) অর্থাৎ প্রকৃতি ও ভগবানের স্নেহের সন্তান বলে মনে করেন। লেপচারা সুউচ্চ হিমালয় পর্বতের মতই প্রাচীন ও আদিমতম জাতি। সৃষ্টির সূচনা থেকেই তারা নিজস্ব প্রাচীন ও সমৃদ্ধ, স্বাধীন, দুর্লভ, আকর্ষ ও অত্যাধুনিক ভাষা ও লেখনী দ্বারা সমৃদ্ধশালী।

লেপচা বর্ণ লেখনী, শব্দের গুরুত্ব ও অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য :

1. **ল্যাজঙ (Lazaong) :** লেপচারা তাদের অতিসমৃদ্ধ ময়, প্রাচীন, দুর্লভ ও অত্যাধুনিক 'ল্যাজঙ' নিয়ে ভীষণ গর্বিত, 'ল্যাজঙ' মানে বর্ণপরিচয়, এবং বর্ণের নিয়মাকানুন, এটা একান্তভাবেই লেপচা প্রচীন ভাষার মূল বৈশিষ্টা ও নীতিগুলির উপর নির্ভরশীল, এবং এটা কোনভাবেই পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত ল্যাটিন ব্যাকরণ দ্বারা প্রভাবিত নয়। 'ল্যাজঙ' কে 'শব্দের শক্তি' ও বলা হয়ে থাকে।

ল্যাজঙ এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

(ক) এটা লেপচা প্রাথমিক বর্ণপরিচয়।

(খ) এতে প্রত্যেকটা উচ্চারণ অক্ষর অনুযায়ী ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ, ধ্বনি, সুর, স্বর, এবং একতার উপর এতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এটা একই সাথে বিভিন্ন উচ্চারণ নির্দেশক প্রতীক দ্বারা গঠিত শব্দের বানান প্রণালী।

এটা আবার বর্ণানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত লেপচা গ্রসারি ও লেকসুইকান।

ল্যাজঙ হল লেপচা ভাষার স্বচ্ছন্দগতি সম্পন্ন ছন্দ বিশিষ্ট শক্তিশালী অস্ত্র।

লেপচা মনের ভাব প্রকাশের জন্য আরো ৩৪০টি বিভিন্ন ধ্বনিযুক্ত বর্ণ রয়েছে। এছাড়া আরো প্রায় ৬০০০ শব্দ রয়েছে।

লেপচা ভাষাকে জানতে গেলে ল্যাজঙকে জানতেই হবে।

2. ল্যাথু (Lathyoo) :—

অপর একটি সমৃদ্ধময় সংস্কৃতি সম্পন্ন ও উচ্চমানের লেপচা লিপি-বর্ণ-ও শব্দ হল 'ল্যাথু'। দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনির সংযুক্তি করণ হল ল্যাথু। লেপচা ভাষার ৭টি 'ল্যাথু' আছে।

এই ৭টি ল্যাথু, সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি একটা করে অক্ষরকে উপস্থাপিত করে যা প্রাচীনকাল থেকে লেপচা শব্দের উচ্চারণ ও বানানকে প্রতিস্থাপিত করে। এটা একান্ত ভাবেই বিভিন্ন ধ্বনি নির্দেশক প্রতীকের উপর নির্ভরশীল।

সারা বিশ্বে একমাত্র লেপচাদেরই এই ধরনের সমৃদ্ধময় ল্যাণ্ড অক্ষর রয়েছে।

3. টেলবু থাম্‌বিয়ান অথবা মিঙ টায়ল (Telboo Thaambyn or Ming Tyaol) : লেপচাদের শুধুমাত্র সূচক চিহ্নই যে বর্তমান তা নয়, একই সাথে ওদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ৯টি সাংকেতিক চিহ্ন আছে। এগুলি যখন স্বরবর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তখন ওপরে ও আগে বসে।

4. লেপচা নামকরনের বৈজ্ঞানীক নীতি :—

লেপচা ভাষা হল পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধতম বৈজ্ঞানিক ভাষা, নামকরনের পদ্ধতিও অদ্ভূত, প্রত্যেকটি নাম শুরু হয় নির্দিষ্ট, পৃথক এবং বিশেষ অক্ষরের শব্দ দিয়ে। যেমন, দেব ভূমিতে সমস্ত নদীর নাম শুরু হয় 'it' দিয়ে, বনাপদ, উদ্ভিদ, প্রকৃতির নাম শুরু হয় 'S' দিয়ে এবং মানুষের অথবা পশুর শরীরের সমস্ত ভাল অংশের নামকরণ হয় 'AA' দিয়ে, খারাপ ও ব্যক্তিগত অংশের নাম শুরু হয় 'T' দিয়ে। এই নামকরনের তালিকার শেষ নেই।

5. **শিশুদের জন্য বলা চলিত ভাষা—**

লেপচা পিতা-মাতা অথবা বড়রা শিশুদের জন্যে এই ধরনের চলতি ভাষা ব্যবহার করেন।

লেপচা শিশুদের জন্য ব্যবহৃত শব্দ :

(ক)	মা মাম চি চি হাম (Maa Maam chi chi haam)	eat (খাওয়া)
(খ)	টাটি টাটি লাম ডু লাম ডু (Taate taate Laam do Laam do)	walk (হাঁটা)
(গ)	আজি জি আজি জি (Aaji ji Aaji ji)	prohibition (নিষেধ করা)
(ঘ)	বুনগি বুনগি (Boonge Boonge)	you may fall (তুমি পড়ে যাবে)

6. বিকৃত, ক্ষতিকর, অপমানকর, ব্যঙ্গাত্মক এবং নিষ্ঠুর জাতীয় কোন শব্দ লেপচা ভাষায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

7. আকিপ্ (Aakep) : দ্বিতীয় একটি শব্দের মিশ্রনে একাধিক লেপচা শব্দ গড়ে উঠেছে। হয়তো দ্বিতীয় শব্দটির সাথে প্রথম শব্দের কোন মিল নেই, তবু দুটি শব্দের মিলনে একটি অর্থপূর্ণ নতুন শব্দের উৎপত্তি হয়। একেই বলে লেপচা ভাষার 'আকিপ'। কবিতায়, গানে, ছন্দে এর বহুল ব্যবহার। প্রচার যেমন—

Aago—aanyit	Joy, Happiness
(আগো—আন্যানিট)	(আনন্দ, সুখ)
Vom—dom	Music, Poem
(ভম্—ডাম্)	(সঙ্গীত, কবিতা)
Naam—toom	Year, time
	(বছর, সময়)

8. সঙ্গীত : লেপচাদের বিশেষ উল্লেখিত বিষয় তাদের 'Vom—Dum' বা সঙ্গীত। এ'রা মূলত প্রকৃতি প্রেমিক, ও ধার্মিক, তাই এদের প্রত্যেকটি গান যুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে এবং প্রত্যেকটি নৃত্যের ভঙ্গি ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ১৯৯৬ সালে দিল্লী সঙ্গীত নাটক আকাডেমী লেপচা শিল্পী সোনম্ টেমরি কে সঙ্গীত নাটক আকাডেমী পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে, যা লেপচা নৃত্যগীতের প্রতি এক বিরল সম্মান।

9. **প্রবাদ বাক্য ঃ**

'Ring Taom' বা প্রবাদ বাক্য হল লেপচা ভাষার এক উল্লেখযোগ্য অলঙ্কার। এগুলির উৎপত্তি কর্মজীবন, প্রয়োজনে, স্নেহ, ভালবাসা, রুচী, শর্ত ও নাটকের ভিতর থেকে।

উদাহরণ ঃ—

Kidukma maat tel Rum Mathopne—কোন ক্ষতি নেই,

কোন লাভও নেই।

লেপচা লোকাচার ঃ—

লেপচা লোকাচার গড়ে উঠেছে তথাকথিত গল্প, রীতি নীতি, অভ্যাস, উপকথা, লোকগাথা, প্রবাদ, সঙ্গীত, ছন্দ প্রভৃতির মধ্যে থেকে, এগুলি প্রকাশ পায় চলতি বাক্যে।

লোকাচার মূলতঃ মৌখিক সংস্কৃতি। লেপচা লোকাচার খুবই প্রচলিত। এই সংস্কৃতি শুধুমাত্র বিনোদনের প্রকাশ নয়, শিক্ষারও মাধ্যম।

উপসংহার ঃ—অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাদপদ লেপচারা শহর থেকে বহু দূরে বাস করে, বৈদ্যুতিক আলো বিহীন, এই সভ্যতার রেডিও বিলাসীতা, দূরদর্শনের কোন প্রশ্নই নেই। অধিকাংশ লোকেরই শীতে ব্যবহারের জন্যে উপযুক্ত পোশাকও নেই। তাই শীতের তীব্রতা ভোলাবার জন্য বড়রা বাচ্চাদের গোল করে আগুনের পাশে বসিয়ে শোনায় উৎসাহব্যঞ্জক, বিনোদন মূলক, উদ্ভাবনমূলক, শিক্ষামূলক গল্প। আর এদের মাধ্যমেই জাতির বক্তব্যের মধ্যেও স্বকীয়তা বজায় রেখে চলেছে লেপচা লোকাচার ও গল্প শৈলী ॥

With best Compliments From :

RAMRAJA INDUSTRIAL PRODUCTS

Mailing Address : 31/10 Bhattacharya Para Lane,
Howrah-711 104

Office & Works : Howrah Amta Road, Kabarpara, Bankra
Howrah-711 403

Telephone 627 0068@/653 1986 (W)

গজল

সুরজিত পাতর

অনুবাদ : অনুরাধা মহাপাত্র

কী প্রয়োজন বলো একে স্মৃতি বানানোর
এ গাছ শুষ্ক আর নিতান্ত প্রতিমা হয়ে যাবে

হাসির বহ্নে ওই বিপন্নতা হতে পারে
তখন তোমার পথ নিরাপদ হবে

তোমার সম্ভাবনার বীজে রক্ত দেবে
সমস্ত প্রজন্ম আজ ধ্বংস হবে মাত্রার ভেতর

চাদরের সুতো-ফোঁড়ে তোমার নামের ওই ফুল বুনে যাবে
সে চাদর গায়ে তোমার প্রেমে বিঁধবে না কোনো কাঁটা

একটি খবর আসে সূর্যের উদয়ের পথে
একদিন অস্ত ও উদয়ের ভিন্নতা মিটে যাবে

তবু, এক কাঁটা হৃদয়ে রয়েছে বিঁধে
তোমার শরীর হতেছে কোনো কাঁটার ভরা গাছ

যখন করবে গভীর আত্মার কোনো এক আদালত
তখন আত্মার সাক্ষীতে তুমি ফাঁসীতে ঝুলে যাবে।

নীল আকাশ
সবুজ ঘাস
প্রাণ ভরে নাও নিশ্বাস

পোলিও দিলে ঠিক সময়
এই রোগের থাকবে না ভয়

জল জমতে দেব না
ম্যালেরিয়াও হবে না

খাবো না কাটা ফল
কিংবা পথের রঙ্গীন জল

ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করবো যানে

ময়লা ফেলবো সঠিক স্থানে

আরও, আরও গাছ লাগাবো
সুন্দর, সবুজ শহর বানাবো

কলকাতা পৌরসংস্থা

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

আমাদের স্বাস্থ্য—দেশের সম্পদ

M/s. Pacific Cotspin Ltd.

(100%, EOU, KOLKATA)

কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

M/s. Adi Lokenath Fashion Pvt. Ltd.

211, Bus Stand, Rajarhat

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

অধুনা প্রাপ্তিযোগ্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান প্রকাশনা

Rasvihari Das Philosophical Essay : Ramaprasad Das	150.00
Economic Theory, Trade and Quantitative Economics : Asis Banerjee & Biswajit Chatterjee	200.00
পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা ঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ	৩০০.০০
বাংলার বাউল ঃ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী	৩০.০০
উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র ঃ সুপ্রিয়া সেন ভট্টাচার্য	৯০ ০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী : শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী	১২৯ ০০
বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা : শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	৬০.০০
শব্দ পদাবলী (চয়ন) ঃ শ্রী অমরেন্দ্র নাথ রায়	৭০.০০
ভাষা পাঠ সঙ্কলন : প্রাক স্নাতক ভাষা পাঠ পর্যদ কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন	৪০.০০
বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) : অধ্যাপক শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রী সুকুমার সেন, শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত	৬০.০০
একালের ছোটগল্প সঙ্কলন	৬০,০০
একালের কবিতা সঙ্কলন	৪০,০০
একালের প্রবন্ধ সঙ্কলন	৭০.০০
আধুনিক বাংলা ভাষার অভিধান ঃ ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০ ০০
বাঙ্ময় যোষিনী পত্রিকা ঃ ডঃ ভারতী রায়	১৪০.০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা ঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ	৭৫ ০০
পূর্ববঙ্গের কবিগান ঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ	৯০.০০
ময়মনসিংহ গীতিকা ঃ রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন	৯০ ০০
প্রাচীন কবিওয়ালার গান ঃ ডঃ শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল	১২৫.০০
শ্রী শ্যামামৃতসমুদ্র ঃ ডঃ উমা রায়	১৬০.০০
বাংলা কাব্যে নারীরূপ ঃ কনক মুখোপাধ্যায়	৭৫.০০
A Dictionary of Indian History Sachchidananda Bhattacharyya	250-00
Elements of the Science of Language : Irack Jehangir Sorabji Taraporewala	80·00
A History of Sanskrit Literature S. N. Dasgupta	60.00
Agrarian System of Ancient India : U. N. Ghoshal	15.00
The Science of Sulba B. B. Dutta	40.00
Studies in Indian Antiques : H. C. Roychoudhuri	55 00
Studies of Acounting Thought : G. Sinha	100.00
Reading Keats Today : Prof. Surabhi Banerjee	60.00
Dynamics of the Lower Troposphere : D. K. Sinha, G. K. Sen & M. Chatterjee	150,00
Political History of Ancient India : Hemchandra Roy Choudhury	70.00
The History of Bengal : Narendra Krishna Sinha	200,00
An Enquiry into the Nature & Function of Art : S. K. Nandi	80.00
Romance of Indian Journalism : Jitendranath Basu	75.00
Yoga Philosophy of Patanjali with Bhasvati : Hariharananda Aranya (S 40)	400.00

আরো বিশদ বিবরণের জন্য ঃ

Pradip Kumar Ghosh, Superintendent
Calcutta University Press
48, Hazra Road, Calcutta-700 019
Phone : 475-9466

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

আশুতোষ ভবনের একতলা, কলেজ স্ট্রীট চত্বর

প্যাপিরাস নিবেদিত চিন্তার সাহিত্য

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৪
ফোন : ৫৫৩-৬০৮১

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
আধুনিক ভারতীয় গল্প
প্রথম-পঞ্চম খণ্ড : প্রতিটি ৬০.

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর
কর্ণেলকে কেউ চিঠি লেখে না ৩৫.
সরলা এরেন্দিরা ও তার নিষ্ঠুরা ঠাকুমার
অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী ৬০.
অনুবাদক । মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এ পরবাসে ৩৫.
অনুবাদ : কল্যাণী ঘোষ

এক অসামান্য আত্মজৈবনিক উপন্যাসে
পেটার বিকসেল-এর
গল্পসংগ্রহ ২৫.
অনুবাদ : মাইকেল কাটনার মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বরিস পাস্তেরনাক-এর
ডাক্তার জিভাগো ১৮০.
অনুবাদ : মীনাক্ষী দত্ত ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুস্তাভ ফ্লবেয়ার-এর
মাদাম বোভারি ১৫০.
তিনটি গল্প ২৫.
অনুবাদ : সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়

আলেক্স হেলি-র
শিকড়ের সন্ধানে ৬০.
(The Roots-এর বঙ্গানুবাদ)

মুলক রাজ আনন্দ-এর
সাতটি রৌদ্র ৫০.
অনুবাদ : ঈশানী রায়চৌধুরী

মাইকেল ওয়াইল্ডিং-এর
গ্রেমিকের স্বপ্ন ৭৫.

ইয়ান মিরডাল-এর
এক অবিশ্বস্ত ইউরোপিয়ানের
স্বীকারোক্তি ১০০.
অনুবাদ : রজত রায়

সেহিও রামিরেজ-এর
গল্প সংগ্রহ ৬০.
অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী ঘোষ অনূদিত
এরিখ মারিয়া রেমার্ক-এর
নিস্তব্ধ পশ্চিম রণাঙ্গন ১৫০.
(All Quiet on the
Western Front-র বঙ্গানুবাদ)

সমীর দাশগুপ্ত-র
নির্বাচিত ব্রেখট ৮৫.
(কবিতা ও গান)

শিশিরকুমার দাসের
বহুযুগের ওপার হতে ১৫.
(প্রাচীন গ্রীক কবিতার মূলানুবাদ)

সমীর দাশগুপ্ত রূপায়িত
হাইকু ৫০.
জাপানি অনু-কবিতা

সুমতীন্দ্র নাডিগ-এর
দাম্পত্যের গান ও অন্যান্য ৬০.
অনুবাদ : সুবোধ সরকার ও মাল্লিকা সেনগুপ্ত

শঙ্করী মিত্র অনূদিত
পূর্বদিগন্তের কবিতা ৪০.
সমকালীন তিন চীনা কবির এক ঝলক
(চীনা কবিতার মূলানুবাদ)

With best Compliments of :—

Situation Vacant
For MARKETING & SALES :

Wanted aggressive sales persons (girls & boys) for securing orders for our Brass made classic decoration/gift item named SEVEN SISTERS CUM GOOD LUCK CHARMS. International concept product already being exported world over. Attractive Commission. Contact Shanker Wire Products Industries.

B. Deoghar—814112 Fax 06432 22682

With best Compliments from :—

INDAL

ADITYA BIRLA GROUP

INDIAN ALUMINUM COMPANY, LIMITED

1, MIDDLETON STREET, KOLKATA-700071

Tel : (033) 280 9710, Fax : (033) 240 3964

www. indal. com/www. adityabirla.com

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত আঠাশ বছরের একটি অমল উজ্জ্বলতা।

অনুবাদ পত্রিকা

বার্ষিক ১০০ টাকা দিয়ে চার সংখ্যার গ্রাহক হোন।

পত্রিকা সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনদাতারা এর মাধ্যমে পৌঁছে যান। লেখা পাঠান।

দেশ থেকে দেশের বাইরে।

বিজ্ঞপ্তি : সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে।

GREETINGS OF THE SEASON

'TUV

CERT

EN ISO 9002

Certificate : 041009318

RWTUV

Elevator Cars,Doors and other Components
Enclosures for Electrical and Air Conditioning Industries

Spring Steel Products

Plot No. A/298, Road 16-Z
Wagle Estate, Thane - 400 604.
Tel. : 582 1341/1032 Fax : 582 1032
E. Mail : esespl@bom 7.vsnl.net.in

—অন্তত তারা যারা খ্যাতি প্রতিষ্ঠার মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের মতাদর্শে অটুট অনড় থেকে নিঃশব্দে সাহিত্যকর্ম চালিয়ে যায়. তাদের ঘনিষ্ঠ আন্দোলন যে তরঙ্গ তোলে তা প্রথমে যত ছোট বৃত্তই রচনা করুক মিলিয়ে যাবার আগে তা স্পর্শ করে যায়। এই কারণেই ছোট পত্রিকার কাছে আমাদের প্রত্যাশা থেকেই যায়। বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের অপ্রাচুর্য বিস্ময়কর। বৃহৎ পত্রিকাগুলিতে অনুবাদের স্থান সংকুচিত হয়ে গেছে অনেকদিন থেকেই।
—প্রচার এবং আর্থিক সঙ্গতির অভাবে ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ ঘটাতে না পারলেও দীর্ঘ সময় ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে একটি লিটিল ম্যাগাজিন অনুবাদে আত্মনিবেদিত হয়ে রয়েছে এ খবর অনেকেরই অজানা—এবং আনন্দের কথা এই পত্রিকার নীরব কর্মোদ্যোগ ১৯৮১ সালে 'আনন্দ পুরস্কারে' পুরস্কৃতও হয়েছিল। দেশ

—আশ্চর্য শহর কলকাতা। কলেজ স্ট্রীট পাড়া থেকে নিয়মিত বেরিয়ে যাচ্ছে এই ত্রৈমাসিক (অনুবাদ পত্রিকা)।
—অথচ এক গ্রামে এক ছোট স্কুলের শিক্ষিকার প্রশ্ন ছিল প্রাণ্ডলিক সাহিত্য সম্পর্কে।
তার সুন্দর জবাব এই অনুবাদ পত্রিকা— আনন্দবাজার

—পাঞ্জাবীদের সাহিত্য বাঙালীদের কাছে গ্রীক। বাঙালীদের সাহিত্য তামিলভাষীদের কাছে ল্যাটিন।—
অন্যান্য সাহিত্যে কি আছে সে বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল হব। এমনি করে ভারতের লোক এক সংস্কৃতির অধিকারী হবে। যে সংস্কৃতি আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি।—
আমি আশা করি সরকার এদিকে একটু দৃষ্টি দেবেন। প্রকাশনা যার আজকাল সাধারণের নাগালের বাইরে। এই অনুবাদ পত্রিকাটির আয়ু নির্ভর করছে সরকারী অনুদানের ওপরে।— অজানা পাঠকের রায়

—গুজরাটের সুসাহিত্যিক সুরেশ জোশী 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন—এটাই একমাত্র পত্রিকা যা গুজরাটী সাহিত্যকে বাংলায় অনুবাদ করেছে, এই অনুবাদ পত্রিকা দীর্ঘজীবি হোক।—
সুরেশ জোশী

With best Compliments :

AS IS ENTERPRISE

ASANSOL

অনুবাদ পত্রিকা

ফেব্রুয়ারি—এপ্রিল ২০০৩

তেলেগু ভাষায় 'দিগম্বর' কাব্য আন্দোলনের অন্যতম কবি 'নির্মল'-এর কবিতা / সুরাজ সেনগুপ্ত
কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা মানবেন্দ্র নাথ রায়-এর চিঠি / নিরঞ্জন হালদার, আমেরিকান প্রেস-এর সঙ্গে নোয়াম
চমস্কির সাক্ষাৎকার / সঞ্জীবন সরকার, অসমীয়া গল্প / বাসুদেব দাস, হিমাচলের কবিতা / জ্যোতির্ময়ী দাশ,
সিনথিয়া ক্রুজ-এর কবিতা / ওমর লাহা, ওড়িয়া কবিতা / শ্বেতা গুহ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প
'টেপরেকর্ডার' নন্দী শূর এবং প্রখ্যাত লেখক সিদ্ধেশ-এর গল্প, কাশ্মীরি কবিতা / অনুরাধা মহাপাত্র এবং
সেনেগালের কবিতা / অনঙ্গ দাশ।



ANUBAD PATRIKA :

A BENGALI HINDI QUARTERLY JOURNAL OF TRANSLATION

February-April : 2003

অনুবাদ পত্রিকা

ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল সংখ্যা : ২০০৩

সম্পাদক : বৈশম্পায়ন ঘোষাল
যুগ্ম সম্পাদক : অনুরাধা মহাপাত্র
সহ সম্পাদক : বিতস্তা ঘোষাল

মুখ্য উপদেষ্টা : স্বরাজ সেনগুপ্ত

৫৪ তম নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে (১৯৮১) অভিনন্দিত এবং 'আনন্দপুরস্কার', আন্তর্জাতিক 'মাতা কুসুমকুমারী' পুরস্কারে সম্মানিত।

Editor—Baishampayan Ghoshal
Joint Editor—Anuradha Mahapatra
Asst. Editor—Bitasta Ghoshal

Chief Adviser—Swaraj Sengupta

Registration No. N 27088/75
Anubad Patrika

February-April—2003
Rs. 30·00

'ভাষা সংসদ' এর পক্ষে

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ হিরণ মিত্র

সম্পাদক, প্রকাশক ঃ বৈদ্যনাথন ঘোষাল
ভাষাসংসদ প্রকাশন, ৮নং, নটবর পাল রো, কলকাতা-৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত।
অনুবাদ পত্রিকা, ৩ শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন—২২১৯-২১৭৮ (অফিস), ২৫৫৭-৬৯০, ২৫৪৬-১০০৮
2219-2178 (Office), 2557-6690, (Resi) 2546-1308

অনুবাদ পত্রিকার ২১ বছর হল। 'বয়স বেড়েছে যের নবনারীদের'। অনুবাদ পত্রিকার বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে পেয়েছে যের। সারা পৃথিবীতে বাংলাভাষীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিশ্বে চতুর্থস্থান অধিকার করে আছে বাংলা ভাষা। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভারতীয় সমস্ত ভাষাসহ বিশ্বের সমস্ত ভাষার সঙ্গে হৃদ্যবন্ধন স্থাপিত করছি। অর্থাৎ সারা বিশ্বেরও—এই মূল অনান্য অধ্যায় স্বপ্ন নিয়েই আমাদের এই পৃথিবীতে আসা এবং সাহিত্যে, শিল্পে, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তোলা।

একদা ২১ বছর আগে কয়েকজন পূর্ণে দৃষ্টির, অনন্যমনা, স্বাধীন বাঙালী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নব নক্ষত্রতুল্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষার নব নক্ষত্রতুল্য কতিপয় জ্ঞানযোগী, সৃজনশীল, চিরঅম্লেষবৃ পথিককে নিয়ে 'অনুবাদ পত্রিকার' মতো একটি বিরল অন্যতম প্রয়াস শুরু করেছি। বোধকরি তার পূর্বে বাংলাভাষায় এরকম চিন্তা বিরল। যে কারণে, যে নবপত্রিকার জন্মের কারণে প্রয়াত শ্রী বিরূপদ ভট্টাচার্য, শ্রী স্বরাজ সেনগুপ্ত এবং শ্রী বৈশম্পায়ন ঘোষাল স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবেন।

আমরা আহ্বান করছি বাংলা, ভারত এবং বিশ্বের সমস্ত প্রাক্তন এবং নতুন প্রজন্মকে যাঁরা এগিয়ে আসুন পত্রিকাটিতে তাঁদের অনুবাদ লেখা, অনুবাদ সম্পর্কিত সৃজনশীল এবং মননধর্মী লেখা দিয়ে এবং সংগ্রামরত এই পত্রিকাটিকে বাঁচানোর জন্য তাঁদের অমল-সুন্দর আর্থিক আনুকূল্যের হাত বাড়িয়ে।

আমরা ২০০৩-এর গভীর মানবতাবোধের শপথ নিয়ে শুভেচ্ছা জানাই সমস্ত লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপন দাতা এবং সহৃদয় বন্ধু, সম্মানীয় বন্ধুদের।

সম্পাদক : অনুবাদ পত্রিকা

বাইরে কুরুক্ষেত্র
ঘরে কুরুক্ষেত্র
কুরুক্ষেত্র মনে
কৃষ্ণ কিন্তু বলছেন
অর্জুন তা শোনে

—বৈশম্পায়ন ঘোষাল

With best Compliments of :—

A

WELL

WISHER

মুস্‌লি-উদ্‌-দিন সাদী (১১৮৪ ?—১২৯১)

অনুবাদ : সোমক দাস

[পারস্যের কবি। 'বুস্তান' (ফলের বাগান), 'গুলিস্তান' (গোলাপের বাগান ' এবং 'দিস্তান' নীতি কবিতা সংগ্রহ) গ্রন্থের রচয়িতা। অজানা অনুবাদকের ইংরেজি অনুবাদ থেকে]

অপ্রত্যাশিত পুরস্কার

কাঁটা গাছ পুঁতেছি আমরা। এখন কি খেজুর কুড়োবো ? কর্কশ শলাকে মসৃণ করেছি আমরা। এখন কি তা দিয়ে জরির কিংখাব বানাবো ?

আমাদের পাপকথা লেখা হয়ে গেছে। এখনও মুছে ফেলতে পারিনি সেসব। ঘৃণ্য অপরিপূর্ণতার বিরুদ্ধে আমাদের সুসংবদ্ধ কোনো ভালো কাজ নেই।

আমাদের কামনাবাসনাই আমাদের নিজস্ব ধ্বংস। পুনরুত্থানের দিনগুলির দুঃখকষ্ট মনে পড়ে।

এত মূল্যবান আমাদের জীবন এখন অতীত, আর ফিরবে না ; আর আমরা এখনও পাপে নিমজ্জিত।

এই পৃথিবীতে কেবলই পতিত ও নিমজ্জিত হওয়া কি যে দুর্বল ও অপৌরুষের কাজ, যে পৃথিবীতে ঈশ্বরের দুঃসাহসী মানুষের পা রেখেছে ; কিন্তু নিবাস নির্মাণ করেনি কোনো !

আমাদের যৌবনের দিনগুলি এখন অতীত, তারা যেন একটি রাত্রি ও একটি দিন ; রাত্রি কিগত হয়েছে, দিনও এসে গেছে, কিন্তু আমরা জেগে উঠিনি এখনও।

জীবনের গৃহে পাঁচিলের গর্তে বসে থাকা পাখিটির মত আর কতকাল বেঁচে থাকবো আমরা ! একদিন আমাদের মরদেহের ধুলো পাঁচিলের পাথরে মিশে যাবে।

শেষ বিচারের দিনে এ হবে এক বিস্ময় : আজ কি আমাদের আত্মা অন্যদের আশ্রয় হতে সক্ষম হবে ?

প্রভুর দানশীলতা সেদিন সাহায্য করতে পারে আমাদের, কিন্তু ভেবো না—যে পাপ নরকগামী তা আমাদের স্বর্গের দিকে নিয়ে যাবে।

সন্ন্যাসের প্রসন্ন সকল থেকে হয়তো সৌরাৎ এক কণা শস্য অপ্রত্যাশিতভাবে উপহার দেওয়া হবে আমাদের ; যে শস্যের বীজ আমরা নিজেরা বপন করিনি কখনও।

(৩৫/২৬৫)

With Best Compliments from :—

M/S. General Equipments (India)
100/A, S. N. Banerjee Road
Kolkata-700014

With best Compliments from

M/S. Shefali Motor
15D, D. H. Road (J. K. Nagar)
Kolkata-700008

A WELL WISHER

A WELL WISHER

বেওয়ারিশ লাশ

বশীর অতহর

অনুবাদ : অনুরাধা মহাপাত্র

বেওয়ারিশ এক লাশ দেখি।
অন্ধকার শহরের অন্ধকার ভরা এক কুয়োর ভেতর
এক বেওয়ারিশ লাশ দেখি

বিপন্ন হয়ে বিপন্নতার ভেতর
কঙ্কালহীন—বেকুল
বিকল, অসহায়, দিশেহারা
সময়ের রক্তমাখা রক্তে লটপট
আধো চোখ খোলে—যেন কিছুতো রয়েছে
ঘুরে ঘুরে যেন সব কিছু গেছে
আশে-পাশে কিছু পাখার পালক,
রক্তমাখানো
বেওয়ারিশ এক লাশ দেখি

কুয়োতে আজ মৃত্যুরই নীরবতা
কিছু ঐদিকে পালায়
কিছু, কেউ কেউ এইদিকে
কিছু জানালার ছিদ্রে
কিছু দরোজার দুই পাল্লার জোড়ে
আকাশে কিছু চিল ওড়ে ঘূর্ণায়মান
শকুন নিজের চঞ্চুকে পান করায়
বেওয়ারিশ এক লাশ দেখি।

কুয়োয় শব্দ গভীর ধ্বনিত হলে আমি বলি—
হে খোদা, এখানে আমার কেউ
যে করে সহায়তা
কিন্তু হায়,
মৃত্যুর স্তব্ধতা গভীর হতে থাকে
ধ্বনিত হয় হিরোশিমা, নাগাসাকি
অলস, অধার্মিক কিছু কুকুর
লাশের গভীর নিকটে
মানবমাংস খেয়ে খেয়ে হয় মানুষ
আধখোলা চোখ, নুয়ে পড়া মাথা
আফসোস করে, ধিক্কার—
মৃত্যুর পরে কেউ আছে, অসুরে ?
বেওয়ারিশ এক লাশ দেখি।

এখনো হাতে রয়েছে মেহেদী শেষ
মন এখনোতো ভেজেনি পূর্ণ
যৌবনকালি পূর্ণ খেলেনি
শুধুই গন্ধে ফুটেছে এখনি-এখনি
ঘরে বোন ডাকে বার বার
দরজার পাশে মা, রয়েছে পথ চেয়ে
বুড়ো বাপ তার কোমর কুঁকিয়ে আছে
আমার বাছাটি এখনি আসবে ফিরে
অথবা,
ছোট ছোট মিষ্টি ওই শিশু
নিজের বাবার অপেক্ষায়
বেওয়ারিশ এক লাশ দেখি।

আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকায়
না-জানি কোন্ বোনের সোহাগ লুটায়
না-জানি কোন্ বাপের লাঠি টুটে
জানি না, কেউ সহসা অনাথ হল

এই রাস্তার পরে

গোলাপ রসূল সন্তোষ

অনুবাদ : অন্নরাধা মহাপাত্র

এই রাস্তার পরে
তুমিও থেমে গেলে
আর
আমিও থেমে গেলাম।

চোখে জলসার দগ্ধ বনের আগুন
ভেতরে ধু-ধু জ্বলে ওঠে কোনো আলাপ
কেমন খুলে যাওয়া রক্তপথের
প্রতিটি পা ফেলা
পায়ের নীচে চুর চুর হয় লোহা
জ্বলতে জ্বলতে শরীর হয়ে যায় ছাই
বুকের ভেতর কেমন জ্বলে চিতা
পিপাসার্ত ঠোঁটের কান্নায়
মুখের ভেতর জিভে পাথর হয়ে যায়
এই পথের প'রে

এই পথের প'রে
তুমিও থেমে গেলে
আমিও থেমে গেলাম
এর না কোনো শেষ আছে
না, কেউ এসে পৌঁছয়,
সামনে চলার বেগে চলতে চাইলে পিছিয়ে পড়তে হয়
পেছনে ফিরতে চাইলে সামনের পথ টানে,
যদি এর সঙ্গে চলতে চাই
তো, ক্লান্ত হই
এই পথের পর

এই পথের ওপর
হায়! কত না কমল পা
কে জানে কোথায় হারিয়ে গেছে
হায়! কত না আশা শুকোয়
কত না গভীর পদ্মদীঘি
হায় শুকোয়

আগুনে পুড়ছে
আধফোটা গোলাপ
হায়, চোখও পাথর হয়ে যায়
কেমন বালি
এই পথের পর

এই পথের পর
তুমিও ক্লান্ত হায়
আমিও···
জলহীন সব গাছ
আর

দ্বৈতদ্বন্দ্ব

নিখিল

অনুবাদ : অরাজ সেনগুপ্ত

[তিন দশক আগে ছ'জন তেলেগু তরুণ কবি তাঁদের জন্মগত পরিচয় অর্থাৎ, জাতি-ধর্ম-বর্ণের মিথ্যা আবরণ ছিঁড়ে 'দিগম্বর কবিগোষ্ঠী' ('Naked Poets') নামে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁরা তাঁদের কবিতায় নিরীশ্বরবাদ তথা বিজ্ঞানবাদকেই তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। তাঁদেরই একজন নিখিল রাজু ('রাজু' শব্দে বংশের সংকেত আছে বলে তিনি তা বর্জন করে শুধু নিখিল নামই ব্যবহার করেন)]

যেমন হাতি খুব গভীর গহন বনে হয় স্বাভাবিক
যেমন বনেই তার একমাত্র 'বৃহৎ' শব্দটি মানায়
যেমন ক্ষুধার্ত ওষ্ঠের উষ্ণ অধীর কিনারে অধর ভিড়ানো
নামানো হল প্রকৃত চুম্বন।

আমি হরিণকে লোকালয়ে হরিণ বলি না,
বলি অসহায় কোমল করুণ জন্তু।

যেমন পথ ভুললে পথিক আর পথিক থাকে না,
হয় ক্লান্ত মানুষ।
যেমন ভিক্ষুকের কান্না রাজার কান্নার সাথে কখনো মেলে না
যেমন উৎসবের দিনে 'বিষণ্ণতা' শব্দটিকে মনে হয় একা।
ঘৃণা করতে পারে যেমন কেবল ভালোবাসা।

আমি বকুল বৃক্ষকে বোকা খুনীর ঘরের পাশে
কখনো যেমন আর বকুল বলিনা। বলি তার আচ্ছাদন
তার হত্যার হরিৎ পটভূমি।
যেমন যৌবন আজ যন্ত্রণায় আমার মনন বোঝে, আমাকে খরচ করে
শেষকালে তৃপ্ত হয় আমারই মজায়।

ঈশ্বর, তুমিও কি তাই ? তুমিও কি তাদের মতন ?
আলো জ্বললে তুমি নেই, তাই অন্ধকারে পাথর হয়ে থাকে !

ঈশোপনিষদ্

অনুবাদ : আশিস সিংহ

শান্তিপাঠ

ওঁ উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ, পূর্ণ হতে পূর্ণ জন্মায়,
পূর্ণের পূর্ণ নিলে পূর্ণই অবশিষ্ট রয়।
ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি

জগতে যা গতিমান ঈশের আবাসযোগ্য সবই।
তাহার• ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। লোভ নয়। ধন আবার
কার ?১

কর্ম করতে করতে তোমার শতবর্ষ হোক পরমায়ু।
এছাড়া উপায় নেই। নরে কর্ম আলিপ্ত থাকে না ;২

অসুর্যনামক সেই লোকগুলি অন্ধকার তমসায় ঢাকা।
আত্মহনা জন যারা যায় সেথা প্রয়ানের পর ।৩

অচল সে• এক•, তবু মন হতেও দ্রুত বেগবান,
এই ইন্দ্রিয়েরা কেউ তার• পূর্বে পৌঁছতে পারে না।
স্থির থেকে অন্য যত ধাবমানকে পেরিয়ে সে• যায়।
তারই• মধ্যে হাওয়া করে জলকে ধারণ ।৪

চলে সে•, চলে না সে•, দূরে সে•, নিকটেও সে•ই।
এই সবের অন্তরে সে•, এই সবের বাহিরেও সে•ই ।৫

সর্বভূতকে আত্ম মধ্যে, আত্মকে সর্বভূত মধ্যে
দর্শন করে যে জন কাহাকেও ঘৃণা সে করে না ।৬

যেহেতু সকল ভূত বিজ্ঞানীর আত্মই হয়ে গেল
তাহলে একত্বদর্শীর মোহ কই ? শোকই বা কোথায় ।৭

ছড়িয়ে পড়েন তিনি কায়াহীন ব্রণহীন হয়ে
শিরাহীন শুদ্ধ শুভ্র ; পাপ তাঁকে বিদ্ধিতে পারে না।
কবি ও মনীষী তিনি, পরিভূ স্বয়ম্ভূ তিনিই,
যথা অর্থ বিধান করেন সর্ব যুগে যুগে ।৮

অবিদ্যার উপাসকে অন্ধকার তমসায় ঘেরে,
বিদ্যায় রত যে-ব্যক্তি তার অন্ধকার আরও গাঢ় ।৯

বিদ্যার ফল অন্যই হয়, অবিদ্যার ফলও অন্য
—একথা আমাদের বলে গেছেন ব্যাখ্যাকারী ধীমানগণ ।১০

বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়েই উপাসনা যে করে
অবিদ্যার মৃত্যুকে জিনে বিদ্যা দিয়ে অমৃতে সে পায় ।১১

অসম্ভূতি-উপাসকে অন্ধকার তমসায় ঘেরে।
সম্ভূতিতে রত যে-ব্যক্তি তার অন্ধকার আরও গাঢ় ।১২

সম্ভবের ফল অন্যই হয়, অসম্ভবের ফলও অন্য
—একথা আমাদের বলে গেছেন ব্যাখ্যাকারী ধীমান গণ ।১৩

সম্ভূতি ও বিনাশ এই উভয়েরই উপাসনা যে করে
বিনাশে মৃত্যুকে জিনে সম্ভূতিতে অমৃতে সে পায় ।১৪

সোনার পাত্রটি দিয়ে সত্যমুখ আবরিত আছে,
হে পূষন, খোলো ঢাকা, সত্যধর্মা সে-মুখ দেখুক ।১৫

একর্ষি, পূষন, তুমি যম, সূর্য, প্রজাপতি-সুত,
রশ্মি ফিরিয়ে নাও, সংবরণ কর তব তেজ,
তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাকে আমি দেখি।
তোমাতে যে সেই পুরুষ, সে ত' আমিই ।১৬

এখন অনিলে বায়ু, অমৃতে এ ভস্মশেষ দেহ :
ওঁ যা করতে চেয়েছে এবং যা করেছি সব স্মরণ কর,
স্মরণ কর ।১৭

অগ্নি, তুমি আমাদের সুপথে ঐশ্বর্যে নিয়ে যাও,
সকল বুঝেন তুমি অবগত আছ,
আমাদের থেকে জটিল পাপ তুমি দূরে রাখ।
অসংখ্য প্রণামোক্তি তোমাকে নিবেদন করি ।।১৮

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি

কয়েকটি কৈফিয়ৎ

সকলেই জানেন, প্রত্যেক ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যার ভাষান্তর হয় না। এই অসুবিধাটি বর্তমান অনুবাদ কর্মেও হাজির হয়েছে। সংস্কৃতে লিঙ্গভেদে সর্বনামের রূপভেদ হয়, বাংলায় হয় না। সংস্কৃতে 'যঃ, সঃ, যা, সা, যৎ, তৎ' এই সব সর্বনাম শব্দেরই বাংলা 'যে, সে।' ঈশোপনিষদের কবি ১ম, ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে ঈশ তথা ব্রহ্মকে বোঝাতে ক্লীবলিঙ্গ বাচক সর্বনাম শব্দ ব্যবহার করেছেন, আর ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম শ্লোকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন পুংলিঙ্গবাচক সর্বনাম শব্দ দিয়ে। এই লিঙ্গভেদের যা দার্শনিক তাৎপর্য তাব ভরে তার অপঘাতে চলবে না। তাই, উপায়ন্তর না পেয়ে আমি বাংলায় ঈশ বা ব্রহ্মবোধকে ক্লীববাচক সর্বনাম শব্দগুলিকে তারকাঙ্কিত করে মুশকিল আসান করেছি। অন্য ক্লীববাচক এবং পুংবোচক বাংলা সর্বনাম শব্দ অচিহ্নিত রাখা হয়েছে।

ভাষার বৈশিষ্ট্যগত প্রায় অনুরূপ আর একটি অসুবিধার মুখে পড়েছি ১৩শ শ্লোকে 'সম্ভব' ও 'অসম্ভব' শব্দ দু'টিকে নিয়ে। চেহারায় তৎসম এই দু'টি শব্দের বাংলায় অর্থান্তর ঘটে গেছে। তবু এরা দার্শনিক পরিভাষা বলেই আমি এদের বাংলাতেও রেখে দিয়েছি মূলে সংস্কৃত অর্থেই অর্থাৎ যথাক্রমে সম্ভূত বা প্রকট এবং অসম্ভূত বা অপ্রকট অর্থে, প্রচলিত বাংলা অর্থে নয়।

৮ম শ্লোকটির দার্শনিক অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে, অনুবাদে যার প্রভাব বাড়ছেই। শঙ্কর ভাষ্যমতে শ্লোকটি ব্রহ্ম লক্ষণ বর্ণনা করছে। তিনটি কারনে মতটি মানা যায় না। প্রথমত, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোকের মত এই শ্লোকেও পুংবোচক সর্বনাম শব্দ 'সঃ' ব্যবহৃত হয়েছে 'পর্যগাৎ' ক্রিয়ার কর্তারূপে যা আগেই বলেছি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির দ্যোতক। দ্বিতীয়ত, এই শ্লোকটির ঠিক আগের দু'টি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির লক্ষণ, ব্রহ্মর লক্ষণ বলা হয়েছে তারও আগের দু'টি শ্লোকে। ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণনা করে আবার দু'টি শ্লোক টপকে হঠাৎ ৮ম শ্লোকে ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণনা কবিতা বা যে কোন রচনার রীতিবিরুদ্ধ, কেননা তা বক্তব্যের ধারাবাহিকতাকে খণ্ডন করে। এযাবৎ কোন ভাষ্যকার শঙ্কর ব্যাখ্যাও করেননি। তৃতীয়ত শঙ্করভাষ্য মানতে হলে দেখা যায় এই শ্লোকে ব্রহ্মকে একবার পুংলিঙ্গবাচক সর্বনাম শব্দ দিয়ে এবং পরেই আবার ক্লীববাচক শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এরও কোন সঙ্গত কারণ শঙ্কর ভাষ্যে নেই।

অনুসন্ধানে দেখা গেল, প্রাচীন ভাষ্যকারদের (যেমন, উবটাচার্য এবং মহীধরাচার্য) মতে এই শ্লোকটি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির লক্ষণই বর্ণনা করেছে। আমার অনুবাদে আমি সেই মতটিই গ্রহণ করেছি যদিও সম্পূর্ণ উবট বা মাহীধর ভাষ্য গ্রহণ করিনি। এই প্রাচীন আচার্যদ্বয় উভয়েই 'অকায়ম, অব্রণম্' ইত্যাদি শব্দকে গমনার্থক 'ই' ধাতুর (পর্যগাৎ = পরি − ই + লুঙ্ ত) কর্ম হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন যার ফলে শ্লোকটির প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়ায় 'তিনি (ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি) তাঁর চারিদিকে ব্রহ্মের প্রতিগমন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মকে লাভ করেন।' এ অর্থটি মেনে নিলে বলতেই হয় যে, এই শ্লোকটি রচনায় কবি কিছুটা ভিন্ন বাগভঙ্গীর আশ্রয় নিয়েছেন। সাধারণভাবে উপনিষদের কবি ব্রহ্মকে বা অমৃত লাভ করার ব্যাপারটা আরও সরাসরি বলেছেন অন্যান্য জায়গায় 'অশ্নুতে' বা '(অমৃতম্) ভবন্তি' প্রভৃতি ক্রিয়া ব্যবহার করে। এই শ্লোকটির মত গমনার্থক ধাতু ব্যবহার করে তির্যকভাবে বোঝাননি। দ্বিতীয়ত যাকে সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত করা যায় তাঁকে মাত্র কয়েকটি বিশেষণে বিশেষিত করলে তার মহিমা খর্ব করাই হয়, আর তাতে উপনিষদের কাব্যমানেরও হানি হয়। আমি তাই 'শুক্রম্……অপাপবিদ্ধম্' অন্বেচ্ছদের বিশেষণগুলিকে 'পর্যগাৎ' ক্রিয়ার ক্রিয়াবিশেষণ হিসাবে গ্রহণ করেছি যাতে শ্লোকটির প্রথমার্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধের (কবিঃ…সমাভ্যঃ) ঠিকঠাক সাযুজ্যও রক্ষিত হয়। কেননা ঐ প্রক্রিয়ায় (শুক্রম্…অপাপবিদ্ধম্ যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে তার পক্ষেই কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভূ এবং যথার্থবিধায়ক হওয়া সম্ভব।

তবে এই অনুমানও অমূলক নয় যে, উবট ও মহীধর যে অর্থ করেছেন এবং আমি বর্তমান অনুবাদে যে অর্থ গ্রহণ করেছি এই উভয় অর্থই কবির উদ্দিষ্ট ছিল এবং সেই ভাগিদেই বাগ্‌ভঙ্গীর কিছু বক্রতা। অতএব এখানে আমি উবট ও মহীধরের ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদের একটি পাঠান্তরও দিলাম।

চতুর্দিকে পান তিনি কায়াহীন, ব্রণহীনকে,
শিরাহীন শুদ্ধ শুদ্ধকে পান—পাপ যাঁকে বিদ্ধিতে পারে না।
কবি ও মনীষী তিনি ; পরিভূ স্বয়ম্ভু তিনিই,
যথা অর্থ বিধান করেন সর্ব যুগে যুগে। ৮
—উবট ও মাহীধর ভাষ্য অনুযায়ী

এছাড়া বহুচলিত শঙ্করভাষ্য অনুযায়ী নিম্নরূপে একটি পাঠান্তরও হতে পারে।

সর্বব্যাপী, শুদ্ধ তিনি, কায়হীন, ব্রণবিহীন,
শিরাহীন, শুদ্ধ তিনি, পাপ তাঁকে বিদ্ধিতে পারে না।
কবি ও মনীষী তিনি ; সর্বোক্তম, স্বয়ম্ভু তিনিই,
যথা অর্থ বিধান করেন সর্ব যুগে যুগে।৮
—শঙ্কর ভাষ্য অনুযায়ী

সবশেষে মূল দর্শন বিষয়ে কিছু বলব যার প্রভাব পড়েছে অনুবাদে। ১এ শ্লোকে 'বাস্য' শব্দটি শঙ্কর সমেত নতুন পুরোনো সব ভাষ্যকারই 'উচিত' অর্থে গ্রহণ করেছেন। ঋষি যাকে 'ব্যাপ্য' বলেছেন ভাষ্যকারেরা তাঁকেই বলে দিচ্ছেন 'ব্যাপ্ত।' এতে শ্লোকটির অর্থ সংকোচন ঘটেছে। ভাষ্যকারেরা নিজেদের দর্শনটিকেই একমাত্র দর্শন হিসেবে সকলের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। কবি বলছেন সব কিছুই ঈশ দ্বারা 'বাস্য', কিন্তু 'উচিত' বলেননি। 'উচিত' ধরে নিলে যে দর্শন পাই সেটি সুরলোকের দর্শন, আর 'ঈশ দ্বারা উচিত' না ধরে নিলেই আচ্ছাদনের কাজটি হয় এবং সেই আচ্ছাদনা ব্যক্তিরা হয় অসুরলোকের বাসিন্দা যে কথা বলা হয়েছে তৃতীয় শ্লোকে। অনুবাদে আমি 'বাস্য' অর্থটি তাই রক্ষা করেছি।

ফলে ৩য় শ্লোকের প্রেত্য শব্দটিও (প্র—ই + লাপ) নতুনভাবে ব্যাখ্যা করবার দরকার হয়েছে। নতুন পুরোনো সব ভাষ্যকারের মতে 'প্রেত্য' মানে 'মৃত্যু' বা মরণ লাভ করিয়া। তাঁরা ধরেই নিচ্ছেন, অসুর শ্লোকটি পরলোকে যেখানে আচ্ছাদনা ব্যক্তিরা যায় মরণের পরে। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এই পৃথিবীতে আচ্ছাদনা ব্যক্তিদের অবস্থান কোথায় ? সে সম্বন্ধে ঈশোপনিষদ কি কিছুই বলেননি ?

অবশ্যই বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত'র সমগ্র বক্তব্যটিই নিহিত আছে এই একটি উপনিষদে। আমরা যদি 'প্র-ই' ধাতুর অর্থ 'প্রকৃতরূপে গমন' বলতে মননের দ্বারা গমনকে বুঝি তাহলেই বোঝা যায় এই পৃথিবীতে অসুরলোক হল সেই লোক যার অধিবাসীরা চারিদিকের জাগতিক বস্তুসমূহকে ঈশ দ্বারা উচিত হিসাবে দেখতে পায় না। বিবেকানন্দ যে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অসুরসভ্যতা বলেছেন সে কথাটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কেনোপনিষদের ২।৫ শ্লোকটিকে ঈশোপনিষদের ৩য় শ্লোক এবং কঠোপনিষদের ২।৩।৩ শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে 'প্রেত্য' শব্দের অর্থ যে 'মননের দ্বারা গমন' তা বোঝা যাবে। কেনোপনিষদের শ্লোকটি বলছে, ইহজীবনে যে তাঁকে (ঈশ বা আত্মা বা ব্রহ্মকে) বুঝতে পারে সে এই লোক থেকে প্রকৃতরূপে গমন করে অমৃত হয়। ঈশোপনিষদের শ্লোকটি বলছে, আচ্ছাদনা ব্যক্তিরা (অর্থাৎ যারা তাঁকে বুঝতে পারল না তারা) এই লোক থেকে 'প্রকৃতরূপে গমন করে' অসুরলোকে যায় ; এবং কঠোপনিষদের শ্লোকটি বলছে যে তাঁকে বুঝতে পারে সে সুজনলোক লোকসমূহে (দ্যুলোক,

ভূলোক প্রভৃতি) ক্রমান্বয়ে থাকতে চায়। 'প্র-ই' ধাতু বা প্রকৃষ্টরূপে গমনের অর্থ যদি 'মননের দ্বারা বর্তমান লোক থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে এই পৃথিবীতেই সুরলোকে বা অমৃতলোকে স্থাপন করা' বুঝি তবেই শ্লোক তিনটির মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না।

অনুবাদে 'প্রকৃষ্টরূপে গমন' বোঝাতে আমি 'প্র-যা' (যা ধাতুও গমনার্থক) ধাতু নিষ্পন্ন 'প্রয়ান' শব্দটি ব্যবহার করেছি। 'প্র-ই' ধাতু ব্যবহার করতে হলে শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণের অনুবাদ দাঁড়ায় :

"আজন্মের জন যারা যায় সেথা প্রয়ানের পর।"

কিন্তু "প্রয়ান" (প্র – ই + অন্) কথাটি বাংলায় অপ্রচলিত ; এবং মূল শ্লোকেও কবি একে পারিভাষিক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেননি বলেই আমি প্রচলিত এবং সহজবোধ্য 'প্রয়ান' শব্দটি ব্যবহার করেছি যদিও মনে করি যে এখানে দেওয়া পাঠান্তরটি মূলের সঙ্গে বেশী সঙ্গতি রক্ষা করে।

ছোটো ছোটো তারারা

অনুবাদ : তনুশ্রী বোস

ছোটো ছোটো তারারা মিটিমিটি আলো দেয়,
কেমন করে যে, ভেবে মনে লাগে বিস্ময়।
পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে অতিদূরে নভতলে
হীরকের মত তারা করে সেথা ঝলমলে।
দিবসে আমরা দেখি ঝকমকে আলো,
সূর্যের অবসানে হয়ে যায় কালো।
রাতের আঁধারে যেই পৃথিবী ঘুমালো,
মিটিমিটি তারাদের ফুটে ওঠে আলো।
যে আলোতে পান্থচারী পথ খুঁজে নেয়,
ঘরে ফিরে তারাদের ধন্যবাদ দেয়।
তারাদের যদি আলো না থাকিত যদি
পৃথিবীটা হয়ে যেত আঁধারের নদী।

ইংরেজী থেকে

এম. এন. রায়ের চিঠি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক-পদ পরিত্যাগ করার পর পত্রিকাটি বে-আইনী ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির একটি শাখা সংগঠনকে বিক্রি করেন। এই সময়ে তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সংস্কেপে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। এম. এন রায় তখন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে সম্পাদক করে একটি ইংরেজী ত্রৈমাসিক বের করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তখন সরকারী চাকুরে ছিলেন। তাই সম্পাদক হতে পারেননি। পত্রিকাটি ছাপা শুরুর আগে কী কী করতে হবে এই নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও এম এন রায়ের মধ্যে পত্র বিনিময় হয়। গত সংখ্যায় এম. এন রায়কে লেখা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি চিঠি ছাপা হয়েছিল। এই সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা এম. এন. রায়ের চিঠি ছাপা হল।

বোম্বে, জুন ৮, ১৯৪৪

প্রিয় সুধীন,

আমরা এখানে গতকাল ফিরেছি। আপনার দুটি চিঠি এবং সাপ্লেমেন্টের খসড়া এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুতরাং আপনার আলসেমির জন্য কোনো ক্ষতি হয়নি।

সাপ্লেমেন্ট[১] সম্পর্কে আমার মনে হয় ঠিক এই ধরনের লেখার দরকার ছিল। এতে পাণ্ডিত্যের ছোঁয়া থাকায় ত্রৈমাসিকের এই আবেদনে আকৃষ্ট হবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে এটা প্রচার করছি না। কারণ আপনার চিঠির কয়েকটি মন্তব্যের জন্য প্রস্তাবিত প্রচেষ্টা শুরু করার আগে বিষয়টি নিয়ে আমাকে আরও কয়েকবার ভাবতে হবে।

আমার আশঙ্কা, প্রস্তাবিত ত্রৈমাসিকের নাম (মার্কসিয়ান ওয়ে)[২] লোকের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু আপনার উৎসাহজনক অনুমোদন আমাকে উৎসাহিত করেছে, এমন কী খুশিও হয়েছি। আপনি যদি মনে করেন, আমাদের জন্য একটি নাম বাছা উচিত। আমি আপনার প্রস্তাবিত নাম রাখার জন্য জেদ করব না। আপনি বুঝতে পারছেন যে, আপনার ধারণা অনুসারে আমি অতটা অনড় থাকতে চাই না। কিন্তু আপনি যা লিখেছেন, তাতে আমার দিক থেকে এখানেই বিতর্কের পরিসমাপ্তি।

বিদেশী লেখকদের জন্য আমার কোনো দুর্ভাবনা নেই। আমাদের আবেদন তাঁরা সহজভাবেই নেবেন। ত্রৈমাসিকসুলভ আন্তর্জাতিক শিরোনাম জোগানোর চিন্তা আমাদের না ভাবলেই চলবে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের অনুরোধ প্রতীক তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। আমি কেবল আমার নাম নিয়ে চিন্তিত। এজন্য আমার প্রস্তাব, পত্রিকার সম্পাদক[৩] হওয়া নিয়ে আপনি আর একবার ভাবুন। অবশ্য আমি সব কাজ করব। তাই কম আক্রমণাত্মক বা কম ভীতিজনক নাম ঠিক করতে হবে। আপনি সম্মত না হলে আমি অন্য কোন ব্যক্তির কথা চিন্তাই করতে পারি না।

সম্পাদক মণ্ডলী সম্পর্কে আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। কারণ, আপনার নামও ঐ তালিকায় স্থান দেওয়া যাবে না। আপনি অন্য রকম ভাবলেও সহযোগীদের নামের তালিকা একেবারে অর্থহীন হবে না। আমি কয়েকজন ব্যক্তির সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করব। যেমন, লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সি আর রেড্ডী[৪], ডঃ আর-পি পরাঞ্জপে[৫]। ডঃ আম্বেদকর[৬] ও ফিলিপ স্প্রাট[৭]। আমার ধারণা হজেটি[৮] তার নাম দিতে রাজী হবে। আমরা তর্কতীর্থ লক্ষ্মণশাস্ত্রী যোশী[৯] অধ্যাপক বিনয় মুখোপাধ্যায়[১০] এবং অধ্যাপক জি ডি পারিখের নাম রাখতে পারি। সিনেমা প্রযোজকদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধিজীবী শ্রী জে বি-এইচ ওয়াদিয়ার নামও রাখা যায়। আমরা বোম্বের চিকিৎসক ডাঃ এবুলকরের নামও যুক্ত করতে পারি। তিনি শুধু দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসকই নন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি তিনি এদেশে একমাত্র ব্যক্তি, তিনি চিকিৎসাবিদ্যাকে বিজ্ঞান হিসাবে প্রয়োগ করে

থাকেন। এতসব দীপ্তিমান তারকার মধ্যে আপনি অনায়াসেই এক অন্ধকার কোণে আত্মগোপন করতে পারবেন। সুশীলের খবর কী? আমি তাকে লেখার অনুরোধ জানাচ্ছি না এই জন্য যে সে বিনয়ের সঙ্গে সরকারী অফিসের নিয়ম শৃঙ্খলে নিজের অক্ষমতা জানাতে পারে। আপনি এ ব্যাপারে সুশীলের সঙ্গে কথা বলুন। এইসব নামের তালিকা কোনো ক্রমেই সংকীর্ণতার পরিচায়ক নয়। নিঃসন্দেহে দেশের মধ্যে সর্বোত্তমদের আমরা পেয়েছি। আপনি কোনো প্রস্তাব করেন নি। এই ব্যাপারেও আমি আপনার প্রস্তাব আশা করছি।

সমালোচনার জন্য নিয়মিত বই পাওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন হবে। কিন্তু আমি প্রস্তাবটি ধামাচাপা করতে চাই না, যদিও প্রথম দিকে এই প্রস্তাব কার্যকর করতে সক্ষম না হতেও পারি। এদেশের বাজার থেকে কিছু বই কেনার জন্য টাকা বরাদ্দ করতে হবে। আমরা ইংলণ্ড থেকে বই সংগ্রহ করতে সক্ষম হব, যদিও ঐদেশে আমাদের স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই।

উচ্চমানের লেখা পাওয়ার ব্যাপারে সত্যিই কিছুটা অসুবিধা হবে। খরচের হিসাব করার সময়ে আমরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কত টাকা পাব, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। ওয়াল্টার থমসন্ বিজ্ঞাপন সংস্থার পিটারের প্রতিশ্রুতির কী হল? ঐ প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা সম্ভব হলে খরচের ব্যাপারে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা থাকবে না। আপনি কথা বলে এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করুন।

কলকাতা থেকে পত্রিকা ছাপানো ও প্রকাশের ব্যাপারে আমি কি আপনার তত্ত্বাবধানের প্রস্তাবের উপর নির্ভর করতে পারি? অন্য বিকল্প হচ্ছে বোম্বে। কিন্তু এখানে আমাদের যথেষ্ট লোকসম্পদ নেই এবং মোটামুটি সাধারণ দামে উচ্চ শ্রেণীর কাগজ পাওয়া কঠিন। সত্যি কথা বলতে কী, আপনার হাতে পত্রিকা থাকলে আমি নিশ্চিত বোধ করব। আমি আপনার উপর এমন কিছু করার জন্য চাপ দিচ্ছি না, যা আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক ও অস্বস্তিকর হবে। আমি কেবল আমার ইচ্ছাই প্রকাশ করছি, এবং আপনার উপরেই নির্ভর করছে আমার ইচ্ছা আপনি পূরণ করতে পারবেন কি না। আপনার পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হলে সমস্ত কারিগরী ব্যাপারে আপনি কিরণ ব্যানার্জীর সঙ্গে কথা বলুন। তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে খুব শীগগির আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে আলোচনা করতে পারব না। কিন্তু বিনয় এই মাসের শেষে দিল্লিতে আসবেন এবং তারপর দেরাদুনে আমাদের দেখা হবে, বিনয় কলকাতা ছাড়ার আগে আপনি যদি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং আমাকে আপনার মতামত জানান, তাহলে তার ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্ত নেব।

কাজ সম্পর্কে আমার কথা এখানেই শেষ। আপনার চিঠির বড় ধরনের রসিকতা আমাকে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী করেছে। বিতর্কের বিষয় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পর্কে। বর্তমান সম্পর্কে আমি সব কিছুতে অবিশ্বাসী। বর্তমান বলে কিছু নেই। অতীত যদি পুরোপুরি মৃত হয় এবং ভবিষ্যৎ অজানা থাকে। তাহলে জ্ঞানের কোনো ভিত্তি থাকে না। সত্যি কথা বলতে কী, অঙ্কশাস্ত্রের সীমাবদ্ধ বিচারে বর্তমান হচ্ছে নিয়ম বহির্ভূত সৃষ্টি এবং জ্ঞান সম্ভাব্য দর্শন শাস্ত্রের ধারণা। যে প্রশ্নটি আমাকে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে, আমি সেই প্রশ্নটি আপনাকে করতে চাই। প্রশ্নটি হচ্ছে, নীতিবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যতত্ত্বের কোনো সম্পর্ক আছে কি না। সৌন্দর্যতত্ত্বে সততার কি কোনো স্থান নেই? একজন কি একই সঙ্গে অসৎ হয়ে দাবি করতে পারে যে, সে একজন শিল্পী অথবা বুদ্ধিজীবী? অবশ্য ব্যক্তির ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রশ্ন উঠতে পারে। আমি বিমূর্তভাবে এই প্রশ্ন করছি। যাতে ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই এই বিষয়ে আলোচনা করা যায়।

আমারা জেনে দুঃখিত হলাম যে, রাজেশ্বরীর শরীর ভাল যাচ্ছে না। আমি আশা করছি যে, সাংসারিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা আপনার স্বীকৃত অথবা কল্পিত পূর্বপুরুষের পুনর্বিবাহ থেকে আপনাকে রেহাই দেবে। আমাদের আবার কবে দেখা হবে? এর পরে যখন দেখা হবে তখন আমি নিশ্চিতভাবে হাতে কাজ না রাখার বেপরোয়া চেষ্টা করব। কিন্তু আপনাকে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে এবং আমার আধ্যাত্মিক প্রকাশকে উৎসাহ দিতে হবে।

আপনাকে ও রাজেশ্বরীকে আমাদের দুজনের ভালবাসা।

আপনাদের বিষ্ণু

রায়

অনুবাদ: [illegible]

পার্সিফোনি

মূল কবি : সিলভিয়া প্লাথ

মূর্ত বালন্তিকা

অনুবাদ : তমাল সাহা

পৃথিবীর গহ্বরে শস্যোদ্যান জিইয়ে রেখেছি
ঢেলেছি শস্যের বীজ জীর্ণ ভগ্নস্তূপে
যদি সে আমাকে চায় ?
যদি সেই ক্ষত নিরাময় ?

স্বপ্নের ভিতরে দেখি আমাদের বিপন্ন বসুধা
মোর রক্ত বিতানে আটক
মাথা থেকে রক্তের ঘুড়ুটে
গুঞ্জরিত অলির পালক

আমার কর্ণে বেঁধে নীল আর কমলার মৌ
এখন শ্রাব্যসুখে পৃথিবীর ভরাভূমি শুনি
বাদ্য যন্ত্রে মর্মরে
ট্রেটার মৃদু ঘন্টাধ্বনি

মানবিক আমি আত্মহীন
তবুও তৃষ্ণা নিয়ে একখানি হৃদয় সন্দেশ
ফল থেকে, শোনিতাক্ত করে

সাতটি নীলাভ বীজ
ক্ষতচিহ্নে লগ্ন হয়ে আছে
সাতটি শস্যের গ্লাস
তারা যেন উষ্ণ দীপ্যমান

কে যেন অনুচ্চে ডাকে—সবকিছু করেছি গ্রহণ
পৃথিবীর চামড়ার নিচে আমি এক লুকোনো স্পন্দন

গাছে গাছে আকাশ প্লাবন
আমার ব্যর্থ চাওয়া সমূহ প্রয়াস
নদীকে কিনার থেকে ডাকে
আমার আত্মার ঘুমে আঙুলের নির্জনতা ছুঁয়ে

শুনে রাখো, স্বর্গ নয়
শুধু ঐ বাজকের তারা
রুক্ষতায় অবলে, আর নেভে

আর, বায়সের বিষ্ঠাগুলি শস্যক্ষেত দাপিয়ে বেড়ায়।

সুদর্শন বশিষ্ঠ (জং ১১৪৯) ঃ কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার। প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা পঁচিশ। উচ্চপদস্থ সরকারি অধিকর্তা হয়েও প্রতিষ্ঠানবিরোধী এবং সরকারি কার্যকলাপের প্রতি তীব্র কটাক্ষময়। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু মূলত কৌতুক-প্রিয়তা এবং তিনি ব্যঙ্গের ভিয়েনে কবিতা লিখতে ভালোবাসেন। অনেক সরকারি ও বেসরকারি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ 'আতঙ্ক' (উপন্যাস), 'অন্তরাল মেঁ ঘটা সময়' (গল্প) ঃ কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দুই। 'কিছুই সম্ভব নয়' কবিতাটিতে বিদ্রূপের কশাঘাত লক্ষণীয়

কিছুই সম্ভব নয়
অনুবাদ : জ্যোতির্ময় দাশ

এখন কিছুই আর করা সম্ভব নয়
গাড়ি বিকল হয়ে গেছে
ড্রাইভার আচমকা ঘোষণা করে
নেতারা জানান
সব কিছুই এখন নষ্ট হয়ে গেছে
কিছুই আর করা যাবে না
গাড়ি এবং দেশের অবিকল একই অবস্থা
নৈরাশ্যময় শাস্ত্রকথা শোনাবার সময়
সাধুসন্তেরা খুবেই আলাবাদী
সমাজ সংস্কারকেরা বিরক্তি প্রকাশ করে
চাঁদার রসিদ কেটে দেবার সময়
ইদানীং অনেক সংগঠন দুশ্চিন্তায় থাকে

দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে
ভূমিকম্পের ব্যাপারে
জনসাধারণ অবশ্য কিছুটা সন্দিহান
অন্যান্য সরকারি পরিকল্পনার মতো
ওদের অনুদান পৌঁছবে তো দুর্গতদের কাছে !

দুর্নীতির পরিভাষা বদলে গেছে
অনেক সঙ্কুচিত হয়ে গেছে সততার পরিমণ্ডল
এক তস্কর জানায় ঃ
কাল রাতে জানলা গলে যখন আমি ঢুকলাম
দেখি গৃহস্বামী দাঁড়িয়ে রয়েছে
অলঙ্কার হাতে
অতঃপর ডাক্তারেরা ঘোষণা করে
সুস্থ দুরারোগ্য অবস্থায় এসে পৌঁছেছে
আমরা নিরুপায়

তুলসী রমণ (জঃ ১৯৫৪) ঃ কবি, গল্পকার, সমালোচক এবং সম্পাদক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম ঃ 'ঢালান পর আদমী' এবং 'পুহ্‌ভী কী আঁচ'। এছাড়া একটি উপন্যাস আছে ও দুটি গল্প গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। লিথুয়ানিয়া ভাষার কবিতা হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন। বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি পুরস্কার পেয়েছেন। 'বিপাশা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। 'ভেড়া' কবিতায় কবি অসহায়ের প্রতি সকলের নিপীড়নের বিষয়টি প্রতীকের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পেশ করেছেন বলিষ্ঠ কলমে।

ভেড়া

বয়োজ্যেষ্ঠরা এভাবে বলে থাকেন ঃ
ভেড়ার পশম কেটে নেবার সময়
আমরা কখনো তার অনুমতি নিই না

কিছু সবুজ ঘাসপাতা
সামান্য একটু খাবার
অথবা একমুঠো শস্যের দানা দেখিয়ে
স্বাভাবিকভাবে তাকে ডাক দিয়ে
তোমাকে আরো কাছে ডেকে নিতে হবে

এবং কোনোকিছু সন্দেহ না করে
সরল পশুটি এগিয়ে আসতে থাকে
সুবিধে মতো তারপর
তুমি তোমার কাঁচি চালাতে পারো

তার সব পশম কাটা হলে
কর্তিত পশুটিকে ছেড়ে দাও তুমি
এই টালমাটাল দেশে
ছোট ও বড়
নেকড়ে অধ্যুষিত অরণ্যে

ভেড়ার পশম দিয়ে
সিংহাসনগুলো সাজানো হয়
ভেড়ার রক্ত দিয়ে
রাজতিলক দেওয়া হয় কপালে
এবং সেই নিরীহ ভেড়াটি
প্রবাসিত হবার পর
এখন সে
একলা পশম
অথবা কিছুটা রক্ত।

[হিমাচল প্রদেশের কবিরা সকলেই হলেও হিন্দীতে কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্য রচনা করেন। তবে পাঞ্জাবের সন্নিহিত অঞ্চল হিসেবে অনেকে দ্বিতীয় ভাষা পাঞ্জাবীতেও সাহিত্য সৃষ্টিতে পারঙ্গম। সে কারণে হিমাচল প্রদেশের অনেক কবি-সাহিত্যিক পাঞ্জাবী লেখক হিসেবেও সমধিক পরিচিত।—অনুবাদক

১৮১২-র যুদ্ধের পর এই প্রথম

অনুবাদ : সঞ্জীবন সরকার

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ এ এক বিধ্বংসী বিমানহানায় নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও ওয়াশিংটনের পেন্টাগন আক্রান্ত হয়। ঘটনাটির পশ্চাদপট ও পরিণাম সম্বন্ধে যাবতীয় ধারণার মাধ্যম হিসেবে আমেরিকান প্রেস প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে। নোয়াম চমস্কি এই সাক্ষাৎকারে এমত বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন যার তাৎপর্য অদ্যাবধি রহস্যাবৃত। সন্ত্রাসবাদী বিমান আক্রমণগুলি তাদের ঐতিহাসিক ও বৈশ্বিক পটভূমিকায় এখানে আলোচিত। চমস্কি যুক্তিবাদী ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আমাদের বুঝিয়েছেন। "এই সত্যগুলি," চমস্কির মতে, "ইতিহাসের গন্ডী থেকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের তা কার্যত চিলেকোঠায় হামলা চালিয়ে উদ্ধার করতে হবে।"

বিশ্ববিশ্রুত রাজনৈতিক ভাষ্যকার, লেখক নোয়াম চমস্কি ম্যাসাচুসেটস্ ইনসটিটিউট্ অব টেকনোলজিতে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে ১৯৫৫ থেকে কর্মরত। ভাষাতত্ত্ব, দর্শন এবং রাজনীতি বিষয়ক লিখিত গ্রন্থগুলি চমস্কিকে এক অগ্রগণ্য চিন্তক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থগুলির মধ্যে "পাওয়ার অ্যান্ড প্রস্পেক্টস্", "ওয়ার্ল্ড অর্ডার : ওল্ড অ্যান্ড নিউ", "ডেটারিং ডিমোক্রেসি", "প্রফিট ওভার পিপল" বিশেষজ্ঞ মহলে সমাদৃত। বৃহত্তর গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে চমস্কির প্রয়াস শান্তি ও সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে আন্দোলনকে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

প্রশ্ন। বার্লিন প্রাচীরের পতনের ফলে কোনো জলকর হয়নি, তবু তা ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষিতকে প্রবলভাবে বদলে দিয়েছিল। আপনার কি মনে হয় ১১ই সেপ্টেম্বরের বিমানহানোর অনুরূপ ফলাফল হতে পারে?

চমস্কি। বার্লিন প্রাচীরের পতন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং বস্তুত তা ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষিতকে প্রবলভাবে বদলে দিয়েছিল। কিন্তু যে অর্থে ভাবা হয় সেভাবে নয়। অন্যত্র আমি এ বিষয়ে আমার যুক্তিগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তাই এখানে আর সেগুলির পুনরুল্লেখ করব না।

১১ই সেপ্টেম্বরের ভয়ংকর নৃশংসতা বিশ্ব বিষয়ে এক অভূতপূর্ব ঘটনা, কেবল তার মাপকাঠি এবং চরিত্রের দিক থেকেই নয়, বরং লক্ষ্যবস্তুর দিক থেকে। ১৮১২-র যুদ্ধের পরে এই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ভূখন্ড আক্রান্ত, এমনকি সম্ভ্রস্ত হলো। বহু ভাষ্যকার পার্ল হারবারের সাথে এর সাদৃশ্য টেনেছেন যেটা বিভ্রান্তিকর। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি সামরিক ঘাঁটি আক্রান্ত হয়। কিন্তু জাতীয় ভূখন্ড কখনোই ক্ষুব্ধ হয়নি। আমেরিকা হাওয়াইকে তাদের অঙ্গ বলে মনে করে, কিন্তু যথার্থে হাওয়াই একটি উপনিবেশ মাত্র। অতীতে কয়েক শতাব্দী ধরে আমেরিকা দেশজ জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করেছে (বহু লক্ষ মানুষ যার শিকার), মেক্সিকোর অর্ধেক দখল করেছে (যা ফলত দেশজ জনগোষ্ঠীর অঙ্গ, কিন্তু তা স্বতন্ত্র), হিংসা সম্বল করে চার পাশে আক্রমণ চালিয়েছে, হাওয়াই ও

ফিলিপিনস-কে কব্জা করেছে যার ফলশ্রুতিতে হাজার ফিলিপিনো নিহত হন এবং নির্দিষ্টভাবে বিগত অর্ধ-শতাব্দীতে, গোটা দুনিয়ার বড় অংশে তাদের সামরিক শক্তি বিস্তৃত করেছে। এর শিকার হয়েছে বহুসংখ্যক বিপ্লবাসী। এই প্রথম বন্দুকের নল উল্টোদিকে ঘুরে গেছে। সেটাই একটা নাটকীয় পরিবর্তন।

একই কথা, আরো বেশি নাটকীয়ভাবে, ইউরোপের ক্ষেত্রে সত্য। ইউরোপও মর্মান্তিক হত্যালীলার বলি হয়েছে, তবে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের কারণে। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় শক্তিগুলি চরম নিষ্ঠুরতার বিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেছে। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তারা তাদের বিদেশী উপনিবেশ যারা কখনো আক্রান্ত হয়নি। ভারত ইংলণ্ডকে আক্রমণ করেনি, কঙ্গো করেনি বেলজিয়ামকে কিংবা ইথিওপিয়ার আগ্রাসনের শিকার হয়নি ইতালি, এমনকি ফ্রান্সও আলজেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়নি (যদিও অ্যালজেরিয়াকে ফ্রান্স উপনিবেশ বলে স্বীকার করে না)। সুতরাং ইউরোপ যে ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে প্রচণ্ড আহত হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। দুঃখজনকভাবে এ আঘাত কেবলমাত্র তার পরিমাণের দরুণ নয়। এই আক্রমণ বিশ্বের সঙ্গে তা সবার অনুমোদনের বাইরে। কিন্তু এটা যে মারাত্মকভাবে নতুন তা বোঝার এখন পরিষ্কার।

প্রশ্ন। আমার মনে হয় এই আক্রমণ আমাদের নতুন কোনো রাজনৈতিক চিত্র উপহার দেবে না, বরং এটি 'সাম্রাজ্যের' অভ্যন্তরে এক সমস্যার উপস্থিতি অনুমোদন করবে। সমস্যাটি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত। আপনি কী বলেন?

চমস্কি। সম্ভাব্য অপরাধীরা একটি স্বকীয় প্রকল্প। তবু, তর্কাতীতভাবে, তারা অতীতের ইউরোপীয় প্রভুদের সীমা ছাড়ানো মার্কিন আঞ্চলিক নীতির প্রতি তিক্ত ক্রোধের আধার থেকে সমর্থন সংগ্রহ করেছে। নিশ্চিতভাবেই এখানে 'রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা' বলে একটি বিষয় রয়েছে। আক্রমণগুলির পূর্বে "ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল" অঞ্চলের ধনাঢ্য মুসলমানদের (ব্যাঙ্কার, বুদ্ধিজীবি এবং এবং আমেরিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যবসায়ী) মতামতের একটি সমীক্ষা চালায়। কঠোর স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলির প্রতি মার্কিন সমর্থন এবং স্বাধীন বিকাশ তথা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পথে ওয়াশিংটনের বাধা ও অত্যাচারী শাসনে তোল্লা দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে সেখানে তারা তাদের হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাদের মূল আপত্তিটি ছিল: ইরাক ও ইজরায়েলের সামরিক অবস্থানের প্রতি ওয়াশিংটনের গৃহীত নীতি। নিপীড়িত দরিদ্র মানুষের কাছে অনুরূপ ভাবনাগুলি আরো তিক্ত, স্বীয় অঞ্চলের সম্পদসমূহে পাশ্চাত্যের এবং পাশ্চাত্যের এবং পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক ও পাশ্চাত্য-পোষিত কয়েকটি দুর্নীতিগ্রস্ত নিষ্ঠুর শাসক তথা অভিজাত শ্রেণীর কুক্ষিগত হওয়ার প্রক্রিয়া তাদের মনে যাদৌ কোনো হর্ষোদ্রেক বিষাদোদ্রেক করেনি। তাই কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সমস্যাগুলি আছেই। তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষিত মার্কিন প্রতিক্রিয়া সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েছিল সেগুলিকে তীব্র করেই। যা অবশ্যই অনিবার্য নয়। এমত চিন্তা ভাবনাগুলির উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে।

প্রশ্ন। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াকে চালনা করতে আমেরিকার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? আমি জাতীয় নিরাপত্তা বা গোয়েন্দা নজরদারির অর্থে এ প্রশ্ন তুলছি না।

চমস্কি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক বিশ্বায়ন প্রকল্পের প্রশাসক নয়, যদিও সে একটি প্রাথমিক ভূমিকা এক্ষেত্রে পালন করছে। এই কার্যসূচীগুলি ভীষণরকম প্রতিরোধের জন্ম দিচ্ছে, মূলত দক্ষিণে, যেখানে গণবিক্ষোভকে দমন কিংবা উপেক্ষা করা যায়। গত কয়েক বছরে প্রতিবাদগুলি ধনী দেশগুলিতেও শোনা গিয়েছে এবং কার্যত বৃহৎ শক্তিবর্গের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃক্ষণাত্মক ভূমিকাটি তারা টের পাচ্ছে এবং তা অকারণে নয়। লাভী অনুকূল বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধের উপযুক্ত হেতু আছে, কিন্তু তা বলার জায়গা এটি নয়।

প্রশ্ন। ইরাকে 'বুদ্ধিমান বোমা', কসোভোর 'মানবিক কারণে হস্তক্ষেপ'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই এগুলিকে যুদ্ধ হিসেবে বর্ণনা করেনি। এখন তারা একটি নামহীন

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কেন?

চোম্স্কি। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র 'ধর্মযুদ্ধ' কথাটি ব্যবহার করেছিল। তখন তাদের বোঝানো হয় যে যদি তারা ইসলামিক দুনিয়ার বন্ধুর সন্ধান চায়, ঐ কথাটির ব্যবহার। একটি গভীর ভুল হবে। সংগত কারণেই হবে। তাই বাধ্যিতা 'যুদ্ধ' শব্দটিতে সরে এল! ১৯৯১ এর উপসাগরীয় যুদ্ধকে 'যুদ্ধ' বলা হলো। সার্বিয়ার বোমাবর্ষণকে বলা হলো 'মানবিক কারণে হস্তক্ষেপ' যা কোনো অর্থেই নতুন শব্দ ব্যবহার নয়। এটি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের একটি চলতি বাগধোরা। সাম্প্রতিককালে 'মানবিক কারণে হস্তক্ষেপের' একটি বিশিষ্ট গবেষণাকর্মে প্রাক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মানবিক কারণে হস্তক্ষেপের তিনটি দৃষ্টান্ত টানা হয়। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী হানা, মুসোলিনীর ইথিওপিয়া আক্রমণ এবং হিটলারের সুদেটেনল্যান্ড দখল। লেখক কখনোই বলেন না যে শব্দগুলি যথার্থ, বরং সেগুলি প্রচ্ছন্নভাবে অপরাধসমূহকে মানবিক হিসেবে চিহ্নিত করে।

কসোভার হস্তক্ষেপ, সম্ভবত ইতিহাসে প্রথম, আদতে মানবিক কিনা তা বারবই বলবে। কেবল সংরাগী ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। কেননা এ ধরণের বাধ্যিতার প্রতত প্রভাবে সব ধরণের বলপ্রয়োগই ন্যায়সংগত হয়ে যায়। কসোভার ক্ষেত্রে মানবিক উদ্দেশ্যের দাবীগুলি কি অস্বাভাবিক রকম ঠুনকো, আরও সঠিকভাবে বললে, দাবীগুলি মোটেই টেকে না, এ সম্পর্কে সরকারি কারণগুলি প্রায়শই ভিন্ন। তবে তা আলাদা ব্যাপার, অন্যত্র আমি এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এমন কি 'মানবিক কারণে হস্তক্ষেপের' প্রচ্ছন্ন ভণিতাটিও বর্তমান ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। একটাই রাস্তা: যুদ্ধ।

উপযুক্ত শব্দটি হবে 'অপরাধ' – বোধহয় 'মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ', যেমন রবার্ট জিল্ক বলেছেন। অপরাধের শাস্তির জন্য অনুশাসন আছে। অপরাধীদের শনাক্তকরণ, তাদের অভিযুক্ত করার প্রক্রিয়া যে পদ্ধতি ভ্যাটিকান বা অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের জন্য সুপারিশ করেছে। কিন্তু তার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ দরকার যা কিছু বিপক্ষজনক প্রশ্নের দরজা হাট করে দেবে। তার মধ্যে একটি মাত্র হলো: পনের বছর আগে কিংস আদালত দ্বারা দণ্ডিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের প্রকৃত অপরাধী কারা?

এরকম অনেক কারণে 'যুদ্ধ' নামক একটি অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করাই ভালো। একে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলাটা নেহাৎই প্রচার হয়ে দাঁড়ায় যদি না 'যুদ্ধটি প্রকৃতই সন্ত্রাসবাদকে লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু তা কখনোই ভাবা হয়নি কারণ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ শব্দটির সরকারি সংজ্ঞা, যেমনটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধান ও সামরিক কার্যবিধিতে আছে, মেনে চলতে পারবে না। তা মেনে চললে মুহূর্তে প্রকাশিত হবে যে, যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ং একটি মুখ্য সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র, যেমন তার অনুচর রাষ্ট্রগুলি।

এখানে বোধহয় আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাইকেল স্টোলকে উদ্ধৃত করতে পারি: "আমাদের বুঝতে হবে যে কেবলমাত্র প্রচলিত রীতি দ্বারাই বৃহৎ শক্তিগুলি বলপ্রয়োগ করে এবং সেই বলপ্রয়োগের ভীতিপ্রদর্শনকে সাধারণত অবরদস্তি মূলক কূটনীতি বলে বর্ণনা করা হয়, কখনোই সন্ত্রাসবাদ বলে নয়।" যদিও সাধারণভাবে তাকে জড়িয়ে থাকে ভীতি প্রদর্শন বা সময় সময় হিংসার ব্যবহার থাকে তবুও "সন্ত্রাস বাদী উপাদানই বলা যেতে পারত যদি না বৃহৎ শক্তিগুলি অনুরূপ পদ্ধতি ব্যবহার করত" (শব্দগুলির আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী)। এই অবস্থায় (যা অকল্পনীয় বলে স্বীকার্য) পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যে বুদ্ধিজীবি চক্র শব্দটির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণে আগ্রহ দেখানোর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এমন একটি ভিন্ন রূপ নেবে সম্ভ্রান্ত অনুশাসন বহির্ভূত সাহিত্যের পংক্তিতে বা অনুচ্চারিত উচ্চারিত।

যে উদ্ধৃতিটি আমি পেশ করলাম তা 'পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ' নামে একটি সংকলন থেকে গৃহীত যার সম্পাদক আলেকস জর্জ এবং দশ বছর আগে এক বড় প্রকাশক যা প্রকাশ করে। কিন্তু এর উল্লেখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করা যাবে না। স্টোলের বক্তব্য সারা বইটি জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। এমন বহু উদাহরণ আছে, কিন্তু সূত্র থেকে প্রাপ্ত, যেমন সরকারি দলিল-দস্তাবেজ, যার উল্লেখ, পুনরায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করা

যাবে না, যদিও এই নিষেধাজ্ঞা অন্যান্য ইংরেজীভাষী রাষ্ট্রে তত কঠোরভাবে বলবৎ নয়।

প্রশ্ন। ন্যাটো, আক্রমণের চরিত্র অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নির্ধারণ অবধি নীরব আছে। একে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

চমস্কি: আমি মনে করি না ন্যাটোর ক্ষিধার এটি কোনো কারণ। আক্রমণটি যে বৈদেশিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় ন্যাটোর ক্ষিধার কারণ সেগুলিই যা ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন।

অঞ্চল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের মতোই তাঁরা মনে করেন যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত নামিয়ে আনা বিন লাদেন ও তার সহযোগীদের প্রার্থনার উত্তরেরই সামিল হবে। এবং তা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের, যেমন ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন, একটি পৈশাচিক ফাঁদে ফেলে দেবে।

প্রশ্ন। আপনি কি মার্কিন গুপ্তচর সংস্থার ভূমিকা এবং কারসাজি সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

চমস্কি। প্রশ্নটা বুঝলুম না। বিমান আক্রমণটি পাশ্চাত্য ও আমেরিকান গুপ্তচর সংস্থার কাছে এক বিরাট ধাক্কা এবং বিস্ময় ছিল। এক্ষেত্রে সিয়ার একটি ভূমিকা ছিল যা বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু তা গত শতাব্দীর আশির দশকের ব্যাপার যখন সে পাকিস্তানি ও অন্যান্য সৌদি আরব, ব্রিটেন ইত্যাদি গুপ্তচর সংস্থার সাহায্যে ইসলামিক মৌলবাদীদের নিযুক্ত করে এবং প্রশিক্ষণ ও সশস্ত্র সাহায্য দিয়ে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এক পবিত্র যুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। এ বিষয়ে সেরা সূত্রটি হলো মধ্যপ্রাচ্য প্রতিবেদক ও লেখক জন কুলির 'অপবিত্র যুদ্ধাবলী'। ইদানিং যেমন আঁচ করা গিয়েছিল, অতীতকে মুছে ফেলার এক প্রয়াস চলেছে ভান করা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল এক নিরীহ দর্শকের এবং কিঞ্চিৎকরুণভাবে (অন্যদের কথা না-ই বা বললাম) শান্তভাবে সিয়ার কর্তাদের উদ্বুদ্ধ করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যা সাংবাদিকতার ন্যূনতম নীতিকে পুরোপুরি লঙ্ঘন করে।

সেই যুদ্ধের সমাপ্তির পর, আফগানীরা বিন লাদেনের মতো অনেকে, যারা আফগান নয়, তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাল। যথা চেচনিয়া ও বসনিয়ায়, যেখানে তারা পরোক্ষে মার্কিন মদত পেয়ে থাকতে পারে। তারা ওই সরকারগুলির সাদর আমন্ত্রণ পেয়েছিল, বসনিয়ায় প্রভূত স্বেচ্ছাসেবককে তাদের সামরিক পরিষেবার বিনিময়ে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়

কার্লোটা গল, । নিউইয়র্ক টাইমস। ২রা অক্টোবর, ২০০১

পশ্চিম চীনে যেখানে তারা (যারা চৈনিক মুসলমান) চৈনিক আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভের জন্য লড়ছিল, তাদের কাউকে চীন, ১৯৭৮-এ আফগানিস্তানে সেখানকার সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে যোগ দিতে পাঠায়। ১৯৭৯-তে সোভিয়েত সমর্থিত আফগান সরকারের রক্ষণার্থে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের সময়ে (যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের প্রতিরক্ষায় সে দেশকেই আক্রমণের সমতুল্য), তারা সিয়া সংগঠিত জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণ ফিলিপিনস, উত্তর আফ্রিকা ও অন্যত্র তারা একই উদ্দেশ্যে সংগ্রামরত। মিশর, সৌদি আরব ও অন্যান্য আরব দেশগুলিতে এবং নিউইয়র্ক-এর পনের নাগাদ আমেরিকার (যার সৌদি আরব হস্তক্ষেপ, লাদেনের মতে, সোভিয়েত আক্রমণের সমান), তাদের প্রধান শত্রুদের দিকে দৃষ্টি ফেরায়।

প্রশ্ন। সিয়াটেল আন্দোলনে আলোচ্য বিমানহানার কেমন প্রভাব পড়বে? আপনি কি মনে করেন এর ফলে সিয়াটেল আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে? নাকি আন্দোলনটি আরো জোরদার রূপ নেবে?

চমস্কি। নিঃসন্দেহে সর্বাত্মক কিংবারনের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিবাদ-এর ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এই প্রতিবাদের শুরু সিয়াটেলে শুরু হয়নি। এ ধরনের সন্ত্রাসবাদ বহুদলের রাষ্ট্রগুলির কাছে এক মূল্যবান উপহার স্বরূপ। এর সদ্ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই করা হবে, কার্যত করা শুরু হয়ে গেছে। সামরিকীকরণ, ক্ষমতার শ্রেণীবিভাজন, সামরিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার

বিরুদ্ধাচার, সংকীর্ণ বৃত্তে সম্পদের স্থানান্তর, এবং কার্যতভাবে গণতন্ত্রের অবলুপ্তিতে উহা উপহারটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এর প্রতিরোধ হবেই। আমার মনে হয় না উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলির কোনো দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য সম্ভব।

প্রশ্ন। মধ্যপ্রাচ্যে ১১ই সেপ্টেম্বরের বিমান আক্রমণের অভিঘাত কেমন? নির্দিষ্টভাবে বললে ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের সংঘাতের ক্ষেত্রে?

চমস্কি। ১১ই সেপ্টেম্বরের বর্বর আক্রমণ প্যালেস্টাইনের কাছে এক ভীষণ আঘাত, যা তারা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করে। এই 'সুযোগের বাতায়ন' উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ইজরায়েল প্রকাশ্যেই উল্লসিত এবং মনে করছে যে এর ফলে প্যালেস্টাইনকে ধ্বংস করার খেলা পরোয়ানা তারা পেয়ে গেছে। ১১।৯।২০০১ এর বিমানহানার পর প্রথম কয়েকদিন ইজরায়েলী ট্যাঙ্ক কতকগুলি প্যালেস্টীনিয় শহরে প্রবেশ করে যথা জেনিন, রামাল্লা, বেথলেহেম ইত্যাদি, কয়েক ডজন প্যালেস্টীনিয় নাগরিককে হত্যা করা হয় এবং যেমনটি ভাবা হয়েছিল, ইজরায়েলের বজ্র মুষ্টি আরও চেপে বসে। আর এটাই ক্রমবর্ধমান হিসেবে একটি সাধারণ নিয়ম যার সাথে গোটা বিশ্ব পরিচিত: উত্তর আয়ারল্যান্ড, ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন, বলকান প্রজাতন্ত্রগুলি এবং অন্যরা।

প্রশ্ন। আমেরিকান প্রতিক্রিয়া, আপনার কিছুরে, কি রকম? তারা তো মোটামুটি শীতল মস্তিষ্কের বলেই মনে হয়, কিন্তু সসকিয়া সেসন সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমাদের এখনই মনে হচ্ছে যে, আমরা যুদ্ধের সম্মুখীন"?

চমস্কি। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল আঘাতের, ভীতির, ক্রোধের, ত্রাসের এবং প্রতিশোধের এক দুর্মর ইচ্ছার। কিন্তু জনমতের মিশ্র এবং পালটা স্রোত অল্পসময়েই বইতে শুরু করে। একে এখন মূলধারার ভাষ্যে চিনে নেওয়া হচ্ছে। দৃষ্টান্ত আজকের সংবাদপত্র।

প্রশ্ন। মেকসিকান দৈনিক "লাজোর্নাডাকে" দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলে যে আমরা একটি নতুন ধরনের যুদ্ধের মুখোমুখি। আপনি ঠিক কী বলতে চেয়েছেন?

চমস্কি। এটি একটি নতুন ধরনের যুদ্ধ সেই কারণে যা আমি আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছি। বন্দুকের নল এখন উল্টোদিকে ঘুরে গেছে। ইউরোপ ও তার সন্তানদের ইতিহাসে এ এক নতুন ঘটনা।

প্রশ্ন। আরবেরা কি, সংজ্ঞা অনুযায়ী, আবশ্যিকভাবে মৌলবাদী? তারা কি পাশ্চাত্যের সাম্প্রতিকতম শত্রু?

চমস্কি। নিশ্চিতভাবেই না। প্রথমত তিলমাত্র বুদ্ধিবৃদ্ধিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই বলবেন না যে আরবরা মৌলবাদী। দ্বিতীয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পাশ্চাত্যের বৃহত্তর মৌলবাদ সম্পর্কে কোনো আপত্তি নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশ্বের অন্যতম চরম মৌলবাদী সংস্কৃতি। ইসলামিক দুনিয়ায়, তালিবান ব্যতীত, চরমতম মৌলবী রাষ্ট্র হলো সৌদি আরব, গোড়া থেকেই সে মার্কিন অনুচর। তালিবানকে একভাবে ইসলামের সৌদি সংস্করণের সন্ততি বলা যায়।

ইসলামী চরমপন্থীরা যাদের প্রায়শই মৌলবাদী বলা হয়, ১৯৮০-র দশক নাগাদ আমেরিকার প্রিয়পাত্র ছিল, কেন না হতের কাছে তারাই ছিল সেরা হাতিয়ার। সে সময়ে ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শত্রু ছিল এবং ল্যাটিন আমেরিকায় দরিদ্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের 'চরম পাপ' করে উক্ত পাপচক্রের দরুণ শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। শত্রুচয়নে পাশ্চাত্য মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ! নির্ণায়ক শর্তগুলি হলো বশ্যতা এবং ক্ষমতার প্রতি সেবা প্রদর্শন, ধর্ম কখনোই নয়। এর অন্যান্য বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে।

[সাক্ষাৎকারটি নটরাজ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত ৭/১১ নামক সংকলনের অন্তর্ভুক্ত।

সেনেগাল : বিরাগো ডিয়প

অনুবাদ : অন্তত দাস

[বিরাগো ডিয়প-এর জন্ম ১৯০৬ সালে সেনেগাল-এর ডাকারে। সেন্ট লুইসে পড়াশুনা করেছেন এবং ভেটেরিনারি সার্জেন হয়েছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় ভোলটায় সরকারি অফিসার হিসেবে কাটিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিশীল লেখা খুব কম. কিন্তু খুব যত্নের সঙ্গে সুন্দরভাবে তা রচিত। সেনেগালের-এর আনন্দলাঞ্জিতে তাঁর বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। 'নেগ্রিচুড' আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন]

অমঙ্গল (Omen)

একটা উলফ সূর্য—একটা হলুদে সূর্য
প্রভাতে সম্পূর্ণ নয় এক সূর্য
হরিদ্রাভ নদীর তীরে
ঢেলে দেয় স্বর্ণ ঢেউ।

সে এক উলফ সূর্য—একটা সাদা সূর্য
একটা সম্পূর্ণ নয় এবং সাদা সূর্য
শ্বেতাভ নদীর উপর
ছড়ায় রুপালি ঢেউ।

একটা উলফ সূর্য—একটা লাল সূর্য
সে এক সম্পূর্ণ নয় এবং লাল সূর্য
রক্তাভ নদীর বুকে
লাল রক্তের ঢেউ দিচ্ছে ঢেলে

অহঙ্কার (Vanity)

যদি আমরা আজে আজে বলি
বা আমাদের একদিন বলতেই হবে
উপহাস না করে কেউ কি আমাদের কথা শুনবে
অভিযোগকারী ভিক্তুকদের বিষাদময় কথা
সত্যি করে বলতো উপহাস না করে
কে তাদেরকথা শুনবে ?

যদি আমাদের এই দুঃখদুর্দশা নিয়ে বিশ্রীভাবে কাঁদি
শুরু থেকেই যদি তা বেড়ে যায়
তাহলে কোন চোখে দেখা হবে আমাদের এই মুখগুলো
বড় শিল্পের উপহাসে তা কি আকার নেবে
তাহলে কোন চোখে দেখা হবে আমাদের এই মুখগুলো ?

আমাদের এই একান্ত চাওয়াকে হৃদয় দিয়ে কে শুনবে ?
কে কান দেবে আমাদের এই করুণ ক্রোধের প্রতি
যা আমাদের ভেতর টিউমারের মত বেড়ে উঠছে
আমাদের বিষাদপূর্ণ গলার কালো গহ্বরে ?

যখন আমাদের মৃতরা তাদের মৃতের সঙ্গে আসে
যখন তারা আমাদের সঙ্গে নোংরা স্বরে কথা বলে
কেন আমরা কানে কালা হয়ে আছি
তাদের চীৎকারের প্রতি, তাদের বন্য অনুরোধের প্রতি
আমরা কালা হয়ে থাকি
তারা এই পৃথিবীতে তাদের চীৎকার গেছে রেখে
এই জলে, এই হাওয়ায় যেখানেই তারা রেখেছে তাদের পদচিহ্ন
আমাদের জন্য, অন্ধ বোবা এবং অবোধ্য সন্তানদের জন্য
তারা যা করেছে তার বাইরে কিছু দেখছে না
জলে, হাওয়ায় যেখানে তারা পা রেখেছে।

আর যেহেতু আমরা মৃতদের পারিনি বুঝতে
যেহেতু আমরা তাদের চীৎকারে করিনি কর্ণপাত
যদি আমরা ধীরে ধীরে কাঁদি
যদি আমাদের দুঃখদুর্দশা নিয়ে বিশ্রীভাবে চীৎকার করি
তাহলে আমাদের চাওয়ার কথা কে শুনবে
আমাদের এই ফুঁপিয়ে ওঠা হৃদয়ের কান্নায় কে কান দেবে ?

কণিকা
প্রতিভা সংপতি
অনুবাদ—স্বাতী গুহ

প্রায়ই ঠিক শব্দমালা গড়ে তুলতে গিয়ে
ছিঁড়েছে আমার চুল, প্রচণ্ড অস্থিরতা
জাগিয়ে রেখেছে সারা রাত
ভয়ংকর কষ্টে মোড়া এক অনামী যন্ত্রণা !
তবু যা কিছু ফলে উঠেছে
যেন তার কোনো ভাষা নেই, কিংবা সেই অর্থ
যা আমি ভরে দিতে চেয়েছি শব্দের শরীরে আমার
তা আজও বলা হ'ল না একটুও।

হয়তো যা বলা হ'ল সে সব শব্দরা থেকে যাবে
বাধা আর কালির রাজ্যে মিলেমিশে
তারা কখনোই স্পর্শ করতে পারবে না সে অনন্তনীল দীর্ঘশ্বাস
আমার ভিতরের প্রচণ্ডতা, উষ্ণতা
যা ডেলা পাকিয়ে উঠে আসে আর মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গেই
যদিও আমিই পারি তাদের রুখে দিতে !
ঘুম না আসা যেসব জটিল প্রহর জুড়ে
আমার স্বপ্নের যেসব হেরে যাওয়ার অনুরণন
ঘোষণা করে আমার মানুষী অক্ষমতা।

সে আমাকে শিখিয়েছিল সাফল্যের সাদা ফুলের গন্ধ শুকে নিতে
কে সে চৈতন্যহারক ?
ভিতরে ভিতরে বেড়ে ওঠা এত গভীর বিশাল অস্থিরতা সত্ত্বেও

ভিতরে ভিতরে ভেঙে যাওয়া
আমি গড়িয়ে পড়েছি পৃথিবীর ধুলোমাটিতে
অস্থির, উদ্‌গ্রীব
তাকিয়ে থেকেছি একেবারে ফাঁকা আকাশের দিকে।

প্রতিভা সংপতি উড়িষ্যার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর দ্বিতীয়া কন্যা। তিনিও গল্প ও উপন্যাস লেখেন। তাঁর কবিতা গ্রন্থ 'কাঁটা ও ফুল' থেকে কবিতাটি গৃহীত।

সান্নিধ্যে

কমলাকান্ত লেংকা

ছোট্ট ছোট্ট বিরতির উড়ান
সতেজ চক্রাকার বাতাসের ঘুরে চলা
আকাশের পাখি
যায়, উড়ে যায়
মাটির আশিস্ ছুঁয়ে আর
নুয়ে পড়া সবুজ ঘাসের শরীর

ভেঙে দাও দু'টুকরো করে
সুললিত আঘাতকারী সুরের তার
শব্দহীন নীরব হাহাকারের ফাঁদ
এখনও কি তারা আছে তোমার ?

ওড়ো, উড়ে যাও জঙ্গলের দিকে
কিংবা পাতাঝরা নয় গাছগুলির মাথার উপর
আর এক নীল সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে
চিরন্তন তীব্র জ্বলে ওঠা শিখার কেন্দ্র।

না, না
উড়ে যেও না
স্থির পাখি, আদরের পাখি
তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য
রেখেছি সবকিছু আমি
ভালোবাসার সুস্বাদু ফল
ফুলে ঢাকা গোধূলি
আর ফুরানো সমাহিত অন্ধকার।

কমলাকান্ত লেংকা উড়িষ্যার প্রতিষ্ঠিত কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। ওড়িয়া সাহিত্যের 'নবদশ' আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। কমলাকান্ত-এর কাব্যগ্রন্থ 'স্মৃতি ও প্রমতা' ওড়িয়া সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছে।

দহন

চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া
অনুবাদ : বাসুদেব দাস

(১৯২৭ সনে শিবসাগর জেলার আমগুঁড়ি গ্রামে অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি ও প্রকাশন পরিষদের সচিব শ্রীচন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর শ্রীশইকিয়া উপন্যাস ও ছোটগল্প দুটিতেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'মহারথী' উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমান গল্পে লেখকের মানবতা বোধ ও আদর্শবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'মায়ামৃগ' চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়ার নির্বাচিত গল্প। তাঁর অন্যতম গল্প সংকলন।)

পীতাম্বর শইকিয়ার মৃতদেহ রাষ্ট্রীয় সম্মান এবং মর্যাদায় দাহ করা হবে।

এ খবর ঘরে ঘরে, গ্রামে ফাল্গুনের দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

রাষ্ট্রীয় সম্মানে কিভাবে মৃতদেহ দাহ করা হয়, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ জীবনে কোনদিন তা দেখেনি। তা দেখার জন্য পীতাম্বর শইকিয়ার ঘরের চারদিকে লোকে লোকারণ্য হলো। শহর থেকে বহু দূরে, প্রায় শ্মশানের মতো নির্জন, নিস্তব্ধ এই অরণ্যময় গ্রামে এবং আশপাশের গ্রামে এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

রাজধানী থেকে পুলিসের ওয়ারলেসে খবর এলো, রাষ্ট্রীয় সম্মানে মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করার জন্য উচ্চ পদস্থ সিভিল সার্ভেন্ট এবং পুলিস অফিসারের একটা দল গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে। পীতাম্বর শইকিয়ার ঘর থেকেই মৌন শোভাযাত্রা করে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিখ্যাত আর অক্লান্ত যোদ্ধা, তিনবার কারাবাস করা এবং স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা পীতাম্বরের মৃত্যুতে সমগ্র রাজ্যের লোক শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল।

এর মধ্যেই উপর মহল থেকে নির্দেশ পেয়ে ছয় মাইল দূরের পুলিস থানার কয়েকজন পুলিস চলেই পীতাম্বরের ঘরে চলে এলো। শ্মশানে গিয়ে তারা গ্রামের মানুষের সাহায্যে মৃতদেহ সৎকারের যাবতীয় কাজ করল। এক মাইল দূরে থেকে ইলেকট্রিকের তার টেনে এনে পীতাম্বরের ঘরের চারদিকে শক্তিশালী আলোর ব্যবস্থা করা হলো। শ্মশানেও একইভাবে লাইটের ব্যবস্থা করা হলো।

শ্মশানের চারদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করে উচ্চপদস্থ অফিসার এবং পুলিসদের দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা হলো।

রাজধানী থেকে রাষ্ট্রীয় পথ দিয়ে বিকেল ৫টার আগে আগে এলো মাঝন রঙের একটি নতুন মোটর। তাতে বসে রয়েছে দুইজন উচ্চ পদস্থ অফিসার, পেছনের স্টেশন ওয়াগনের দুজন পুলিস অফিসার, একজন ফটোগ্রাফার। সবশেষে পুলিসের ট্রাক।

উচ্চপদস্থ অফিসার দু'জনের একজন একটা পাইপ টেনে চলেছে। নাম সুশান্ত চৌধুরী। অপর জনের নাম ভগীরথ শইকিয়া।

অনেকক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করে সুশান্ত চৌধুরী পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে ভগীরথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই পীতাম্বর শইকিয়ার নাম আপনি কখনও শুনেছেন কি ?

ভগীরথ শইকিয়া ইতিমধ্যে চকলেটের বড় টিবে একটা থেকে পান বের করে তাতে চুন মাখিয়ে নিচ্ছিল। ছেলে-মেয়েরা যে তৃপ্তি এবং উল্লাসে চকলেট এবং আইসক্রিম খায়, সেই একই তৃপ্তি এবং উল্লাসে সে পান খায়। 'সুশান্তের প্রশ্ন শুনে তার হাসি পেল। অনেকক্ষণ ধরে সে হেসেই

চলল। কেউ কোন প্রশ্ন করলে সে প্রথমে এভাবেই হাসে, জোর করে অট্টহাসি হাসে অর্থাৎ কিছু বলার আগে সে সর্বদাই এভাবে হাসে— ভোজ সভাতেই হোক, হাসপাতালেই হোক, অথবা, শ্মশানেই হোক।

"পীতাম্বর শইকিয়ার নাম আমি এই প্রথম শুনলাম। তাও আপনার মুখে। দুপুরবেলা অফিস থেকে বাড়িতে ভাত খেতে যাওয়ার সময় মেয়ে বলল রেডিওতে একজন দেশপ্রেমিকের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছে। অফিসে ফিরে এসে খবর পেলাম আমাকে আপনার সঙ্গে গ্রামে যেতে হবে। বলুনতো, যদি এই পীতাম্বর শইকিয়া সম্পর্কে আপনার কিছু জানা থাকে।

সুশান্ত চৌধুরী শান্ত মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে পাইপে টান দিল। সে শইকিয়ার কথার শেষের অংশটা শুনে চমকে উঠল। সে যে শইকিয়াকে কোন প্রশ্ন করেছিল, ইতিমধ্যে তা একেবারে ভুলেই গেছিলেন।

'পীতাম্বর শইকিয়ার নাম খবরের কাগজে একবার বা দুবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেবার কথা বোধ হয়। পুরনো দিনের পুরনো মানুষ। তিনবার নাকি জেলও খেটেছে। কিন্তু এক সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেই এভাবে জাতীয় সম্মান দেখানোটা বড় বেশি করা হচ্ছে বলে মনে করেন না কি?"

প্রশ্নটা করেই সে মুখে পাইপ লাগিয়ে গম্ভীর হয়ে বাইরের দিকে তাকাল, যেন প্রশ্ন করাটাই তার দায়িত্ব, উত্তর শোনাটা নয়।

ভগীরথের হাসি পেল। হাসির শব্দে ড্রাইভার পেছনে তাকাতে বাধ্য হলো। হাসির চোটে মুখ থেকে ছিটকে পড়া পানসুপুরির টুকরোগুলি শার্ট থেকে মুছে নিয়ে সে বলে উঠল, 'আমিও ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম, বিশ্বাস করুন। কিন্তু আমাদের দেশের মতো বিনারক্তে বিনা রক্তপাতে এবং এত সহজে স্বাধীনতা অর্জন করা পৃথিবীতে সম্ভবত একটিও নেই। দেশের জন্য এই পৌঢ়ত্বদের সর্বস্ব ত্যাগ করার কথা শুনলে, সত্যিসত্যিই আমার খুব হাসি পায়।"

বাস্তবিকই সে হেসে উঠল। হাসির দমকে তার সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে উঠল। শীঘ্রই হাসি কাশিতে রূপান্তরিত হলো। সে হাত দিয়ে গলাটা জোরের সঙ্গে চেপে ধরল।

সুশান্ত সতর্ক হলো; বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে সে ভগীরথের দিকে তাকাল। পলমবাজার শইকিয়া সুশান্তর থেকে নিচে: এরপর থেকে সে আর কোন রকম প্রশ্ন না করে কেবল বাইরের দিকে চেয়ে রইল। অজস্র শুকনো গাছ, শ্রীহীন কিছু খড়, চালচুলোহীন কিছু নামঘর, বৃষ্টিতে গরু ছাগল আশ্রয় নেওয়া কিছু পাটশালা অতিক্রম করে মোটর গাড়ি এগিয়ে চলল। পেছন পেছন সমান দূরত্বে অনুসরণ করে চলল স্টেশন ওয়াগন এবং পুলিশের ট্রাক।

অনেকদূর যাবার পর ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে কিছুটা দূরে অনুষ্ঠিত এক উৎসবের দৃশ্য এবং তার আনুষঙ্গিক হুলুস্থুল কানে এসে বাজল। পাইপ টেনে চলা অফিসার ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিল। সেখানে কি হচ্ছে দেখে আসার জন্য ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল।

সে পেছনের দিকে তাকাল। নির্দিষ্ট দূরত্বে পেছনের গাড়ি দুটি থেমে রয়েছে। ড্রাইভার খবর নিয়ে এসে জানাল কয়েকের আগমনে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

সুশান্ত কয়েকবার পাইপটা ভগীরথের মুখের সামনে ঘুরিয়ে বলল," এই জেলার ডেপুটি কমিশনার হয়ে থাকার সময় আমি একবার এই বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করেছিলাম। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকরা মিলেমিশে এই উৎসবের আয়োজন করে।

এইটুকু কথা বলে সে পুনরায় তৃপ্তির সঙ্গে পাইপ টানতে লাগল। যেন, কিছুক্ষণ আগে নয়, বহু সময় ধরে কোন কথাই বলছিল না।

কিছু সময় এভাবে মৌন হয়ে থাকার পর সুশান্ত বলল, 'চলুন একটু তাড়াতাড়ি হয়ে আসি। ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে জীবনটা একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। করেও শান্তি নেই। হয় মিনিস্টার, এম. এল.-এর টেলিফোন, না হয় ঘরে নিয়ে আসা সেও ফাইল আর ফাইল। ফ্যামিলি লাইফ বলে আর কিছুই বাকি রইল না।'

এইটুকু বলে সে ভগীরথের দিকে তাকিয়ে ছোট ছেলের মতো একটু হাসল। এই রকম গুরুগম্ভীর মুখে এ রকমের নির্মল হাসি কেউ হাসতে পারে ভগীরথ তা ভাবতেই

পারেনি। তাছাড়া তার বক্তব্যের সুরের সঙ্গে এই হাসির সামান্যতম মিল অথবা সম্পর্কও ছিল না।

সুশান্ত এবার বলল, "চলুন, স্নানে উপস্থিত হবার আগে কিছু সময় উৎসব দেখে আসি। অনাদি আমার হ্যান্ড, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের এতবড় উদাহরণ আর কোথাও দেখা যাবে না। কতগুলি সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে যোগদান করেছে, জানেন কি ?"

সুশান্ত জোরে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশের দরজা খুলে হাতে পানের ডিবেটা নিয়ে ভগীরথ বেরিয়ে এলো।

সুশান্ত স্টেশন ওয়াগনে বসে থাকা ফটোগ্রাফারকে ইশারায় নেমে আসতে বলল।

ইতিমধ্যে পুলিশ অফিসার দুজন নেমে এসে সুশান্তর পাশে দাঁড়িয়েছে। সুশান্ত হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা কিছু সময় বিশ্রাম নিন। আমরা উৎসব দেখে ঘুরে আসি।"

রাজপথ থেকে নেমেই ও'রা একটা ছোট খাল পেল। জল খুব বেশি নেই। কাদা রয়েছে, প্রথমে ফটোগ্রাফার লাফ দিল। সে ওপার থেকে সুশান্তর লাফ মারার দৃশ্যের ফটো নেবার জন্য সবকে তৈরি হলে। সুশান্ত নালাটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে, কোথায় শেষ হয়েছে, লাফ না দিয়েও যাওয়া যাবে কিনা, সবদিক দেখে শুনে লাফ দিল। ওপারে পৌঁছেই সে ভগীরথের উদ্দেশ্যে একট হাত বাড়িয়ে দিল।

লাফ দিতে গিয়েই ভগীরথের হাসি উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসি বিস্তারিত হলো। হাত বাড়িয়ে দেওয়া সুশান্তর মুখ থেকে অন্যে শুনতে না পায় সেভাবে কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে এলো : "অপদার্থ ! ভাগ্য যে কখন কাকে 'অটিয়ে দেয় !"

"স্টপ, স্টপ", মুখে বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে সুশান্ত বলে উঠল :

ভগীরথ লাফ দিল। লাফ দিতেই হাতের পানের ডিবেটা কাদায় পড়ে গেল। পার হওয়ার আগে তার বাঁ পাটাতে অল্প কাদা লেগে গেল। ফটোগ্রাফার ছোট ছেলের মতো লাফ দিয়ে পানের ডিবেটা তুলে আনল।

ভগীরথ পা থেকে কাদাজল ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করতেই সুশান্ত বলে উঠল, 'ন্যাশানাল ইন্টিগ্রেশনের মতো বিশাল কাজে এসেছেন যখন দেশের মাটি ও কাদার দাগ তো শরীরে লাগবেই, ডোন্ট ওরি, চলে এস।"

উৎসবের আয়োজন বেশ ভালোভাবেই করা হয়েছে।

চারদিকে বিশাল প্রাকৃতিক শোভা, একটা ছোট নদীর পারে রাশি রাশি গাছ। গাছের নিচে উৎসবের আয়োজন কসন্তের আগমনী উৎসব।

চারদিকে রঙের বাহার, নিকটবর্তী চা বাগানের শ্রমিক পুরুষ-মহিলার, এমনকি বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও পোশাক বিচিত্র রঙের। দুই সারিতে শ্রমিক যুবক যুবতী মাদলের তালে তালে সারি দিয়ে নাচছে, গান গাইছে, কিছুটা দূরে গ্রামের মহিলারা বিয়ের গান গাইছে। যুবক যুবতীর মুখে দেশলের রঙ। শত শত পুরুষ মহিলা বসে সেই নাচ গান উপভোগ করছে।

বাইরে পান সিগারেট, পুতুল-খেলনা ইত্যাদির কয়েকটি দোকান।

দক্ষিণে একটি মঞ্চ।

সুশান্ত আর ভগীরথ পরস্পরের কাছে চলে এলো। ওদের দেখে কয়েকজন কর্মকর্তা এগিয়ে এলো। এই জেলারই প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার সুশান্ত চৌধুরী সকলেরই পরিচিত।

"স্যার, কি সৌভাগ্য আপনাকে এখানে দেখতে পেলাম।" ওই বলে অনুষ্ঠানের সভাপতি তাঁদের নমস্কার করে অভ্যর্থনা জানাল। সুশান্ত ফটোগ্রাফারের দিকে তাকাল। ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ হল।

সুশান্ত বলল, "আমার বেশি সময় নেই, সরকারি কাজে এসেছি। আপনাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখার জন্যই কিছুক্ষণের জন্য এসেছি। এটাই হলো ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের আসল কাজ।'

"হ্যাঁ স্যার, আমরা এখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক জমায়েত হয়েছি। জাতীয় সম্মান অটুট রাখাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।"

তাদের নিয়ে মঞ্চে বসান হল। মঞ্চে বসে থাকা কয়েক জনের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করে দেওয়া হল। সুশান্ত পাইপে

নতুন করে তামাক ছেড়ে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে টানতে শুরু করল আর ভগীরথ বের করে আনল পানের ডিবে।

দুটি মেয়ে তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে চা এবং পান-সুপুরি এগিয়ে।

সুশান্ত এবং ভগীরথ আয়েশ করে কিছুক্ষণ নৃত্যগীত উপভোগ করার পর ভগীরথ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুশান্তর মুখের দিকে চাইল। সুশান্ত উঠে দাঁড়াল এবং বিদায় নেবার উদ্দেশে কর্মকর্তাদের নমস্কার জানাল। অনুষ্ঠানে সভাপতি সে কাঠের ব্যবসা করে অঢেল ধন সম্পত্তি অর্জন করেছে এবং সে শুনেছে ডেপুটি কমিশনার সুশান্ত চৌধুরীকে ভালভাবে জানে, তিনি সুশান্তের হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললেন, স্যার, আমাদের এই বাৎসরিক উৎসবে উপস্থিত থেকে কিছু জলপান না খেয়েই চলে যাবেন তা হয় না। সেটা হলে তা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বিরোধী হবে।"

"কিন্তু আমাদের যে রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে একজন দেশ প্রেমিককে শ্মশানে দাহ করতে যেতে হবে!" সুশান্ত আশ্চর্য দৃষ্টিতে ভগীরথের দিকে তাকাল, ভগীরথ বলল, আমাদের এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে। 'একথা বলে সে হেসে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুশান্তের তীক্ষ্ণ তির্যক দৃষ্টি দেখে অতি কষ্টে উদ্যত হাসিটাকে দমন করল।

সভাপতি বলল, "কিছু ভুল হয়নি স্যার! চলুন।

তিনি এবং আরও দুয়েকজন সুশান্ত এবং ভগীরথকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে সভাপতির ঘরের দিকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। কিছুটা এগিয়েই সুশান্ত বলল "কিন্তু আমরা দায়িত্ব পালন করতে এসেছি। উই হ্যাভ টু বি ডেপুটিসিভ।"

"হবে স্যার, চলুন, জীবনে আমরা আর বেশি কি পেলাম বলুন তো? শ্মশানে হাজির হওয়া হাসপাতালে যাওয়া, ঘরের অসুস্থ রোগীর জন্য ওষুধ কেনা—এর বাইরে জীবনে আর যেন কিছু পাবার নাই নাকি?"

সভাপতির কথায় ভগীরথের প্রচণ্ড হাসি পেল, কিছুটা এগিয়েই সভাপতির ঘর। সন্ধে হয়ে আসছে, জলপানের আয়োজন বেশ ভালভাবেই করা হয়েছে। লুচি, আলুর দম, পায়েস, কয়েক ধরনের মিষ্টি, চা, সুশান্ত প্রায় কিছুই স্পর্শ করল না, পুরনো পরিচিত সভাপতি খারাপ ভাববে ভেবে মিনিট অর্ধেকটা মুখে দিয়ে চায়ের কাপটা হাতে নিল।

সভাপতি সুশান্তের পাশে বসে বলল, "আমার শটক কিন্তু রেডি আছে স্যার, আপনি তাড়াতাড়ি করে একটু···।"

সুশান্ত তার কানের কাছে মুখ আনতে দেখেই তিনি কি বলতে চাচ্ছেন তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন, ডেপুটি কমিশনার থাকা অবস্থাতেও তাকে এধরণের কথা শুনতে হয়েছে।

"দ্যাটস ইমপসিবল, ইমপসিবল; আমরা সরকারি কাজে এসেছি।" সুশান্ত উঠে দাঁড়াল।

সভাপতি জানে সুশান্ত প্রথমে ঠিক এভাবেই কথা বলে। 'সরকারি কাজে এসেছেন জানি। কিন্তু সময়েরও তো আধ ঘন্টা এক ঘন্টা এদিক সেদিক হতে পারে। আসুন স্যার, সব তৈরি হয়েছে।"

"নো নো' সিম্পলি 'ইমপসিবল। কি কথা বলছেন আপনি? মানুষ শুনলে কি মনে করবে?"

ভগীরথ উঠে দাঁড়িয়ে সুশান্তের মুখের দিকে তাকাল। সে লক্ষ্য করল, সেই কঠিন শব্দগুলি জোর দিয়ে উচ্চারণ করা সত্ত্বেও, সুশান্তের মুখে ছোট ছেলের হাসির ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মোটর থেকে নামার সময়ও তার একই ধরনের হাসি দেখা গিয়েছিল।

"ঘটনাটা কি?" ভগীরথ জিজ্ঞেস করল। ঘটনা আর কি হবে। একটা কুইক ডিসিশনের আয়োজন করা হয়েছে।

ভগীরথের হাসি পেল। বেশ জোরেই হেসে উঠল। হাত ঘড়িটা দেখে সে সুশান্তের মুখের দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাল।

"স্যার, আসুন", সভাপতি বলল।

"কি করা যায়?" সুশান্ত ভগীরথকে জিজ্ঞেস করল।

"এত করে বলছে যখন, চলুন। ধীরে ধীরে আমাদের রাজি হতেই হল।" তারা সামনের 'রুমটিতে প্রবেশ করল।'

দেখতে পাচ্ছে, দুটি বোতল—একটা 'হুইস্কি'র একটা ব্রান্ডির। প্লেটে রয়েছে ভাজা মাছ, ভাজা আলু, ডালমুট।

বিন্দুমাত্র দেরী না করে ভগীরথ বোতল থেকে গ্লাসে হুইস্কি, ঢালতে থাকল। 'আমার বাগেও একটা ছিল।'—ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল।

সুশান্ত বলল, "গুড লুড, গুড লুক, গুড ড্রিঙ্ক—কি বলেন শইকিয়া ?" সে বার বার ঘড়ির দিকে তাকাল।

চিয়ার্স, চিয়ার্স।

ভগীরথ বলল, "কিন্তু গুড ওয়াইফ, এটা ভাউট ফুল।"

"কিভাবে ?" সুশান্ত ভগীরথের দিকে চোখ দুটো তুলে ধরল।

"এই যেমন, আমার পরিবারের বাইরে ড্রিঙ্ক করায় আপত্তি নেই, কিন্তু ঘরে করলেই একেবারে কালীমূর্তি। ছেলেমেয়েরা খারাপ হয়ে যাবে। একদিন বোতল একটা এনে রেখেছিলাম, বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি বললাম, ছুঁড়ে ফেললে ঠিক আছে। কিন্তু একটা বন্ধ করেও তো ছুঁড়ে ফেলতে পারতে !

"আমার স্ত্রী আবার গুড ড্রিঙ্ক দেখেইনি, মদ মুখে দিলেই সে ভাবে মাতাল হয়ে নর্দমায় গড়াবে। আর ছেলে মেয়ে ? ওরা প্রতিভাবান হলে কেউ ক্ষতি করতে পারে ?"

ভগীরথের হাসি পেল, সুশান্ত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কুইক, কুইক, উই হেভ গট টু বি রেসপনসিবল। উই আর অন দেট ডিউটি।'

ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হয়। উৎসবের কলকোলাহল ক্ষীণ স্বরে ভেসে আসে। বোতলে পানীয়ের পরিমাণ কমে আসে।

সুশান্ত ঘড়ির দিক তাকাতে ভুলে যায়। তার মুখটা রাঙা হয়ে উঠে।

ভগীরথ বলে, 'আমাদের দেরী হলে গ্রামের মানুষ আবার কি করে। আমরা পৌঁছানর আগেই যদি কাজটা শেষ করে ফেলে। আজকাল গ্রামের মানুষের উপর আর ভরসা নেই।'

"হোয়াট ?' সুশান্তের চিৎকারে ভগীরথ চমকে উঠল।' 'ন্যাশনাল অনার অবজ্ঞা করার সাহস আছে গ্রামের লোকদের ? আমরা না পৌঁছান, পর্যন্ত ওরা বসে থাকবে। আমরা না যাওয়া পর্যন্ত ওরা……।"

সুশান্তের চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এল। কষ্ট করে সে সামনের সোফাটাতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ভগীরথও বসে থাকা সোফায় হেলান দিয়ে বসল।

এদিকে, ভোররাতেই মৃত্যু হল পীতাম্বর শইকিয়ার। মৃতদেহ সাজিয়ে অজস্র মানুষ রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের অপেক্ষায় বসে থাকল।

ঘরের ভেতর, বারান্দায়, পথে-ঘাটে চারদিকে কেবল মানুষ, মানুষ আসছে। চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যুবক যুবতীর সংখ্যাই বেশি। চোখ তুলে তারা দূরে রাজপথের দিকে পুলিশের গাড়ি আসার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা ফিরে এসে পুলিশের গাড়ি থামেনি বলে ঘোষণা করে। আবার ওরা রাজপথে যায়।

এদিকে শ্মশানে বসে থাকে, দাঁড়িয়ে থাকে অনেক মানুষ, মৃতদেহ, ধূপ ধুনো সব প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

পুলিশের থানা থেকে খবর আসে, উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারা অনেক আগেই রাজধানী থেকে রওয়ানা দিয়েছে। সে কোন মুহূর্তে এসে পৌঁছতে পারে।

বিকেল অতিক্রম করে সন্ধ্যে হয়ে এল। পীতাম্বরের মৃত্যুর শোক ধীরে ধীরে কমে এল। তাঁর গুণকীর্তন করে করে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অন্য কথা চলতে লাগল। সময় কাটানোর জন্য মানুষ গল্প, প্রবচন, কিম্বদন্তী, গ্রামের প্রত্যেকেরই জানা অজ্ঞ গোপন কেলেঙ্কারির কথা, খবরের কাগজে প্রকাশিত চাঞ্চল্যকর খবরের আশ্রয় নিল। পীতাম্বরের দু'একটি দোষের কথাও কেউ কেউ বলতে ভুলল না।

শ্মশানে সর্বদা মৃত ব্যক্তির বাইরে অন্য কথাই বেশি আলোচিত হয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর সেদিন সেখানে উপস্থিত মানুষগুলি কিছু ভয়াবহ, অবিশ্বাস্য এবং সঙ্গে হাস্যরসের কথা বলতে শুরু করল।……একদিন রাতে একজন ভোজ সেরে আসার সময় জোছনার আলোতে দেখল, সামনের গাছটিতে আত্মহত্যা করার জন্য যুবকটি একটি রশি নিয়ে তৈরি হচ্ছে। লোকটি বলল, দেখছে বাপু, আজকে অন্তত তুমি এই কুকাজটি কোর না, গ্রামের মানুষ আমাকেই দায়ী করবে। একজন বলল, আমার বাবার খুব সাহস ছিল। রাতের বেলা হারান গরুর খোঁজে এই জঙ্গলে এসে বাঘের দেখা পেল। বাঘটি এগিয়ে আসছে, বাবাও এক পা নড় চড় করছে না। মন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ ভেড়ায় পরিণত হয়ে গেল। একজন বলল, কাকার মুখে শোনা কথা।

ঐ জায়গাটাতে নাকি ভীম দুঃশাসনকে বধ করেছিল। ভীম দুঃশাসনকে গদা দিয়ে মারল। দুঃশাসন পালিয়ে এসে জঙ্গলে উপস্থিত হল, সেখানে ভীম তাকে বধ করে সোজা থানায় গিয়ে উপস্থিত।

রাত বেশি হল।

ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মহিলারাও চলে গেল। কিছু লোক ভাত খেতে গিয়ে আর ফিরে এল না। শ্মশানে চারভাগের একভাগ মানুষ মাত্র রইল।

রাত বারোটা বাজল।

পীতাম্বরের গ্রামের মোড়ল এবং দূরে থেকে আসা মুক্তি যোদ্ধারা ধীরে কেউ কাউকে আহ্বান না করে উঠোনে সমবেত হল। তাদের চোখে মুখে শঙ্কা, ক্রোধ আর উদ্বিগ্নতার স্পষ্ট চিহ্ন। একজন বলল, "বারোটা বাজার পর আমরা আর এক সেকেণ্ডও অপেক্ষা করতে পারব না। 'মৃতদেহ একটা রাতও বাসি করতে পারি না।'

'কিন্তু ওরা বোধহয় এসে পৌঁছল মাত্র।' একজন বলল।

'ওদের পৌঁছানর আশায় আমরা মৃতদেহ বাসি করব নাকি? কোন্ শাস্ত্রে রয়েছে?'

'তবুও সরকারের নির্দেশ।'

'নির্দেশ কি হে? কিসের নির্দেশ? ওদের কথায় সারাটা দিন প্রায় সোটা রাত আমরা পথ চেয়ে রইলাম। আমাদেরও তো একা দায়িত্ব রয়েছে।" 'মৃতদেহ সৎকার না করে তুমি কি দায়িত্ব পালন করতে চলেছ?"

কিছু সময় সবাই মৌন হয়ে রইল। একজন আর এক জনের মুখের দিকে তাকাল। বয়স্ক একজন উঠে দাঁড়িয়ে মোটরের আশায় এদিক ওদিক চাইতে লাগল। একটা বাদুড় শব্দ করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

'তাহলে এবার উঠা যাক, ধর।'

পীতাম্বর সইকিয়ার ক্ষীণ দুর্বল শরীর আগুনের লেলিহান শিখায় প্রায় শেষ হয়ে আসছিল! ঘি ঢালা এবং ধুনো ছিটোনোর সময় হয়ে এসেছে।

হঠাৎ মোটরের শব্দ হল: চারদিকে লাইটের আলো ছড়িয়ে পড়ল।

পুলিশগুলি দৌড়ে এসে চিতার কিছু দূরে সারি দিয়ে বন্দুক উল্টো করে মাটিতে নামিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। সুপার, ভলীরব আর উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্মচারী দুজনও দৌড়ে এসে মাথা নিচু করে, সারি দিয়ে দাঁড়াল। কেবল ভলীরব হেসে উঠলে সুপার তার দিকে একবার ভয়ংকর দৃষ্টিতে চাইল।

চিতার কাছে যে সামান্য কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বজ্রাহতের মতো যে সেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে অবাক দৃষ্টিতে পুলিশের দিকে তাকিয়ে রইল।

শেষ রাতে এই অরণ্যের মধ্যে, অগ্নিদগ্ধ হওয়া চিতার আগুনে আর অস্থায়ী বিদ্যুতের আলোতে সমস্ত দৃশ্যটাই হয়ে উঠেছিল কোন উদ্ভট নাটকের অভিনয়ের মতো।

একমাত্র ফটোগ্রাফারই জীবন্ত প্রাণীর মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই উদ্ভট দৃশ্যের বারবার ছবি নিচ্ছিল।

अनुबाद पत्रिका

मई-सितम्बर संख्या, २००३

सुदंर	सुभाष मुखोपाध्याय
रेकाडे	नारायण गंगोपाध्याय
नन्ही रौशनी	सिद्धेश
मौन हिंसा	राधेय
अनिंम बात शुन्यता	तरुन दिर्धागी

सुदंर

— सुभाष मुखोपाध्याय

(काव्य ग्रन्थ : ''फुल फुटुक'')

(अनुवाद : नबनीता नन्दी)

कवि सुंभाष मुखोपाध्याय की लेखन मार्कसवादी आदर्श और विश्वास को दर्शन है ।
वह संग्रामी चेतना से प्रेरित थे । और इस कारण हेतु सोन्दर्य को उन्होंने हमेशा उस नजर से हि बयान किया है । कवि ने ''पटानिक'' काव्य ग्रन्थ में भले प्रेम को कविता न लिखि हो, उनके ''फुल फुटुक'' आदि काव्य ग्रन्थो में एसी लेखन विरल नहीं ।
परन्तु उनकी दृष्टिकोण राजनैतीक और साम्यवादी होने के कारण, उनकी प्रेम की कविताएं चिराचरित रीति में नहीं लिखि जाती थी ।
उनके कविता में प्रेम के साथ हमेशा आर्थ सामाजिक और राजनैतीक परिस्थितियां मिल जुल के दर्शाई जाती है । इसका उदाहरन है उनका ''अग्निकोण'' काव्य ग्रन्थ ।
इस तरह से रोमन्टीक् प्रेम और मानवीक मुक्ति, जीन्दगी के दो एदम् पहलुं को अपने कविता में स्थान देकर उन्होने पाठक हृदय में अपना आसन अटल बना लिआ है ।
कवि सुभाष मुखोपाध्याय को ''ज्यान पीठ'' और ''पद्म भुषण'' पुरस्कार से सम्मानित किआ गया था।

जब तुम्हारा आँचल
हवा के झौंके से अकेले उड़ि जा रही थी
तब भी नहीं ।

शाम के टलते धुप में
बुंद बुंद पसीना
तुम्हारे चेहरे पर जब मोती की तरह चमक रही थी
तब भी नहीं ।

किसी बात पर आकाश को आलोकित कर
जब तुम हस उठे ।
तब थी नहीं ।

जब सायरन के बजतेहि
पाट के रोएं से टके सरों का एक समुन्दर
एक एक इस्तेहार के लिए
उँचे उठाए बाँहो के तरगं से तुम्हे ढक दिए
जब तुम और नहीं दिखाई दिए -
ठिक उसवक्त

आश्चर्य सुदंर दिखाई दिए तुम ।।

बांग्ला कहानी

रेकाडे

— नारायण गंगोपाध्याय

(अनुवाद : ननी शूर)

बहुबाजार स्ट्रीट और सियालदह के मोड़ को कुछ छोटी छोटी गलियों से या स्कॉट लेन की बगल से होकर विचित्र एक बाजार में हम पहुँच सकते हैं। अंग्रेजी में इस बाजार का एक शालीन नाम है - सेकंड हैंड मार्केट। लोगबाग इसे चोर बाजार कहते हैं। कदाचित किसी समय यहाँ चुराए गए साजोसामानों का बिक्री-बट्टा चलता था। आजकल वह व्यापार तो बंद हो चुका पर वह बदनाम जो एकबार लग गया वह अब भी इसके साथ चिपका है।

बैठकखाना मार्केट की छोटे छोटे पेड़-पौधों की दूकानों को पार करने के बाद इस बाजार की सीमा शुरु होती है। बाजार के इस हिस्से में बताने लायक कुछ भी नहीं है। नए-पुराने सस्ते जुते, सोला-हैट, इलेक्ट्रिक होटर, चकती टाँके स्टोव और दस-बारह आने सेरवाली लाल लाल झींगी मछलियाँ मिलती हैं। यहाँपर पैर रखते ही स्पिरिट और वार्निश की बू आती है। फिर आगे कदम बढ़ाने पर आप एकदम फर्नीचर की दुनिया में पहुँच जाएँगे।

नए-पुराने फर्नीचर से भरी दूकानें हैं। लैजारॉस कंपनी के पुराने बर्मी सागौन रंग पलटकर आपके इंतजार में हैं। किसी एक चमकीली चीज को अव्वल दर्जे का सी. पी. सागौन मानकर घर ले आए और छह महीने बाद पता चला कि दरअसल वह सागौन नहीं जास्थ था। कभी एकदम सस्ते में असली तून की चीज मिल जाएगी तो कभी काफी रुपये खर्च करके अलमारी खरीद ले जाकर देखेंगे कि कटी कटी काठ-कबाड़ के ऊपर बेमालूम वार्निश पोतकर आपको धोखा दिया गया है।

अर्थात् यहाँ की खरीदारी बिलकुल रास्ते के किनारे की लॉटरी-जैसी है। एक आना पैसा देकर काँटा घुमाएँ तो कभी तीन छोटे छोटे बिस्कुट मिल जाएँ और अगर नसीब खुल जाए तो कभी चंदन का एक साबूत साबुन ही मिल जाए।

फिर हम जैसे मध्यवर्ग के टुटपुँजियों को तो यहाँ लॉटरी का टिकट खरीदना ही पड़ता है। बहुबाजार या रिपन स्ट्रीट की बड़ी बड़ी दूकानों में कदम रखने की हिम्मत कहाँ?

छोटे मोटे एक बुककेसे की तलाश में मैं यहाँ आया था। पर मनोवांछित वस्तु एक भी नहीं मिली। वापस आने ही वाला था कि अचानक एक दूकान पर मेरी नजर पड़ी। उँह, फर्नीचर की दूकान पर नहीं। उस दूकान में 'बाबू कोलकाता' का अंतिम अभिज्ञान कमरे को सजाने सँवारने लायक कुछ सामग्रियाँ - जौनी मिट्टी का बड़ा बरतन, गिलट किए फ्रेम में विलायती पिक्चर, संगमर्मर या इमिटेशन स्टोन की दो-एक छोटी-बड़ी मूर्तियाँ, काँसे की नग्निका, पुराने फैशन की तरह तरह की छोटी मोटी चीजें थीं। चोंगेवाले एक ग्रामोफोन पर हिंदी गाने का एक रेकार्ड बज रहा था। गाने की आवाज सुनते ही मैं ठिठक गया। नहीं, हिंदी गीत के आकर्षण से नहीं। मैंने देखा कि वहाँ ढेर सारे पुराने रेकार्ड थे। 'जेखाने देखिबे छाइ' - इस आप्तवाक्य पर विश्वास करके मैं पहले भी लाभवान हुआ था।

पुराने रेकार्डों के ढेर में मुझे रवींद्रनाथ ठाकुर का दुर्लभ कंठस्वर मिल गया था, मिल गया था राधिका गोस्वामी जी का संगीत, दिलीप कुमार राय का गाया मशहूर संगीत 'मुठो मुठो रागां जबा'। उनमें से कुछ तो इतने घिसेपिटे थे कि मुश्किल से वे सुनने लायक थे, पर कुछ तो एक दम नए जैसे ही थे। कहना निरर्थक है कि उनकी कीमत आशातीत रूप से सस्ती थी। मैंने दूकानदार से आग्रह किया "रेकार्ड दिखाओ तो।"

एक आदमी ने रेकार्ड दिखाया। ज्यादातर रेकार्ड सिनेमा के सस्ते चटुल गीत के ही थे या लोकप्रिय 'पपुलर डिस्क' के। पूजा के दिनों ऐंप्लिफायर पर बजते बजते उन्हें अकालजरा प्राप्त हो चुकी थी। उनमें से एक रेकार्ड की ओर मेरा ध्यान गया। अपरिचित लेबेल और अज्ञात भाषा का था वह। रेकार्ड के ऊपर की लिखावट भी रोमन लिपि में नहीं थी। यह रेकार्ड ज्यादा पुराना भी नहीं था।

हिंदी गीत का रेकार्ड खत्म हो चुका था। मैंने अनुरोध किया - "इसे बजाओ तो।"

चोंगेवाले ग्रामोफोन से पहले तो ढेर सारे अजीबो गरीब बाजों की आवाज फैल गई। वैसा बाजा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। एक ड्रम बज रहा था, शायद गीटर भी था, और क्या था मैं समझ नहीं पाया। मैंने बहुतेरे विदेशी पिकचर देखे, रेकार्ड भी बहुत सुने, पर ऐसी चीज पहले कभी सुनने को नहीं मिली।

फिर गाना शुरू हुआ। लगा कि नारी और पुरुष के चार पाँच कंठस्वर थे। बाजे जितने अजीब थे - धुन भी वैसी ही विचित्र थी। धुनते ही खून में एक खलबली सी मच गई। वह धुन एकदम अपरिचित थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले कहीं उसे सुना हो। रेकार्ड के दूसरी तरफ भी एक ही वस्तु थी एक ही गाने को गाया गया था।

मैंने पूछा - "कहाँ मिला यह रेकार्ड?"

जवाब मिला - "चौरंगी इलाके में हमारा जो एजंट है, उसीने ला दिया।"

- "कौन-सी जबान है यह?"

बिहार के मुसलमान दूकानदार ने खीस निपोड़कर कहा - "क्या पता?"

पौने एक रुपये से वह रेकार्ड खरीदकर घर ले आया। मोलतोल करने से शायद और भी सस्ते में मिल जाता, पर ऐसा लगा कि मोलभाव करके जलील करने की चीज नहीं थी वह।

घर आकर मशीन पर जब रेकार्ड चलाया तो मेरी श्रीमती जी करुणा पढ़ाई की मेज छोड़कर आ गई। कालेज में अध्यापन करने को अभी अभी घुसी कालेज की छात्राओं से भी उसकी पढ़ाई की ताकीद ज्यादा थी। नाक-भौं सिकुड़कर उसने पूछा - "यह क्या है?"

मैंने कहा - "देख तो रही हो, रेकार्ड बजा रहा हूँ।"

- "कितना बेढब बाजा है भई। कौन-सा गाना है यह?"

- "पता नहीं।"

- "पता नहीं तो लाए क्यों ?"

- "ज़रा चुप रहो न जी, सुनने तो दो।"

करुणा कुछ देर तक चुपचाप सुनती रही। फिर उसके मुँह पर ढेर सारी खीज फैल गई।

- "दिमाग खराब कर दिया तो। इतनी सारी रद्दी चीजें कहाँ से उठा लाए हो? मुझे पढ़ने देने का मतलब न हो तो साफ साफ बता दो न, मैं छत पर चली जाऊँ।"

- "अरी भली मानस, तनिक सब्र तो करो। तीन ही मिनटों में तुम्हारे ज्ञानार्जन में कोई अड़चन नहीं आएगी।"

रेकार्ड खत्म हुआ। मैंने करुणा की तरफ देखा। उसके हाथ में जो लाल-नीला पेन्सिल था, वह उसके एक सिर को अनमने से कुतर रही थी।

- "बहुत बुरा लगा क्या करुणा?"

कुछ देर तक करुणा चुपचाप खड़ी रही। फिर कहा - "नहीं, उतना बुरा तो नहीं लगा। पर जो उचट गया। मेरी पढ़ाई को बरबाद कर दिया तुमने।"

- "क्यों ?"

- "बिलकुल अजीबो गरीब है यह धुन। ऐसा लग रहा है कि मैंने इस धुन को कहीं सुना हो।"

मैंने कहा - "हाँ, हाँ, ठीक। मुझे भी वैसा ही लगा था।"

करुणा चुपचाप जाकर अपनी मेजपर बैठ गई। मैंने मशीन को बंद किया, फिर देखा कि वह नहीं पढ़ रही थी, गुमसुम बैठी एक ब्लाटिंग पैड पर नीले पेन्सिल से कुछ रेखाएँ खींच रही थी।

मैं भी कुछ कॉपियाँ लेकर विश्वविद्यालय को उत्तीर्णों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश में लग गया। पर किसी भी कॉपी में मन नहीं लगा पा रहा था। कानें में उस अजीबो गरीब बाजों की आवाज और संगीत की धुन गूँज रही थी। वह धुन कहाँ सुनी थी, कब सुनी थी, कुछ भी याद नहीं आ रही थी।

मानो मेरी ही चिंता का डोर पकड़कर करुणा ने कहा - "यह क्या कर बैठे तुम?"

- "क्यों, क्या हुआ?"

- "इस रेकार्ड ने तो बड़ी परेशानी पैदा कर दी। ऐसा लगता है कि यह धुन बहुत ही जानी पहचानी है - मानो "करुणा ने दो-तीन धुनें गुनगुनाईं, फिर हैरान होकर बोली - "उँहु, कुछ भी याद नहीं आ रही है। यह कैसा पागलपन है। कर दिया तो मेरी पढ़ाई का काम तमाम।"

दरअसल उस रेकार्ड ने हम दोनों को उस शाम उलझा रखा। मन के उचटने की दशा थी। बहुत ही जाने पहचाने किसी शायर का नाम याद न आने पर या चाभी का गुच्छा अभी अभी कहीं रखकर फिर ढूँढ न पाने पर मन में जो बेचैनी पैदा होती है ठीक वैसी बेचैनी थी।

रात को जब खाना खाने बैठा तो करुणा बोल उठी - "हाँ, अब याद आई।"

मैंने आँख उठाकर देखा।

- "बचपन में मैं जब असम में थी, तब खासिया लोग

नृत्य के साथ ऐसा ही गाना गाया करते थे।''

- ''खासिया लोगों का गाना?''

करुणा जरा-सी विभ्रांत हो उठी। सिर हिलाकर कहा - ''ऊँह, ठीक खासिया लोगों का गाना भी नहीं। पर... पर... क्या बताऊँ?'' कुछ क्षण चुप रहकर बोली - ''बरसात के दिनों ब्रह्मपुत्र का गर्जन सुना तुमने? वह जब पहाड़ ढहाकर नीचे उतर आता है, बड़े बड़े पेड़ों को अपने बहाव में एक तिनके की तरह बहा ले जाता है दूर दराज के पहाड़ों पर जंगली हाथी चिंघाड़ चिंघाड़ कर उठते हैं तब नागा लोगों के ढाकों की आवाज...''

बोलते बोलते उदास होकर करुणा चुप हो गई। स्मृति कौंध गई। मानभूम की स्मृति। दोनों ओर कुसुम के पेड़ों की कतार और बाँस के घन जंगल थे। जंगल के बीच एक बीरान पथ पर मैं पैदल चल रहा था। अंधेरा उतर आया था। झालदा के पहाड़ दूर क्षितिज पर एक भौतिक आकार लेकर खड़े थे। बगल के एक बड़े तालाब में पनडुबियों की चहकार और झींगुरों की झनकार बज रही थी।

एकाएक पनडुबियों की चहकार और झींगुरों की झनकार की आवाज को दबाकर गुर्र... गुर्र की आवाज कर उठे नगाड़े। इस सिरे से उस सिरे तक, इस क्षितिज से उस क्षितिज तक। कोई त्योहार था उन लोगों का - गाँव गाँव में आरंभ हो गया छौ नृत्य।

उस धुँधले अंधेरे में - स्याह बन चुके कुसुम के पेड़ें। और बाँसों के जंगल में, झालदा के पहाड़ों की भौतिक छवि और नगाड़ों की उस आवाज से मेरा कलेजा धक धक कर उठा। उस दिन की बात याद आ गई थी। पुलिस के बुलेट से लड़ने के पहले की रात की बात। सन बयालीस के अगस्त में बालुरघाट में अंधेरे में डूबे संथाल गाँवों से वैसी ही नगाड़े और टिकारे की रोल मैंने सुनी थी।

बरसात के ब्रह्मपुत्र का गरज, नागा लोगों के ढाक, नगाड़े और टिकारे की रोल, छौ नृत्य का बाजा - इन सब के साथ कहीं किसी स्थान पर इस रेकार्ड की आवाज मिलती जुलती सी लग रही थी। पूरी पूरी मिलती नहीं - फिर थी नहीं कुछ मिलती थी। ठीक ठीक याद नहीं आ रही थी - पर कहीं कुछ समरूपता थी। इतना बुरा लग रहा था कि क्या बताऊँ।

अज्ञान अपरिचित और पुराना एक रेकार्ड खरीदकर यह कैसी मुसीबत मैंने मोल ली?

संयोगवश एकदिन करुणा को एक सहपाठिन हमारे घर आई।

महानगर के ऊँचे वर्ग की महिला थी वह। किसी दिन करुणा से गहरी सख्यता थी इसलिए हमारे इस गए गुजरे मुहल्ले में उसने पैर रखा। विदुषी तथा गुणवान महिला थी वह। वेस्टर्न म्यूजिक सीखने युरोप जा चुकी थी और वहाँ से म्यूजिक पर डाक्टरेट बनकर आई। एक मराठी एकसीक्यूटिव इंजीनियर के गले में वरमाला पहनाई थी।

उसे देखते ही करुणा ने हुलसकर कहा - आइभि, तू आ गई। बहुत अच्छा हुआ। हमारी पहेली का हल कर दे तो।

आइभि ने रेकार्ड को उलट पुलट कर देखा, भौंहें सिकुड़ी।

-''लगता है यह कोई स्थानीय भाषा है। बजाकर सुना तो।''

रेकार्ड बजाया गया। आइभि भी कुछ समझ नहीं पाई। शाँपा-भागनार-बाख-बीटोफेन से उसका परिचय था। उनपर एक छोटा सा भाषण हमें अकारण ही दे दिया। पर समस्या का समाधान वह नहीं कर पाई।

आखिर उसने अपना बैग खोलकर एक टॉफी मुँह में डाली। ढाँकी के सेलोफेन के आवरण को उँगली पर लपेटते हुए कहा - ''लगता तो है यह कोई कम्यूनिटि सॉन्ग है।''

करुणा ने कहा - ''सो तो है ही, कइयों ने एकसाथ मिलकर जो गाया है।''

टॉफी के आवरण को अंगूठे की तरह उँगली पर लपेटते हुए कहा - ''नाउ आई रिमेम्बर। स्वीटज़रलैंड के मैरेज फेस्टिवेल में कदाचित मैंने ऐसा गाना सुना होगा।''

मैरेज फेस्टिवेल! करुणा ने मेरी तरफ देखा। आँखें चार हुईं। हममें से किसीको यह जवाब नहीं जँचा।

करुणा ने कहना चाहा - यह शादी की धुन-जैसी लगती है क्या ? फिर स्वीस लोग तो स्लाव बोलते हैं -

आइभि ने मौका नहीं दिया। उठ खड़ी हुई, बोली - ''आज चलती हूँ भई। न्यू एम्पायार में एक शो होगा, उसका रिहर्सल करना है। देर भी बहुत हो चुकी। नैन्सी इज फोलिंग वेरी लोनली। ए पुअर लिटल थिंग शी इज।''

नैन्सी उसकी बेटी नहीं - कुत्ती है।

उसकी मोटर के चले जाते ही करुणा झुँझलाकर बोली - ''चालबाज कहीं की।''

मैं हँस पड़ा - कोई जवाब नहीं दिया। करुणा झल्ला उठी, बोली - "सुनती हूँ युरोप में पेड़ों तले डक्टरेट का डिप्लोमा बिकता है। पाँच शिलिंग या सात फ्रांक के बदले..."

करुणा। खुद डक्टरेट नहीं थी, इसलिए उसको यह ईर्ष्या स्वाभाविक थी। असल बात तो यह थी कि श्रीमती आइधि ने थी हमें निराश किया। हम जिस अंधेरे में थे उसी अंधेरे में पड़े रहे।

उस दिन आधी रात को मेरी नींद खुल गई।

पानी पीने उठा तो एक शेर का दहाड़ कानों में पड़ा, रात के उेढ़ बजे सोई हुई कोलकाता महानगरी महानगरी के ऊपर से एक गंभीर ध्वनि-तरंग प्रवाहित होने लगी। स्वर आर्त पर भयंकर था, क्लांत पर क्रुद्ध था। पानी का गिलास ओंठों तक ले जाकर भी नीचे उतार रखा।

एक शेर दहाड़ रहा था।

हमारे घर से एक सीधी रेखा खींची जाए तो दो बड़ी बड़ी सड़कों के उस पार मार्कास स्क्वार है। सर्कस के एक दल ने आज कई दिन हुए वहाँ अपना डेरा डाला, वहीं से शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही थी।

आधी रात को रोशनी से उजागर इस नगरी में उस निद्राहीत शेर को कदाचित सुंदरवन का सपना सता रहा होगा। इसी लिए इसतरह चौंककर जाग उठा वह। पर न जाने क्यों शेर का वह दहाड़ सुनते ही मुझे उस विदेशी रेकार्ड की याद आई। दोनों ध्वनियों में भी समरूपता थी। पर मैं किसी भी तरह पकड़ नहीं पा रहा था - किसी भी तरह नहीं।

खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। सामने कुछ पाम के पेड़ थे - उनके ऊपर तारे थे, बादल के कुछ टुकड़े थे, सब कुछ शेर के गर्जन से मानो काँप रहे थे।

आखिरकार एक धू-पर्यटक ने हल किया,

रेकार्ड को सुनते ही वे चौंक उठे। आहिस्ते से उन्होंने पूछा - "कहाँ मिला आपको यह रेकार्ड?"

- "चोर बाजार में।"

- "अजीब बात है।"

- "क्यों ?"

- "सोचता हूँ कोलकाता में यह रेकार्ड आया कैसे? एकदम गुप्त रुप से इसका निर्माण हुआ था - गुप्त रुप से स्वल्प संख्या में इसकी बिक्री और बँटाई हुई थी। यह रेकार्ड बनानेवाला प्रत्येक कलाकार नात्सियों की राइफल की गोली से शहीद हो गया था।"

मेरे मस्तिष्क में बिजली कौंध गई। करुणा की आँखें चमक उठीं।

- "कृपया विस्तार से बताइए न।"

पर्यटक ने युरोप के एक छोटे-से मुलक का नाम बताया। नात्सियों के अधिकार के दिनों यह रेकार्ड वहाँ के स्वतंत्रता-संग्रामियों का देशभक्ति का संगीत था। हिटकर के जासूसों ने ऐसा दावा किया था कि उन्होंने उस रेकार्ड को हर एक कापी को, इसको ऑरिजिनल को तथा सके तर एक कलाकार को लिक्विडेट कर दिया था। और इधर-यह रेकाडल मिला कोलकाता के बाजार में।"

पर्यटक रुका।

रास्तेपर से विद्यार्थियों का एक जुलूस नारे लगाते हुए गुजर रहा था। हम तीनों ने कुछ देखतक ध्यान से उनके नारों को सुना। कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया।

पर्यटक ने फिर कहा - "एक बहुत ही उमदा चीज आपके हाथ लगी। पता नहीं विश्वयुद्ध के बाद उस देश के वासी इस रेकार्ड को फिर निर्माण कर सके कि नहीं। अगर न कर सके..."

विद्यार्थियों के जुलूस के नारों की आवाज एक जलप्लावन के समान प्रबल वेग से टूट गई। धायँ-धायँ की कई आवाजें सुनाई दीं। फिर सड़कपर से चीखता चिल्लाता हुआ कोई निकल गया - "लाठी-चार्ज चल रहा है, आँसू-गैस फेंका जा रहा है..."

फिर खामोशी फैल गई कमरे में।

दूर से हम सुन रहे थे - प्राणों की उताल उत्तेजना, क्षोभ का प्रचंड गर्जन। नहीं - अब उस धुनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ब्रह्मपुत्र नद की बरसात, बादल, नागा पहाड़ों के टाकों, छौ नृत्य के नगाड़ों, बालुरघाट की रात की दिल दहलनेवाले टिकारों की आवाज - मार्कास स्क्वार से आनेवाला शेर का दहाड़ और अब जख्मी जुलूस का यह शोर सब ने एकसाथ मिलकर उस धुन की रचना की। देश-देशांतर में, काल कालांतर में यह सुरतान समाद है। हाँ पता था हमें भी पता था इस धुन का। हमारे शरीर की रक्तधारा में यह स्वर प्रसुप्त रुप में था, इसीलिए अबतक पहचान नहीं पाए।

करुणा ने मेरी ओर देखा। एक असीम असहनीय घृणा से उसकी आँखें जल रही थीं। धीर धीरे वह कह उठी - "इस रेकार्ड को कोई तोड़कर मिटा नहीं सका। कोई कभी इसे मिटा भी नहीं सकेगा।"

नन्ही रौशनी

— सिद्धेश

रात के साढ़े दस बज रहे थे। शहर से लौटते हुए प्रताप लोकल ट्रेन से उतर कर घर की तरफ रवाना हुए। बड़ी थकावट महसूस हो रही थी, ऊपर से प्यास जोर की लगी थी। कमर और पेट के बीच दर्द जोर का था। यह रोज का किस्सा है, लेकिन आज अपने दामाद और बेटी के घर गये थे, ऑफिस से छूटते ही भागे थे उस ओर, पहुंचने में देर हो गयी थी, इसीलिए ज्यादा देर हुई। ट्राम बीच रास्ते में जाकर खराब हो गयी। प्रताप आधा घंटा से ट्राम में ही झूलते रहे थे। आफिस से जब निकले ते, तभी सात बज चुके थे।

प्लेटफार्म पर उतरते ही थोड़ी-सी ठंडी हवा लगी, तो प्रताप के जान में जान आयी। लोकल ट्रेन तो जेलखाने की तरह है। न सही ढंग का पंखा, न बैठने की सहूलियत। भीड़ इतनी कि खड़े होने तक की जगह नहीं। लगता है, आदमी नहीं, मेंड़-बकरियों को ठूंस कर भर दिया गया हो। पसीने से लथपथ लोग, युगान्ध से परेशान लोग चीख-चिल्लाहट के बीच बेहोशी में खड़े रहते हैं। शरीर में जान नहीं रहती, बस सांस किसी तरह चलती रहती है। दिन-ब-दिन लोकल ट्रेनों की हालत बदतर होती जा रही है।

घर की तरफ बढ़ते हुए प्रताप थोड़ा ठिठके। कोई गली में बीच रास्ते पर सोया पड़ा था, शायद पियक्कड़ है। लेकिन आसपास कोई नहीं, चारो तरफ सन्नाटा छाया था। दूर पर कुछ लोग आपस में बतिया रहे थे। नजदीक जाने पर पता चला कि वह खून से लथपथ पड़ा है। प्रताप दहशत में आ गये। किसी प्रकार वहां से पार कर दूसरी तरफ मुड़ गये। वे लगभग भागते हुए घर पहुचे। घर के अंदर पहुंच कर बिस्तर पर लेट गये। वे हांफ रहे थे।

पत्नी सुलता जब पानी का गिलास लेकर पास आ खड़ी हुई, तब उन्हें होश आया।

"क्या हुआ? इतनी देर कहां लगा दी ?"

प्रताप ने पानी का गिलास हाथ में लेकर सुलता की तरफ ताका।

"सुमन के पास गया था। उसके बाप का फोन आया था इसीलिए।"

"क्यों ? सुमन तो ठीक है न ? और गीता ?"

गीता यानी बेटी। सुमन उसका नन्हा बेटा। प्रताप का नाती। सुमन से प्रताप का जी-जान का लगाव है। प्रताप को इस तरह मोह-माया में फंस रखा है कि सात-दस दिन के भीतर उसको न देख पाकर भीतर-ही-भीतर परेशान हो उठते हैं। सुमन भी नाना-नानी की रट लगाये रहता है।

"सुमन को थोड़ा बुखार है।" सौगत ने फोन पर आने के लिए विशेष रुप से आग्रह किया था। सुमन मुझको देखने की जिद्द कर रहा है।

प्रताप न चाहते हुए, भी, परेशानी में चले गये थे। फिर तो किसी प्रकार सुमन को भुला-बहला कर चले आये थे। कह आये थे कि कल फिर वे आयेंगें। हो सका तो, मामा भी आयेगा। मगर वे जानते हैं कि मामा यानी प्रताप के बेटे नवीन को फुरसत ही कहां है ? वह भी सुमन को बहुत प्यार करता है, लेकिन वह तो अपनी ही दुनिया की भाग-दौड़ में लगा रहता है। नानो सुलता का वहां हाल है। घर से बाहर शहर में नौकरी, ट्रेन से ही रोज आना-जाना। हां, वह समय की पाबंदी बरतती है। सुबह नौ बजे निकलना, फिर शाम के छह बजे तक लौट आना। लेकिन आने-जाने की इस परेशानी को उसे भी बखूबी झेलना पड़ता है। ट्रेन की भीड़, फिर बस पकड़ने की आपा-धापी। एक बार नहीं, कई बार वह चोट खाते-खाते बची थी। समय ने आदमी को आज कितना लाचार कर रखा है। जितना ही विज्ञान ने अपने हाथ-पैर बढ़ाये है, उतना ही आदमी परेशान होता जा रहा है। दो क्षण आदमी के समय नहीं कि वह अपने बारे में सोच सके।

"तो फिर वहीं रह जाते, इतनी रात को लौटने की जरुरत नहीं थी।"

"तुम परेशान हो जाती न, कह कर तो गया नहीं था।"

"ट्रेन की हालत तो देख ही रहे हो, आज भी ट्रेन ठीक से

नहीं चली। बीच रास्ते में आकर रुक गयी थी। ओवर-हेड करेंट नहीं था। अंधेरे और गर्मी में ही लोग घंटा भर परेशान रहे। मैं भी तो देर से आ रही हूं।

''यह तो रोज का किस्सा है। अखबारों में बराबर लिखा जा रहा है, लेकिन लोग, विशेषकर बड़े लोग इतने कामचोर और सुविधाभोगी हो गये हैं कि उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। वे सब के सब बेहया हैं।''

''खैर छोड़ो। चल कर हाथ-पांव धो लो। खाना परोसती हूं। कमर में अब दर्द कैसा है ?''

''ठीक नहीं है। उम्र हो चली है। यह सब तो लगा ही रहेगा। कभी सरदर्द, कभी प्रेशर, कभी कब्जियत और क्या-क्या...'' प्रताप ने उठते हुए कहा।

''नवीन भी अब तक नहीं लौटा है।''

''वह कब दस-ग्यारह बजे रात के पहले लौटा है। अरे हां, सुमन बुखार में भी नानी-नानी की रट लगा रहा था। कभी जाकर देख आना। शनिवार को तुम्हें जल्दी छुट्टी हो जाती है। उसी दिन चली जाना। मुझे तो कल भी जाना है। उसके भले-चंगे न होने तक मैं परेशान रहूंगा।''

''हां, सुमन ने तो तुम पर भी जादू कर रखा है। इतना तो अपने बेटे-बेटियों पर भी तुम्हारा खिंचाव नहीं था।''

''सच सुलता, उस पाजी ने मुझे इस तरह मोह में फांस रखा है कि चैन से मरने भी नहीं देगा।''

तभी बाहर कॉलबेल बजा था। शायद नवीन आ गया है। सुलता ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, ''जल्दी से हाथ-पांव धोकर खा लो। नवीन को तैयार होने में देर लगेगी। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है।''

प्रताप बाथरूम जाने के लिए उठे। कमर में तेज दर्द दौड़ गया, मगर इसकी परवाह न कर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गये।

पिछले दो-चार सालों से प्रताप और सुलता कहीं बाहर नहीं गये। उसे के लिहाज से परेशानी भी कम नहीं बढ़ी थी। समय कैसे-कैसे बीत जाता है। इनकी शादी के बत्तीस साल कैसे बीत गये, इसका खयाल नहीं रहा।

प्रताप खुद इतने अपराध-बोध से ग्रसित रहते हैं कि सुलता की बातों का सामना नहीं कर पाते। कई बार सुलता तुनक कर कहती है, ''अब कभी तुम्हारे साथ बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। चार साल पहले विवाह-बंधन के वर्षगांठ पर निकलती रही, लेकिन तुमने जैसे अपने मन से कभी नहीं चाहा, जबरदस्ती मैं ही करती रही, इसीलिए निकले। मगर मात्र कर्तव्यबोध तुम पर हावी रहा। तभी से कसम खायी...''

प्रताप के रिटायर्ड होने में चार-पांच साल और हैं। तब वे क्या करेंगे। इच्छा है कि देश-भ्रमण पर निकल जायेंगे। मगर सुलता अगर जाना न चाहे। यह भी सोचा है, अगर लड़के नवीन के अधीन वह कर दया का पात्र बनना पड़े, तो यह उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। पता नहीं, बहू कैसी हो ? आज का जैसा जमाना है। कोई भरोसा नहीं। शायद सुलता भी यही सोचती है। तब ''ओल्ड एज होम'' की शरण लेनी है।

कई बार सुलता से इस बात पर बहस हुई है। सुलता इस पक्ष में न होते हुए भी इसकी सुख-सुविधा पर बराबर चर्चा होती रही है। सुलता के कार्यालय की एक महिला ने ''होम'' में जाने का निर्णय ले लिया है। मगर वह तो अकेली है, शादी भी नहीं की। उसके संबंधियों की नजर उसके बैंक-बैलेंस पर लगी है। वह महिला अलका रिटायर्ड होने के पहले ही छुट्टी ले लेना चाहती है। सारा पैसा ''होम'' में लगा कर बाकी बचे पैसों को किसी संस्था में दे देना बेहतर समझती है। सुलता को भी ''ओल्ड एज होम'' का इश्तहार देकर उससे सलाह-मशविरा लेती रही है। सुलता ने उस दिन इश्तहार दिखाते हुए प्रताप से कहा था, ''देखो, आदमी जब असहाय की स्थिति में पहुंच जाता है, तो यहां जाता है।''

प्रताप ने कहा, ''लेकिन हम तो अभी असहायवाली स्थिति में नहीं हैं। अपना मकान है, जब तक हम दोनों हैं, ऐसी स्थिति नहीं आयेगी।''

सुलता ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया। मगर भविष्य किससे देखा है ? प्रताप की सारी मोह-माया एक जगह पर केंद्रित हो जाती है और वह है सुमन। कितना चाहता है उन्हें। क्या वह भी बड़ा होकर जमाने की हवा में बह जायेगा?

सुलता ने उस दिन पूछा था, ''तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। एकबार जाकर डाक्टर को क्यों नहीं दिखा आते ? तुम्हारे साथ कोई नहीं जायेगा, किसको फुरसत है इतनी। कहो तो, एक दिन मैं ही छुट्टी ले लूं।

"नहीं, नहीं, रहने दो। मुझको फुरसत नहीं है। जब बिस्तर पर पड़ूंगा, तब देखा जायेगा।" लेकिन लगता है, प्रताप खुद महसूस करते हैं। उनकी तबीयत भीतर से गिरती जा रही है। किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कहीं भी महफिल में या दोस्तों से मिलने गोष्ठियों में जाना छोड़ दिया है। आमंत्रण पाने पर उसे चढ़ कर रख लेते हैं। जाते नहीं। सिनेमा या किसी सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी जाना छोड़ दिया है। बमुश्किल नौकरी कायम रखनी है, इसलिए इतनी दौड़-धूप परेशानियों को झेलते हुए ऑफिस जाते हैं। सुबह दस से लेकर रात के नौ-दस तक बाहर रहना पड़ता है। चार घंटे तो उनको आने-जाने में ही लग जाता है।

कुछ दिन बीत जाने पर ही सुमन को देखने, उसे छूने और बतियाने की इच्छा होती है, तो वे ऑफिस से निकलने के बाद उस दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं। जानते हैं कि इससे उनके शरीर पर क्या बीतनी है, फिर भी मन है कि मानता नहीं। लौटते वक्त सुमन की याद में अपने-आपको भूल जाते हैं और रास्ता तय हो जाता है। आज भी सुमन के पास जाना है, कल ही वे भरोसा दे आये हैं। सुमन नन्हा बच्चा है, वह कुछ कहेगा नहीं, मगर भीतर-ही-भीतर उनके आने के राह देखेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रताप कह कर भी नहीं गये हैं। ऑफिस में काम खतम करते-करते देर हो गयी थी या तबीयत नाशाद थी कि देर रात तक लौटना उनके लिए वाजिब नहीं था। मगर इसे सुमन ने याद रखा था। दूसरे दिन जाते ही अपनी तोतली आवाज में शिकायत की थी। तभी प्रताप को लगा था कि उनका कह कर न जाना, उसके लिए कितना कष्टदायक था।

पिछली बार प्रताप अपनी बेटी, दामाद और नाती सुमन के साथ तीन दिनों के लिए समुद्र-भ्रमण पर गये थे। सुमन सब समय उनके साथ उनकी नजरों के सामने था। रात में उन्हीं के पास सोता। तीन दिन कैसे-कैसे बीत गये, उन्हें पता भी नहीं चला। समुद्र-स्नान से लेकर बालुका राशि पर घोंघे और शंख बीनने तक उनको साथ देना पड़ा। उन दिनों वे सुमन की तरह की तरह ही बच्चे हो गये थे। वहां से लौटने के बाद बस-स्टैंड पर उन्हें छोड़ कर सुमन अपने घर नहीं जाना चाहता था। कितने जोर-जोर से तड़प कर रोया था। जबकि दो दिन बाद वे खुद उसके पास गये था। बेटी गीता ने हंस कर कहा था, "सुमन अब हमारे साथ न रह कर आपके साथ रहना चाहता है। इसे ले जाइए और पास रख कर सिखाइए-पढ़ाइए। सब समय आपकी रट लगाये रखता है।"

प्रताप ने हंस कर सुमन की तरफ देखा था। वह सिर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था और मन-ही-मन खुश हो रहा था। आज उसकी तबीयत खराब है। प्रताप अपनी सारी परेशानियों के बावजूद फिर उसे देखने जायेंगे। सुबह जल्दी उठ कर ऑफिस जाने की तैयारी में लग गये। एक बार सोचा कि ऑफिस न जाकर उसी के पास चले जायें। आज ऑफिस की छुट्टी कर लें। मगर घर से निकलने तक कुछ भी तय नहीं कर पाये।

घर से प्रताप के पहले ही सुलता निकल जाती है। उसे और भी जल्दी रहती है, लोकल ट्रेन पकड़ने की। प्रताप घर से निकल कर स्टेशन की तरफ बढ़े, प्लेटफार्म तक पहुंचते ही उन्हें पता चला कि लोकल ट्रेन ठीक से नहीं चल रही है। एक ट्रेन प्लेटफार्म पर ही खड़ी थी। सिगनल न मिलने की वजह से खड़ी थी, पिछले घंटे भर से। तो क्या सुलता बस-स्टैंड की तरफ चली गयी ? मगर प्रताप की इच्छा नहीं हुई कि एक माइल चल कर बस-स्टैंड तक जायें और फिर भीड़ में ढूंस कर डेढ़-दो घंटे बाद ऑफिस पहुंचें। वे ट्रेन में आ बैठे। ट्रेन के बहुत सारे यात्री जो पिछले स्टेशनों से चले आ रहे थे, वे उठ कर चले गये थे, इसीलिए प्रताप को बैठने को सीट मिल गयी। ट्रेन जब चले, तब चले-ये जम कर बैठे रहे। एक सिगरेट सुलगा ली और बाहर की तरफ ताकते हुए भीतर-ही-भीतर कहीं किसी कोने में खो गये।

एक घंटे बाद जब ट्रेन चली, तब तक प्रताप बैठे-बैठे ऊब चुके थे। उन्हें प्राय: खांसी हो गये कंपार्टमेंट में झपकी आ गयी थी। हवा का तेज झोंका से उनकी आखें खुल गयीं। अब तक वे गर्मी के मारे पसीने से लथपथ हो रहे थे। कंपार्टमेंट में पंखा चल रहा था, पर हवा नहीं मिल रही थी। पंखा इतना गंदा और उसके ब्लेड सपाट थे कि हवा उलटे लौट जा रही थी। ट्रेन चार स्टेशनों के बाद फिर एक बार बीस मिनटों के लिए रुकी रही। सिगनल नहीं मिल रहा था। वे अंदर-ही-अंदर परेशान हो उठे। सोचा, लौटती ट्रेन से घर लौट जायें। डेढ़-दो घंटे देर से ऑफिस जाकर क्या करेंगे ? यहां भी अन्यथा परेशानी होगी। लेकिन सुमन के पास आज जाना ही है। घर लौट जाने पर फिर वे निकलने से रहे। अत: मन मार कर ट्रेन में बैठे रहे।

ऑफिस जाने पर हलके से दो चार व्यंग्य के वाक्य सुनने पड़े। लेकिन अपनी अक्षमता बताते हुए प्रताप ने कहा, "यातायात

की स्थिति ऐसी ही रही तो हम क्या कर सकते हैं ?''

इस बात पर पासवाली कुर्सी पर बैठे मि. भारती हंसने लगे। प्रताप झेंप कर रह गये। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, ''लेट स्लिप रेलवे से क्यों नहीं ले लिया ?''

''तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर रोज-रोज यही हालत रही तो लेटस्लिप की क्या उपयोगिता रह जाती है।'' प्रताप झुंझलाये हुए थे।

दूसरे सहयोगी ने व्यंग्य के लहजे में कहा, ''और फिर लेट-स्लिप लेने के लिए तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। एक तो ट्रेन लेट, उस पर लाइन में खड़े होकर अपनी बारी आने तक और लेट। वाह !''

प्रताप गुस्से को भीतर-भीतर पी गये। क्या करें, किसको गाली दें, ट्रेन के चालक को या लाइनैमन को ?

दिन भर किसी तरह मानसिक दबाव से ग्रसित रहे। शाम बोत जाने पर जब ऑफिस से निकले तो छह बज चुके थे। ट्राम पकड़ने की आपा-धापी में भूल गये कि सुमन के लिए कुछ मिठाई वगैरह नहीं ली। फिर यह भी सोचा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, कल ही उसे बुखार में देख आये हैं। दौड़ कर एक भीड़ भरी ट्राम में जा चढ़े। ...ट्राम अपनी धीमी गति से चल पड़ी, तब उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। दिन भर की परेशानी, मरौव्वत में उनकी जान आफत में थी। अब जाकर सुमन के पास दो घड़ी बैठ कर यह सब भूल जायेंगे। जब सुमन अपनी तोतली आवाज में कहेगा, ''नाना, मेरे लिए क्या लाये ? नाना, तुम्हारे दांत देखूं, तुम बड़े हो गये। देखो-देखो, मेरे दांत ठीक हैं। नाना, देखो न मेरा खिलौनेवाला पिस्तौल टूट गया है और यह जापानवाला ट्रेन, वह कितना तेज दौड़ता है क्या कहते हैं मोनो रेल।''

प्रताप जवाब में कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसकी तरफ एकटक ताकते हुए मुस्कराते ही रहेंगे। कभी उसके घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां डाल कर सहलाते रहेंगे या फिर अपने पेट पर बैठा कर उसकी मां और पिताजी के प्रति उसकी शिकायत सुनेंगे।

चौरंगी से सुमन का घर जाने में ट्राम ही सबसे बेहतर है। जिस रास्ते से ट्राम जाती है, वह इलाका मैदानों, पेड़ों और बेहतरीन दृश्यों से भरा है। बीच में विक्टोरिया मैदान, विभिन्न क्लबों के टेंट, उनमें सजी-सजायी फुलवारी और सीध में चली गयी पेड़ों की शृंखला, दूसरी तरफ फोर्टविलयम और गंगा पर बना नया विद्यासागर पुल, उसी से जुड़ा ओवरब्रिज का सर्पीला टैर-दृश्य देखते बनता है। यह कलकत्ता का सबसे अछूता, खूबसूरत जगह है। लोग मैदान में दूर-दूर तक फैली मखमली घासों पर शाम को बैठे रहते हैं। जोड़ों की कमी नहीं रहती। उसके सामने आकाश में झांकता विक्टोरिया भवन का रौशनी में झिलमिलाता गुम्बद। उस पर परी की प्रस्तर मूर्ति। उसके पंख लगे हों, मानो उड़ रही हो।

ट्राम जाते-जाते एक हिचकोले के साथ रुक गयी। लोग चौंके नहीं, केवल मुस्कराये। प्रताप भी देखा-देखी में मुस्कराये, मगर उनके भीतर फिर से तूफान उठ खड़ा हुआ।

कंडक्टर को पूछा, ''क्या हुआ भाई, ट्राम चलेगी या नहीं

''नहीं बाबूजी, देखते नहीं, चक्का लाइन से उतर गया है। बनने में समय लगेगा। आपको कहां जाना है ?''

''बहनुम में...'' चाह कर भी प्रताप नहीं कह सके। बस दूसरे यात्रियों के साथ नीचे उतर गये। सुमन का घर अब भी दूर है। वे यात्रियों की भीड़ में भेड़ियों की तरह आगे बढ़े। हठात् उन्हें क्या हुआ, धीरे से अनजाने ही मैदान में उतर गये। मैदान के चारो तरफ धुंध अंधेरा छाया हुआ था। दूर-दूर पर रास्ते के किनारे रोशनी से झिलमिलाते बल्ब विभिन्न लट्टुओं की तरह लग रहे थे। विक्टोरिया का गुम्बद रौशनी में झिलमिला रहा था, परी मानो अब भी उड़ रही थी। प्रताप धीरे-धीरे मैदान में चलते हुए अंधेरे में खो गये।

तेलुगु कहानी

मौन हिंसा

— राधेय

(अनुवाद : कोम्मिशेट्टि मोहन)

श्री राधेय पहले कवि है और उसके बाद ही कहानीकार है । कवि के रूप मे इन की प्रतिभा हर कविता सकलन मे प्रकट हो चुकी है । इनके कई कविता सग्रह विभिन्न संदर्भो में पुरस्कृत है ।
कविताओं की तुलना में इनकी कहानियाँ सख्या की दृष्टि से कम है । फिर भी प्रतिभा की दृष्टि से कम नही ।
वे मूलतः कवि होने के नाते इन की कहानियो में भी कविता का सौदर्य झलक पडता है ।
इनके प्रकाशित कुछ कविता सग्रह परो प्रपथन कोरम्, दिव्य दृष्टि (पुरस्कृत), तुफानु पुदटि प्रशति (पुरस्कृत), ई कर्णाटिकि तडि लेदु आदि ।
'उम्मिडिशेट्टि साहिनी पुरस्कार' के व्यवस्थापक है और पिछले दस वर्षो से हर साल कविता सग्रहो की प्रतियोगिता आयोजित करके श्रेष्ठ कविता सग्रह को पुरस्कार प्रदान कर रहे है ।

विचारों को एक ही झुरमुट । यह उन का केवल आरंभ ही था एक अंतहीन विचारों की हलचल थी ।

विचारों के चूल्हे में गिर कर शलभ जैसा झटपटाना हृदय

वह इतवार का दिन था। यही एक मात्र खुशी थी। सप्ताह के छः दिनों के मानसिक और शारीरिक क्षोभ से थोड़ा सा चैन मिलने का दिन।

लगातार यांत्रिक जीवन में यह एक मात्र दिन ही चैन की साँस लेने का दिन है ।

मैं सावधानी बरतने लगा कि ये अमूल्य क्षण आँखे की पलकों से गायब न हो जाय। मैंने जलदी से 'श्यत रातें' कहानी संग्रह हाथों में लिया।

तब तक धारओं में फैले हुए सभी विचार फिर से एक साथ इकट्ठे होने लगे। 'पुस्तक पठन' में तललीन होने पर मैं जीव समाधि में चले गये 'ध्यान योगी' सा बन जाता हूँ। पुस्तक पूरा पढ़ कर बंद करने के बाद इतना संतोष मानो संसार की समीक्षा की है ।

जीवन के बारे में सपना अलग है और सचाई अलग है । अपना दृश्य को देखता है । लेकिन सचाई घावों का स्पर्श करती है ।

मध्य वर्गीय लोग आशा जीवी होते हैं । वे निरंतर आर्थिक संबंधों से संघर्ष करते रहते हैं ।

'पिताजी... पिताजी...' एक आवाज़ ।

बाहर से हैरानी के साथ मानो दौड़ते हुए सतोष सकोच में पहुँचा ।

मौन का भंग होने पर भय झट सिर उठा कर उसकी ओर देखा।

मानो वह मेरी नज़रों का मतलब समझ गया हो, कुछ परेशान हो गया। बातें गले से बाहर नहीं निकलीं।

'क्या है बेटा! बोलो! क्यों रुक गये...'

यह जान कर कि उस का पूँह छोटा हो गया, मैंने प्यार से पूछा।

उसका उत्साह फिर बढ़ गया। नजदीक आ कर बैठ गया।

वह आठवीं कक्षा में पढ़ रहा है।

'आज हमारे अध्यापक ने सभी छात्रों से एक सवाल पूछा है।'

'क्या है यह? बोलो। अगर तुम उत्तर नहीं जानते हो तो मैं बताऊँगा न....?' मैंने कहा।

'हम सब ने वहीं उत्तर दिया है।'

'असल बात क्या है?' मुझ में जिज्ञासा बढ़ गई।

'सवाल यह है । क.... तुम लोग पढ़ कर बड़े होने पर क्या क्या करोगे ? तुम क्या क्या बनना चाहते हो ?'

'फिर तुमने क्या उत्तर दिया था ?' मेरे पूछने के पहले ही वही कहने लगा।

'यही कि... हमारे दोस्त वासु, रमेश, दीपू, पवन, भाग्य, सुभाषिणी, इन सब लोगों ने कहा कि... डाक्टर, इंजनीयर, वकील, जासूस, वैज्ञानिक आदि बनेंगे। लेकिन मैंने कहा कि... तुम्हारी तरह 'अध्यापक' बनूँगा। उस की आँखों में एक तरह का 'अभिमान' झलकने लगा।

'वेरी गुड! बहुत अच्छा कहा है।' मैंने संतोष के साथ उसकी गाल पर चुम्मी डाली।

बस, मेरी बात से उस का उत्साह दुगुना हो गया। वह क्रिकेट का बैट लेकर बाहर दौड़ पड़ा।

रसोई घर में श्रीमती 'मिक्सी' के साथ कुश्ती लड़ रही थी। इस बाप-बेटों का वार्तालाप सुन कर भी वह निर्लिप्तता से अपने काम में मग्न थी।

उस की बेचैनी थी कि उस की आज्ञायें और उच्छ्वाएँ 'मिक्सी' में नरम खीर बन रही हैं।



सच है! सत्या की वेदना बेमतलब की नहीं है। हम दोनों और हमारे तीन। प्रति दिन घर भर की चाकरी। धुँधले अंधकार में पाँच बजे ही उस की दिनचर्या शुरु होती है । सात बजे तक बच्चों के लिए और मेरे लिए कैरियरों को तैयार रखना। सुबह का नास्ता। स्नान-पान। हम सब के चले जाने के बाद बाकी चाकरी। कपड़े धोना इत्यादि कामों की हड़बड़ाहट। भोजन के पश्चात् एक घंटे का आराम भी नहीं। धोये हुये कपड़ों की इस्त्री करना, छुटे हुए बटने लगाना और सिलाई का काम शाम को पाँच बजे तक रहेगा ही।



इकलौता बेटा है। उसके आगे और पीछे सब लड़कीयाँ ही हैं। इस के पैदा होते ही मैंने कहा था कि ऑपरेशन करवा लूँगी। लेकिन आप ने अनसुनी की। तीसरी बार फिर से लड़की होते तो अच्छा होता। एक के दो लड़कियाँ हो गई। मैं कितना भी समझाऊँ... आप अपनी जिद्दी नहीं छोड़ते। मेरी आकांक्षा है कि कम से कम वह तो डाक्टर या इंजनीयर बने। लेकिन वह कहता है कि, 'अध्यापक बनूँगा, अध्यापक!' उसका यह मौन संघर्ष मिक्सी की आवाज में मिल गया।

'सत्या! सुन रही हो, हमारा बेटा क्या कह रहा है? मेरी तरह अध्यापक बनेगा!' पुस्तक बंद करते हुए मैंने कहा।

'हाँ... हाँ... सुनती हूँ आप बाप बेटों की बातें! आप को ही निभा नहीं पा रही हूँ। फिर वर भीचर बनें तो बस... कुछ भी बनें, उससे मेरा क्या मतलब। इस नौकरी से मेरा छुटकारा तो नहीं हो सकता!

मैं इससे बढ़ कर भी क्या कर सकती हूँ।

'अरे... यह क्या? तुम्हारे दुःख का कारण गया है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ने कैसी आज़ादी खोयी है। 'अध्यापक' के धंधे से तुम क्यों इतनी तफ़रत करती हो? यहाँ आओ। थोड़ा बता दो तो मैं भी जान लूँ।'

'क्या बताऊँ! मेरे पिताजी भी अध्यापक ही थे न!'

मैं उन की एक मात्र संतान थी। उसने लाड़ प्यार से मेरा पालन पोषण किया था। फिर भी उधर स्कूल में उन की छात्रा के रूप में डरती हुई विचरती थी। मेरी पढ़ाई भी हाई स्कूल तक ही रुक गई। पढ़ने की इच्छा थी। लेकिन अवसर न मिलने के कारण मुझे संतुष्ट होना पड़ा।

उस के पश्चात्... ढूँढ़ ढूँढ़ कर आप को पति के रूप में लाया। आप के साथ बाहर वर्ष गाँव में बीत गये। अब भी छोटे-मोटे शहर में रहने का संतोष ही नहीं है। आप को प्रतिदिन कैरियर के साथ बस की प्रतीक्षा करते हुए गाँव में जाना ही पड़ता है। वेतन और जीवन के बीच लगाव रहित नौकरी। आमदनी जो आवश्यकताओं के लिए काफ़ी नहीं है। सारा वेतन बच्चों के स्कूल की फ़ीस और परिवार के खर्चों के लिए काफ़ी नहीं है। लड़कियों की शादी के बारे में सोचने मात्र से ही शरीर काँप उठता है। ऐसी जिंदगी कि हमारे जैसे कर्मचारी वर को ढूँढ़ लाने की भी ताकत नहीं है। बताइए कि इस प्रकार कब तक जीते रहें!

कम से कम हमारा बेटा डाक्टर या इंजनीयर बनें। उसका जीवन सुखी रहे। उसके द्वारा हमारी लड़कियों की जिंदगी ठीक हो। यही आकांक्षा है। आप ही बताईये, क्या यह मेरी लालच है? क्या मैं संकुचित नज़र से सोच रही हूँ? जहाँ तक मेरा सवाल है, इस हालत से संतुष्ट हूँ। लेकिन कम से कम हमारी संतान इस संसार में चैन से जियें! यही मेरे लिए काफ़ी है।

वह अपनी आँखों मे उमड़ने वाले आँसुओं की धारा को पोंछने की कोशिश करने लगी। वर चाहती थी कि यह मुझे मालूम नहीं हो। पर वर अपनी कोशिश में असफ़ल रही।

'छि: छि: दुखी क्यों होती हो? यह इच्छा ग़लत तो नहीं है। तुम्हारी इस वेदना का भी कुछ मतलब है। मैं इनकार नहीं करता। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे इतना मानसिक संघर्ष चल रहा है!

श्रीमती ने अपने मन की पीड़ा को प्रकट करके कुछ शांति पायी। मेरे हृदय के भीतर फिर से संघर्ष शुरु हुआ।

पुस्तक पढ़ने की इच्छा नहीं हुई।

सच है सत्या की वेदना बेमतलब की नहीं है। हम दोनों और हमारे तीन। प्रति दिन घर भर की चाकरी। धुँधले अंधकार में पाँच बजे ही उस की दिनचर्या शुरु हो है। सात बजे तक बच्चों के लिए और मेरे लिए कैरियरों को तैयार रखना। सुबह का नास्ता। स्नान-पान। हम सब के चले जाने के बाद बाकी चाकरी। कपड़े धोना इत्यादि कामों की हड़बड़ाहट। भोजन के पश्चात् एक घंटे का आराम भी नहा। धोये हुये कपड़ों को इस्त्री करना, छुटे हुए बटन लगाना और सिलाई का काम शाम को पाँच बजे तक रहेगा ही।

पाँच बजे तक बाहर गय हूए हम सब लोगो का गृह प्रवेश। इस के पश्चात् चाय, काफ़ी और नास्ता। रात के लिए रसोई की तैयारी। नल से पानी लाना वगैरह। भोजन करने तक लग भग रात के दस बजते है।

तब भी थोड़ी देर टी. वी. के पास बैठना चाहें तो दिन भर की मेहनत के थकान के कारण आँखे बंद होने लगती है।

हम पढ़ते लिखते रहते हैं। पर वह तो नींद में चली जाती है। फिर सुबह को हम से पहले ही उठती है। अपनी दिनचर्या में मग्न हो जाती है ।

यह भी नहीं समझ पाने की हालत कि इस निरंतर दिनचर्या के कारण उस ने क्या खोयी है! रविवार के दिनों में और भी ज्यादा काम। सब घर में रहते हैं। इसलिए सब लोगों को रुचि को संतुष्ट करना पड़ेगा। यह तो अनिवार्य है!

❋ ❋

सारे सपने लहरों के रुप में फैलते हुए टूट कर गिर रहे हैं। फिर भी लगातार कोशिश। किनारे से टकराते हैं।

घिसे जा रहे हैं।

उन लहरों पर नज़रें टिका कर बहुत नज़दीक से

देख रहा हूँ। वे लहरें नहीं हैं। एक सत्या, एक सुनीता, एक वेवी.... न जाने और किशने लोग....



ये सारे दृश्य मेरे विचारों में विचरने लगे। दृश्य के बाद दृश्य मेरी आँखो के सामने फैलने लगा।

घर भर की चाकरी में मअत करने के लिए एक नौकरानी को रख लें। मेरे वेतन में इस की गुंजाइश नहीं है। सोचा कि किसी ने कितनी तरह रख लिया जाय। उस का वेतन, खान-पान सब... को मिलाने पर परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जयेगी।

फिर, इस समस्या का समाधान क्या है?

फिर इस चाकरी से छुटकारा कैसे मिले?

फिर से विचारों का झुंड!

छटा हि उठा।

जंजीरों से मुक्त करने पर भी नहीं भागनेवाली पतिव्रता पत्नी।

उसको देखने पर किसी पुस्तक में पढ़े हुए एक वाक्य को अस्पष्ट रुप से हमेशा याद आती रहती है।

आम आदमी की आधी आयु तक फैली हुई समस्या जिसका समाधान नहीं।

कितने दिनों की नीरव लड़ाई...

कितने दिनों तक मौन हिंसा...सह सकती है।

'पिताजी... पिताजी... मेरे सवाल का जवाब दीजिए न?' सामेन खड़ी हुई दस वर्ष की वेवी को ओर देखा।

'सूजना' उसकी असली नाम है। लेकिन घर के सब लोग लाड़ प्यार से 'वेवी' कह कर पुकारते हैं। सब से छोटी है। फिर भी बातें सब से बढ़कर करती है। छोटा मुँह बड़ी बात! अक्सर पड़ोस के लोग कहा करते हैं।

'क्या चाहिएं वेवी? बोला न बिटिया।'

'हमारी तेलुगु पुस्तक के पीछे दो बच्चे घर की की रौनक लिखा हुआ है न! उसका मतलब क्या है पिताजी?'

'ओर! यही! उस का मतलब है कि हम जैसे माँ-बाप के दो बच्चे मात्र काफी हैं।

'अहो! ऐसी बात है! शायद इसलिए ही माँ मुझ पर अक्सर नाराज़ होती है।'

'तुम मेरी इच्छा के खिलाफ़ पैदा हुई हो। तेरे पिताजी ने मेरी बात न मानी।'

'वह तो मज़ाक करती है बिटिया! तुझे तंग करने के लिए ऐसा कहती है।'

'नहीं... ऐसी बात नहीं... तुम भैय्या के लिए ही सारी चीज़ें खरीदते हो। चाहे वह कितना ही चिल्लावें, उस को नहीं डाँटते।' मुँह फुलाते हुए कहा।

'बहिन, भैय्या ओर तुम! मेरे लिए तीनों बराबर ही हैं बिटिया! ऐसे भेद भाव नहीं है। तुझे भी भैय्या के स्कूल में ही पढ़ाते हैं न? प्रतिदिन रिक्शे में ही स्कूल भेजते हैं न?'

'तुम भी जो कुछ माँगो खरीद देते हैं न बेटी!'

'मैं क्या जानू? अगर मैं कोई काम नहीं करती हूँ तो माँ मुझ पर नाराज़ होती है। उसे बिलकुल नहीं डाँटती।'

'मैंने माँ से कह दिया है न!... कभी कभी थक जाने के कारण ऐसा नाराज़ होती है। असल में माँ भी बहुत अच्छी है।

इस बात पर शायद उसे पूरा भरोसा हुआ।

उस की आँखें चमकने लगीं।

वह अपने खिलौने लेकर उत्साह के साथ चली गई।

फिर से विचारों की झुरमुट..

ऐसे सवालों का मुकाबला जिनका जवाब नहीं मिलता।

श्रीमती के संघर्ष का मूल कारण क्या है?

मुझ पर अपार विश्वास!

अचंचल प्रेम और अभिमान! बच्चों के प्रति अपार वात्सल्य।

पर अपने आप पर कोई ममत्व नहीं है। किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। सब के लिए तड़पती है।

उस में कोई अभिनय नहीं है। द्वैध नहीं है।

अपने मन भर परिपूर्ण विश्वास। निर्मल प्रेम।

उस प्रेम को पहचानने के लिए फुरसत ही नहीं है। यांत्रिक दैनिक जीवन।

उसमें कभी कभी वैराग्य... निर्लिप्तता... मैंने शादी तो कर ली... लेकिन मैंने उसके लिए क्या किया है। अपनी पत्नी के रूप में, साथिन और सहचरी के रूप में मैंने उसे क्या दिया है? सांत्वना और सहानुभूति के सिवाय?

विचारों को फैलती हुई लहरें। मानो प्रशांत तालाब में पत्थर फेंका हो।

वलयाकार में विचरते हुये विचार।

फेंका गया पत्थर पानी की तह में बैठ गया। फिर भी लहरों का फैलना ज़ारी है। वे किनारे को छूती हैं।

'पिताजी... एक हफ्ता हुआ। हमारे मास्टर जी ट्यूशन की फ़ीस माँग रहे हैं। दीजिए न पिताजी...

बड़ी लड़की सुनीता की विनजी से विचारों में रुकावट।

बड़ी लड़की सुनीता प्रकाशम हाई स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती है। हमेशा निर्मल और हँसमुख रहती है। नाराज़गी उसमें बहुत दूर रहती है। मिलनसार लड़की है।

अब रुपये नहीं हैं बिटिया। एक सप्ताह में वेतन मिलेगा न! दे देंगे... मास्टर जी से कह दो।'

'सब ने दे दिया है। मैं अकेली रह गयी हूँ पिताजी।'

ठीक है बेटी! बस एक हफ्ता! तुम भी दे देना!'

'ठीक है पिताजी! अब मैं ट्यूशन के लिए ही जारही हूँ। मास्टर जी से कह दूँगी।'

उसी तालाब में फिर से पत्थर... और एक... फिर एक... लगातार रुक रुक कर गिरते हुए पत्थर..

सारे सपने लहरों के रूप में फैलते हुए टूट कर गिर रहे हैं। फिर भी लगातार कोशिश। किनारे से टकराते हैं।

घिसे जा रहे हैं।

उन लहरों पर नज़रें टिका कर बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। वे लहरें नहीं हैं। एक सत्या, एक सुनीता, एक वेवी... न जाने और कितने लोग...

हाँ! सच है!

मध्यवर्गीय जीवन मिथ्या के वलय हैं।

अपने आप को समझाते हुए जीविका चलाने वाले विचित्र जीव हैं।

किवाड़ के खुले रहने पर भी पिंजरे के भीतर ही रहने के लिए आदी पक्षी।

पट्टियाँ खोलने पर भी चक्के के चारों ओर घूमने वाले विचित्र जीव!

विचारों की लहरों के बीच कविता का भ्रमण!

कविता जीवन बन कर भ्रमण कर रही है!

अन्तिम बात शुन्यता

— तरुन दिर्घांगी

(अनुवाद : फुल्लरा मुखर्जी)

कहानी, कविता, नाटक और प्रबंध, बांगला साहित्य के इन सभि विषय पर कवि तरुन दिर्घांगी अपने लेखन पारदर्शिता का प्रदर्शन किआ करने है ।

परन्तु कविता हि उनका प्रिय बिषय है । कवि तरुन दिर्घांगी प्रचार बिमुख कवि है ।

वह अत्यत समबेदनशील भाषा में बांगला साहित्य के तरह विषय के लेकर साहित्य साधना किआ करते है । अनुबाद साहित्य में भी उन्होने मुख्य भूमिका निभाई है । बहुत से पत्र पत्रिका में नियमित लिखने के इलावा उनकी एक काव्यग्रंथ है जो "प्रिय दिनगुलि" के नामसे परिचित है । प्रचार बिमुख कवि होनेके कारण उनकी पाठक सख्यां भले कम है परन्तु लोगो की हृदय में सम्मान और प्यार की एक जगह कायम करने में वह सफल रहे ।

राह देख रहे है हम पूब आसमान क
समयके दुसरे स्थान पर थम गया है
पश्चिम आसमान ।
आश्चर्यका दो प्रातं, जैसे के कोई
शिल्पीत सृजनको गहराई छाया हुआ
जहापे अनंत काल की शुन्यता
रोज के रोज थर थर कांपना है
शुन्यता हि प्रतय ।
शुन्यता हि शिल्पीकी सृजन
पूब से लेकर पश्चिम तक
चित्रकर कि पन्नोको जोड़ कर इतने रगों का खेल

व सब क्या शुन्यता में विलीन
शुन्यता हि प्रतय
शुन्यता हि शिल्पीकी सृजन
शुन्यता क्या आँधार मे खोया करता है
आँधार की कोई आवरन नहीं
आवरनहीन होना हि उसको अतीम बात
सब रगों की अतीम बात जैसेकी सुन्यता ।

THE TASTY WAY
TO
GOOD HEALTH.



Tea is rich source of flavonoids, which Prevent cardio-vascular diseases, cancer, diabetes, inflammation, cataracts and even Alzheimer's disease.
So, sit back and enjoy the freshest taste of good health with Tata Tea Premium. The known for its superior quality and distinctive taste. Handpicked from gardens in Assam, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala.
Try a cup of Tata Tea Premium. It's the tastiest way to drink to your health.

TATA TEA
ASLI TAAZGI.
ASLI MAZAA.

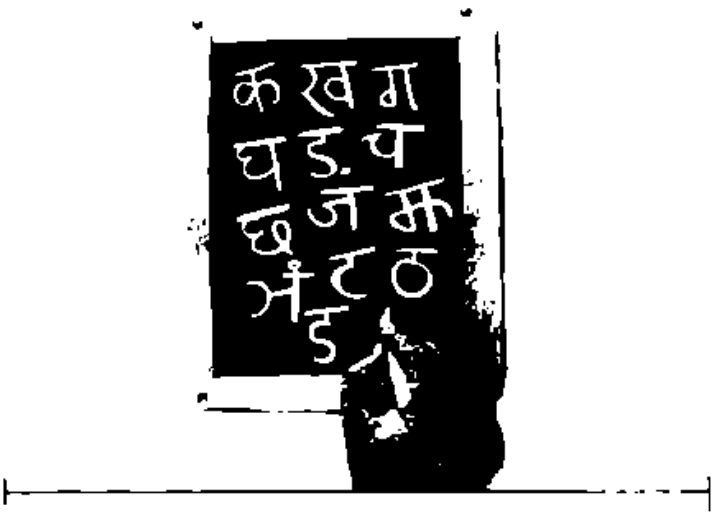
অনুবাদ পত্রিকা

যে পত্রিকা কখনো
পুরাণো হয় না।



Everyday. Tata Tea helps bring
fingers together

The difference is either a fresh new day
Or a fresh new life



Tata Tea runs 280 adult literacy centres. 160 child care centres. 26 hospitals. Schemes like Project Dare in the High Range of Munnar to take care of the educational needs of mentally handicapped children. Schools to educate workers' children. Wildlife protection foundations and sanctuaries. Yes, the name Tata Tea means more than a giant tea company. For thousands across the country it means life.

TATA TEA

TATA

A BENGALI MAGAZINE OF TRANSLATION

ANUBAD PATRIKA : "A NOTE WORITHY VENTURE"

সম্পাদক :
বৈশম্পায়ন ঘোষাল

সংযুক্ত সম্পাদক :
অনুরাধা মহাপাত্র

অনুবাদ পত্রিকা
১৪০৮

সহকারী সম্পাদক :
বিতস্তা ঘোষাল

বার্ষিক সংখ্যা : ২০০১ (১৪০৮)

পৃষ্ঠপোষক : সনাতন রায়চৌধুরী

Registration No. N 27088/75
Anubad Patrika

Annual Issue—2001
Rs. 25·00

'ভাষা সংসদ' এর পক্ষে

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ হিরণ মিত্র

সম্পাদক, প্রকাশক ঃ বৈদ্যনাথন ঘোষাল
নীল সরস্বতী প্রেস, ৮নং নটোবর দত্ত রো, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত।
অনুবাদ পত্রিকা, ৩ শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৭ প্রকাশিত।
ফোন—৫৫৭ ৬৬১০, ২১১২৭৮

সম্পাদকীয়

২০০১-এর অনুবাদ পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হল। নিয়মিত প্রকাশ করার আন্তরিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ অর্থনৈতিক চাপে তা সম্ভব হল না।

সারা ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্ব জুড়ে ধর্ম, জাতি ও জাতীয়তার নাম নিয়ে অন্ধকারময় অস্থিরতা চলছে—সঙ্গে হিংসা ও লড়াই। অনেক প্রশ্ন ও বহুল অসাম্যের মুখোমুখি আমরা। তবু মানুষ কি নিজের হৃদয়ের গভীরে খুঁজে দেখবে না! মানুষ কি আবহমানকাল ধরে অমৃতের, মনুষ্যত্বের, অনন্তের সাধনা করে আসেনি!

আমরা তাই নবতর রূপে ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আলোয় স্পন্দিত বাণী খুঁজে নিতে প্রয়াসী, নিজ জন্মভূমি ও বিশ্বের ভাষায়। একজন বাঙালী খুঁজে নেবে একজন তামিল ভাষীর হৃদয়ের ভাষা, একজন ভারতীয় খুঁজে নেবে একজন পুশতোভাষী আফগানের ভাষা, একজন ভিয়েতনামী কি খুঁজে নেবেনা আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ভাষা! একজন বাঙালী খুঁজে নেবে হিন্দী, কন্নড়, অসমীয়া, উর্দু ও লেপচা সাহিত্যের মূলগত যোগ।

অনেকে মনে করেন অনুবাদে মূলের স্বাদ অনুভব করা যায় না। কিন্তু এছাড়া পথ বা কী! পাখির গানের সুরের উৎস কী!—কে জেনেছে! তবু দেশে দেশে—লোকে-লোকান্তরে মানুষে মানুষে হৃদয়ে হৃদয়ে সেই সুর প্রবাহিত হয়ে চলেছে। 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে কবে!'

সাজানো কোনো বনসন্তূপ নয়, বাণিজ্যিক বন্দরের অন্তঃসারশূন্য কোলাহল নয়। কলমের কৃত্রিমতা নয়, সোনার পাথরবাটিও নয়—আমরা অনুবাদ পত্রিকার অনুবাদের মাধ্যমে চেয়েছি সেই রক্তের ভাষা, মর্মের ধ্বনি, মননের সৃষ্টি। তথাকথিত আধুনিকতাকে ধসে করে আজও বেঁচে আছে আমাদের 'মহাভারত', আমাদের 'রামায়ণ', আমাদের রবীন্দ্রনাথ।

২০০১-এ নোবেল পুরস্কার পেলেন ভি এস. নইপাল। আন্তর্জাতিক হলেও তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। কোথাও তাঁর শেকড় ছেঁড়া গেছে এদেশের মাটিতেই। নানা বিতর্কসত্ত্বেও তিনি এ'দেশের কাছে ঋণী। তাঁর সাহিত্যকীর্তি এবং তজ্জনা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমরা 'অনুবাদ পত্রিকা'-র পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। কিন্তু অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আমাদের কিছু কথা না জানিয়ে পারছি না—'An area of darkness নামক বইতে তিনি ভারতবর্ষের মানুষের ভেতর শুধুই কি অন্ধকার দেখেছেন, কোনও আলোর রেখা দেখতে পাননি! এছাড়া India, a wounded civilisation' নামক বইতে তিনি শুধুই কি আহত, ক্লান্ত ভারতবর্ষের চেহারা দেখলেন, তার বাইরে জীবনের আর কোনো সদর্থক দিক নজরে পড়েনি!

এই সংখ্যায় ভারতীয় ভাষা, তথা, হিন্দী, উর্দু, কন্নড়, তামিল, অসমীয়া, লেপচা, পাঞ্জাবী সাহিত্যের অনুবাদের পাশাপাশি রেখেছি পুশতো, ভিয়েতনামী, আমেরিকান ইণ্ডিয়ান, ফারসী, তুর্কী, সার্বিয়ান, স্প্যানিশ, ফরাসী, রাশিয়ান, জার্মান, লাতিন আমেরিকান, ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য। ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী সাহিত্যের নদীটিকে কোন এক সমুদ্রে পৌঁছে দিয়েছে ভিয়েতনামী, ফারসী, তুর্কী, উর্দু, স্প্যানিশ ও আমেরিকান ইণ্ডিয়ান সাহিত্য। এই সাগরে ভারতীয় সাহিত্যের জাহ্নবীধারাও অবগাহন করেছে। কোনো এক নতুন আলো আসছে কোনো এক নতুন শেকড়-সন্ধানে।

এই সংখ্যায় ভারতীয় ভাষায় আছেন রবীন্দ্রনাথ, কর্তার সিং দগ্গল, সৈয়দ আবদুল মালিক, অবতার সিং সাধু (পাশ), গোপীনাথ কবিরাজ, জিদ্দু কৃষ্ণমূর্তি প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক। পাশাপাশি আছেন খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক লেখক অলব্যর কামু, হাইনরিখ বোল, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, ইকবাল, ভিস্‌ওয়াভা শিম্বোর্সকা, আমিনা সাইদ, হেরম্যান হেস, গুন্টার গ্রাস, সিজার ভালেজো, ভাসকো পোপা, আনা আখমাতোভা, হো শুয়ান হুয়েন্ড প্রমুখ।

বিশিষ্ট কবি ও লেখকরা, যাঁদের বিশিষ্ট অনুবাদকর্মে এই সংখ্যা আলোকিত—তাঁরা হলেন, শঙ্খ ঘোষ, সুনীলবরণ রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলকুমার দত্ত, স্বরাজ সেনগুপ্ত, জয়ন্ত সেন, জ্যোতির্ময় দাশ, বেলা বসু, কমলেশ সেন, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম সেনগুপ্ত, সোমক দাস, দিলীপ ঘোষ প্রমুখ। এবং আরো অনেকে।

আমরা দুঃখিত বিশেষ করে গত ২০০০ সালে প্রকাশিত 'অনুবাদ পত্রিকা'-র শরৎ-হেমন্ত সংখ্যাটিতে প্রকাশিত কিছু লেখার মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য। সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে সমস্ত লেখক ও অনুবাদকদের কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, প্রকৃতপক্ষে মুদ্রণ সম্পর্কিত একটি অতিভুল ব্যবস্থার চারদেয়ালের চাপে পড়ে এই সংখ্যাটিতে প্রকাশিত লেখাগুলির সমস্ত ভুল ছাপার অসহায় দোষভার আমাদের বহন করতে হয়েছে। এমন একটি অবস্থানের কথা সমাক অনুধাবন করে লেখক, অনুবাদক, পাঠক এবং বিজ্ঞাপনদাতা আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করে নেবেন আশা রাখি। একেবারেই অনিচ্ছাকৃত এই দৈন্য।

আমরা বিশেষ শুভেচ্ছা জানাই অনুবাদ পত্রিকা-র সমস্ত লেখক, অনুবাদক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের যাঁদের অকৃপণ সহযোগীতা ব্যতিরেকে এ সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

আমরা বিশ্বাসার্থী ভবিষ্যতে, পথচলায়, আবিষ্কারে এবং অনন্তে।

সম্পাদক : অনুবাদ পত্রিকা

সূচিপত্র

আমিনা সাইদ-এর কবিতা
অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ
গুন্টার এ্যাস-এর কবিতা
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
ভিয়েতনামের কয়েকটি কবিতা
অনুবাদ : অতুলকুমার দত্ত
ভিস্ ওয়াভা শিম্বোর্স্কার কবিতা
অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পাঞ্জাবী কবিতা
অবতার সিং পাশ্ (পাশ)
অনুবাদ : রবিন পাল
সিজার ভ্যালেজো : লাতিন আমেরিকার স্প্যানিশ কবি
অনুবাদ : জ্যোতির্ময় দাশ
রাশিয়ান কবিতা
আনা আখ্‌মাতোভার দুটি কবিতা
অনুবাদ : বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুশতো সাহিত্য
অনুবাদ : স্বরাজ সেনগুপ্ত
অসমীয়া গল্প
মমতা / সৈয়দ আবদুল মালিক
অনুবাদ : বাসুদেব দাস
পেরুয়ার গল্প
অনুবাদ : গৌতম সেনগুপ্ত
কথোপকথন : গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ও রিনিও আপুলিও মেন্দোজা
সুনীলধরণ রায় অনূদিত কবিতাগুচ্ছ
(উর্দু, ফারসী, স্প্যানিশ, সার্বিয়ান)
হিন্দী গল্প
মিথ্যে গল্প / বিজয় শর্মা
অনুবাদ : কমলেশ সেন
রবীন্দ্রনাথ : শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে
অনুবাদ : হরন্ত সেন
দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে / হেরম্যান হেস
অনুবাদ : দিলীপ ঘোষ
হিন্দী কবিতা
দুধবারণ্য
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
অনুবাদ : চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য
কন্নড় গল্প
কাক / প্রতিভা নন্দকুমার
অনুবাদ : রিক্তা দত্ত
তামিল প্রবন্ধ
সম্পর্ক-বিষয়ক / জিঙ্কু, কৃষ্ণমূর্তি
অনুবাদ : বেলা বসু
ফরাসী গল্প
অতিথি / অলব্যার কাম্
অনুবাদ : শচীন দত্ত
জার্মান গল্প
পোস্টকার্ড / হাইনরিখ বোল
অনুবাদ : চিরঞ্জন চক্রবর্তী
মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি এবং লেপচা : এক আন্দোলন / টি. কে. দাস. ডি. সি. রায়
অনুবাদ : বিতস্তা ঘোষাল ৮৬
আমেরিকার একজন আদি মানুষ তার দুঃখকে দেখছে / এন. স্কট মোমাডে
অনুবাদ : দিলীপ ঘোষ ৮৯
পাঞ্জাবী গল্প
দুটো নিঃসঙ্গ পাতা / কর্তার সিং দুগ্গল
অনুবাদ : নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
অ্যালেন গীনস্‌বার্গ-এর নোটবুক থেকে
অনুবাদ : সোমক রায়

ANUBAD PATRIKA :

Poems of Amina Sayeed
Translated by Shankha Ghosh

Poems of Gunter Grass
Translated by Alokeranjan Dashgupta 11

A Few poems of Vietnam
Translatd by Atul Kumar Datta 14

Poems of Simborska
Translatedby Manabendra Bandopadhyay 17

Poems from Panjab
Poems of Avatar Singh Sadhu (Pash)
Translated by Rabin Pal

Caesar Vyalejo : A Latin-American Spanish Poet
Translated by Jyotirmoy Das 23

Russian Poems
Two Poems of Ana Akhmatova
Translatedby Biswanath Bandopadhyay 25

Pushto Literature
Translated by Swaraj Sengupta 29

Mamata Saiyad Abdul Malik
Translated by Basudeb Das

Smell of Guava /Conversation beetween Gabriyel Garcia Marquez and Plilio Apoolio Mendoja
Translated by Gautam Sengupta

A Few Poems of Urdu, Farsi, Spanish, Serbian
Translated by Sunilberan Roy 57

Hindi Story
A Lie Story / Bijoy Sharma
Translated by Kamaleah Sen 59

Rabindranath on Sri Aurobinda
Translated by Jayanta Sen 63

On Dostayevosky / Hermann Hesse
Translated by Dilip Ghosh

Hindi Poems
The Forest of heart / Sri Gopinath Kabiraj
Translated by Chandidas Bhattacharya 69

Kannada Story
The Crow / Prativa Nandkumar
Translated by Rikta Datta

On Relation-ship / Jiddn Krishna Murti
Translated by Bela Basu 72

French Story
The Host / Albert Camus
Translated by Sachin Datta

German Story
The Postcard / Heindrisch Bohl
Translated by Chiranjoy Chakravorty 81

Mother Language, Mother Culture and Lepcha : A movement / T. K. Das & D. C. Roy
Tsanslated by Bitosta Ghosal

An ancient American manl ook at his mother land / N. Scot Momade
Translated by Dilip Ghosh 89

Punjabi Story
Two Lonely Leaves / Karter Singh Daggal
Translated by Nilanjan Cahttopadhyay 97

From Indian Journal by Alen Ginsberg
Translated by Somak Das

অনুষ্ঠান

বিয়ে ও যে কোন উৎসবে ভাড়া দেওয়া হয়।

111A, Diamond Harbour Road

Calcutta-700034

যোগাযোগ—Mr. Raychaudhuri

Mr. J. Das

Phone : 219-2178

With Best Compliments From :—

Hotel "CONFRIERE"

Closure to Thakur Pukur Cancer Hospital

Now Under Construction

Contact For Booking

Phone 219-2178

SPACE DONATED BY :—

*

A

WELL

WISHER

আমিনা সাইদ-এর কবিতা

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

[১৯৪৩ সালে টিউনিসে জন্ম। থাকেন এবং কাজ করেন প্যারীতে। লেখেন ফরাসী ভাষায়। 'Le Centre National des Lettres' থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন ১৯৮৯ সালে। ১৯৯৫ পর্যন্ত কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে সাতটি।]

দিনের ওপর ভর-দেওয়া
একটা গাছের মতো
সেজে আছো পাখিতে

আলোর কোনো ওজন নেই

এই শরীরে
কী তুমি খোঁজো

দেয়ালে ঠেকে গিয়ে
কেঁদে ওঠে একটি মুখ

সমস্ত আলোর কাছে অন্ধ
আমাদের পাথর শরীর
শুয়ে আছে গুহার গভীরে

সেখানে রাত
যে রাত যুগলের
সেখানে রাত

জায়গা আমাদের ছায়াগুহনের জন্য
আমাদের অন্ধকার যুগল
পৃথিবীর জলপথে হালছাড়া
এখনো বেঁচে থাকবার অযোগ্য
উদ্ভাসিত এই জগতে

জায়গা আমাদের ইতিহাসের
উপেক্ষিত ছেঁড়া পাতার জন্য

জায়গা আমাদের খরশান সুন্দরের জন্য
আর সেই শাখার জন্য যেখানে ফোটে বেরোয়
ফলের ঈষৎ ঘ্রাণে

জায়গা সেই খাড়াই মিনারের জন্য
অগ্নিশিখার চেয়ে যা দীর্ঘ
সেই দীপ্ত দেবতার জন্য যিনি বেরিয়ে আসছেন
জনতার হাতে ঘটে-যাওয়া
তাঁর চকিত মৃত্যুর দিকে
তাদের অবসানিত নিশ্বাসে
দড়ির ফাঁস জড়ানো তাঁর গলা

জায়গা সেই সাক্ষীর জন্য যে জেগে ওঠে
তার অনাবৃত শব্দাবলির
অসীম দাহের জন্য

জায়গা সেই চোখ-খুলতে-থাকা সময়ের জন্য

গুন্টার গ্রাস-এর কবিতা

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কিং লীয়ার

হলঘরে
যে কোনো হোটেলের হলঘরে

কোনো-একটা ব্যবহারজীর্ণ চেয়ারে
ক্লাব-চেয়ারে, চামড়ার—কিন্তু কখনোই বেতের চেয়ারে নয়,
সভাসম্মেলনের যত অকাল-অংশীদার
আর ভূমিকাসম্বলিত থালি হাতলওয়ালা চেয়ারের মাঝখানে
ঠিক-মাঝে ব্যবধান থেকে অভিবাদনে
বসে থাকেন তিনি, পালভোলা বেয়ারাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত দ্বীপ,
আর কিছুই ভুলতে পারেন না

এই দুঃখ নিজেকেই আস্বাদন করে
আর এক দিকের বারোটা মাংসপেশীসহকারে হেসে ওঠে।
খুব বেশি শুনতে পান না তবু সব-কিছুই শোনেন
কার্পেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।
চিকন প্লাস্টারের কারুকাজ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
ভ্রূক্ষেপে তাদের দূর করে দেন।
সোনার তবক খসে যাবার আগেই
ব্যারক দেবদূতেরা এসে হাজির হয়।
গির্জের পাঠিয়ে দেয় গোয়েন্দাদের ;
তাঁর যা অভাব সেটা হল সহ-অভিনেতার।
অনর্থক একরাশ আয়না তাঁকে নকল করতে চেষ্টা করে।
তাঁর মেয়েরা এখন জনপতি।

সাথায় হোটেলে হের কর্টনারের ডাক পড়েছে।
তিনি এখন মহড়ায় ব্যস্ত বলে পাঠিয়েছেন।
হলঘরে, তাঁর হাতলওয়ালা চেয়ারে, একজন মৃতের ভূমিকায় অভিনয়রত,
খোয়াইয়ে কেন্ট-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে।

ঘুরে তাকিয়ো না

বনের ভিতর যেয়ো না,
বনের মধ্যে আছে ধন।
বনে যে যায়
গাছপালা খোঁজে,
বনের ভিতর তাকে খোঁজা হয় না।

ভয় রেখো না,
ভয়কে শুঁকে বেড়ায় ভয়,
যে ভয় শোঁকে
তাকে শুঁকে বেড়ায়
বীরেরা, যারা বীরপুরুষের মতো গন্ধ শোঁকে।

সাগর থেকে জল খেয়ো না,
সাগর আরো-বেশির আস্বাদ জোগায়।
সাগর থেকে যে খায় তার
তখন থেকে
শুধু মহাসমুদ্রের তেষ্টা জাগে।

বাড়ি বানিয়ো না,
বরং বাড়িতেই থাকো,
যে বাড়ি থাকে
ফেরি-করা আগন্তুকের অপেক্ষায়
থাকে আর দরজা খুলে দেয়।

চিঠি লিখো না কোনো, চিঠিপত্র আর্কাইভ্‌সে চলে যায়।
যে চিঠি লেখে
সইও করে দেয়
তার কী-কী জিনিশপত্তর বাকি রয়ে গেল।

বৈধ অধিকার

আর ছোট মনে থাকা নয়
আর স্বপ্নের মধ্যেও
হেয়িং কেনার জন্য কিউতে দাঁড়ানো।
আবদ্ধ মেঘের চাকনায়
জানালার পাশে সীট পাবার জন্য যুদ্ধ করছি।

প্রথমভাত

সেক্ষেত্রে আমি আমার ছেলেপুলেদের জন্য ভাল রাঁধব।
ওরা ভাববে, বাবাই তো এটা করতে পারে।
তারপর ভাগবাঁটোয়ারা করতে থাকবে ;
আর সে হবে এলাউ
যে তার বাবাকে আর বাবার রান্না ভালবাসে।

ভিয়েতনামের কয়েকটি কবিতা

১

খুঁং ভিয়েত (আ: ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে)

অনুবাদ : অতুলকুমার দত্ত

কাঠ ও আগুন

কাঠের গভীরে আদিমাগ্নি সুনিদ্রিত থাকে
মুক্ত কর তাকে, সে আবার জ্বলে ওঠে নবীন জীবনে।
কাঠের ভিতরে অগ্নি যদি না সে থাকত লুকিয়ে
কোথা থেকে তবে কাঠের আগুন জ্ব'লে যাবে ?

২

সম্রাট লি থন্‌হ্‌-তোঙ্গ (খ্রীষ্টীয় ১১৪২—১৪৯৭-এর ভিতর কোন সময়)

পাথরের কুকুর

ভারী এক থাবা নিয়ে সীমান্ত দেয় সে পাহারা
গিরিপথ মাঝখানে একা বসে থাকে,
বরফ, তুষার, উত্তরেই মনোযোগহীন
উত্তম সুখাদ্য কিংবা সেতন কোনটাই কখনো না ছেয়ে,
শুধু তার দুচোখে তাকিয়ে।
ঘোর গন্ধে তাদের জিহ্বার শব্দ সে কখনো শোনে না।
এক মনে সে তার প্রভুর সেবা করে।
ওজন হাজার মণ, কখনই তাকে টলানো যায়না ॥

৩

অজ্ঞাত (খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী)

ছিপ দিয়ে মাছ ধরা

সুন্দর বাঁশ দিয়ে তৈরী আমার ছিপটি
আমার বড়শিগুলি তৈরী সোনার
টোপের জন্য আমি চকমকে রঙ লাগাই,
তারপর সুতো ছুঁড়ি ছাগলের দুধে।

কোন কোন লোক নদীতে, সমুদ্রে ধরে মাছ
কিন্তু আমি প্রতিষ্ঠিত পরিবারে মেয়েদের পিছনে লেগেছি।
এরি মধ্যে বিয়ে যদি করে থাক তুমি,
আমার টোপটি ছেড়ে দাও।
তা না হলে কামড়াও, চেষ্টা করব
তখন তোমাকে আমি জমিতে নামাতে।

৪

অনামিক (আনুমানিক ১৭০০ খ্রী:)

আদুরী মেয়ে

মাগো, বয়স আঠারো হয়েছে আমার এ-বছর
তবুও এখনো নেই স্বামী।
কি করবে ভেবেছ তুমি মা ?
রঙীন লেজের পাখি এনেছিল দুজন ঘটক :
তাদেরকে ছুঁড়ে দিলে মনের বাসনা :
পুরো পাঁচ কোয়ানের চেয়ে কম নয়
পাঁচ হাজার সুপুরি,
মোটা পাঁচটা গুয়োর
আর পুরো পাঁচটা পোশাক।

মাগো, এ-বছর আমি হয়েছি তেইশ
আর, এখনো রয়েছি স্বামী ছাড়া
আদরিনী মা আমার, তোমার কি ইচ্ছেটা করায় ?
রঙীন লেজের পাখি এনেছিল দুজন ঘটক,
তাদের ছুঁড়লে তুমি মনের বাসনা।
কিছু কম নয় পুরো তিন 'কোয়ানের'
তিন হাজার সুপুরি
সুপুষ্ট তিনটি গুয়োর
আর পুরো তিনটি পোশাক।

মাগো, এ-বছর আমার বয়স বত্রিশ
তবুও এখনো নেই স্বামী,

আদরের মা আমার কি তোমার ইচ্ছেটা করার ?
রঙীন লেজের পাখি এনেছিল দুজন খটক
আর তুমি ছুঁড়ে দিলে তোমার দাবীটা,
কিছু কম নয়, পুরো এক 'কোয়ানের' চেয়ে,
এক টাকার দুপুরি,
একটা মোটা কুকুর এবার
আর এক পোশাক কাপড় ।

মাগো আমি তেতাল্লিশে পড়েছি এবার
এখনো একটিও স্বামী ছাড়া ।
মাগো, দেখ, দেখ,
মাগো তুমি খুশি হয়ে, আমাকে কি কারো কাছে
শুধু দিয়ে দেবে ?

৫

হো ভয়ান হুয়োঙ্ (তাঃ ১৮০০)

এক স্বামী ভাগ নিয়ে

সেই ভাগ্য পারলে আটকাও, যা তোমাকে দেয়,
তোমাকে প্রদেয় ভাগ একই পুরুষের ।
একজন তড়াতড়ি করে শোয় তুলোর লেপের নীচে,
অন্যজন শীত-জর্জর ।
প্রত্যেক এখন তখন যেন তাল ঠুকে পারে,
নাও ঠুকে পারে ।
মাসে একবার অথবা দুবার, আহা !
এটা যেন কিছু নামের মতন ।
তুমি এতেই থাকতে চাও লেগে, ভাতের উপরে
ঠিক এক মাছির মতন,
কিন্তু ভাতটা তো পচা । তুমি এক কির মত কাজ কর,
কিন্তু বেতন ব্যতীত । জানতাম যদি
ব্যাপারটা কেমন চলবে,
নিশ্চয় তবে আমি একাই থাকতাম,

ভিস্‌ওয়াভা শিম্বোর্স্কা-র কবিতা

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এক প্রবীণা গায়িকা

"সে এখন গায় : ট্রা লা লা ট্রালা।
আমি গাইতাম : ট্রালা ট্রালা।
তফাৎ যে কোন্‌খানে—তুমি শুনতে পাও ?
এবং সে এখানে না-দাঁড়িয়ে কিনা দাঁড়াতো এখানে
এবং তাকিয়ে দেখতো ওই দিকে, ওইখানে নয়—
যদিও ওখান থেকে ঠিকঠাক—না-না, ওইখান থেকে নয় মোটে
মেয়েটি আসতো ছুটে, এখন যেমন করে সে-রকম নয়,
পাল্টা য়াল্টা পাম ক'রে নয়—
বরং সরলসোজা নিখেতাবে পাল্টা য়াল্টা পাম,
অবিস্মরণীয়া সেই শুভবেশ্‌-বোর্ডেনিয়েরি,
কিন্তু বলো
কে মনে রেখেছে তাকে এতদিন—এবং এখন—"

রংনাম্বার

গ্যালারির এক ঘরে টেলিফোন বেজে যাচ্ছে ক্রিং ক্রিং ক্রিং
যখন সেখানে কেউ থাকে না আদৌ, মধ্যরাতে ;
যদি কেউ ঘুমুতো সেখানে, সে তাহ'লে এতক্ষণে টের পেতো,
কিন্তু এখানে থাকে শুধুমাত্র নিদ্রাহীন রংয়ের কবিরা,
শুধুমাত্র নৃপতিরা চাঁদের আলোয় যারা ফ্যাকাশ পাণ্ডুর হ'য়ে গেছে,
শ্বাস চেপে রয় তারা, চোখ ফাঁকা—শূন্য দৃষ্টি তাতে,
যখন এমনিতে দেখে মনে হয় কোনো-এক দুষ্টু তীব্র উজ্জ্বল বনিতা
স্থির চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওই বেজে-ওঠা বাক্সটার দিকে,
কিন্তু না, না, মেয়েটি নাড়ে না তার হাত,
উদ্ধত, গরহাজির, আধা গায়ে কিংবা নগ্ন হওয়া,
সে ধরা পড়েছে, চুপচাপ, অন্য সকলেরই মতো সমর্পিতা, সব মেনে নেয়া,
যারা কোনো মনোযোগ না-দিয়েই অবহেলা করে ওই ক্রিং ক্রিং,
এটাই দেখিয়ে, আমি মাইরি বলছি, আরো-বেশি দুষ্টু রসিকতা,

তারও চেয়ে বেশি যদি রাজার কর্মচারী ওই কাঠামোটা থেকে বেরিয়ে আসতেন,
(যদিও ভদ্রতা ছাড়া আর-কিছু তাঁর কানে যাবে না কখনও)।
আর এই তথ্যের সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলা যায় শহরেরই কোনো-একজন
এমন ছাদা ও বোকা রিসিভার নামিয়ে রাখছে না
ফুলডাল নম্বরে ডায়াল ক'রে—সে কি না বেঁচেই আছে, তাই ভুল করে।

বাস্তব

বাস্তব উধাও হ'য়ে যায় না কখনও
স্বপ্নেরা যেভাবে ফুটপ হাওয়ায় মেলায়।
না কোনো মর্মরধ্বনি কিংবা কোনো ঘণ্টার চং
ছত্রভঙ্গ ক'রে দেয় তাকে,
কোনো আর্তনাদ কিংবা ধমাধম ঘুঁষি খাওয়ার
তার থেকে কখনও ওঠে না।

স্বপ্নের ভেতরে সব প্রতিমা বা ছবি
কাঁপনা থাকে, অনিশ্চিত থাকে,
শতেক ব্যাখ্যার কাছে
হাট ক'রে খোলা রয় তারা।
বাস্তব বোকায় কিন্তু শুধুই বাস্তব—
এবং সেটাই কি না সবচেয়ে বড়ো ধাঁধা, বড়ো ব্যাসকূট।

স্বপ্নের অনেক চাবি থাকে।
বাস্তব নিজেই কিন্তু খুলে যায়,
কিছুতেই রুদ্ধ হ'তে চায় না কখনও।
পিছনে পায়ের সব ছাপ রেখে যায়
ফুলের রিপোর্ট আর তারায়-তারায়,
বরফে ঝলমল প্রজাপতি
আর যত মর্চে-পড়া পুরোনো লোহার আস্তাবের
মুণ্ডহীন যত টুপি
আর যত ছিন্নভিন্ন মেঘের ঝরোকা—
শেষটায় তৈরি ক'রে দেয় এমন অদ্ভুত প্রহেলিকা
যা শুধু দুর্ভেদ্য নয়—যার কোনো সমাধানই নেই।

আমাদের বাদ দিয়ে কোনো স্বপ্ন কোনোখানে হবে না কখনও।
সে-ই এক, যাকে ছাড়া বাস্তব হবে না কখনও।
সে-ই এক, যাকে ছাড়া বাস্তব হবে না কোনোদিনও,
সেইজন এখনও অজানা
অথচ তখনও তার নিদ্রাহীনতার সৃষ্টিগুলি
প্রভাবিত ক'রে যায় তাদের সবারে
যারা জেগে ওঠে ;

স্বপ্ন নয় মোটেই পাগল,
বাস্তবই বরং তাহা উন্মাদ
যেভাবে সে নাছোড়বান্দার মতো আঁকড়ে ধ'রে থাকে
ঘটনার পরম্পরা
তার সেই একরোখা জেদের জন্যেই।

খানিক্ষণ আগে যারা যারা গেছে, আমাদের আত্মীয়স্বজন,
তারা কিছু স্বপ্নে বেঁচে থাকে
মৃত্যুর পরেও—
উপভোগ করে তারা স্বাস্থ্য সুখ এবং তাদের
ফিরে-আসা হারানো যৌবন।
বাস্তব বরং ডেকে দেখায় কেবল
মৃতদেহগুলো।
সূচাগ্র ভূমিও কিন্তু বাস্তব দেখবে না কোনোদিন।

কর্পূরের মতো উবে যাবার ক্ষমতা
স্মৃতিকে মধুর করে স্বপ্ন যাতে জেগে রেখা যায়।
বিস্মৃতির জন্য কিন্তু বাস্তবের থাকে না কখনও।
সে হ'লো কঠিন খোপড়ি, কিছুতে যে ভাঙে না নড়ে না।
সারাক্ষণ ব'সে থাকে আমাদের কাঁধে,
ভারি হ'য়ে শুয়ে থাকে আমাদের সবার হৃদয়ে,
পথ রোধ করে দেয়,
বাস্তবের কাছ থেকে কিছুতে রেহাই নেই আর,
প্রতিটি লড়াই, যুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে সেও থেকে যায়।
আমাদের যাত্রাপথে এমন কোনোই ঠাঁই নেই
যেখানে সে ওত পেতে নেই সারাক্ষণ।

অবতার সিং সাধুর কবিতা (পাশ) পাঞ্জাবী কবিতা

অনুবাদ : রবিন পাল

[পাঞ্জাবের এক অকালবৃত্ত কিন্তু প্রতিভাদীপ্ত নব্যাদিশারী কবি ছিলেন অবতার সিং সাধু (১৯২০—১৯৮৮)। সালেম গ্রামের সন্তান এই কবি গ্রাম্য বাতাবরণ, রাজনৈতিক সক্রিয়তা, সাংবাদিকতা ও বিপ্লবী আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর কাব্যাদর্শ। লেখা পড়ায় মেধাবী হলেও প্রথাদুরস্ত শিক্ষা ও শিক্ষকতায় ছিলেন অনাগ্রহী, তাই কোনোক্রমে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্নাতক হওয়া অনেক পরের ঘটনা কিন্তু একসময় তিনি দুটি পত্রিকা (ক্রান্তবীর, হলরেখা) সম্পাদনা করেছেন। জীবিকার প্রয়োজনে একসময় স্কুলও গড়েছেন। সত্তর আশির দশকে পাঞ্জাবে যখন সন্ত্রাস ক্রমবর্ধমান হলো তখন তার প্রত্যক্ষ ঝাপটা এসে লাগলো এই কবির গায়েও। হত্যার লক্ষ্য হয়ে পড়লে কবি ১৯৮৬-তে পাড়ি দেন আমেরিকায়। সেখানে থাকার সময় বার করেন একটি পত্রিকা '১৯৪৭ বিরোধী' এই নামে। ১৯৮৮-তে তিনি নবীকরণের জন্য দেশে ফিরেছিলেন। প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হলেও তিনি মঞ্জুর হয়। কিন্তু দিল্লী দিয়ে উড়ানে যাবার একদিন আগে ১৯৮৮ এর ২৩শে মার্চ তিনি তাঁর গ্রামের কাছেই অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হয়ে যান। অবতার সিং সাধু 'পাশ' (সুগন্ধ) এই ছদ্মনামেই বেশীর ভাগ কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'লৌহ কথা' প্রকাশ পায় ১৯৭০-এ, দ্বিতীয় কবিতার বই 'উড়ন্ত ঈগলের সন্ধানে' ১৯৭৪-এ। মৃত্যুর পর বার করা হয় 'ছড়ানো ছুটো পাতা' ১৯৮৯-এ। তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন পাবলো নেরুদা এবং বের্টল্ট ব্রেখট। সাহিত্য আকাদেমী থেকে প্রকাশিত তাঁর "কৃষ্ণ সময়ের সঙ্গে বোঝাপড়া" নামের ইংরেজি সংকলন থেকে এই কয়েকটি কবিতা বাংলায় অনূদিত হলো।]

মুক্তি / অবতার সিং সাধু (পাশ)

জেল থেকে মুক্তি পেলে
তোমাকে আর হাজিরা দেওয়া শিখতে হবে না,
তোমাকে আর আধো আধো কথায় ফিরতে হবে না
মায়ের বুকের দুধ খাবার ইচ্ছে ফিরবে না।

আকাশে খোদিত হয়ে আছে যে সব নাম
তাতে খোঁজ তুমি তোমার নাম
যে নাম মঞ্জুর করে বাতাস
যে নাম নিয়ে হৈ চৈ করে ওটে গাছগাছালি
এ ভাবেই শুরু হয়ে যায় জীবনের দায়ভাগ নতুন ক'রে,
শুরু হয় লড়াইয়ের গল্প আত্মাকে শান্ত ক'রে
হারিয়ে যায় জনগণের মাঝে
আর এই একই বিজয়-দীপ্ত স্বরে
শুরু হয়ে যায়
জীবনের নতুন দায়ভাগ।

তবে তাই হোক / পাশ

তারা আমাদের চ্যালেঞ্জ উপভোগ করতে পারে না,
তবে তাই হোক
কারণ জীবন তাদের কাছে খেলার সামগ্রী,
শোনে কান্নাভরা গান
আর বাহবা দেয়

আমাদের নীরবতা বজায় রাখা ভালো
যদি জীবন হত এক কবিতা
যদি স্বপ্নগুলো নেমে আসত শুধুই পাথর থেকে
আমরা তবে খেলা করতে পারতাম নুড়িটুড়ি নিয়ে,
যদি জল থাকত পর্যাপ্ত পেট ভরাবার মতো
আমরা তবে চকচক করে খেতাম ঘুমোনোর আগে পর্যন্ত
যদি সম্ভব হত আলো পরে নেওয়া
আমরা তবে বেডোয়াক্কা রাখতাম আলো জামা কাপড়ে।

এখানে কোনো কিছুই নেই দেখবার
শান্তির পায়রার মতো উড়ছে চারিদিকে,
গান-গওয়া গাছপালা বেড়ে ওঠে না
যাতে দোলনা থাকবে ভালে।

আমাদেরই বে-তোয়াক্কা রাখতে হবে
রানির চুমি করা ঘুম,
আমাদেরই পরখ করতে হবে
রক্ত শোষা হাতের মনোশক্তি
তাদের শান্ত করতে মনে হয়
কান্নাভরা গান গাইলে চলবে না আমাদের।

জন্মদিন / পাশ

সারিধন্ত বন্ধুরের হাতে সমর্পিত
জন্মের অভিলাষ নিয়ে এগিয়ে চলে,
এমনকি উনিশটা ধাপ পার হওয়ার পরও
জানিনা আমি বেঁচে থাকার কারণ,
নামের যাত্রা ছিলো সুখিয়ে
শুধু ছিলো শব্দসমূহের বোঝা

একটা ছিলো আমার মায়ের নাম, আর একটা বাবার
ছিলো কতক বন্ধুদের-ও নাম
ছিলো কিছু শহর আর সড়কের নাম
নামগুলো শুরু হয়ে
যার মাথায় লেখা 'ঐতিহ্য',
প্রয়োজনীয় বর্ণ মাথায় দিয়ে
জীবনের কোনো নাম ছিলো না
যখন অজাতকের অনুভব
বদলে গেল অসহ্য বেদনায়,
আমি তখন কুড়িটা সিঁড়ি পার হয়েছি
জীবনের মরিয়া বর্ণমালাকে গানে গানে ভরে তুলতে,
আণবিক ধূলি ছিলো ওপরের বাতাসে
চোখ দুটো অস্ফুরিত হচ্ছিল আকাশে,
আমার লোকজন চলেছিল শবের বিপজ্জনকতায়
পাপ কিংবা অন্য কিছুতে ভরা।
আমার পিঠে
ভরে নিয়েছিলাম আমি সমস্ত শব্দই
আর শীতরাতে শুরু করেছিলাম চামড়ার ব্যাগের মতোই
রক্তের সমুদ্দুরে।
গরাদ ছিলো সেখানে
যেখানে শাখ হলো আমার বিংশতি সিঁড়ি,
এভাবে পরবর্তি পর্যায়ের চৌকাঠ
পার হয়ে গেলাম আমি বর্ণমালা জীবনকে মাথায় রেখে।

এখান থেকেই উঠে আসে 'জন্ম' এই শব্দটি
এতেই তো জীবনের সূচনা,
এ মানুষটার কাছে এখন ঘুম পাড়ানি গান শোনানো
এই নবজন্ম পাওয়া মানুষটির কোনোর কাছে আছে
এই কুড়িটা বছরের সবটুকু
এই ঘুমপাড়ানি গানে যায় মিশে
সুখী জন্মদিনের গান
ওই সাথী বন্ধুদের
টুং টাং শব্দে ধ্বনিত হয়ে ওঠে শৃঙ্খলিত গান।

সিজার ভ্যালেজো : লাতিন আমেরিকার স্প্যানিশ কবি

অনুবাদ : জ্যোতির্ময় দাশ

পেরুর উত্তরাঞ্চলের এক ছোটো শহরতলী সান্তিয়াগো ডি ছুচকাতে কবি সিজার ভ্যালেজোর জন্ম ১৮৯২ সালে হয়েছিল। তাঁর বাবা-মা নিতান্তই গরীব ছিলেন তবু চেষ্টা চরিত্র করে তাঁরা ভ্যালেজোকে লিমার ট্রুজিলো ও সান মার্কোজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পেরেছিলেন। অবৈধ রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে ও অভিযোগে তাঁর জন্ম-শহর থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯২০ সালে। আপাত দৃষ্টিতে তিনি নির্দোষ ছিলেন, তবু তাঁকে কয়েকমাস জেলে বন্দী-জীবন কাটাতে হয়। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ট্রিলস-এর (১৯২২) বেশ কিছু কবিতায় এই কারাবাসের তিক্ত অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে। এই ঘটনা তাঁর পরবর্তী জীবন ও কাব্যমানসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯২৩-এ ভ্যালেজো প্যারিস শহরে এবং ১৯২৮ ও ১৯২৯-এ দুবার অল্প-সময়ের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। এই দুই বিদেশযাত্রাও তাঁর জীবনে এক সুগভীর রেখাপাত করে।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে সিজার ভ্যালেজো সংগ্রামী গণতন্ত্রবাদী (মিলিট্যান্ট কম্যুনিস্ট) হয়ে ওঠেন এবং ফ্রান্স থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হলে তিনি স্পেনে চলে আসেন। পরে অবশ্য ফ্রান্সে তিনি ফিরে এসেছিলেন (১৯৩৩) কিন্তু সে সময়ে ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধের জন্য বেশিদিন থাকতে পারেননি।

সিজার ভ্যালেজোর সাহিত্য রচনার পরিমাণ খুব বেশি নয়। তাঁর কবিতা আপাত-কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কবিতার পংক্তি বা বাক্যাংশ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন অসম্পূর্ণ যে কবিতার বক্তব্য বুঝতে বেশ অসুবিধা হয়। বক্তব্যকে সহজ সরলভাবে বলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর পছন্দ ছিল না এবং লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছতে ন-কাব্যাত্মক সাহিত্য-সৃষ্টি (এ্যান্টি-লিটারেসি) করতে তিনি ভালোবাসতেন। নিজের লেখক পরিচিতি বা ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার জন্য কখনই তিনি তাঁর কাব্যকৃতিকে ব্যবহার করেননি এবং কোন ধরনের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক-রাজনীতির সঙ্গে মাখামাখি করতেন না। সেই কারণেই তিনি তাঁর চর্চিত কোনো কিছুতেই তেমন কোনো খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। এমনকি তাঁর মৃত্যুর সময়েও (১৯৩৮) সমাজতান্ত্রিক স্পেনের সমর্থক হিসেবে কেউ তাঁকে জানত না। তাঁর অর্ধেকের বেশি কবিতা মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং দু-একজন বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁকে বর্তমানে স্প্যানিশ ভাষায় বিংশ-শতাব্দীর অন্যতম বলিষ্ঠ কবিই শুধু নয় সম্ভবত শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ বৈচিত্র্যরহিত কবি হিসেবে গণ্য করা হয়।

অনূদিত কবিতাগুলি পেঙ্গুইন, ব্রিটেন প্রকাশিত (১৯৭৬) লাতিন আমেরিকান সিরিজে সিজার ভ্যালেজোর নির্বাচিত কাব্য-সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে। স্প্যানিশ ভাষায় কবির নামের উচ্চারণ 'সেজার ভায়েখো' হওয়া উচিত কিন্তু যেহেতু কবিতাগুলি আমরা ইংরেজি অনুবাদ থেকে গ্রহণ করেছি তাই ইংরেজি অক্ষরমালায় Cé́sar Vallejo) তাঁর নামের উচ্চারণটিই ব্যবহার করা সঙ্গত মনে করেছি।

নির্ঝর

আমি এমন একটি দিনে জন্মেছিলাম
যখন ভগবান অসুস্থ ছিলেন।

প্রত্যেকেই জানে আমি বেঁচে আছি,
আমি লোকটা বধ ; এবং তারা জানেনা
সেবছরের জানুয়ারিতে ডিসেম্বরের ঘটনাটা।
কারণ আমি এমন একটি দিনে জন্মেছিলাম
যখন ভগবান অসুস্থ ছিলেন।

আমার অধিবিদ্যামূলক আবহাওয়ার পরীরে
একটা গহ্বর রয়েছে
কেউই সেটা অনুভব করতে পারবে না ;
এক নিস্তব্ধতায় আচ্ছাদিত পথ
আগুনের রক্তিমাভায় কথা বলে।
আমি এমন একটি দিনে জন্মেছিলাম
যখন ভগবান অসুস্থ ছিলেন।

শোনো, ভাই তোমরা শোনো…
ঠিক আছে। আমাকে না দুধ খেতে দিও না
ডিসেম্বরের দিনে না আসবার জন্য,
জানুয়ারিদের ফেরৎ না দেবার জন্য।
কারণ আমি এমন একটি দিনে জন্মেছিলাম
যখন ভগবান অসুস্থ ছিলেন।

প্রত্যেকেই জানে আমি বেঁচে আছি,
আমি শিবোতে পারি…এবং তারা জানে না
কেন আমার কবিতার পংক্তি ক্যাচ-কোঁচ শব্দ তোলে
মোমবাতিদানের পাত্র থেকে অন্ধকারের ফুৎকার
রঙ্গভূমিকে উঁকি দিয়ে দেখতে থাকা
হিংস্র দানবীর দেহ থেকে পাক খুলে আনা
উত্তপ্ত খসখসে বাতাস।

প্রত্যেকেই জানে···এবং তারা জানে না
যে আলোও এখন ক্ষয়রোগাক্রান্ত,
এবং ছায়া পৃথুল মেদযুক্ত···
এবং তারা জানে না যে রহস্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে···
অথবা কে সেই বিষণ্ণ সঙ্গীত পরিশ্রমী
যে দেশ থেকে দেশে দেশান্তরে
মধ্যবর্তী সীমান্ত সোপানটিকে
দূর থেকে অস্বীকার করে।

আমি এমন একটি দিনে জন্মেছিলাম
যখন ভগবান সাংঘাতিকভাবে
অসুস্থ ছিলেন।

ভাই মিগুয়েলের স্মৃতি স্মরণে

ভাই, আজ আমি ঘরজার পাশের বেঞ্চে বসে রয়েছি,
এবং তোমার অনুপস্থিতিকে আমরা আজ অনুভব করছি তীব্রভাবে।
আমার মনে পড়ছে এই সময়ে আমরা রোজ খেলতাম, আর মা
আদর করে আমাদের বলত : কিন্তু বাছারা···।

এবার আমি গিয়ে লুকিয়ে পড়ব,
ঠিক আগের মত, আর সবকিছু এমনকি—
গানেরা, আশা করব তুমি আমাকে খুঁজে পাবে না।
বসবার ঘরের মধ্যে, হলঘরে, বারান্দাগুলোতেও।
তারপর তুমি লুকিয়ে পড়লে, এবং আমি আর খুঁজে পেলাম না।
আমার বেশ মনে আছে ভাই, এই খেলাতে
পরস্পরকে আমরা কাঁদিয়ে থাকতাম।

মিগুয়েল, তুমি লুকিয়ে পড়লে
আগস্টের এক রাতে, প্রথম আলো ফোটার সময়ে ;
কিন্তু অন্যবারের মত মজা করে লুকোনোর বদলে, সেদিন বিষণ্ণ
ছিলে তুমি, এবং তোমার ঘুমন্ত হৃদয় সেই পড়ন্ত বিকেলগুলিতে
তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর এখন
তোমার আত্মার ওপরে ছায়া নেমে আসছে।

ওহে ভাই, খুব বেশি কিন্তু দেরী কোরো না আড়াল থেকে
বেরিয়ে আসতে। বুঝেছ তো? মা হয়ত তাহলে খুবই চিন্তা করবে।

হতবাক

আজ কেউ কিছু খোঁজ করতে এল না ;
আজকের এই সন্ধ্যায় তাঁরা আমার কাছে কিছুই জানতে চাইলেন না।

এই আনন্দমুখর আলোর মিছিলে আমি আজ
একটিও কথার ফুল দেখতে পেলাম না
আমাকে ক্ষমা করুন ঈশ্বর : আমার তো সামান্যই মৃত্যু ঘটেছিল।

আজ এই সন্ধ্যায় প্রত্যেকে একে একে চলে যাচ্ছে
আমার কাছে কোন কিছু খোঁজ বা জিজ্ঞাসা না করে।

আর আমি জানি না ঠিক কি তারা ভুলে গেল এবং কিছু
ফেলে গেল কি না ভুল করে আমার হাতে, অন্য কারোর জিনিষ ভেবে।

আমি দরজার বাইরে বেরিয়ে
চিৎকার করে হয়ত তাদের জানাবো :
তোমরা যদি কেউ কিছু হারিয়ে থেকে থাকো, সেটা এখানে রয়েছে।

কারণ এই জীবনের সমস্ত সন্ধ্যাবেলায়
আমি জানি না ঠিক কোন্ দরজাগুলি বন্ধ হয়েছিল আমার মুখের ওপরে,
এবং অচেনা অন্য কিছু আমার আত্মাকে আক্রান্ত করেছিল কিনা।

আজ কেউই এদিক দিয়ে গেল না
এবং আজ আমার এই সন্ধ্যায় খুবই অল্প একটু মৃত্যু হল।

কালো অশ্বদূতেরা

করাঘাতের ধারা জীবনে যে এত তীব্র হতে পারে···আমি জানতাম না!
যেমন ঈশ্বরের ঘৃণার ধারা : মনে হয় যেন তার প্রভাবে
প্রতিকূল স্রোতে যা কিছু ছিল সব কিছুই আহত হয়ে
তোমার আত্মায় স্থির স্রোতহীন হয়ে গেল···আমি জানতাম না।

সামান্য হলেও তারা কিন্তু রয়েছে···গভীর কালশিটের দাগ
ফেলে যায় তারা তীক্ষ্ণতম মুখে, কঠিনতম পিঠেও।
তারা বন্ধ ফুলরাজাদের বাজ্ঞা হতে পারে, অথবা
আমাদের কাছে পাঠানো মৃত্যুর কালো অগ্রদূতের দল।

তারা তোমার পৃথীর আত্মার গভীরে সুড়ঙ্গপথ হতে পারে ;
নিয়তি গাল পেড়ে অভিসম্পাৎ দেয় তোমার এমন কোন সুন্দর বিশ্বাস।
ওই হতচ্ছাড়া করাঘাতগুলো যেন বিদ্যুৎচুল্লির দরজার কাছে রাগা
পাউরুটির চট্‌পট্‌ করে পুড়তে থাকার অবিরাম শব্দ।

এবং মানুষ···হতভাগা মানুষ ! আমাদের কাঁধে চাপড়
মেরে ডাক দিলে তবে তারা ফিরে তাকায় ;
সে তার ঝ্যাপাটে চোখ তুলে তাকায়, আর যা কিছু সব ভীষণ
নিশ্চল স্থির হয়ে যায় তার দুচোখে পাপের জলাশয়ের মত।

করাঘাতের ধাক্কা জীবনে যে এত তীব্র হতে পারে···আমি জানতাম না !

রাজস্থানী সাহিত্য নিয়ে বাংলায় প্রথম বই
জ্যোতির্ময় দাশ-এর
নির্বাচিত রাজস্থানী দোঁহা
প্রায় ছয়শত দোঁহার বাঙ্ময় ভাষান্তর ও ইতিহাসের সন্ধান।
অনুবাদ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। মূল্য-৯০.
সাহিত্য অকাদেমী
২৩/৪৪ ডায়মন্ডহারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩

আনা আখ্‌মাতোভা-র দুটি কবিতা

অনুবাদ : বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[রাশিয়ার মহিলা কবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্যা আনা আখ্‌মাতোভা (১৮৮৯—১৯৬৬) এযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। স্তালিনীয় লৌহযুগের অসংখ্য রুদ্ধকণ্ঠ লেখকলেখিকার মতো তিনিও ছিলেন নির্যাতিত, লেখক-সংঘ থেকে বহিষ্কৃত এবং পুলিশি চক্ষের সতর্ক প্রহরাধীন। অবশ্য, স্তালিনের মৃত্যুর পর আবার তাঁর কবিতা স্বদেশে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি পশ্চিমের দেশগুলি ভ্রমণ করার অনুমতিও পান। নানা ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। ইংরেজিতে তাঁর কবিতার আকর্ষ অনুবাদ করেছেন ডি. এম. টমাস]

১৯৪০

তুমি যখন একটা ঘুমকে কবর দাও
তখন গোরস্থানে স্তোত্রপাঠ কর না।
শীগগীরই শিয়ালকাঁটা আর ফণিমনসায়
ফুল ধরবে ;
কেবল সমাধিখননকদের কাজের বিরাম নেই
কারণ মৃতদেহরা অপেক্ষা করে না।
চারদিক সুনসান্
এতো স্তব্ধ, হে ঈশ্বর,
সময়ের পায়ের শব্দটি শোনা যায়।
একদিন এই ঘুম জেগে উঠবে
ঘেতাবে ঘড়া ভেসে ওঠে বসন্তের নদীতে,
কেবল কোনো মায়ের ছেলেই
মায়ের দেহটা চিনতে পারবে না ;
নাতিরা নোয়াবে মাথা,
আকাশে দোল খাবে চাঁদের পেণ্ডুলাম।
এখন আক্রান্ত পাখী সহরে
নৈঃশব্দ্য ডানা ছড়াচ্ছে।

কবির মৃত্যু

সেই অনন্ত কণ্ঠস্বরে কেউ আর কথা বলবে না
গতকাল আমাদের ছেড়ে গ্যাছে
কুঞ্জবনের কথক
সে আজ রূপান্তরিত
শস্যের প্রাণদাত্রী মঞ্জরীতে
অথবা মৃদু বৃষ্টি
যার গান গেয়েছিলো একদিন
একমাত্র এই পৃথিবীতেই জন্মায় যতো ফুল
ফুটে উঠলো তার মৃত্যুর সন্ধানে
তন্দ্রালু স্তব্ধতা নামলো সেই গ্রহ জুড়ে
নম্রতম নাম যার, মাতা বসুমতী

পুশতো সাহিত্য

অনুবাদ : ড: অরাজ সেনগুপ্ত

পুশতো ভাষা পাঠানদের ভাষা। পুশতো সাহিত্য পড়লে সীমান্ত প্রদেশ ও সে অঞ্চলের উপজাতীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কঠিন পর্বতমালা ও পাথরকুচি ভরা পথঘাট, উপত্যকা এবং রুক্ষ পাহাড়ী অঞ্চল পুশতো সাহিত্যের প্রেক্ষাপট।

পাঠানেরা খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে আমু দরিয়ার চারদিকে বসবাস করতেন। পুশতো ভাষা তাই অতি প্রাচীন ; তবু কিন্তু প্রাচীন পুশতো সাহিত্যের বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না।

কাবুল থেকে কান্দাহার আর ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার পাহাড়ী ও সমভূমি বাসিন্দা-দেরই কথা ভাষা পুশতো। আফগানিস্থানের প্রধান ভাষারূপেও পুশতো আজ স্বীকৃত। আবেস্তাই পুশতো সাহিত্যের উৎস। আরবী, ফারসী আর প্রাকৃতের বহু শব্দ পুশতো ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

পুশতো ভাষা সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীনতম কথ্যভাষা রূপে প্রচলিত হয়ে এলেও, তার লিখিত ভাষার নিদর্শন খুব বেশিদিনকার নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাশিয়ার পারকত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্নহার্ড ডরন-ই প্রথম পুশতো ভাষার ইংরেজি ব্যাকরণ সংকলিত করে প্রকাশ করেন। পেশোয়ার আফগানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল হলেও পুশতো ভাষার অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল মসজিদ ও দরগায়। দিল্লির বাদশা আকবরের শাসনকালে বাহাদিদ আনসারী তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ পীর-ই-রোশান বা মহাপ্রাজ্ঞ রচনা করেন। পুশতো ভাষায় তাঁর সমসাময়িক আকুন্দ দরবেজও কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। খাটকের খুশল-খানও ফারসী থেকে পুশতো ভাষায় শতাধিক লোকনীতি অনুবাদ করেন। আহম্মদ শাহ্ (বর্তমান আফগান রাজবংশের আদিপুরুষ), আবদুর রহমান প্রভৃতি অনেকেই সেকালে পুশতো ভাষায় গীতিকাব্য রচনা করে অমরত্ব লাভ করে আছেন। এখনকার পেশোয়ার থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে হাজারখানায় দরবী ও দরদী কবি আবদুর রহমানের কবরস্থান আজও আছে। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের (বিশেষ করে উলিয়াম কেরির) উৎসাহে পুশতো ভাষা ছাপার হরফে প্রচারিত হয়। মার্কিন প্রেসবিটেরিয়ান মিশনারিরাও পুশতো ভাষায় গ্রন্থ প্রচারে সহায়তা করেছেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বাসিন্দা পাঠানদের বাঁচার সংগ্রামেই জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়ে থাকে। সাহিত্য-মূলক সূক্ষ্ম হৃদয়বেত্তার স্থান তাতে বড় একটা নেই। তবুও প্রাচীনতম পুশতো কবিতায় যে-সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে তাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শৌর্যবীর্যের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। যেমন :

"আমার লৌহকঠিন সংকল্প তীরের ফলার মতো, দুশমনের মাথার উপরে ঝকমক করে ওঠে। আমি পলাতক দুশমনের পিছনে ছুটে তাকে আক্রমণ করি, আমার সমতুল্য বীর যোদ্ধা আর কেউ নেই।"

বস্তুত, বীরত্ব-গাথা বা বীরত্বসূচক রচনাই প্রাচীন পুশতো সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এই দিক থেকে আমীর কেরোরের কবিতাগুলি পাঠান জাতির দুঃসাহস ও বীরত্বপূর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক।

পুশতো সাহিত্যকে তিন যুগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রাচীন যুগ : দ্বাদশ শতক থেকে আরম্ভ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক, অর্থাৎ বাবরের ভারত অভিযান কাল পর্যন্ত। মধ্য যুগ : খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে ইংরেজ শাসনের সূচনাকাল পর্যন্ত। আর তৃতীয় বা একালের সাহিত্যের অন্তকাল ১৮৪০ থেকে বলা চলে।

প্রাচীন যুগ :

প্রাচীনকালের পুশতো সাহিত্যের প্রকৃত তথ্য খুব বিশেষ জানা যায় না। 'টপ্‌পা খাজানা' গ্রন্থে (১২৯২) কিছু প্রাচীন তথ্যের হদিস পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক এই পুশতো গ্রন্থখানি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পুশতো সাহিত্যের সূচনা-পর্বের অনেক খবর এই মূল্যবান গ্রন্থখানি থেকে জানা যায়। প্রাচীন পুশতো সাহিত্য ছিল খুব সহজ ও স্বাভাবিক ; কবিতা গানে ছিল বইয়ের প্রভাব-মুক্ত, একান্ত নিজস্ব। প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে ছিলেন আবু হাশেম, শায়খ মালকিয়ার, আস্‌আদ সুরী। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ছন্দে কবিতা লিখেছেন, আরবী বা ফারসী ছন্দের কোনো প্রভাব ছিল না।

অবশ্য ১১৮০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে তার ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে। ফারসী গজলের অনুকরণ হতে শুরু করেছে এবং ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, পরিভাষায়, অলঙ্কারেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তবে পুশতো সাহিত্য তার স্বকীয়তা হারিয়েছিল তা ঠিক বলা যায় না। কেননা, কেবল গজলের ফারসী অনুকরণ দেখা যায়। পুশতো সাহিত্যেও ফারসী সাহিত্যের অনুরূপ। রূপের আরাধনা ও প্রেমের স্থান প্রধান। (বীর কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সুরা, মূলুক আর রঙের প্রাচুর্যও দেখা যায়। এক কথায়, সে যুগের পুশতো সাহিত্যে রূপ, রঙ, রসের স্থান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে শক্তিমত্তার বর্ণনা।

গজল ছাড়া 'টপ্পা' পুশতো সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন সম্পদ। টপ্পা পুশতো কাব্যের স্বাভাবিক স্বতোৎসারিত সাহিত্য। পুশতো ভাষায় টপ্পাকে 'লড়ি' বা 'মেসরা' বলা হয়—লোকগীতির একটি প্রধান অঙ্গ এই 'লড়ি' বা 'মেসরা'—সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সর্বজনপ্রিয়। কেননা আজও দেখা যায় আপামর বৃদ্ধ সকল পাঠানই একাধিক 'লড়ি' বা 'মেসরা' কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন। এ অনেকটা পাঞ্জাবী বা মুলতানী ভাষার 'দোহা'র অনুরূপ। টপ্পা ছাড়া পুশতো লোকসাহিত্যের অপর শাখা হল 'চারবীতা' 'নিমকাই' ও 'বেগতাই', একতারার সাহায্যে এগুলি গাওয়া হয়।

সলমান কাকুর 'তাজকিরাতুল আওলিয়া' পুশতো গদ্য সাহিত্যের একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ। ১২০০ খ্রীস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচিত হয়। এ গ্রন্থের যে কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়, গ্রন্থখানি সহজ ও সাবলীল এবং আরবী রচনারীতির অনুকরণে রচিত।

সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আকবর আমিজাক—তৈমুরলঙ্গের সমসাময়িক। তৈমুরের ভারত অভিযানের সময় তিনি জীবিত ছিলেন। তবে তাঁর লিখিত কবিতা-গান বড় একটা আজ চোখে পড়ে না। ঘোর ও গজনীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে তিনি বাস করতেন। সেকালের পুশতো কবিদের মধ্যে মোল্লা মস্ত জমানদও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর লেখা 'মূলুকুল গোজোয়াত' (১৪০৫) একখানি উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্য। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে তাঁর রচিত বহু রুবাই, কাসিদা ও গজলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এমনি একটি গীতের বাংলা অনুবাদ :

'হে মস্ত! তুমি যখন আনন্দের সম্পদ লাভ করেছ, তখন আর দুঃখ কি? কেননা আনন্দই তো সত্য ও সুন্দর।'

বিবি যবুনা (১৪০১—১৪৭২) ও বিবি রাবেয়া (১৪১৩—১৪৭১)—এই দুই নারী কবির রচনারও সন্ধান পাওয়া গেছে প্রাচীন পুণতো সাহিত্যে। যবুনা লিখেছেন জীবনের কথা, সুখদুঃখ, অভাব অনটনের কথা আর রাবেয়া লিখেছেন পাপ পুণ্য ও স্বর্গনরকের কল্পকথা।

মধ্যযুগ :

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ও সাধক কবি বায়েজিদ আনসারীর (১৪৯৮—১৫৭৮) জন্ম হয় ওয়াজিরিস্তানে। পাঠানেরা তাঁকে 'পীর-ই-রওশন' বা উজ্জ্বল পীর বলে সম্মানিত করতেন। আনুমানিক ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আনসারী ইসলামী জীবনদর্শন বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নাম 'খাকল-বয়ান'। গ্রন্থখানি আরবী ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত হলেও ছন্দোবদ্ধ। 'খাকল-বয়ান' আদি মধ্যযুগের পুণতো সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আনসারী শুধু কবিই ছিলেন না, প্রবন্ধকারও ছিলেন। ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে শতাধিক প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁর উত্তর-সাধক মীর্জাখান আনসারীও (১৫৪৮—১৬০৯) কবিতা, গান ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করে পুণতো সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তিনি সুফী-সাধকও ছিলেন। তাঁর একটি নীতিকথা :

'কি, বলি, আমি কি ? আমার জীবন-মৃত্যু তাঁরই প্রতিচ্ছবি।'

খোশহাল খান খটক (১৬২২—১৭০৩) পেশওয়ারের আকোড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো তাঁর প্রতিভাদীপ্তিতে পুণতো সাহিত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সকল দিক থেকে। তাঁরই একান্ত সাধনায় পুণতো সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার হয়। তাঁকে মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্বের জাতীয় কবিরূপে অভিহিত করা হয়। খোশহাল খান কমবেশি ৩৬০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'দিওয়ান'-এ ১০ হাজার বয়াত আছে। দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, দেশাত্মবোধক কবিতা, বিরহ-মিলন-প্রেম গাথা প্রভৃতি শিল্পকলার কোনো দিকই বাদ পড়েনি। খোশহাল খান পুণতো গদ্যকেও নতুনভাবে সজীবিত করে গিয়েছেন। সাধারণ মানুষের হাসি কান্নার কথা অলংকারাতিশয্যের আওতা থেকে মুক্ত করে সহজবোধ্য রূপদানের রেওয়াজ তিনি নিয়ে আসেন পুণতো সাহিত্যে। প্রাঞ্জল পুণতো গদ্যভাষার নমুনা হিসেবে তাঁর 'আয়ার-ই-দানেশ' উল্লেখযোগ্য অনুবাদ (১৬৬২)। 'দস্তারনামা' খোশহাল খানের শ্রেষ্ঠ রচনা। স্বাধীনতা প্রিয় পাঠকদের মানবিক মর্যাদা-জাগানিয়া কাহিনীই তিনি এখানে রচনা করেছেন। গ্রন্থখানির সূচনার একটি বাক্য :

সাধারণত অনেকেই মূল্যবান বসনভূষণ পরে থাকে, তবে মানুষ নামের মর্যাদার বিস্তার খুব কম লোকের জীবনেই ঘটে।'

কবি খোশহাল খানকে তাঁর জীবনের শেষের দিকে দিল্লীর বাদশাহ গ্রেফতার করে রাজধানীতে নিয়ে আসেন এবং অন্তরীণ করে রাখেন। তিনি তাঁর কারা-জীবন সম্পর্কে লিখেছেন :

'প্রথমত দরবারে প্রতিদিন হাজিরা দিতে হয়। এখানে কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই। এখানে আমি কারও প্রতি স্নেহ প্রীতি মমতা দেখাতে পারি না। এখানে কাউকেই সত্যার্থে মানুষ বলে মনে হয় না। তাছাড়া এখানকার প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মনোভাব পোষণ করেন স্বয়ং বাদশাহও।'

খোশহাল খানের বংশধরদের মধ্যেও অনেকে সাহিত্য-সাধক ছিলেন। তাঁর পুত্র আলতাফ খান পেশ দাদীর (১৬৪৮—১৭৩০) 'গুলিস্তান'-এর পুণতো অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ সহজ ও হৃদয়গ্রাহী।

আবদুর রহমান বাবা (১৬২৬—১৭১১) পুশতো সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সূফী কবি। তিনি মোশহাল খানের সমসাময়িক। তিনি তাঁর সুরের মাধ্যমে পাঠানদের অন্তরে মানব-প্রেমের দীপ জালিয়েছেন। সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে মানব জীবনের ব্যাখ্যা তাঁর কবিতা ও গানের প্রধান বিশেষত্ব। আবদুর রহমান বাবার রচনায় রুমী, সাদী, হাফিজ প্রমুখ ইরাণী মহাকবির প্রভাব লক্ষণীয়। পাঠানদের স্বাধীনতার দুর্মর আবেগ তাঁর কবিতায়, প্রতিটি দিওয়ানে রুবাই ও গজলে অনুরণিত। তাঁর গান ও কবিতা আফগানদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এমন কোনো পুশতো ভাষা-ভাষী শিক্ষিতের দেখা মিলবে না যিনি আবদুর রহমান বাবার কিছু না কিছু গান বা কবিতা—রুবাই, গজল—কণ্ঠস্থ করতে পারেন নি।

পেশোয়ারের অনতিদূরে বাগডুর কুলি গ্রামে ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি সাংসারিক জীবনে একরূপ নীতস্পৃহ হয়ে পড়েন। নির্জন নদীর তীর বা গাছের তলায় বসে একতারা হাতে তিনি সুরের সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর মুখে গান শুনবার জন্য সঙ্গীতানুরাগীরা তাঁকে ঘিরে থাকতেন। তাঁর সুরের প্রতি অন্তহীন ভালবাসা ব্যক্ত হয়েছে এখানে :

'রহমান বড় দুঃখে আছে। সে সব সময়ে সুরের বিচ্ছেদে কাঁদে। সুর তার কাছে এসে রহস্যময়ী নারীর মতো হাসে, নাচে, ধরা দেয় না, ধরতে গেলেই সে দূর আকাশে অথবা সাগরে ভেসে যায়। কোথায় আর পাব তাকে?'

পুশতো সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্তিমপর্বের শ্রেষ্ঠতম কবি পেশওয়ারের আবদুল হামিদ। তিনিও ছিলেন মরমী কবি। তাঁর দিওয়ানগুলিতে মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতিরই প্রকাশ। রূপ ও রস তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান অঙ্গ।

আবদুর রহমান বাবা ও আবদুল হামিদের প্রভাব পরবর্তী কালের অর্থাৎ আধুনিক যুগের পুশতো ভাষা-ভাষী কবিদের মধ্যেও দেখা যায়।

আধুনিক যুগ :

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবেই পুশতো সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। রোমান্স-ধর্মী উপাখ্যান রচনাতেই আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু হল। তবে এসব রচনার বেশির ভাগই মৌলিক নয়। কোনোটা বা অবলম্বনে রচিত।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা আটক নদী পার হয়ে পাক্‌তুনিস্থান অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। ইংরেজদের আসার পর থেকে বৈদেশিক প্রভাব পুশতো সাহিত্যে পড়ে নতুন যুগের সূচনা করে।

বিদেশীদের ভাবনাচিন্তা অনুসরণে বিভিন্ন বিষয়ে তখন সাহিত্য সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে। উর্দু কবিতা ছাড়া ইংরেজি কাব্যের অনুকরণেও পুশতো ভাষায় নতুন নতুন বিষয়বস্তুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে থাকে। ইওরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও তার প্রতিক্রিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রেও দেখা দিল। ফলে পুশতো গদ্য সাহিত্যে আধুনিক ভাব-ভাবনা ও রীতির প্রচলন হল। আগেকার অলংকার বাহুল্য ও দুর্বোধ্যতারও অবসান হল।

উনিশ শতকের পুশতো সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে আহ্‌মদ উল্লাহ্, কাজী আহ্‌মদ শাহ্ রেজওয়ানী, কাজী রহিমুল্লাহ্, মুনশী আহ্‌মদ জান এবং সৈয়দ রাহাতুল্লাহ্ রাহাতের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই কথাশিল্পীরা তাঁদের কথা-কাহিনী ও উপন্যাসে পুশতো ভাষায় সাধারণ নারীপুরুষের জীবনের ছবি সহজভাবে রূপায়িত করে তোলেন।

পুশতো সাহিত্যের প্রগতি-কালের সূচনা বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, ১৯২০ থেকে। পেশোয়ারের ইসলামিয়া কলেজ ও এডওয়ার্ড কলেজের অবদান এক্ষেত্রে অপরিসীম। ইংরেজি শিক্ষিত এই দুই কলেজের ছাত্রবৃন্দ পুশতো সাহিত্যকে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন। তাঁরাই নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে পাশ্চাত্য আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন। তাঁদের উদ্যমে ও উৎসাহে পুশতো কাব্যে ও কথাসাহিত্যে জাতীয়, সামাজিক ও সংস্কারমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং পুশতো সাহিত্যে আরবী, ফারসী ও উর্দু সাহিত্যের প্রভাব-মুক্ত স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত যুগান্তর দেখা দেয়। ইংরেজি কাব্য উপন্যাসের ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়ে সৈয়দ রসুলখান রেশা (১৯৩১) মুহম্মদ আশরাফ্ মখতুমে (১৯২৪—১৯৮১) কঞ্জলে হক শায়দা (১৯২৯—), সন্দর খান বরদপুরী (১৯৩২—১৯৯০), হামজা খান শেনওয়ারী (১৯২৭—১৯৮৪), আজম খান খটক (১৯২২—১৯৮৭) এবং আবদাব হেদায়েতুল্লাহ্ খান (১৯৪২—) প্রভৃতির সৃষ্টির নবীনতায় পুশতো সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছে।

আধুনিক পুশতো সাহিত্যে প্রেম-সংগীতের ঐশ্বর্য অসাধারণ। পুশতো প্রেম-সংগীত অতীন্দ্রিয়বাদ অথবা অধ্যাত্মবাদে হারিয়ে যায়নি। মাটির কাছাকাছি থেকে প্রেম-সংগীতগুলিতেও সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা ও জীবনের কথা ধ্বনিত হয়েছে। পুশতো প্রেম-বিষয়ক গীতিকবিদের মধ্যে আবদুল কাদীর খান (১৯২৮—১৯৮২) আলী খান (১৯৩২ —) ও আবদুল হামিদ (১৯৩২—) বিশেষভাবে স্মরণীয়। আবদুল কাদীরের একটি গীতি কবিতার বাংলা অনুবাদ :

'আমি সারাদিন তোমার কর্মরত দুটি হাতের দিকে চেয়ে থাকি, তোমার দুটি চঞ্চল পা' আমার ঘরের মধ্যে অবিরাম ঢেউ তুলে তুলে আমাকে ভেঙাতে থাকে। তোমার দুই চোখের তারায় ভালবাসার দীপ জ্বলে ওঠে, আমার গরীব ঘরের অন্ধকার তাতে ঘুচে যায়।'

এখানে ভালবাসার আবেগ কেমন জীবনাশ্রয়ী! পুশতো সাহিত্যে অধিকাংশ প্রেম-সংগীতই এমন বাস্তব জীবন ও গভীর আবেগের বিস্ময়কর মিশ্রণে রচিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যে প্রেম-সংগীতের বাস্তবায়ন দুর্লভ।

পাঠানদের মতো সংগীত-প্রিয় জাতি পৃথিবীতে বেশি নেই। জীবন-যাত্রার প্রতি পদে পদে—অসংখ্য সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে, গ্রামীণ গোষ্ঠদের বৈঠকে সর্বত্র রবাব ঢোল ও খঞ্জনী সহযোগে এরা গান-বাজনা করেন। হুজরা পাঠান পল্লী-জীবনের মধ্যতম অঙ্গ। গ্রামের যুবা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধারা হুজরায় সমবেত হন। হাসি-গল্প-গান-বাজনায় মশগুল হন। কিন্তু হুজরার আসরেও যে-সব গান এঁরা করেন, সেগুলিতেও ঘর-সংসার, মা শিশু, শিশুর দোলনা প্রভৃতি নিয়ে জীবনের ছবিই ভাষায়, ছন্দে ও সুরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হুজরা আসরের একটি গানের বাংলা অনুবাদ :

ঘরের চালে পাখি নাচে
ঘরের ভেতরে মা গুন্ গুন্ গান গায়
কাজের ফাঁকে ফাঁকে।
বাপের হাতে কোদাল,
ঘাম ঝরছে কপাল-গাল বেয়ে।
ঘামের ঘড়ি দিয়ে কোলানো—

উঠোনের দোলনা দোলে
আমাদের ছোট্ট খাঁ (খোকন) এতে ঘুমোয়
বাগানের ফুলের মেলায়
হারিয়ে যাওয়া গোলাপ কলিটির মতো।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল। পাঠানরা কিন্তু তাঁদের পুশতো ভাষা ও সাহিত্যকে মনে প্রাণে ধরে রেখেছেন। □

সহায়ক গ্রন্থ :

1. *Modern Asian Literature* : Edited by Darsthy Blair Shimer Mentor Book, New Englsih Library, London
2. *Selection From The Poetry of Afgans* : R. G. Raverty 1964.
3. *Linguistic Survey of India Vol X.*

SPACE DONATED BY :—

A

WELL

WISHER

মমতা

সৈয়দ আব্দুল মালিক
অনুবাদ : বাসুদেব দাস

পাশাপাশি অনেকদিন বাস করার ফলে আর হয়তো সমবয়সী হওয়ার জন্যই ক্যাপ্টেন বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল অবশ্য অনেক বিষয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্যও ছিল। যেমন ও কথা বলে বড় আনন্দ পায়, একজন মনের মতো শ্রোতা পেলে খাওয়া দাওয়া ভুলে কথা বলে যেতে পারে কিন্তু আমি কথা খুব কম বলি— আগে থেকেই। তাছাড়া অনর্গল কথা বলার মতো উপলক্ষ্যও আমার সবসময় থাকে না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই সকাল বিকেল যা অল্প কথা বলি। ক্যাপ্টেনের ঘর শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট। তাঁর ঘরে কেবলমাত্র দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটি ঘরে থাকে না। এয়ারফোর্সে রয়েছে। ঘরে কেবলমাত্র ক্যাপ্টেন বিবেকানন্দ এবং মেয়ে সবিতা। মেয়েটিও বইপত্র, ম্যাগাজিন আর ভায়োলিন নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সবিতা খুব সুন্দর ভায়োলিন বাজায়।

আমার ছেলেমেয়ে আটটি। ছোট একটি ভাতিজাও আমার সঙ্গে থাকে। তাছাড়া হাসপাতালের চৌকিদার এবং তার স্ত্রীও আমাদের ঘরের সঙ্গে থাকে। ফলে আমি যদিও কম কথা বলতে ভালোবাসি। আমার ঘর সব সময়ই হৈচৈ লেগে থাকে।

ভেটেরিনারি হাসপাতালের কম্পাউণ্ডটা বিশাল। রোগ কম। শহরের মাঝখানে গোরু মহিষের হাসপাতাল খুললে রোগ কম হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তাই সারাদিনে তিন চারটি গোরু ছাগল দেখার। বাইরে আমার আর কোন কাজ থাকে না। তাছাড়া জন্তুর চিকিৎসা একতরফা। ডাক্তারের বিচার আর সিদ্ধান্তই শেষ কথা। গোরু-মহিষ প্রতিবাদ করতে পারে না। আর গোরু মহিষের সাধারণতঃ একই ধরনের অসুখ হয়। মানুষের মতো জটিল অসুখ বিসুখ খুব কমই হয়। সেজন্যই আমার অবর্তমানে কিম্ভ অ্যাসিটেন্ট ব্যাধি দেখে ঔষধ দিতে পারে, দেয়ও। আমার মতে ভেটেরেনারি ডাক্তারের কাজটা খারাপ নয়। অবশ্য মানুষের ডাক্তারের মতো এতো পয়সা নেই। কিন্তু কাজটি খুব নির্ঝঞ্ঝাটের।

আমাদের হাসপাতালের পথটির ওপাশেই ক্যাপ্টেন বিবেকের ঘর। বয়সে সে আমার থেকে ছয় সাত বছরের বড়। তার বয়স ষাট বছরের কাছাকাছিই হবে। সবিতা এখন বাইশ বছরের।

দুটি মহাযুদ্ধেই ক্যাপ্টেন সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন। তারপর রেগুলার আর্মিতে কিছুদিন কোন একটি সামরিক কলেজের শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে পেনশন নিয়ে এখানেই ঘরবাড়ি করে বসবাস করছেন।

এখন সৈন্য না হলেও সৈনিকের স্বভাব প্রায় সবগুলিই বজায় রয়েছে। ভোর পাঁচটায় উঠেন, দাড়ি কাটেন, স্নান করেন, অল্প চা পান করেন, তারপর ঠিক ছয়টার সময় সবিতার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে যান। জোর বৃষ্টি না হলে এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না।

মানুষটি প্রায় ছয় ফুট লম্বা স্বাস্থ্যবান এবং সুন্দর। মুখ দেখলে তাঁর বয়স বিশ বছর কম ভাবতে কোন অসুবিধে নেই। সবিতার পাশে তাঁকে বড় ভাই বলে মনে হয়। ক্যাপ্টেনের সোনার ফ্রেমের গাঢ়লা চশমা জোড়া, বাঁ হাতের দামী ঘড়িটা আর সর্বদা ইস্ত্রি করা জামা কাপড় সবসময়ই নতুন বলে মনে হয়। কেবল মাত্র পরিবর্তন দেখা যায় টুপিটার ক্ষেত্রে। তিনি সাধারণতঃ একটা খাকি টুপি পরে থাকেন। কিন্তু কখনও আবহাওয়া পরিষ্কার

থাকলে তিনি টুপি ছাড়াই বেড়াতে যান। অল্প টাক খাওয়া মাথাটি তাঁর শান্ত জীবনযাত্রার পরিচয় দান করে।

তাঁর এই সুশৃঙ্খল, পরিপাটি জীবনের তুলনায় আমার জীবন যথেষ্ট বেসুরো। সকালে উঠে বেড়ানোর অভ্যেস আমার নেই, অবশ্য আমিও তাড়াতাড়ি উঠি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সুশৃঙ্খল করতেই আটটা বেজে যায়। যার পক্ষে একা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাছাড়া আটটা থেকে হাসপাতাল খুলতে হয়। বিকেলেও যখন ক্যাপ্টেন মেয়েকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যায়, তখন আমি বাজার করতে যাই।

যেদিন ক্যাপ্টেন সিনেমায় যান না, সেদিন হয়তো তিনি সবিতার বেহালা শোনেন, নতুবা আমাদের ঘরে আসেন। আমার বড় মেয়ের সঙ্গে সবিতার খুব বন্ধুত্ব। তাই সবিতাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে বিবেক আমার সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠে।

জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ ক্যাপ্টেন বিবেক ঘর থেকে দূরে, বাইরে কাটিয়েছে। সৈনিকের জীবন, তার উপর রেগুলার ইনফেন্ট্রি। যুদ্ধক্ষেত্রে সবসময় প্রথম সারিতে থাকতে হত। জীবনের সঙ্গী বন্দুক আর বুট, ট্রেঞ্চ আর তাঁবু। সেই জীবনের সঙ্গে কম করেও বিশ বছরের সম্পর্ক।

কত দেশ দেখেছেন বিবেক। কত জায়গায় বেড়িয়েছেন। কত ধরনের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। কত অভিজ্ঞতা, কত চেনাজানা আর যদি যে সমস্ত কথা বলার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে ক্যাপ্টেন বিবেক আগ্রহী হয়ে উঠে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

ক্যাপ্টেন লোকটি যেমনটি পরিপাটি কথাবার্তায় তেমনই ধীর এবং সংযত। যুদ্ধক্ষেত্রের অত্যন্ত ভয়াবহ একেকটা পরিস্থিতির অভিজ্ঞতার কথা বলতেও তিনি বিন্দুমাত্র ধৈর্য হারান না। একটুও অতিরঞ্জনের চেষ্টা করেন না। এ জন্যই তাঁর কথাগুলো শুনতে আমার ভাল লাগে। তিনি যেন একজন ইতিহাসবিদ, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন মানুষের জয় মৃত্যুর ইতিহাস,...আর পুরনো দিনের এপিক গায়কের মতো এক দিক থেকে বলে যান কথাগুলি।

যখনই আসেন তখনই তিনি আমাকে তাঁর দৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই বলেন। একদিন তিনি বলছিলেন,—"অন্ধকারের মধ্যে গুলি চালনায় আমার হাতে কত লোক মরেছে তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। কিন্তু চোখের সামনে বন্দুকের গুলিতে আর সঙ্গীন দিয়ে যাদের খুঁচিয়ে মেরেছি তাদের কথা আমার ভালভাবেই মনে রয়েছে।"

"আপনার হাতে আনুমানিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে?

"ঠিক একাশিটি। দুটি মহাযুদ্ধে আমার হাতে মোট ঠিক একাশিটা মানুষ মরেছে, ডায়েরিতে আমি তারিখ এবং জায়গার কথা লিখে রেখেছি।"

"একজন মানুষকে খুন করার সময় খারাপ লাগে না কি?"

"সৈনিক হিসেবে একটুও খারাপ লাগে না, আনন্দই হয়, আর আমার বাঁচার অন্য কোন পথও নেই। আমি না মারলে সে আমাকে গুলি করে মারবে। তাই সে বুদ্ধিমান, সে শত্রু সৈন্য দেখলে এক সেকেণ্ডও দেরি করবে না। প্রথমে যে গুলি করে, সেই রক্ষা পায়।

"নিজের গুলিতে চোখের সামনে একটি মানুষকে ঢলে পড়তে দেখেও খারাপ লাগে না?"

"ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ দেখে না, দেখার সময় থাকে না। এগিয়ে যেতে তো হবেই। একবার জার্মানীর সামনে ছিলাম। হঠাৎ শত্রুরা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। আর উপায় নেই, আমরা অবিরত গুলি চালাতে লাগলাম। শত্রুপক্ষের 'পেট্রোল' দেওয়া সৈন্য সংখ্যায় কম। সকলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। শেষ সৈন্যটি ছিল প্রায় আঠার বছরের এক জার্মান যুবক। পেটে গুলি লাগায় সে চিৎ হয়ে পড়ল। আমি তার সামনে গেলাম।

দেখলাম সে জীবিত রয়েছে। আমি সামনে থাকায় সে বড় করুণভাবে ইংরেজিতে বলল—"Do not kill me. I may Live."

"আপনি তখন কি করলেন?" "আমার বন্দুকের সামনে থাকা বেয়নেটটা তার বুকে জোরে ঢুকিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ ধড়ফড় করে সে মরে গেল। তার চোখ দুটি এখনও আমার মনে পড়ে।

ক্যাপ্টেনের কিন্তু থ্রামবোলিপনা রয়েছে। তিনি কুকুর সহ্য করতে পারেন না। হারমোনিয়মের আওয়াজও তাঁর কাছে অসহ্য; লালরঙের কাপড় দেখলেই তাঁর মাথা গরম হয়ে যায়, বৃষ্টি তাঁর খুব প্রিয়। কিন্তু একনাগাড়ে দুদিন বৃষ্টি হলে তিনি কিছুটা ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন।

কখনও কখনও তিনি আমার ছেলে মেয়েদের নিজের ঘরে ডেকে নেন এবং ঘরের দুপেছন দিকের উঠানে সব কয়টিকে দাঁড় করিয়ে রাখেন। তাদের হাসি পেলেও হাসতে ভয় করে। ক্যাপ্টেন সীরিয়াস।

কখনওবা আমাকে ডেকে পাঠান। তাঁর অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলেন, আর কিছু ফোটো বার করে দেখান, কখনওবা তাঁর ডায়েরি পড়ে শোনান, লোমহর্ষক, রোমাঞ্চকর কাহিনীতে পরিপূর্ণ তাঁর ডায়েরি।

একদিন পড়ছিলেন—"বড় গরম, আমরা এগোতে পারছিলাম না। সামনেই বিরাট পর্বত। হঠাৎ একটা গোলা ফাটল, আমার মুখের সামনে দিয়েই সোঁ সোঁ করে উড়ে গেল। ভয়ে শিউরে উঠলাম না। দেখলাম পর্বতের গুহায় একদল সশস্ত্র গরিলা। আমরা বারজন ছিলাম। তিনজন মারা গেল। বাকি কয়জনকে বন্দী করে নিয়ে গেল।"

তখন মধ্যরাত্রি, আমাদের নিয়ে একটি দুর্গে প্রবেশ ক'রল, একটি পুরনো দুর্গ। ভেতরে একঘর মানুষ ছিল। আমাকে আর হরিসিংকে একটি ছোট ঘরে বন্ধ করে রাখল। মনে হয় তাদের জেলখানা অল্প দূরে ছিল।

"ভোরবেলা একজন যুবতী মেয়ে আমাদের দুঠরির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ডাকলাম। সে তাকাল, আমি বললাম, 'আমার খুব পিপাসা পেয়েছে।' মেয়েটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে গিয়ে জগে করে এক জগ জল নিয়ে এল। জগটি বেশ বড়। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে ঢোকে না। আমি তাকে দরজা খুলে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। দরজার বাইরে থেকে বল্টু লাগান রয়েছে। মেয়েটি কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর দরজাটি খুলে দিল। আমি বেরিয়ে এলাম, তার হাত থেকে জগটি নিয়ে জল খেলাম।

আরও একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্যাপ্টেন পড়ে গেল—"তারপর জগটা ফিরিয়ে দিয়েই, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির গলা টিপে ধরলাম। মেয়েটি শব্দ করতে পারল না। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে মরে গেল। আমি পালালাম। হরিসিংয়ের কথা জানি না।"

ক্যাপ্টেনকে নির্বিকারভাবে পড়ে যেতে দেখে আমার শরীরের লোমগুলি শিউরে উঠল।

আপনাকে জল দিয়েছে যে মেয়েটি তাকে কেন মেরে ফেললে?"

"না হলে এখানে বসে আজকে আপনাকে আমার ডায়েরি পড়ে শোনাতে পারতাম না। যুদ্ধ বন্দীর একমাত্র কর্তব্য যে কোন উপায়ে পলায়ন।

আমাদের দিনগুলি ভালভাবেই কেটে যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন থাকে তাঁর বিচিত্র অতীত নিয়ে। আমি থাকি অজ্ঞাত ভরা বর্তমান নিয়ে। ক্যাপ্টেন লোকটিকে আমার বেশ ভাল লাগে।

একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—'আপনি অনেক দেশ দেখেছেন, অনেক মৃত্যুও দেখেছেন, কোন ধরনের মৃত্যুকে আপনি বেশি ভয়াবহ বলে মনে করেন?"

একই রকম সরল গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি বললেন—'আমার দেখা প্রতিটি মৃত্যুই এক ধরনের, মৃত্যু অন্যের

মতোই একটা মর্ম্যাল বায়োলজিক্যাল অ্যাক্সেডার। তাতে বিন্দুমাত্র বৈচিত্র নেই। তবুও ঘরে বসে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াটাকেই আমি সবচেয়ে ভয়াবহ বলে মনে করি।

তাঁর কথা শুনে আমি বেশ বিস্মিত হলাম। প্রতিটি মানুষই পরিবার পরিজনের মাঝখানে শান্তিতে মরতে চায়। ক্যাপ্টেন বলেন—সে মৃত্যুই ভয়াবহ। আমি চুপচাপ থাকব ভেবেও জিজ্ঞেস করলাম—"আপনি কেন এভাবে ভাবেন?'

ক্যাপ্টেটন আরও সীরিয়স হয়ে বললেন—একদল ছেলেমেয়ে চারদিক থেকে ঘিরে থাকলে, মানুষের স্বাভাবিক যে দুর্বলতা, তার জন্য মৃত্যুর সময় দুঃখ হাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে সেখানে মৃত্যু হলে খারাপ লাগে না। You simply die. Nothing more.

সেপ্টেম্বর মাসে বিবেক আর সবিতা দুজনেই ছেলের জন্য সিমলা গিয়েছিল। প্রতি বছরেই যায়। মধ্যে মধ্যে কখনও কখনও তাঁর কথা মনে পড়ে। ইতিমধ্যে আমি আমার বড় মেয়ের বিয়ের প্রস্তুতিতে জড়িয়ে পড়লাম। আমার ছেলেমেয়েগুলি কিন্তু সবিতা এবং তার বাবার কথা প্রায়ই আলোচনা করে।

বড়দিনের সময়টা বোম্বাই কাটিয়ে ক্যাপ্টেন ঘুরে এল। আমাদের হাসপাতালের চৌকিদারের ঘরে একটি কুকুরের জন্ম হয়েছিল। মোটা মোটা বেশ কয়েকটি বাচ্চা। একদিন আমাদের বারান্দায় বসে থাকার সময় হঠাৎ ক্যাপ্টেন বিবেক 'কুকুরের বাচ্চাগুলিকে দেখতে পেল।

বলা যায় না তাঁর মনে কি ভাবনার উদয় হ'ল। চৌকিদারকে একটা রূপার টাকা দিয়ে তিনি কুকুরের বাচ্চাগুলিকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। চৌকিদার নিজে বাড়িতে দিয়ে আসবে বলেছিল; কিন্তু তার জন্য অপেক্ষায় না থেকে তিনি নিজেই নিয়ে গেলেন। আমরা বিস্মিত হলাম!

তারপর থেকে দশদিন পর্য্যন্ত ক্যাপ্টেন বিবেকের আর কোন কাজ নেই। কুকুরের বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায়, স্নান করায়, বেড়াতে নিয়ে যায়, ঘুম পাড়ায় আবার জাগিয়ে দেয়।

একদিন সবিতা এসেছিল, সবিতাই বলল,—বাবা এই কয়দিন। কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এত ব্যস্ত, আমার খবর রাখাই ছেড়ে দিয়েছে। "আমরা হাসলাম, বৃদ্ধ হলে মানুষ শিশুর মতো হয়ে যায়।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়। বাইরে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারটা বাজে। আমরা নটার সময় শুয়েছি—তখনও ঘুম আসেনি, হঠাৎ দরজার সামনে থেকে ক্যাপ্টেনের ডাক শোনা গেল,—"ডাক্তার।"

আমি এক ডাকেই উঠে এলাম। বসার ঘরের দরজা খুলে বললাম,—আসুন।"

গম্ভীরভাবে ক্যাপ্টেন ঘরের ভেতর এল, তাঁর পরিধানে বিকেলের পোষাক, ছাড়েননি। আমি একটু উদ্বিগ্ন হলাম। ধীরভাবে তিনি বললেন—পোষাক পরুনতো, আমার সঙ্গে একটু আসুন।" আমি 'আলস্টার'টা পরে তাঁর সঙ্গে চললাম। ভয় হলো। কি জানি সবিতার কি হয়েছে। কিন্তু আমি গোরু মহিষের ডাক্তার, মানুষের নয়।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পেছনে গিয়ে পৌছলাম। তিনি তাঁর শোবার ঘরের সামনের ছোট কুঠরিটা খুলে দিয়ে সুইচ টিপে লাইট জ্বালালেন। আমি দেখলাম—পরিষ্কার একটা মাদুরের উপর কুকুরের বাচ্চাগুলি। লাইট জ্বলতে দেখে কুকুরের বাচ্চাছুটি চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকাল। একটি বাচ্চা উঠে বসল। অপরটি শুয়েই থাকল।

ক্যাপ্টেন শুয়ে থাকা কুকুরটা দেখিয়ে আমাকে বলল—এর কিছু একটা হয়েছে। আজ সকাল থেকে কিছুই খায়নি। দেখুন তো এর কি হয়েছে?"

আমি মোটামুটি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কুকুরের বাচ্চাটির জন্যই কি আমাকে রাত বারোটার সময় ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসছে?

আমি উল্টে পাল্টে কুকুরের বাচ্চাটিকে দেখলাম। বিশেষ করে গতরাতে তীব্র ঠাণ্ডা পড়ায় আহা! কাবু হয়ে পড়েছে।

আমি বললাম— "হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে এটার জ্বর হয়েছে।"

কিন্তু আমিতো ওর গায়ে গরম কাপড় দিয়েছিলাম?"

"বাচ্চাটা ছোট। এসময় ওর মায়ের শরীরের উত্তাপ ওর পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়।"

"এখন তাহলে আপনি কি করতে চান?" ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল।"

"আমি একটা ঔষধ দিচ্ছি। সঙ্গে একটু সেঁক দিতে পারলে ভাল হয়।"

"তাহলে আসুন। আপনি ঔষধটা দিন, দেরি করবেন না। আমি আগুনের তাপে সেক দিচ্ছি।"

আমি একটা ঔষধ দিয়ে পাঠালাম। তাঁর নির্দেশানুসারেই আমি আর গেলাম না। শুয়ে রইলাম।

পরদিন সকালবেলা হাসপাতালে যাবার সময় হঠাৎ আমার কুকুরের কথাটা মনে পড়ল। আমি তাঁর ঘরে গেলাম।

কুকুরের বাচ্চাটা শেষ রাতের দিকে মারা গেছে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের অবস্থা তখন ভয়াবহ। তিনি সারা রাত আগুনের কাছে বসে কুকুরটাকে সেক দিয়েছেন। সারারাত বিছানায় যাননি। ঠাণ্ডায় তাঁর মুখ রুক্ষ হয়ে উঠেছে। চায়ের টেবিলে বসে অন্য দিনের মতো সবিতাই কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। মৃত কুকুরের বাচ্চাটা সামনে নিয়ে তিনি ছোট্ট শিশুর মতো বিমর্ষ হয়ে বসে রয়েছেন।

আমি একটু সমবেদনা জানালাম। তিনি বসা অবস্থাতেই চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম তিনি কাঁদছেন। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

"আপনি মন খারাপ করবেন না। ছোট বাচ্চা মরেই।"—আমি বললাম। ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'ডাক্তার আমি বহু মৃত্যু দেখেছি। কিন্তু মৃত্যু যে কি তা বোঝার কোনদিন অবসর পাইনি। ইস মৃত্যু কি করুণ, কি দুঃখময়! কুকুরের বাচ্চাটি যে কি আশায় আর কি করুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল! মৃত্যুর সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে আমি এই প্রথম মুখোমুখি হলাম। যতদিন পর্যন্ত নিজের প্রিয়জনের মৃত্যু না হয় ততদিন পর্যন্ত মৃত্যু যে কি তা আমরা বুঝতেই পারি না। আমি যে ওটাকে কি ভাল বাসতাম ডাক্তার।"

তাকিয়ে দেখি, ক্যাপ্টেনের চোখে জল। আমি বেশ অপ্রস্তুত। হাসপাতালে এসে পিয়নকে দিয়ে, কুকুরের বাচ্চাটাকে আনালাম। সঙ্গে ক্যাপ্টেনও এল। তিনি আমার ড্রইংরুমে, বসলেন।

আমি কথা খুঁজে পেলাম না।

ক্যাপ্টেন বিবেক বললেন—ডাক্তার, মৃত্যুর সময় কুকুরের বাচ্চার চোখ দুটি মর্মান্তিকভাবে ট্রাজিক হয়ে উঠেছিল। ওর চোখদুটি আর সেই যুদ্ধে বেয়নেটে আমার খুঁচিয়ে মারা জার্মান যুবকের চোখ দুটি একেবারে এক, আশ্চর্য মিল।...

পরে সবিতা এসে বলেছিল সেই কুকুরের বাচ্চাটির মৃত্যুশোকে ক্যাপ্টেন তিনদিন অন্নজল পান করেনি।

আমি বুঝতে পারছিলাম না দুশো একান্ন জন মানুষের হত্যাকারী ক্যাপ্টেন বিবেকের হৃদয়ে একটি কুকুরের বাচ্চার মৃত্যু এতটা প্রতিক্রিয়া কিভাবে সৃষ্টি করল।

হয়তো এরই নাম মমতা। □

পেয়ারার গন্ধ

অনুবাদ : গৌতম সেনগুপ্ত

কথোপকথন : গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ও প্লিনিও আপুলিও মেন্দোজা

১

লেখার কায়দাকানুন

আমি লিখতে শুরু করেছিলাম হঠাৎ করেই, খুব সম্ভবত আমার এক বন্ধুকে শুধু এটুকু প্রমাণ দিতে যে আমাদের প্রজন্ম লেখক পয়দা করতে পারে। তারপর লেখার মজার পাঁচে আমি পড়ে গেলাম। তারপর পড়লাম এর পরের ফাঁদে। যেখানে এসে আমি আবিষ্কার করলাম পৃথিবীতে লেখার চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছুই নয়।

—তুমি বলছ লেখা আনন্দের ব্যাপারে। একটুসঙ্গে এও বলেছ লেখা শুধুই যন্ত্রণার। এর মধ্যে কোন্‌টা সত্যি?

—দুটোই। একদম শুরুতে যখন আমি লেখার কায়দাগুলো শিখছিলাম তখন লিখতাম ফুর্তিতে, দায়িত্ব-জ্ঞানহীনভাবে। আমার মনে পড়ে ঐ সময় আমি খবরের কাজ শেষ করে রাত দুটো তিনটে অবধি লিখতাম। অনায়াসে চার পাঁচ এমন কী দশ পাতাও লিখেছি। একবার তো এক সিটিংএ একটা গোটা ছোটো গল্পই লিখে ফেলেছিলাম।

—আর এখন?

—এখন সারাদিনে একটা ঝরঝরে প্যারাগ্রাফ লিখতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হয়। আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখালেখির কাজটা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

—কেন? বরঞ্চ তোমার তো এরকমই ভাবা উচিত যে তোমার দক্ষতা যতই বাড়বে লেখার কাজটাও ততই সোজা হয়ে যাবে।

—আসলে কী হয় জানো দায়িত্বের বোধটা বেড়ে যায়। তুমি আস্তে আস্তে অনুভব করতে শুরু করো তোমার লেখার প্রতিটা শব্দই আগের চেয়ে বেশি ভারী হয়ে উঠছে। সেগুলি অনেক বেশি লোককে ভাবাচ্ছে।

—এটা সম্ভবত খ্যাতির অন্যতম একটা বিড়ম্বনা। তোমার বিরক্ত লাগে না?

—চিন্তিত হয়। যে মহাদেশ লেখকদের সাফল্যের জন্য তৈরি নয় সেখানে এমন একজন লোক যে লেখার বাজারেই নেই তার বই যদি মুড়ি মুড়কির মতো বিক্রি হওয়া শুরু হয় তাহলে সে বেচারা খুবই ফাঁপরে পড়ে যায়। তাছাড়া হাট বাজারের জিনিস হয়ে ওঠা আমার কোনোকালেই খুব একটা পছন্দ নয়। টিভি, সম্মেলন, অধিবেশন, সেমিনার এসব আমার খুবই খারাপ লাগে।

—সাক্ষাৎকার?

—হ্যাঁ সেগুলিও পরনির্ভরশীল কোনো সাফল্যই আমি চাই না। এটা হল অনেকটা সেই পর্বত আরোহির মতো যে চূড়োয় ওঠার জন্য জীবনযাপন করেছে। সেখানে পৌঁছে সে কী করে? সে নামতে থাকে বা নামার চেষ্টা

করতে থাকে যতটা সম্ভব মর্যাদা বজায় রেখে।

—যখন তোমার বয়স কম ছিল, অল্প জীবিকা ছিল তখন তুমি রাত্তিরে লিখতে আর প্রচুর সিগারেট খেতে।

—দিনে চল্লিশটা।

—আর এখন?

—এখন একেবারেই সিগারেট খাই না। কাজ করি দিনে।

—সকালবেলা।

—সকাল নটা থেকে দুপুর তিনটে, একটা ঠাণ্ডা ঈষদুষ্ণ ঘরে।

—অন্য লেখকদের মতোই একটা সাদা পাতা কী কোনোভাবে তোমার অস্বস্তি ঘটায়?

—হ্যাঁ। দমবন্ধ হয়ে যাবার আতঙ্কের কথা বাদ দিলে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে অস্বস্তির বিষয়। কিন্তু হেমিংওয়ের মতটা জানার পর থেকে এ ব্যাপারে ঝামেলাটা আমি অনেকটা কেটে ফেলতে পেরেছি। উনি বলেছিলেন পরেরদিনটায় তুমি ঠিক কিভাবে লিখবে সেটা জানার পরেই তুমি আজকের লেখা থামাবে।

—একটা লেখার কাছে তুমি কীভাবে চল চলে আসো?

—একটা দৃশ্যের কল্পনায়। আমার মনে হয় অন্য লেখকদের কাছে তৈরি হয় একটা আইডিয়া থেকে, ধারণা থেকে, আমি সবসময়ই শুরু করি একটা দৃশ্য দিয়ে। 'মঙ্গলবারের দিবানিদ্রা' বলে যে গল্পটাকে আমি আমার সেরা গল্প বলে বিবেচনা করি, সেটা শুরু হয়েছিল এক মহিলা ও একটি কিশোরীকে দেখে। তারা ঠাঁ ঠাঁ দুপুরে খালি শহরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল কালো জামা কাপড় পরে, কালো রং-এর ছাতা মাথায়। ক্যাক্টো পাতা'র এক বুড়ো তার নাতিকে নিয়ে শবযাত্রায় যাচ্ছে। 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না,' লেখাটা মাথায় এসেছিল একটা লোককে দেখে। সে বারানকুইলার বাজারে দুপুরের খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে অপেক্ষা করছিল একটা চাপা উদ্বেগ নিয়ে। এরও বেশ কয়েকবছর পর আমি নিজেকেও ঐভাবে অপেক্ষা করতে দেখলাম প্যারিসে একটা চিঠির জন্য সম্ভবত একটা মানি অর্ডারের জন্য—ঐ একই রকম উদ্বেগ নিয়ে তারপর সেই লোকটির স্মৃতির সঙ্গে এই ব্যাপারটা আমার কাছে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

—একশো বছরের নিঃসঙ্গতার ক্ষেত্রে কোনো দৃশ্য ব্যবহার করেছিলে?

—একজন বুড়ো লোক একটা বাচ্চা ছেলেকে বরফ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। বরফটা তখন সেখানে সার্কাসের মতো করেই দেখানো হচ্ছিল।

—সেই বৃদ্ধ কি তোমার দাদু, কর্নেল মার্কেস?

—হ্যাঁ।

—এটা কি সত্যিই ঘটেছিল?

—না ঠিক ওভাবে নয় তবে ওটার প্রেরণা ছিল একটা বাস্তব ঘটনা। আমার মনে আছে ছেলেবেলায় আরকাটাকায় দাদু আমায় সার্কাসে নিয়ে গিয়েছিলেন। একটা একহুঁ জওলা উট দেখাতে। আরেকবার আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি কোনো বরফের প্রদর্শনী দেখিনি। তখন তিনি আমায় একটা কলার কোম্পানীর বসতিতে নিয়ে গিয়ে তাদের বলে একটা বরফে ঢাকা মাছের ঝুড়ির ঢাকনা খুলিয়ে তার ভেতর আমার হাতটা ভরে দিয়েছিলেন। পুরো একশো বছরের নিঃসঙ্গতা লেখাটা শুরু হয়েছিল শুধু ঐ একটা দৃশ্য থেকে।

—তাহলে দুটো স্মৃতি একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে তুমি তোমার বই-এর প্রথম লাইনটা পেয়েছিলে। ব্যাপারটা ঠিক কেমন দাঁড়িয়েছিল?

—'অনেক বছর পর যখন সে কায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি হয়েছিল, কর্নেল অরিলিএনো বুয়েনদিয়ার মনে পড়েছিল সেই দূরের বিকেলের কথা যখন তার বাবা তাকে নিয়ে গেছিলেন বরফ আবিষ্কার করতে।'

—তুমি সাধারণত বই-এর প্রথম বাক্যকে প্রচুর গুরুত্ব দাও। একবার তুমি আমায় বলেছিলে, একেক সময় তোমার প্রথম বাক্যটা লিখতে যতটা সময় লাগে বাকি পুরো বইটা লিখতেও অত সময় লাগে না। কেন?

—কারণ প্রথম বাক্যটা সেই পরীক্ষাগার হতে পারে যাতে তুমি তোমার লেখার স্টাইল, গঠন এমনকী ধৈর্যও মেপে নিতে পারো।

—একটা উপন্যাস লিখতে কি তোমার অনেক সময় লাগে?

—না লিখতে খুব একটা সময় লাগে না। বরঞ্চ বলা যায় আমি বেশ তাড়াতাড়িই লিখি। একশো বছরের নিঃসঙ্গতা লিখেছিলাম দু'বছরের কম সময়ে। কিন্তু এ বইটা লিখতে টাইপ রাইটারের সামনে বসার আগে আমি পনেরো ষোল বছর ধরে ভেবেছিলাম।

—কুলপতির শরৎ তৈরি হতে অনেক সময় লেগেছিল। একটি মৃত্যুর পূর্বাভাসের কিসসা লেখার আগে তুমি কতদিন অপেক্ষা করেছিলে?

—তিরিশ বছর।

—কেন এতদিন?

—১৯৫১ সালে যখন ঘটনাটা ঘটে তখন আমি এটার সম্পর্কে উৎসাহী হয়েছিলাম কোনো উপন্যাসের হিসেবে নয়, খবরের কাগজের রিপোর্টের একটা বিষয় হিসেবে। কিন্তু সে সময় কলম্বিয়ায় ঐ ধরনের রিপোর্টের জন্য মানুষ খুব একটা তৈরি ছিল না। আমি তখন মফস্বলের একটা কাগজের অস্থায়ী সাংবাদিক ছিলাম। তাদের তো এ ব্যাপারটা মাথা ঘামানোর কোনো কথাও নয়। এটাকে সাহিত্যের জন্য আমি ভাবতে শুরু করি বেশ কয়েকবছর পর। কিন্তু এই চিন্তাটা সব সময়ই আমার মাথায় ছিল। মা তার বন্ধু আর আত্মীয়স্বজনদের ছেলের লেখা বইতে দেখলে কতটা মর্মাহত হবেন। তবে আসল সত্যিটা হল এই যে গল্পটাই আমাকে ঠিকভাবে আঁকড়ে ধরতে পারছিল না। গল্পটা বেশ কয়েকবছর ধরে চিবোনোর পর আমি এর মূল খাদটা ধরতে পারলাম—দুজন খুনির কেউই আসলে খুনটা করতে চায়নি বরং কেউ সেটাকে আটকাক তার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা করে শেষমেষ ব্যর্থ হয়েছিল। এটাই হল নাটকের একমাত্র উপাদান, বাকিটা তো লাতিন আমেরিকায় যখন তখন হতে পারে। বাস্তবে ঘটনাটা শেষ হয়েছিল অপরাধের পঁচিশ বছর পর, যখন স্বামী তার পরিত্যক্ত স্ত্রীর কাছে ফিরে এসেছিল। কিন্তু এটা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল যে বইটাকে শেষ হতে হবে অপরাধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্যে। এর উপায় হিসেবে আমি একজন কথক তৈরি করেছিলাম যে এই উপন্যাসের সমস্যাগুলি গঠনের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারবে: ফলে এই প্রথমবার আমি উত্তমপুরুষে লিখেছিলাম। এসবের তিরিশ বছরের আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম, আমরা ঔপন্যাসিকরা যেটা প্রায়ই ভুলে যেতে চাই—সবসময়ই সেরা সাহিত্যের কর্মূলা হল সত্য।

—হেমিংওয়ে বলতেন কোনো ঘটনার ঠিক পরে বা খুব পরে লেখা উচিত নয়। তা একটা গল্প এতদিন ধরে না লিখে মাথার মধ্যে রাখতে তোমার কোনো অসুবিধা হয়নি?

—আমি কখনোই এমন কোনো আইডিয়া সম্পর্কে উৎসাহী হইনি যার বহুবছরের তাড়িলা সহ্য করার ক্ষমতা

নেই। যদি সেটা একশো বছরের নিঃসঙ্গতা-র মতো পনেরো বছরের, কুলপতির শরতের মতো সতেরো বছরের বা একটি মৃত্যুর পূর্বাভাসের কিসলার মতো তিরিশ বছরের চাপ সহ্য করতে পারে তারপর তো সেগুলিকে লিখে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকে না।

—তুমি নোট নাও?

—কখনো নয়, এক শুধু খুব টুকটাক খুচরো কিছু ছাড়া। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যখনই তুমি নোট নেয়া শুরু কর তখন তুমি কী নোট করবে শুধু সেই নিয়েই ভাবো। লেখাটা নিয়ে আর ভাবে না।

—তুমি কি লেখা অনেকবার বদলাও?

—আমার লেখার ধরন অনেক বদলেছে। যখন বয়স কম ছিল তখন আমি সোজাসুজি লিখতাম। ফের সেটাকে কপি করতাম। তারপর বারবার সেটাকে লিখতাম। এখন আমি লাইন ধরে ধরে ঠিক করি। যাতে করে দিনের শেষে সরাসরি ছাপাখানায় যাবার জন্য একটা কাটাকুটি ছাড়া সাফসুতরো পাকা তৈরি হতে পারে।

—তুমি কি অনেক পাতা ছিঁড়ে ফেলো?

—অবিশ্বাস্য পরিমাণে। যখন আমি একটা পাতা টাইপ করতে শুরু করি।

—তুমি সবসময়ই টাইপরাইটারে লেখো?

—হ্যাঁ সবসময়। একটা ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে। যখন আমার কোনো ভুল হয়, লেখার কোনো শব্দ অপছন্দ হয় বা যখন টাইপ-এর কোনো ভুল হয় তখন আমি সে পাতাটাকে ছিঁড়ে ফেলে ফের অন্য একটা পাতায় লেখা শুরু করি। এটাকে তুমি আমার দোষ, বাতিক বা খুঁতখুঁতানি যা খুশি বলতে পারো। একটা বারো পাতার গল্প লিখতে আমি পাঁচশো পাতাও নষ্ট করতে পারি। শিল্প সাহিত্যের ভুলের সঙ্গে টাইপের ভুলকে গুলিয়ে ফেলার পাগলামির হাত থেকে আমি বেরোতে পারিনি।

—অনেক লেখক তো ইলেকট্রিক টাইপরাইটার সহ্যই করতে পারে না। তুমি?

—আমি ইলেকট্রিক টাইপরাইটারের ব্যাপারে এতই একচোখো যে এখন এছাড়া অন্য কিছু দিয়ে লেখার কথা ভাবতেই পারিনা। সাধারণভাবে আমি বিশ্বাস করি তুমি তখনই ভালো লিখতে পারবে যখন সবরকম সুবিধা তোমার চারপাশে থাকবে। আমি কোনোদিনই ঐ ধরনের কোনো রোমান্টিক উপকথায় বিশ্বাস করিনা, লেখককে সবসময়ই উপোস করতে হবে আর কিছু লেখার আগে তাকে একেবারে নিজেকে ফুরে খেতে হবে। তুমি যদি ভালো খেতে পাও আর তোমার যদি একটা ইলেকট্রিক টাইপরাইটার থাকে তাহলে তুমি অনেক ভালো লিখবে।

—তোমার সাক্ষাৎকারগুলিতে যে বই লিখছ সে সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলো না কেন?

—কেননা সেগুলি আমার ব্যক্তিগত জীবনের অংশ বলে। আর সত্যি বলতে কী যেসব লেখকরা সাক্ষাৎকারে তাদের না লেখা বই-এর প্লট নিয়ে আলোচনা করে তাদের সম্পর্কে আমার করুণাই হয়। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে সমস্যাটা তারা উপন্যাসে সমাধান করতে না পেরে প্রেসের সামনে বলে একধরনের সান্ত্বনা পাচ্ছে।

—যে বই লিখছ তা নিয়ে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে অনেককথা বলো।

—হ্যাঁ, তাদের আমি একেবারে এই চক্করের মধ্যেই ফেলে দিই। আমি যখন কিছু লিখি সে সম্পর্কে প্রচুর কথা বলি। আসলে এটা একটা পদ্ধতি, এভাবেই আমি বুঝতে পারি ঠিক কোন্ জায়গায় শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি আর কোথায় চোরাবালিতে। সম্পূর্ণ না বোঝা কোনো কিছুকে বোঝার এটাই আমার ধরন।

—তুমি অনেক কথা বললেও যা লিখছ সেটা কখনোই পড়াও না।

—না কখনোই নয়। এটা আমার একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করি লেখকরা সবসময়ই একলা, যাকে ইংরিজিতে বলা জাহাজের নাবিকের মতো। এটা হল পৃথিবীর নিঃসঙ্গতম পেশা। তুমি যা লিখছ তাতে আর কেউই তোমার সাহায্য করতে পারে না।

—তোমার মতে লেখার জন্য আদর্শ জায়গা কোন্‌টা?

—এর উত্তর আমি এর আগেও বহুবার দিয়েছি। সকালে জনশূন্য দ্বীপ রাতে বড়ো শহর। সকালে আমার নীরবতার প্রয়োজন। সন্ধেবেলা দামাস্ক পানীয় সহযোগে আড্ডা দেবার মতো বন্ধুবান্ধব। আমি সবসময়ই রাস্তায় লোকেদের সঙ্গে থাকতে চাই, জানতে চাই চারপাশে কী ঘটছে। উইলিয়াম ফকনার যখন বলেছিলেন বেস্তাবাড়িই হল লেখকের আদর্শ জায়গা তখন তিনি এটাই বলতে চেয়েছিলেন, কারণ সেখানে সকালে যেমনই শান্ত প্রতি রাতে তেমনই হুল্লোড়।

—শিক্ষানবিশি পর্বে কে তোমায় সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন।

—প্রথমত এবং প্রধানত আমার ঠাকুমা। তিনি একেবারে না কাঁপিয়েই এমন সব ভয়ংকর ঘটনার গল্প বলতেন যেন তিনি এক্ষুনি সেগুলি দেখে এলেন। আমি পরে বুঝেছি এই অবিচলিত ভঙ্গি আর উপমার ঐশ্বর্যই তার এই গল্পগুলিকে এতদূর বিশ্বাস্য করে তুলেছিল। একুশ বছরের নিঃসঙ্গতা আমি লিখেছিলাম আমার ঠাকুমার পদ্ধতিতে।

—তুমি কি তোমার ঠাকুমার মধ্যে দিয়েই নিজেকে লেখক হিসেবে দেখতে পেয়েছিলে?

—না কাফকার মধ্যে দিয়ে। উনি আমার ঠাকুমার কথাগুলিই জার্মান ভাষায় বলেছিলেন। যখন রূপান্তর গল্পটা পড়ি তখন আমার সতেরো বছর বয়েস, ঐ সময়ই আমি বুঝেছিলাম যে আমিও একজন লেখক হতে পারি। যখন দেখেছিলাম গ্রেগর সামসা ভোরে উঠে একটা বড় পোকা হয়ে গেছে তখন আমি নিজেকে বলেছিলাম, আমি জানি না তুমি এটা পারবে কিনা, যদি পারো তবে তুমি নিশ্চিতভাবেই একজন লেখক হতে চাও।'

—এটা তোমার এমন ভাবে টানল কেন? যা চাও তা তৈরির স্বাধীনতার জন্যই কি?

—হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম লেকেওারি স্কুলের পাঠ্যবইগুলিতে যেসব যুক্তিপূর্ণ ও চূড়ান্ত পণ্ডিতি উদাহরণ আমি পড়েছি তার বাইরে সাহিত্যে অজস্র সম্ভাবনা খোলা রয়েছে। আমার কাছে ওটা ছিল একেবারেই সতীচ্ছদ ছেঁড়ার মতো ব্যাপার। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝেছি যে তুমি যা খুশি তাই কল্পনা বা তৈরি করতে পারো না কারণ তাতে মিথ্যে বলার একটা ঝুঁকি থেকে যায়। সাহিত্যে মিথ্যে জীবনের চেয়েও মারাত্মক। এমনকী আপাতভাবে খেয়াল খুশির লেখার পিছনেও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম কাজ করে। কেবলমাত্র তখনই তুমি অনায়াসে যুক্তি শৃঙ্খলার অবশেষটুকুও ফেড়ে ফেলতে পারো যদি উল্টো দিকের কোনো হট্টরোল বা পাকচক্রের কোনো গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে না যাও।

—মানে যা খুশি তাই ভাবার এক খেলায়?

—হ্যাঁ তাতেই।

—তুমি আজগুবি লেখা অপছন্দ কর কেন?

—কারণ আমি বিশ্বাস করি যে সমস্ত কল্পনাই আসলে সত্য প্রকাশের মাধ্যম আর সৃষ্টির মূলে শেষ পর্যন্ত বাস্তবই থাকে। আজগুবি লেখা একেবারে বিশুদ্ধ অর্থে এস্কাপ্ট ডিজনির ভঙ্গে, যে ফ্যান্টাসির কোনো বাস্তব ভিত্তিই নেই তা আমার সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়। আমার মনে পড়ছে একবার আমি ছোটোদের জন্য একটা গল্প লিখতে

চেয়েছিলাম তখন তোমার হারানো সময়ের সমুদ্রের খসড়াটা পাঠিয়েছিলাম। তুমি যেমন স্পষ্ট কথার মানুষ সেভাবেই জানিয়েছিলে যে ওটা তোমার ভালো লাগেনি। তুমি ভেবেছিলে সমস্যাটা ছিল এই যে তুমি আজগুবি গল্প ভালোবাসো না। শিশুরাও আজগুবি গল্প পছন্দ করে না একথাটা আমায় একেবারে ধরিয়ে দিয়েছিল। কারণ শিশুরা যা পছন্দ করে তা হল কল্পনা। এ দুয়ের কারাক ওতটাই একজন মানুষের সঙ্গে একটা কথা বলা পুতুলের তফাৎ যতটা।

—কাফকা ছাড়া অন্য কোনো লেখক কী তোমার শৈলী তৈরি করতে ও কাজের টুকতাকগুলি শিখতে সাহায্য করেছিলেন?

—হেমিংওয়ে।

—যাকে তুমি একজন বড়ো ঔপন্যাসিক বলে মনে করো না।

—তাকে আমি একজন বড়ো ঔপন্যাসিক বলে মনে করি না ঠিকই কিন্তু একজন অসামান্য ছোটো গল্প লেখক বলে মনে করি। তিনি বলতেন ছোটো গল্প হল হিমশৈলের মতো, তার অদৃশ্য অংশের ওপরেই সে দাঁড়িয়ে থাকে—সমস্ত চিন্তা, পর্যবেক্ষণ, সংগৃহীত তথ্য যা সরাসরি গল্পে ব্যবহৃত হল না। হ্যাঁ হেমিংওয়ে সত্যিই আমাদের অনেক শিখিয়েছেন। এমনকী একটা বিড়াল কীভাবে পাক খায়ে সেটাও।

—গ্রীণও তোমায় বহু কিছু শিখিয়েছেন। তা নিয়ে আমরা আগে একবার কথাও বলেছি।

—হ্যাঁ গ্রাহাম গ্রীণ আমায় নিরুদ্যম অঞ্চলকে আরো ভালোভাবে বুঝতে শিখিয়েছেন। খুব চেনা পরিবেশের ভেতর থেকে বাস্তবিক সময়ের মূল উপাদানগুলিকে ছেঁকে নিতে তিনিই শিখিয়েছেন। তুমি তো জানো যে সে কাজটা করা খুব কঠিন। কারণ ব্যাপারটা এতই জানা যে কোথা থেকে শুরু করতে হবে সেটাই ধরা যায় না অথচ তোমার এত বলার আছে যে যখন শেষ হয় দেখা যায় কিছুই বোঝা গেল না। নিরুদ্যম অঞ্চল নিয়ে এটাই আমার সমস্যা ছিল। আমি ক্রিস্টোফার কনরাস, সিগাকেস্তা বা ইভিসের অন্যান্য কাহিনীকারদের লেখা খুব মন দিয়েই পড়েছি এবং তাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির তারিফও করেছি। একইসঙ্গে সলগেরি, কনরাড ও বিশ শতকের লাতিন আমেরিকান ইপিকালিস্টদের লেখাও পড়েছি যারা সমস্ত কিছুকে দেখেছে একটা আধুনিক চশমার মধ্যে দিয়ে। আরো অনেকের লেখাই পড়েছি কিন্তু তাদের বক্তব্য ও বাস্তবের মধ্যে বিরাট ফারাকটা সবসময়ই নজরে পড়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই কর্ণ তৈরির ফাঁদে পড়ে গেছে, এর মজার দিক হল কর্ণ যত লম্বা হয়েছে তাদের দৃষ্টিও ততই সীমিত হয়েছে। বাকি অনেকেই চাপা পড়ে গেছে অলঙ্কারের আধিক্যে। গ্রাহাম গ্রীণ এই সাহিত্যিক সমস্যাটাকে সমাধান করেছেন নিখুঁতভাবে—কয়েকটা অদম্য সূত্রকে তিনি জুড়েছেন আভ্যন্তরীণ ঐক্যের ভিত্তিতে। যা একইসঙ্গে সূক্ষ্ম ও বাস্তব। এই পদ্ধতিতে তুমি নিরুদ্যম অঞ্চলের সব রহস্যকেই ছোটো করে পচা পেয়ারার গন্ধে পরিণত করতে পারো।

—আর অন্য কারো থেকে কিছু শিখেছো?

—প্রায় বছর পঁচিশ আগে কারাবাসে রয়ান বস বলে ডোমিনিকের একজন লেখকের কিছু কথা শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন লেখার কায়দা তোমায় শিখতেই হবে—কৌশল, তৈরি করার কায়দা, লুকোনো নিখুঁত জোড়গুলি—যখন তোমার বয়স কম থাকবে। আমরা লেখকরা হলাম টিয়াপাখির মতো, বয়স বাড়লে আর কথা বলা শিখতে পারি না।

—সাংবাদিকতা কি কোনোভাবে তোমার এই লেখালেখির পেশাকে সাহায্য করেছে?

—হ্যাঁ কিন্তু না মানে যেভাবে বলা হয় যে ওটা আমায় ভাষাকে খুব লাগসইভাবে ব্যবহার করতে শিখিয়েছে

সেভাবে নয়। সাংবাদিকতা আমার গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে শিখিয়েছে। সুন্দর কাপড় চোপড় পরা মেয়েদেরকে তো পাতায় (সাদা পাতায়) বেশ ভালোই লাগে। তা স্বর্গে ওটা বা কাদার নিকোনর রেইনাকে এক কাপ চকোলেট (চকোলেট ছাড়া অন্য কোনো পানীয় নয়) যার পর কাদার নিজেকে তুলে ফেলবে মাটি থেকে দু-ইঞ্চি ওপরে—এগুলি হল একেবারেই সাংবাদিক কৌশল যা একইসঙ্গে বেশ কাজেও আসে।

—তুমি সবসময়ই সিনেমায় যেতে খুব ভালোবাসো। সিনেমা লেখককে কোনো কৌশল শেখাতে পারে।

—আমি জানি না। আমার ক্ষেত্রে সিনেমা সাহায্য, বাধা দুই-ই তৈরি করেছে। ওটা আমায় শিখিয়েছে ছবি দিয়ে কীভাবে ভাবতে হয়। তবে আজকাল দেখি চরিত্রের ছক বা দৃশ্যের ছবিটা দেখবার জন্য একটা ধাড়াবাড়ি রকমের উৎসাহ এমনকী ক্যামেরার ফ্রেম ও কোণের ব্যাপারে প্রায় অন্ধ হয়ে পড়া, একশো বছরের নিঃসঙ্গতার আগের সব বইগুলোতেই এটা আছে।

—তুমি নিশ্চয় কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখেনা-র কথা ভাবছ।

—হ্যাঁ ঐ উপন্যাসটা কাদার দিক থেকে চিত্রনাট্যের ঢঙেই লেখা। চরিত্রেরা ওখানে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন ক্যামেরা ওদের শেছন পেছন ঘুরছে। পরে যখন বইটা পড়েছি তখন ক্যামেরাটা আমি দেখতে পেয়েছি। অবশ্য এখন আমার বিশ্বাস সাহিত্যিক সমাধান সিনেমাটোগ্রাফির চেয়ে অনেক আলাদা!

—তোমার লেখায় সংলাপকে এত কম গুরুত্ব দাও কেন?

—প্যানিশে ঐ সংলাপগুলিকে সত্যি বলে মনে হয় না বলে। আমি সবসময়ই বলেছি মুখের কথা আর লেখা সংলাপের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। একটা স্পেনীয় সংলাপ যা জীবনে সুন্দর তা উপন্যাসে যে সবসময় ভালো লাগবে এমন নয়। যে কারণে আমি সংলাপ খুব কমই ব্যবহার করি।

—প্রত্যেকটা চরিত্রের পরিণতি কি তুমি উপন্যাস শুরুর আগেই জানো?

—খুব সাধারণ অর্থে লিখতে লিখতে বহু কিছুই আচমকা ঘটে যায়। যেমন প্রথমে ভেবেছিলাম কর্নেল অরিলিয়েনো বুএনদিয়া হবে এক গৃহযুদ্ধ ফেরতা মরবে একটা গাছের নীচে পেচ্ছাব করতে গিয়ে।

—সান্তিয়াগো আমায় বলেছিল যখন সে মারা গেল তখন তুমি খুব কষ্ট পেয়েছিলে।

—হ্যাঁ আমি জানতাম এরকম একটা সময় আসবে যখন ওকে মারতেই হবে কিন্তু আমার সাহস হচ্ছিল না। কর্নেলের এমনিতেই বেশ বয়স হয়েছে, ছোটো ছোটো গোল্ড ফিস পোষে, তারপর একদিন বিকেলে মনে হল, 'ঢের হয়েছে।' এবার একে মারতেই হবে। যখন আমি পরিচ্ছদটা শেষ করে দোতলায় সান্তিয়াগোর কাছে গেলাম তখন আমি কাঁপছি। ও আমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে কী ঘটেছে। 'কর্নেল মারা গেছে', সে বলেছিল। তারপর আমি বিছানায় শুয়ে দু'ঘণ্টা ধরে কেঁদেছিলাম।

—প্রেরণা বলতে কী বোঝ? এরকম কিছু কী আছে?

—এ শব্দের মর্যাদা রোমান্টিকরা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি এটাকে কোনো দৈবী অনুগ্রহ বা স্বর্গীয় আশ্বাস বলে মনে করি না। এটা হল সেই মুহূর্ত যখন চেষ্টা আর নিয়ন্ত্রণ দিয়ে বিষয়কে তুমি বাগে আনতে পারো। যখন তুমি কিছু লিখতে যাও তখন তোমার আর লেখার মধ্যে একটা পারস্পরিক টানা হেঁ-টানা তৈরি হয়। তুমি যেমন বিষয়কে খোঁচাও, বিষয়ও ঠিক তেমনভাবেই তোমাকে খোঁচায়। তারপর একটা সময় আসে যখন সব বাধা মুছে যায়, সমস্ত দ্বন্দ্ব উবে যায়, যা তুমি স্বপ্নেও ভাবনি সেটাই ঘটে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীতে লেখার চেয়ে মনোরম আর কিছুই হয় না। এটাকে আমি প্রেরণা বলতে পারি।

—কোনো লেখার সময় তুমি কী কখনো এই প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছ?

—হ্যাঁ তখন আমি ফের গোড়া থেকে ভাবতে শুরু করি। এরপ সময় আমি একটা ছু ড্রাইভার জোগাড় করে ঘরের দরজা আর প্রাগগুলিকে লাগাতে শুরু করি বা ঘরদোর সবজে রং করি। কারণ শারীরিক পরিশ্রম অনেক-সময় বাস্তবের মুখোমুখি হবার ভয়টা কাটিয়ে দেয়।

—ঐ গোলমালগুলি কোথায় হয়?

—সাধারণত লেখার গঠনের ক্ষেত্রেই এগুলি হয়।

—কখনো কী সেটা খুব গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়?

—কখনো কখনো এতই গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যে আমি নতুন করে শুরু করতে বাধ্য হই। ১৯৬২ সালে মেক্সিকোতে যখন আমি কুলপতির শয়ং লেখা থামিয়ে দিয়েছিলাম, তখন আমার তিনশ পাতা লেখা হয়ে গেছে। শেষ অবধি ওর থেকে শুধু প্রধান চরিত্রের নামটাই রইল। ওটাকে আবার ধরলাম ১৯৬০-তে বার্সিলোনায়, দুমাস ধরে রগড়ারগড়ির পর ফের ছেড়ে দিলাম কারণ মূল চরিত্রের, একটা বুড়ো ডিক্টেটার তার কয়েকটা নৈতিক দৃষ্টিকোণ কিছুতেই ঠিকভাবে ধরতে পারছিলাম না। এরওপ্রায় দু'বছর পর হেমিংওয়ের লেখা ভূমিকার টানে আফ্রিকার শিকার বিষয়ে একটা বই কিনে'ছিলাম। ভূমিকাটায় বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু ঐ বইয়ের হাতিদের অধ্যায়টা পড়েই আমি লেখার কায়দাটা যেটাতে পেরেছিলাম। হাতিদের কয়েকটা বিশেষ ধরনধারণ আমার ঐ ডিক্টেটারের নৈতিকতাটা একদম স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

—এই গঠন বা কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ছাড়া তুমি কি অন্য কোনো সমস্যাতেও পড়েছো?

—হ্যাঁ, বহুবারই আমি মারাত্মক সব কায়দায় পড়েছি। একবার একটা লেখার মতটা গরম দরকার আমি কিছুতেই সেটা তৈরি করতে পারছিলাম না। ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে উঠেছিল, কারণ ও গল্পটা ছিল ক্যারিবিয়ার এক শহরের আদতে যেখানে প্রচণ্ড গরম।

—তারপর কী করলে?

—এর একমাত্র সমাধান হতে পারত পুরো পরিবারটাকে ক্যারিবিয়ার থেকে সরিয়ে আনা। আমি এর চারপাশে একবছর ধরে ঘোরাঘুরি করলেও কিছুই করতে পারিনি। তারপর বার্সিলোনায় গিয়ে যখন ফের এটা লিখতে শুরু করলাম তখন কয়েকটা গাছ তৈরি করলাম, কিছু গন্ধ জুড়ে দিলাম। এভাবেই নিরক্ষীয় অঞ্চলের শহরের গরমের অসহনীয়তাটা আমি পাঠককে বোঝাতে পারলাম।

—যেটা লিখছ সেটা প্রায় শেষ হয়ে যাবার পর কী হয়?

—সেটার সম্পর্কে আর কোনো উৎসাহই থাকে না। হেমিংওয়ে যেমন বলতেন, মরা সিংহ।

—তুমি বলতে প্রতিটা ভালো উপন্যাসই বাস্তবের এক কাল্পনিক রূপান্তর। এ ধারণাটা ব্যাখ্যা করতে পারো?

—হ্যাঁ। আমি মনে করি উপন্যাস হল গোপন সংকেতে বলা একটা বাস্তবতা, অনেকটা পৃথিবী বিষয়ক ধাঁধাঁর মতোই। উপন্যাসের বাস্তবতা জীবনের বাস্তবতা থেকে আলাদা। যদিও তার শেকড় ওর মধ্যেই থাকে। স্বপ্নের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি।

—তোমার উপন্যাসে যেভাবে তুমি বাস্তবতাকে ব্যবহার করেছ, বিশেষত একশো বছরের নিঃসঙ্গতা বা কুলপতির হেমন্ত, তাকে 'জাদুবাস্তবতা' বলা হচ্ছে। আমার মনে হয় ইউরোপের পাঠকরা তোমার গল্পের জাদুটা ধরতে পারলেও তার পেছনের বাস্তবতাটা ধরতে পারছে না···

—বাস্তবতা শুধুই টমেটো আর ডিমের দামের মতো আটকে থাকে না। এটা বুঝতে ওদের যুক্তিবাদই ওদের বাধা দিয়েছে। লাতিন আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনে এটা প্রমাণিত, বাস্তবতা আসলে নানান উদ্ভট ঘটনার ভরা। এ বিষয়টা বোঝাতে আমি সাধারণত আমেরিকার পর্যটক উপন্যাসের কথা বলি। গত শতকে আমাজনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ পথ তিনি হেঁটেছিলেন, দেখেছিলেন ফুটন্ত জলের নদী বা এমন জায়গা যেখানে মানুষের গলার স্বর তুষুল বৃষ্টি নিয়ে আসে। আর্জেন্টিনার দক্ষিণতম প্রান্তে দক্ষিণ মেরু থেকে আসা ঝড় একটা গোটা দার্কাসকে উড়িয়ে নিয়ে গেছিল, পরদিন ভেলেদের জালে ধরা পড়েছিল সিংহ, জিরাফ প্রভৃতিদের দেহগুলি। দিদিমার গ্রান্ড এক পোপের কলম্বিয়ার গ্রামে যাবার একটি প্রায় অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কাহিনী। যে রাষ্ট্রপতি তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো আমি তাকে বর্ণনা করেছিলাম একজন টেকো, গাট্টাগোট্টা লোক হিসেবে। যাতে তখন ক্ষমতায় থাকা রোগা লম্বা চেহারার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাকে কেউ গুলিয়ে না ফেলে। এই গল্প লেখার এগারো বছর পর পোপ যখন সত্যিই কলম্বিয়ায় গেলেন তখন তাঁকে যে রাষ্ট্রপতি অভ্যর্থনা জানালেন তিনি ছিলেন ঐ গল্পের মতোই টেকো ও গাট্টাগোট্টা। একশ বছরের নিঃসঙ্গতা বেরোনোর পর বারানকুয়ার একটি ছেলে তারও ওরকম একটা স্কলারের লেজ আছে বলে দাবি জানিয়েছিল। আমাদের চারপাশে যেসব অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলি রোজ ঘটে সেটা তুমি খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাবে। আমি এমন সব সাধারণ মানুষদের জানি যারা একশ বছরের নিঃসঙ্গতা পড়েছেন, মজাও পেয়েছেন কিন্তু কখনোই অবাক হন নি। কারণ সবটা পড়ার পর তারা দেখেছেন আমি এমন কিছুই বলিনি যা তাদের জীবনে ঘটেনা।

—তার মানে তুমি যা লিখেছ সেসবই সত্যি জীবনের ভিত্তিতে লেখা?

—আমার উপন্যাসে এমন একটা লাইনও নেই যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

—তুমি নিশ্চিত? কারণ কয়েকটা খুবই উদ্ভট ব্যাপার কিন্তু একশো বছরের নিঃসঙ্গতায় ছিল। সুন্দরী রেমিডোসের স্বর্গে যাওয়া, মরিসিও ব্যাবিলোনিয়ার চারপাশে ঘোরা হলদে প্রজাপতির ঝাঁক…

—এ সমস্তই ঘটেছিল…

—যেমন…

—ধরো মরিসিও ব্যাবিলোনিয়া, আমার যখন পাঁচ বছর বয়স সে সময় আমাদের আরকাটার বাড়িতে একজন ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি এসেছিল মিটার বদলাতে, আমার ঘটনাটা এমনভাবে মনে আছে যেন সেটা গতকাল ঘটনা। আসলে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম তার চামড়ার বেল্টটা দেখে ঐ বেল্টা দিয়ে, যাতে পড়ে না যায় সেজন্য সে নিজেকে একটা লাইটপোস্টের সঙ্গে বেঁধে রাখত। সে বেশ কবার এসেছিল। এরকম একদিন আমার ঠাকুমা কাজল দিয়ে প্রজাপতি তাড়াতে তাড়াতে বলেছিলেন, 'যখনই এ লোকটা আমাদের বাড়িতে আসে, তখনই ঐ হলুদ প্রজাপতিটা ওর পেছন পেছন আসে।' এটাই হল মরিসিও ব্যাবিলোনিয়ার বীজ।

—আর সুন্দরী রেমিডোস? তাকে স্বর্গে পাঠানোর চিন্তাটা তোমার কীভাবে এল?

—গোড়ায় ভেবেছিলাম যখন রেমিডোস রেবেকা আর আদারাস্টার সঙ্গে বাড়িতে সেলাই ফোঁড়াই-এর কাজে ব্যস্ত সেরকম একটা সময়ে সে হঠাৎ ভ্যানিস হয়ে যাবে। কিন্তু প্রায় সিনেমার মতো এই কায়দাটা পরে আমার ঠিক যুৎসই বলে মনে হল না। তখন আমি রেমিডোসকে চারপাশে ঘোরাচ্ছিলাম। তারপর ভেবেছিলাম তাকে স্বর্গে তুলে নেবো, একদম সশরীরে। এর পেছনের ঘটনা? এক বুড়ির নাতনি শেষরাতে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল শুধু একখাটা গোপন রাখতে যেটা তার ঠাকুমা চাউর করে দিয়েছিল, নাতনি স্বর্গে গেছে।

—তুমি এর আগে অনেক প্রবন্ধে বলেছ তাকে উড়িয়ে দেবার ব্যাপারটা খুবই কঠিন ছিল।

—হ্যাঁ, সে মাটি থেকে মোটে উঠতেই চাইছিল না। আমিও ক্ষেপে গেছিলাম কারণ তাকে ওড়ানোর কোনো রাস্তাই আমি বার করতে পারছিলাম না। একদিন আমি এই সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমাদের বাগানে হাঁটছিলাম। সেদিন খুব হাওয়া দিচ্ছিল। একজন বেশ দশাসই চেহারার কালো মহিলা সদ্য কাচাকাচি শেষ করে তার চাদরগুলিকে সমান করে মেলার চেষ্টা করেছিলেন। সেটা কিছুতেই হচ্ছিল না কারণ বাতাস বারবার সেগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার মাথায় হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। 'আরে এই তো'। আমি বুঝলাম সুন্দরী রেমিডোসের শুধু চাদর চাই স্বর্গে যাবার জন্য। এক্ষেত্রে চাদরগুলিই ঘটনাটাকে বাস্তব করে দিয়েছে। তারপর যখন আমি টাইপরাইটারের কাছে ফিরে গেলাম তখন সুন্দরী রেমিডোস শুধু ওপরে উঠল আর উঠল—কোনো সমস্যা ছাড়াই। এমনকী খোদ ভগবানেরও তখন তাকে আটকানোর কোনো সাধ্য ছিল না।

২

লেখালিখি

—তুমি এটায় সত্যিই বিশ্বাস কর?

—হ্যাঁ করি। আমি মনে করি একজন লেখক আদতে একটাই বই লেখে, যদিও সেই একই বই নানা নামে নানা খণ্ডে প্রকাশিত হতে পারে। তুমি এটা বালজাক, কনরাড, মেলভিল, কাফকা আর অবশ্যই ফকনারে দেখতে পাবে। কোনো লেখকের একটা বই তার অন্যান্য লেখাকে এমনভাবে ছাপিয়ে যায় যে মনে হয় তিনি যেন শুধু ঐ একটা আদি গ্রন্থেরই লেখক। সার্ভান্তিসের ছোটো গল্পের কথা কার মনে আছে? উদাহরণ হিসেবে সেই গ্রাতক যে নিজেকে ভাবত কাচের তৈরি গল্পটার কথা আজ আর কারইবা মনে আছে? কিন্তু সে লেখাটা তো তার মূল কাজগুলির মতোই জমিয়ে পড়া যায়। লাতিন আমেরিকার ভেনেজুয়েলার লেখক রোমুলো গ্যালিগস্ বিখ্যাত তোখা বারবারাকর জন্য। কিন্তু আমার বিচারে সেটা কোনোভাবেই তার সেরা লেখা নয়। গুয়েতেমালার মিগুয়েল এঞ্জেল অস্ট্রিয়াস পরিচিত তার রাষ্ট্রপতি বলে বইটির জন্য, একটা কালজু উপন্যাস। ওটা ওর গুয়েতেমালার উপকথার ধারে কাছে আসে না।

—যদি এটা সত্যিই হয় যে একজন লোক সারাজীবনে একটাই লেখা লেখে তাহলে তোমার সে লেখা কোন্‌টা? মাকোন্দোর নিয়ে লেখাটা কী?

—তুমি জানো যে এটা ঠিক কথা নয়। শুধু আমার দুটো উপন্যাস একশো বছরের নিঃসঙ্গতা, ঝোড়ো পাতা আর দিদিমার শ্রাদ্ধ বলে বইটার কয়েকটা ছোটো গল্প মাকোন্দোয় ঘটেছে। অন্যগুলি যেমন কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখেনা, অন্তত সময় বা এখটি মৃত্যুর পূর্বাভাসের কিস্‌দা কলম্বিয়ার সমুদ্রের ধারের অন্য শহরগুলিতে ঘটেছে।

—এমন শহর যেখানে ট্রেন নেই, কলার গন্ধ নেই।

—…কিন্তু নদী আছে। এমন শহর যেখানে শুধুই স্টিমারে করে যাওয়া যায়।

—যদি সে লেখাটা মাকোন্দোর না হয় তাহলে তোমার সেই একমাত্র লেখাটা কিসের?

—নিঃসঙ্গতার। ঝোড়ো পাতার মূল চরিত্রটার কথা তুমি যদি ভাবো তাহলে দেখবে তার বাঁচা-মরা দুই-ই ঘটে পুরোপুরি নিঃসঙ্গতার মধ্যে। নিঃসঙ্গতা তাড়া করে ফেরে কর্নেলকে। কেউ চিঠি লেখে না উপন্যাসের মূল

চরিত্রকে—সে অপেক্ষা করে থাকে, শুক্রবারের পর শুক্রবার তার স্ত্রী ও মুরগির ছানা সমেত, যুদ্ধের পেনশানের জন্য, যেটা কখনোই আসে না। কোড়ো সময়ে যে মেয়র শহরে আত্মবিশ্বাস জাগাতে ব্যর্থ হল সেও একটা নিঃসঙ্গ চরিত্র। তার মতো করে ক্ষমতার নিঃসঙ্গতা সে বুঝতে পেরেছিল।

—অনেকটা অরিলিয়ানো বুয়েনদিয়া বা কর্নেলপত্নির মতো।

—একদম। কর্নেলপত্নির হেমন্তের বিষয় হল নিঃসঙ্গতা অবশ্য একশো বছরের নিঃসঙ্গ তারও ঐ একই বিষয়।

—যদি নিঃসঙ্গতাই তোমার লেখার মূল বিষয় হয় তাহলে এই মাত্রাতিরিক্ত আবেগের শেকড় খুঁজতে আমরা কোন্‌দিকে তাকাব, তোমার ছেলেবেলার দিকে কী?

—আমি মনে করি এ সমস্যাটা সকলেরই। এটাকে নিজের মতো করে প্রকাশ করার উপায় বা ধরণও তাদের আছে। এই অনুভবটা অনেকের লেখাতেই ছেয়ে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবচেতনভাবেই এর কথা বলে। আমি তাদেরই মতো একজন। কিন্তু তুমিও কি তাই নও?

—হ্যাঁ আমিও। তোমার প্রথম বই কোড়ো পাতাতে একশো বছরের নিঃসঙ্গতার বীজটা ছিল। যে তরুণ ও বইটা লিখেছিল তার সম্পর্কে এখন তুমি কী ভাবো?

—এখন আমার তার জন্য করুণাই হয়। কারণ সে বেচারা বইটা লিখেছিল খুবই তাড়াহুড়ো করে। সে ভেবেছিল জীবনেও আর লিখবে না, হঠাৎই ওটা লিখছে। কাজে কাজেই তার জানের ভাণ্ডার সে ওই বইটায় উজাড় করে দিয়েছিল। বিশেষ করে সে সময়ের ইংরেজ আর আমেরিকান ঔপন্যাসিকদের কাছ থেকে শেখা কায়দা-কানুন ও কুকৌশলগুলি।

—অবশ্যই ভার্জিনিয়া উলফ, জয়েস, ফকনার। কোড়ো পাতার ৮৫টা তো একেবারেই ফকনারের এই যেমন আমি মরতে বসেছিলাম মতোই।

না ঠিক একেবারে এক নয়। আমি সোনো নাম না দিয়ে তিনটে সম্পূর্ণ আলাদা চঙ ব্যবহার করেছিলাম। ওখানে একটা বুড়ো লোক, একটা বাচ্চা ছেলে আর একজন মহিলা আছে। তুমি দেখবে কোড়ো পাতা আর কর্নেলপত্নির শরতের লেখার চঙও বিষয় ঐ একই (মৃতের প্রতি আচরণ)। কোড়ো পাতার ক্ষেত্রে কারাক শুধু এইটুকু, ওখানে আমি নিজেকে ছেড়ে দেবার সাহস পাইনি। স্বগতোক্তিগুলোও খুব শক্ত ছকে বাঁধা ছিল। যেখানে কর্নেলপত্নির হেমন্তে আমি একাধিক স্বগতোক্তি ব্যবহার করেছি, কখনো কখনো একই বাক্যের মধ্যে। ও লেখাটায় পৌঁছোনোর আগেই আমি উড়তে শিখে গেছিলাম। আমি নিজের লাগাম খুলে দিয়েছিলাম, যা মনে আসে তাই-ই করেছিলাম।

—চলো একটু পিছিয়ে সেই তরুণের কাছে যাওয়া যাক যে কোড়ো পাতা লিখেছিল। তখন তোমার কুড়ি।

—বাইশ।

—তোমার তখন বাইশ বছর বয়েস। তুমি বারানকুইলায় থাকো, একটা উপন্যাস লিখেছ। আমার স্মৃতি যদি ঠিক থাকে তো তুমি তখন একটা খবরের কাগজের অফিসের সম্পাদকীয় বিভাগে বসে অনেক রাতে লিখতে, সকলে বাড়ি চলে যাবার পর।

—এল হেরাল্ডোতে।

—হ্যাঁ আমি ঐ অফিসগুলি জানি—নিওন আলো, সিলিং ফ্যান, সবসময়ই প্রচণ্ড গরম। বাইরের রাস্তাটা দুনিয়ার চুল্লি থেকে ওরা। 'কলি ডেল কিমেন একেবারে বহুব্যবহৃত সড়ক। এখনো কী ওরা রাস্তাটাকে ঐ নামেই ডাকে।

—হ্যাঁ একেবারে ঐ একই নামে। আমি তো ওখানেই থাকতাম, ওরকমই একটা হোটেলের অস্থায়ী বোর্ডার হিসেবে—সে হোটেলগুলো আসলে বেশ্যাখানাই ছিল ও—হোটেলগুলিতে সেখানে এক রাতের জন্য ঘর পেলো লাগত। এল হেরাল্ডো তখন এক কলম লেখার জন্য আমায় দিত তিন পেসো, কখনো কখনো সম্পাদকীয়র জন্য আরো তিন। যেসব দিন পকেটে ঘর পেসোও থাকত না সেসব দিন আমি ছোট্টো পাতার পাণ্ডুলিপিটা ঐ হোটেলের বেয়ারার কাছে জমা রাখতাম। ও জানতো ঐ কাগজগুলির দাম আমার কাছে অনেক। এরও অনেক পরে, একশ বছরের নিঃসঙ্গতা লিখে ফেলার পর ঐ বেয়ারাটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখন যারা আমায় ঘেপার বা সই নেবার জন্য ভিড় করেছিল সেও তাদের মধ্যে ছিল। তার সবই মনে ছিল।

—ছোট্টো পাতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তোমার কি কোনো সমস্যা হয়েছিল?

—একজন প্রকাশক পেতে আমার পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর্জেন্টিনার প্রকাশন সংস্থা এডিটোরিয়াল লোসাডার আমি এটা পাঠিয়েছিলাম, ওঁরা পাণ্ডুলিপিটা ফেরত দিয়েছিল স্পেনীয় সমালোচক গুয়েলেরায়ো ডি টোরির একটা চিঠি সহ। সে চিঠিতে উনি আমায় জানিয়েছিলেন লেখালেখা ছেড়ে অন্য ব্যাপারে মন দিতে। সে যাই হোক উনি আমার লেখায় একটা জিনিস দেখেছিলেন যেটা এখন আমায় বেশ তৃপ্তি দেয়—কবিত্বের এক নিশ্চিত বোধ।'

—প্রায় এরকমই একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে, তুমিই বলেছিলে, সেটা ঘটেছিল ক্লাসে। খুব সম্ভবত রজার কেলোর সঙ্গে, তাই না?

—ফর্মেলকে কেউ চিঠি লেখে না। একশো বছরের নিঃসঙ্গতার বহু আগেই আমি গালিমারকে দিয়েছিলাম। ওখানে দুজন পাঠক ছিল—হুয়ান গুয়েতিসোলো আর রজার কেলো। গুয়েতিসোলোর সঙ্গে তখন আমার এখনকার মতো বন্ধুত্ব ছিল না? সে তখন ও বইটা বিষয়ে একটা, অসাধারণ রিপোর্ট নোট লিখেছিল-। যদিও কেলো ও বইটাকে একেবারেই বাতিল করে দিয়েছিল। আমার বইতে গালি প্রুফের নজর পড়ার আগেই একশ বছরের নিঃসঙ্গতা লেখা হয়ে গেছিল। ততদিনে আমার এজেন্ট কার্লা নোভা নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেছিল।

—ছোট্টো পাতা আর একশো বছরের নিঃসঙ্গতার মধ্যের লেখাগুলি যেমন কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না, অন্তত সময় ও দিদিমার প্রাক) হঠাৎ কেমন যেন বাস্তবধর্মী, সংযত ভাষা ও গঠনের দিক থেকে কেমন যেন বেশি আটোসাটো হয়ে গেল। এগুলিতে কোনো জাদু বা তত্ত্বকর ব্যাপার ছিল না। এই বদলটাকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করো?

—যখন ছোট্টো পাতা লিখেছি তখন আমি নিশ্চিত ছিলাম যে কোনো ভালো উপন্যাস মাত্রই তাতে বাস্তবতা কবিতার সঙ্গে জায়গা বদল করে নেয়। তোমার নিশ্চয় মনে আছে এ উপন্যাসটা বেরিয়েছিল কলম্বিয়ার প্রবল রাজনৈতিক তামাতোলের মধ্যে। আমার অতি বন্ধুরা আমার মধ্যে একটা তত্ত্বকর অপরাধের বোধ চারিয়ে দিয়েছিল। তারা বলত, 'তোমার লেখা তো কিছু বাতিলও করে না আবার কিছু ফাঁসও করেনা।' এ মতটাকে এখন আমার অতি সরল ও ভুল বলেই মনে হয়। কিন্তু সে সময় মনে হয়েছিল আমার দেশের রাজনৈতিক এবং সমাজবাস্তবতার সঙ্গে আমার আরো বেশি করে জড়িয়ে থাকা উচিত। যে কারণে আমি আমার সাহিত্য বিষয়ক প্রাথমিক ধারণার থেকে অনেকদূরে সরে এসেছিলাম। ভাগ্যক্রমে আমি অবশ্য আবার লেখায় ফিরে যেতে পেরেছিলাম। ইতিমধ্যে অবশ্য নিজের মুণ্ডু উড়ে যাবার মতো গুরুতর ঝুঁকিও আমি নিয়েছি। কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখেনা, অন্তত সময় ও দিদিমার প্রাক হল কলম্বিয়ার সেই সময়ের বাস্তব জীবনের প্রতিফলন, ও জিনিসটাই এ বইগুলির মুক্তি

কাঠামোটা খাড়া করেছে। অবশ্য এসব লেখার জন্য আমার কোনো অনুশোচনা নেই। কিন্তু এগুলি হল একধরনের আগে থেকে ঠিক করা লেখা, যেগুলি বাস্তবের একটা অনড় ও বিচ্ছিন্ন ছবি তৈরি করে। এগুলি ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন সবসময়ে শেষ পাতাতে এসেই শেষ হয়। এসব লেখাকে আমার এখন খুবই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। আমার বিশ্বাস, আমি অন্তত এর চেয়ে ভালো লিখতে পারি।

—এই দ্বিক বদলের কারণটা কী?

—আমি নিজের লেখা নিয়ে ভেবেছি। অনেকদিন ধরে ভেবে শেষে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে আমার দায় শুধু আমার দেশের রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নয়, আমার দায় সারা পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার প্রতি। আমি এর কোনো দিককে ভাঙ্গিয়েও করিনি আবার মাথায়ও তুলিনি।

—তার মানে তোমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই তুমি লাতিন আমেরিকার সমস্ত বিখ্যাত দায়বদ্ধ সাহিত্যকে ধরবাচ্ছ।

—তুমি তো এটা ভালোই জানো যখন আমার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পছন্দের প্রশ্ন ওঠে তখন আমার দায় আছে, রাজনৈতিক দায়।

—সমাজতন্ত্রের দিকে···

—আমি চাই সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র কায়েম হোক। আমি বিশ্বাস করি আজ না হোক কাল সেটা হবেই। তবে লাতিন আমেরিকার দায়বদ্ধ সাহিত্য বলে যে জিনিসটা চলছে সে সম্পর্কে আমার প্রচুর আপত্তি আছে। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে প্রতিবাদের সামাজিক উপন্যাসগুলি সম্পর্কে (এসব অনেক হয়েছে)। আমি মনে করি এসব লেখায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা সংকীর্ণ মত থাকে তা দিয়ে এমন কী রাজনীতির স্বর্থেও কিছু পাওয়া যায় না। এটা চেতনাকে ওপরে তোলার বদলে নীচেই নামিয়ে দেয়। লাতিন আমেরিকানরা উপন্যাসের কাছে তাঁদের প্রত্যক্ষ অবিচারের অত্যাচারের চেয়েও অনেক বেশি কিছু আশা করে। আমার অনি বন্ধুরা অনেকেই মনে করে লেখকের লেখায় নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। সম্ভবত অবচেতনভাবেই তারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে, যখন সৃষ্টির স্বাধীনতাতেই তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বসে। আমি মনে করি একটা প্রেমের উপন্যাসও অন্য যে কোনো উপন্যাসের মতোই সমানভাবে প্রামাণিক। যখন এরকম লেখা হয় তখন একজন লেখকের কাজ হল আরো ভালো করে লেখা—যদি চাও এটাকে তুমি বৈপ্লবিক কর্তব্য বলতে পারো।

—এসব তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক বাস্তবতার দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করে কীভাবে অন্য একটা রাস্তা পেলে, যাকে বলা যায় পুরাণের পথে বাস্তবে আসা, যেভাবে তৈরি হল একশো বছরের নিঃসঙ্গতা?

—আমি তো আগেই বলেছি যে ঠাকুমার বলা গল্প থেকেই আমি প্রথম সূত্রগুলি পেয়েছি। সেই সময়কার লোকেদের মধ্যে প্রচলিত মিথ, পুরাণের গল্প বা বিশ্বাস, এসবই তার রোজকার জীবন যাপনের সঙ্গে জড়িয়েছিল। এ থেকেই বুঝেছিলাম যে আমি নতুন কিছু করছি না। শুধু সে সময়ের প্রচলিত অন্তত চিহ্ন, পূর্বাভাস বা কুসংস্কার-গুলির যা প্রকৃত অর্থেই লাতিন আমেরিকান তার পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র। মনে রেখো সে সময়ে লোকেরা মন্ত্র পড়ে গরুর কান থেকে পোকা বার করত। উদাহরণ হিসেবে তুমি শুধু তাদের কথা মনে রেখো। কারণ লাতিন আমেরিকায় আমাদের রোজকার জীবন এসব জিনিসেই ভরা।

একশো বছরের নিঃসঙ্গতা আমি লিখেছিলাম শুধুমাত্র বাস্তবের দিকে তাকিয়ে, আমাদের বাস্তবের দিকে তাকিয়ে। তার এমন কোনো ছক ছিল না যা যুগ যুগ ধরে যুক্তিবাদীরা বা স্তালিনপন্থীরা আমাদের ওপর চাপিয়েছে

শুধু তাদের বোঝার সুবিধা হবে বলে।

—জীবনের চেয়েও বড়ো মাপে দেখানো ব্যাপারগুলি, এবশো বছরের নিঃসঙ্গতা কুলপতির হেমন্ত বা তোমার হালের গল্পগুলির বাড়িয়ে তোলা অংশগুলি সম্পর্কে তুমি কী বলবে? সেগুলি কী বাস্তব না আর প্রয়োগ?

—না অসংগতি আমাদের এই বাস্তবতারই অংশ। আমাদের বাস্তবতা তো আদতে সবরকম অসংগতিতে ভরা। এটা সেইসব লেখকদের কাছে খুব সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যারা এটাকে বর্ণনা করার মতো শব্দ খুঁজে পায় না। যদি তুমি নদীর কথা বলো সেক্ষেত্রে একজন ইউরোপীয় পাঠক সবচেয়ে বড়ো যে নদীর কথা ভাবতে পারে তা দানিয়ুব, ১৭৭০ মাইল লম্বা। সে কীভাবে আমাজনকে কল্পনা করবে যেটা এক এক জায়গায় এত চওড়া যে এপার ওপার দেখা যায় না? বড় শব্দটা ইউরোপীয় পাঠকের কাছে একরকমের ম্যাজিক তৈরি করে, আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আর এক রকমের। বৃষ্টি সম্পর্কেও এই একই কথা বলা চলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বর্ষা বলতে যে ভয়ংকর জিনিসটা বোঝায় তার অর্থ তাদের কাছে স্পষ্ট করা মুস্কিল। ফুটন্ত জলের নদী, মাটি কাঁপানো বাতাস, গোটা শহরকে উড়িয়ে দেয়া ঝড় এর কোনোটাই বানিয়ে তোলা কথা নয়। আমাদের গোলার্ধের প্রাকৃতিক জগৎটাই তো এরকম।

—তার মানে তুমি মিথ, জাদু বা অতিরেকগুলি আমাদের বাস্তব থেকেই নিয়েছ। কিন্তু ভাষা? এগুলো বছরের নিঃসঙ্গতার ভাষায় যে চমক, গরিমা বা প্রাচুর্য ছিল তাতো তোমার এর আগের কোনো লেখাতেই পাইনি এক ঐ দিদিমার শ্রাদ্ধ বই-এর নাম গল্পটা ছাড়া।

—এটা শুনতে বেশ ভালোই লাগছে। কিন্তু আসল সত্যিটা এই যে আমি বরাবরই ওভাবে লিখতে পারতাম। তবে এর আগে আমার ওভাবে লেখার কোনো দরকার হয়নি।

—তার মানে তুমি কী বলতে চাও একজন লেখক তার এক বই থেকে অন্য বইতে ভাষা পাল্টে নিতে পারে, যেমন তুমি প্রতিদিন তোমার জামা বদলাও? তুমি কি মনে করো না যে ভাষা হল একজন লেখকের অস্তিত্বের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ?

—না। আমি মনে করি বই-এর বিষয়ই তার ভাষা ও লেখার কৌশল ঠিক ঠিক করে দেয়। যে ভাষা আমি ব্যবহার করেছিলাম কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না, অন্তত সময় বা দিদিমার শ্রাদ্ধে তা সংহত, সংক্ষিপ্ত ও সাংবাদিক বিবেচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, একশ বছরের নিঃসঙ্গতার ঐ অন্য বাস্তবতাকে উপস্থাপনের জন্য আমার প্রয়োজন হয়েছিল এক সম্পন্নতর ভাষার, ঐ যে বাস্তবতাকে আমরা পৌরাণিক বা জাদুকরি বলব বলেই মেনে নিয়েছি।

—আর কুলপতির হেমন্ত?

—আসলে একশো বছরের নিঃসঙ্গতার ভাষার হাত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমার আর একটা ভাষার প্রয়োজন হয়েছিল।

—কুলপতির হেমন্ত তো গদ্য কবিতা, তুমি কি কবিতার শিল্প থেকে প্রভাবিত হয়েছিলে?

—না, সঙ্গীত থেকে। আমি এ বইটা লেখার সময় যত গান শুনেছি আমার গোটা জীবনেও আমি অত গান শুনেছি কিনা সন্দেহ।

—মূলত কোন্ সঙ্গীত?

—এই বিশেষ ক্ষেত্রে বেলাবাতেকি আর ক্যারিবিয়ানের সমস্ত পপ গানগুলি, এ দুয়ের মিশ্রণ বিস্ফোরক হতে বাধ্য।

—তুমি বলেছিলে এ বইতে যতকিছুই পরোক্ষভাবে আছে, রোজকার কথাবার্তায় ব্যবহৃত প্রবচনগুলিও।

—ফুলপতির হেমন্ত একেবারেই চালু ভাষায় লেখা উপন্যাস। বিষয়, গঠন, গান বা ধুয়োর দিক থেকে ক্যারিবিয়ানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। এতে এমন অনেক লেখা আছে যা কেবলমাত্র বারানকুইলার একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারই বুঝতে পারবে।

—ফিরে দেখলে নিজের কাজকে কেমন লাগে, ধরো তোমার গোড়ার দিকের লেখাগুলোকে?

—আগেও বলেছি এ লেখাগুলো সম্পর্কে আমি এক ধরনের অপত্য স্নেহ বোধ করি; যা তুমিও কর তোমার ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে, যারা এখন বড়ো হয়েছে, বাড়ি ছেড়েছে। শুধু মনে পড়ে ঐ তরুণ লেখকটির ওসব লেখার সময় কী মাথাই না ধরত।

—তখন যে সমস্যাগুলি ছিল এখন তো তুমি সেগুলির সহজেই সমাধা করতে পারো।

—হ্যাঁ, সে সমস্যাগুলি এখন আর কোনো সমস্যাই নয়।

—তোমার আগের লেখা আর পরের লেখা মানে যে লেখা তোমায় পৃথিবী বিখ্যাত করে দিল এ দুয়ের মধ্যে কোনো সুতো আছে কী?

—হ্যাঁ আছে, সে সুতোটা ভেতরে আছে এবং সেটাকে এখনও রক্ষা করার প্রয়োজন।

—তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই কোন্‌টা?

—সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফুলপতির হেমন্ত হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ও বইটা আমায় ডুবে যাবার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

—এছাড়াও তুমি বলেছ ও বইটা লিখতে তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। কেন?

—কারণ এ বইটাই আমি চিরকাল লিখতে চেয়েছি। এখানেই আমি সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি করতে পেরেছি।

—অবশ্যই খুব রেখে ঢেকে।

—অবশ্যই।

—এটা লিখতেই তোমার সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছিল।

—সব মিলিয়ে সতেরো বছর। এর মধ্যে ঠিকঠাক হয়নি বলে দুটো খসড়া আমায় ফেলে দিতে হয়েছিল।

—এটাই কি তোমার সেরা বই?

—একটি মৃত্যুর পূর্বাভাসের কিসসার আগে আমি 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখেনা'কেই আমার সেরা উপন্যাস বলতাম। ওটা ন বার লিখেছিলাম। আর আমার নিজের লেখার মধ্যে ওটাই সবচেয়ে কম স্পর্শকাতর।

—তুমি তো মনে করো একটি মৃত্যুর পূর্বাভাসের কিসসা ওর চেয়েও ভালো লেখা।

—হ্যাঁ।

—কোন্‌ দিক থেকে?

—ওটা নিয়ে আমি ঠিক যা করতে চেয়েছি তা পেরেছি, এর আগে যা কখনো ঘটেনি। এর আগে, আমার অন্য লেখাগুলোতে সব নিজের মর্জিতে চলেছে, চরিত্রেরা নিজেদের মতো জীবন কাটিয়েছে, তাদের যা খুশি তাই করেছে।

—সাহিত্য সৃষ্টির এটাই তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার

—কিন্তু আমি এখন একটা বই লেখার তাগিদ অনুভব করছিলাম যার ওপর আমার সম্পূর্ণ কঠিন নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারব। আমার মনে হয় একটি মৃত্যুর পূর্বাভাসের কিসসায় আমি সেটা করতে পেরেছি। আসলে বিষয়টা একেবারেই গোয়েন্দা গল্পের মতোই একটা নির্দিষ্ট গঠন দাবি করেছিল।

—এটা খুবই অদ্ভুত যে তুমি তোমার সেরা বই-এর মধ্যে এতবারও একশো বছরের নিঃসঙ্গতার কথা বলছে না অথচ বেশির ভাগ সমালোচকই তো ওটাকে একেবারে অনতিক্রম্য বলে মনে করেন। তোমার কাছে ব্যাপারটা কি এতই তেতো?

—হ্যাঁ। ওটা আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছিল। ওর পরের প্রকাশিত
ওরকম হয়নি।

—কেন?

—কেননা খ্যাতি ক্ষমতার মতোই তোমার বাস্তববুদ্ধিকে নড়বড়ে করে দেয়, একইসঙ্গে তা চাপ তৈরি করতে শুরু করে তোমার ব্যক্তিগত জীবনের ওপর, দুর্ভাগ্যবশত এর ফেরে না পড়লে কেউই এটা বিশ্বাস করতে চায় না।

—তুমি কী মনে করো একশো বছরের নিঃসঙ্গতা তোমার অন্যান্য লেখাকে হীনমূল্য করে দিয়েছে?

—হ্যাঁ। ফুলগতির হেমন্তর সাহিত্যমূল্য বরঞ্চ ওর চেয়ে অনেক বেশি। সম্ভবত ওটায় ক্ষমতার নিঃসঙ্গতার কথা বলা হয়েছে আর একশো বছরের নিঃসঙ্গতায় ছিল বৈনন্দিনের নিঃসঙ্গতা, ওটা যে কোনো লোকের জীবনের গল্পই হতে পারে। তাছাড়া এটা লেখাও সহজ, তরতরে, রেখাচিত্রের মতো করে। আমি তো বলব (আগেও বলেছি) ওটা খুব ভালো চলনে লেখা।

—মনে হচ্ছে তুমিও ওটাকে নাকচ করছ।

—না। কিন্তু নানারকম কায়দাকানুন ও চুকতাক দিয়ে ওটা এমনভাবে লেখা, যে লেখার আগেই জানতাম যা লিখছি আমি তার চেয়ে ভালো লিখতে পারি।

—মানে তুমি ওটাকে ছাড়িয়ে যেতে পারো।

—হ্যাঁ আমি অবশ্যই ওটাকে ছাড়িয়ে যেতে পারি।

অনুবাদকের কথা

প্রথম প্রকাশ : আরম্ভ : মে ২০০০

কথোপকথন : গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ও প্লিনিও আপুলিও মেন্দোজা একটা বই লিখেছিলেন 'পেয়ারার গন্ধ' নামে। বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পকার ঔপন্যাসিক কলম্বিয়ার গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলাপের এক সংকলন।

এই বইটির বহু মুদ্রণ হয়েছে। আমাদের দেশেও নানান সংস্করণে বইটি সুলভ। কোনো অংশ কখনো কখনো বাংলা অনুবাদে বেরিয়েছে (এ বইটি থেকে দুটো অংশ এখানে অনুবাদ করা হল। তা থেকে অবশ্য 'পেয়ারার গন্ধ' নামটার ব্যঞ্জনা খুব একটা বোঝা যাবে না। এই কথাটা মার্কেজ অন্য এক উপলক্ষে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ক্যারিবিয়ার, তার স্বদেশের বাইরে থাকতে তিনি পেয়ারার গন্ধ ভুলে যাচ্ছেন। এরপর থেকে এই গন্ধটা লেখকের শিকড়ের গভীরতা বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এই আলাপচারিতায় মার্কেজের 'একটি মৃত্যুর পূর্বাভাসের কিসসা' পর্যন্তই উল্লেখিত। তারপর মার্কেজের তিনটে উপন্যাস বেরিয়েছে, তিনটেই বিখ্যাত। 'কলেরার সময়ে প্রেম', 'সেনাপতির গোলকধাঁধা', 'প্রেম ও অন্যান্য দানো', তার শেষতম বই 'একটি কিডন্যাপিং-এর সংবাদকে (১৯৯৭) মার্কেজ নিজে উপন্যাস বলেন না। তিনি বলেছেন যে আমি আর উপন্যাস লিখতে পারছি না বলেই এই রিপোর্টটা লিখলাম। কিন্তু তাত্ত্বিকেরা বলছেন যে এই রিপোর্টেও ঘটনার যে নির্বাচন আছে, ঘটনার যে বিন্যাস আছে, চরিত্রগুলির ভেতর সম্পর্কের যে টানাপোড়েন আছে তা রিপোর্টিং-এর সংজ্ঞা আর আওতার মধ্যে আঁটে না। সেগুলির জন্য দরকার একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের কল্পনা ও দক্ষতা।

অর্থাৎ একজন সত্যিকারের ঔপন্যাসিক, উপন্যাসের শিল্পরূপের সঙ্গে যার ব্যক্তিত্ব, চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি সম্পূর্ণ অভিন্ন তিনি রিপোর্ট লিখলে তা উপন্যাসই হয় একথা মার্কেজ আগেও প্রমাণ করেছেন। তিনি যখন এক কাগজের অখ্যাত রিপোর্টার তখন এক জাহাজডুবির রিপোর্ট লিখেছিলেন। সে রিপোর্ট বেরিয়েছিল ঐ নাবিকেরই নামে যে দশদিন সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে শেষপর্যন্ত বেঁচেছিল। মার্কেজ নোবেল প্রাইজ পাবার পর এ লেখাটি মার্কেজের নামেই বই হয়ে বেরোয়—উপন্যাস হিসেবে।

তাহলে কি মার্কেজ তার প্রায় তিরিশ বছর বয়সে লেখা জাহাজডুবির রিপোর্ট আর এই সত্তর বছর বয়সে লেখা কিডন্যাপিং-এর রিপোর্টে এটাই বোঝাতে চাইলেন যে তার কাছে রিপোর্টিং আর উপন্যাসের মধ্যে তেমন কোনো মাত্রনিক পার্থক্য নেই?

এই আলাপচারিতায় দেখা যাবে যে উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্বন্ধে ও উপন্যাসে তিনি কী করতে চান সেই লক্ষ্যের ব্যাপারে মার্কেজের বোধ কোনো অস্পষ্টতা বা অবজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দেয় না বরং কখনো কখনো তিনি অতিরিক্ত স্পষ্ট। যেমন 'প্রেম ও অন্যান্য দানো' উপন্যাসটিও রিপোর্টিং-এর সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তিনি সেটাকে উপন্যাসই বলেন।

এই কথাবার্তার-সময় ধরে পড়ে যাচ্ছে যে মার্কেজ 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা' ও 'সেনাপতির হেমন্ত' উপন্যাস দুটিতে তার ঔপন্যাসিকত্ব নিয়ে যেন একটু বেশি রকম চঞ্চল। তিনি যেন 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' লেখার চঙ-টাকে একটু বেশি বড়ো করে দেখছেন। আমরা বুঝতে পারি যে মার্কেজের মধ্যে তখন একটা দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছিল। টেকনিকের এই দ্বন্দ্ব না মিটিয়ে কোনো প্রধান শিল্পীই স্বস্তি পান না ঠিক তেমনই আবার স্বস্তি ও নতুন দ্বন্দ্বে প্রবেশের মধ্যে কোনো বিরতিও থাকে না। আমরা এ অনুবাদটা করছি যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তার পরের দুটি রচনায়, 'কলেরার দিনগুলিতে প্রেম', 'প্রেম ও অন্যান্য দানো'তে এই দ্বন্দ্বের নিরসন কীভাবে করলেন। মার্কেজ-পাঠক এ দুটি উপন্যাসের পঠন অভিজ্ঞতাকে এই কথোপকথনের ব্যাখ্যাত সূত্রগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবেন।

যে কোনো ভালো লাগাই নিজের মৌনসিনে মিলিয়ে নিতে পারলে আমার একটু সুবিধা হয়। আর সেইকারণেই গার্সিয়া মার্কেজের সঙ্গে গায়াদের মাতৃভাষার ঔপন্যাসিকদের একটা সাদৃশ্য খুঁজছিলাম। লৌকিক পুরাণ ব্যবহারে বা যে কোনো সত্যিকে একটা বানানো মঞ্চলের মধ্যে রেখে সার্বজনীন করে দেখার ক্ষমতায় তার সবচেয়ে কাছের লোক এদেশে সোমহর এক তারাশঙ্করই।

কিন্তু আমি এখনো নিশ্চিত নই, খুব স্পষ্ট কোনো যুক্তি তৈরি করতে পারছি না। যদি কেউ আরো স্পষ্ট করে কিছু ভাবতে পারেন তো জানান। তাহলে হয়ত ওঁর চিন্তাকে ধরে আমি এই বিষয়টাকে আরো কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। □

সুনীলবরণ রায় অনূদিত কবিতাগুচ্ছ

আরও আছে

[শেখ মোহম্মদ ইকবাল রচিত উর্দু গজলের অনুবাদ]

তারার শোকের ওপারে জগত আরও আছে ;
এখনো প্রেমের পরখ নিরীখ আরও আছে।
এ মহাশূন্যে জীবনমুক্ত নেই যে কোথা ;
এখানে মিছিল যাত্রীদলের আরও আছে।
থেকো না তুষ্ট সুরভিয়াসের জগত ল'য়ে ;
ফুলের বাগান পাখির কুলায় আরও আছে।
একটি যবিকা হারান কুলায় দুঃখ কিসে ?
বিনাশ দীর্ঘশ্বাসের আলয় আরও আছে।
তুমি শাহবাজ, ওড়াই তোমার কর্মধারা ;
তোমার সুমুখে গগন বিথার আরও আছে !
থেকো না জড়িয়ে দিনের রাতের গ্রন্থিপাকে ,
তোমার স্থান ও তোমার কাল যে আরও আছে।
বিশ্ব দিনের সভায় ছিলাম একল আমি।
এখানে আমার প্রাণের সুহৃদ আরও আছে।

কলকাতা
৭ই অগাস্ট, ১৯৭৫

ইকবালের একটি রুবাই

আঁধার সাগরে হারিয়ে গিয়ে সামনে যা,
মুচড়ে পড়ায়ে ঘূর্ণিপাকে বদলে যা ;
ভুল নেই ওরে ঢেউ যে তোর ভাগ্যেতে—
কেনিয়ে গর্জে যেদিকে চাস উথলে যা।

কলকাতা
১৩ই আগস্ট,

আর আজকের জগত

[আবদুল আমি দাস্ত গায়েব রচিত ফারসী কবিতার অনুবাদ]

আর আজকের জগত
বুকের চরণাঙ্কিত সেই তিলুনীর মত,
রক্তগোলাপের মত পোড়ায় নিজেকে নিজেরই আগুনে ;
মরুভূমির শূন্য আকাশ
আর কালের দিগন্ত জুড়ে
বিতীষিকা তারই আর্তনাদের।

কলকাতা
৭ই ফেব্রুয়ারি,১৯৭৭

যদি

[ফিল মোস'এদ্ রচিত ফারসী কবিতার অনুবাদ]

তোমার হাতের পাপড়িতে
ভালোবাসা আনতে যদি আমার মতে
তোমার কামনার আঙুলে
ঝরতাম
সারাক্ষণ
সরল সিক্ত রাখার জন্য তাদের

কলকাতা
২৭শে মার্চ, ১৯৭৭

তোমার লাল টুপির গান

[আহমাদ্ হাকিম রচিত ফারসী কবিতার অনুবাদ]

দিনান্তে
পাইন গাছের সবুজ ছুঁচল পাতা
ঘাষাধর মেঘগুলিকে
এক সূত্রে গাঁথে।
তুমি আসো তখন,
মাথায় লাল টুপি।
নীরবে তাকাই আমরা একে অন্যের দিকে
আর আমি দেখি তোমার চোখে
বরফ ঝরে।

কলকাতা
১৬ই জুলাই, ১৯৭৭

লুকোচুরি

[তাস্কো পোপা রচিত সার্বিয়ান কবিতার অনুবাদ]

কেউ লুকোয় আর কারো থেকে ;
লুকোয় তার জিভের নীচে,
সে খোঁজে তাকে মাটির তলায়।

সে লুকোয় তার কপালে,
সে খোঁজে তাকে আকাশে।

সে লুকোয় তার বিস্মরণে,
সে খোঁজে তাকে শ্বাসের মধ্যে।

খোঁজে আর খোঁজে তাকে,
কোথায় না খোঁজ তাকে
আর খুঁজতে খুঁজতে হারায় নিজেকেই।

কলকাতা
১৯শে মার্চ, ১৯৮২

দেবদূত

[রাফায়েল্ আল্বের্তি রচিত স্পেনিশ কবিতার অনুবাদ]

যাকে চেয়েছিলাম সে এলো,
যাকে ডেকেছিলাম।

কাড়ুয়ার নয় অরক্ষিত আকাশের,
হাল্কে তারার,
দেশহারা চাঁদের,

বরফের।
যে বরফে করেছিল একটি হাত,
একটি নাম,
একটি স্বপ্ন
একটি ললাট থেকে।

চুলের সঙ্গে মরণকে বেঁধেছিল যে
সে নয়।

যাকে চেয়েছিলাম।

হাওয়া ঘাঁচড়ে,
পাতা মুচড়ে বা জানলা কাঁপিয়ে নয়।

চুলের সঙ্গে বেঁধেছিল যে
অখণ্ড নীরবতা।

আমাকে অক্ষত রেখে
নরম আলোর একটি তট খুঁড়তে আমার বুকে
আর নাম্য করতে আমার প্রাণ।

কলকাতা
১৯শে মে, ১৯৮৬

মিথ্যে গল্প

বিজয় শর্মা

অনুবাদ : কমলেশ সেন

[এই শহর কলকাতাতেই থাকেন বিজয় শর্মা। জন্ম ১৯৬১। লিখছেন দু'দশক ধরে। কলকাতা শহরে হিন্দী-ভাষাভাষীদের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক যে পরিমণ্ডল আছে, সেই পরিমণ্ডলকে যাঁরা বাঁচিয়ে রাখছেন, বা আরও সজীব করে তুলছেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বিজয় শর্মা। তাঁর গল্পগুলিতে আছে এক মৌলিক অন্তর্দৃষ্টি। তিনি নিজেকে মনে করেন, উত্তর-আধুনিক একজন গল্পকার। উত্তর-আধুনিকতার দর্শনগত দিকও তাঁর গল্পে প্রতিফলিত বলে তিনি বিশ্বাস করেন। সম্প্রতি 'শব্দকর্ম' নামে এক সাহিত্যপত্র নিয়মিত প্রকাশ করছেন। 'দুসরী গাড়ী সে পহুঁচ রহুঁ'—তাঁর এই নির্বাচিত গল্পগ্রন্থ থেকে এই গল্পটি নেয়া হয়েছে।]

শেখরের ইস্কুলের নাম ভারতী স্কুল। জানি না, কেন পাশের কলোনীর ছেলেরা একে বলে পাঠশালা। চন্দ্রদীপ শেখরের সহপাঠী। প্রথম শ্রেণী থেকে তারা একসঙ্গে পড়াশোনা করছে। এখন সপ্তম শ্রেণীতে আছে।

চন্দ্রদীপের গায়ের রঙ কালো, কাঁচা-পাকা দাড়ি, যে-দাড়ি সে সপ্তাহে একবার করে কামায়। ভবানীপুরে চা-জলখাবারের দোকান আছে। হোটেলটাকে ও-ই দেখাশোনা করে—সামলায়। চার-চারটি কন্যা সন্তান আছে। বয়সের তুলনায় ওর স্ত্রী বেশ বুড়িয়ে গিয়েছে। ভাবী বলতে একটু বাধো-বাধো ঠেকে।…

ইস্কুলের টিফিনের সময়ে বা ছুটিতে ও সবাইকে খুব খাওয়ায়—ছুটকো, চুরমুর, ইডলি এবং চানাচুর। দোকানে বসে, কাঁচা পয়সা, তাই·· ইস্কুল থেকে সোজা দোকানে যেতে হয়, বিক্রি-টিক্রির তো এই সময়।

'তুই বাড়িতে ফিরে কি করিস…শেখর ?'

'কি আর করব…মাঠে যাই, খেলি, আর আটটা বাজতে না-বাজতে মাস্টার মশায় আসেন।'

ঠিক তখনই রান্নাঘরে ওদের কথাবার্তার মধ্যে যোগ দেয়। রান্নাঘরের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, ইস্কুলের সব মাস্টার ওকে চেনে, ও স্যারদের সঙ্গে সিগারেট খায়, খৈনি খায়। ইস্কুলের কাছেই লোহা-লক্কড়ের দোকান, সুযোগ পেলেই বলবে, আজমগড়ে চারটি বড়ো জাত আছে—লোহার, বরমপয়াল, সোনার এবং জয়সওয়াল। ওকে আমি কখনও ফুলপ্যান্ট পরতে দেখিনি, হামেশাই নীল লুঙ্গি এবং গেঞ্জি পরে থাকে। ও হামেশাই মনে করে ট্যাক্সি ড্রাইভারের বান্ধা সবচেয়ে ভালো।

'আজকে হাফ টাইমে আমি চলে যাব, দোকান খুলতে হবে, বাবা বাড়িতে গিয়েছেন।'

'তুই বাড়িতে ফিরে কি করিস রে…শেখর ?'

'আ…আ…মি…রিক্সা চালাই।'

—'টানা রিক্সা ?'

'হাঁ, ঐখানে, আমাদের মোড়ে যে স্টাণ্ড আছে।'

'খুব পরিশ্রম হয় না?'

'এমন কি পরিশ্রম···আমি দু-একটা টিপ করি। চৌরাস্তা থেকে দাঁড়ি, দাঁড়ি থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত, বেশি কাজ কে করবে?'

রামাসরে সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে বলে, 'পুলে উঠতে বেশ পরিশ্রম হয়, না?'

চনরদীপ একটু ঠেস দিয়ে বলল, 'ওঠার চাইতে নামায় সময় বেশি কষ্ট হয়।'

'হাঁ,···তুই ঠিক বলেছিস, ব্রেক নেই, রিক্সায় পুরো লোডকে পা দিয়ে থামাতে হয়···'

ওরা যখন একটু সময়-সুযোগ পায়, তখন শেখর, রামাসরে এবং চনরদীপ রিক্সা লোহা-লক্কড় এবং হোটেল নিয়ে গল্প করে···

শিক্ষক : 'হোমওয়ার্ক কেন করিসনি?'

রবি : 'স্যার, সময় পাইনি।'

শিক্ষক : 'কেন?'

রবি : 'মা-র শরীর খারাপ ছিল, মাকে সেবাশুশ্রূষা করতে হয়েছিল।'

শিক্ষক : 'মহাত্মা গান্ধী···বেঞ্চের ওপর দাঁড়া, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাক···আর শোন, ওদিকে সিনেমা হলের দিকে নয়, পেট্রোল পাম্পের দিকে···

'···হাঁ, কোন্ চ্যাপ্টার ছিল, জাজমেন্ট সিট অফ্ বিক্রমাদিত্য।'

শেখর : 'তোর মা-র শরীর সত্যিসত্যি খারাপ ছিল?'

রবি : 'তাহলে কি আমি মিথ্যে বলেছি?'

রবি আমতলায় থাকে, কাঠের একটা ছোট্ট-খাটো গোলা আছে। বাবা মারা যাওয়ার পরে, দু'ভাই মিলে দোকানটাকে ধরে রেখেছে। কখনও তিন-চার বছরে ওদিকে একবার যায়। প্রতিবারই আবার মা-র সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করে দেয়া হয়।

রবি : মা এ হচ্ছে শেখর, মনে পড়ছে?

মা : কেন মনে থাকবে না, এখানে পড়াতে আসত না? ঈশ্বর, রামেও আর ও আসত···

আর মা, মা-র মতো কথা বলতেন।

আর ব্যাপারটা হচ্ছে, শেখর কোনদিন রবিদের বাড়িতে পড়তে যায়নি, তাছাড়া ও কোনো রামেও কোনো ঈশ্বরকে চেনে না।

কিন্তু মা-র কথায় সায় দিয়ে ও এমনভাবে মাথা দোলাত, যেন সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনার একটা ছবি ওর সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠত···

তবে কি মা মিথ্যে বলছেন?

—মিথ্যে কেন বলবেন?

আবার স্মৃতিভ্রম?

না তাই বা কেন, স্বাস্থ্য শরীর-স্বগত সবই ঠিক আছে, সাধনী মহিলা, তাহলে নিশ্চয়ই ভুল বলছেন···?

মা ভুল বলতে পারেন না। এ-ব্যাপারে সামান্যতম যখন প্রশ্ন উঠেছে, তখন অন্যান্য ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই···

এমনও তো হতে পারে শেখরের মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত কথাগুলি মুছে গিয়েছে, বিশটি বছর তো বিশটি বছরই।

অনিল শেখরের চেয়ে চার বছরের ছোট। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দু'জনে ইস্কুল থেকে একসঙ্গে ফেরে। মাঝ পথে অনিলের বাড়ি, ইস্কুল থেকে এক কিলোমিটার দূরে। আর সেখান থেকে শেখরকে আরও আধ কিলোমিটার পথ যেতে হয়।

অনিল : 'গতকাল আমাদের পাড়ায় পতৌদি এসেছিল। আমাদের প্রতিবেশী কড়কর আঙ্কেল আছে না, তিনিও তো টেস্ট ম্যাচ খেলতেন। জানো, তিনি ব্রাডম্যানকে ছিয়াত্তে আউট করেছিলেন। কখনও কলকাতায় ম্যাচ হলে সমস্ত ক্রিকেটাররা ওঁর বাড়িতে আসে।'

তৃতীয় দিন ইস্কুল থেকে ফেরার সময় অনিল শেখরকে ব্যানকনিতে দাঁড়ানো আঙ্কেলকে দেখাল। ব্রিটিশ ক্রিকেটারদের ব্লাক এ্যাণ্ড হোয়াইট ছবির সাথে হুবহু মিলে যায়, কিন্তু পুরোমাত্রায় হিন্দুস্তানী।

শেখর : 'অনিল তুমি জানো, লতা মুঙ্গেশকর আমাদের পাড়ার ইস্কুলে প্রতিদিন আসে।

অনিল : লতা মুঙ্গেশকর ইস্কুলে কেন আসে?

শেখর : 'পড়াতে। ওখানকার টিচার, গার্লস সেকশনের। কাল সকালে আমাদের বাড়িতে এসো, তোমাকে দেখাব, তারপর একসঙ্গে ইস্কুলে যাব।'

ভোরে অনিল শেখরের বাড়িতে এলো। শেখরকে একটু বিচলিত মনে হলো। কিন্তু ও সাহস হারায়নি।

শেখর : চল বাইরে গিয়ে দাঁড়াই, ও এখনই আসবে।

অনিল : স্থির দৃষ্টিতে গলির দিকে তাকিয়ে রইল। শেখর ওর নজর বাঁচিয়ে ওকে দেখছিল!

শেষ পর্যন্ত লতা মুঙ্গেশকর গার্লস ইস্কুলের গেট দিয়ে বেরুল।

অনিল একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, 'হাঁ বন্ধু।'

লতা মুঙ্গেশকর ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল, রাস্তা পার হয়ে মিলিয়ে গেল।

অনিল : 'ওতো সিম্পল, তাই না!'

শেখর : হাঁ···হাঁ চল, ইস্কুলে যাই, দেরি হয়ে গিয়েছে। কাউকে বলিস না।

ষষ্ঠম শ্রেণীতে গরমের ছুটির আগে স্যার ঘোষণা করলেন—'প্রত্যেকে একটি করে প্রবন্ধ লিখে আনবে। যদি কেউ ছুটিতে কোথাও যাও, তবে পুরো বিবরণ, প্রমুখ প্রসঙ্গ এবং ঘটনা লিখবে। নিজের মন থেকে···যেমনভাবে বুঝেছ, তেমনি লিখবে।'

এঁর মতো জনপ্রিয় টিচার ইস্কুলে আর কেউ নেই। ইংলিশ ম্যাথ—দুটোতেই সুপরব, তেমনি আমাদের ভূগোল পড়ান। উনি আমার প্রিয়, তার অনেক কারণ আছে, তার একটি কারণ, আমরা দু'জনেই সিংহ। তিনিও আমাকে খুব ভালোবাসতেন। গত মাসে রামাসরে বলে, উনি রাজপুত ছিলেন না, লোহার ছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পরে ও শ্মশানযাত্রী ছিল, দু-জন একই জাতের।

তবে কি আমি ওকে যেভাবে জানতাম, তা হলে কি উনি আমাকে লোহার বলে জানতেন?

—না, তা কি করে সম্ভব। ওঁর মতো বিদ্বান মানুষ এমন ভুল নিশ্চয়ই করবেন না।

···যাইহোক, প্রসঙ্গ ছিল প্রবন্ধ লেখার প্রতিযোগিতা।

আমি তো ছুটিতে কোথাও যাইনি। আমাদের কোনো গ্রাম নেই, যেখানে আমি যেতে পারি। সবাই তো কলকাতায় থাকে। গ্রাম বলতে এক তিন অক্ষরের ঠিকানা আছে, যে-নাম বাপদাদারা কখনও কদাচিৎ উচ্চারণ

করে জীবন্ত রাখতেন।

সামনের লেক্চি .স্টার থেকে আমি একটি রদ্দি বই—.রেলওয়ে টাইম টেবল—এ্যাট এ গ্লান্স পাই। সেই বইয়ের সাহায্য নিয়ে স্টেশনের বিবরণ দিয়ে আমি এক ভ্রমণ কাহিনী লিখে ফেললাম। হাতের লেখা আমার চিরদিনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অর্ধেক তো এতেই জয় করা যায়—ইস্কুলের পড়াশোনায়। বাকি অর্ধেকটা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতেই পারিনি। স্যার, মানে, আর টি. সিংহের কাছে আমার প্রবন্ধটি খুব অথনটিক মনে হয়।

'রিয়ল…'

আমার প্রবন্ধটিকে উনি খুব প্রশংসা করেন। আমি যেমন চেয়েছিলাম, প্রবন্ধটি ঠিক তেমনি হয়েছে…রিয়ল বিবরণ. টাইম পর্যন্ত।

ক্লাসের পর আমি স্যারকে বলি, স্যার, এ-জায়গায় আমি কখনও যাইনি। বিয়ের কথা আমি মা-র কাছে শুনেছি, মামার বিয়ে, সে তো দশ বছর আগেকার কথা।

স্যার : কিন্তু ঐ স্টেশন, রুট, টাইম।

স্যার, এ হচ্ছে ইস্টার্ন রেলওয়ে—এ্যাট এ গ্লান্স।

স্যার : 'বাঃ, কি সুন্দর…তবে তো আরও ভালো।' তারপর তিনি সমস্ত টিচারদের সঙ্গে ডিসকাশন করতে থাকেন, হাসতে থাকেন চুলে হাত বুলোতে থাকেন।

আজ দশ বছর ধরে শেখর সাংবাদিকতা করছে। কিন্তু রিপোর্টিংয়ে সাহসী এবং প্রাজ্ঞ। কাহিনী প্রেস ক্লাব, কফি হাউসের তরুণদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। বই পড়তেও খুব ভালোবাসে। এখন কি তেমনি পড়ার সময় পায়, কে জানে! কিন্তু বই কেনার শখ এখনও ওর তেমনি সজীব আছে।

ওর লেখালেখি অনেকদিন ধরে কারও চোখে পড়ছে না। ও আগে টাইপরাইটারে লিখত। এখন কমপিউটারে লেখে। মেকিনটানে নোট নেয়, থিংক প্যাডে ভাবে। লেখার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সিনকে ভিজুয়ালাইজ করে।

ওর লাইব্রেরিতে সামুয়েল বেকেট…হারিও ফো…ব্রেখট, আয়ন র‍্যাণ্ড থেকে শুরু করে মুকুল কেশওন পর্যন্ত সব কিছু আছে·

সম্প্রতি ও সিরিয়াস কিছু লিখবে বলে ভাবছে…সিরিয়াস ক্লাসিক রাইটিং…। □

রবীন্দ্রনাথ : শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে

অনুবাদ : জয়ন্ত সেন

অনেকদিন ধরেই অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা করার তীব্র ইচ্ছা মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল। এতদিনে তা পূর্ণ হোল। তাঁকে নিয়ে আমার যা চিন্তা ভাবনা তা আমার লেখায় অবশ্যই আসা উচিত।

পূর্বীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে (সৃষ্টির) শুরুতেই ছিল শব্দ। শব্দই ছিল সৃষ্টির মূলসূত্র। সময়ের বিবর্তনী নতুন যুগের হদিশ দেয় নি। শব্দই মানুষকে পূর্ণতা এনে দিয়েছে, দিয়েছে বাস্তবতার হদিশ

আমাদের শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সকল মহৎ বাণীর আদি ও অন্তে ওম্ শব্দটি আমরা পেয়েছি। এর অর্থ হোল সত্যের স্বয়ং স্বীকৃতি। এটিই হোল অসীম অনন্তের প্রশ্বাসধ্বনি।

মহৎ ভাবনা-সাগরে জোয়ারের প্রবল উচ্ছাস হিসেবে ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। নতুন যুগের সূচনা সম্ভব হয়েছিল ফ্রান্সের উৎপীড়িতের দল উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল বলে নয়, সম্ভব হয়েছিল সময়ের সূচনায় সেই শব্দের জন্য যা নৈতিক মুক্তির সূচক ছিল সমস্ত মনুষ্যকুলের কাছে।

মাজিনি আর গ্যারিবল্ডি ইটালীতে নবযুগের সূচনা করেছিলেন—তা সম্ভব হয়েছিল যাহাতঃ রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের সুবাদে নয়—সম্ভব হয়েছিল তাঁদের মুখনিঃসৃত শব্দের সুবাদে, যা বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এক সৃজনশীল সত্তাকে। গাঢ় অন্ধকারে স্পর্শানুভূতি মানুষকে সেই জিনিসেরই হদিশ এনে দেয় যার নাগাল সে পায় প্রত্যক্ষভাবে—এবং এই অনুভূতি একান্তই তার নিজস্ব অনুভূতি। কিন্তু সূর্যকিরণ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে হদিশ দেয় তা প্রত্যেকের, প্রতিজনের—একার কারুর নয়। এই আলোকবর্তিকাই হোল শব্দের আসল প্রতীক।

একদিন বিজ্ঞান পশ্চিম জগতে এনেছিল যুগান্তর—তা শুধু প্রকৃতির রহস্যভেদ করে নয়—মানুষের অন্তরে সমস্ত জগতের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিতির সূত্র নির্দেশ করে—প্রতিটি ঘটনার পশ্চাদ্‌পটে যে সত্য তার হদিশ নির্দেশ করে—প্রতিটি ঘটনার পশ্চাদ্‌পটে যে সত্য তার হদিশ নির্দেশ করে। এই সত্যের বলেই মানুষ সব রকমের উৎপীড়ন এমন কি মৃত্যুকেও অগ্রাহ্য করার শক্তি সঞ্চয় করে। যাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের হাল হকিকত জানেন তাদের জানা আছে কিভাবে বিজ্ঞান আমাদের নতুন সময়ের সিংহদুয়ার খুলে দিয়েছে—আবৃত জ্ঞানের সাহায্যে আমরা একের পর এক সত্যকে অনুধাবন করে 'সৃষ্টি'র সত্যকে সমুজ্জ্বল হতে দেখি।

প্রাচীন ভারতে সৃষ্টির আদি পর্বে বহুবিধ আনুষ্ঠানিক আচার-বিচারের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্ম জ্ঞানের হদিশ পাওয়ার প্রক্রিয়া চালু ছিল। আত্মাকে সুপ্তোত্থিত করে তার অন্তর্হীন ঐশ্বর্যে যে জ্ঞান আবৃত হয়েছিল তাতে মানুষ জেনেছিল সেই শুধুমাত্র বাঁচার মত বাঁচে যে অনন্তের আশ্রয় পায়। সে যুগের অন্তরের বাণী ছিল এটাই—যার সারমর্ম হোল "যারা সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম তারাই অমরত্বের অনুধাবনে সক্ষম।"

বৌদ্ধ যুগে এরকম এক শব্দ বার্তাবাহী হিসাবে আসতে দেখা দিয়েছিল। সে বার্তা ছিল অন্তহীন ভালোবাসা আর আত্মত্যাগের বার্তা। মানুষের নৈতিকতার সুষম বিকাশের ক্ষেত্রে যে আদর্শের প্রতি তার ইঙ্গিত ছিল তা মানুষকে দিয়েছিল নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার শিক্ষা।

ঐ পথ হচ্ছে মানবিক আচার আচরণে অন্তরের ঐশ্বর্যরাজি বিকশিত করার পথ। প্রকৃতি প্রাণী মাত্রকেই তার প্রাণধারণের কাজে দৈনন্দিন নিয়ন্ত্রণে রাখে। ঐ পথই মানুষকে সব রকম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে জীবনের মহত্তর স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আত্ম চিন্তা, স্বার্থপরতার জন্য ক্ষীয়মান আলোয়—কিন্তু মানুষ কখনোই অন্ধকারের জীব নয়।

সময়ান্তরে উপায় মানুষকে খুঁজে বের করতেই হবে তার মহত্বের পরিচয় দিয়ে যাতে সে সার্বিক মুক্তি লাভ করতে পারে। সব সময় নতুন করে আমরা অনুভব করি—আমাদের মধ্যে এমন মানুষ আছেন যিনি মহাত্মা পদবাচ্য—যিনি আচারে-বিচারে অন্যকে যথার্থ জীবন যাপনের পথ দেখান। যুক্তিনির্ভর বৌদ্ধিক বিচার শুধু নয়—শুভ ইচ্ছা যা পরিকল্পনার সাহায্য করে, কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তাও শুধু নয়, ঐ মহাত্মার মহৎ জীবন যা সর্বতোভাবে সেই সর্বব্যাপ্ত "ওম" পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা চিরকালের ঐতিহ্যবাহক বলে চিহ্নিত তাইই পথ দেখাতে সক্ষম।

আশেপাশের আত্মপ্রবঞ্চক আধ্যাত্মিকতাবে ঠগ, আত্মগরে স্ফীত মানুষদের দেখে মনে হয় মানুষকে তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অনর্থকনীয় বর্বর হিসেবে কালাতিপাত করে যেতে হবে—মনে হয় আমাদের মূল্যবোধও মূল্যায়িত হবে বাজারের কেনাবেচার হিসেবেই। আর তখনই পূর্বোক্ত ঐরকম মহাত্মার দর্শন পাবার ইচ্ছা ক্রমেই ঘনীভূত হয়।

আজ যখন সত্য প্রতিনিয়ত অবদমিত হচ্ছে, যেন তেন প্রকারেণ তৎক্ষণি কিছু পাবার প্রবৃত্তির কাছে আমরা তখন নিজেদেরই হারিয়ে ফেলি। অস্থিরতা আমাদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না—যা হোক করে কিছু পাবার বা আদায় করে নেওয়ার মনোভাব উচিত ও নৈতিকতাকে ঘুরে ঠেলছে প্রতিমুহূর্তে। আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাশা তার নিজস্ব স্বাভাবিক পথ সংকীর্ণ করে তুলছে—কেননা পথ পেরোলেই সিদ্ধি—এই ভাবনা আমাদের পেয়ে বসেছে। কিন্তু সত্য সত্যই—পাপড়ি মেলা ফুলের মত তার স্বাভাবিক নম্রতাতেই সে বিরাজ করছে। উপযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা আর তার ভালোবাসার আর্তি নিয়ে থাকে না—চলে যায় অন্তাচলে উপযোগের সব দাবীকে অগ্রাহ্য করে। রামায়ণের রামচন্দ্র দীর্ঘকাল ক্লেশকর বনজীবন অতিক্রান্ত করার পর উপলব্ধি করলেন যে নিগ্রহ যাতনা সহ্য করে সীতা, তার কষ্টের সাথী, হয়তো বা তাঁর প্রতি আর একনিষ্ঠ নেই। যা হতে পারতো সীতার একনিষ্ঠতার চরম প্রমাণ, ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে প্রমাণিত সত্য সেই ক্লেশ-ক্লিষ্ট অভিজ্ঞতার সব আবেদনই বাতিল হোল। রাজনৈতিক চালে অযোধ্যায় ফিরে রাম সীতাকে বললেন চট-জলদি সতীত্বের প্রমাণ দিতে। অগ্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে। সীতা অস্বীকার করলেন—কেননা তিনি বুঝেছিলেন যে এই পরীক্ষা সত্যকেই অপমান করবে—বাস্তবতার মূল্যায়ন এতে হবে না। তিনি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলেন।

একটি প্রাচীন বাংলা কবিতার প্রথম লাইনটি প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে। বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর সংগৃহীত অমূল্য রচনা-ভাণ্ডার থেকে এটি আমাকে যোগান দিয়েছিলেন। এটি অনেকটা এই রকম—(মূল বাংলার রবীন্দ্রকৃত ইংরাজী তর্জমা) :

"O cruel man of urgent needs Must thou in thy haste scorch by fire the mind that is still in bud?"

অপরিণত মনে 'যথার্থ' কি তার স্বরূপ কি ও কেমন, তার হদিশ পাওয়া সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এক্ষেত্রে নিষ্ঠুর ব্যগ্রতা দাবী করে বসলো তাৎক্ষণিক প্রমাণের—তখন খোদ মনটাই হারিয়ে গেল। সমবেত মনুষ্যকুল পরীক্ষার চোখ ধাঁধানো আয়োজনের তারিফ করলো। আমরা যখন সর্বত্র দেখি এ হেন মননের উগ্র প্রকাশ তার

রথের চাকায় কি ভাবে সত্যকে বেঁধে ধূলি মলিন পথ বেয়ে লক্ষ্যস্থলে তড়িঘড়ি পৌঁছাতে চেষ্টা করছে—তখনই আমরা বুঝতে পারি এ ধরনের অপ্রতর্কী প্রচেষ্টা সফল হবে না। যিনি স্থিতধি, যিনি নিজের বিশ্বাসের প্রতি একনিষ্ঠ ও অবিচল তাঁর পক্ষেই 'তাড়া' কে এড়ানো সম্ভব—তিনিই পারেন তাৎক্ষণিকতার মায়াজাল ছিন্ন করতে, পারেন সংখ্যার সম্মোহন থেকে মুক্ত থাকতে।

মানবিকতার গাম্ভীর্য অনুধাবনে আজ এমন একজন প্রাজ্ঞসুন্দর মানুষের প্রয়োজন যিনি পূর্ণ মানবিক ধর্ম সম্পর্কে প্রচার ও ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখেন। একথা সত্য যে মানুষ বড় সহজ প্রাণী নয়—কেননা তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে পশুনাতীত নানা বস্তু সমন্বয়ে—যার বহুমুখীতা হিসাবে আসে না। তবু এটা বোধহয় সম্ভব—তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে সমাজের উপযোগী করে সহজ ও সরল পথে অভ্যাসে পরিণত করে দেওয়া। কিন্তু একথা মনে রাখতেই হবে যে মানুষ মাত্রেই জটিল সত্তা—সমকোতা ব্যতিরেকে তার সমস্যাগুলিকে মেটানো সম্ভব নয়। মানিয়ে নিতে না শিখলে এই সমস্যাগুলিই যথার্থ মানবিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়—ক্ষুদ্রতার আবর্তে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অর্থহীন আচার আচরণ, ভাবনাচিন্তা মন থেকে দূর না করতে শিখলে, নিবেদনের আর্তি না থাকলে ওপরওয়ালার কাছে যে প্রার্থনাই করিনা কেন তা অর্থহীন হয়ে যাবে। প্রার্থনা সহজ ও সরল হতে হবে নইলে অচিরেই তা রীতিসর্বস্ব যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে। তিলকে ধর্মের চাকা ঘোরানোর ধর্মীয় রীতি ঐ যান্ত্রিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই পদ্ধতির বিকল্প যা হতে পারে সদর্থকভাবে তা অনুসরণ করলে কর্মসঙ্কটের সুরাহা হয়—কর্মীর ইতিবাচক ভূমিকা দৃষ্ট হয়। যেসব শিক্ষক যান্ত্রিকভাবে ছাত্রদের পরীক্ষা—বৈতরণী পার করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পারদর্শী তারা জানেন শিক্ষণ পদ্ধতিকে কিভাবে মুখস্থ নির্ভর করে ছাত্রদের সহজাত জানার প্রবৃত্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়। এই নিষ্ঠুরতা আমায় ব্যথীত করে—আমি জানি এতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। হাল আমলের রাজনীতি এ জগতে অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে—যেখানে উচিত তরল মনন মানস নৈতিকতার কোন ধার ধারে না—রাজনীতি যাদের অভ্যাস তারা তাদের চিন্তা, প্রয়োগে ও অনুধাবনে নৈতিকতাকে সর্বোতোভাবে পরিহার করে চলেছে। যান্ত্রিক-শিল্পায়নও সহজগামীতাকে দোসর করে যে পথে এগোচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যা কিছু শোভন ও সুন্দর তা পরিহার করাই তার ধর্ম। অপর পক্ষে উৎপাদনের আদিম প্রক্রিয়া অতিরিক্ত তরল ও সরল থাকার পথকে বেছে নিয়ে বিজ্ঞান ও সমাজের দাবী অগ্রাহ্য করে প্রতর্কী মানবিকতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে। আমরা আমাদের প্রকৃত শিক্ষককে তাঁরই মধ্যে খুঁজে পাই যিনি আমাদের আত্মাকে সর্বনিম্ন অবস্থান থেকে উচ্চমার্গে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন—যিনি জ্ঞানে ও অনুশীলনে বিকাশের পূর্ণ চিত্রটি তুলে ধরেন। মনুষ্যত্বের জীব বিশ্বচরাচরে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে যে তরল সরলতায় তা যেন অশান্ত জলস্রোতে ভেসে থাকা দোঁহে বাঁধা কলাগাছের ভেলা। কিন্তু মানুষ জল স্থল ও অন্তরীক্ষে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জ্ঞানে ও অনুশীলনে এমন এক নৌকার হদিশ পেয়েছে যার হাল পালে নোঙরের ধর্ম তার অজানা নেই। এ নৌকায় ভেসে থাকার সূত্রটি সে যেমেছে বিজ্ঞানের কাছ থেকে—সে এটি সঙ্গে নিয়েছে বিজ্ঞানের এ সূত্র মাথায় রেখেই। এর জন্য তার সাধনা ছিল অসংখ্য পরীক্ষা ও নিরীক্ষার—আর ছিল তার সহজাত নন্দন জ্ঞান ও বোধ। যৌক্তিক চেতনা সবরকমের প্রতিবন্ধকতা থেকে মানুষকে তার অন্তরের মেলবন্ধ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে শেখায়। কায়মনোবাক্য এবং অবশ্যই তার যৌক্তিক শক্তিবে মানুষ মানুষই—অন্য জীবেদের থেকে স্বতন্ত্র। আত্মার বিকাশ এগুলিকে জাগরিত করেই সম্ভব। আত্মার অর্থও এই সুষম বিকাশের পটপ্রেক্ষাতেই সুসহ।

এই সব চিন্তা যখন মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল—ফরাসি ঈষারে, আমি পণ্ডিচেরী গিয়ে পৌঁছলাম। অরবিন্দের দর্শনলাভ আমার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম দর্শনেই মনে হোল আত্মার হদিশ পেতে তিনি ব্যাকুল ছিলেন—এবং হদিশ তিনি পেয়েছেন। অনুভব ও অনুভূতির জন্য যে সুদীর্ঘ পথ তাঁকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে—যা ছিল তাঁর সাধনার লক্ষ্য সেই বৌদ্ধিক জ্ঞান লাভ করে মনে হচ্ছে তিনি নিজের মধ্যে এমন এক শক্তি অর্জন করেছেন যা অন্যকে উদ্দীপিত করতে পারে। তাঁর মুখমণ্ডল যেন কোন এক জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—তাঁর শান্ত সমাহিত চেহারার স্থানে অবস্থান রেখে মনে হোল—আত্মা তাঁর নিপীড়িত নয়, কোন নিষ্ঠুর আচার বিধিতে বাঁধা নয়—বরং নিপীড়িতকে আলো দেখাতে সক্ষম। আমি স্থির নিশ্চিত ওঁর শিক্ষা কোন ইউরোপীয় গুরু মানুষের কাছে হয় নি।

আমার মনে পড়লো পুরাকালের সেই ঋষির কথা যিনি মানবাত্মার শৃঙ্খলহীনতার কথা ঘোষণা করে বলেছিলেন "তার গতি সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে।" আমি তাঁকে বললাম "শব্দগুলি আপনার জানা—আমরা এসেছি তা জানতে—আমরা অপেক্ষায় আছি। আপনার কণ্ঠে ভারতবর্ষ কথা বলবে। এ দেশ বলবে 'এই তো আমি এই'।"

শকুন্তলা তার আদি বনগৃহে যৌবনের উজ্জ্বলতায় জীবনের প্রথম বোধে চোখ খুলেছিল। পরের জীবনে আশ্রমগৃহে জীবনের চরম বোধ অনুভব করেছিল। কয়েক বছর আগে আমি অরবিন্দকে দেখেছিলাম যৌবনের রসে সিক্ত বীরের বেশে। তখন আমি গেয়েছিলাম—

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"

আজ তাঁকে দেখলেম জ্ঞানে মূর্তিতে দীপ্তিতে আরো গভীরতায়। মনে মনে আবার গাইলেম—

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

[Modern Review পত্রিকায় রচনাটি ১৯২০ সালে জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৯৬১ সালে পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে "Sri Aurobindo and Rabindra Nath Trgore" শীর্ষক যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও "Rabindranath on Sri Aurobindo' নামে এটি ছাপা হয়। ইংরাজি নিবন্ধটির মূলানুবাদ করেছেন শ্রীঅমল সেন।] □

দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে

হেরম্যান হেস
অনুবাদ—দিলীপ ঘোষ

দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে বলার মতন নতুন কোন কিছুই নেই। চাতুর্থেতরা ও যথার্থ যা কিছু বলার ছিল বহু আগেই সে সমস্ত বলা হয়ে গেছে। সেই সময়কালে নতুন ও উদ্ভাবনী যা, এখন তা মামুলী হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে বিপুল-সমাদৃত ও আতঙ্কজাগানো লেখকের ব্যক্তিত্ব মনে হয় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নতুন রহস্য ও প্রহেলিকায় আবৃত হয়ে উঠছে, যখনই আমরা কোন এক প্রয়োজনের বা গভীর ধ্যানের প্রহরে তাঁর কাছে এগিয়ে যাই।

সাধারণ, মানুষ যারা আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে আর রাসকল নিকভ সম্পর্কে পাঠ করে, এই অপরীরী জগত থেকে একটা আতঙ্ককর নিশ্বাসে পৌঁছন, এই লেখকের সত্যিকার পাঠক তারা নন, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী যিনি দস্তয়েভস্কির উপন্যাসগুলিতে নিহিত মনস্তত্ত্বের প্রশংসা করেন এবং প্রশংসাকর প্রবন্ধটি লেখেন লেখকের বিষয়টি সম্পর্কে, তিনিও বেশি কিছু নন। দস্তয়েভস্কি পাঠের সময় হোল যখন আমরা দুর্দশাগ্রস্ত, আমরা যখন সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছি আর অনুভব করি যে জীবনের সমগ্রতা রয়েছে একটা অবিভাজ্য যন্ত্রণাদায়ী ক্ষতে, আমরা যখন হতাশার জীবন কাটাই, এবং হতাশাকর মরণে মরে গেছি। দুর্দশার ভারে বঞ্চিত, ক্ষুব্ধ, এবং কোনমতেই জীবনকে তার উষ্ণতা, সুন্দর নিষ্ঠুরতায় বুকে উঠতে পারি না, তাকে নিয়ে বাঁচবার আর কোন আশা ব্যক্ত করি না, দূর থেকে জীবনের প্রতি দৃকপাত করি, তখনই আমরা এই ভয়ঙ্কর ও অতীবসুন্দর লেখার সঙ্গীতের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। আমরা তখন আর কোনমতেই দর্শক নই, কোন মতেই অতি খুঁত খুঁতে এবং বিচারক নই, আমরাও দস্তয়েভস্কি সৃষ্ট বেচারা শয়তানদের মধ্যে সমগোত্রীয় আত্মা। তখন আমরা তাদের দুঃখকষ্টে যন্ত্রণা ভোগ করি, এবং বিমূঢ়ভাবে, শ্বাসরুদ্ধ তাকিয়ে দেখি, তাদেরই সঙ্গে জীবনের উচ্ছৃঙ্খল হৈ-চৈ-এর দিকে, চিরকাল দুর্দশাকারী মৃত্যু-যন্ত্রের দিকে। একই সঙ্গে কিন্তু আমরা দস্তয়েভস্কির সঙ্গীতেরও সাক্ষাৎ পেয়ে যাই, তার সান্ত্বনা, তার ভালোবাসা। আর তখনই আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করি তার ভয়ঙ্করী এবং মাঝেমধ্যে তেমনই নায়কীয় জগতের।

দস্তয়েভস্কি সৃষ্ট উপন্যাসের মধ্যে দুটি শক্তি আমাদের আচ্ছন্ন করে। দুটি উপাদান ও বিপরীত মেরুদ্বয়ের পর্যায়ানবৃত্ত ও বৈপরীত্যের মধ্য থেকে জন্ম নেয় পুরাণ-প্রতিম গভীরতা এবং তার সঙ্গীতের বিপুল বিস্তৃতি।

একটি হোল হতাশা, অন্তহীন ভোগান্তি, নিষ্ঠুরতার কাছে সমর্পণ, ও অপ্রতিরোধ, রক্তক্ষয়ী কঠোরতা এবং সমগ্র মানব অস্তিত্বের দুর্বোধ্যতা। এই মৃত্যুকে অবশ্যই পার হতে হবে, অন্যটিকে দেখার আগে এই নরককে অবশ্যই পরিক্রমা করতে হবে, আর ঈশ্বরের স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর, সত্যিসত্যিই আমাদের কাছে পৌঁছতে পারে। আমাদের অস্তিত্ব ও মানবতা যে একটা দুর্দশাকর, অনিশ্চিত, এবং হয়তো হতাশ ব্যাপার এমন স্বীকৃতি জানানোর অকপটতা ও সুলভতা। অবশ্যই আমরা নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ করি যন্ত্রণাভোগের কাছে, আত্মসমর্পণ করি মৃত্যুর কাছে, আমাদের অস্তিপোলক দুটি দৃঢ় হয়ে উঠবে অসংবৃতের প্রতি, নগ্ন-বাস্তবতার দানবীয় তেজচাহনির প্রতি, সেই দ্বিতীয় অর্থাৎ সেই অন্য কণ্ঠস্বরের গভীরতা ও সত্য উপলব্ধি করতে পারার আগে।

প্রথম কণ্ঠস্বরটির প্রত্যয়ী ঘোষণা ব্যক্ত করে মৃত্যুর, আশাকে নাকচ করে দেয়, যাদের সঙ্গে আমরা অত্যন্ত সেই হরেক

যৌক্তিক ও কাব্যিক পূর্বানুগামিতা ও পুনরুত্থানকে অনুমতিদানের ক্ষেত্রে, সাধারণভাবে কবিদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সান্ত্বনাদানের জন্য আর আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য, মানব অস্তিত্বের বিপদ ও নায়কীয়তা বোঝানোর জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি, এই লেখকার সত্যিকার স্বর্গীয় দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটি আমাদেরকে দর্শন করায়, তার অন্তপার্থের স্বর্গীয় দিকটিকে, মৃত্যুর থেকে ভিন্ন একটি উপাদান, ভিন্ন একটি বাস্তবতা, ভিন্ন কোন এক স্বতন্ত্র সত্তা—মানুষের বিবেক। মানবজীবন হোক না গোটাটাই কেবল সংগ্রামে ও যন্ত্রণাভোগ, নীচুতা ও আতঙ্কের—সেই সাথেই অন্য একটা কিছুও রয়েছে, মানুষের বিবেক,ঈশ্বরের বৈপরীত্যে নিজেকে স্থাপন করার যোগ্যতা। কোন সন্দেহই নেই যে বিবেকই আমাদের নিয়ে যায় যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু-ভয়ের মধ্য দিয়ে, দুর্দশা ও অপরাধবোধের মধ্য দিয়ে, তবুও এটি আমাদেরকে চালিত করে অসহনীয় একাকীত্বের অর্থহীনতার মধ্য থেকে এবং পৌঁছে দেয় অর্থময়তার সংস্পর্শে, সত্তার সঙ্গে, অবিনশ্বরতার সংস্পর্শে। বিবেকের কোনই সম্পর্ক নেই নৈতিকতার সাথে, আইন কানুনের সাথেও কোনও, সত্যি সত্যিই তাদের মধ্যে চলে মরীয়া বিরোধীতা, এটি চলতে থাকে, এই বিরোধিতাটি বিশ্বাস রকমের প্রবল, এটি আত্মের শক্তির থেকেও জোরালো, আত্মস্বার্থের থেকেও শক্তিশালী, অসার অহংকের চাইতে প্রবল-প্রতাপ, বিভ্রান্তির সর্বশেষ মাত্রায় রয়েছে তেমন কোন মানুষের কাছে। এই বিবেক সবসময়েই একটা সংকীর্ণ মুক্ত দরজা দেখাতে পারে, মৃত্যুর কাছে সমর্পিত এই জগতে প্রত্যাবর্তনের জন্য নয় বরং এটির পরপারে। এর থেকে দূরে ঈশ্বরের কাছে। মানুষ যা চালিত করে নেয় নিজের বিবেকে কঠিন, সেই পথ। বেশির ভাগ মানুষ সর্বদাই বিবেকের বিপরীতে জীবন কাটায়, একে তারা প্রতিহত করে। যতক্ষণ না তারা স্বাধীনতা বিবেকের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়, তারা বেশি ভারগ্রস্ত হয়, নেমে যেতে থাকে। কিন্তু সদাই, সর্বক্ষণই, দুঃখযন্ত্রণা ও হতাশার ঊর্ধ্বে খোলা রয়েছে শান্ত পথ, যেটি জীবনকে অর্থপূর্ণ আর মৃত্যুকে সহজ করে তোলে। কিছু কিছু মানুষকে উন্মত্তভাবে বিবেকের বিরুদ্ধে পাপকর্ম করে চলতে হয়, যতক্ষণ না তারা নরকের সমস্ত অভিজ্ঞতা নিজেদেরকে পঙ্কিল না করে তোলে, সমস্ত প্রকার আতঙ্কের তারে, যথার্থ অর্থেই শেষ পর্যন্ত মুক্তির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ভ্রান্তিকে চিনে উঠতে, এবং রূপান্তরের সেই প্রহরটির অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। অন্যেরা বেঁচে থাকে নিজেদের বিবেকের সঙ্গে পরিপূর্ণ বন্ধুত্বে, বিরলমুখী এবং পবিত্র মানুষ, আর তাদের জীবনে যাই-ই ঘটুক না কেন সেসবই তাদেরকে নিছক বহিরঙ্গে স্পর্শ করে যায়। হাসি তাদের মুখ থেকে কখনোই মিলিয়ে যায় না। এমনই একজন হচ্ছে কুলশীল মিশকিন।

এই কণ্ঠস্বর দুটি, এদুটি শিক্ষা, শুনেছি আমি ধ্রুপদীতন্ত্রি থেকে, সেই সময়ে আমি যখন তার গ্রন্থগুলির মর্ম পাঠক ছিলাম, সেই সময়ে যখন হতাশা, এবং দুঃখ আমাকে প্রস্তুত করে তুলেছে। একজন সঙ্গীতকার আছেন, যাকে আমি অনুভব করতে পারি, একইভাবে, যাকে আমি সর্বদা পছন্দ করি না বা সব সময় তাকে শুনতেও চাই না। ঠিক তেমনই সর্বদা আমি ধ্রুপদীতন্ত্রি পাঠে কোনভাবেই পছন্দ করি না। তিনি বেঠোফেন। সুখ প্রাজ্ঞতা আর পরিপূর্ণ সমতিতে তিনি একই কাব্য জ্ঞানের অধিকারী, যাই ঘটুক না কেন, তার কিন্তু দেখা পাওয়া যাবে মন্থর পথযাত্রায়, ঈশ্বর ও আত্মাদের কাছাকাছি পথযাত্রাতেই যেন কেবল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। কেউই তার সাক্ষাৎ পাবে না হাসতে হাসতে বরং শুধু চোখের জল এবং ক্লান্তি ও দুঃখের মধ্যে। বেঠোফেনের ঐকতানবাদনে আর বাদ্যচতুষ্টয়ে এমন এমন মুহূর্ত রয়েছে বিশুদ্ধ দুঃখাবস্থা ও বিহ্বলতার কারণে কোন একটা বিষয় সীমাতীত ভাবে সংবেদ্য, চপল এবং দীপ্তিমান হয়ে পড়ে। একটা অর্থের আভাস, পরম মুক্তির বিষয়ে অবগতি ঘটে। এরকম অভিজ্ঞতাই আমি খুঁজে পাই, ধ্রুপদীতন্ত্রির মধ্যে। একই তারে। □

হৃদয়ারণ্য

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

[কবির লেখা হিন্দী কা-লোক যাত্রা নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে অনূদিত]

অনুবাদ : শ্রীচণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য

একদিন মৃদুমন্দ গায়াহ্ন সময়ে,
নিরজন বনভূমে উত্তান প্রাঙ্গনে,
আমিহু একাকী। গাঢ় অন্ধকারময়
সেই জনহীন স্থান ; নাহি কোনো রব,—
চতুর্দিকে নীরবতা শান্তি বিরাজিত
কেবল বিষাদ ম্লান নৈশ বিহঙ্গের
অস্ফুট বিলোল ধ্বনি, করিছে মণ্ডিত—
গভীরতা প্রকৃতির ; আর শুধু ঐ—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সদা যখন নিঃশ্বাসে—
সর্বত্র উদাস পবন ঘুরিয়া, বেড়ায়।
ক্রমে-ক্রমে অন্ধকার হলে ঘনীভূত,
চারিদিক ঢাকে নিঃশব্দ।

তরু, মূল, ফল, লতা শূন্য সমুদয়—
অসীম পুকুর বক্ষে তারকার মালা,
বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ অরণ্য মাঝারে,
গাঢ় কৃষ্ণ মেঘমুখে স্তম্ভিত—বিতানে
হলো ক্রমে তিরোহিত।
আমিও তখন শঙ্কাহীন পদক্ষেপে বসিলাম আসি
কবিপ্রিয় দীনযোগ্য তৃণের আসনে।
শুনিহু অনতিদূরে অনন্তের কোলে,
সঙ্গীতের প্রাণোন্মাদী মধুর নিক্কন বসিয়া বিরলে।
হেথা জীবন নদীর সৈকত পুলিনে।
পরে সুদূর-বিমানে,
দূর ক্ষিপ্ত যমুনার ঘোর গরজনে,—
শুদ্ধ স্থির হলো, সেই সংগীতের ধ্বনি—
আশার কিরণ হৃদে হোলো নিবাপিত।

কাক

প্রতিভা নন্দকুমার

অনুবাদ : রিক্তা বসু

পোষা কাকের মত রোজ এই সময় কাকটি আসে। খাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে বাইরে একটা থালায় রাখি। কাক সেটা খেতে আসে। পৃথিবীতে কাক না থাকলে সৌন্দর্য বিঘ্নিত হবে না। কাকের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার নিয়োগ-পত্রটা নেওয়া হবে কিনা জানিনা। একটা কাক দেখে সেটা পুরুষ না স্ত্রী সেটা বলার ক্ষমতা আমার নেই। আমি এটা আজই দেখছিনা, অনেকদিন ধরে দেখছি।

সেই মেয়েটা কনভেন্ট থেকে এসেছিল। ওর নাম কি ছিল ভুলেই গেছি। তিনটে কাক একসঙ্গে দেখলেই, "one for joy, two for boy, three for……," বলত। তবে সব কাক দেখলেই এই কথা বলতনা। গলা মোটা, খুব কালো রেবন দেখলে এই কথাটা বলত। প্রথমে আমিও এই কথাটা বলতাম শুধু আনন্দের আতিশয্যে। কিন্তু এখন কাক দেখলেই যে, "one for joy, two for boy" বলতে শুরু করি।

সেটা ছিল রাজেশ খান্নার জমানা। আমাদের কলেজের পাশে একটা বড় বটগাছ ছিল। সেই গাছে ছিল শত শত কাক তা সত্ত্বেও কিন্তু সেই "one for joy. two for boy" এর গাছ আমাদের মধ্যে ছিল। কাক বললেই মনে পড়ে আমাদের সেই দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের কথা। সেবার ভ্রমণের সঙ্গী ছিল অনেক মেয়ে এবং ছয়জন শিক্ষিকা। কন্যাকুমারিতে গিয়ে একটা মেয়ে একজন ম্যাডামকে কিছু অসম্মানজনক কথা বলে ফেলে। ম্যাডাম যতক্ষণ না ক্ষমা চায় ততক্ষণ জ্যোতি "আমি কিছু খাবনা" বলে জেদ ধরে বসল। ডানপিটে, জেদি জ্যোতি একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আমরা ওর হয়ে ক্ষমা চাইলাম বারবার। কিন্তু ম্যাডাম তার জেদে অটল। সমুদ্রতীরে যাওয়াটা বানচাল হয়ে যায় দেখে শেষ পর্যন্ত জ্যোতি মুখ ফিরিয়ে sorry madum বলল। সাথে সাথে একটা মেয়ে প্রায় দৌড়ে গিয়ে ম্যাডামের জন্য রুটি নিয়ে এল। আমরা বসেছিলাম বারান্দায়। মেয়েটি রুটি আনার সাথে সাথে একটা কাক ছোঁ মেরে নিয়ে গেল রুটির ঠোঙাটা। আমরা দৌড়ে গেলাম, সেই কাক কি রেবন কাক কিনা তা দেখার জন্য। যখন নিশ্চিত হলাম যে সেটি রেবন কাক তখন মহানন্দে "one for joy, two for boy" বলে গান গাইতে শুরু করলাম।

"সেই ডানপিটে জ্যোতির সঙ্গে তোমাকে দেখলে হাত পা বেঁধে পেটাব"—বাবা শাসিয়েছিল। কিন্তু ওর সঙ্গ আমি ছাড়তে পারব না। ওর পুরুষালি স্বভাব আমার খুব ভাল লাগত। কিন্তু একদিন ও বলেছিল, "এই, তোমার রবি না নীল রঙের শার্টটা পরলে দারুণ দেখায়। কথাটা কিন্তু আমার একেবারে ভাল লাগেনি। সেদিন বাড়িতে ফিরে রবির উপর রাগ করে বলেছিলাম—যুৎ ঐ নীল রঙের শার্টটা ফেলে দাও।"

কলেজের অন্তিমবর্ষের পরীক্ষার ফলাফল জেনে নিয়ে একটা ছবি দেখতে যাবো বলে বেরিয়ে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ একটা কাক জ্যোতির গায় পায়খানা করে দিল। ওর বয়ফ্রেণ্ড আসতে দশ মিনিট বাকী ছিল তখনও। কি করবে বুঝতে পারল না জ্যোতি। শেষে Ladeis Room এ গিয়ে ব্লাউজটা খুলে ভাল করে ধুয়ে বেরিয়ে এল। এরপর আমাদের চোখের সামনেই বয়ফ্রেণ্ডের বাইকে বসে কোমরটা পেঁচিয়ে

ধরে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে গেল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখছিলাম। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলাম কাকের আওয়াজে। ওগুলো ছিল জোড়া রেবন। আমরা সহসা "two for boy, two for boy" বলে চেঁচাতে লাগলাম।

আমি পাশ করেছি third class এ। চাকরি পাওয়া তাই দুষ্কর। M. A. পড়ার জন্য সিট পেলাম না। কেন? নেই। ঘুষ দেওয়ার জন্য টাকাও নেই। শোভার জন্য আমি টাইপে ভর্তি হলাম। কেননা শোভার মা বলেছিল জানকি টাইপে ভর্তি হলে তুমিও যাবে। তাই শোভা আমায় জোর করে মামার বেতন দিয়ে আমায় ভর্তি করেছিল। সেই দোকানের মালিক ভাস্কর যার চুলটি একেবারে রাজেশ খান্নার মত। দশ মিনিট টাইপ করে ক্লান্ত হয়ে আমরা সেই দোকানে গিয়ে পঞ্চাশ মিনিট ধরে রস খেতাম। না, না। শোভা পঞ্চাশ মিনিট ধরে রস খেত, আর আমি ততক্ষণ এদিক ওদিকে কাকগুলোকে খুঁজতাম।

একদিন কাঁচের আলমারির ওপর হেলান দিয়ে শোভা ভাস্করকে কিছু বলছিল। হঠাৎ একটা কাক এসে দোকান থেকে একটা আম নিয়ে উড়ে গেল। খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। সেদিন থেকে আমার টাইপের ক্লাশ বন্ধ।

এর কিছুদিন পর ছুটিতে আমি গ্রামে গিয়ে সেই অদ্ভুত কম সেন্টারেও গেলাম। ভূমের মত শোভা cash এর গদীতে বসে আছে। দু-গ্লাস কলের রস খাইয়ে বলল, "কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমাদের প্রতাপ এখুনি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরবে। ওকে দেখে যা।" বলতে বলতেই ভাস্করের স্কুটার চেপে প্রতাপ নামল। খুব সুন্দর দেখতে ছেলেটা। ও একে একে নমস্তে, হ্যালো, টা টা—সব করে দেখিয়ে দিল।

বাড়ি ফেরার সময় রাণীর মায়ের সঙ্গে দেখা হল। উনি বললেন, "শুনেছি জ্যোতি দুবাই আছে। বম্বেতে আমার রাণীর সঙ্গে দেখা করেছিল। রাণীর বর বম্বেতে খুব বড় চাকরিতে আছে, নিজের ফ্ল্যাটও আছে। একদিন বাড়িতে এসো, ফটো দেখাব···।"

আমি চাকরিতে ঢুকেছি তিন বছর হল। তার আগে চার বছর বাড়িতেই ছিলাম। তার পরের ছ'মাস পাশের লাইব্রেরীতে কাজ করেছি। তখন অমিতাভের জমানা। বেলবটম উঠে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। চাকরিতে ঢোকার তিনমাস পর কিস্তিতে একটা সালোয়ার কামিজ কিনতে বাড়িতে পানিপথ যুদ্ধ করতে হয়েছিল। শেষে মা যুদ্ধে হেরে গিয়ে রাজি হয়েছিল। আমার পাড়ায় সেই সময় খুব ভাল পোশাক পরে ঘুরে বেড়ানো মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। মনে হয় সেইজন্য মা আমার সালোয়ার কামিজের জন্য রাজি হয়েছিল।

একদিন ছাতে বড়ি শুকোতে শুকোতে বই পড়ছিলাম। একটা আমার থালার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। সেটা আমাকে স্পর্শমাত্র করেনি বললেও, মা আমার থালার ওপর বালতির পর বালতি জল ঢেলেছিল। ঠাকুরের সামনে ঘি এর দীপ জ্বালিয়েছিল। খুব কামেলা করেছিল মা। কাকটি রেবন কিনা দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বা আগ্রহই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আমার চাকরিস্থলে বট গাছ আছে কিনা জানিনা। কাকগুলোও খুব কম। একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়েছি সাড়ি দিয়ে বহুদূর ভাড়াটে। বাড়ির লোকেরা ভালই। বাড়ির বাইরে বড়ো বাজার। লাইন ধরে বড়ো বড়ো দোকান। সব কিছুই ভাল। মা এসেছিল। আগে পাশের লোককে আমার একটু দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। গতবার যখন মা এসেছিল, পাশের ঘরের বৃদ্ধা মহিলাটি বলেছিল, "সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি চিন্তা করোনা, সব কিছুরই একটা সময় আছে। তোমার মেয়ে রোজ কাককে খাওয়ার দেয়। শনিদেবকে প্রসন্ন করলে তার পুণ্য পাবেই। আচ্ছা, আপনারা বরং একটা কাজ করুন। শনিদেবকে মানত করে প্রতি শনিবার তিল তেলের প্রদীপ জ্বালান। ইচ্ছা পূরণ হবে·····।" □

সম্পর্ক-বিষয়ক

জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি

অনুবাদ : বেলা বসু

দক্ষিণ ভারতীয় দার্শনিক জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি পারস্পরিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে সামাজিক সমস্যার মূল আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইংরাজী ভাষায় লেখা তাঁর এই বিষয়ক ধারাবাহিক রচনাগুলোকে একত্রে সংকলিত করে On Relationship নাম দিয়ে এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে সম্পর্ক বিষয়ে তিনি যে সব বক্তব্য রেখেছেন, সেই সবগুলোই এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

কৃষ্ণমূর্তির এই রচনাগুলো বহুবিধ জাগতিক সমস্যার সমাধানে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যাই সামাজিক সমস্যার সঙ্গে, এমন কি—জাগতিক সমস্যার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে পরিবারের মধ্যেই আগে দৃষ্টিপাত করা দরকার।

১৮৯৫ সালে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ। মাত্র তের বৎসর বয়সেই তাকে থিওসফিক্যাল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একজন বিশ্ববিখ্যাত গুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে তাকে এই ঘটনাটাই সাহায্য করে।

কৃষ্ণমূর্তির বাণী এবং গ্রন্থাবলী বিশেষ কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য—কোন মতবাদেই বিশ্বাসী না হয়েও তিনি একটি বিশ্বমতবাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। কোন বিশেষ মতবাদকে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করে তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক ও আর্থিক সংগঠনগুলোকে ১৯১৯ সালেই নাটকীয়ভাবে ভেঙ্গে দেন। তার পরেই সত্যের সন্ধানে তাঁর যাত্রা শুরু হয় পদচিহ্নহীন এক অজানা পথের উদ্দেশ্যে। কোন সাংগঠনিক ধর্ম, দর্শন বা শিষ্যত্বের সমর্থনে এই সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।

কৃষ্ণমূর্তিকে গুরুহিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার অনুগামীরা প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তি দৃঢ়ভাবে এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেন। নিজের মতবাদ দ্বারা তিনি বিশ্বব্যাপী বহু অনুগামীকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের মতবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে অস্বীকার করেন এবং কাউকেই শিষ্যরূপে স্বীকৃতি দেন না। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির পৃথক সত্তাকে স্বীকার করতেন। ব্যক্তি চেতনার মাধ্যমেই সমাজে আমূল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে—এই ছিল তাঁর উপলব্ধি।

সীমাবদ্ধ জ্ঞান, ধর্মের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রভাব এবং জাতীয়তাবাদী শর্তাবলী সমাজকে অনবরত নিষ্পেষিত করে চলেছে। এজন্য আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন।

তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল একটি খোলামেলা পরিবেশের দিকে—"মস্তিষ্কের সেই সুবিশাল স্থান, যার মধ্যে অকল্পনীয় শক্তি সমাহিত রয়েছে—এটাকেই তার মনে হত সৃজনী শক্তির অফুরন্ত উৎস, আর এটাই সেই অনুঘটন যার প্রভাব অনায়াসেই বিশাল জনগণের উপর পড়েছে।

১৯৮৬ সালে নব্বই বৎসর বয়সে তিনি প্রয়াত হন। আমৃত্যু তিনি বিশ্বের জনগণের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কথা বলে গেছেন। তাঁর বাণী, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি ষাট-এর অধিক পুস্তকে সংকলিত রয়েছে। সেই বিশাল কথামৃত থেকে বর্তমান রচনা সংকলনকে তৈরী করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পুস্তকে জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের মঙ্গলকর বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ওজায়, ১৬ জুন, ১৯৪০

মনুষ্য সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে—নির্ভরতা। এই নির্ভরতা অর্থনৈতিক অথবা মানসিক—দু-রকম হতে পারে।

এই নির্ভরতাই আমাদের মধ্যে অধিকারবোধের জন্ম দেয়। আর এর ফলেই সৃষ্টি হয় বিরোধ, ভয়, সন্দেহ আর হতাশা। আইনের মাধ্যমে এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অপরের অর্থনৈতিক নির্ভরতা দূর করা সম্ভব। কিন্তু আমি বিশেষভাবে সেইসব মানসিক নির্ভরতার কথা বলতে চাই যেগুলো মানুষের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খার পরিণতি হিসাবে দেখা যায়। এই রকম ব্যক্তিগত অধিকার বোধের মধ্যে দেখা যায় সমৃদ্ধ সৃজনশীল কর্মকাণ্ড বিশেষ। এখানে একজনের অপেক্ষাকৃত কম আবেগ অন্যের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। এই সম্পূর্ণতার উৎসকে ক্ষতিগ্রস্ত না করার জন্যই একজন অন্যজনের উপর নির্ভর করে থাকে, আর স্বাভাবিকভাবেই অধিকারবোধের ভয় পরবর্তী ফলাফলের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এইরকম মানসিক নির্ভরতার সম্পর্কের মধ্যে—সচেতন বা অচেতনও—যেভাবেই হোক, ভয় ও সন্দেহের উপস্থিতি থাকবেই। এগুলো অবশ্য গোপন থাকে সুমধুর বাক্যের মধ্যে। এই ভয়ের প্রতিক্রিয়াতেই ব্যক্তি বিশেষ অবিরাম নিরাপত্তার পিছনে ছুটে বেড়ায়। এজন্যই সে নিজেকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করে এবং মতাদর্শগতভাবে নিজেকে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। এ ছাড়াও মানসিক স্বস্তির জন্যও বিকল্প কোন মতাদর্শের পিছনে ছুটে বেড়ায়।

যদিও আমরা একজন অপরের উপর নির্ভরশীল, তথাপি আমাদের মধ্যে বিরোধহীন পরিপূর্ণতার আকাঙ্খা রয়েছে। কোনও সম্পর্কের জটিল সমস্যা হচ্ছে—নির্ভরশীল না হয়েও কি করে ভালবাসা যায়, বিরোধীতা বিচ্ছিন্নতা ছাড়া কি করে ব্যক্তিসত্তাকে পৃথক করার ইচ্ছাকে জয় করা যায় এবং সংঘর্ষের কারণ থেকে দূরে থাকা যায়।

আত্মসুখের জন্য আমরা যদি সমাজে-সংসারে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি, তাহলে সেই নির্ভরশীলতা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আমরা তার সঙ্গে লেগে থাকি আর এর কোন পরিবর্তন হলেই আমরা প্রচণ্ডভাবে তার বিরোধিতা করে থাকি। কারণ, মানসিক নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমরা এই সম্পর্কের উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।

যদিও আমরা যুক্তির সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারি যে জীবন হচ্ছে একটা নিরন্তর প্রবাহ বিশেষ—বারাবাহিক অথচ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনশীল। অথচ আবেগের তাড়নায় আমরা প্রতিষ্ঠান বা মূল্যবোধের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি। আর এভাবেই পরিবর্তন এবং স্থায়িত্বের মধ্যে নিরন্তর একটা সংঘর্ষ চলতেই থাকে। এই বিরোধের নিষ্পত্তি হওয়া কি সত্যিই সম্ভব?

আবার কোনরকম সম্পর্কহীন জীবনও সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত ভালবাসার অধিকার বোধের দ্বারা আমরা একে করে তুলি মানসিক যন্ত্রণাক্লিষ্ট ও সন্দেহাকুল। তাহলে অধিকার না মিটিয়ে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ভালবাসতে পারা কি সম্ভব?

গোপনীয়তা, মতাদর্শ আর বিশ্বাসবোধের মধ্যে এর সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। বরং অধিকার বোধ ও নির্ভরশীলতার মধ্যে বোঝাপড়ার দ্বারাই এটা পাওয়া সম্ভব।

কেউ যদি পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে চায়, তাহলে আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলোকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। কারণ, সমাজ হচ্ছে পরিবারেরই বৃহত্তর

প্রতিবিম্ব। যে পারিপার্শ্বিকতাকে আমরা সমাজ বলি, সেটা তৈরী হয়েছে বিগত প্রজন্মের হাতে। আমরা তাকে স্বীকার করে নিই, কারণ, এটাই আমাদের অধিকারবোধ, আশা-আকাঙ্খা আর বিশ্রান্তিকে ধরে রাখে। এই বিশ্রান্তির মধ্যে শান্তি বা স্থায়িত্বের কোন স্থান নাই। বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব পাওয়া সম্ভব নয়, আর আইনকানুনও এই সংঘর্ষের সমাপ্তি টানতে সক্ষম নয়।

যতদিন আমরা এই ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ঠিকভাবে বুঝতে না পারব, ততদিন সামাজিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু অধিকারবোধের ভালবাসার উপরে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নির্ভর করে, সেহেতু এই সম্পর্কের উৎপত্তি ও কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের সদা-সতর্ক থাকতে হয়।

অধিকারবোধের উগ্রতা, ভয় ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া বিষয়ে গভীরভাবে সতর্ক থাকতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই একটা সম্পূর্ণতার উপলব্ধি ঘটে। একমাত্র এই সম্পূর্ণতার উপলব্ধিই নির্ভরশীলতা ও অধিকারবোধ থেকে চিন্তাকে মুক্ত করতে পারে। আর ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই সম্পর্কের একাগ্রতাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব, অন্যভাবে বা পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নয়।

বিরোধিতার প্রাথমিক কারণ হচ্ছে ব্যক্তিসত্তা। এই ব্যক্তিসত্তা-ই হচ্ছে কামনা সমন্বয়-এর কেন্দ্র। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ প্রাথমিকভাবে অন্য কোন কাজের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। আর এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যদি সম্পর্কের ভিত্তিমূল থেকে গভীরভাবে অনুভূত হয়, তাহলে সম্পর্কের উপরে গভীরভাবে অনুভূত হয়, সম্পর্কের উপরে গভীরভাবে মৌলিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে। এই রকম পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জাগতিক সমস্যাই থাকে না, উপরন্তু সর্বস্তরে চিন্তা ও বোধেরও সমস্যা থাকে।

একব্যক্তি অপরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে তখনই, যখন সে সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে একাত্ম হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার—অন্য কিছু নয়, একমাত্র একাত্মতাই বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে অন্যের সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে; বরং নিজের মধ্যে বিরোধ এবং দ্বন্দ্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

যখন আমরা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য—সে স্বাচ্ছন্দ্য যুক্তিসঙ্গত অথবা আবেগজনিত—যাই হোক না কেন—অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি, সেই নির্ভরশীলতা অনিবার্যভাবেই ভয়ের উদ্রেক করে। আর ভয় থেকে দুঃখের উৎপত্তি।

সম্পর্কের জটিলতা বুঝতে হলে অবশ্যই মননশীল ধৈর্য ও ব্যগ্রতা থাকা দরকার।

সম্পর্ক হচ্ছে একটা আত্মপ্রকাশের পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষের দুঃখের গোপন কারণগুলোকে আবিষ্কার করতে পারি। এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করা একমাত্র সম্পর্কের ক্ষেত্রেই সম্ভব।

আমি সম্পর্কের উপরেই গুরুত্ব বেশী দিয়ে থাকি। কারণ, এর জটিলতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমরা উপযুক্ত বুদ্ধি তৈরী করে নিই। এই বুদ্ধি যুক্তি ও আবেগ—দুটোকেই অতিক্রম করে যায়। আমরা যদি আমাদের বোঝাপড়াকে শুধুমাত্র যুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, তাহলে তার মধ্যে বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ভালবাসা ইত্যাদির অভাব ঘটবে। আবার, আমরা যদি শুধুমাত্র ভাবাবেগের দ্বারা বোঝাপড়া করতে চাই, তাহলে তার মধ্যে কোন গভীরতাই থাকে না, ভালবাসাহীন আবেগ বাষ্পের মতই উবে যায়। আসলে কামের সম্পূর্ণতা বেরিয়ে আসে এইরকম বোঝাপড়া থেকেই। আর এই বোঝাপড়া হয় নৈর্ব্যক্তিক আর সেটাকখনও ধ্বংস হয় না। আর এইরূপ বোঝাপড়া কখনই সময়েরও ব্যতিক্রমী হয় না।

আমাদের প্রতিদিনের আশা-আকাঙ্খা ও সম্পর্কের সমস্যাগুলোকে যদি সমাধান না করতে পারি, চেতনার অন্তর্জগতে যদি ভালবাসাকে আবিষ্কার না করতে পারি, তাহলে আমাদের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির জগতেই বাস করতে হবে।

আবার আশা-আকাঙ্খার পদ্ধতিকে ঠিকভাবে উপলব্ধি না করে শুধুমাত্র সহানুভূতি ও উদারতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে অজ্ঞতা ও নিষ্ঠুরতাকেই স্বাগত জানানো হবে। সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কের বিচার-বিশ্লেষণ না করে শুধু মাত্র সহানুভূতি ও উদারতা সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে—আত্মবিচ্ছিন্নতা এবং সুক্ষ্মভাবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া।

বোঝাপড়ার আকুল কামনার মধ্যে সমবেদনা ও ক্ষমার ভাবও থাকে। তথাপি অর্জিত গুণাবলী কিন্তু আসল গুণাবলী নয়। এইসব উপলব্ধির জন্য চাই নিরন্তর সতর্কতা ও নমনীয় তীব্রতা। বিষয় পদ্ধতিতে দমন করতে যাওয়াও খুব বিপজ্জনক। কারণ, সেটা হয় একপেশে ও অসম্পূর্ণ। আর সেটা সেজন্য অসার ও অগভীর।

স্বার্থ স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে আর স্বার্থের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই উপলব্ধির বিকাশ হয়ে থাকে। বিরোধ ও দুঃসহ জীবনের জটিল সমস্যাকে উপলব্ধি করতে গেলে সেই উপলব্ধিটা সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। এটা তখনই হওয়া সম্ভব, যখন আমরা কামনার পদ্ধতিকে উপলব্ধি করতে পারি। আর এই কামনাই হচ্ছে আমাদের জীবনের মূল চালিকা শক্তি।

প্রশ্ন : আত্মপ্রকাশ কথাটার অর্থ আপনি কি ভাবে করতে চান? নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশ করা, না নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করা?

উত্তর : একজন প্রায় সময়েই অন্যের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে—"তুমি অপরের কাছে নিজেকে প্রকাশ করছ"—এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

আমি এটাকে এভাবেই ব্যাখ্যা করতে চাইছি যে আমরা যদি উপরোক্ত পদ্ধতিতেই আত্মপ্রকাশ করি, তবে সব রকম সম্পর্ক-ই আয়নার মতই প্রতিফলিত হবে—যার মধ্য দিয়ে ছল-চাতুরি অথবা সহজ-সরলভাবে—দুটোই ফুটে উঠবে। এই পদ্ধতিতে যে আলো বিচ্ছুরিত হবে, তাতে সবই স্পষ্ট দেখা যাবে।

কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে যদি আমরা কোন বিশ্বাস, মতাদর্শ বা কোন পক্ষপাতদুষ্ট ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হই, তাহলে কাঙ্খিত সম্পর্ককে ঠিকমত উপলব্ধি করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশ করার পদ্ধতি ছাড়া সম্পর্কটা আর কিছুই হয়ে উঠবে না।

আমাদের প্রাথমিক বিচার্যবিষয় এই যে—সত্যদর্শনের পথে আমাদের সামনে ঠিক কোন্ বিষয়টি বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? আমরা সঠিক বিষয়টি দেখতে পাই না এই জন্য যে আমাদের মতাদর্শ, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, উৎকণ্ঠা, আশা-আকাঙ্খা—এইসব কিছুই একটা আবরণের মতই কাজ করে। এই বিকৃতির কারণকে ঠিকভাবে বুঝতে না পেরে আমরা দ্রষ্টব্যকে বিকৃত করে দেখার চেষ্টা করি অথবা দেখা থেকে বিরত থাকি। আর এ থেকেই পরবর্তী বিরোধ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়।

আমাদের প্রধান বিচার্যবিষয় হওয়া উচিত দ্রষ্টব্যকে বিকৃত না করা; বরং এই বিকৃতির বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকা। কেউ কেউ বলতে পারে যে তাদের কাজে-কর্মে যথেষ্ট ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই সতর্ক থাকার মত সময় নাই।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা সময়ের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে স্বার্থের। সুতরাং মানুষ যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন সতর্ক থাকার সুযোগ করে নিতেই হবে। আর প্রত্যক্ষ ফলাফলকে অর্জন করার জন্য বোঝাপড়ার সম্ভাবনাকে খর্ব করতে হবে। □

অতিথি

অলবার কামু
অনুবাদ : শচীন দত্ত

স্কুলের শিক্ষক মশাই অনেক দূর থেকে লক্ষ্য করেছিলেন দুটো লোককে—একজন ঘোড়ার পিঠে, অন্যজন পায়ে হেঁটে আসছে—নির্জন প্রশস্ত মালভূমিটার ওপর দিয়ে, খুব ধীরে ধীরে বরফ এবং পাথর-ভর্তি প্রান্তর অতিক্রম করে। ঘোড়াটা মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে—তার নাক দিয়ে বেরুচ্ছে ধোঁয়া—পায়ে চলা পথটা ঢেকে আছে বরফে। ওরা আসছে এদিকে—পাহাড়ের ওপর এই স্কুল বাড়িটার দিকে। বাইরে খুব ঠাণ্ডা। মনে হয় আধ ঘণ্টার আগে ওরা এখানে পৌঁছতে পারবে না। শিক্ষক মশাই ভেতরে গেলেন, রোদেটার পরে আসতে।

ঠাণ্ডা খালি ঘরটা পেরিয়ে গেলেন তিনি। ব্ল্যাক বোর্ডে নানা রঙের চক দিয়ে আঁকা ফ্রান্সের চারটে নদী—মোহনার দিকে বয়ে চলেছে। আট মাস খরার পর অক্টোবরের মাঝামাঝি তুষার পাত সুরু হয়েছে—মাঝে একবারও বৃষ্টি হয়নি। এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনাবৃষ্টি ছাত্র পড়তে আসতো এই স্কুলে। এখন তারাও আসছে না।

শিক্ষক মশায়ের নাম দারু, জানালার কাছে ফিরে এলেন। লোক দুটোকে আর দেখা যাচ্ছে না—সম্ভবতঃ ওরা চড়াই বেয়ে উঠছে। আকাশ বেশী অন্ধকার নয়, রাতেই তুষার পড়া বন্ধ হয়েছে। আকাশে মেঘ কেটে যাচ্ছে—এই বেলা দুটোর সময় মনে হচ্ছে—এই মাত্র ভোর হল। গত তিনদিন ধরে অবিরাম তুষারপাত হয়েছে—অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের ভেতর দিনে পুরু হয়ে, সঙ্গে প্রবল জোড়ো হাওয়া। দারু কদিন বাইরে বের হতে পারেনি—তাগিদ উত্তর দক্ষিণে কাছের গ্রাম টাজিদ থেকে টাকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এসে গিয়েছিল—তুষার ঝড় শুরু হবার দুদিন আগেই। ছোট ঘরটায় সমের ধন্তা ছড়ানো। খরাগ্রস্ত গরীব পরিবারের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য সরকার থেকে গম এসেছিল। এই স্কুলের সব ছেলেরাই গরীব। দারু প্রতিদিন ছেলেদের রেশন বিতরণ করেছেন। খারাপ আবহাওয়ার জন্য এ কদিন ওরা আসেনি। জাহাজ ভর্তি গম এসেছিল ফ্রান্স থেকে—কিন্তু এতে এসব লোকেরা কি দারিদ্র্য ঘুচতে পারবে? হত-দরিদ্র লোকেরা ভূতের মতো রোদে রোদে ঘুরে বেড়ায়—মাসের পর মাস এই অঞ্চল কাঠের মতো পুড়তে থাকে—মাটি পুড়ে ফাটতে থাকে। হাজার হাজার ভেড়া মরেছে—লোকও যে মরেছে কতো—সে খবর কেউ জানতে পারেনি।

চারদিকের এই দারিদ্র্যের মাঝখানে—ঘুরের এই স্কুলবাড়িতে দারু বাস করছে রাজার হালে—ঘরের দেয়াল চুনকাম করা—সব লোকা, রঙহীন সেল্ফ—সাপ্তাহিক খাদ্য ও জলের ব্যবস্থা—এই রুক্ষ জীবন নিয়ে সুখী। সে এসবে অভ্যস্ত। তার জন্ম এই অঞ্চলেই। সে বারান্দায় বের হল। লোক দুটো চড়াই বেয়ে আর্ধেকটা পথ উঠেছে। সে অশ্বারোহীকে চিনতে পারল—গেন্দার্মি—মিলিটারী পুলিশ—সে একটা আরবদেশীয় লোককে হাতে দড়ি টেনে আনছে। তার গায়ে রঙ ওঠা নীল জেলাবা বা কোল্লা—পায়ে ভারী মোজা ও স্যাণ্ডেল—মাথায় ছোট চেচি বা কাপড়ের টুপি। খুব ধীরে ধীরে উঠছে ওরা।

শুনতে পাওয়া যুরঙ্কে এসেই বলডুসি চেঁচিয়ে উঠল : "এল্ আমেউর থেকে তিন কিলোমিটার পথ আসতে এক ঘণ্টা লেগে গেল।" দাক কোন জবাব দিল না। ওরা এসে পড়ল। বারান্দার কাছে আসতেই দাক অভ্যর্থনা জানাল : "হ্যালো, এসো ভেতরে, গরম হও আগে।" বলডুসি ঘোড়া থেকে নামল। পাকানো গোঁফের তলা দিয়ে চেয়ে সে হাসল। দাক ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে এসে বলল : "আমি আগে গ্রাশ ঘরটাকে গরম করি—তোমরা আরাম পাবে। বলডুসি ততক্ষণে সোফাটায় বসে পড়েছে—হাতের দস্তিটা ফেলে দিয়েছে। আরবটা হাত-বাঁধা অবস্থাতেই মেঝেতে বসে পড়েছে—চুল্লিটার পাশে। দাক লক্ষ্য করল—লোকটার বিরাট মোটা ঠোঁট—নিগ্রোদের মতো—কিন্তু নাকটা চোখা—চোখ দুটো কালো—উন্নত কপাল—ফ্যাকাসে গায়ের চামড়া—চেহারাটায় কেমন যে একটা অস্থির ভাব। —পাশের ঘরে চল, পুদিনীর চা বানিয়ে দিচ্ছি।"

—"ধন্যবাদ। কী বানাবে। আমি অবসর নেবার জন্য মুখিয়ে আছি—আর ভালো লাগেনা এসব"—বলডুসি বলে। দাক আরবীতে বন্দীকে বলল : "এই তুমি এসো।" আরবটি ধীরে ধীরে উঠল, তার বাঁধা হাতদুটো সামনে তুলে। বসল এসে শিশুকের প্ল্যাটফর্মটার ওপর, চুল্লির পাশেই। চা'য়ের গ্লাসটা এগিয়ে দেবার সময় ওর বাঁধা হাতের দিকে চেয়ে দাক বলল : "ওর হাতের বাঁধন খুলে দেয়া উচিত।"

—"অবশ্যই, এই লম্বা ভ্রমণের জন্য এটার দরকার ছিল।"

দাক চায়ের গ্লাসটা মাটিতে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে ওর বাঁধন খুলে দিল। ফুলে-ওঠা কব্জিদুটো কয়েকবার ঘষে নিয়ে সে চায়ের কাপটা তুলে নিল। তপ্ত চায়ে চুমুক দিল।

—"তোমরা কোথায় যাচ্ছ?" —দাক প্রশ্ন করে। বলডুসি ভিজে গোঁফটা চায়ের থেকে তুলে জবাব দেয়—"এখানেই, বৎস।"

—"অদ্ভুত লোক তো! এখানেই রাত কাটাবে নাকি?"

—"না ভাই, এ রকমই অর্ডার আছে।" —"অর্ডার।" একটু ইতস্তত: করে দাক বলে : "মানে, এটাতো আমার কাজ নয়।"

—"কী বললে? যুদ্ধের সময় লোক সব রকম কাজ করে।"

—"তাহলে যুদ্ধ ঘোষণা না-হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হয়।" বলডুসি মাথা নাড়ল : "কিন্তু অর্ডার আছে—তোমাকে নিয়ে ও গোলমাল পাকাচ্ছে—বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।" দাকের মুখে তখনও উন্নত ভঙ্গি।

—"শোনো বৎস! আমি তোমাকে পছন্দ করি—এবং তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। এল্ আজুর আমরা মাত্র ২ জন আছি—এই সমস্ত অঞ্চলটার পাহারায়। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে—দেরী না করে—এটাই আদেশ। এই লোকটাকে এখানে রাখা যাবেনা। ওর গ্রামের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে আছে—ওকে ছিনিয়ে নেবে। তুমি কাল সকালেই ওকে নিয়ে টিনগুইটে যাবে—৮০ মাইল যুরঙ্ক তোমার মতো চটপটে লোকের কাছে কিছুই নয়। তারপর ফিরে এসো—এই আরামের জীবনে।"

দেয়ালের পেছনে ঘোড়াটা নাক ডাকাচ্ছে। আবহাওয়া ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। বরফ গলে গেলেই আবার অসহ্য গরম পড়বে। বলডুসির দিকে ফিরে দাক জিজ্ঞেস করে : "আচ্ছা, লোকটা কী করেছে? সে কি ফরাসী-ভাষা বলতে পারে?" —"এক বর্ণও না। ওকে আমরা এক মাস ধরে খুঁজছিলাম। সে ওর খুড়তুতো ভাইকে হত্যা করেছে।"

—"সে কী আমাদের বিরুদ্ধে ?"—"মনে হয় না, তবে কিছু বিশ্বাস নেই।"

—"কেন সে খুন করেছে।"—"পারিবারিক শত্রুতা বোধ হয়—ঠিক জানি না, গলা কেটে দিয়েছে।" কেটলিটা স্টোভে ফুটছে। আর একবার চা হল।

—"ধন্যবাদ। এখন আমি চলি"—বলডুসি উঠল। পকেট থেকে একটা ছড়ি বের করে লোকটার কাছে গেল।—আরে, তুমি করছ কী ?"

—"কিছু না, তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার অস্ত্র আছে তো ?"

—"বন্দুক আছে।"—"কোথায় ?"—"ট্রাঙ্কে"।—ওটা তোমার বিছানার নীচে রাখা উচিত।"—"কেন ? আমার ভয়ের কিছু নেই।"—"তুমি একটা পাগল ! বিদ্রোহ ঘটলে কেউই নিরাপদ নয়।" বলডুসি হাসল। ডেস্কের ওপর তার রিভলবারটা রেখে বলল : "এটা রেখে যাও—আমার কাছে আর একটা আছে।"

—"শোনো বলডুসি !" ব্যাক হঠাৎ বলে ওঠে : "এসব আমার কাছে অসহ্য বিরক্তিকর। আমি লোকটাকে পৌঁছে দেব না। লড়াই, দরকার হলে করবো।" বন্ধু পুলিশটা কটমট করে তাকিয়ে থেকে বলল: "তুমি একটা বোকা।"

—"আমি ওকে হস্তান্তর করব না।"

—"দেখ। এটা আদেশ। আমি আবার বলছি।"

—"ঠিক আছে, আমি মানবো না। তুমি ওদের জানাতে পারো।" বলডুসি চুপ করে থাকল, সে একবার লোকটার দিকে, আবার ব্যাকের দিকে তাকাল : "—আমার ওপর যা অর্ডার আছে—তা তোমাকে জানালাম। এখন তোমার খুশি। এই কাগজটায় সই করে যাও।

—"তার কোন দরকার নাই। তুমি যে ওকে আমার হাতে দিয়ে গেছ—। তা কখনই অস্বীকার করবো না।"

—আমাকে ভুল বুঝো না। জানি, তুমি সত্যি কথাই বলবে। কিন্তু তোমাকে সই করতেই হবে।" ব্যাক ড্রয়ার থেকে তার কাঠের কলম ও বেগুনী—কালি বের করে সই করে দিল। বলডুসি কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে পুরে দরজার দিকে অগ্রসর হল।

—"চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

—"কোন দরকার নেই। তুমি আমাকে অপমান করেছ।" আরবটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জানলা দিয়ে দেখা গেল বলডুসি লাগাম হাতে বন্ধুকের ওপর দিয়ে চলেছে, পেছনে তার ঘোড়াটা। ব্যাক আরবীতে আরবটাকে বলল :—"তুমি এখানে অপেক্ষা কর। বলে পাশের শয়ন-কক্ষের দিকে পা বাড়াল, কিন্তু কি মনে করে ফিরে এসে টেবিলের ওপর থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে গেল।

ব্যাক বিছানায় শুয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাল। যুদ্ধের পর সে বসতী চেয়েছিল—পাহাড়ের নীচে একটা ছোট শহরে—আরও উত্তরে। এই জমা পার্বত্য উপত্যকা, এই নির্জনতা তাকে পীড়া দেয়। চারপাশে কোন শব্দ নেই। ব্যাক উঠে বসল। সে খুশি হল ভেবে যে আরবটা নিশ্চয়ই পালিয়েছে—যাক্, ওর সম্বন্ধে তাকে আর সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। কিন্তু না, বন্দীটা রয়েছে—চুল্লি আর ডেস্কের মাঝখানে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। চোখ খোলা, ছাদের দিকে চেয়ে আছে।

—"এসো," ব্যাক বলল। লোকটা উঠে তার পেছন পেছন পোষার ঘরে এসে ঢুকল। ব্যাক ওকে একটা চেয়ারে বসতে বলল।

—"তোমার কী খিদে পেয়েছে ?"—"হ্যাঁ"। ছাক ময়দা ও তেল দিয়ে ছাই পানে কেকের মতো কি একটা বানালো। তার সঙ্গে পনির, ডিম, খেজুর এবং জমানো দুধ। ডিম থেকে তৈরী হল অমলেট, দুধ থেকে কফি।

—"নাও, খেয়ে নাও।"—"তুমি খাবে না ?"—"আমি পরে খাবো।" একটু চতুরতা করে আরবটা খেয়ে নিল। তারপর জিজ্ঞেস করল : —"তুমি কি বিচারক ?"—না, আমি কাল পর্যন্ত তোমাকে এখানে রাখবো।"

ছাক একটা ফোল্ডিং খাট এনে বিছানা করল। একটা বড় সুটকেশ থেকে দুটো কম্বল বের করে দিলো। তারপর বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করল :—"কেন তুমি হত্যা করেছ ?" নিজের কঠোর স্বরে সে নিজেই অবাক হল। আরবটা অন্যদিকে তাকাল। বললো : "এখন ওরা আমাকে নিয়ে কী করবে।"

"তুমি কি ভয় পেয়েছো ?—তুমি কি দুঃখিত ?" সে উত্তর দিল না। ছাকের বিরক্তি বাড়ছিল। "—এখানে শুয়ে পড়—এটা তোমার বিছানা।" আরব নড়ল না। ছাককে জিজ্ঞেস করল : "পুলিশটা কি কাল ফিরে আসবে ?""

—"জানি না ; কেন ? বন্দী উঠল, কম্বলগুলোর ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত গভীর হল। ছাকের চোখে ঘুম নেই। সে জামা কাপড় ছেড়ে শুয়েছিল—সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শোয়া তার অভ্যেস। জানালায় তারাহীন রাত। বাতাসের বেগটা বাড়ছে। আরবটা নড়ে উঠল। ছাক তখনও ঘুমায়নি। লোকটা আবার নড়ল, বিছানায় উঠে বসল। ছাক সজাগ হয়ে আছে। মনে পড়ল রিভলবার ড্রয়ারে আছে, ওটা আনা দরকার। কিন্তু উঠল না। লোকটা খুব আস্তে মাটিতে পা রাখল -উঠে দাঁড়াল ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ছাক তখনো ওঠেনি—"ব্যাটা পালিয়ে যাচ্ছে…।" জল পড়ার শব্দ। আরবটা ফিরে এল, শুয়ে পড়ল। ছাক এবার নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেল।

ঘুম ভেঙে ছাক দেখে আকাশ পরিষ্কার। জানালার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে। আরবটা তখনও ঘুমোচ্ছে। ধাক্কা দিতেই সে ধড়ফড় করে উঠে বসল। ছাক বলে : ওঠো, এখন কিছু খাবে, এসো। ফোল্ডিং খাটে বসে কফি ও কেক খাওয়া হল। আরবটা বাইরের কলে হাত মুখ ধুতে গেল। সূর্য তখন নীল আকাশে উঠে গেছে—পাহাড়ে কোথাও বরফ গলছে! বন্দুকটির কথা মনে পড়ল। কিন্তু লোকটাকে আবার পুলিশের হাতে তুলে দিতে তার সম্মানে বাঁধছে। আরবটা সিমেন্টের মেঝেতে কাত হয়ে দু-আঙুলে দাঁত মাজছে। ছাক ওকে ডাকল। ঘরে গিয়ে সোয়েটারের ওপর শিকারের জ্যাকেটটা পরে নিল। আরব তার শিরস্ত্রান ও আঙরাখা পরল। ছাক রুটি, বিস্কুট, খেজুর ও চিনি একটা প্যাকেটে পুরে নিল। ড্রয়ারের সামনে এসে একটু ইতস্তত: করল, তারপর দরজায় তালা দিল। ছাক বলল : "এসো"। ওরা পুব দিকে হাঁটা শুরু করল।

একঘণ্টা চলার পর বিশ্রাম—এটা চুনা পাথরের চূড়ার পাশে বসল। বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে—এবং সূর্য সেই জলবিন্দুগুলো তখুনি পান করে নিচ্ছে—অধিত্যকার মাটা যেন চেটে পরিষ্কার ও শুকনো করে দিচ্ছে।

আবার পথ চলা সুরু। আরো এক ঘণ্টা হেঁটে ওরা দক্ষিণে নীচে নামতে লাগল—এবড়ো খেবড়ো পাথুরে সমতল ভূমি—পুবদিকে আবার চালু পথ। দিগন্তে শুধু আকাশ—মানুষবসতির কোন চিহ্ন নেই। ছাক আরবটার দিকে ফিরল—লোকটা বোকার মতো শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। —"এগুলো নাও—এই প্যাকেটে রুটি, খেজুর, চিনি এসব আছে—এতে তোমার দু'দিন চলবে। আর এই নাও একহাজার ফ্রাংক। আরবটা জিনিষগুলো বুকের কাছে নিয়ে ধরে দাঁড়াল—এ সব নিয়ে সে কি করবে বুঝতে পারল না। —"এদিকে দেখো"—পুব দিকে আঙুল তুলে স্কুল মাষ্টার বলল—"এই দিকে টিনগুইট—এখনো দুঘণ্টার পথ। ওখানে গিয়ে তুমি শাসনকর্তার অফিস ও পুলিশ দেখতে পাবে। ওরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। লোকটা পুব দিকে তাকাল। ছাক তার কনুই ধরে তাকে

দক্ষিণ দিকে ঘোরালো—"ঐ যে সরু পথটা এদিকে—যখান থেকে সারাদিন হাঁটলে তুমি সম্ভবত পন্তভরা ক্ষেত পাবে—ওখানে রয়েছে যাযাবররা—ওরা তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে।" আরব এবার দারুর দিকে ফিরল, তার মুখে ভয়ের ছাপ। দারু বলল: "শোন, শান্ত হও। আমি চলে যাচ্ছি।" দারু পেছন ফিরল। লম্বা পা ফেলে স্কুল বাড়ির দিকে ফিরে চলল। দুপা এগিয়ে পেছন ফিরে দেখে—তখনও লোকটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দারু আবার চলা শুরু করল।···কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে দেখে আরবটা তখন পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে—তার দিকে চেয়ে আছে। দারুর মনে হল তার গলায় কি যেন আটকে। কিন্তু গা ঝাড়া দিয়ে সে লোকটার দিকে হাত নাড়ল, তারপর আবার চলা শুরু করল। বেশ খানিকটা গিয়ে সে থামল, পেছন ফিরল আবার—না, লোকটা আর নেই সেখানে।

দারু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলো। সূর্য তখন অনেক উঁচুতে—মাথার ওপর তাপ বর্ষণ করছে। সে আবার ফিরে চলল সেখানে—যেখান থেকে লোকটা বিদায় দিয়েছিল। সেই ছোট পাহাড়টার কাছে আসতে সে খেয়ে গেল, তারপর তাড়াতাড়ি পাহাড়টার চূড়ায় উঠতে শুরু করল। হাঁফাতে হাঁফাতে পৌঁছল সেখানে। দক্ষিণে পাথর ভর্তি মাঠ—কিন্তু পুব দিকে সমতল ভূমি থেকে বাষ্পীয় তাপ উঠছে। দারু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দেখলো—সেই আরবীয় লোকটা ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে জেলখানার দিকে।···

স্কুল শিক্ষক দাঁড়িয়ে ছিল ক্লাস রুমের জানালার ধারে। ঝকঝকে আলো নীচের উপত্যকাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সে তা দেখছিল না। তার পেছনের ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা ফরাসী নদীগুলোর ওপর মাঝখানে কে যেন চক দিয়ে লিখে রেখে গেছে—"তুমি আমাদের ভাইকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করেছ—এর ফল ভোগ করবে।" দারু আকাশের দিকে তাকাল—উপত্যকার দিকে—আরো দূরে অদৃশ্য অঞ্চলের দিকে তাকাল—যেটা সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। তার মনে হল এই প্রকৃতিকে সে ভালোবাসে—কিন্তু সে যে বড়োই একা। □

[অলব্যার কাম্যু (Albert Camus) একজন স্বনামধন্য ফরাসী লেখক, গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। উনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৫৭ সালে]

পোস্টকার্ড

হাইন্‌রিখ্‌ বোল্‌

অনুবাদ : চিরঞ্জয় চক্রবর্তী

যারা আমায় চেনে, তাদের মধ্যে কেউই জানেনা বা বুঝতে পারে না, কত যত্ন করে আমি কাগজের টুকরোটা রক্ষা করি, আপাতদৃষ্টিতে যার কোন দাম নেই। টুকরোটা আবার একটা দিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে স্পর্শকাতর করে তোলে। অথচ তোমার কোন প্রতিপত্তি এতে বাড়ে না।

আমি একটা কাগজের কলের সহকারী ম্যানেজার। আমি স্পর্শকাতরতার বিরোধিতা করি এবং বারংবার চেষ্টা করি একটাকে একটা স্মারক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করতে। এটা একটা ছোট সাধারণ চতুর্ভুজ কাগজ, আকারে হলেও আকৃতিতে ডাকটিকিট নয়—এটা ডাক টিকিট থেকে শক্ত এবং লম্বা—যদিও পোস্ট অফিস থেকেই পাওয়া যায়, তবু এটা জমানোর কোন কৃতিত্ব নেই। কাগজটার চারধার ঘেঁষে উজ্জ্বল লাল দাগ দেওয়া এবং আরেকটা লাল দাগ চতুর্ভুজটাকে ছোট বড় দুটো ভাগে ভাগ করেছে। এর মধ্যে ছোট খোপে কালো দিয়ে "R" লেখা আছে। আর বড়টায় কালো দিয়ে লেখা "DUSSELDORF" এবং একটা সংখ্যা—সংখ্যাটা হ'ল 634.

কাগজের টুকরোটা ক্রমশ হলুদ আর পাতলা হয়ে গেছে। আমি ঠিক করেছি কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দেব, একটা সাধারণ রেজিস্ট্রেশন স্টীকার, প্রতিদিন একটা পোস্ট অফিসে যা কিনা কয়েক জনকে লাগান হয়।

এখন পর্যন্ত কাগজের টুকরোটা আমায় এমন একদিনের কথা স্মরণ করায় যেটা সত্যি ভোলা যায় না। যদিও মন থেকে মুছে ফেলার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার স্মরণ ইন্দ্রিয় ঘটনাটাকে পরিষ্কার মনে রেখেছে।

প্রথমতঃ সেই দিনটার কথা ভাবলেই আমি ভ্যানিলা পুডিংয়ের গন্ধ পাই। একটা গরম মিষ্টি ঘেঁড়া আমার শোয়ার ঘরের দরজার তলা দিয়ে ঢুকছিল আমার ভালোবাসা মনে পড়ছিল। আমি মাকে বলেছিলাম ছুটির প্রথমদিন ভ্যানিলা পুডিং করতে। আর এও বলেছিলাম, আমি যেন ঘুম থেকে ওঠার সময়ে পুডিংয়ের গন্ধ পাই।

তখন সাড়ে দশটা বাজে। একটা সিগারেট ধরালাম, বালিশটা মাথার থেকে সরিয়ে দিলাম, তারপর ভাবতে শুরু করলাম—কিভাবে বিকেলটা কাটাব। ঠিক করলাম সাঁতার কাটতে যাব। খাওয়া দাওয়ার পর একটা গাড়ি ধরে সমুদ্র সৈকতে চলে যাব, কিছুক্ষণ সাঁতার কাটব, বই পড়ব। সিগারেট খাব তারপর সহকর্মী যুবতীর জন্য অপেক্ষা করব। কথা আছে ও পাঁচটার পর সৈকতে আসবে।

রান্নাঘরে মা মাংস কুচি করছিল এবং ছুরির আওয়াজ বন্ধ হলেই—আমি গান শুনতে পাচ্ছিলাম। মা গাইছে। ভক্তিগীতি —এত ভাল লাগছিল। তার আগের দিন আমার পরীক্ষা পাশের খবর বেরিয়েছে। কাগজের কারখানায় একটা চাকরী হয়েছিল। চাকরিটায় উন্নতির সুযোগ সুবিধাও ছিল—তখন আমি বাড়িতে ছিলাম কারণ সপ্তাহের গরমের ছুটি ছিল। ঘরের বাইরে প্রচণ্ড গরম, তখন গরম ভালই লাগত। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখতাম মাটি থেকে জল বাষ্প হয়ে উপরে ওঠার সময়ে বায়ুমণ্ডল ইতস্ততঃ নেচে বেড়াচ্ছে, মত্ত হচ্ছে। শুয়ে শুয়ে রাস্তার

গান্ধ দেখছিলাম, গাড়ির আওয়াজ শুনছিলাম—হঠাৎ মনে হ'ল এখন ভাল খাবার খাওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে মার পায়ের আওয়াজ পেলাম, উঠেছি কিনা দেখতে আসছিল। বুঝতে পারছিলাম মা বড় ঘর পেরিয়ে আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল—বাড়িটার কোথাও কোন আওয়াজ ছিল না। 'মা' বলে ডাকতে যাব তখনই দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। মা বাইরের দরজায় গেল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নিচের বাজারের হইচই চীৎকার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মা আর শ্রীযুতি কুরৎস্ দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। উনি আমাদের পাশের ফ্লাটে থাকতেন। ওদের কথার মধ্যেই একজন পুরুষের গলা শুনতে পাচ্ছিলাম, ভদ্রলোক ডাক পিওন। যদিও আমি তাকে খুব সামান্যই দেখেছি। ডাক পিয়ন আমাদের বসার ঘরে ঢোকেন। মা জিজ্ঞাসা করে, 'কি ব্যাপার?' তিনি বলেন, 'এইখানে সই করুন।' কিছুক্ষণ শুনলাম, কোন আওয়াজ নেই, তারপর ডাকপিয়নের 'ধন্যবাদ' আওয়াজটা আমি পরিষ্কার শুনতে পাই। মা বাইরের দরজা বন্ধ করে, আওয়াজ পাই। তারপর ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

এর কিছুক্ষণ পরেই আমি বিছানা থেকে উঠি এবং কলঘরে যাই। দাড়ি কামাই, বহুক্ষণ ধরে স্নান করি এবং কল বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাই মা কফি গুঁড়ো করছে। অনেকটা রবিবার রবিবার মনে হচ্ছিল, শুধুমাত্র চার্চে যাইনি এই যা।

কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না, হঠাৎ আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কেন হল বলতে পারব না। খুব খারাপ লাগছিল। যেমিক্ষণ আমি কফির গুঁড়োর আওয়াজ পাইনি। গা মুছলাম, জামা প্যান্ট পরলাম, মোজা জুতো পরলাম, চুল আঁচড়ালাম তারপর পোয়ার ঘরে গেলাম। টেবিলের উপর ফুলদানীতে সুন্দর তাজা গোলাপ ফুল আর প্লেটের উপর আমার জন্য লাল এক প্যাকেট সিগারেট।

ঠিক তখনই মা কফির কেটলী হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল, দেখলাম মা কাঁদছে। মার একহাতে কেটলী অন্যহাতে ভাঁজে আধা চিঠিপত্র। এগিয়ে গিয়ে কেটলীটা নিলাম, চুমু খেয়ে বললাম, 'সুপ্রভাত' আমাকে ভাল করে দেখে বলল, সুপ্রভাত কালকে ভাল ঘুম হয়েছিল তো? বলে হাসতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

আমরা বসলাম। মা কফি ঢালছিল, আমি লাল প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরালাম। হঠাৎ সিগারেট খেতে ইচ্ছা করল না। কফির মধ্যে চুমু আর চিনি দিয়ে নাড়তে নাড়তে মার দিকে তাকাতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু প্রত্যেকবারই নামিয়ে নিতে হচ্ছিল। 'কোন চিঠি এসেছে? অর্থহীন প্রশ্ন, কারণ সামনেই মার হাতের তলায় সমস্ত চিঠিপত্র ছিল, চিঠির স্তূপের সবচেয়ে উপরে ছিল সেদিনের সংবাদপত্র।

'এসেছে' বলে চিঠির স্তূপ মা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি সংবাদপত্রটা তুলে নিলাম। এই সময়ে মা আমার জন্য রুটিতে মাখন মাখাচ্ছিল। উপরের পাতায় হেডিং ছিল, সীমান্ত এলাকায় জার্মানদের উপর প্রকাশ্যে অত্যাচার করা হচ্ছে, 'সপ্তাহখানেক ধরেই প্রথম পাতায় এই জাতীয় খবর ছাপা হচ্ছিল। খবরে বলা হচ্ছিল, 'পোলিশ সীমান্তবর্তী' এলাকার উদ্বাস্তুরা বাঁচার জন্য রাইখের দিকে পালাচ্ছে।'—কাগজটা সরিয়ে রাখলাম। একটা বিজ্ঞাপন পুস্তিকা নিলাম—পাঠিয়েছেন একজন মদ ব্যবসায়ী। বাবা বেঁচে থাকাকালীন এই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আমরা কয়েকবার মদ কিনেছি। বিজ্ঞাপনে খুব সস্তায় মদ দেবে বলেছে—সরিয়ে রাখলাম।

এর মধ্যেই মা রুটিতে মাখন লাগিয়ে ফেলেছিল, আমার প্লেটে রেখে বলল, 'খেয়ে নাও'। মা কাজ করছে অথচ চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে, মা রুমাল দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছছে। কেউ কষ্ট পেলে আমি তার দিকে তাকাতে পারি না। অন্যদিকে বুঝতেও পারছিলাম না মা কেন কাঁদছে। মা'র তো কাঁদার কথা নয়। হঠাৎ আমার মনে হল তাকে আসার চিঠিপত্রই মার কান্নার উৎস। আমি খুব নিশ্চিত এটা তাকে থেকে হয়েছে। সিগারেটে

নিভিয়ে দিলাম। মাখন মাখানো রুটিতে একটা কামড় দিয়ে পরের চিঠিটা নিতে গিয়ে দেখলাম, সবার তলায় একটা পোস্টকার্ড, পোস্টকার্ডের স্ট্যাম্পটা আমি দেখতে পাইনি, সেই ছোট শক্ত কাগজটা, যেটায় আমার একটু দুর্বলতা আছে। তাই উপরের চিঠিটা পড়লাম, চিঠিটা এভি কাকা লিখেছেন। বহুদিন সহযোগী নির্দেশক থাকার পর, সে পুরোদস্তুর একজন নির্দেশক হয়েছে। কিন্তু তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রত্যন্ত গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে তার উন্নতি খুবই কম হয়েছে, কারণ তার বেলায় স্থানীয় বেতনক্রম মেনে চলা হচ্ছে, প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে তার ছেলেমেয়েদের স্কুলিং কাপি হয়েছে। নানা কারণে সে নিজেও দুর্বল বোধ করে—অথচ এসবের কোন কারণ সে বলতে পারে না। অনেক ভাবনা চিন্তা করেও সে যখন কিছু বলতে পারত না, তখন আমরা খুবই কষ্ট পেতাম এবং যে শুনত সেই কষ্ট পেত।

যখন আমি পোস্টকার্ডটা পড়ব বলে হাত বাড়িয়েছি, দেখি তারপার নেই। মা পড়ছে। আমি রুকিতে চিনি নাড়লাম। অর্ধেক খাওয়া মাখনরুটির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাবার মৃত্যুতে মা সমস্ত কিছু ভুলে বসেছিল। যেমন আজ কাঁদছে—এটা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না এবং তখন আমি মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথা ভাবিইনি। অসংখ্য চিন্তা তখন তাঁর কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

মাখনরুটি খাওয়ার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। কারণ হঠাৎ মনে হল, মা আমার জন্যে কষ্ট পাচ্ছে। মা কিছু বলল, শুনতে পেলাম না। আমার হাতে পোস্টকার্ডটা ছিল, সেই সময়ই আমি রেজিস্টেশান স্বীকারটা দেখলাম। সেই লালরঙের বর্ডার দেওয়া চতুর্ভুজ, যেটা আরেকটা লাল দাগ দিয়ে দুটো ভাগে ভাগ করা। তার মধ্যে ছোটটায় কালো দিয়ে বড় করে লেখা 'R' অন্য চতুর্ভুজে লেখা "Dusseldorf" এবং 634। এমনিতে পোস্টকার্ডটা খুবই সাধারণ, আমার নামে লেখা এবং পিছনে লেখা ছিল 'ব্রুনো স্নাইডার, আপনাকে ৫, ৮, ৩১-এ আডেনব্রুকের হিফেনবাখেকে আট সপ্তাহের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করছেন।' ব্রুনো স্নাইডার, তারিখ এবং আডেনব্রুক শব্দগুলো টাইপ করা, অন্য সমস্ত ছাপানো। শেষে দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর এবং ছাপানো একটা শব্দ 'মেজর'।

আজকে বুঝি, তখন মেজরের ঐ দুর্বোধ্য স্বাক্ষরের কোন প্রয়োজন ছিল না। যা একটা ছোট মেশিন সহজেই ছেপে দিতে পারত। শুধুমাত্র আরতকার ঐ স্বীকারটার জন্যই আমার মাকে সই করে নিতে হয়েছিল।

মা'র হাতটা ধরে বললাম "ভাবনার কি আছে, মাত্র তো আট সপ্তাহ"। মা খুব শান্তভাবে বলেছিল, "আমি জানি।" বলেছিলাম মাত্র তো আট সপ্তাহ এবং জানতাম মিথ্যা কথা বলছি, মা কাঁদছিল, আর বলছিল, "সত্যি তো, কি আর এমন বেশিদিন?" আমরা দুজনেই মিথ্যা কথা বলেছিলাম এবং একে অপরকে প্রবঞ্চনা করে ছিলাম। জানতাম না কেন মিথ্যা বলছি—অথচ মিথ্যা বলছি এটা বুঝতে পারছিলাম।

রুটি মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আজ বাদে আর তিন দিন আছে। সেদিন বেলা দশটায় আমি এখান থেকে তিনশো মাইল দূরে থাকবো। খারাপ লাগছিল, রুটি ফেলে উঠে পড়লাম। মা'কেও কিছু বললাম না। নিজের ঘরে গেলাম। লেখার টেবিলের কাছে দাঁড়ালাম, ড্রয়ার খুললাম, আবার বন্ধ করলাম। চারিদিকে তাকালাম, বুঝতে পারলাম কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু কি ঘটছে বুঝতে পারলাম না। এই ঘর আর আমার থাকবে না। মনে হচ্ছিল আমার কাছ থেকে সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অথচ আজ বুঝি সেদিন কত অর্থহীন কাজ করেছিলাম। চিঠির বাক্স কিংবা বই আঁতিপাতি করে খোঁজার কোন দরকার ছিল না। কারণ আমি জানতাম কি করতে চলেছি। তাই দ্রুত সুটকেশ গোছাতে শুরু করলাম। শার্ট, প্যান্ট, তোয়ালে এবং জোড়া নিলাম, বাথরুমে দাড়ি কামানোর জিনিসগুলো আনতে গিয়ে দেখলাম, মা তখনও টেবিলে বসে আছে। কিন্তু কাঁদছিল না। মোটে, আমার অর্ধেক

খাওয়া রুটি এবং কাপে কিছুটা কফিও ছিল। মা'র সামনে এসে বসেছিলাম, স্টেলেবাখ্‌কে ফোন করতে হবে, কখন যেতে হবে এসব জেনে নিতে হবে। ও আছে কিনা জেনে ওর কাছে গিয়েছিলাম।

ঠিক বারোটায় স্টেলেবাখ-এর কাছ থেকে ফিরে এলাম। আমাদের সামনের ঘরটা ঝলসানো মাংস আর কোহলরুলের গন্ধে ভরে গেছিল। দেখলাম মা আমাদের ছোট্ট আইসক্রীম মেশিনটায় বেওয়ার জন্য বলিতে বরফ ভাঙছে।

সেদিন রাত আটটায় আমার ট্রেন, পরদিন সকাল ছটায় আশেনব্রুক পৌঁছে যাওয়ার কথা। হেঁটে গেলে স্টেশন মাত্র পনেরো মিনিট। তা সত্ত্বেও বাড়ি থেকে তিনটের সময় বেরিয়ে পড়েছিলাম। মা জানত না আশেনব্রুক পৌঁছাতে কত সময় লাগে—তাই মিথ্যা কথা বলে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

শেষ তিনঘন্টা যখন বাড়িতে ছিলাম, মনে হয় যতদিন ঐ বাড়িতে বাস করেছি তার থেকেও দীর্ঘ সময় ঐ তিন ঘন্টা। আমি জানি না আমরা দুজনে কী করেছিলাম। আমাদের কোন খিদে ছিল না। তবু মা তাড়াতাড়ি মাংস, কোহলরুল, আলুগুলো আর ভ্যানিলা পুডিং রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসেছিল। তখন আমার প্রাতঃরাশের কফি খেলাম। কফি পটে থাকার জন্যে তখনো গরম ছিল। আমি একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম। তখন বারবার একজোড়া কথাই বলেছি আমরা। আমি বলেছি, 'আট সপ্তাহ' আর মা বলেছে 'হ্যাঁ, আমি জানি।' কিন্তু মা তারপর একটুও কাঁদেনি। তিনঘন্টা ধরে দুজনে মিথ্যা কথা বলেছি। আমি ব্যাপারটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। তারপর মা আশীর্বাদ করল। চুমু খেল এবং আমি যখন সামনের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম, জানি মা কাঁদছিল।

তখন ছুটির সময়। তাই স্টেশনে খুব ভিড়। চারিদিকে লোক আর লোক—প্রত্যেকেই সুখী সূর্যের আলোয় নিজেকে সুখী ভাবছিল। আমি একটা বীয়ার নিয়ে প্রতীক্ষালয়ে বসেছিলাম এবং প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ সিদ্ধান্ত নিলাম সেই সুন্দরী বান্ধবীকে ফোন করব।

যখন ডায়াল করছিলাম, নিজেদের চাকতিটা বারবার নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছিল এবং প্রথম পাঁচবারই আমি ভেবেছিলাম ওকে ফোনে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যেই কল্পকর করেছি—অমনি ওর গলা শুনতে পেলাম, "কে বলছেন?" মুহূর্তের জন্য আমি স্তব্ধ হয়েছিলাম। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলেছিলাম "ক্রনো"—একটু থেমে আমার বলেছিলাম, "তুমি কি আসতে পারো? আমাকে যেতে হচ্ছে—সেনা বিভাগে।"

ও জিজ্ঞাসা করেছিল, "এখনই?"

—"হ্যাঁ"

ও কিছু ভাবছিল, চুপচাপ ছিল। টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম কারা যেন সম্ভবত আইসক্রীম কেনার জন্য অর্থসংগ্রহ করছে। "শোনো" ও বলল, "আমি কি স্টেশনে আসব?" বললাম, "হ্যাঁ"।

ও স্টেশনে এল খুব তাড়াতাড়ি।

দশ বছর হয়ে গেল ওকে নিয়ে সংসার করছি। তবু নিশ্চিত হতে পারিনা, সেদিনের টেলিফোনের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা উচিত কিনা। সবচেয়ে বড়কথা, ওদের অফিসে আমার জন্য একটা চাকরী ঠিক করে রেখেছিল। আমি ফিরে আসার পরে ও আমায় হারিয়ে যাওয়া সোনালী স্বপ্নে নতুন রঙ দিয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ওই একমাত্র মানুষ যাকে আমার আজকের উন্নতির জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

সেদিন আমি যতক্ষণ তার সঙ্গে থাকতে পারতাম, ততক্ষণ থাকলাম না। আমরা সিনেমায় গিয়েছিলাম,

কাকা অন্ধকার, ঘরবন্ধ সিনেমা হলের গরমে আমি ওকে চুমু খেয়েছিলাম। যদিও এমন কিছু অনুভব করিনি, তবু ঘন ঘন চুমু খেয়েছিলাম। আটটার আগে স্টেশনে যাওয়ার কোন দরকার ছিল না। তবু ছ'টার সময়ে স্টেশনে গেছিলাম। প্লাটফর্মে আবার চুমু খেলাম। তারপর পুবদিকে যাওয়ার গাড়িতে উঠে পড়লাম।

সেই থেকে আমি সমুদ্র সৈকতের দিকে তাকাতে পারি না। কীরকম একটা কষ্ট হয়। সূর্য, জল আর উল্লাসকরা মানুষগুলো—আমার কাছে কেমন বিষণ্ণ মনে হয়। তার থেকে বর্ষার দিনে ধীরে ধীরে শহরের পথে হাঁটতে ভাল লাগে, কোনো কোনো সময়ে সিনেমাতে যাই, সেখানে আমার পাশে চুমু খাওয়ার মত কেউ থাকে না। এই অভিজ্ঞতে আমার উন্নতির সম্ভাবনা শেষ হয়নি। আমি ডিরেক্টর হতে পারি। সম্ভবত হব এবং সেটা খুব সাধারণ নিয়মেই হবে। অনেকেই ভাবতে পারে আমি কোম্পানীর খুব অনুগত এবং কোম্পানীর অনেক বড় কাজ আমার দ্বারা হবে। আসলে আমি মোটেই অনুগত নই বা কোনরকম বড়কাজ করার ইচ্ছাও আমার নেই।

মাঝে মাঝে সবকিছু ভুলে আমি ছোট স্টীকারটার কথা ভাবি। সেটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। প্রতি গ্রীষ্মে যখন নতুন নতুন কর্মচারী যোগ্যতাসূচক পরীক্ষায় পাশ করে আমার কাছে আসে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য। তখন আমাকে একটা বক্তৃতা দিতে হয়। সেই বক্তৃতায় "উন্নতির সুযোগ" এই শব্দগুচ্ছ বছরের পর একইভাবে ব্যবহার করতে হয় আমাকে। □

[Heinrich Boll. হাইনরিখ্ বোল-এর জন্ম ১৯১৭ সালে কোলন্-এ। স্কুলের পাট চুকিয়ে তিনি পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায় শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দেন। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে জার্মান ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ের পড়াশুনা। কিন্তু স্নাতক হওয়ার আগেই ১৯৩৮ সালে তাঁর নাম 'লেবার' কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন প্রান্তের যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁকে ঘুরতে হয় এবং ১৯৪৫ পর্যন্ত এই কাজে যুক্ত থাকতে হয়। যুদ্ধ বিষয়ক বাধ্যতামূলক কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের জন্য স্থানে ফিরে আসেন এবং ঐখানে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৪৭ সালে মনস্থির করেন যে লেখাকেই জীবিকা হিসাবে নেবেন এবং তারই প্রথম ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৪৯ সালে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন "ট্রেনটা সময় মত এসেছিল" (Der Zug War Punktlich) প্রকাশিত হয়। ঠিক দুবছর বাদে প্রকাশিত হয় প্রথম উপন্যাস" আদম তুমি কোথায় ছিলে ?" (Wo Warst du Adam ?)

হাইনরিখ্ বোল-এর সাহিত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের এবং পরে জার্মান জীবনযাত্রার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষিত প্রতিচ্ছবি। বার্লিন দেওয়ালের দুপাশের মানুষই তাঁর লেখার সমানভাবে আহৃত। প্রায় ১০টা ভাষায় তাঁর সাহিত্য অনূদিত। এমনকি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুও বাংলায় একটি গল্প অনুবাদ করেছিলেন।

একের পর এক বই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার পেয়েছেন দু'হাত ভরে। প্রথম পুরস্কার পান ১৯৫১ সালে, পেয়েছেন বুয়েখনার প্রাইজ, ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বিদেশী উপন্যাসের পুরস্কার এবং আরো অনেক। ১৯৭২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত PEN-এর সভাপতি ছিলেন। ১৬ই জুলাই ১৯৮৫ কোলন্-এ হাইনরিখ্ বোল ৬৮ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে, উপন্যাস : সাড়ে নটায় বিলিয়ার্ডস, ডোমার, শ্রীমতীর সঙ্গে ছবি, এবং গল্প সংকলন : শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার নয়, ছেলেবেলার কটি ইত্যাদি।

এছাড়াও তিনি রেডিও নাটক ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। স্মৃতিকথা প্রকাশ পেয়েছে ১৯৮৫ সালে।]

মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি এবং লেপচা : এক আন্দোলন

টি. কে. দাস, ডি. সি. রায়
অনুবাদ : বিভূতা ঘোষাল

(লেপচা জাতি ভারতের পূর্ব হিমালয়ের কোলে একটি স্বতন্ত্র জনসত্তা যাদের নিজস্ব অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়ে ইংরেজ শাসনের ফলে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাথমিক পর্বে একে স্বীকৃতি দিলেও ১৯৪২ এর মাঝামাঝি সময় থেকে এই ভাষার স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। বর্তমানে লেপচা অ্যাসোসিয়েশন্ বিভিন্ন লেপচা বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য সাধারণ নাগরিকের সহায়তায় লেপচা ভাষা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় রত।)

মাতৃভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের (মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ) চিন্তার প্রতিফলন সমাজের সকলেই অবগত, সকল স্বতন্ত্র জাতির মত লেপচাদের মাতৃভাষা তাদের শিক্ষাগত বিকাশকেই প্রকাশিত করে না, সংস্কৃতিকেও প্রস্ফুটিত করে। দার্জিলিং এর লেপচা (Rong) কমিউনিটি তাদের সাক্ষরতা আন্দোলন মাতৃভাষার গন্ধে ভুলছে, অজান্তে হলেও রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীন চিন্তার সুরে সুর মিলিয়ে।

লেপচারা পূর্বহিমালয়ের কোলে একটি স্বতন্ত্র জনসত্তা যারা ছড়িয়ে আছে কালিংপঙ, দার্জিলিং এবং সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে।

অন্যান্য অনেক উপজাতির মতোই লেপচাদের স্বাধীন লেখচিত্র, সমৃদ্ধ সাহিত্যগত ঐতিহ্য ও সরকারী ভাষা হিসেবে আপন স্বকীয়তা বজায় ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্বে। দার্জিলিং এর যে তিনটি ভাষাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সিকিম পিউটির মাধ্যমে প্রথম জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দেয় তার মধ্যে লেপচা ছিল প্রথম, লেপচা বিশেষজ্ঞ G. B. Mainwaring লক্ষ্য করেছিলেন, "লেপচা ভাষা এই সময় পর্যন্ত সমস্ত সিকিমের ভাষা···যেটা কর্নেল লয়েডের সময়, যখন ব্যবসাপত্র চলছিল, এবং ইংরেজ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন এ সম্পর্কে সকল দলিল, তথ্য লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়েছিল।"

লেপচা জনগণ ও ভাষাকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে অত্যাচার তুঙ্গে ওঠে পুন্তো নামগেয়াল (Phutso Namgyal) (১৬৪২—১৬৭০) এর সময় যখন লেপচা লেখচিত্র ও সমৃদ্ধ তথ্যপঞ্জীকে পুড়িয়ে জঞ্জাল হিসেবে নিক্ষেপিত করা হয়। এই অবস্থা ব্রিটিশ শাসনের শেষ অব্দি বজায় ছিল।

এই পরিবর্তন ও ধ্বংসলীলার ফলে লেপচা ভাষা দ্বিমুখী ও বহুমুখী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এবং তাদের নিজ ভাষা নিষেধের দ্বারাই পরিত্যক্ত হয়। সাধারণভাবে গ্রাম্য লেপচা ছাড়া লেপচাদের ভাষা সংক্রান্ত স্বতন্ত্রতা হারিয়ে যায় আধুনিক বহুমুখী ভাষাতে, সরকারী ভাষার মর্যাদা হিসাবে বিলুপ্তীকরণ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি উপেক্ষা তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্ত সত্তাকেই বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়।

যাইহোক তা সত্ত্বেও ভাষা হিসাবে লেপচাদের নিজস্বতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়নি। বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েও মাতৃভাষাকে পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চলে আসছে শেষ সত্তর বছর ধরে। লেপচা সমিতি, দার্জিলিং এর প্রধান লেপচাদের সংগঠন লেপচাদের সক্রিয় সহযোগিতায় কালিংপঙে ২৪টি স্কুল খুলেছে যেখানে লেপচা ভাষায় 'A', 'B', 'C' শেখানো হচ্ছে।

গ্রামবাসীদের উদ্যোগে কালিংপঙের থেকে প্রায় ৬০ কি. মি দূরে পীত ভ্যালিং ব্লকের অধীনে পোলক বস্তিতে এই রকমই একটি বিদ্যালয় চলছে। মূলকেন্দ্র থেকে বিদ্যালয় পৌঁছাতে পাহাড়ী উঁচু রাস্তায় হাঁটা পথে এক ঘন্টার বেশী সময় লাগে।

এটি প্রায় ৫০০ জন সদস্য বিশিষ্ট ১১টি পরিবারের একটি গ্রাম যেখানে লেপচাদের সংখ্যা বেশী, অবশ্য কিছু নেপালীও গ্রামের উঁচু অংশে বাস করেন। এমন এক উপজাতীয় নিম্ন অর্থনৈতিক জগতে এঁরা বাস করেন যেটা মূলতঃ গড়ে উঠেছে মিনেট, বাজরা এবং ধান উৎপাদন করে, যেটা সম্পূর্ণ ভাবে পরিচালিত হয় বার্টার পদ্ধতির এক অদ্ভুত সহাবস্থানের দ্বারা, অবশ্য কিছু সমৃদ্ধ-কৃষকও আছে যাদের উন্নত মানের জমি আছে এবং তারা অর্থকরী ফসল হিসাবে cardemom ও আদার চাষ করে।

পোলক বস্তির লেপচা বিদ্যালয়টি ১৯৬৪ সালে প্রাথমিক ভাবে চালু হলেও টিনের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত বর্তমান বাড়িটি তৈরী হয় ১৯৯৩ সালে। রেন্ ব্রুকুপ লেপচা নামক এক গ্রামবাসী এক একর জমি দান করেছিলেন কমিউনিটি বিদ্যালয়গঠনের জন্যে, সমগ্র লেপচা সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছায় দান করা অর্থের সাহায্যে বিদ্যালয়ের অর্থ তহবিল গড়ে উঠেছিল। গ্রামের উৎসাহী তরুণ যুবকেরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিল। লেপচা সম্প্রদায় এই গৃহ নির্মানের জন্যে স্বেচ্ছা শ্রম দান করেছিল।

বিদ্যালয়ে একজন তরুণী শিক্ষিকা সমেত চারজন শিক্ষক রয়েছেন। পাসকাল লেপচা, মুকিং লেপচা, ডুরসিং লেপচা যাদের বয়স কুড়ির মধ্যে তারা প্রধানা শিক্ষিকা সাহুমিৎ লেপচার সাথে লেপচা সম্প্রদায়ের তরুণদের শিক্ষিত করার দায়িত্বে লিপ্ত হয়েছেন। শিক্ষার সাথে সাথে তারা অ্যানসরীর সহায়তায় লেপচা সংস্কৃতিকে পুনঃ জাগরিত করতে চেষ্টা করছেন। তারই জন্যে শনি ও রবিবার লেপচা লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের শিক্ষণও চলেছে। এইভাবে বিদ্যালয়টি একই সাথে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে চলেছে।

১২ বছর বয়সের নীচের ছাত্রছাত্রীরা নগ্নপদে, প্রায় ছিন্ন পোশাকে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে এখানে আসে। ২১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সংখ্যাগত প্রভেদ নেই বল্লেই চলে। অধিকাংশেরই শিক্ষার উপকরণ নেই। কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহে ও তদারকিতে এরা লেপচা প্রাথমিক বই 'Lazaong' (K. P. Tamsary কর্তৃক সংকলিত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থনৈতিক অনুদানে ১৯৮২ তে প্রকাশিত) শেষ করে ফেলেছে। বিদ্যালয় শুরু হয় লেপচা প্রার্থনা সঙ্গীতের দ্বারা। যদিও অ-লেপচা হিসাবে একজন এই প্রার্থনার অন্তর্নিহিত অর্থ নাও বুঝতে পারে, কিন্তু ছাত্রদের চোখবন্ধ অবস্থায় হাত জোড় করে শিক্ষকদের সামনে নতজানু হয়ে বসে সমবেত স্বরে আত্মনিবেদনের ভঙ্গিটি এত সুন্দর যে, যে কেউ এই প্রার্থনার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারে।

তারা সাহুমিৎ এর সাথে সমস্বরে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করে এবং সেই শব্দ শ্রোতাদের বুঝতে সাহায্য করে যে তাদের শিক্ষা কতটা নিখুঁত।

পাস্তেল, দয়ামিত্, বেঞ্জামিন লেপচা ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পড়তে পারে।

মাঝে মাঝে অত্যন্ত সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ক্লাসে অনুষ্ঠিত হয়। সকল ছাত্র ছাত্রী সমবেত সঙ্গীতে অংশ নেয় যার মধ্যে লেপচাদের প্রাত্যহিক জীবনের আনন্দ দুঃখের কথা আছে। অধিকাংশ সঙ্গীতের স্রষ্টা হলেন রেন্ এস্ টি লেপচা। (সঙ্গীত নাটক আকাডেমী দ্বারা ১৯৯৮ সালে সম্মানিত) মুসকিং সৃষ্ট কিছু সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হয় লেপচাদের তরুণ প্রজন্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সংকটের ধ্বনি। ছাত্রছাত্রীরা নৃত্যও পরিবেশন করে থাকে।

নিঃসন্দেহে পোলক অঞ্চলের দরিদ্র গ্রামবাসীদের দ্বারা পরিচালিত এই প্রকল্প যথেষ্ট সাহসিক যার প্রভাবে প্রভাবিত হয় আরও কিছু বিদ্যালয় উদাহরণ স্বরূপ "মেনচু" তে উচ্চশ্রেণীতে ইতিহাসও পড়ানো হচ্ছে লেপচা ভাষায়। যাইহোক উদ্যোক্তা সকলের পথে এরা সকলের সাহায্য পাচ্ছে। এখন এর প্রয়োজন উপযুক্ত সরকারী আনুগত্য ও অর্থনৈতিক সহায়তা। এটা শুধুমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সচেতনতা বাড়াবার কাজ নয়, এটা একই সাথে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে এক ধরনের জটিল সামাজিকীকরণ প্রচেষ্টা।

লেপচা সংগঠনগুলি বিংশ শতাব্দীতে লেপচা ভাষার স্বীকৃতির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা লেপচাবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চার করলেও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ও রাজনৈতিক ঔদাসীন্যের ফলে তা নষ্ট হতে বসেছে।

মাতৃভাষা পুনরুদ্ধারের জন্যে, যা একান্তভাবেই সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা রক্ষার প্রচেষ্টাও তার প্রতিফলন ঘটেছে ইয়ং থুপকিং এর এই মানবতাবাদী গানটির প্রতি ছত্রে—

"লেপচা জনগণ হারিয়েছে তাদের উৎপত্তির ইতিহাস
লেপচা জনগণ হারিয়েছে তাদের ঐতিহ্য
তারা নিজেদের জাতি জানে না
তামপ্রা ও তামডেম্ (মহিলাদের পরিধেয় পোশাক) আজ আমরা হারিয়েছি
ভাষা ও সংস্কৃতিকে আমরা ভুলেছি
আমরা জানিনা কেমন করে আমাদের ছুরি বহন করব।
আমরা আজ জানিনা কেমন করে টাকা চালাব।
আমরা জানিনা কেমন করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ফিরে পাব
আমরা জানিনা কেমন করে নদীর ছত্রছায়ায় বাস করব।

মানুষ ও এক গাছ

লিয়ানগ্, সঙ তামসঙ

আমি এক বৃক্ষ, একজন দাতা
আমার শাখা প্রশাখা ঘন সবুজ পাতায় প্রসারিত হয়ে,
আমি তোমাদের জন্যে বৃষ্টি আনি
অপরিহার্য জলকে সংগৃহীত করি,
বাতাসকে পরিশোধিত করি
তোমাদের প্রাণকে রক্ষা করতে।
আমি এক বৃক্ষ, একজন দাতা
আমি সবুজতা, ফুল, ফল, ছায়া এবং আশ্রয় দিই
আমি তোমাদের জন্যে আনি উষ্ণতা, সৌন্দর্য ও আনন্দ,
প্রাকৃতিক বিপর্যয়তাকে নিয়ন্ত্রণ করে
আমি তোমাদের নিরাপত্তা দিই।
কিন্তু বিনিময়ে, তোমরা আমাকে নির্বিচারে ধ্বংস করো।
কুঠার, ছুরি, হাত-করাত ও আগুন জ্বালিয়ে ;
আমি প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হই, ক্ষত হই
এবং সুতীব্র যন্ত্রনায় নীরবে কাঁদি
যখন আমি ভাবি তোমাদের আগামী পৃথিবীর কথা আমাকে ছাড়া
এখন আমাকে পরিচর্যা কর
আগামী কাল তোমাদের পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্যে,
আমি এক গাছ, এক পাতা।

(লেখক এল. এস টামদাঙ "লেপচা সংগঠন" এর সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত। লেপচা ভাষার পুনরুদ্ধারের ও স্বীকৃতির লড়াইয়ে এই সংগ্রামশীল লেখকের লিখিত এই কবিতাটি ১৯৯৬ সালে 'Portraits of life, the National Library of Poetry U.S.A.তে প্রথম প্রকাশিত হয়।)

আমেরিকার একজন আদি মানুষ তার ভূখণ্ডকে দেখছে

এস. স্কট মোমাডে / অনুবাদে : দিলীপ ঘোষ

প্রথম মানুষ দেখ,
ধরিত্রী পত্রদলে ঝলমলে,
নভোমণ্ডল বৃষ্টিতে ঝক্‌ঝক্ করছে,
পরাগ বাহিত হচ্ছে বাতাসে,
ফলে পড়ছে, আশ্রয় পাচ্ছে
পর্বত শ্রেণীতে,
সিডারের চালুদেশে,
পর্বতমাত্র, কালো করে তুলছে,
আর পাইনগাছগুলিকে

একশো শতাব্দী আগে। আজ যেটি নতুন মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চল, সেখানে চওড়া বিষমাকৃতি ভূখণ্ডের সারি। সূর্যটা নিষ্প্রভ, একটা সাদা থালা, সম্পূর্ণ একটা রহস্য যেন, দেবতা কোন এক—যার উদয়াস্ত বন্ধ। ধূসর আকাশ জমাট দুধের মত, আর তা ধরিত্রীর বুকের উপরে ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে। মাটির উপর দিয়ে কনকনে হাওয়া ছুটে চলেছে, বেয়ে আসছে, ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। গভীর গিরিখাতের তলদেশের কোন জলাশয় থেকে তুষারকণাগুলি তাড়া খেয়ে ছুটছে। বাতাস না থাকলে নৈঃশব্দ আরো গভীর। গিরিখাতের গভীরে একজন মানুষ গুটিসুটি মেরে চলছে। সেখানে অন্ধকারে কোন মতে তাকে দেখা যাচ্ছে। কোন দেরী সে সহ্য করছে না, শুধু তার চুলের একটা গুচ্ছকে কখনো বাতাস উড়িয়ে ঘাড়ের পাশে আবার নামিয়ে দিচ্ছে। দেহ তার চামড়ার পোষাকে ঢাকা, আর একখানি বর্শা হাতে নিয়ে চলেছে। তার মানবিক বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রকাশ করছে এইসব জিনিস, আর বিশ্বের প্রভু হিসাবে তার পরিচয়, জ্ঞাপন করছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে তার কাছে বিশেষভাবে এই ভূখণ্ডটিই। আর ভূখণ্ড হচ্ছে বাতাসেরই মতন কোন একটা আদি-উপাদান। বিপুলাকারে প্রসারিত নিষ্পাপ, জনহীন, অকর্ষিত প্রান্তরটিই সামগ্রিক বিচারে তার পরিপ্রেক্ষিত জগত। অন্য কোন জায়গায় জীবনের অস্তিত্বের কোন সম্ভাবনা তার পক্ষে কল্পনীয়।

হাওয়ার স্রোত যেন চোখে দেখা যাচ্ছে, আবহের থেকেও গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের গুড়গুড়ানির শব্দ, লেখকের মাথার উপরে, যে মাটির শক্ত পাড় ভেঙে পড়ছে আর সে তালগুলি সড়াতে সড়াতে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। সেই সাথে পাকাশরেখা ছুড়ে লম্বা শিঙ, বিশাল আকারের বাইসনের মাথা, তারপর পিঠের কুঁজ, ধীরে আস্ত পশুটি, বিপুলাকার আকাশের পটে দাঁড়িয়ে আছে। কুঁজ পর্যন্ত উচ্চতায় সাত ফুট, শিঙসমেত বয়সে লম্বায় ছ'ফুট, সেটি লম্বা কোঁচকানো লোমাবৃত মাথার উপর দিয়ে প্রসারিত। এক মুহূর্তের জন্য মানুষটি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর তীর বরাবর জলাশয়টির দিকে বেঁকে গিয়ে হাল্কা পায়ে এগিয়ে গেল। তখনো সে নড়াচড়া করেনি, যদিও পশুটি এতক্ষণে উপরে কয়েক ফুট মাত্র ঘুরপথের মধ্যে এসে পড়েছে। ঘটতে চলেছে যা তার কোন আন্দাজ করে ওঠা অসম্ভব, পশুটি এঁকে বেঁকে চলেছে, আর লোকটি 'নিথর' নিশ্চল।

বিস্ফোরণ ঘটল দৃশ্যটির তার পরেই। এক মুহূর্তেই লোকটি নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াল, আর সামনের দিকে দ্রুত এগোল, হাতদুটি তার বেঁকে গেল, বর্শাটি উপরের দিকে উঠে গেল, এবং বিশাল আকারের, পশুটি সামনে ঝাঁপ দিল। গর্জন করতে করতে আপন বেগের ভার উন্মত্তভাবে তীরের দিকে সঁপে দিল। তার ক্ষুরগুলি মাটি গুঁড়িয়ে বাতাসে উড়িয়ে চলল, চোখ দুটি উন্মত্ত, আকাশে এবং বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য তার ভয়াত উন্মত্ত গতিবেগ কমে গেল, আর কাদামেখে ভয়ে অসহায় হয়ে পড়ল। তখনি লোকটি সমস্ত শক্তিতে বর্শাটিকে সজোরে ছুঁড়ে দিল। বর্শার ডগাটি গভীরে ঢুকিয়ে দিল, ভেতরের মাংসে। আর বাইসনটি বেদনার যন্ত্রণায় টলতে টলতে ভেঙে পড়ল। তারপর মারা গেল।

অতি প্রাচীন শিকারের এমন নাটকীয় এই দৃশ্যটি বারবার অভিনীত হয়েছে। মানুষটি পরিষ্কারই একজন শিকারজীবী, সবচে বিপজ্জনক। শিকার করে সে জীবনধারনের জন্য। তার সমগ্র অস্তিত্ব, এককথায় বললে ঐ পেশার উপরেই নির্ভর করে আছে। তবুও সে যে শিকার করে তা এই কারণে যে সে তা করতে সক্ষম, যেহেতু তার কাছে হাতিয়ার রয়েছে। তার কাছে সেই কালের সর্বোত্তম হাতিয়ার রয়েছে, আর শিকারও সুপ্রচুর। তখনো সুযোগের সাথে তার সম্পর্ক কোন নৈতিক সমীকরণের মাত্রা অর্জন করেনি।

কিন্তু যথাসময়েই সে বুঝে উঠতে পারবে যে কোন একটা অন্তরঙ্গ যোগাযোগ তার নিজের এবং ধরিত্রীর মধ্যে থেকে গেছে। এমন একটা সম্পর্ক যেটি নির্দেশ করছে অধিকার ও দায়িত্ব পালনের একটা জটিল উর্ণাজাল। অকল্পনীয় সুদূর কোন এক ভবিষ্যতে সে বুঝে উঠবে যে তার পরিবেশকে ধ্বংস করার ক্ষমতা, হয়তো বা বিনাশেরও শক্তি তার আয়ত্তাধীন। এবং সেই মুহূর্তটি হবে বিবর্তনের পথে তার কাছে চূড়ান্ত সংকটগুলির অন্যতম একটি।

হাতিয়ারটি হচ্ছে মারাত্মক এবং ভীষণ কাজের। এটি গড়তে শিকারী গভীর মন করেছে, বিশেষ করে এটির সূঁচালো আগাটিকে নির্মাণ করতে, সেটিই হোল বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রতিটি পার্শ্ব থেকে খড়সড় কণাগুলি ঝরিয়ে ফেলা হয়েছে, একটা খাঁজ হাতল থেকে ডগা পর্যন্ত প্রসারিত। কয়েকশো পাউণ্ডের বল, দক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, এইসব খাঁজগুলি গড়তে প্রয়োজন হয়েছে। শিকারী তো তখন একজন কারিগর। আর তাকে জানতেই হবে কিভাবে পাথিম যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করতে হয়। এইসব শিল্প-বস্তুর নির্মানে তার দক্ষতা প্রকাশ পায়, সময়ও লক্ষ্যের নিরীখে বা কিনা বিবেচনীয়। এই হাতিয়ারের সাহায্যেই প্রত্নইতিহাসিক শিকারী তার পরিবেশকে সুচারুভাবে কাজে লাগাতে পারে।

বহু হাজার বছর পরে, কলম্বাস যে সময়টিতে যখন নতুন পৃথিবীতে নতুন যাত্রা শুরু করছেন, আরেকজন মানুষ, বৃহৎ হ্রদের অকূলে বনের ছায়ায় সূর্যকরোজ্জ্বল ঢালের ধারে দাঁড়িয়ে। একটা হরিণ এক লহমায় আলোকিত বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। লোকটি নিঃশব্দে ধনুকে তীর জুতে নিল, লক্ষ্য স্থির করল, তীরটি ছুঁড়ে দিল। ঘুরন্ত পাক হয়ে গেল তীরটি আর লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানল। হরিণটি লাফ দিয়ে উঠল, তারপর মরে পড়ে গেল।

পরের যুগের এই মানুষটি, তার প্রাচীন পূর্ব-পুরুষের মত নয়, ঘটনাক্রমে শুধু সে একজন শিকারী। একজন কৃষক, এমনকি একজন চিকিৎসকও। সে গাছ কাটে, নৌকা তৈরি করে, সে তরিতরকারি ফলায় শস্য চাষ করে ফলমূল আর বাদাম সংগ্রহ করে, কয়েকশো রকমের বুনোলতা পাতা খাবারের ঔষধি, পানীয় ও ধোয়াধুয়ির কাজে ব্যবহার করে। একটা ছুটো, বা তিনটে পশুর আস্তানায় সে বহুরকম প্রাণী শিকার করে। কোনটিকেই বিনাশ করে না, যেমন প্রত্ন-ইতিহাস শিকারী হয়তো বা করেও থাকতে পারে। নিজেকে সে জনহীন প্রান্তরের জল-প্রকৃতির সঙ্গে আরো নিপুণভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তারই প্রাচীন পূর্বপুরুষদের তুলনায়। যে ভূমিখণ্ডে সে বসবাস করে তা থেকেই

জীবনাহার্য নেয়, কিন্তু একে সে বিনাশ করে না। এই পার্থক্যটুকুই এমন একটি মৌলিক নৈতিকবোধকে উপস্থিত করে আজকের দিনে আমরা যাকে সংরক্ষণ বলে থাকি। যদিও এখনো ঠিক নাম ধরে নয়, তবুও মানুষটি একজন সংরক্ষণবাদী।

শিকারের এই দুটি দৃশ্যচিত্রের মধ্যে বিপুল দূরত্ব, অর্থাৎ সময়ের যাত্রার দিক থেকে সামগ্রিক সম্ভাবনার বিষয়টা ছাড়া নিজেরা পার্থক্যের বিচারে অতি নগণ্য। আমি বিশ্বাস করি যে, সেই মধ্যবর্তী কালপথে মানুষের মনে গড়ে উঠেছিল তৃণখণ্ডের পবিত্র একটা ভাবনা-চিত্র।

প্রত্যূষে যখন যেখানে ছায়ারাশি
ঊষল পুঞ্জিত হয় অপসৃত হয়,
বাতাসে ভাসে, জলাশয়ে। আর স্থির
উড়ে চলে, ঘাসগুলি ভাসে, দূরে
প্রান্তরের চকচক করে, ধোঁয়ার মত।
আকাশে দীপ্তি ছড়ায়।

"ধরিত্রী আমাদের মাতা। আকাশ আমাদের পিতা।" প্রকৃতির এই ছবিটি, আদিম আমেরিকানদের বিশ্বদৃষ্টির কেন্দ্রে যেটি স্থিত, তা আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত। তবুও এটা খুবই স্বাভাবিক যে আমরা সেটিকে পুরোপুরি বুঝতে পারি না, কি সেই ভাবনাটি তার নৈতিক ও দার্শনিক নিহিত অর্থে।

আমার ছাত্রদের আমি বলি যে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের একটি বিশিষ্ট বিনিয়োজন রয়েছে আমেরিকার ভূখণ্ডে। এটি এমন একটা দান যা সম্ভবতঃ উপস্থিত করে তাদের তিরিশ হাজার বছরের জীবন যাত্রার ধারাকে। সেই সময় পর্বটিকে আপনা থেকেই মহামূল্যবান হতে হবে, সত্যিই তা একটা বিরাট ব্যাপার। এখানে ইণ্ডিয়ানরা বাস করছে বহুকাল ব্যাপী, সে এখানে স্বজন্মঃ। সেই সহজ ও সুস্পষ্টতা হচ্ছে সত্যিই ইণ্ডিয়ানদের জগতের সব থেকে জরুরী সত্যের একটি, আর ইণ্ডিয়ানদের মন ও চেতনার এটি একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এমন একটা চেতনা কিভাবে রূপ পরিগ্রহ করলো? কোথায় এর যাত্রারম্ভ? হয়তো এর যাত্রারম্ভ সৌন্দর্যের স্বীকৃতিতে, এমন উপলব্ধিতে ভাগতিক পৃথিবী হচ্ছে সুন্দর। আদিম শিকারীদের অনুভূতিরাশির বিষয়ে আমরা বেশি কিছু জানি না। এমন তো সম্ভব নয় যে তার জীবনে অবসর ছিল, একটা নান্দনিক আদর্শকে রূপদান করার জন্য। তা সত্ত্বেও যে হাতিয়ার সে নির্মাণ করেছিল তা ছিল সুন্দর আবার একই সাথে কার্যকরী। এমন ভাবনা পোষণ করা হয় যে হাতিয়ারের, পাথরেখাদুড়ে যা কিছু কাটাকুটি তা নান্দনিক সন্তোষ দান ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করেনি।

মধ্যঅঞ্চলের বনভূমিতে বাসরত মানুষজন সম্পর্কে আরো একটু বিশদ জানা গেছে। উদাহরণ হিসাবে বলসে সে দেবদারুজাতীয় ও বটগাছের ছাল থেকে সুন্দর বাক্স ও ডিশ তৈরী করেছিল। নৌকাগুলি ছিল তার অত্যাশ্চর্য শিল্পকর্মের সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর নান্দনিক কল্পমূর্তি তার সমসাময়িক সমস্ত ইণ্ডিয়ানদেরই একটা মৌলসূত্র ছিল যেমন তা আমাদের সমসাময়িককালেরও। সমকালের আদিম ইণ্ডিয়ান এমনই মানুষ যাদের গভীর নান্দনিক কল্পমূর্তি পরিষ্কারভাবে তার শিল্পকলা ও হস্তশিল্পকর্মে পরিস্ফুট, তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে এবং তাদের মৌখিক ঐতিহ্যের গল্পগাথায় ও গানে প্রকাশিত। ইণ্ডিয়ানদের জগতের উপর যে চাপ এসে পড়েছে এবং যে বিপুল পরিবর্তন তার ভূখণ্ডজুড়ে আছড়ে পড়েছে সেসবের বিচারে যেমন এটা আশীর্বাদ তেমনি একটা বিপর্যয়ও।

দৃষ্টান্ত রূপে বিচার করে দেখুন চতুর্থ কৌমিক অঞ্চলের নাভাজোদের কথা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ব্যাপক কয়লা-তোলার কাজ তাদের পবিত্র ভূখণ্ডের কোন কোনটিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ঐ একই অঞ্চলে একটা বিশাল শক্তিকেন্দ্র বায়ুমণ্ডলে ধূমপ ছড়িয়েছে যা কিনা বহু মাইল দূর থেকেও দেখা যায়। তথাপি যেকোন মানুষ সম্পর্কে যেমন, আমি শুনেছি তাদেরই মতন নাভাজোরা প্রাকৃতিক বিশ্বের সৌন্দর্য উপলব্ধি এবং উদ্‌যাপন করে।

নাভাজোদের উৎসবানুষ্ঠানের একটি গান রয়েছে, যেখানে প্রাকৃতিক বিশ্বে যে সমস্ত ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে সেগুলিকে অনুষ্ঠান করা হয়, বিশেষ কণ্ঠস্বরগুলি পৃথিবীকে যা সুন্দর করে তোলে :—

উর্ধ্বলোকে কণ্ঠস্বর,
বজ্রের কণ্ঠস্বর,
কথা বলে,
ঘন মেঘের থেকে,
নিচের কণ্ঠধ্বনি,
ঘাসফড়িঙের কণ্ঠ,
কথা বলে,
বৃক্ষের হরিৎ থেকে
তাতেই তো ধরিত্রী
সুন্দর হবে।

এ গানের গতি ও অর্থের গভীরে বিশ্বের এমন একটা অনুভব লুকিয়ে রয়েছে যা বিশেষভাবে আদিম, আমি বিশ্বাস করি তা হচ্ছে আদিম আমেরিকানদের মানসিকতার একটা অত্যন্ত-অর্থ। কল্পনা করুন যে গায়ক প্রাকৃতিক জগতের ঠিক কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে, বিশ্বের ধ্বনিপুঞ্জের উৎসে, সেই বিশ্বলোকের কোন কিছুই তার কাছে অনধিগম্য নয় অথবা তার মনোযোগ আকর্ষিত হয়নি। গান তার ভরে ওঠে শ্রদ্ধায় আর বিস্ময়ে এবং আনন্দে, আর একইভাবে দৃঢ় আস্থায়। নিজের সম্পর্কে সে একটা কিছু জানে, তার চারপাশের সবকিছু সম্পর্কে—আর সে একথা অবহিত যে সে জানে। আমি আগ্রহী, সে কি দেখছে, আর কি শুনছে সে ব্যাপারে। আমি আগ্রহী তার প্রত্যক্ষানুভবের সীমা ও শক্তির বিষয়ে। আমাদের তাৎক্ষনিক অনুকৃতিতে মনে হতে পারে যে তার প্রত্যক্ষানুভব সংকীর্ণ আর গভীর—উন্নত। সর্বোপরি, উর্ধ্বলোকের ধ্বনি···নিম্নলোকের ধ্বনিপুঞ্জের সে শুধু গেয়ে চলেছে। কিন্তু সে কি শুধুই উন্নত? তার প্রকাশের প্রতিটি স্তরে যেখানে তার সচেতনতার প্রসারণ, সমগ্র ভূখণ্ড-বিস্তারী উর্ধ্বলোকের কণ্ঠধ্বনি হচ্ছে বজ্রের কণ্ঠধ্বনি আর সে বজ্র এগিয়ে চলে। তা ছাড়া, সেটি নিঃসৃত হয় স্পর্শাতীত ঘন মেঘের গর্ভ থেকে এবং ছুটে যায় তাদের আনুভূমিক গতিসীমায়। এমন একটা ধ্বনি যা কিনা আবহমণ্ডলের সমস্ত কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আর তৎসত্ত্বেও, নিম্নলোকের ধ্বনি, যা কিনা ঘাসফড়িঙের, উৎসারিত হয়ে থাকে বিস্তৃত প্রান্তর ও অসংখ্য বৃক্ষলতার মধ্য থেকে। আর নিশ্চিত রূপেই গায়ক বজ্র ও কীটপতঙ্গের ধ্বনিপুঞ্জ থেকে অনেক বেশি সজাগ, তার গানে আমাদেরকে পরিবেশন করা হয়েছে তার দর্শনের শ্রবণের প্রসারিত দৃষ্টিকোণ—এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তার মর্যাদার, আমার আর গভীর বিশ্বাসের নিদর্শন।

এটি যেহেতু শুধু পরিবেশের প্রতি মানুষের সহজাত প্রতিক্রিয়াকেই হিসাবে আনে না বরং একইভাবে মনুষ্যত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও সম্যক উপলব্ধিকেও, একজন ব্যক্তি এবং জাতি হিসাবে তার মৌখিক ও আত্মিক উন্নয়নের সাকল্যকেও, সুতরাং পৃথিবী ও আবহ-পরিমণ্ডল সম্পর্কে এমন একটা অনুভবের বোধ নিশ্চিতভাবেই একটা নৈতিকতার ব্যাপার।

নিজের অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির প্রতি বস্তুগত স্বাধীনতার এমন সমস্ত দৃষ্টান্ত আমি দেখতে পেয়েছি। আমার ঠাকুরদা বাপোত্যাটি পরিণত বয়সে ছিলেন একজন চাষী। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন একজন মহিষ শিকারী। মাঝে-

তাদের পক্ষে চাষী হয়ে ওঠার ব্যাপারটা স্বাভাবিক ছিলনা। নিজে তিনি ছিলেন একজন কিয়োবাবের। আর কিয়োবাবের কখনই কৃষিজীবীর ঐতিহ্য ছিল না। তথাপি তাঁকে জীবন নির্বাহ করতে হোত। আর সমতলভূমিতে ঘুরে বেড়াবার সেই পুরনো, প্রিয় জীবন এবং মহিষ শিকার 'চিরদিনের জন্যই অন্তর্হিত হয়ে গেল। তবুও তার পূর্বের যে কোন মানুষের মতনই তিনি মনকে নিবিষ্ট করেন, নিজের সন্তাকে ভূখণ্ডের প্রতি। এ ছাড়া অন্য কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। ভূখণ্ডের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকার কথা তিনি ভাবতেও পারেননি।

আমি 'বৃষ্টিমুখর পর্বতের দিকে পথে' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি ছোট একটি কাহিনী যেটি আমার পরিবারের কথকতার ঐ সূত্রের ধারায় অন্তর্ভুক্ত। ভূখণ্ডের প্রতি আদিম আমেরিকাবাসীদের মনোভাবের বিষয়ে এটি আত্যন্তিক কিছু জরুরী ভাবনা তুলে ধরেছে :—

"আমার ঠাকুমার বাড়ীর পূর্বদিকে, সেতান উকবীদির ঢালিয়ে সুন্দর পোষাকে একজন মহিলাকে কবর দেওয়া হয়। কোথায় তাকে কবর দেওয়া হয়েছে সে কথা মাত্র দুজন জানতেন, কিন্তু, আর কেউই তা জানতেন না। বাড়ীটির সামনের বারান্দায় যদি আপনি দাঁড়ান, কার্বেসির দিকে পূবমুখো তাকান, তাহলে জানবেন যে মহিলাটিকে আপনার দৃষ্টিসীমার মধ্যেই একটা কোথাও কবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমাধিটির কোন চিহ্ন নেই। তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল একটা পবাধারে, আর তার পরনে ছিল, সুন্দর পোষাক। কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল! পোষাকটি ছিল সেই সময়ন্ত পুচাচ হরিণের নরম চামড়ায় তৈরী, আর সেটি অলংকৃত হয়েছিল হরিণের কাঁচা এবং পুঁতির কাজে। সেই পোষাকটি এখনো রয়েছে, সেখানেই মাটির গভীরে।"

এখন আমার মনে হয় যে বিবৃতিটি প্রথমতঃ ভূখণ্ডের প্রতি ভালোবাসারই এক রকমের স্বীকৃতি; যার মধ্যে লুকিয়ে আছে নানান অনুষঙ্গ,—সেই মহিলা, পোষাকটি, আর এই প্রান্তরভূমি—অবশেষে হয়ে দাঁড়ায় একটিই মাত্র বাস্তবতা, প্রকৃতির বুকে সুন্দরের একরকম প্রকাশ। তাছাড়াও এটিকে আমার কাছে মনে হয় এই অর্থে বিশিষ্ট ধরনের ভূমিজ আমেরিকাবাসীদের—অর্থাৎ একই বিন্দুতে বিষয়গুলির মিলে যাওয়া যেগুলিকে স্পষ্টভাবে স্মরণ করা হয়েছে, সাধারণ ভূমিভাগ, দাবলীল, সমাধিটির প্রায় অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক ধরণ, সর্বোপরি সুন্দর সব পোষাকপঞ্জা, যে সমস্ত পরিপূর্ণভাবেই প্রকৃতিতে একাত্ম, (একটভাবে কাহিনী সূত্রের মধ্যে তার কার্যকারিতা) বিশেষভাবেই চরিত্রগত বিচারে ইণ্ডিয়ান; যে সমস্ত বিষয় গুলি স্পষ্টতঃ স্মরণে আনা হয়নি—মহিলাটির নাম, তার কবরের সঠিক স্থান,—এসমস্ত বিষয় গল্পকথকের বিশেষ দৃষ্টির বিচারে খুবই কম জরুরী। এখানে যেটি জরুরী তা হোল ভূখণ্ডের মধ্যে মহিলাটির স্থানান্তকরণ, এমন এক রূপান্তর বিশেষভাবে, অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে সুন্দর ও বিশিষ্ট একটি ইণ্ডিয়ান পোষাকের মধ্য দিয়েই।

আমি যখন বালক, বহু বছর তখন আমি কাটিয়েছিলাম নিও মেক্সিকোর নেমেজ পুয়েবলাতে। পুয়েবলা ইণ্ডিয়ানরা হয়তো বা অন্য মানুষদের থেকেও আরো গভীরভাবে বিনিয়োজিত ভূখণ্ডের সঙ্গে। গোটা জীবন তাদের উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে প্রাকৃতিক জগতের ব্যাপারে। একটি সামগ্রিক উপলব্ধিতে, আর তার বিচিত্র দিকগুলি ঘিরে। যখন সেখানে প্রথম আমি বাস করতে যাই, পুয়েবলাদের গোষ্ঠীপ্রধান ছিলেন এজন শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধ। লম্বা পাকা ধূসর চুল আর গভীরে-ঢোকা উজ্জ্বল চোখ। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবেই একজন লম্বা উদ্রেক করার মতন এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক মানুষ। বরং একজন বাঘের চোখে আরো ভয়ঙ্কর। আমার কল্পনাকে তিনি বিপুলভাবে উসকে দিলেন। আমাকে জানানো হয়েছিল যে বৃদ্ধ এই মানুষটি গোষ্ঠীর জন্য দিন-পঞ্জিকা রাখেন, আর প্রতিদিন প্রত্যুষে কোন একটি বিশেষ

জায়গায় তিনি দাঁড়াতেন, শহরের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি। এবং সঠিক ভাবে দেখবার জন্য যে সূর্য আকাশরেখায় ঠিক কোথায় দর্শন দিল। এই দীর্ঘ দিনলিপির সাহায্যে তিনি জানতে পারতেন এবং জানিয়ে দিতেন নিজের গোষ্ঠীর লোকদেরকে, কখন গাছ পোঁতার সময় এল, ফসল বোনার, এটা বা ওটার অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের। আমার মনশ্চক্ষে ভাসমূর্তিটি—বৃদ্ধ মানুষটি প্রতিদিন প্রত্যুষে নিয়মিতভাবে চলমান সূর্যকে দেখছেন—আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল প্রকৃত সময়ন্বয়ের মৌলিকতা রূপে, মানুষ ও ভূখণ্ডের মধ্যে—যেটি ইতিহাসবিদের জগৎকে বাধ্য করে তোলে।

একদিন আমি যখন আমার ঘোড়ায় চেপে নেমেস নদীর পাড় দিয়ে চলছিলাম, তাকিয়ে দেখলাম দীর্ঘ একটা ক্যারাভানের গাড়িগুলি আর ঘোড়ার পিঠে, পায়ে পায়ে মানুষজন চলেছে। আমাদের সামনের দিকে পশ্চিম বরাবর পুরুষ, নারী ও শিশুরা নদী পার হচ্ছে, সেখানেই বেশির ভাগ চাষের জমি রয়েছে, শহরের খামারেরর খেতগুলি। নজর কাড়ার পক্ষে এটি ছিল আমার কাছে চমকপ্রদ দৃশ্য, এমন লম্বা মিছিলের সারি। আর তৎক্ষণাৎ আমিও ভীষণ উৎসুক হয়ে পড়লাম। আমি অনুসন্ধান করতে চাইলাম। কিন্তু এখনই সেটি করে উঠতে হবে তেমন তাড়া আমার মধ্যে ছিল না। যেহেতু জাতিগত স্মৃতি ও ঐতিহ্যে সেই স্বতন্ত্রতার বোধ, যা কিনা আদিম আমেরিকাবাসীদের সংস্কৃতির গভীরে নিহিত, আমাকে তা থমকে দিল, আটকে রাখল। তারপর দেখলাম কেউ একজন ঘোড়ার পিঠে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, দ্রুত বেগে। সে, আমারই এক বন্ধু, আমারই বয়সী একটি ছেলে। বললো, 'এসো', 'আমাদের সাথে এসো।' সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,—"কোথায় চলেছ তোমরা"? সেকথা কিন্তু সে আমায় বলবে না। সে শুধু হাসলো, আর তাদের সঙ্গে আমায় চলতে বলল। অবশ্য সেটি করতে আমি খুবই আনন্দিত ছিলাম। বসন্তের সে এক উজ্জ্বল সকাল, একটা সুন্দর ঘোড়ায় আমি সওয়ার। আর দুঃসাহসিক যাত্রার সম্ভাবনাটিও বেশ তৃপ্তির। আমরা এগিয়ে চললাম বহুদূর, কয়ে যাওয়া সমতলের উপর দিয়ে, দূরতম প্রান্তর পর্যন্ত বিপুল লাল মেসার পাদদেশ অবধি। আর সেখানে বিশাল ছুটো চাষের খেতে শস্যের চারা লাগালাম। আর তারপর, সেই মাঠেরই ধারে, চাদর পেতে বসলাম এবং কটনউড ঝোপের ছায়ায় ভোজনের উৎসব সারলাম। আমি পরে জেনেছিলাম সেটি ছিল cacique খেত, সেখানেই আমরা শস্য বুনেছিলাম। আর জেমেজে এটি একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। শহরের লোকেরা শস্য বোনে, যত্ন নেয়, cacique খেতগুলিতে ফসল ফলায়। আর শীতের সময় শিকারীরা পাহাড়গুলি থেকে যে মাংস আনে তার একটা ভাগ তাদেরকে দেয়। ব্যাপারটা যেন cacique স্বয়ং মানুষেরই রূপান্তর, ভূখণ্ডের মধ্যেই প্রতিটি মানুষের।

সে দিনটি আমি ভুলিনি, আর কখনো ভুলবও না। খেতের মাটির উষ্ণতা, হাতে ফসলবীজের মসৃণ অবয়ব, ফসল সারির ভেতর দিয়ে ঘোলা বাদামি জলের অপ্রতিরোধ্য ধীরগতিতে বয়ে চলা আমি স্মরণ করতে পারি। সর্বোপরি সেই উদ্দীপনা মিছিলটিকে গড়ে তুলেছিল, গোটা কাজটিকে মূলস্পর্শ করেছিল, আর যেভাবে ভোজনের উৎসব সবাই উপভোগ করেছিল তাও আমি মনে করতে পারি। সেটি ছিল একত্রিত মেলার উদ্দীপনা, এই গ্রহের জীবনের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্কিত হওয়া। আর সেই অসীম দূরত্বের এবং নৈঃশব্দের—যার মধ্য দিয়ে গ্রহটি আবর্তিত হয়ে চলেছে। আমরা সমানতালে সত্তারই একটা যথার্থ অভিব্যক্তি গড়ে তুলি।

কোন এক অপরাহ্নে একজন বৃদ্ধা কিওয়া কথা বললেন আমার সঙ্গে, ওকলাহোমায় যেখানে তিনি একশো বছর ধরে বাস করেছেন, সেই স্থানের কথা। স্থানটিতে আমার প্রপিতামহরাও বাস করেছেন, আর সেই স্থান আমি যেখানে

জন্মেছিলাম। আর তিনি আমার আরো আগের সময়ের কথা বললেন, কিওয়ারা যখন কিনা উত্তরাকাশ থেকে এসেছিল, এবং তাদের কৃষ্টিকে দক্ষিণাকাশের রক্তমৃত্তিকায় সংস্থাপিত করেছিল। চমৎপ্রদ সব কাহিনী তিনি বলেছিলেন—আর যেভাবে আমি শুনেছিলাম তাতে আরো বেশি বেশি করে আমি নিশ্চিত হতে থাকলাম যে তার কণ্ঠস্বর ঠিক যেন ভূখণ্ড থেকেই উৎসারিত। কিওয়াদের সম্পর্কে আমি বহু কিছু জানতে চাইলাম, কারণ আমি বুঝে উঠতে চাইছিলাম যা-কিছু সম্ভবপর আমার ঐতিহ্যের সে সমস্ত কিছুকেই। সেই বৃদ্ধাকে আমি জানিয়েছিলাম যে তার কাছে গিয়েছি সবকিছু জানতে, যা তার মতন মানুষজনের কাছে থেকে জানতে, সেই সমস্ত কিছু পুরাতন জীবনধারা যেগুলির মধ্যে বেঁচে রয়েছে। আর তিনি সহজভাবেই বলেছিলেন—"ভালোই হয়েছে, যে তুমি এখানে এসেছ।" তার "ভালো" শব্দটি গভীরার্থে যে অনেক কিছুকেই বুঝিয়েছে তা আমি বিশ্বাস করি, যদিও একদিক থেকে এটি বোঝার ঠিকই সরল বা যথার্থই। আর সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা যথাযথ ছিল যে নিজের ভূখণ্ড সম্পর্কেই তিনি বলবেন। সেটি করার পক্ষে সত্যিই তিনি যোগ্য ছিলেন, ভূখণ্ডের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল, আর ছিল তার জন্য এক প্রাচীন উপলব্ধি যা কিনা অর্জিত হতে পারে একমাত্র বহু প্রজন্মের পরম্পরার ধারায়।

ঠিক এমনই যথার্থতা আর সেই সাথে সৌন্দর্যের মনোভাব সেটিই ভূমিজ আমেরিকাবাসীদের ভূখণ্ডের বিষয়ে মানসচিত্র গড়ে তোলে। এ সমস্ত মাত্রাগুলি একার্থে আবিভাজ্য। ভূমিজ আমেরিকাবাসীদের মৌখিক ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ গান, এবং কাহিনীতে তারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বন্দনা করে, প্রাকৃতিক জগতের সৌন্দর্য। যা সুন্দর তার থেকে আর কিই বা আমাদের জগতের পক্ষে আরো বেশি উপযোগী?

মধ্যাহ্নে
ঘুঘু পাখিরা
হেঁটে বেড়ায়
উষ্ণ
নিবিড় মাটিতে।

ধোঁয়াটি
ঝাঁক বাঁধে।
তৃণক্ষেত্র
তপ্ত এবং স্বচ্ছ
সমতলের

মধ্য দিয়ে
ঘুরে-ঘুরান্তরে
হারিয়ে যায়।

ভূমিজ আমেরিকাবাসীদের বিশ্বদৃষ্টিতে অতি প্রাচীন এমন বিশ্বাস রয়েছে যে, ধরিত্রী জীবন্ত আর তার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক মাত্রা রয়েছে। এমন একটা মাত্রা মানুষ যেখানে ঠিকমতন বেঁচে থাকে। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই একথা বেরিয়ে আসে যে এ ব্যাপারটির মধ্যে একটা নৈতিক অনুজ্ঞা রয়েছে। যে পরিমাণে আমি ভূখণ্ডের মধ্যে বিরাজমান, আমি মনে করি এটাই সঠিক যে আমার নিজেকে ভূখণ্ডের চেতনায় প্রকাশ করা জরুরী। এই পৃথিবীতে আমার জীবনকে আমি উদযাপন করবো আর বিশ্বও তা করবে আমার জীবন-মধ্যে। মানুষ নিজেকে ভূখণ্ডের মধ্যে নিয়োজিত করে প্রাকৃতিক নিয়মে, আবার একই সঙ্গে ভূখণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় তার একান্ত নিজস্ব বেশিরভাগ মৌলিক অভিজ্ঞতার মধ্যেও। পারস্পরিক এমন বিশ্বস্ততাই হচ্ছে পবিত্র।
আর এমন কল্পনার প্রকৃতিমান নির্ধারিত হয় একই সঙ্গে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। ভূমিজ আমেরিকাবাসীদের ভূখণ্ড সম্পর্কিত দৃষ্টিচেতনা গড়ে উঠেছে সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে। এমন একটা সময়পর্ব যেটি পিছন দিকে বরফ যুগের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত। ভূখণ্ডটি, ভূখণ্ডতার জাতিগত স্মৃতিতেও সুরক্ষিত হয়ে আছে।

আমাদের সমাজে আমরা সুখকে ভাবনা গড়ে নিই মোটের উপর মালিকানা ও ব্যবহারের নিরীখে। বিনিময়ের এটি একটা নিজস্ব মাধ্যম, আমাদের বেশির ভাগ মানুষের কাছে, আমি, আপনি করি যে এটির কোন আধ্যাত্মিক মাত্রা নেই, যেমন একখানা মোটর গাড়ি বা বলা যাক ক্রিকেট ব্যাট থেকে। আমাদের বিধিনিয়ম এমন মনোভাবকেই জানায়, যেহেতু ভূমিখণ্ডকে আমরা কিনতে এবং বেচতে পারি। যে জমিকে এবং থেকে আমরা বহিষ্কারও করতে পারি, আর মালিকানার প্রশ্নে যেমন খুশি তাকে ব্যবহার করতেও পারি মালিকানার মধ্যে নিহিত রয়েছে ব্যবহার আর ব্যবহারের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভোগ।

কিন্তু সুখও ঘিরে এমন ভাবনার ধরন ভূমিজ আমেরিকাবাসীদের কাছে অজানা। এমন সমস্ত ধারণার বিপ্রতীপে তার সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তি, সত্যিই তার পক্ষে, সুখের সবকিছুই অনুভবের মাত্রা। মৌলিক তফাতটুকু বুঝবার পক্ষে সহজতর হয়তো হয়ে ওঠে মালিকানার দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যবহার সেই নিরীখে। স্পষ্ট করে বললে, আমেরিকা-বাসীরাও ব্যবহার করে, আর চিরকালই ব্যবহার করে এসেছে, সুখও ও তার মধ্যে নিহিত সম্পর্ককে। ব্যাপারটা হোল এমন যে ব্যবহার বললে সত্যিকার কোন অর্থেই তাদের সুখও চেতনাকে বোঝায় না। 'ব্যবহার' শব্দটিও তাদের নয়, আর তাদের চেতনাও নয়। একজন ভূমিজ আমেরিকাবাসী হিসাবে আমি চিন্তা করি, তোমরা বল যে আমি সুখকে ব্যবহার করি, আর প্রত্যুত্তরে আমি জানাই ঠিকই ব্যাপারটা সত্যি, তথাপি এটিই একমাত্র সত্য নয়। প্রথম সত্য এটাই যে আমি সুখকে ভালোবাসি। আমি দেখি যে সুখটি সুন্দর। এর মাঝে আমি আনন্দ খুঁজে পাই, এর মধ্যে আমি বেঁচে রয়েছি।

এশিয়া থেকে তার সুদীর্ঘ যাত্রাপথে এবং নতুন জগতে তার নিজস্ব উপলব্ধিতে আদি-ইউরোপীয়রা অর্জন করে নিয়েছে ধরিত্রীর প্রতি একটা গভীর নৈতিক শ্রদ্ধা, আর আকাশ এবং প্রাকৃতিক জগতের প্রতিও একটা শ্রদ্ধার ভাব—যেটি আধুনিক সভ্যতার সেই সমস্ত অদ্ভুত শিক্ষার একেবারে বিপরীত ধরের, যে শিক্ষা আপাতভাবে মনে করে যে মানুষ, তার পরিবেশকে নিঃশেষ করবেই। ভূমিজ আমেরিকাবাসীদের এখন প্রাচীন নৈতিকতা, যেটি পৃথিবীকে সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে সঙ্গে জুড়ুক আর সেইসাথে পৃথিবীর পৃষ্ঠে জীবনকে, পৃথিবীর মধ্যে জীবনকে—

সন্ধ্যাবেলা ঘুমন্ত শেয়ালেরা শীতে জড়সড় হয়ে পড়ে

কালো পাখিরা সাদা ডালে ডালে স্থির বসে থাকে নদীরা

চলে, চাঁদের পিছে, সুদীর্ঘ শুভ্র পথটি পূর্ণচন্দ্রের।

নিঃসঙ্গ দুটো পাতা

লেখক : কতার সিং দগ্গল

ভাষান্তর : নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

[কতার সিং দগ্গল আধুনিক পাঞ্জাবি সাহিত্যে সুপরিচিত নাম। জন্ম—লাহোরে। ১৯১৭-তে। ছোট গল্পকার হিসেবেই এই লেখকের খ্যাতি সর্বাধিক। তাঁর গল্পগ্রন্থ ১৯৬৮-তে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। তিনি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের অধিকর্তা ছিলেন।]

সুন্দরের সোধা কুকুর শেরু ঘরজার চৌকাঠে। হাঁফাচ্ছে। তার শরীরে আঁচড়ানো-কামড়ানোর চিহ্ন। কোনও কোনও ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তও বেরোচ্ছে। পাড়ার ছোকরাদের কাছ থেকে জানা গেল, গুজ্জিদের কুকুর ভাব্বুর সঙ্গে শেরুর জোর একচোট মারপিট হয়েছে। শেরু গুজ্জিদের উঠোনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ভাব্বু হঠাৎ তাকে তেড়ে যায়। আঁচড়ায়। কামড়ায়। ঘরের জানালা দিয়ে নাকি গুজ্জি সব দেখেছে। সুন্দরের নিরীহ কুকুরটা একতরফা মার খেয়েছে। গুজ্জির বাবা ঠিক সময়ে ছুটে না এলে শেরুকে ভাব্বুর আক্রমণ থেকে বাঁচানোই কঠিন হত। ঘটনার বিবরণ শুনে সুন্দর গুম হয়ে গেল।

একদিন গুজ্জি রাস্তায় লোকজনের সামনে সুন্দরের গালে এক চড় কষিয়েছিল। চড়টা বেশ জোরই ছিল। তার জ্বালা সুন্দর এখনও যেন অনুভব করে। পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল গালে।

গুজ্জির এরকম চড় মারার যে খুব গুরুতর কারণ ছিল তাও নয়। রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিল গুজ্জি। বিপরীত দিক থেকে সুন্দরও যেন দ্রুত হেঁটে আসছিল। সরু রাস্তা। তাই ময়লা একপাশে। আর এক দিকে খোঁটায় বাঁধা মোষ। একটা সাইকেলও আসছিল। পাশ কাটাতে গিয়ে সুন্দরের কাঁধ বোধহয় গুজ্জির কাঁধে একটু লেগে গিয়েছিল। সুন্দর বোঝাতেও চেয়েছিল গুজ্জিকে যে সে ইচ্ছে করে ধাক্কা দেয় নি : কিন্তু গুজ্জি বুঝতে চায়নি। তার ধারণা, সুন্দর ইচ্ছে করেই তার গায়ের ওপর এসে পড়েছিল।

পরে অবশ্য সুন্দর ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে। ইচ্ছে করেই হয়তো সে গুজ্জির কাঁধে মৃদু ধাক্কা মেরেছিল। আসলে গুজ্জিকে তার পছন্দ। ভীষণ পছন্দ! পাকা জলপাইয়ের মতন রং গুজ্জির। মাথার চুল লম্বা। চেহারা ছিপছিপে। ফর্সা, ছোট্ট কপালে দু-একটা চুল। গুজ্জির এই রূপের দিকে একবার তাকালে সুন্দরের বুক কেঁপে ওঠে! গুজ্জিকে আদর করতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু গুজ্জির বাবা! সে তো এক মহা রাগী মানুষ। কেউ তাকে বাদুড়ার বলে ডাকতে সাহস পায় না। তাতে রেগে ওঠে মানুষটা। পারলে যেন হাতের কাঁটা তুলে এক-ঘা দিয়েই দেয়। জাতটাই বিচিত্র। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায়—হরিজন। ঈশ্বরের সন্তান। সেই বাবার মেয়ে গুজ্জির মেজাজ বটে! গুজ্জির দিক সুরের ধারালো ফলা। কাউকে রেয়াত করে না মেয়েটা। আর গুজ্জির কুকুর ভাব্বুর মেজাজও একইরকম। পাড়ার আর কোনও কুকুর ভাব্বুর কাছে ঘেঁসতে সাহস পায় না। গুজ্জিদের বাড়ির উঠোনে ঘাড় উঁচু করে রাজার মতন বসে থাকে ভাব্বু। কোনও কুকুরকে কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই ঘেউ ঘেউ আর লাফালাফি। ওর এলাকায় ঢুকে ওকে পেরিয়ে যাবার সাহস কোনও কুকুরেরই হবে না।

সুন্দরের সামনে শেক। হাঁকাচ্ছে। মার তো কম খায়নি বেচারা। তবুও গুড্ডিকে ব্যাপারটা নিয়ে বলার সাহস সুন্দরের নেই। সুন্দর তো কোন্ ছার! গুড্ডিকে কিছু বলার সাহস কারোরই বোধ হয় নেই। গুড্ডির হাতে সুন্দর চড় খেয়েছে। সে আর এমন কী! ছোট্টুকে তো গুড্ডি একবার নিজের পায়ের চটি খুলে কয়েক ঘা কষিয়ে দিয়েছিল। লজ্জায়, অপমানে ছোট্টু তো আর বাড়িই ফিরল না। কোথায় যে চলে গেল! মেয়ে হয়ে এতটা বাড়াবাড়ি গুড্ডির ভাল না। কেউ কিছু বলে না! তাই সাহস দিনকে দিন বেড়েই চলেছে গুড্ডির। রাগে কাঁপছিল সুন্দর।

এসব ভাবছিল যখন সুন্দরের নজর গেল রাস্তার ওপারে সরকারি গেস্ট-হাউসের ছাদের দিকে। গেস্ট-হাউসের গোর্খা-গার্ড ত্রিবর্ণ পতাকাকে ধীরে ধীরে অর্ধেক নামিয়ে রাখছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাকায় এক থমথমে গুমোট ছড়িয়ে পড়ল। লোকজনের ফিসফাস চলছিল: প্রধানমন্ত্রী নেহরু মারা গেছেন। সবাই সবাইকে জানাচ্ছিল সে কথা। কিন্তু মনে হচ্ছিল, কেউই যেন বিশ্বাস করছে না কথাটা। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত। তা দেখেও সকলের মনে অবিশ্বাস। চোখে-মুখে ফুটে উঠছে সেই অবিশ্বাস। একের পর এক সব বাড়ির দরজায় তালা পড়ে যাচ্ছিল। মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। সকলেরই গন্তব্য—প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন! কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তায় শুধু মানুষের চল।

অসংখ্য মানুষের ভিড় রাস্তায়। সকলেরই ঠিকানা—তিন মূর্তিমার্গ। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, লাখ লাখ পিঁপড়ের মিছিল। রোদের তাপ বাড়ছে ক্রমশ। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের গেট বন্ধ। বাইরে অপেক্ষমান মানুষ শুধু মানুষ। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। শুধু মানুষ মানুষ আর মানুষ। এত মানুষ রাস্তায়। কেউ আসছে গাড়িতে। কেউ টাঙায়। ছুটারে কেউ। কেউ বা শুধুই পায়ে হেঁটে। সবার মুখ বিষণ্ণ। কারোর মুখে কথা নেই। প্রত্যেককেই দেখে মনে হচ্ছে তার যেন কী হারিয়েছে! রোদ মাথার ওপর। ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে মানুষের ছায়া। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে যাবার যে কটি রাস্তা;—সবগুলোতেই ভিড়ের চাপ। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, ভদ্রলোক, গরীব—সবাই আছে ভিড়ে। উঁচু পদের চাকুরে এবং অধস্তন কর্মচারীরাও আছে। সবাই হাঁটছে ভিড়ে। সবাই হতভম্ব, অবাক, চিন্তিত।

—'নেহরু অমর হয়ে থাকবেন।'—বলল একজন।

সামনে, পেছনে, আশেপাশে যারা হাঁটছিল সবাই দেখল লোকটাকে। কিন্তু কেউ কিছু মন্তব্য করল না।... মৃত্যু না এলে অমর হবার সুযোগ নেই। নেহরু কী সত্যিই মারা গেছেন? ভিড়ের মধ্যে একজন বৃদ্ধ—তার সাদা দাড়ি উড়ছে হাওয়ায়.—কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে। কয়েকজন তাকে দেখল।

একটা গাছের নীচে ঠাণ্ডা জল বিক্রি করার গাড়ি নিয়ে একজন লোক। কিন্তু তার গাড়ির সামনে ক্রেতা নেই। লোকটা দাঁড়িয়ে। বিষণ্ণ, চুপচাপ। আজ ওর একেবারেই বিক্রি নেই। ভিড়ের মধ্যে সুন্দর দেখতে পেল গুড্ডিকে। একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গুড্ডি। পায়ে জুতো নেই। খুব ক্লেমেছে। ঘামে চকচকে তার মুখ। গুড্ডির সাথে তার কুকুরও। তাকে দেখেই সুন্দরের কুকুর শেক সিঁটিয়ে গেল।

—'জহরলাল অমর হয়ে থাকবেন।' আবার কে যেন বলল। ঘাড় উঁচু করে অনেকেই দেখার চেষ্টা করল তাকে। কিন্তু আর কেউ কিছু বলল না। কোথাও কোনও শব্দ নেই। ভিড়ের মধ্যে একজন মহিলা কিই হয়ে পড়ে গেল। কয়েকজন দৌড়ে গেল সেদিকে। জল-জল! চিৎকার উঠল। এগিয়ে গেল জলের গাড়িটা। বিকেল গড়াচ্ছে। হাওয়া নেই একেবারেই। গাছের পাতারা স্থির।

—গেট খুলছে না কেন ?—বিরক্তি আর ক্লান্তিতে বলল একজন। ভিড় ক্রমশ আরও দুলে আর ফেঁপে উঠছে। তিন মূর্তি মার্গের দিকে আগুয়ান অগণ্য মানুষ। নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে ওরা। সন্ধে নেমে এল। তবুও গরম! মাটি থেকে উঠে আসছে যেন গরম ভাপ। প্রত্যেক মানুষের কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম। ঠোঁট শুকনো প্রত্যেকের। নির্বাক।

—গেট ওরা খুলছে না কেন ?—একজন শিখ ট্যাক্সি-চালক বলল এবার।

—হ্যাঁ। গেট খুলে দেওয়াই উচিত।—খোয়ান চেহারার একজনের সমর্থন।

—সত্যিই এবার গেট খোলা উচিত। এত মানুষ! তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ একবার দেখবে না ?—ছাতা মাথায় সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ।

—গেট খুলুন !—চেঁচিয়ে উঠল একজন মুসলমান টাঙা-চালক।

—গেট খুলুন !—অনেকের গুঞ্জন একসঙ্গে।

—গেট খোলা হোক ? খোলা হোক গেট !—এবার মিলিত চিৎকার। ঠেলাঠেলি আর চিৎকার !

কিন্তু যেমন বন্ধ ছিল গেট তেমনই। শুধু ভিড়ের মাঝে বিষম ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি আরও বাড়ছে ! ক্রমাগত পেছন থেকে চাপ আসছে সামনের মানুষগুলোর ওপর ! লোহার গেট—অনড়। বন্ধ। শুধু উন্মত্ত জনতার চিৎকার —গেট খোল ! খুলে দাও গেট ! মনে হচ্ছিল এবার সোধংয় বিশাল জনতার ঢেউ গেটের ওপর আছড়ে পড়বে। ভেঙে ফেলবে বাধা।…গেট খোল !…গেট খোল !…গেট খোল !…পাগলের মতন চিৎকার করছে জনতা !

ঠেলাঠেলি আর ধাক্কাধাক্কিতে কিছু বৃদ্ধ, মহিলা আর শিশু মাটিতে পড়ে গেলে তাদের মাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছিল ভ্রূক্ষেপহীন জনতার স্রোত !

—এখনই গেট খোলা হবে—এখনই।—ভেতর থেকে কারোর গম্ভীর গলা। মুহূর্তে জনতা শান্ত।

থেমে গেল চিৎকার চেঁচামেচি।

কয়েকটা পুলিশের জিপ আর অ্যাম্বুলেন্স ছুটে এল। ভিড়ের চাপে আহত হয়েছিল যারা তাদের তুলে নিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। চারপাশে আবার নৈঃশব্দ্য। বিষন্নতা ঘন হয় মুখে। ভিড়ের মাঝে সুন্দর নজর করল গুজ্জির বাবা মেয়ের হাত ধরে টেনে ভিড়ের বাইরে নিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু লাভ হল না। কিছুক্ষণ বাদে ওর বাবা যেন বেশ হতাশ হয়ে নিজেই বাড়ির দিকে চলে গেল। গুজ্জি তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে।

নিষ্প্রাণ লৌহ-গেট।

খানিক বাদে মাথার ওপর ট্রেনের শব্দ।

জনতা চোখ তুলে তাকাল।

—জওহরলাল অমর রহে !—বলল একজন।

—জওহরলাল অমর রহে !—গলা মিলিয়ে বলে উঠল আরও অনেকে। ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত একটাই আওয়াজ—জওহরলাল অমর রহে !

ক্রমে আরও অন্ধকার। খুব একা বোধ করছে সুন্দর। খিদেও পাচ্ছিল বেশ। ক্লান্ত পায়ে সে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। সংসদ ভবন, সেক্রেটারিয়েট—সব পার হয়ে হাঁটতে লাগল সুন্দর। এই রাস্তায় কতবার প্রধানমন্ত্রী নেহরুর গাড়ি ছুটেছে ! রাস্তার একপাশে ভিড়ের মাঝে উঁচু হয়ে কতবার সুন্দর, অপেক্ষা করেছে গাড়ির ভেতরে আসীন প্রধানমন্ত্রীকে একবার দর্শনের জন্যে।

সত্যিই ভীষণ একা লাগছে তার।

কিন্তু পর মুহূর্তেই তার মনে হল সে একেবারে একা নয়। পেছনে মন্থর গতিতে আসছে শেক—তার হুকুর।

সামনের মোড় ঘুরতেই সুন্দর দেখতে পেল গুজ্জিকে। গুজ্জিও হাঁটছে। একা। ঠিক একা নয়। গুজ্জিরও পেছনে ভাল্লু—তার পোষা হুকুর।

শেককে দেখে ভাল্লু লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল।

শেকরও যেন ভয় কেটে গেছে।

সেও এগিয়ে গেল ভাল্লুর দিকে।

দুজনে দুজনের গা চাটছে।

এখন অন্ধকার আরও ভারি। আর ঘন। সুন্দর দেখল গুজ্জি রাস্তার ধারে শুলমোহর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আর বোধহয় হাঁটতে পারছে না বেচারা। খুবই ক্লান্ত লাগছে গুজ্জিকে। বিষণ্ণ চোখদুটো তুলে গুজ্জি সুন্দরের দিকে তাকাল।

সুন্দর এবং গুজ্জি দাঁড়িয়ে—মুখোমুখি।

কেউ কোনও কথা বলছে না।

এখন আর গুজ্জির চোখে রাগ নেই। শুলমোহর গাছ থেকে একটা শুকনো পাতা ঠিক দুজনের মাঝখানে খসে পড়ল। খানিক বাদে আর একটা।

গাছ থেকে খসে পড়া নিঃসঙ্গ দুটো পাতা খুব কাছাকাছি। এই মুহূর্তে ঐ দুটো পাতা পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসতে চাইছে। ধীরে—রাত নামছে। □

With Best Compliments From :—

A

WELL

WISHER

"ইণ্ডিয়ান জর্নালে"র উৎসর্গপত্র

অ্যালেন গীনস্‌বার্গ

অনুবাদ : সোমক রায়

যাদেরকে উৎসর্গ করা হল—

মরিস ফ্রীডম্যান—যিনি বলেছিলেন, "গুরুর সন্ধানে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি বন্ধ করো"। স্বামী শিবানন্দ—যিনি বলেছিলেন, "তোমার নিজের হৃদয়টই তোমার গুরু"। যোশের সেই মুসলিম বাবা যে পিটার অর্লোভস্কিকে চুমু খেয়েছিল, সেই দালাই লামা—যিনি জিগ্যেস করেছিলেন—"এল এস ডি খেলে তুমি কি—ওই ব্রিফ্‌কেসের মধ্যে কি আছে—দেখতে পাবে?" যার পরে গ্যারি স্নাইডার অজস্র ওয়ার পাঠ করেছিল প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র; যেহের বাবার কৃষ্ণজি শিল্প—হুমিইওদিতে যে শপথ নিয়েছিল ধারাবাহিক নীরবতার—যে নীরবতা আমেরিকার পক্ষে মঙ্গলময় হবে,—অশোক কবির—যে নিমতলা ঘাটে বাবার পরে নেতৃত্ব দিয়েছিল; কলকাতার স্বামী সত্যানন্দ—যিনি বলেছিলেন—"প্রভূত হুমিই কবি হও তুমি গোপীনাথ কবিরাজ—যিনি বলেছিলেন—"তুমি যা যা করছো, মনে তো হয় ভালোই করছো"; শূন্যতাবোধ নিয়ে বাঁচার পক্ষে কবিতাই যে আমার একমাত্র নির্ভরতা—আমার এই বিশ্বাসের উত্তরে যিনি বলেছিলেন—"কবিতাও তো এক ধরনের সাধনা ও যোগাভ্যাস—যা শূন্যতাবোধে নিমগ্ন হতেও কাজে লাগতে পারে." শ্রীমাতা কৃষ্ণাজি ও বাঁকাবিহারী—বৃন্দাবনের—যিনি বলেছিলেন—"ব্রেককে তোমার গুরু করো", কালিম্পঙের ভূর্জে। রিনপোচে নিং মাপা লামা—যে আমার এল এস ডি জনিত দৃষ্টি বিভ্রমের ভয়কে শান্ত করার জন্যে দাঁত দিয়ে বাতাস আহরণ করেছিল আর উপদেশ দিয়েছিল—"যদি ভয়াবহ কিছু দেখতে পাও, তাহলে ওসব কোরো না। যদি সুন্দর কিছু দেখতে পাও, তাহলেও ওসব কোরো না।" —১৯৬২ সালে এলাহাবাদের মাঘমেলায় সেই অজানা নারী সন্ন্যাসিনী, যে ঘুরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে এত মিষ্টি করে গেয়েছিল যে আমার আজও তা মনে পড়ে; শম্ভু ভারতী বাবা—যে বেনারসের শ্মশান ঘাটে আমাকে ডেকে নিয়ে গাঁজা খাইয়েছিল আর অভয় মুদ্রা দেখিয়েছিল; সীতারাম ওঙ্কারদাস ঠাকুর যিনি পিঁয়াজ মাংস যৌনতা সিগারেট ছেড়ে দিয়ে তিন সপ্তাহ ধরে এক নাগাড়ে গুরু গুরু গুরু গুরু গুরু গুরু জপ করার উপদেশ দিয়েছিলেন গুরু খুঁজে পাবার জন্যে ("সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করো"—একথাও বলেছিলেন) যা নিয়ে গঙ্গার ওপরে বাঁশের মাচায় দেওয়াল বাবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল, পিটার অর্লোভস্কির সঙ্গে আমি মারামারি করার পরে যিনি বলেছিলেন—"ওঃ, কি সাংঘাতিক আহত, কি সাংঘাতিক আহত!"

□ অধুনা প্রয়াত আমেরিকার বীট কবি অ্যালেন গীনস্‌বার্গ মূলত প্রথাবিরোধী, সমকামী, নেশাতুর; ভারতের পথে পথে পরমার্থের সন্ধানে ঘুরেছেন অনেক, পঞ্চাশের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন, কলকাতায় কবিদের মধ্যে সংক্রামিত করেছিলেন মারিজুয়ানা, গাঁজা, চরস, এল এস ডি। বিখ্যাত গ্রন্থ—'হাউল'। ভারতে দিনযাপনের অভিজ্ঞতা নিজের আঁকা ছবিসহ লিপিবদ্ধ আছে "ইণ্ডিয়ান জর্নাল"-এ। অন্যান্য লেখার সঙ্গে এতে "হাইমস্ টু কালী"ও আছে। প্রকাশক : পেঙ্গুইন। দাম ৫০.০০ টাকা।

Seasons Greeting from :

Kamala Tea Company Limited

240-B, A. J. C. BOSE ROAD

CALCUTTA-700 020

Tel : 247-8502, 240-7458

Fax : 247-8876

EXPORTERS OF QUALITY TEA

GARDENS DARJEELING, DOOARS, TRIPURA

With Best Compliments From :—

Anjali Investment & Consultants

6/1. SAKLAT PLACE (2ND FLOOR)

CALCUTTA-700 072.

Near Hindustan Building (L. I. C Mutual Fund Office)

Pone : 236 4195 (0), 344 9490 (R)

Greetings of the Season :—

BERGER PAINTS INDIA LIMITED

BERGER HOUSE

129, PARK STREET
CALCUTTA-700 007

GREETING OF THE SEASON

M/s. MOKALBARI KANOI TEA ESTATE PRIVATE LTD.

13/2 BALLYGUNGE PARK ROAD

CALCUTTA-19

রত্ন সম্রাট

শ্রী মতিলাল বসাক প্রতিষ্ঠিত ৬২ বর্ষ অতিক্রান্ত

ওরিয়েণ্টাল জুয়েলার্স

৮১ নং বিধান সরণী কলকাতা-৪

(হাতিবাগান) ফোন ৫৫৫৬০৯৯

২২ ক্যাঃ গিনি সোনার ও চাঁদি রূপার গহনা এবং আসল গ্রহ রত্ন বিক্রেতা

জ্যোতিষ বিভাগ আছে

এখানে সকল প্রকার গহনার অর্ডার নেওয়া হয়

বিঃ দ্রঃ—রবিবার সম্পূর্ণ দিবস খোলা

বৃহস্পতিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

GRAM : FIXED PRICE

Phone : 237 0053
0064
0256
4302
Fax 033 215 0204

'POWER SYSTEMS'
COMMERCE HOUSE
2, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700013

Authorised Dealer for 'KIRLOSKAR' AC Motors, Pumps, 'NEC' Motors Kilburn Starters, 'BE' Pumps. 'AUE' FHP Motors & Pumps, Polar Pumps, Ammeter Voltmeter, Control Panel accessories Etc.

Our Sister Concerns :

Electrical Elements Co	Authorised stockists of L & T Switchgears
Power Control	Authorised Dealer for Kirloskar AC Motors & Spares.
Raijada Electricals	Authorised Dealer of MEI Switchgears & Rajamane Coolant Pumps.
Power Cam	Authorised Dealer of Kirloskar oil Engine.

With Best Compliments from :—

Hydrochem Products (I) Pvt. Ltd.

206, Abdul Hamid Street

Calcutta-69

Phone No. 2484734

Dealers of : OKS Speciality Lubricants

ION EXCHANGE

TATA NONEYWEW

With Best Compliments from :

Roplas (India) Ltd.

Encl. 145 Mumbai-Pune Road

Pimpri-Pune : 411 018

Phone No. 020-7477289

Best Compliments From :—

KANOI INDUSTRIES
PVT. LTD.

13/2. Ballygunge Park Road
Calcutta-700019

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত আঠাশ বছরের একটি অমল উজ্জ্বলতা

অনুবাদ পত্রিকা

বার্ষিক ১০০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন।

পত্রিকা সংগ্রহ করুন।

লেখা পাঠান।

Greetings of the Season



Elevator Cars, Doors and other Components
Enclosures for Electrical and Air Conditioning Industries

Spring Steel Products

Plot No. A/298, Road 16-Z,
Wagle Estate, Thane - 400 604.
Tel. : 582 1341/1032 Fax : 582 1032
E. Mail : esespl@bom 7.vsnl.net.in

শারদীয়

অনুবাদ পত্রিকা

যে পত্রিকা কখনও পুরোনো হয় না

প্যাপিরাস নিবেদিত চিন্তার সাহিত্য

শঙ্খ ঘোষের

দামিনীর গান ৫০

'এ বইয়ের প্রথম চার কবিতাগুচ্ছের গান, কেবলে কেবলে হয়। অর, এ কেন হলে এই কথা জানা যে একটা লেখা কত সালের কত তিথি নেহাত মিছে পৌঁছায়, কতখানা হয়ে ওঠে সে।'

অনেপনা ঘোষ সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথের গান : সঙ্গ-অনুষঙ্গ

অনেকগুলি গান সূচিপত্র পঞ্জি সমেত বিশিষ্টজনের গান নির্বাচিত হয়ে বিশ্লেষণের ভার শঙ্খ ঘোষ পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বয়স মহিলা কয়েক রাজ্যের কণ্ঠশিল্পের প্রত্যয় করেছেন যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন চিত্রা-সংগীতশিল্পী রবি-প্রাণপ্রবাহের বিশেষ জানার সংকলন।

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫০

সুধীর চন্দ্র-এর

রবীন্দ্রসংগীত : রাগ-সুর নির্দেশিকা

সম্পূর্ণ রবীন্দ্রসংগীতের রাগ-তাল-স্বরলিপি সমান ও সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সম্বলিত অনন্য গ্রন্থ।

পরিবর্ধিত পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ১০০

শঙ্কা সংকট প্রত্যয়

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু

সম্পাদনা সুব্রত মুখোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ মল্লিক সেন দৌহিত্র ভট্টাচার্য প্রণব বিশ্বাস

বইয়ের শেষে অনেক নিয়ে লেখার সাক্ষাৎকার আছে যে লেখেন হয় শঙ্খ ঘোষ Satyajit Dasgupta Irfan Habib প্রমুখ ২১জন কিন্তু লেখকের নাম জানা যায়।

মলাট ১/৮ সাদা ৩২৪ পৃষ্ঠার প্রথমসংস্করণ ১০০

প্রফুল্লকুমার সিকদারের

দুটি আকর্ষক সমালোচনার বই

দুই বাংলার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক কবিতার বৃহদায়তন মূল্যায়ন

চোখের দুটি তারা ৮০

দুই বাংলার কবিতা

আধুনিক বিষয় সংখ্যা ও

সংযোজন হয়ে ওঠার আগে ৩৯টি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা

নবীন যদুর বংশ ৪০

সুচিত্রা চৌধুরী-র

প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য

কিংবদন্তীর পুনর্বিচার

দ্বিতীয় সংস্করণ ৭৫

ঐতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধ এ-বছরের সর্বাধিক মান সুচি পুরস্কারপ্রাপ্ত বই

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গবেষণামূলক বিস্ফোরক উপন্যাস

অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা ৮০

কতটুকু জানি আমরা বিদ্যাসাগরের কথা! জানি কি যে বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিবারিকভাবে রক্ষণশীল পুরুষ—কিন্তু তাঁকে ঘরের মধ্যে আর নয়! এই যে অবিবাহ কোনো সমাজিক ঘটনাই নেই, কিন্তু মূলাস্তরের মজুরী বেশ্যা গমনের মতো এদের সন্ধান করে—যথা এদের বৈধতার উদ্ভব নয়। অথচ বিধবার মতো এরও চায় প্রেমিক, স্বামী-সন্তান—কিন্তু অর্থ-বাধিনের এ-অবস্থাকে পূর্ণতা পায় না কোনোদিনই—তাই এরা অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

সেইও রামিরেস-এর

গল্প সংগ্রহ ৩০

ইয়ান কলকো-র পেদ্রো পারামো

মেক্সিকো-র একটি উপন্যাস ৬০

ভৈকম মুহম্মদ বশীরের শ্রেষ্ঠ গল্প ১২০

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁর কৌতুকময় জীবন যাপনে দৃষ্টিতে আছে জগৎ সমাজ ও জীবন সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর প্রাণ খোলা ও মনোরম।

কল্যাণী ঘোষ অনূদিত

অ্যালান পেটন-এর

প্রিয় স্বদেশ, তুমি কাঁদো ১২০

(Cry, The Beloved Country)

বর্ণবিদ্বেষ আধুনিক কবিদের নিয়ে লেখা একটি মর্মান্তিক ও উজ্জ্বল উপন্যাস। এই উপন্যাসে আছে দেশের মর্মান্তিক পরিস্থিতি বর্ণবিদ্বেষের অনুপ্রবেশ-আক্রান্ত কিভাবে বৃদ্ধিদীপ্ত ও মর্মস্পর্শী হল—তার সংকেত এবং যাদের আক্রান্তরূপ চিত্র। লেখকের বিশ্বাস—প্রেমের ও কৃষ্ণাঙ্গের পারস্পরিক ঘৃণা ও ভয়ের অবসানেই প্রেমের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।

এরিক মারিয়া রেমার্ক-এর

নিস্তব্ধ পশ্চিম রণাঙ্গন ৮০

(All Quiet on the Western Front)

অনেক ওজনদার বহু মুদ্রিতেই এই উপন্যাসের যথেষ্ট চিত্রকালীন। মাত্র ২০০ টাকায়।

কবি শঙ্খ ঘোষের একমাত্র প্রতিবর্ধমূর্তি উপন্যাস

প্যাপিরাস-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য

সুতপা ভট্টাচার্যের

গাঢ় শঙ্খের খোঁজে

মলাট থেকে শেষ-কলা কথা, বেশি শঙ্খ ঘোষের কবিতায়। এ-বইয়ে তাঁর সবকটি কবিতার বই নিয়ে লেখা ন-কলা কথাই উদ্ঘাটন করেছেন লেখিকা—অন্তর্নিহিত নিয়ম উপলব্ধির কথা। পরিশিষ্টে আছে কবির কয়েকটি গদ্যাংশের আলোচনা—যে-লেখায় আমি কবিতার যোগ যে আছেই।

ENGLISH BOOKS

Susobhan Sarkar
ON THE BENGAL RENAISANCE 15/-

Buddhadeva Bose
TAGORE : PORTRAIT OF A POET 60/-
AN ACRE OF GREEN GRASS 50/-

Brajendranath Seal
NEW ESSAYS IN CRITICISM 75/-

Himani Bannerji
THE MIRROR OF CLASS
Essays on Bengali Theatre 200/-

R. K. Dasgupta
EAST WEST LITERARY RELATIONS 150/-

Sisir Kumar Das
THE ARTIST IN CHAINS
The Life of Bipin Chandra Chattopadhyay 200/-

SAHIBS AND MUNSHIS
An Account of the College of Fort William 200/-

Geraldine Heinrich Forbes
POSITIVISM IN BENGAL 200/-

U R Anantha Murthy
LITERATURE & CULTURE 150/-
ed. by A J Thomas

Sumit Sarkar
A CRITIQUE OF COLONIAL INDIA 100/-

Selections from the writings of
HURRISH CHUNDER MOOKERJI
Compiled from the Hindoo Patriot
200 ODD Paper Back 150/-

প্যাপিরাস ।। ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৪ ফোন : ২৫৫৫-৬০৮১

অনুবাদ সাহিত্যের অগ্রগণ্য সংস্থা
এন বি টি-র কিছু অনন্যসাধারণ অনুবাদ

● **পরাজিত নায়ক** — অনুবাদ বোম্মানা বিশ্বনাথন
তেলুগু জীবনকথার এক প্রোজ্জ্বল আলেখ্য।

● **লাল টিনের ছাদ** — অনুবাদ তপশ্রী
জ্ঞানপীঠ পুরস্কৃত লেখক নির্মল বর্মার এই উপন্যাস হিন্দি সাহিত্যের অঙ্গনে এনেছে মনোবিশ্লেষণের এক নতুন আঙ্গিক—এক নতুন শৈলী।

● **পাতুম্মার ছাগল ও বাল্যসখী** — অনুবাদ : নিলীমা অব্রাহাম
জীবন থেকে ছিঁড়ে নেওয়া দুটি পাতার মতো দুটি ছোট্ট মলয়ালম উপন্যাস।

● **দানাপানি** — অনুবাদ : শৈল শর্মা
আধুনিক যন্ত্রধর্মী ও যন্ত্রণাজর্জর জীবনের এক বস্তুনিষ্ঠ, সফল ও পূর্ণাঙ্গ রসভাষ্য এই ওড়িয়া উপন্যাস।

● **যান্ত্রিক** — অনুবাদ সুবিমল বসাক
আধুনিক সৌকর্যের নিরিখে এক অনন্য তামিল উপন্যাস।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার কিছু অবিস্মরণীয় ছোটগল্প সংকলনের অনবদ্য অনুবাদ

● অসমীয়া গল্প সঙ্কলন	অনুবাদ : সুজিৎ চৌধুরী	৭৫.০০
● আদবনের ছোটগল্প সঙ্কলন	অনুবাদ : এস কৃষ্ণমূর্তি	২৮.০০
● আশাপূর্ণাদেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন	লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত	৪০.০০
● একাদশের মলয়ালম গল্পগুচ্ছ	অনুবাদ নিলীমা অব্রাহাম ও বিকুপদ ভট্টাচার্য	৩৪.০০
● একুশটি বাংলা গল্প	সম্পাদনা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৪০.০০
● উর্দু গল্প সঙ্কলন	অনুবাদ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৩৫.০০
● ওড়িয়া ছোটগল্প সঙ্কলন	অনুবাদ জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ারদার	২৫.০০
● কন্নড় ছোটগল্প সঙ্কলন	অনুবাদ মুকুল গুহ	৫৭.০০
● গুজরাতী গল্পগুচ্ছ	অনুবাদ জ্যোতির্ময় দাশ	২৭.০০
● জয়কান্তনের গল্পগুচ্ছ	অনুবাদ বিকুপদ ভট্টাচার্য	১০.৫০
● তামিল গল্প সংগ্রহ	অনুবাদ অজিতকুমার দত্ত	৪০.০০
● তেলুগু গল্প সংগ্রহ	অনুবাদ : ইন্দ্রাণী সরকার	৭০.০০
● প্রেমচন্দের গল্পগুচ্ছ	অনুবাদ : প্রসূন মিত্র	৪০.০০
● ফণীশ্বরনাথ রেণুর শ্রেষ্ঠ গল্প	অনুবাদ : প্রসূন মিত্র	৪০.০০
● মলয়ালম গল্পগুচ্ছ	অনুবাদ : নিবেদন পালিত	৩৪.০০
● মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন	লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত	৩০.০০
● হিন্দি গল্পগুচ্ছ	অনুবাদ ইন্দ্রাণী সরকার	২১.০০
● তেত্সো-চান	অনুবাদ মৌসুমী ভৌমিক	৫৫.০০

ছোটদের জন্য জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব তেৎসুকো কুরোয়ানাগি-র লেখা এই স্মৃতিনির্ভর সাহিত্য এখন বিশ্বের অন্যতম বেস্টসেলার।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

পূর্ব আঞ্চলিক কার্যালয়—৫এ, ভবানী দত্ত লেন কলকাতা ৭০০ ০৭৩, দূরভাষ : ২২৪১-৩৮৯৯

অধুনা প্রাপ্তিযোগ্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান প্রকাশনা

- The Problem of Minorities Dhirendranath Sen 60/- $10.00
- [illegible]
- [illegible]
- Rasvihary Das Philosophical Essay Ramaprasad Das
- Economic Theory, Trade and Quantitative Economics
  Anti Banerjee & Biswajit Chatterjee 200.00
- পূর্বঙ্গের কবিগান সম্পাদনা ও পরিচয়লিপি : ড: দীনেশচন্দ্র সিংহ ৩০০.০০
- [illegible] ৫০.০০
- [illegible] ৯০.০০
- কবিকঙ্কণ চণ্ডী : শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী ১২১.০০
- বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪০.০০
- শাক্ত পদাবলী (চয়নিকা) : শ্রী অমরেন্দ্র নাথ রায় ৭০.০০
- [illegible]
  [illegible]
- [illegible]
  [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] : ড: দীনেশচন্দ্র সিংহ
- [illegible] : ড: দীনেশচন্দ্র সিংহ
- [illegible] : রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন
- [illegible] : ড: শ্রী ধরণীচন্দ্র পাল
- [illegible] : ড: উমা রায়
- বাংলা ভাষায় অভিধানের ক্রমবিকাশ : কমল মুখোপাধ্যায়
- A Dictionary of Indian History
  Sachchidananda Bhattacharyya 250.00
- Elements of the Science of Language
  Irach Jehangir Sorabji Taraporewala 60.00
- A History of Sanskrit Literature S.N. Dasgupta 80.00
- Agrarian System of Ancient India U.N. Ghoshal 15.00
- The Science of Sulva B.B. Dutta 40.00
- Studies in Indian Antiques : H.C. Roychoudhury 55.00
- Studies of Accounting Thought G. Sinha 10/-

আরো বিশদ বিবরণের জন্য : Pradip Kumar Ghosh, Superintendent

|| CALCUTTA UNIVERSITY PRESS 48, Hazra Road, Calcutta-700 019 Phone 2475-9466 ||

বিক্রয় কেন্দ্র : আশুতোষ ভবনের একতলা, কলেজ স্ট্রীট চত্বর

With Best Compliments From

HATS OFF TO ANUBAD PATRIKA FOR THEIR REMARKABLE JOB

M/S PARK INTERNATIONAL

(Fire Fighting Equipment)

6/41 NETAJI NAGAR, KOLKATA - 700 092

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রোড কলকাতা ৭০০ ০২০

বাংলা নাট্য সংকলন ১ম খণ্ড সম্পাদনা ড. অজিতকুমার ঘোষ, বিষ্ণু বসু, নৃপেন্দ্র সাহা ২০০

সফদর হাসমি নাট্য সংগ্রহ (লোভন সংস্করণ) সম্পাদনা নৃপেন্দ্র সাহা ৭৫

শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী উপেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদনা ড. মহাদেবপ্রসাদ সাহা ৪০

নীল দর্পণ (ইং) সম্পাদনা সুধী প্রধান ৭০

থেস্পিস থিয়েট্রেক্স ড. হরাৎ মজুমদার ১৮ | নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী স্মরণে মুখোপাধ্যায় ১ | নাট্যাচার্য শিশিরকুমার পাকড়াশী ভট্টাচার্য ৪০

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ড. অজিতকুমার ঘোষ ১৫ | বাংলার নটনটী (৪র্থ খণ্ড) দেবনারায়ণ গুপ্ত ৩৫ | নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৩ ২০

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৫ ৫০ | নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৬ ৬০ | নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ৩, ৪ (প্রতিটি) ১০

বঙ্গীয় নাট্যশালা স্মরণে মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা : ড. বিষ্ণু বসু ৫০

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯০১-১৯০৯) শংকর ভট্টাচার্য ৬০ | বাংলা কালচের ইতিহাসের উপাদান (১৯১০-১৯১৯) শংকর ভট্টাচার্য

সম্পাদনা : অভিজিৎ ভট্টাচার্য ৮০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস বিহারীলাল নন্দী সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস ৮০

আলোর ঝলকানি ভূপি (২য় সং) উৎপল দত্ত ৪৫ | প্রসঙ্গ নাটকের মন্মথ রায় ৫০ | সম্পাদনা শিব শর্মা

নট-নাট্যকার-নির্দেশক গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি আলেখ্য লেখা বিষ্ণু বসু সম্পাদনা প্রভাতকুমার দাস ৮০

নট-নাট্যকার-নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য একটি আলেখ্য লেখা সন্তোষ বাগচৌধুরী সম্পাদনা নৃপেন্দ্র সাহা ৮০

বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান ড. ব্রজমোহন ঠাকুর ৫৫

প্রাপ্তিস্থান বইঘর কফি হাউস (অপের সিট), রবীন্দ্রসদন, শিবব্রত মল্লিক (শিলিগুড়ি) বাংলা আকাদেমি চত্বর ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-১০

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সারস্বত কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড কলকাতা ৭০০ ০২০

ওড় বাংলা শিশুতে ফেলে পশে বাদুন আকাদেমি বিদেশী বাংলা অভিধান ১৬০

আরও অভিধান আকাদেমি বানান অভিধান ১০

পরিভাষা প্রকাশন (৩য় সং) ২৫ বাংলা বানানবিধি (৩য় সং) ৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র ১০২ খণ্ড প্রকাশিত

কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র সূচীপত্র খণ্ড প্রকাশিত হলো। প্রতি খণ্ড ১০০

শব্দতালি-বাংলা সমার্থক অভিধান ১০০ ক্ষুদিরাম দাস

সাহিত্যের শব্দার্থকোশ ৪০ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়

ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা ১৮ সুভাষ ভট্টাচার্য

২০০৩ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত গ্রন্থ

প্রবন্ধলেখমালা : সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক সংকলন ১৫০, পবিত্র সরকার সম্পাদিত ● সুকুমার সেন ৬০ অলোক রায় ● শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫০ বুদ্ধদেব দাশ ● বাংলার ভাষাতত্ত্বের আন্দোলন ১৩০, অমলেন্দু দে ● অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৩০, অরুণ মুখোপাধ্যায় ● রমরঞ্জন রায় ৪০, শান্তি সিংহ ● পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ১৮০, অজিতকুমার ঘোষ ● সম্পাদক : সাময়িক বিষয়ক গদ্য সংকলন ১৫০, বিষ্ণু বসু অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত ● ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট ১০, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ● গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ (বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়) ৫০, সখ ঘোষ

যোগাযোগ : সুরভাষ ২২২৩-৯১৭৮, ২৩৫৩-০৪০৭

ফ্যাক্স (০৩৩) ২২২৩-০১৪৬ ই-মেল/bakademi@vsnl.com

LIST OF PUBLICATION

JADAVPUR UNIVERSITY

KOLKATA 700 032

PHONE : 2414-6666

ENGLISH

W.B. Yeats An Indian Approach (1968)—Dr. Naresh Guha 15.00

BENGALI

Kadambari O Gadyasahitye Silpachar (1968)—Dr. Hrishikesh Basu 15.00

PHILOSOPHY

Research Bulletin of Philosophy (1984) Special issue—Editor Dr. S. K. Bhattacharya 20.00

SANSKRIT

Tattvasandarbha by Srijiva Goswamin (1967)—Edited Dr. Sitanath Goswami 6.00

HISTORY

Journal of History Vol. II (1981)—Edited Dr. S.K. Maity 20.00

ECONOMICS

Economic Theory, Policy and Estimation (1972)—Department of Economics, J.U. 15.00

GEOLOGY

Contribution to the Geology of Singhbhum (1966)—Prof. S. Deb 5.00

MATHEMATICS

Ship Waves and Wave Resistance (1967)—Dr R.N. Bhattacharya 35.00

ENGINEERING

Principles of Power Project Planning (1973)—Manoranjan Dutta 25.00

With Best Compliments From

INDAL
ADITYA BIRLA GROUP

INDIAN ALUMINIUM COMPANY, LIMITED

Middleton Street, Kolkata 700 071, Telphone (033) 2280 9710,
Fax (033) 2240 3964 www.indal.com

সামান্য কিছু সতর্কতা

ম্যালেরিয়া তাড়াতে পারে

- জ্বর হলেই রক্তপরীক্ষা করান ও পুরোমাত্রায় ওষুধ খান
- ম্যালেরিয়ার মশা কেবল পরিষ্কার জলে জন্মায়—খোলা চৌবাচ্চা, হাঁড়ি-কলসি বা ড্রামে ধরা জল সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন পরিষ্কার করুন
- বর্ষার জল বাড়ির ছাদে বা আনাচে-কানাচে জমতে দেবেন না
- জলের ট্যাঙ্ক ঢেকে রাখুন যাতে মশা ঢুকতে না পারে
- শোয়ার সময় অবশ্যই মশারি টাঙান

ম্যালেরিয়া জীবন নেয় সাবধানের মার নেই।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা

With Best Compliments From

A

Well

Wisher

"চেয়েছিলাম অনেক কিছু করতে।
পেরেছি কিছু বাকি আছে অনেক..."

আমার নিজের গ্রাম। চেয়েছিলাম তার জন্য অনেক কিছু করতে। বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সে সুযোগ দিয়েছে। আজ ইঁটুভর কাদার বদলে হয়েছে পাকা সড়ক, ডিপ টিউব ওয়েল দিয়েছে পরিশ্রুত পানীয় জল।

মেয়েরা হয়েছে অনেকখানি স্ব-নির্ভর, হয়েছে চাষ আবাদের উন্নতি, সেচ ব্যবস্থায় উন্নতি এসেছে, শিশু ও বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি, স্বয়ংম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা এবং তার সঙ্গে শিশুদের অন্ততঃ একবেলা পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ। গ্রামে গ্রামে এসেছে বিদ্যুৎ। কিন্তু এতো যথেষ্ট নয়। আরো অনেক রয়েছে বাকি। তার সঙ্গে শুধরে নিতে হবে আগেকার ত্রুটি বিচ্যুতি। আমি বিশ্বাস রাখি, আমরা আরো অনেক উন্নতি করতে পারবো। যদি পাই আরো একটু সময়, আরো ধৈর্য এবং আপনারা থাকেন পাশে।

ভালো হতো আরো ভালো হলে। কিন্তু যা হয়েছে তাই বা মন্দ কি?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

"স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা"

পর্যটন শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ

বরফে ঢাকা পাহাড় থেকে সোনালী সমুদ্র, বন্য প্রাণীতে ঘেরা ঘন জঙ্গল থেকে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কী নেই পশ্চিমবঙ্গে! পশ্চিমবঙ্গ মানেই এক সম্পূর্ণ ভ্রমণ কাহিনী।

রাজ্য পর্যটন বিভাগের কয়েকটি প্রধান পরিকল্পনা হল, সরকারী ট্যুরিস্ট লজগুলোর পরিকাঠামোগত ও পরিষেবার উন্নতিসাধন, আরও নতুন সরকারী ট্যুরিস্ট লজ এবং তারকাখচিত হোটেলের নির্মাণ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তার পর্যটন বিভাগের কয়েকটি প্রধান পর্যটন প্রকল্পগুলি হল

* ঐতিহাসিক পর্যটন * তীর্থ ভ্রমণ * সাংস্কৃতিক পর্যটন * ক্রীড়া পর্যটন * প্রমোদ উদ্যানের নির্মাণ * অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ * বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী পর্যটন * হিল রিসর্ট * নদী ভ্রমণ * সৈকত পর্যটন * রেল পর্যটন এবং অবশ্যই প্রকৃতি পর্যটন।

অসুন্দর ছবি বেরুই পশ্চিমবঙ্গে, উপভোগ করুন পৃথিবীর এক অনবদ্য রূপ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

Space Donated By

Well Wisher

MR. SANJOY KEDIA

RABINDRA SARANI
KOLKATA

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল

(একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান)



(ক) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রাঙ্গণে ধ্বনি ও আলোক প্রদর্শনী — কলকাতার কাহিনী
প্রদর্শনীর সময় অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬.১৫টা থেকে ৭টা (বাংলা)। ৭.১৫ থেকে ৮ (ইংরাজী)। মার্চ থেকে জুন : সন্ধ্যা ৬-৪৫ টা থেকে ৭-৩০টা (বাংলা) ৭-৪৫ থেকে ৮-৩০টা (ইংরাজী), টিকিট ১০ টাকা ও ২০ টাকা ছাত্রদের জন্য ১০ টাকা। তিন বছরের উর্ধ্বে শিশুদের পুরো টিকিট লাগবে। টিকিট কাউন্টার খোলে দুপুর ১২টা/১২-৩০টা। ব্লক বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ এডুকেশন ইউনিট-ইন-চার্জ।

(খ) প্রদর্শনী চলছে (১) দরবার হলে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ভারত—তৈলচিত্র। শিল্পী টিলি কেটেল, উইলিয়াম ড্যানিয়েল, উইলিয়াম হেজেস, টমাস ড্যানিয়েল, টমাস হিকি, জোহান জোফনি।
স্থায়ী প্রদর্শনী : * জাতীয় মুক্তিকক্ষে দেশবরেণ্য নেতার ছবি * কলকাতা গ্যালারিতে কলকাতা ৩০০ বছর সংক্রান্ত ছবি ও সংগ্রহ, অন্যান্য গ্যালারিতে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের তৈলচিত্র ও অন্যান্য সংগ্রহ

(গ) সাম্প্রতিক প্রকাশনা : ১। চার্লস ডি'এলিস ক্যালকাটা—অ্যালবাম এক ও দুই/৪০ টাকা প্রতিটি। ২। ইন্ডিয়া ইন দি আইভরি অফ ড্যানিয়েলস/৪০ টাকা। ৩। ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিন বাই সিনসন/৪০ টাকা। ৪। সিলেক্ট ভিউজ অফ ইন্ডিয়া/৪০ টাকা। ৫। পিকচার পোস্টকার্ড সেট-ডি/১০ টাকা। ৬। পিকচার কেলিও নম্বর ১/১ টাকা। ৭। পিকচার কেলিও নম্বর ২/২ টাকা। ৮। সেরামিক টাইলস (ভিউজ অফ সেন্ট অন্দ্রেজ চার্চ)/৩২ টাকা। ৯। চক্রবর্তী, স্টিফেন অ্যান আনলি হিস্টোরিক্যাল পারসপেকটিভ ফর দা ক্যালকাটা টারসেন্টেনারি/৩৫ টাকা। ১০। গ্রেগ, চার্লস : ল্যাওস্কেপ পেন্টিংস ইন দা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল/১৫০ টাকা। ১১। গোস্বা, চৌধুরী এন্ড ভাস্কর চন্দ্র : এ কমপ্রিহেনসিভ কাটালগ অফ ওয়াটার কালারস, পেস্টিল স্কেচেস অ্যান্ড ইঙ্ক ড্রয়িংস ইনদা কলেকশনসন অফ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল/১৫ টাকা। ১২। উর্দু গাইড বুক/৫ টাকা। ১৩। গাঙ্গুলি, কে কে : মর্ডান মাস্টারস/৩৫ টাকা। ১৪। কাটালগ অফ-বার্টস এন্ড স্টাচুয়ারি/২.৫০ টাকা। ১৫। ক্যালকাটা গ্যালারি—ইন্ডিয়ান ফাস্ট সিটি গ্যালারি/৫০ টাকা। ১৬। কনটেমপোরারি আর্ট অফ বেঙ্গল/৩৭৫ টাকা। ১৭। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ২০০০ ন্যাচারল হিস্ট্রি পেন্টিং অ্যালবাম সিরিজ এক থেকে তিন/৯০ টাকা প্রতিটি। ১৮। হিসকেপ অফ ইন্ডিয়া/৭০ টাকা। ১৯। ভিক্টোরিয়া, আর্ট নাইট/৫টাকা। ২০। নাথনাল সিভারস পেন্টেড গ্যালারি/১.২৫ টাকা।

১, কুইন্সওয়ে, কলকাতা ৭০০ ০৭১, ফোন ২২২৩-১৮৯০-৯১/৫১৪২, ফ্যাক্স ২২২৩-৫১৪২
www.victoriamemorial-cal.org

With Best Compliments From

A Well Wisher

With Best Compliments From

G. D. ENTERPRISE

121 BANSDRONI PARK,
KOLKATA 700 070

With Best Compliments From

'BASANTI CONSTRUCTION'

DEVELOPER & CONTRACTOR

254/A, K. C. GHOSH ROAD,
KOLKATA 700 050

With Best Compliments From

South Calcutta Decorating Centre & Caterer

CONTACT NUMBER
(R) 2471-9414
(Mobile) 31048818

বাংলা ভাষান্তরে ভারতীয় গল্পসম্ভার

আমাদের গাছপালা দেহরাতে — মৈথিলী গল্প সংকলন ৬৫.০০
এখনও জন্মায় ৬০.০০ — সম্পাদনা কামাখ্যা দেবী
অমলকিন বসু — অনুবাদ গৌরী সেন
অনুবাদ অমীয় চৌধুরী — তেলুগু গল্প সংকলন ৮০.০০
কৃষ্ণ চন্দরের নির্বাচিত — অনুবাদ সুনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
গল্প ১০০.০০ — নির্বাচিত কন্নড়
অনুবাদ নবী সুর — ছোট গল্প ১৫০.০০
হিন্দি গল্পসংকলন ১৪০.০০ — সম্পাদনা জি এস আমুর
সংকলন ও সম্পাদনা : ভীষ্ম সাহনি — অনুবাদ ঈশানী মুখার্জী
অনুবাদ : সুবিমল বসাক — কাক ও কালাপানি ৪০.০০
মধুপুর বহুদূর ৪০.০০ — নির্মল বর্মা,
শীলভদ্র — অনুবাদ মায়া ওঝা
হেমন্তের কান্না ১০০.০০ — ঠাকুরঘর ৭০.০০
কৃষ্ণচন্দরএর স্মরণীয় — বিশেশ্বরীচরণ দাস
অনুবাদ সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় — অনুবাদ : জ্যোতিপ্রিয়মোহন চৌধুরী

সাহিত্য অকাদেমি
জীবনতারা, ২৩এ/৪৪ এক্স্, আরমেনিয়ান স্ট্রিটের রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৪৩, দূরভাষ ২৪৭৮-১৮০৬
প্রাপ্তিস্থান : অকাদেমি দপ্তর, দে বুক স্টোর, নব প্রকাশ,
উষা পাবলিশিং, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি।

With Best Compliments From

M/s. Mokalbari Kanoi Tea Estate Private Ltd.

13/2, BALLYGUNGE PARK ROAD

KOLKATA - 700 019

With Best Compliments From

KAMALA TEA COMPANY LIMITED

240-B, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020
Telephone 2247-8562, 2240-7458
Fax 2247-8876

EXPORTERS OF QUALITY TEA

Garden DARJEELING, DOOARS, TRIPURA

অনুবাদ গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রকাশন সংস্থা

ভাষা-সংসদ-এর কয়েকটি অসাধারণ বই

- নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ — নারায়ণ চৌধুরী
- ম্যাস্কুলা ফেমিনা — জাঁ লুক গদার অনুবাদ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
- আধুনিক বিদেশী কবিতা — সুনীলবরণ রায়
- ছড়ায় এসো ছড়ায় বসো — ষষ্ঠীচরণ চট্টোপাধ্যায়
- মানুষের শুদ্ধ সঙ্গীত — অলকেশ ভট্টাচার্য
- বন্যার জোয়ার — রমা ভট্টাচার্য
- পূবের জানালা — অতুল দত্ত
- ক্যাম্পিং — অঞ্জন রায়

A

Well

Wisher

With Best Compliments From

ADVOCATES HOUSE

(FOR ANY SORT OF LEGAL PROBLEMS)

3, SHAMBHU CHATTERJEE STREET, 1ST FLOOR, KOLKATA 700 007
PHONE 2219-2178

Contact

Sanatan Roychaudhuri Advocate, High Court, Calcutta
Phone (R) 2546-1308, (M) 94330-10231

Joydeep Das Advocate, High Court, Calcutta
Phone (R) 2531-6314, (M) 94330-10232

Space Donated By

A Well Wisher

Space Donated By

A Well Wisher

With Best Compliments From

A
Well
Wisher

With Best Compliments From

Silver Arts

F-34, NEW MARKET
NEAR FLOWER RANGE
KOLKATA - 700 087
Phone 2252-2906
CeLL 31089367
Resi 2240-8717

৫৪তম নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে (১৯৮১) অভিনন্দিত এবং
'আনন্দ পুরস্কার', আন্তর্জাতিক 'মাতা কুসুমকুমারী' পুরস্কারে সম্মানিত

অনুবাদ পত্রিকা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যা ২০০৩

সম্পাদক : বৈশম্পায়ন ঘোষাল

যুগ্ম সম্পাদক : অনুরাধা মহাপাত্র *সহ সম্পাদক* বিতস্তা ঘোষাল

মুখ্য উপদেষ্টা : স্বরাজ সেনগুপ্ত

Registration No. N 27088/75

A Bengali Quarterly Journal of Translation

ANUBAD PATRIKA

SEPTEMBER-OCTOBER 2003

Editor Baishampayan Ghoshal

Joint Editor Anuradha Mahapatra *Assistant Editor* : Bitasta Ghoshal

Chief Adviser Swaraj Sengupta

পরিবেশক

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদশিল্পী দেবাশিস রায়

দাম : পঞ্চাশ টাকা

সম্পাদক বৈশম্পায়ন ঘোষাল

ভাষা সংসদ-এর পক্ষে বৈশম্পায়ন ঘোষাল কর্তৃক ৩ শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত ও টেক্‌নোপ্রিন্ট ৭, সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

দূরভাষ ২২১৯-২১৭৮ (অফিস) ২৫৪৬-১৩০৮ (বাড়ি)
2219-2178 (Office) 2546-1308 (Resi.)

সম্পাদকীয়

একশো কোটির ওপর ভারতবাসীর হৃদয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াস একমাত্র ভাববন্ধনেই সম্ভব। আর বাংলাভাষার সীমানা আজ নিজের দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর নানান প্রান্তে। তবে এ-কথা ভুললে চলবে না যে এ-বাংলার প্রাণের সঙ্গে যুক্ত প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশের হৃদয়।

অনুবাদ পত্রিকা এই ভাববন্ধনের কাজ সত্যনিষ্ঠ ভাবে দীর্ঘকাল করে এসেছে। তবু সারা পৃথিবীতে, দেশে দেশে এত সাম্প্রদায়িকতা, এত হানাহানি, রক্তপাত কেন? এর উত্তর খুব গভীরভাবে ভাবতে হবে। আরও গভীরতর সন্ধানে যেতে হবে আমাদের। 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো', রবীন্দ্রনাথের এই অনুসন্ধানই হয়তো সমস্ত বাঙালী, সমস্ত ভারতবাসীর একক প্রাণের কথা। কোথায় থেকে যাচ্ছে আমাদের অমনোযোগ? কেন এই দেশেও হয় সাম্প্রদায়িক রক্তপাত? কেন ইউরোপ শোষণ করে, লুঠ করে এখনও একবিংশ শতকে এসে সমগ্র মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা, আরব দেশগুলোকে। কেন ইরাকের ওপর আমেরিকার আগ্রাসী নারকীয় নির্যাতন, স্বাধীনতা বর্ষণ। কেন এখনও আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, জাত-পাতের তুলামূল্যে মনুষ্যকে ঘৃণ্যভাবে শোষণ ও অবজ্ঞা করা হয়? আমরা সমস্ত শিক্ষিত সমাজও কি যথেষ্ট উদাসীন স্বার্থকেন্দ্রিক নই পাশের মানুষের প্রতি। ভেবে দেখার সময় শুধু বয়ে যায়। আমরা উগ্র আত্মস্বার্থ প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিস্তৃত ধ্বংসের অবক্ষয়ী এক মনুষ্যপ্রজাতিতে রূপান্তরিত হচ্ছি। আকাশে যে দিগন্তহীন আলোর বিদ্যুৎরেখা মাঝেমধ্যেই হেনে যায়, আমরা সে আলোর ইশারায় আলোকিত হতে পারিনা কেন? এমন কোন্ সে চাবি, যা আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা অন্ধকারের বন্ধ দরজা খুলে দেওয়ার। মানুষের আত্মানুসন্ধানও কি তবে শেষ?

একথা শেষ অব্দি মেনে না নিয়েও ভাবতে পারি, একজন বাঙালী, একজন ভারতবাসী এই সময়ে একজন আন্তর্জাতিক মানুষও। ভারতবর্ষের কোনো এক প্রান্তের একভাষিক মানুষকে ভাবতে হবে আফ্রিকার কোনো এক জনজাতির মানুষের বেঁচে থাকা, তার ইতিহাস, তার সাম্প্রতিকতম এক্সপ্রেশনকেও। ভাবতে হবে শুধু বাংলার একজন শ্রমিক, কৃষক নয়, নাইজিরিয়া অথবা ঘানার মানুষের ভাষা ও স্বপ্নের কথা, তার অস্তিত্বের লড়াইয়ের দিকগুলি নিয়ে। একজন বাঙালীকে জানতে হবে শ্যাম, কম্বোজ, তিব্বত, শ্রীলঙ্কার অভিবিপন্ন, অত্যন্ত গভীর গোপন সংস্কৃতিময় জনপদ মানুষের মুখের ও মস্তিষ্কের ভাষা। একজন মানুষের মস্তিষ্কেই লুকনো আছে হাজার বছরের ভাষা ইতিহাস।

অন্ধকার যত জটিল ও দুর্ভেদ্য হোক, যুদ্ধ ও রক্তপাত যতটা বাস্তবতার চেহারা পাক, আলোর সন্ধান ভিন্ন অন্য কোনো, ভিন্ন কোনো পথ নেই। ভালোবেসে প্রতি মানুষের হৃদয়ে আলো জ্বালার প্রয়াসই যে কোনো বিজ্ঞানী, যে কোনো বিপ্লবী, যে কোনো শ্রমণ, যে কোনো মানুষের একমাত্র পথ। আর সে পথের আধারই পৃথিবীব্যাপী মানুষে মানুষে ভাষার মেলবন্ধন। 'অনুবাদ পত্রিকা' সেই প্রয়াসে প্রয়াসী।

আমরা এই সংখ্যায় বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই বাংলার ও আন্তর্জাতিক মানুষের সমমর্মী কবি, অনুবাদক, ভাষাশিল্পস্রষ্টা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে। 'অনুবাদ পত্রিকা'র সঙ্গে তাঁর একধরণের গভীর মনস্কতার সম্পর্ক ছিল। অনুবাদ সাহিত্য বিশেষ করে অনুবাদ কবিতাকে তিনি বাংলাভাষায় একান্ত প্রেমে এক অনন্য শিল্পসৌকর্য ও টেরাকোটার শিল্পের মাত্রা দিয়ে গিয়েছেন যা বাংলাভাষায় বিরল সম্পদ হয়ে থাকবে। চিরকালের বাঙালীর স্মৃতিধার্য হয়ে থাকবে নাজিম হিকমত, হাফিজ, গাথাসপ্তশতী, অমরুশতক ও অন্যান্য অনুবাদ সাহিত্যে। মৃত্যুর পরে মানুষের শরীর নয়, তার কাজ, তার প্রাণের আলো ছড়িয়ে যায় দিগন্ত থেকে দিগন্তে, প্রাণের অসীমে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ও অনুবাদে এমন এক আলো রয়ে গেছে, হয়তো কোনো ভবিষ্যৎকে উদ্ভাসিত করার অপেক্ষায়। জীবন ও মৃত্যু, দীর্ঘকালের রাজনৈতিক মিথ্যে দ্বন্দ্ব ও পচন সেই আলোকে বিনষ্ট করতে পারেনা; কারণ আলোর ক্ষয় নেই।

আমরা বিনম্র ২০০৩-এর শারদ শুভেচ্ছায় সমস্ত সুধী সহৃদয় লেখক, অনুবাদক, পাঠক এবং বিজ্ঞাপনদাতা, ভাষাপ্রেমিকদের প্রতি। যাঁদের সহযোগ ব্যতিরেকে 'অনুবাদ পত্রিকা'-র বর্তমান ভাষা-শিল্প সাহিত্যযোগের যথার্থ প্রকাশ প্রায় অধরা থেকে যেত। মুক্ত পাঠক আরো নিবিড় চোখ এগিয়ে দেবেন কী?

গত ২৭শে এপ্রিল, ২০০৩, আমাদের অনুবাদ পত্রিকা অফিসে গভীর রাতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে অফিসে রক্ষিত পুরোনো দুর্মূল্য 'অনুবাদ পত্রিকা'র সংকলন, ফাইল, কাগজপত্র, কম্পিউটার, টাইপরাইটার সমস্ত ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই নিদারুণ দুর্ঘটনায় আমরা অনুবাদ পত্রিকার 'জুন-আগস্ট' সংখ্যা প্রকাশ করতে পারিনি। একই সঙ্গে ভীষণ ভাবে আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হয়ে পড়েছি। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের অবস্থা বিবেচনা করবেন।

[সম্পাদক]

অনুবাদ পত্রিকার গ্রাহক হোন।

অনুবাদ পত্রিকা পড়ুন, পড়ান।

আপনার প্রিয় লেখকের শ্রেষ্ঠ অনুবাদটি পাঠান।

লেখা নির্বাচন সম্পাদকমণ্ডলীর।
অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

গ্রাহক মূল্য বার্ষিক ১০০ টাকা।

সূচীপত্র

কবিতা

উদ্‌বাস্তু মা আর শিশু	চিনুয়া আচিবি	অনুবাদ শঙ্খ ঘোষ
নারীর মূল্যবোধ এবং সারা কির্শ্‌-এর কবিতা		অনুবাদ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
সুগন্ধে ভরপুর একটি মন্দির অতিক্রম করার সময়	ওয়াং-উই	অনুবাদ আনন্দ ঘোষ হাজরা
বাগানের একটি গোলাপ	মুস্‌লি-উদ্‌-দিন সাদী	অনুবাদ সোমক দাস
প্যারিসে তুষারপাত	লিওপোল্ড সেদর সেনেগার	অনুবাদ অনন্ত দাশ
মৃত্যু আজ সামনে আমার	অনামিকা	
হোরেস	কুইন্তুস হোরেশিয়াস ফ্লেক্কাস	অনুবাদ অতুলকুমার দত্ত
কালো মানুষের কবিতা		অনুবাদ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপরিচিত-কে	ওয়াল্ট হুইটম্যান	অনুবাদ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দ ছাড়িয়ে	ব্রুস ব্রিসলে	অনুবাদ : তমাল লাহা
আন্তর্জাতিক মহিলা কবিদের কবিতা		অনুবাদ রবিন পাল
জুলাইয়ের সেই রাত	লুই আরাঁগ	অনুবাদ : বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
তাই বলে		
বেসুমার	মোহাম্মদ রফিক	বাংলাদেশের কবিতা
মা	মাসুদ খান	সংকলক অরুণ সেন
কয়েকটি ছিন্নসূত্র		
বোধিপথপ্রদীপ অংশ	অতীশ দীপঙ্কর	অনুবাদ অমিতাভ গুপ্ত
কয়েকটি কবিতা	আইয়াপ্পা পানিকর, কে.	অনুবাদ উৎপলকুমার বসু
জীবন	বিপুলজ্যোতি শইকিয়া	
আমি ও নদী	ধীরেন ভট্টাচার্য	অনুবাদ তিতাস মিত্র
বিদায়	নিদা ফজলি	
প্রস্রব	মোহম্মদ আলভি	অনুবাদ : অনির্বাণ রায়
সাঁওতালী লোক সঙ্গীত		
সম্প্রীতির খোঁজে	এডুয়ম হেমব্রম	অনুবাদ মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

নাটিকা

বলিষ্ঠতরা	আউগস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ	অনুবাদ : শিবনারায়ণ রায়

গল্প

স্কাইলাইট	আইজাক বেবেল	অনুবাদ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
সাধুসন্ত এবং তাঁর বন্ধু বাবাবেক সম্পর্কে একজন তুর্কির পত্র	ভলতের	অনুবাদ পুষ্কর দাশগুপ্ত
জলের ঘটি ও জোয়ারের থলি	সাপোআমি জয়রাব	অনুবাদ : মিহির ভট্টাচার্য

ওমেলাস ছেড়ে যারা চলে যায়	উরসুলা কে. লেগুইন্	অনুবাদ : সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়	৩৫
পায়রা	আইজাক সিঙ্গার	অনুবাদ বৌধায়ন মুখোপাধ্যায়	৩৯
শেষ বিচার	কারেল চাপেক	অনুবাদ নীরজা	৪৬
একাকিনী	মন্নু ভাণ্ডারি	অনুবাদ : ননী শূর	৪৯
নাইট-শিফট	পল জাকারিয়া	অনুবাদ নবনীতা দেবসেন	৫৩
দোহা	পি. লঙ্কেশ	অনুবাদ : জি. কুমারাপ্পা, জাহিরুল হাসান	৫৫
মেঘে ঢাকা মুখ	হিমেশ	অনুবাদ তরুণ দীর্ঘাঙ্গী	৫৯
ভুবন ও গুরুর সৃষ্টি	আর. চূড়ামণি	অনুবাদ অনুরাধা মহাপাত্র	৬১
মরণ-ঋতু	দলীপ কৌর তিওয়ানা	অনুবাদ সীমন্তিনী গুপ্ত	৬৫
অতৃপ্ত আত্মাদের রেলভ্রমণ	শরদ জোশী	অনুবাদ : পার্থসারথী শীল	৬৭
মা	বেঙ্কটেশ্বর রাও	অনুবাদ : বিতস্তা ঘোষাল	৭৩

চিঠি

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিঠি	অনুবাদ : নিরঞ্জন হালদার	৭৫

বিশেষ রচনা

জরাথুস্ত্র এমনই বলেন	ফ্রেডরিক নীৎসে	অনুবাদ দিলীপ ঘোষ

প্রবন্ধ

শৃঙ্খলিত সাহিত্য	ওররওয়র রাও	অনুবাদ : কাঞ্চন কুমার
আরবী সাহিত্য : আধুনিককাল	স্বরাজ সেনগুপ্ত	
কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অনুবাদ কবিতা	সুতনুকা সোম	

উদ্‌বাস্তু মা আর শিশু

চিনুয়া আচিবি

যে-ছেলেটিকে শিগগিরই ভুলে যেতে হবে
তার জন্য মায়ের ওই কোমলতা, এ-ছবির কাছে
পৌঁছতে পারে না কোনো ম্যাডোনা আর তার শিশু।

আধোয়া বাচ্চাদের ডায়ারিয়ার গন্ধে
ভারী হয়ে আছে বাতাস, তাদের পাঁজর গেছে ধুয়ে
আর ফুলে উঠেছে তাদের ফাঁকা পেট।
বেশির ভাগ মা-ই অনেকক্ষণ আগে থেকে
গ্রাহ্য করছে না আর কিছু,
কিন্তু এই মা-টি তা নয়; সে তার দাঁতের কাছে
ধরে রেখেছে ভৌতিক এক হাসি
আর চোখে রেখেছে মাতৃগর্বের
শেষ প্রেতচিহ্ন, ছেলের কপালে পড়ে-থাকা
ঘরচেরা কয়েকগুছি চুলে চিরুনি বোলাচ্ছে সে—
আর সুরেলা চোখে—সেগুলিকে পাটপাট করে দিচ্ছে দুবারে...
অন্য এক জীবনে ছেলের ভোরের খাবার বা স্কুলে যাবার সময়ে
এসব ছোটোখাটো দৈনন্দিন কাজগুলির
তেমন বড়ো কোনো মানে থাকত না; এখন সে ওটা করছে
যেন ছোটো একটা কবরের ওপর
সাজিয়ে দিচ্ছে ফুল।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

[চিনুয়া আচিবি নাইজেরিয়ার মানুষ, জন্ম ১৯৩০ সালে। মূলত তিনি ঔপন্যাসিক, নাইজেরিয়ার লেখকদের একজন। লেখার গৃহযুদ্ধকালে, গদ্যরচনা থেকে সরে গিয়ে কিছু কবিতালেখার দিকে মন দেন তিনি। সেইরকমই একটি কবিতার এই অনুবাদ। 'চিকি আর নদী' নামে তাঁর একটি কিশোর-উপন্যাস অনেকদিন আগে বাংলায় অনূদিত হয়েছে, গ্রন্থকারে প্রকাশিতও হয়েছে (১৩৮৬)।]

নারীর মূল্যবোধ এবং সারা কির্শ্-এর কবিতা

সারা কির্শ্

[ওল্টাভিও পাজ্-এর সম্প্রতি কিছু উক্তি থেকে আমরা এমন একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা বিষয়ে অবহিত হই যা ইয়োরোপ-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় (এশিয়াতেও নয় কি?) এক নতুন কাব্যভাষা খুঁজে চলেছে। ইয়োরোকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক প্রবণতার বিরুদ্ধে নিজেকে বিন্যস্ত করাই এই ভাঙ্গন প্রবর্তনা। পাজ্-এর এই উপদাস্য নিয়ে সম্প্রতি ট্যুবিঙ্গেনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় আমার যোগ দেবার সুযোগ হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন প্রায় প্রত্যেকেই নারীর নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব (Weibliche Aesthetik) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। এঁদের বক্তব্যের নির্যাস হল এই যে, এতকাল কবিতার ভাষা পুরুষ-প্রশাসিত থেকে গিয়েছে এবং নারীকে সেই ঔপনিবেশিকতার কবল থেকে অচিরেই মুক্ত করতে হবে।

এরকম ধ্যানধারণা কিছু একপেশে শোনাতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় চিত্রের তার যাথার্থ্য অনেকটাই সমর্থন করতে হয়। অবশ্যই, অন্তত ইয়োরোপের প্রেক্ষাপটে এই কৌণিক প্রস্থানভূমি এমন-কিছু বৈপ্লবিক নয় এখন। যাকে আমরা দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব (১৯৬৮) বলি, সেই পর্ব থেকেই এ নিয়ে বিস্তর ভাবনা-চিন্তা সংঘটিত হয়েছে। দার্শনিক লাকঁ-র অনেকজন ভাবশিষ্য, যেমন এলেন সিক্সু লুস ইরিগারি জুলিয়া ক্রিস্তেভা, তাবাধীক্ষার ব্যাপারে তাবৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ পুরুষসমাজের দাম্ভিকতা বিতর্কের অব্যর্থ প্রয়োগে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। তাঁদের উদ্যোগে অচিরেই একটি ধারাবাহিক আন্দোলনও গড়ে ওঠে যার লক্ষ্যমাত্রা অত্যন্ত স্পষ্ট

১. নারীরা তাদের আত্মগত বোধ থেকেই তাদের জীবনকে রূপ দেবার একটি কেন্দ্রীয়তা খুঁজে নিক।
২. এই আত্মগত উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা থেকেই নতুন একটি সমাজ তৈরি হবে।
৩. পুরুষব্যবহৃত চিত্রধারার পাশাপাশি নারীকে তার নিজের বাগ্‌বিধি ও চিত্রকল্পের আবল দিতে হবে। প্রথম প্রথম সেই প্রয়াস হয়তো ঈষৎ প্রোটোকলধর্মী ও প্রোগ্রামসর্বস্ব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ক্রমশই তার প্রাসঙ্গিকতা সমাজের হর্তাকর্তা পুরুষেরা আর পরিহার করতে পারবে না।

অনুমান করা যায়, আন্দোলনের শুরুর দিকে এরকম উচ্চারিত কার্যক্রমের আড়ালে প্রবল অভিমানের উপসর্গ ছিল অনিবার্য। সাহিত্যে গোয়েটের মতো মহারথীও যখন মেয়েদের সাহিত্যচর্চাকে বড় জোর একটি ডিলেটান্ট ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেন, শিল্পয়চিত্রীকে তাঁর অস্তিত্বের জন্য একটি যুদ্ধবদ্ধতা নির্মাণ করতেই হয়। 'মহিলা কবি'র অবয়বকরি, লাঞ্ছনাসংকুল অভিযান সংক্রমণ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য তাঁকে তখন এক অর্থে লবি রচনা না করলেও চলে না। একজন শিলারের সমানুভূতি সত্ত্বেও তবু গোয়েটের মতো একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ অভিভাবকের পাল্লায় পড়ে সেই সংগ্রাম দীর্ঘকাল জুড়ে বারংবার প্রতিহত হতে থাকে।

তবু ট্যুবিঙ্গেনের তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের সংস্পর্শে আমার মনে হয়েছে, দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লবের প্রণোদনা এরই মধ্যে মন্ত্রায়িত হয়ে উঠেছে। প্রতীকপন্থা থেকে শুরু করে পরাপ্রকৃতবাদ হয়ে দাদাইজম পর্যন্ত যত উপক্রম দেখা দিয়েছে, তাদের পূরঘটিত হিসেবে চিহ্নিত করতে না চাইলেও সত্যের সৌজন্যে মেনে নিতেই হবে সেসমস্ত পৌরুষব্যঞ্জক গোষ্ঠীচর্চা সত্ত্বেও দশকেই নাস্তি-র নাভিশ্বাসে অবসিত হয়ে এসেছে। এই পর্বাঙ্গ থেকেই নারীর রচনা বিস্ময়কর নবত্বে অভিষিক্ত হতে পেরেছে। এই রচনা কাশিত, অর্থাৎ ঢেঁচেথাকা ও বাঁচতে-চাওয়ার মধ্য থেকে উৎসারিত। একাধারে জীবনসংরক্ত এবং অঙ্গীকারবদ্ধ, ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধ তার ভাষা। তার অন্যতম ভর বয়ানের অন্তর্বয়ন (inter-textuality)। সারা কির্শ্-এর একটি প্রোকসন্নিত পঙ্‌ক্তিকে ঘিরেই যখন শ্রীমতী ক্রিস্টা ভোলফ্, এ সময়ে জার্মানির প্রধানতম কথাশিল্পী, একটি উপন্যাস দাঁড় করান, না মেনে উপায় থাকে না, এই পারস্পরিকতা আজকের জীবনবিন্যাস ও সাহিত্যে একটি স্বপ্রতিষ্ঠ অহংকার।

মনে রাখতে হবে, নারীর জাগৃতি ও শক্তি আন্দোলন সমসময়েরই দুই অভিক্ষেপ এবং এ যুগের জন্মসূত্রে একটি অজ্ঞেদ্যতা রয়ে গেছে। জনবিসঙ্কারী এই উভয় অভ্যুত্থানের পিছনেই ক্ষমতান্ধ উত্তম পুরুষের বিরেচিতা ও প্রকৃতির ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখবার উদ্যোগ আসল কথা। বলা বাহুল্য, এরই বিভবে ঐতিহাসিক একটি তৃতীয় কলা ঠিকরে বেরিয়ে আসে যার বর্ণিমা সবুজ, ইকলজিকেন্দ্রিক রাজনীতি। যে-প্রকৃতিকে পুরুষজাতি এযাবৎ স্বার্থিক চাহিদায় নিংড়ে নিয়েছে, এই সমর্থক রাজনীতি তার বিরুদ্ধে সূচিত এবং এই মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত। এই অন্বেষার শরিকেরা, সবুজ সংগঠন থেকে আরম্ভ করে গ্রিন সিক্স্-এর প্রত্যেকেই, আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন গ্রিক 'ঐকোস' (বাড়ি) এবং 'লোগোস্' (বাণী)-এর অন্বয়েই 'ইকলজি' শব্দের সঞ্চার। আমাদের এই অনুবাদ-সংকলনের উপনামকরণ ('এই শীতে আমার একটা বাড়ি চাই') এই অর্থেই কবির 'মস্ত একটা বাড়ি' (Weites Haus) থেকে উঠে এসেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই বাড়িটা কারো একার বাড়ি নয়, ধরিত্রীর প্রতিটি প্রাণীর আশ্রয়। এই কবিতার 'আমি' একক মনোয় বালাই বারবার করে

না দিয়েও নিখিল বঙ্গবচনের উপযোগী এবং সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র এই নাম-কবিতার অণুবিশ্বটি বলতে পারলেই আমরা আঁচ করে নিতে পারব, মূলবোধ নিয়ে নারীর লড়াই সারা কির্শ-এ কীরকম আত্মস্থতা অর্জন করেছে।

কতটা তথ্যগত তা হলে এই মহিলা, আর কতটাই বা স্বগত? এখানে অপরিহার্যভাবেই রোমান্টিক কবিদের নিসর্গপ্রত্যয়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। উঠে আসে জার্মান রোমান্টিকদের পূর্বচার্য লুডমিগ টিক-এর সেই কূট প্রশ্ন ('প্রকৃতি যেমন, ঠিক সেভাবেই কি তাকে আমরা ফুটিয়ে তুলতে পারি?') এবং আঁট নিরসন ('প্রকৃতিকে হৃদয়ের সামগ্রস্যেই দেখতে হবে')। জার্মানির অনেক সমালোচক এই প্রস্তোত্তরের পরম্পরা থেকে সারা কির্শ-এর কবিতাকে সনাক্ত করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত নির্ণয় করেছেন, প্রকৃতি এবং হৃদয়ের এই সাবলীল সমীকরণ সত্ত্বেও আদৌ তাঁকে কিন্তু 'রোমান্টিক' বলে অভিহিত করা যাচ্ছে না। বস্তুত অধিকাংশ সমালোচকই তাঁকে কোনোরকম বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত করতে পারছেন না। 'তা হলে কি তাঁর কবিতা পৃথিবীর সর্বশেষ প্রকৃতিবিষয়ক কবিতামালা?' 'এরা কোনোক্রমেই প্রকৃতির কবিতা নয়।' 'কোথায়, এসব কবিতা তেমন তো পুরুষ-অসহিষ্ণু নয়।' 'এই কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে মূলত রাজনৈতিক, প্রকৃতি এখানে শুধু একটি কারসাজি।' প্রভৃত বিশ্লেষকের একই কিংবা একাধিক সন্দর্ভে এরকম পরস্পরবিরোধী প্রশ্নের ওনতে পাওয়া গিয়েছে।

যাঁকে নিয়ে এত প্রতর্ক সেই নারী এবং কবি সারা কির্শ (জ. ১৯৩৫) কিন্তু তাবৎ মূল্যাঙ্কনের অতিশায়ী হয়ে থাকতে চান। তাঁর কবিতায় নিসর্গের নিরীক্ষণ বা প্রতিনিধির মিনিয়েচার কিংবা প্রেমের মেটাফর কোথায় কীভাবে আছে এসমস্ত পর্যালোচনা তাঁকে অবসন্ন করে। তুখোড় সাংবাদিকদের কাছ থেকে তাঁর অন্তর্জীবনী লুকিয়ে রাখাও তাঁর মনঃপূত একটা অভিপ্রায়। তা সত্ত্বেও অনুবাদকের সবিনীত স্পর্ধায় অনুমান করি, না-জানলেই-নয় এমন তিনটি তথ্য এখানে জ্ঞাপন করলে অসংগত হবে না। জার্মান গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের (জি. ডি. আর.) তৃতীয় প্রজন্মের এই কবি একদা সরকারপুষ্ট পার্টির লেখক সমকরের সঙ্গে অবিত ছিলেন। চারণ কবি ভোলফ বিয়রমানকে পূর্ব জার্মানির নাগরিকতা থেকে বিচ্যুত করা হলে ১৯৭৬-এ সরকারের কাছে খোলা চিঠিতে যাঁরা প্রতিবাদ পেশ করেন তাঁদের ভিতরে থাকার দরুন তাঁকে রাজরোষের কবলে পড়তে হয়। এবং ফলত এর পরের বছরেই পশ্চিমে তাঁর বসবাসের সূচনা।

অক্তাভিও পাজ-এর 'একই ভাষার মতন বিভাজিকা আর কিছুই হতে পারে না' কথাটা এখনে তার তাৎপর্য খোয়াবনি। খণ্ডিত সংযুক্তীকরণের বেশ-কিছুকাল পরেও পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মাতৃভাষার অভিন্নতা দুই শিবিরসত্তার মৈত্রী এমন-কিছু পাকাপোক্ত করে তুলতে পারেনি। তবুও এই মুহূর্তে কি-পূর্বে কি-পশ্চিমে সারা কির্শের কবিতার অভিঘাত কেন এত অবিভাজ্য এবং অমেয়, সেটা ভেবে দেখা দরকার। আজ তিনি বেস্টসেলার লিরিক কবি, কালকে হয়তো-বা সাময়িকভাবে তলিয়ে গিয়ে পরক্ত আবারও প্রিয় পাঠিকা এবং পাঠকদের কাছে তিনি সদর্পে ফিরে আসবেন। যদি তিনি জনপ্রিয়তার কাছে কিয়তে না-ও চান, টিয়াহতে তাঁর জায়গাটা কেউ বোধহয় অস্বীকার করতে পারবে না। তার কারণ, চিরদিনের কবিতার যন্ত্রণা তাঁর রক্তে ও মজ্জায়। কে কোথায় কবে একটি কবিতা লিখেছেন, সেই এষণা তাঁর উত্তরাধিকার। এমন-কি, তাঁর কবিতার যখন 'ভবিষ্যতের স্মৃতিচর্যা' একটি প্রতীতি হয়ে বেজে ওঠে, ধরে নিতে হবে, তিনি সমীপসময়ের কাছে দায়বদ্ধতা এবং কবিতার প্রমূল্যকে ফুলিয়ে ফেলতে রাজি নন। তাঁর কাব্যাদর্শের পরিপন্থী সমালোচকেরাও স্বীকার করেছেন, এখানেই তাঁর পদাবলির বৈধতা। এই সূত্রেই জার্মান ভাষায় তাঁর প্রসঙ্গে একটি পরিভাষার প্রচলন হয়েছে : 'সারা-স্যাউস'। এই সংজ্ঞায়ন এতই স্বচ্ছ যে তার বিশদীকরণ অবান্তর। সারা কির্শের কবিতায় রণিত হতে পেরেছে সেই সংকেত যাকে আমরা 'ধ্বনি' হিসেবে আখ্যায়িত করতে চাই। অবান্তরে ওই ধ্বনিসৌকর্য প্রহত হতে বাধ্য। বর্তমান অনুবাদকও সে-বিষয়ে অবহিত। তা সত্ত্বেও, অথচ সেজন্যেই, মূল পাঠের সন্নিপাত যতদূর সম্ভব বজায় রাখা যায়, সেদিকে তাঁর অনবধান ছিল না। ওই প্রক্রিয়ায় কবির স্বকীয় স্বরায়ণ পুরোপুরি বজায় না থাকলেও হয়তো ততটা লোকসান নেই, কিন্তু এখুনি, এই ইতিহাসমুহূর্তেই, তাঁর কবিতা বাংলাভাষায় সঞ্চারিত করতে না চাইলে ঐতিহাসিকতা অপরাধে দায়বিদ্ধ হতে হবে।]

আকর্ষণ
(Anziehung)

কুয়াশা ঘনিয়ে এল, পাল্টে যাচ্ছে আবহাওয়া। চন্দ্র
মেঘমেদুরিকে জড়ো করে আনছে মণ্ডলে। হ্রদের উপর
বরফে চিড় খেয়ে ঘণ্টাটানি দিচ্ছে। হ্রদের উপর দিয়েই তুমি
এসো।

চৈতি বাংলা
(Sommerhaus)

হাঁস উড়ে গেল বাড়িয়ে লম্বা গলা
আকাশের দিকে লাল ওয়াইনের বোতল
উদিত বেই সূর্য বিদায় নিল
পড়ন্ত দিন দীঘল তাড়িয়ে-ওঠা
পান করি আর কাটি গোলাপের ডাঁটা

হাইকু-র এলাকা থেকে
(Erlkoenigs Tochter)

নতুন বছর : বাতাসটা
পুরোনো সময়ের
উপহার দেয় আমার দাঁতের ব্যথা।

*

নতুন বছরের
আকাশের তলায় হেঁটে যায়
পুরোনো লোকজন।

*

তুষার যেমন, তেমনি সে-ও
দিব্যান্বিত—আমার স্বদেশকে
হতচ্ছাড়া দেখাচ্ছে।

*

হ্যাভেল নদীর উপরে চাঁদ
মন্ত্রনটা ঠিক
ফেলে রেখে গেছে।

*

ঘেউ ঘেউ কর, আমি হুকুম করছি। কুকুরটা
বছরটাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে
আমায় মদত দিচ্ছে

*

নর্মান সরণি : আমি দেখছি
লোকজন যারা
কাপড় কাচছে নববর্ষের জন্য।

*

বছরটা শেষ হতে চলল
এখনো আমি
পর্যটনের পোশাক বয়ে চলেছি।

পৌষপ্রান্তর
(Winterfeld)

তুষারঝঞ্ঝা মেঘবিদারণ
অজস্র বর্ষণ এখন
পুরুষ নেকড়েগুলো আমার
শতচ্ছিদ্র ঘুম খাক করে দিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে সবশেষের
আঁকড়ে-ধরা বর্ণালি আর
ফাৎরাকাই করে দিচ্ছে আমার আদেখিলা হৃদয়ের
সৈকতভূমি। রুয়ে দিয়েছি আমি।

উল্কা আমার যথাযথ চারু চিকণ হীজবুনুনিতে
আগেভাগেই পশমভেড়ার
রেতঃপাতে দাগানো দুর্গ্রহদের
প্রভাবপ্রতিপত্তির বিরুদ্ধে
বিগলিত দয়া দেখানোর পথে ততটা তৈরি নই
যেমন আমি এই
উষর প্রান্তরেই

তুষারগীতি
(Schneelied)

গিরিচূড়াও ঘিরে ঘুরে ঘিরে
ওড়ে সাত দাঁড়কাক
ওরা নির্ঘাত আমার সোদর
বদলে গেছে বেবাক

এতই পেটুক ওইসব ছেলেপুলে
গেছে নিজেদের ছোট বোনটাকে ভুলে
হিরণ্য ধেনু জবাই করার আশে
উড়ে গিয়েছিল বিকট অট্টহাসে

সূর্যের কাছে পৌঁছে যাবার আগে
দৃষ্টিশক্তি খোয়াল দুর্বিপাকে

আমার ঘরের বাতিগুলো একে-একে
বুজিয়ে দিয়েছি ঘুমোতে যাবার আগে
কালো-কালো যত পালক দেখতে পাই
সফেদ জমাট তুষারেই গিয়ে ঠেকে

চোখের পালক
(Augenblick)

আহ্ ওদের জানলাগুলোয় বিদ্যুৎ ঝলসে গিয়ে ক্রমসংখ্যাগুলি
ডানায় ডানায় সঞ্চারিত হয়ে গেল, পাখনাছের সংগোপনে
ঝরে পড়বার আগে...

ভড়্কা ওড়ানো
(Wodka trinken)

শিশল পাখি শিশল পত্রালি
নরম রজন-নদী হয়ে আছে, প্রতি
স্বয়ংতন্ত্র সুঠাম গাছের ছালে
যাদের শিখর তারায় অলংকৃত

বুড়ো মর্মর মানুষেরা পা ছড়িয়ে
বুলভারের দিকে গড়ল কী-অভিরাম
ফুটফুটে সাদা ঝর্ণা-পরীর কোলে
শালিখগুলির মসৃণ আশ্রয়

ভিতরে মস্ত চেয়ারগুলোর গোঁজা
সিংহমুণ্ড হেলানোর পরিসরে
ভড়্কা ওড়াই আমরা যেখানে বসে
গলার কাছটা শূন্য তেপান্তর

রাস্তা আঙুরের মঞ্জরী যায় ঝরে
রজতশুভ্র নদীটির আস্তরে
আর বাঁকাচোরা কুটিল কাঁকড়াগুলো
চাঁদের আলোয় ডাঙায় ফোকর গড়ে

যতক্ষণ না টাদরা শুকিয়ে কাঠ
যতক্ষণ না সমূহ দ্রব্যগুণ
আমাদের গূঢ় গভীরে চলিয়ে যায়
এবং আমরা সিরিয়াস হয়ে উঠি

অন্যেরা যবে ছুড়ে দেয় চিৎকার
এবং এ ওর বাহুতে শয্যাশায়ী
পরস্পরকে সখ্যের কথা বলে
কালকে যদিও মনে থাকবে না কিছু

এসো গো আমরা ঠাণ্ডার দিকে যাই
চন্দ্রের চাপা অন্ধকারের দিকে
চলে যাই যত ছিমছাম পথে যারা
ঘুরে বাঁক নেয় পাহাড়গুলোকে ঘিরে

গ্রীষ্মে
(Im Sommer)

জনবিরল পল্লীপ্রদেশ
প্রকাণ্ড প্রান্তর আর বনস্পতি সত্ত্বেও
গ্রামগুলি ঘুমন্ত রয়েছে
চিরহরিৎ গাছগাছালির নিকুঞ্জে—পাথর ছুঁড়লেও
বেড়ালগুলোর গায়ে লাগে না
অগস্টে ঝরে পড়ে নক্ষত্র
সেপ্টেম্বরে শিকারিরা বাজাতে শুরু করে দেয়।
এখনো ধূসরহংসী উড়ে যায়
অবিষাক্ত মাঠে
হেঁটে চলে সারস।
আহ্, মেঘপুঞ্জ
গিরিরাজি অরণ্যের উপর দিয়ে
উড়তে থাকে।
এখানে যতক্ষণ না খবরের কাগজ এসে পৌঁছোয়
বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থেকে যায়
গ্রাম মারমেলেড তৈরির কড়াইতে ভাসতে থাকে
মনোরম্য নিজের মুখ এবং
অগ্নিসংকাশে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে প্রান্তর

বাতাসে তুষারগন্ধ
(Die Luft riecht schon nach Schnee)

বাতাসে তুষারের গন্ধ লেগে আছে
আমার দয়িত এখন রেখেছে লম্বা চুল,
আহ্ এই শীত, এই শীত
এই এবং
ঘনসংবদ্ধ ছুঁয়ে দেয় দাঁড়ায়
দোরগোড়ায় আগে
হ্যাওয়াকুকুরের সঙ্গে টানটান বাঁধা।
বরফ কুসুম
বিলিয়ে দেয় আমাদের জানালায়,
কয়লা দপদপ করে উনুনে
এবং
হে রম্যকান্তি তুষারশুভ্র আমার
স্বপন করো তোমার শিরোদেশ আমার
কোলে

আমি বলি এটা হল স্লেজগাড়ি
যা আর কখনো দাঁড়ায় না, তুষার ঝরে
এবং
হেমন্তের মাঝখানে, আস্তারেছাইয়ের গামলায়
সে জ্বলে ওঠে
অজনে দয়িত বলে ফিসফিসায় একটি শ্যামাপাখি।

মস্ত বড় একটা বাড়ি
(Weites Haus)

এই শীতে আমার একটা বাড়ি চাই
যার মধ্যে আমি থাকব। স্বল্পভাষী
অনেকরকম ঘর যাদের বিচিত্র জানালা। একটি জানালার ডানা
উত্তরের দিকে, সেখানে দেখি
তুষারখচিত ডালে পাখিদের নাচ।
স্লেজগাড়িতে বাজছে ল্যাপল্যাণ্ডের কুকুরগুলোর ঘণ্টা।
আর তক্ষুনি গলে যায় তুষার, আমি মুখ ধুয়ে নিই,
জমে-যাওয়া চিঠিগুলি গলতে থাকে
শিকারিদের চলনে জেগে ওঠে নিসর্গ, তাদের বন্দুক থেকে
ওড়ে ধোঁয়া
রুক-স্যাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঝাউফল
আগুনের আহুতি।
অন্যান্য জানালাগুলো
আমার শহরের গির্জেগুলো সেখায়, তাদের চূড়ো
উঠে যায় পাতুর কালো আকাশে,
বাজারে ঘোরে নাগরদোলা, গির্জায় ক্রিসমাসের অর্গ্যান
শুধুই বাড়িয়ে দেয় বিষাদ

দরজা খুলে দেখি একটা ঘর সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত
হাজার বছর জুড়ে সেই আয়োজন, যাকে নষ্ট না করলে
আমরা ভালোভাবে বাঁচতে পারতাম।

বিছানায় বসে জুতোজোড়া খুলে ফেলে ভাবতে বসি সেসমস্ত
জাহাজের কথা
যাদের ডানা আছে, যাদের পাখিগুলো কেবিন থেকে তীরের
দিকে ওড়ে

আমি পাইলটকে বলি

গতিবদল করো
ম্যানিলা ঘুরে চলো সাইবেরিয়ায়।
তার চোখের পাতা বৃষ্টিশেষের ঘাসের মতোই গজিয়ে উঠছে,
এই পাইলটের মাথার ভিতরটায় যদি থাকতে পারতাম কী
ভালোই না হত!

মন্ত্র
(Rufformel)

লাল মেঘ চূর্ণ করে দিচ্ছেন জিউস্
আমি আমার ছড়ানো চুল নিয়ে তাঁর ভিতরে সাঁতার কাটি
এমন করে আঁকড়ে ধরি যে তিনি বলতে পারেন না
আজ সোম বা মঙ্গল নাকি শুক্রবার
কোন্ শতক এখন তিনি আর আদৌ ওভিদ পড়ে উঠেছেন কিনা
আমি তাঁর চামচা না স্ত্রী নাকি
নিছক মেঘ দিয়ে তৈরি একটি প্রাণী
আকাশ ছেয়ে

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

চীনা কবিতা

সুগন্ধে ভরপুর একটি মন্দির অতিক্রম করার সময়

ওয়াং-উই

মন্দিরের রাস্তাটা আমার জানা ছিল না
সুতরাং—
মেঘে ঢাকা গিরিচূড়ার মাঝখান দিয়ে
আমি মাইলের পর মাইল হেঁটে গেলাম।

হাঁটছি, আদিম বনের মধ্যে
পথ নেই, পদচিহ্নও নেই।

পাহাড়ের গভীর থেকে
শুনতে পেলাম একটা ঘণ্টাধ্বনি

কোথা থেকে আসছে?
তারপর—
কলকল শব্দ করে
বিশাল পাহাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে
একটা স্রোতস্বিনী

নীলাভ-সবুজ পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে
ঝ'রে পড়া রোদ্দুরের রঙটুকুও
কেমন যেন স্নিগ্ধ...

সন্ধ্যা হয় হয়
আমি একটা নির্জন হ্রদের পাশে
হাঁটু গেড়ে বসলাম;

আবেগের বিবাক্ত ড্রাগনকে
তাড়িয়ে দেবার জন্য
ধ্যানস্থ হলাম।

অনুবাদ : আনন্দ ঘোষ হাজরা

[চৈনিক ভাষার অষ্টম-নবম শতাব্দীর কবি—'ওয়াং-উই'। অনেকে মনে করেন চৈনিক নিসর্গ চিত্রের জনক। চীনের শিল্পীদের আঁকা নিসর্গ চিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ছবিগুলিতে প্রাকৃতিক পটভূমি এক বিশাল গম্ভীর অনন্ত মহিমায় বিরাজমান। মানুষের ছবিও সেখানে থাকতে পারে, কিন্তু সে মানুষ ওই পটভূমিকায় একেবারে বিলুপ্তবৎ। মনে হয় ক্ষুদ্র মানুষকে এরকম প্রকৃতির ছবির কাছে বড় বেশি অসহায় মনে হয়। 'ওয়াং-উই'-এর কবিতাতেও নিসর্গ-চিত্র ওই ভাবেই উপস্থিত। ওয়াং-উই ছিলেন বৌদ্ধ। সেজন্য প্রকৃতির একটি ধ্যানগম্ভীর ভাব তাঁর কবিতায় বৃদ্ধ মহিমার চকিত ছায়াপাত ঘটাতে পারে। কেউ বলেন 'ওয়াং-উই'-এর জন্ম ৬৯৯ সালে আবার কেউ বলেন ৭০১ সালে। মৃত্যু ৭৬১ সালে।]

—

পার্সি কবিতা

বাগানের একটি গোলাপ

মুস্‌লি-উদ্‌-দিন সাদী

বাগানের একটি গোলাপকে দিনের পর দিন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস ; আর পাপিয়ার বুকে জমে উঠছে নতুন দুঃখ।

সম্মানের আইনকানুন সব মানুষের জন্যেই সমান ; ফিসফাস কোরো না ; সুবিচারের কাছে সমর্পণ করো।

যা কিছু জন্ম নিয়েছে তা সবই ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায় মৃত্যুর বাজপাখি তার বাঁকানো নখরে।

বন্ধু হে! এই নশ্বর পৃথিবীকে হৃদয় দিয়ো না ; কারণ এখানে নিস্তরঙ্গ শান্তি সম্ভব হবে না কখনো।

গোলাপ কিংবা রজনীগন্ধা পৃথিবীতেই ফুটে ওঠে—সব তারা ফুটে ওঠে ওই সুন্দর ধূলিকণা থেকেই।

পৃথিবীতে এমন কিছুই নির্মিত হয়নি এখনো যার পরিপূর্ণতা পাল্টে দেয়নি সময়।

গতকাল বাগানের ফুলগুলি পাখিদের কিচিরমিচির উপভোগ করেছে সারাক্ষণ।

আজ শুধু জেগে আছে কাঁটা। যেন গোলাপ কখনো ফোটেনি।

অন্তরের অভিমুখে চলে যাওয়া একটি সেতু এই পৃথিবী। জ্ঞানীরা সেতুর ওপর ঘর বাঁধে না কখনো।

[ওড/৪০৫]

অনুবাদ : সোমক দাস

—

সেনেগালের কবিতা

প্যারিসে তুষারপাত

(Paris in the Snow)

লিওপোল্ড সেদর সেনেগার

হে প্রভু, তোমার জন্মদিনে তুমি এসেছিলে প্যারিস ভ্রমণে
কারণ এই শহর হয়েছিল নোংরা ও নগণ্য
অমোচনীয় ঠাণ্ডায় তুমি একে পবিত্র করেছিলে

শ্বেত মৃত্যু দিয়ে।
আজ সকালে কারখানার চিমনীগুলো ঐকতানে
তুলে ধরেছে শ্বেত পতাকা।
'ভালো মনের মানুষদের জন্য শান্তি'।
হে প্রভু, তুমি এই বিভক্ত পৃথিবীকে, এই বিভক্ত ইউরোপকে
দিয়েছো বরফের শান্তি।
আর বিদ্রোহীরা চোদ্দশো কামান দেগেছিলো
তোমার শান্তির পর্বত চূড়ায়।

হে প্রভু, আমি তোমার এই শ্বেত ঠাণ্ডা করেছি গ্রহণ
যা নূনের থেকেও বেশি জ্বালা দেয়।
কিন্তু আমার হৃদয় সূর্যের আগুনে বরফের মত গেল গলে
আর আমিও ভুলে গেলাম
সেই সাদা হাতগুলো যা বন্দুকে টোটা ভরেছিল
যা সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল
সেই হাতগুলো
যারা ক্রীতদাসদের চাবুক মেরেছিল
সেই সাদা পাউডার মাখানো হাত
আমাকেও মেরেছিল থাপ্পড়
সেই নিশ্চিত হাতগুলো
যা আমাকে ঘৃণা আর একাকীত্বে দূরে ঠেলে দিয়েছিল
সেই সাদা হাত আকাশচুম্বী অরণ্য ধ্বংস করেছিল
যা আফ্রিকার গর্ব
তোমার বাদামী হাতের সৃষ্টি
আফ্রিকার বুকে অবস্থিত শুধু কঠিন 'সারা'কে
ওরা নির্মূল করেছিল।
রেলওয়ে স্লিপারের জন্য তারা তোমার পবিত্র অরণ্য কেটেছিল
মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য
তারা ধ্বংস করেছিল আফ্রিকার অরণ্য।

হে প্রভু, আমি এই শেষতম ঘৃণাকে ত্যাগ করতে পারব না
আমি জানি
লম্বা দাঁতের রাজনীতি কুশল লোকেদের ঘৃণা
যারা কাল কালো চামড়ার লোকেদের সঙ্গে বিনিময় করবে।

আমার হৃদয়, হে প্রভু,
প্যারিসের ছাদে বরফের মত গলে গেছে
তোমার সততার সূর্যে
আমার শত্রুদের প্রতি দয়া
আমার ভায়েদের বরফশূন্য সাদা হাতগুলো
আর শিশিরে ভেজা হাত
আমার গালে পড়ে
রাত্রে ঝলমল করে।

অনুবাদ : অনন্ত দাশ

[সিওপোল্ড সেদর সেনেগার আধুনিক আফ্রিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, জন্ম ১৯০৬ সালে। তিনি সিরিয়ার উপজাতি শ্রেণীর লোক। তাঁর পিতা ছিলেন বাদাম ব্যবসায়ী এবং ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। প্যারিসে অবস্থানকালে তিনি সিজারে, দামাস এবং অন্যান্য নিগ্রো কবিদের সান্নিধ্যে আসেন। পশ্চিম আফ্রিকার একজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। তিনি বিভিন্ন সময়ে Ecole Nationale de la France-এ শিক্ষকতা করেন, Council of Europe-এর সদস্য, ফরাসী জাতীয় পরিষদে সেনেগালের উপাধক্ষ্য ছাড়াও তিনি ছিলেন ফরাসী সরকারে একজন মন্ত্রী। ১৯৬০ সালে সেনেগাল স্বাধীনতা লাভ করলে তিনি সেখানকার রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন।

সেনেগার ছিলেন আফ্রিকার 'নেগ্রিচুড' কাব্যান্দোলনের প্রধান দ্যোতা। তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ Chants d'ombres (১৯৪৫)-এ তিনি নিজস্ব এক স্টাইল গঠন করেন। সঙ্গীত ও চিত্রকল্প তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিষয় হিসেবে তিনি নিপীড়িত নিগ্রো অনুভূতিকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং সুদূর প্যারিসে বসবাসকালে তাঁর এই স্বাজাত্যবোধ আরও দীর্ঘ হয়ে ওঠে।]

দুই দেশের দুটি প্রতীন কবিতা

মৃত্যু আজ সামনে আমার

অনামিক

মৃত্যু আজ সামনে আমার
রোগীর নিকটে যেন স্বাস্থ্যের মতন
রোগভোগ শেষ হলে শয়নকক্ষটি ত্যাগের মতন।

মৃত্যু আজ সামনে আমার
সুগন্ধী তরুর আঠার মত
হাওয়া-ভরা দিনে চাদরের নীচে বসে থাকার মতন।

মৃত্যু আজ সামনে আমার
পদ্ম সুবাসের মত
মত্ততার তীরভূমির উপরে নীচু বসে থাকার মতন।

মৃত্যু আজ সামনে আমার
ধারাবর্ষণ শেষের মতন
বিদেশে নানান যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে
কোন মানুষের যেন ঘরে ফেরার মতন।

মৃত্যু আজ সামনে আমার
স্বচ্ছীভূত আকাশের মত
বন্দিত্বের অসংখ্য বর্ষশেষে কারো বা স্বগৃহ দর্শনেচ্ছার মতন।

[ইজিপ্ট। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১৯০০ সাল।]

হোরেস

কুইন্তাস হোরেশিয়াস ফ্লেক্কাস

যুবকেরা এখন এখানে প্রায়ই কম আসে
যুবকেরা এখন এখানে প্রায়ই কম আসে—এটা কি তা নয়?—
তোমার সে বেঁধে রাখা জানালায় মাঝরাতে খটখট আওয়াজ
তুলতে ;
বড় কম প্রায়শঃই। আজকাল কেমন ঘুমাও?
এমন সময় ছিল তোমার দরজাগুলি দক্ষতার খুলে দিত ছিটকিনি
আজকাল মনে হয় বন্ধ হতে সেগুলি যেগুলি বেশী পটুতর।
আমি তো ভাবি না, তুমি শোন আরো বেশী প্রেমিক-বিলাপ।
"লীডিয়া, কি করে ঘুমাতে পার?
"লীডিয়া, রাত্রিটা সুদীর্ঘ এতই।
"আহা গো লীডিয়া, মারা যাই তোমার জন্যই।"
না। আসছে সময় সেই যখন তুমিই তো করবে বিলাপ
গলির মোড়টা থেকে কাঁদবে যে তুমি তোমাকেই ঘৃণাকারী
চাঁদের আঁধারে যে সময় বায়ু প্রেমাবেগ তাড়নায় যুবাদের দিকে
কামাতুরতায় অশ্বিনীকে বন্য করে দেবে
পুরাতন কতাক্ত চর্মের ভিতর।
একা হয়ে যাবে তুমি আর দগ্ধীভূতা সে সময়
ভাবতে গিয়ে কি করে যে সুখী তরুণেরা তাদের আনন্দ
নতুন নরম কুসুমে, চির সবুজের লাজুকতা নিয়ে নেয়
পাঠিয়ে শুকনো যত পাতা শৈতাময় সমুদ্র-সমীপে।

অনুবাদ : অতুলকুমার দত্ত

[মধ্য ইটালীর পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্যকালের ল্যাটিন কবিতা। কুইন্তাস হোরেশিয়াস ফ্লেক্কাস, আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৬৫ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ৮ সাল পর্যন্ত।]

আফ্রিকার নানা উপজাতির
কয়েকটি লোক কবিতা

কালো মানুষের কবিতা

প্রেম

ভোরের বিজুরির মতো মেয়ে, ওগো মেয়ে।
কথা বলবে না একবারও?

আমি সে দরিয়ার লোক, যার
নাও ভেঙে গেছে কালঝড়ে।

ডাঙার তালাশে কালামুখে
দেখছে চারধার একাকার খালি ধূমল দরিয়া।

আপনাকে বলি, ঢেকে রাখো ভালোবাসা।
চোখের জল কি ঢাকা থাকে?

ফালা ফালা আগুনে খাওয়া গাছ—
তারই পোড়া ছাই আমি এখন।

তাও প্রাণ বাঁধা যেন একটা আশাতে
যদি তুমি চাঁদ হয়ে ওঠো।

[সেমদলি]

দিন্‌কা সৃষ্টিতত্ত্ব

পয়লা শুরুর দিনে সৃষ্টি গড়ছেন দেন্‌দি।
সূর্য গড়লেন আগুনের মতো রাঙা—
শ্মশান গিয়ে সে, মরল, ফের ফিরে এল।
চন্দ্র গড়লেন তেজ রুপোর তাল ছেনে—
শ্মশান গিয়ে সে, মরল, ফের ফিরে এল।
গোট গোট নক্ষত্র গড়লেন একরাশি—
শ্মশান সব্বাই, মরল, ফের ফিরে এল একত্তরে।
মানুষ গড়লেন তাপ রঙ ঢেলে তখন
শ্মশান গিয়ে সে, মরল, আর ফিরল না।

[দিন্‌কা]

শোক

মরল লোকটা—ঢাক না, একটা গান না।
দুঃখী লোক গো—গরিব, না-খাই গাঞি।
কেউ মরে আগুনে, কেউ বা জলে।
তবেই দেখ, আমরা হলুম গে সব
যমঠাকুরের প্রজা—হুকুম হলেই
দুনিয়া খাটতে চলব, পালা যার।
একলা ঘরে ছিলুম, হঠাৎ শুনি
আছাড়বিছাড় বুক-ফাটা কান্না।
যাই, দেখি, ভাই, আপন সোদর ভাই
সেই গেছে। আপনাতেই বিমনাতে
দুঃখে কখন ঢাকে পড়ল বাড়ি।

[এগুরে]

লুয়ো প্রার্থনার পদ

ওগো নিয়াকালাগা গো, থুবড়ো অমর দেবতা গো।
ও নিয়াকালাগা, বাপ আমার॥
বও গাঙভরা ঘর-ভিটির মাঝ দিয়ে আমাদের।
জ্ঞাতগুনের মাঝ দিয়ে উজান উথলে বয়ে চলো॥
ঘর-ঘর ছাওয়াল হোক অগনতি যেমন বালিদানা।
মনটা করে দাও ধুয়ে কড়ির মতন সাফ সাদা॥
ওগো বীরবলী।
বেসামাল করে দাও শত্তুর মতলব।
সুফসলী করো এধারের মাঠ ক্ষেতি॥
বৌয়েরা বিশ্বাসী থাকে যেন।
বিবাদ ঘুচিয়ে দাও আমাদের সবার বাস্তু থেকে॥
নিয়াকালাগা গো, এসে বসে যাও ভোজে আমাদের।
পুজোর পানজলটুকু খাও আমাদের সাথে বসে॥

[লুয়ে]

পূর্বপুরুষের কাছে

আজকে কী হবে?
সিদ্ধি? না ব্যর্থতা?
মরব? না কি বেঁচে যাব আজও?
হায়, হায়, বান কি উঁচোয় বয়ে এঠে?
কোন্ অমঙ্গল ছায়া ফেলে
দেখ্ দেখ্ আড়াল ক'রে আছে সত্যটুকু!
মন্ত্রপূত আসগাছ মুখে মুখে তুলে ধরি তার।
এই যে এধারে পুব, ওধারে পশ্চিম,
সূর্য কেটে পড়ে যেন জীবনে জীবনে এরই মাঝে।
দেখ্ সত্য আসছেন রশ্মির সোয়ার,
আকাশ দুনিয়া চেয়ে দেখছে আমাকে।
বল্ আমার জিহ্বা কাঁপছে, ঠেলে উঠছে বেদিকে।
সাদা চুল মিথ্যের শত্তুর।
এসো গো, উর গো বাপ-পিতেমোর আত্মা, তর হও
দাঁড়াও গো সন্তানের পাশে।
দেখাই কী করা যায় দৈববল পেলে,
কিসে সিদ্ধি হয় আমাদের।
যদি কাটো নওরু গাছ দু পহর দিনে
সূর্য পাটে বসার আগেই,
নয়া কোঁড় গজিয়ে সে ঠাট্টা করে ওঠে কাঠুরেকে।
বলো তবে, জবাব দাও হে,
কী জবাব দেবে দাও সন্তানকে তোমার।

[এগুরে]

মরা লোকেদের প্রাণপুরুষ

বন্ধ হয়ে আছে পাতালের দেউড়ীখানা।
চারঘরে সব কটা দোর বন্ধ হয়ে আছে।

ভিড় করে জমেছে এসে মরা লোকেদের প্রাণপুরুষ
সন্ধ্যেবেলাকার ঝাঁক মশার মতন
ঝাঁক মশা।

নাচছে ঝাঁক মশার নাচন্ সন্ধ্যেঘোরে
রাত কালো ধরে গেল, পুরো যক্ষ কালো
সূর্য ডুবে গেছে, ঢের তলিয়ে গিয়েছে এতবেলা
রাত হয়ে উঠেছে যক্ষ কালো
আর ঝাঁক দিয়ে উড়ছে পাল পাল মশা
ঘুরে ঘুরে উড়ছে যেন মরা খসা পাতা
ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে বাতাসে।

[ঘুমো]

মৃত্যু

আগা-র বিঁধ ছাড়া ছুঁচ হয়?
ধারের ফাল ছাড়া ক্ষুর হয়?
কত রূপে আসে যে মরণ।

পা ডুবিয়ে হেঁটে যাই গো-মোষের মাঠে,
ছুতে ছুঁই দেবতার আকাশ।
একদিন পোড়ানো গরমের ভর বেলা
কাঁধে তুলে নিয়ে যাবে জানি
মরণের গাঁয়ের মাঝ দিয়ে।
গোর দিয়ো না গো বুনো গাছের গোড়াতে,
কী জ্বালা কাঁটার জ্বালা, বাপ।
দোহাই পুঁতো না গো বুনো গাছের গোড়াতে,
কী জ্বালা টপ্‌টপ্ জল ফোঁড়া।
হাটের মাঝখানে ঝাঁপা ছায়াগাছটা যে,
তারই নীচে পুঁতে মাটি দিয়ো।
শুনব ঢাক বাজে গুরুগুরু।
শুনব বুক ভরে বেজে যায়
নাচিয়ে দলটার জোড়া পা।

[কুয়া]

ফুলানি সৃষ্টিতত্ত্ব

আদিতে ছিল গো খালি এক বিন্দু দুধ।
দুনদারি আইলেন, তিনি দুধ বিন্দু দিয়া
গড়লেন পাথর।
তবে সে পাথর তারপর হৈল লোহা।
লোহায় সৃজন করে আগুন তখন।
আগুনে বানায় বসি জল।
জলে হয় সৃজন বাতাস।
দুনদারি আইলেন ফের। পাঁচ দ্রব্য নিয়া
গড়লেন মনুষের কায়াখানি।
আহা, আহা, দম্ভিলা মানুষ গো, হৈলা মহা অহঙ্কারী।
দুনদারি গড়েন বসি আন্ধিলা তখন।
আন্ধিলা নাশএ যত লোক।
আহা, আহা, আন্ধিলা গো, শক্তিধর হৈয়া হৈলা মহা অহঙ্কারী।
দুনদারি গড়েন নিদ্রা তবে।
নিদ্রা নাশে কানা আন্ধিলারে।
আহা, আহা, নিদ্রা গো, তুমিও হৈলা মহা অহঙ্কারী।
দুনদারি গড়েন এক সুভালা উদবেগ, তখনই সে
ফাল ঝাঁপ দিয়া পড়ে, নাশএ নিদ্রারে।
আহা, আহা, উদবেগ হৈয়া বসল মহা অহঙ্কারী।
দুনদারি গড়েন তবে মরণেরে, মুহূর্ত না যায়
মরণ নাশ করে উদবেগেরে।
দুনদারি আইলেন ফের, বার বার তিন বার
আইলেন গুয়েনোর রূপধারী,
আদি-অন্তহারা নিত্যসনাতন, প্রভু গুয়েনো হে,
বিনাশ কর হে মরণেরে।

[ফুলানি]

অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরিচিত-কে

(To A Stranger)

ওয়াল্ট হুইটম্যান

অপরিচিত যাত্রী।
তুমি জানো না কি তৃষ্ণায়, আতুরতায় আমি চেয়ে আছি
তোমার দিকে।
তুমি নিশ্চিত সেই পুরুষ যাকে আমি এতদিন খুঁজেছি,
বা সেই নারী যাকে সর্বদা খুঁজে বেড়াই
(সবই কেমন অলীক স্বজনের মতো ভেসে আসে মনে)
কোথাও, কখনও, নিশ্চিত আমি এক অদ্ভুত আনন্দে
জীবন কাটিয়েছি তোমার সঙ্গে—
সব মনে পড়ে—সব, যখন আমরা পরস্পরের পাশ দিয়ে
উড়ে যাই
কী হাল্কাভাবে, স্নেহময়, পবিত্রতা ও প্রবীণতার স্তব্ধ।
তুমি যে আমার সঙ্গেই বেড়ে উঠেছিলে।
তুমি ছিলে একে নবীন কিশোর
বা আমার অমল কিশোরী
আমি তোমার সঙ্গেই একত্রে খেয়েছি, ঘুমিয়েছি
তোমার ওই দেহ আর শুধু তোমারই নেই
আমার দেহও আর আমারই নয়।
তুমি প্রগাঢ় সুখ দাও আমায়,
দাও তোমার চোখদুটি, মুখ, মাংস—
যখন আমার পাশ দিয়ে আবিলতায় উড়ে চলে যাও।
বদলে, নাও আমার এই ঘন দাড়ি, বুকখানি, দুই হাত—
আমি শুধু তোমারই কথা ভাবি একান্তে যখন বসে থাকি
বা রাতে যখন জেগে উঠি একা।
আমি থাকব প্রতীক্ষায়।
আমি জানি আমি ঠিক তোমার দেখা পাব,
তাই এত সাবধানী, যেন তোমায় আর না হারাই।

অনুবাদ : সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

[ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রখ্যাত আমেরিকান কবি। তাঁর সর্বজনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ 'লিভস অফ গ্রাস'। জন্ম ১৮১৯, মৃত্যু ১৮৯২। তাঁকে আমেরিকার 'আত্মা' ও 'পোয়েট-প্রফেট'ও বলা হয়।]

শব্দ ছাড়িয়ে

(After Words)

ব্রুস বিসলে

শব্দেরা দাঁড়িয়ে থাকে কিনারায়
পরজীবী, ক্ষুধার্তের মত
অর্থ তিতিক্ষায়

কেন যে তাদের কাছে যাই? পেতে
চাই—শোকসিক্ত ; নিভে যাওয়া
ছাই, অন্তঃসারহীন

অথবা কঙ্কালরূপী, ডানায়
উড্ডীন

সেইমত বাড়িয়েছি হাত যেই, আশুস্বর:
"স্বপ্ন" মানে স্বর্গীয় গান
একান্তে বর্ণিল ;
ভাঙা পাথরের নুড়ি সমুদ্র খাঁড়িতে
শেওলার পোশাকে পছিল

কিম্বা শব্দহীন ফিসফিস স্বর
জাদুমন্ত্রকথা মূত্রগন্ধ
স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিময়, মেড়ুসার মাথা

তবু কেউ তারা আমাকে ডাকে না
একা একা ঝরে যায়, বৃথাবদ্ধ
ভাঁড়ারের ঘরে, সুন্দর আবর্জনা
স্তূপ—রাশিকৃত পচা গলা খোসা

শুধু বাতাসে রটি হয়
পূতিময় ছত্রাকের বাসা

এবং তখনও ওরা আমাকে খোঁজে না
দেয় না ফিরিয়ে কোন মন

মুক্তির
ন্যূনতম দান প্রতিদান।

অনুবাদ : তমাল সাহা

[কবি ব্রুস বিন্সলের দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ "দ্য ট্রিয়েশান", ১৯৯৩ সালে ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস/জার্নাল অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার পায়। তাঁর অন্যান্য কবিতাগুলি অ্যানটিউস, ফিন্ড, হ্যাডসন রিভিউ নামক পত্রপত্রিকা ছাড়াও আরও অনেক পত্রিকাতে ছাপা হয়েছে। কবি ওরেস্টার্ন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি (বেলিংটন)র একজন অধ্যাপক।]

আন্তর্জাতিক মহিলা কবিদের কবিতা

একগুচ্ছ বন্য গোলাপ

কারার জানালাগুলো, ডেকেছ আমায়

ড্যানিয়েল আমরানে
(Daniel Amrane)

ভয় পাই অপরিচিতকে
আর তবু হেঁটে যাই অপরিচয়ের দিকে যখন ছাড়িয়ে চলি
এই স্থান
আর যখন দেখি তোমায়
তুমি ডাক দাও আমায়
কারার জানালা
বন্ধ জানালা
আর ওই কারার আড়ালে
ভায়েরা আমার
কারার আড়ালে
সোজা স্বপটা আর শীতল
জীবন সমুদ্র এক
আমার নাম
চিৎকার করে পাঠিয়েছিলে
ভালোবাসার বার্তা
সঙ্গে নিয়েছি তোমার প্রতিমা
তোমার হাসিভরা মুখ
তোমার জীবন ভরপুর মুখ
ওই কালো কালো গরাদের আড়ালে
আর ভাবি না যে বিষণ্ণ হবার অধিকার আছে আমার
জানি না তোমায়
হয়ত জানব না কোনোদিনও
তবু ভালোবাসি তোমায়
যেমন ভালোবাসি
ট্রেমিনের আজান দেওয়া মিনার
ভালোবাসি
যেমন বাসি
কাবিল পর্বতের পথ ঘাট
ভালোবাসি তোমায়
কিন্তু জানি না কেমন করে গাইতে হয়
ভালোবাসার গান।

[আলজিরিয়া]

[ড্যানিয়েল আমরানে জন্মেছিলেন ১৯৩১-এ আলজিরিয়ার মোস্টাগানেম অঞ্চলে। নানা সংকলনে তাঁর কবিতা আছে।]

ভবিষ্যৎ আগামীতে

আন্না গ্রেকী
(Anna Greki)

ভবিষ্যৎ আগামীর জন্য
ভবিষ্যৎ আসন্ন
দেওয়ালগুলোর আড়ালে আছে দৃঢ়মুষ্টি
গরাদের মধ্য দিয়ে জাপটে ধরে সূর্যকে
চিন্তাগুলো আমাদের খাড়া আর আশাগুলো আমাদের
হৃদয়ে পাক খেয়ে জমা ভবিষ্যৎ উঠছে আকাশের দিকে
যেন উঁচুতে তোলা হাত বিদায় চিহ্ন হিসেবে
হাতদুটো খাড়া, আলোতে প্রোথিত
যেন ভালোবাসার আবেদন চিহ্নিত
ফেরাবে আমার জীবন
জাপটে ধরি বুকে বোন আমার
স্বাধীনতা আর কোমলতার স্বপতি আমার
আর বলি তোমায় অপেক্ষা করো আগামীর জন্য

কারণ জানি আমরা
ভবিষ্যৎ আসন্ন
ভবিষ্যৎ আগামীর জন্য।

[অন্না গ্রেকি (১৯৩১-১৯৬৬) আলজিরিয়ান বিশিষ্ট মহিলা কবি। তিনি ফরাসী উপনিবেশ বিস্তারীদের দ্বারা আলজিরিয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে অবরুদ্ধ, অত্যাচারিত, নির্বাসিত হন। তিনি একটি ফরাসী-আরবি দ্বিভাষিক কবিতা সংকলন করেছিলেন ১৯৬৩তে, তারপর ১৯৬৬তে যার হয় Temps Fort. নানা সংকলনে তাঁর কবিতা আছে। তিনি কেলেত অ্যান গ্রেগরি এই ছদ্মনামেও কবিতা লিখতেন।]

রক্তখেকো পৌরুষ

ইফি আমাদিয়ুম
(Efi Amadiume)

হব কি আমি শিশু পূর্ণিমার,
ভালোবাসার ক্রীতদাস
সমরকালের নারীত্বে?

আবার কি আমি পুজো করার সাহস দেখাব
নক্ষত্র চোখে ভালোবাসার মন্দিরে
সেই সব কুমারীদের সঙ্গে যারা এখনও আভাষ্টা?

আমি কি রক্তাক্ত চোখের জল ফেলব
আবার ভালোবাসতে গিয়ে
যেকালে কুমারীরা স্বাধীনভাবেই রক্তাক্ত হয়,
নতুন করে উদ্যম নেবো ভালোবাসার?

আমার বসন্তের উৎস কি
পুনরায় হটে আসবে
না বাঁকা লিঙ্গের বিস্ফোরণে?

আমার গর্ভ কি উন্মত্ততা দেখে
ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আর কুঁচকিয়ে যাবে
রক্তখেকো পৌরুষের সামনে
নারীত্বের এই তুলতায়?

[নাইজিরিয়া]

[ইফি আমাদিয়ুম নাইজিরিয়ার মহিলা কবি, যদিও এখন থাকেন ইংল্যান্ডে। তাঁর কবিতা নানা পত্রিকা ও সংকলনে স্থান পায়। তাঁর কবিতার বই Passion Waves (১৯৮৬) কমলওয়েলথ ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজ কবিতা প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান পেয়েছে। এছাড়া তাঁর প্রকাশিত বই Male Daughters, Female Husbands (১৯৮৭) এবং ইগবু সংস্কৃতি নিয়ে একটি বই।]

লেগেছিল একশ বছর

মালিকা ও-লাসেন

ওরা টুকরো টুকরো করে কাটছে
আমার শরীর আর আমার সূর্য
টুকরো টুকরো করে কাটছে ওরা
তোমাকে
    তুমি সাদা চামড়া
তোমাকে
    তুমি হয়ত কালো চামড়া
ক্ষুধা
    আলস্য
        অনিচ্ছা
লেগেছিল
    একশটি বছর
আমাকে একটা বুনো বানাতে
হয়তো আরো বেশি দিন
ওরা টুকরো টুকরো করে কাটছে সব কিছুই
দপ্তরগুলো
জেলাগুলো
কাঁচি দিয়ে ছাঁটছে ওরা ছবিগুলো
চারপাশে সীমা দিচ্ছে কাঁটাতারের
ওরা টুকরো টুকরো করছে আমার শরীর
শরীরটাকে বানাবে ইতিহাস।

মৃত খাড়াই

আমার দেশটা তো একটা সেবালয় যেখানে পাগলরা
কথা বলে তাদের চোখ দিয়ে
কারণ ওদের তো জিভ নেই
হেঁটে গেছি আমি এর মাঝ দিয়ে
        কালো রাতের মাঝখানে

হেঁটে গেছি আমি এর মাঝ দিয়ে
সারাটা পথ নীরবতার দিকে
হেঁটে গেছি আমি
সারাটা পথ কবরের দিকে
দেখেছি আমি অরণ্যেরা কথা বলে
শহরেরা কথা বলে শীতল আলো দিয়ে
অটোগুলো কথা বলে পাশাপাশি চলতে চলতে
সাবধান
সমুদ্র কিন্তু শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে বাছাধন
সাবধান
সমুদ্র ঢেকে রেখেছে আমার স্বর
আজ
পাগলিনীরা কথা বলে পাথরের সঙ্গে
আর গল্প শোনায় পর্বতদের
আমাদের মৃতেরা বেরিয়ে পড়েছে মাথা উঁচু ক'রে
আমাদের মৃতেরা ঘর ছাড়ছে খালি পায়ে।

[আলজিরিয়া]

অনুবাদ : রবিন পাল

[মালিকা ও·দাসেন (জন্ম ১৯৩০) আলজিরিয়ার আর এক বিশিষ্ট মহিলা কবি, যাঁর কবিতা সেঘের্স রেখেছেন পারী থেকে প্রকাশিত সংকলনে।]

ফরাসি কবিতা

জুলাইয়ের সেই রাত

লুই আরাঁগ

বিচিত্র এক গন্ধ পেলাম গভীর এবং বেদনাময়
মাথার ওপর গোলাপেরই ছদ্ম আতর—সন্দেহ হয়।
না না, সেই দিনটাতো নয়, সেই গোলাপও তখন কোথায়?
একঘেয়ে সব যন্ত্র চলে—বিরক্তিকর যান্ত্রিকতা...
সেই পার্থিটাও ছিলনা তো, জুলাই মাসে, রাত্রি তখন
মিটমিটিয়ে ঘুম চোখে চায় সার্চলাইটের আলো যখন
ঘুম নেই যে জানি আমি, বৃথাই ডাকি ঘুমকে আবার
আগুন দূরে আগুন, আমার জানলা দিয়ে হতছানি তার
জলের হৃদয় সবুজ তবু ছায়ায় আরো গোপন বাণী
আলো হাতে প্রহরীদল হঠাৎ শুরু করবে জানি
অন্ধকারে প্যাঁচার ভয়ে কাঁপছে যত পক্ষীশাবক
এবং সেটা সেই উষা না, নয় সে পাখি তেমন গায়ক
মুহূর্তকে রুদ্ধ করার আর কখনও নেই প্রয়োজন
রাত্রি যখন প্রণয়ীহীন, ভালোবাসাই শূন্য যখন
উষার আলো ভাঙবে নাকি একটি চিলের তীক্ষ্ণ সনেট?
একটি ভালোবাসার জন্য একা নাইটিংগল একাই অনেক
যার কথা আজ বলছি আমি, সে দিনটাতো অনেক দামি
নাইটিংগল ভাঙবে, ওকে ভাঙতে হবে নীরব বাণী
এখনও কি স্বপ্ন দেখি, কেউ পোড়ালো আকাশবাতি?
বাতাস জুড়ে উড়ছে যেন বিচিত্র সব শব্দরাজি
নেপল যখন ফোঁপায় বাতাস যেমন তারি দুঃখে যোড়া
নিকোলা পরগোরা তখন অর্গানেরই চাবি ঘোরাল

অনুবাদ : বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

[লুই আরাঁগ বিশিষ্ট ফরাসী কবি। জন্ম ১৮৯৭ সন। ডাক্তারি পড়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ সমাপ্ত করেন। সম্পাদনা করেছেন পল ভালেরি কৃত সাহিত্য পত্রিকা। লিখেছেন অন্তত: তিনটি উপন্যাস। প্রথমে ডাডাইজম্ ও সুররিয়ালিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। এলীনা নাম্নী রমণীকে বিয়ে করে সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। ফিরে এসে 'রেড ফ্রন্ট' নামে দীর্ঘ কবিতা লেখেন। ফ্যাসী বিরোধী লেখার জন্য বিখ্যাত হন। ১৯৮২ সালে তার মৃত্যু হয়।]

বাংলাদেশ

তাই বলে

মোহাম্মদ রফিক

পদ্মার বিস্তীর্ণ চড়া জুড়ে
শুয়ে আছো তুমি,
তোমার শাড়িও অল্প-অল্প ফুঁসছে হাওয়ায়
তুমি যে পথ দিয়ে হেঁটে এলে, কেউ-কেউ বলে,
কী নিদারুণ-স্পর্শিল ; কেউ বলে, খরবৈনাশিক

জাহাজ ঘাটে এসে ভিড়লেও ঘুম ভাঙেনি তোমার,

দূরের যাত্রীরা একে-একে তোমার স্ত্রী-গর্ভ মাড়িয়ে
সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতেই টের পায়, পায়ের তালুতে,
বুড়ো আঙুলের নখে, ছ্যাঁকা দেয় তৃণের চামড়া,
ভুবনব্যাপী গলে যায় তোমার মাংস এবং আঁশ

যাকে আমরা জল বলি, বলি পাড়,
তোমার বাঁ-পাজরের হাড়গুলো গুঁড়িয়ে যেতেই
দুই হাত ভরতি উপচে এল চাঁদ,
আর তোমার দুটো ঠোঁট পান করে চলেছে জিহ্বা
আকণ্ঠ, কিন্তু ক্ষুৎতৃষ্ণা মিটল না অগ্নির

শুধু জানা গেল, তোমার এ-ঘুম ভাঙার নয় কোনোদিন
তোমার এই ফিরে আসারও শেষ নেই কোনোদিন,
এ শুধু বিস্তৃত শরশয্যা,
এ শুধু বিবাহ, বাসর, অধিবাস,
জল এবং ডাঙার, জরায়ন ডাঙা এবং জলের ;

রোমকূপ জুড়ে পদশব্দ কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার নয়

বেণ্ডমার

একদিন পদ্মা এসে ধাক্কা দেয় কবরের গায়ে ;
বলে চলে, ওঠো, জাগো ; ঢেউয়ের আসঙ্গ স্পর্শ লেগে
ধীরে আড়মোড়া ভাঙে হাওয়া, টানা আপাদমস্তক
মুড়ে-থাকা বালু-পাথরের থান নড়ে ওঠে বিমূঢ়, বিহ্বল।

এতকাল ঘুমিয়ে আছিলা, বেশ, এইবার ওঠো,
বলে ঢেউ, সেই না বিবাহ হল, কথা ছিল শস্যে
জরায়ু-সম্পদে ভরে তুলবে ধরা বিরান-প্রান্তর,
তুমি মাটি, আমি জল, সেই একরাত্রির বাসর ;

মনে পড়ে, ভোর-ভোর, তুমি মাঠে চললে, হাল-গোরু
সঙ্গে নিয়ে, চাষ দেবে ; আর আমি, বাসন-কোসন
কাঁখে, পানা-পুকুরের পথে ; সেইদিন থেকে তুমি
মাটি উগরে-দেওয়া টিবি আর আমি খুঁইয়ে-যাওয়া স্রোত ;

উঠে বসে, অন্তর-বাহিরে টানে, বালুময় গাঙ ;
আর পদ্মা, চড়া পড়ে জেগে আছে একখণ্ড গোর।

মা

মাসুদ খান

এই ধূলি-ওড়া অপরাহ্ণে,
দূরে, দিগন্তের একেবারে কাছাকাছি
ওই যে খোলা আকাশের নীচে একা শয্যা পেতে শুয়ে আছেন,
তিনি আমার মা।
দূর্বা আর ডেটলের মিশ্র ঢেউয়ে ঘ্রাণে রচিত সে-শয্যা।
নাকে নল, অক্সিজেন, বাহুতে স্যালাইন, ক্যাথেটার—
এভাবে প্লাস্টিক-পলিথিনের লতায় গুল্মে আস্তে-আস্তে
জড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি।

শয্যা ঘিরে অনেকদূর পর্যন্ত ধোঁয়া-ধোঁয়া
মিথ্যা-মিথ্যা আবহাওয়া।

মনে হল, বহুকাল পরে যেন গোধূলি নামছে
এইবার কিছু পাখি ও পতঙ্গ
তাদের উচ্ছল প্রগল্‌ভতা
অর্বাচীন সুরবোধ আর
অস্পষ্ট বিলাপরীতি নিয়ে
ভয়ে ভয়ে খুঁজছে আশ্রয় ওই প্লাস্টিকের ঝোপঝাড়ে,
দিগন্তের ধার ঘেঁষে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন মৃত্তিকায়।

সংকলক : অরুণ সেন

ভারতীয়

কয়েকটি ছিন্নসূত্র

অতীশ দীপঙ্কর

প্রাণের শক্তির কাছে যদি কেউ নিজের সম্মান
রেখে যেতে চায়
তাহ'লে নিজেরই প্রজ্ঞায়
যেন আকর্ষণ করে প্রাণ ও শক্তির সব শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান

২.

কোথায় ভাবের শুরু

বস্তুকল্পে
কিংবা অন্তর্মুখী
চিত্ত তাকে তীব্র গড়ে তোলে
তবু উভয়ের সংযোগের মতো তার সূচনাটি নয়

৩.

ভাব, এই কথাটিকে
প্রতীকের মতো মর্ত্যপৃথিবী
ধারণ করেছে ধূলিবিম্বের দিকে
বিকল্প নেই, রয়েছে কেবল নির্বাণই নিবিড়

বোধিপথপ্রদীপ অংশ

আমারই শিষ্য বোধিপ্রভের সংরাগে-অনুরোধে
যে-মঞ্জুশ্রী কুমারভট্টের নিকটে নম্র হয়ে
রচনা করেছি এই বোধিপ্রদীপের পুঁথিটিকে
সে-কৃপা আমার ধর্ম-সত্ত্বে প্রণামের মতো জাগে

অধর্ম আর উত্তম—এই উভয়ের মাঝখানে
যিনি মধ্যম, তিনিও পুরুষ, শ্রেণীবিভাজন তবু
আপাতসহজ 'সংসারসুখমাত্র' অন্বেষণে
অধর্ম তার একার আপনস্বার্থেই নিয়োজিত

'ভবসুখ' যাকে অস্পৃহ করে, স্বভাবে অপাপবিদ্ধ
তবু যে একার আপনকর্মে রত হয়ে থাকে শুধু
সে-ই মধ্যম : যিনি উত্তম, নিজে বহু ক্লেশ নিয়ে
সকলের সব দুঃখের ভার গ্রহণ করেন তিনি

'পরমপ্রাণী'র কাছে মহাগুরু 'আত্মবোধি'র শিক্ষা
ফুলে-সুগন্ধে-কাব্যে প্রণাম জানাই সে' বুদ্ধকে

অনুবাদ : অমিতাভ গুপ্ত

কয়েকটি কবিতা

আইয়াপ্পা পানিকর, কে.

১. বেয়োগ্রাভ
(ইনা ক্রেডা-র জন্য)

মানুষ ও তার দিব্যদৃষ্টি বিষয়ে
আমি কত না আশ্বস্ত হই
যখন দেখি যে খোলা জানলার আড়ালে
কাচা কাপড় শুকানোর জন্য মেলে দেওয়া হয়েছে

নিংড়ানোর সময় কয়েকটি হাত নিষ্ঠুর
হয়েছিল এখন চোখের জল ও আদরে
বিন্যস্ত ভাঁজগুলি
উষ্ণতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

বাতাস বয়
এবং জানলাগুলি বন্ধ হয়
কিন্তু ফাঁক দিয়ে
ছোটো ছোটো চোখ আলোর দিকে তাকিয়ে হাসে।

এখানে আলো, উষ্ণতা, ভালোবাসা।
এখানে জীবন।

২. ইগুয়া
(সাভে-র জন্য)

সেন্ট নাউম-য়ের রাজহাঁসগুলি শ্বেত ও নিষ্কলঙ্ক
কিন্তু তারা যে মদ খায় তা লাল ও মিস্টি।
হাঁসগুলো জলে তাদের মাথা শুকায়
এবং সাপগুলো ঘাস ছেঁড়ে নিঃশব্দে।

হেরাক্লিয়ন-র দুর্দশাগ্রস্ত মোজাইক-য়ের দিকে
মিলাডিনোফ ভাই-রা পাতাবিহীন চোখ খোলে
প্রিয় হরিণ বাঘের দ্বারা আক্রান্ত
নারেক্সি-র পাঁচটি জমাট অশ্রুবিন্দুর গম্বুজ
পাহাড়ে আব্রাহাম আইজাক-কে কাটতে উদ্যত
গটসে ডেন্টচেভ শেষ পর্যন্ত স্মারক স্তম্ভে রক্ষিত
এক ভগৎ সিং লতার মতো শিরা সমেত।

এখন একটি রক্তের রেখা ভারদার দিয়ে নামে এবং
প্রেসপ্যানসকো জেজেরো ওরিভস্কো জেজেরোকে
একটা গোপন সংবাদ পাঠাচ্ছে
ফিলিপ-য়ের পুত্র, প্রাচীন আলেকজান্দার
সেতু নির্মাণকারী এবং ধ্বংসকারী
সেলুসুস এবং পোরুস, এখন মাটির তলে দাবা খেলছে
হাড়ির বলে কিস্তিমাত
গ্রীক এবং তুর্কী এবং হাঙ্গেরীয়
এবং জার্মানরা।

মাকেডোনিয়া
আমি তোমার মঠগুলির চিৎকার শুনতে পাই
প্রায়শ্চিত্তের ভূগর্ভস্থ কুঠুরি থেকে ভেসে আসা,
দেয়ালে খোদাই নিখুঁত ভাস্কর্য;
দেবদেবীদের পটচিত্রগুলি টুরিস্ট ও তাদের মানিব্যাগের দিকে
বিষণ্ণ চোখে চেয়ে আছে
প্রাচীন বেদনার সন্ত স্মৃতিচিহ্নে ভরা
যখন ক্রেনো ডিনো-তে নিমজ্জমান স্মৃতি
অর্কিড-য়ের ঢেউয়ের উপরে জেগে ওঠে সামগান।
আগ্রেব এবং লুবলিয়ানা কান পেতে শোনে
যখন খৃষ্টপূর্বাব্দের পাহাড়গুলির উপর মেঘ করে আসে
মেঘ ও মেঘপালকদল আর ডাকাডাকি করে না
এবং মেঝের উপর দোমড়ানো রুমালের মতো মানচিত্র খসে
পড়ে।

৩. স্কোপে
(সিসিলিয়ানা-র জন্য)

আমার গ্রাম আমার মধ্যে শিকড় মেলেছে, মেয়েটি বলেছিল,
কিন্তু আমি সাত তলায় থাকি
জানলার তাকে শিকড় একটা টবে বেড়ে ওঠে
প্রত্যেক বসন্তে তারা অভ্যাসবশত ফুলে ভরে ওঠে
একটু ভীরু চোখের চাহনি তাদের আরো সুন্দর করে
আমাদের শীতিবোধ ওদের থেকে আলাদা তা না জেনে
শীতকালে ওদের আঁকড়ি আমাদের দিকে ঝুরে যায়।

আমার বাবা তাঁর নিজের অজ্ঞাত কোনো দেশ থেকে
এসেছিলেন
উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি বংশনাম পাননি
বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সর্বদাই এক ছেদ থাকে
আমার ছেলেবন্ধু আমাকে ঈর্ষান্বিত হওয়ার অধিকার দেয় না
হ্রদে মাছ টেবিলে পরিবেশিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল
ডিম ছানা না পেড়ে খাদ্য হতে চায়
স্বপ্নময় বাতাস নিঃস্তব্ধতায় কর্তিত হয়
মাটিতে কিমা মাংসের মতো ধ্বসে পড়ে
মধ্য নিশীথের সংযোগস্থলে রাত্রি
সবুজ সংকেতের জন্য অপেক্ষমান
রাত্রির দেওয়া-নেওয়ার পর
জোড়বাঁধারা স্বতন্ত্র হয়েছে
রাত্রির দেওয়া-নেওয়ার পর
সড়ক নির্ঘুম ক্লান্ত এবং ঘুমবড়ি খোঁজে
দূরদূরান্তে ধাবমান ভারবাহী ট্রাকের তলে পিষ্ট
কান্না নয়, প্রীজ, ছেলেটি বলেছিল
আমার গ্রামে প্রবাদ আছে
পুরুষমানুষ সব সময় একটু পেচ্ছাপ ঝেড়ে ফেলতে পারে
এবং মেয়েরা সোনালি অশ্রু।
দ্বিগুণ বক্ষ বলবানরা
দেশী পনির তোমাকে মাতৃরূপে ফুলিয়ে তুলেছে
এবং আমার উষ্ণ স্পর্শে তুমি গলে যাও
কিন্তু তুমি যদি টলতে টলতে চলার সময় দুটোকে না বইতে
পারো
তবে আমাকে তাদের একে একে বহন করতে দাও
কিন্তু কেন হাই হিলের উপর দুলছ
যেন এটা বলার জন্য আমি তোমাদের গীতা এবং সূত্র পড়েছি
তারা মিশে যায় বটে

রাতের পার্টি শেষ হচ্ছে
নিজের ল্যাজ গলাধঃকরণকারী সাপের মতো
ওয়াটারবটলস্কি এবং ক্রনোভিনোস্কি
শূন্য এবং ফাঁকা হয়েছে
সহজাত প্রেরণায় চালিত হয়ে
চলো আমরা তোমার বিছানার পথ খুঁজে বের করি

অনুবাদ : উৎপলকুমার বসু

[আইয়াপ্পা পনিকর, কে. (মলয়ালম, জ. ১৯৩০)—কর্মজীবন সুরু ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডক্টরেট এবং ইয়েল ও হ্যারভার্ড থেকে পোস্ট ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত। একদা কেরলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নাল অফ সাউথ এশিয়ান লিটারেচার-এর সহ-সম্পাদক ছিলেন। বহু পুরস্কার ও সম্মানে

ভূষিত। অনেক দেশ ঘুরেছেন। বর্তমান ভারতীয় সাহিত্যের এক প্রাজ্ঞ পুরুষ 'দিন ও রাত্রি' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৮৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পায়। তাঁকে আধুনিক মালয়ালম কবিতার পুরোধা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর কবিতার উপজীব্য দেশ ও বিদেশ, মানুষজন, নিজের মানবিক সমস্যা এবং আরো বৃহৎ প্রেক্ষাপটে গ্রুপদী সাহিত্য ও অন্তর্জাগতিক অস্তিত্ব।

প্রস্তুতি তাঁর প্রবন্ধের বই 'ইণ্ডিয়ান ন্যারেটোলজি' প্রকাশিত হয়েছে।]

অসমীয়া

জীবন

বিপুলজ্যোতি শইকিয়া

অসময়ে এসেছ,
অপেক্ষাও করেছ।

যখনই আসবে
অপেক্ষা করতে হবে
ধৈর্য ধরতে হবে।

এভাবে প্রতীক্ষার শেষে
হয়তো সে আসবে—
যার জন্য তোমার প্রতীক্ষা
সে আসবে।

সে হয়তো একটি ফুল
অথবা আকাশ,
নদী,
দীর্ঘশ্বাস,
ভাঙনের শব্দ,
কিংবা ছোট্ট এক শিশুর কান্নার গান।
হতে পারে সে কোনো ঠিকানা
কিছু হারিয়ে যাওয়া বা খুঁজে পাওয়ার খবর—
অথবা কোনো চেনা মানুষের লাশ।

সে আসতে পারে, নাও আসতে পারে।
কিন্তু এ প্রতীক্ষা শেষ হবেই একদিন এবং
তোমাকে একদিন ফিরে যেতে হবে।

তুমি সূর্য নও—
যে অবশ্যই ফিরতে হবে রাত্রি শেষ হলে।
এই তো আমাদের জীবনের সাধনা।

[বিপুলজ্যোতি শইকিয়া বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে অলংকারবর্জিত ভাষায় কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি আসাম 'সাহিত্য সম্মেলন' সংস্থার পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন। 'ব্রহ্মপুত্র' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘ দশ বছর। তাঁর কবিতায় অধিবাস্তবতার সুরের প্রাধান্য লক্ষণীয়।]

আমি ও নদী

হীরেন ভট্টাচার্য

আমার রক্তে একটা নদী আছে—
যেখানে মাঝদুপুরে তামাটে উত্তাপে
উজ্জ্বল জলের মাছগুলো
জলপরীদের চিকন শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

এসো আমরা যাই দেখি মাছগুলোকে
কেমন তারা ক্ষিপ্র সাঁতরায় তোলপাড় করা জলে
তোমার পা দুখানি আসুক পরীর মতো উড়ে—
যেন সুখের ঘরের চাবি তোমার হাতে,
সকল ফসলের সোনা সোনা রঙের হাতছানি।

অনুবাদ : ভিতাস মিত্র

[অসমীয়া কবিতা-জগতে হীরেন ভট্টাচার্য একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর জীবনবোধ, রূপকল্প, প্রতীকী রূপায়ণের নৈপুণ্য এবং গাঢ় গভীর অর্থব্যঞ্জনা পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে।]

বিদায়

নিদা ফজলি

তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম যখন,
বলল না সে একটা কথা
অথচ যখন ব্যাগ খুললাম
বিমানবন্দরে
দেখি
নিঃশব্দে সে রেখে দিয়েছে
তার দুই সন্তানের ফোটোগ্রাফ
আমার পোশাকের তলায়।
সে আমার ছোটো বোন।
অবাক হই
কেন সে আমাকে
আশীর্বাদ করেছিল
মায়ের মতো।

প্রস্তাব

মোহম্মদ আলভি

খাও ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল
ঘিয়ে ভাজা রুটি
ঘুমোও সাদা বিছানার বুকে
উপভোগ করো টিভি
ঈশ্বর, একদিন এসো আমার বাড়ি
এসে লুকিয়ে থাকো
একদিন আমার বাড়িতে।

অনুবাদ : অনির্বাণ রায়

সাঁওতালী লোক সঙ্গীত

১.
নদী পাড়ে তুমি হাল চালাও আমি
সে নদীতে তুলি জল
মুচকি হাসিতে এ মন ভুলালে
জানো তুমি কত ছল।

চোখে চোখ মেরে করলে বিবশ
ওগো ও পরাণ বঁধু
কথা বলো তুমি দেখ সাড়া দিই
নাকি চুপ থাকি শুধু?

২.
আগের মতো নেইকো তুমি পাল্টে গেছে মন
তোমাকে তবু ভুলতে পারি না যে
ও মুখ দেখে সুখ যে জাগে মনে
যত দেখি বুকের ভেতর খুশীতে ঢেউ নাচে।

৩.
কথা ছিল প্রিয় দু'জনেই যাবো
পরবেতে ঘাটশিলা
প্রতীক্ষা করে বেলা চলে গেলো
ভালবাসা হলো টিলা
পুবের সূর্য পশ্চিমে ঢলে
তবু তো এলে না তুমি
পুড়ে যায় বুক সখের মহুল
জীবন রঙ্গ ভূমি।

৪.
হাতির মতন সরহায় পরব ছিলে তুমি কোথায়?
আমি ছিলাম মাঠের সবুজ ধানের ঝাড়ের ছায়ায়
নতুন খতুর সঙ্গে এলাম তোদের কাছে হেথায়
নিজকে নিজে ছড়িয়ে দিলাম হাসি খুশির মায়ায়।

৫.
দশ বারোটি নদী পাহাড় পেরিয়ে তুমি দাদা আমার
করতে এলে আমার নিমন্ত্রণ
বসতে দিচ্ছি চৌকি পিঁড়ি বসো তুমি এখন

বুঝতে পারছি আমার উপর
তোমার মায়া সত্য চিরন্তন।

৬.
মায়ের দেওয়া হলুদ রাঙা কাপড়
আমরা সকল ভাই বোনেরা পরে
বাবার কেনা কাঁসার করতালে
সুর তুলবো গান গেয়ে নাচ করে।

৭.
নদী তীরে বসি কেন বার বার
বাজাও তোমার বাঁশী?
সে বাঁশীর সুরে উন্মনা মন
কুমারী হৃদয় করে টন্ টন
উথাল পাথাল সারাটি অঙ্গ
আঁখে সাগরে ভাসি।

সম্প্রীতির খোঁজে

সলুক সীগীই পান্তে

এুহম হেমব্রম

দেশে দেশে আজ মানুষে মানুষে সম্প্রীতির অভাব
দারুণ আকাল দারুণ খরা
পুড়ে যাচ্ছে গ্রাম ও শহর
বন্যি জনপদ।

তোমার প্রেম ভালবাসা শূন্যে উধাও
আমার ভিতরে বিশাল শূন্যতা
প্রেমিক-প্রেমিকা রাজনীতিবিদ নেতা
শিক্ষক ছাত্র সবাই আজ একই ব্যাধিতে ভুগছে
সবাই আজ ভাব ভালবাসাহীন ভয়ঙ্কর শাপদের শিকার।

দ্বন্দ্বদীর্ণ সময়
বদলে দিচ্ছে পৃথিবীর মুখের আদল
চতুর্দিকে সশস্ত্র দুর্দিন
আক্রমণের বিষ দাঁত
উপড়ে নিচ্ছে প্রীতি ঐক্য সমন্বয়
শান্তির মঞ্জিল ধ্বংস করে খুন রক্তপাত
সদর্পে হেঁটে যাচ্ছে রাজ্যময়।

এদিকে ওদিকে আগুনের ফুলকি
জতুগৃহে আমরা পুড়ছি তো পুড়ছিই
পরিত্রাণের পথ নেই
এসো এক বুক অন্ধকার ঠেলে
সম্প্রীতির সন্ধানে হাত বাড়াই।

আমরা চাই ভালবাসার স্পর্শ সুখ
দিগন্ত জোড়া আলোর বিস্তার।

অনুবাদ : মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

[কবি বাঁকুড়া জেলার তরুণ সাঁওতাল কবি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমাজ সচেতন কবিতা লিখে থাকেন।]

বলিষ্ঠতরা

আউগুস্ট স্ট্রিণ্ডব্যার্গ

মিসেস্ এক্স—অভিনেত্রী, বিবাহিতা।
মিস ওয়াই—অভিনেত্রী, অবিবাহিতা।

[মেয়েদের রেস্তরাঁর একটা কোণ। ঢালাই লোহার দুটো ছোট টেবিল, লাল ভেলভেটে মোড়া একটা সোফা, কয়েকখানা চেয়ার।

টুপি আর শীতের কোট পরা মিসেস এক্স ঢুকল, তার হাতে একটা সুদৃশ্য জাপানী ঝুড়ি।

মিস ওয়াই-এর সামনে রয়েছে কিছুটা খালি একটা বীয়রের বোতল। একটা সুইডিশভাষা সাপ্তাহিক পড়ছে সে, একটু পরে পরেই একটা ফেলে দিয়ে নতুন আরেকখানা কাগজ নিচ্ছে।]

মিসেস এক্স—এই যে, কেমন আছ মিলি? এই ক্রিসমাসের সন্ধ্যেয় আইবুড়ো বেচারীদের মতো একলা বসে এখানে!

[মিস ওয়াই কাগজ থেকে এক মিনিটের জন্য চোখ তোলে, মাথা নাড়ে, তারপর আবার কাগজ পড়তে থাকে।]

সত্যি, তোমায় এমন দেখে বড় দুঃখ হচ্ছে আমার। একলা—একটা রেস্তরাঁয় বসে বসে একলা—তাও কিনা এই ক্রিসমাসের সন্ধ্যেয়। পারীতে এক রেস্তরাঁয় এক বিয়ের দলকে দেখেও এই রকম কষ্ট হয়েছিল—কনে বসে এককোণে একটা হাসির কাগজ পড়ছে আর বর অন্য ধারে বিয়ের সাক্ষীদের সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলছে। আমি ভাবলুম, বাবা, শুরুতেই যদি এই তবে এর শেষে না জানি কি হবে! ভাবো একবার। বিয়ের দিন কিনা বিলিয়ার্ড খেলা। জানি জানি তুমি বলবে যে মেয়েটাও তো কাগজ পড়ছিল। কিন্তু সে হলো গিয়ে অন্য ব্যাপার।

[ওয়েট্রেস এককাপ চকোলেট আনে, মিসেস এক্স-এর সামনে রাখে, তারপর চলে যায়।

মিসেস এক্স কয়েক চামচ চকোলেট চাখে, ঝুড়িটা খোলে, নানারকমের ক্রিসমাসের উপহার দেখায়।]

বাচ্ছাদের জন্যে কি সব কিনলুম, দেখ!

[একটা পুতুল তুলে নেয়।]

এটা কেমন মনে হয়? এটা পাবে লিজা। কেমন চোখ ঘোরায়, মাথা নাড়ে, দেখছ? চমৎকার, না? আর এইটে হলো কার্লের জন্যে—কর্ক লাগানো পিস্তল একটা।

[পিস্তলে কর্কটা লাগিয়ে মিস ওয়াই-এর দিকে তাগে। মিস ওয়াই চমকে ওঠে, যেন ভয় পেয়েছে।]

চমকে উঠলে যে? কি ব্যাপার? তুমি কিছু আর সত্যিই ভাবনি যে আমি তোমাকে গুলি করতে যাচ্ছি? আমার সম্বন্ধে এমন কথা যে তুমি ভাবতে পার, তা আমার মাথাতে আসে নি। বরং তুমি যদি আমায় গুলি করতে—তাতে আমি একটুও আশ্চর্য হোতুম না।

একবার তোমার পথে বাধা হয়েছিলুম—আর জানি সেকথা তুমি ভুলবেনা কোনদিন। কিন্তু কী করতে পারতুম আমি? তোমার এখনো বিশ্বাস যে আমি বড় করে তোমাকে রয়্যাল থিয়েটার থেকে সরিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু সত্যি বলছি সে রকম কিছুই আমি করিনি—যদিও তোমার ধারণা, আমি করেছি। অবিশ্যি এখন আমি যাই বলি কিছু আসে যায় না : কেননা তোমার দৃঢ় বিশ্বাস ও-কাজ আমিই করেছি। [একজোড়া এমব্রয়ডারি করা চটি বার করে] আর হ্যাঁ—এই দেখ, এটা আমার স্বামীর জন্যে—টিউলিপ আঁকা—নিজেই এমব্রয়ডারি করেছি ওর জন্যে। অবিশ্যি টিউলিপ আমার একদম অপছন্দ—কিন্তু ওর কিনা সব কিছুতেই টিউলিপ আঁকা চাই।

[ছিপ এবং কৌতূহল মেশানো ভঙ্গীতে মিস্ ওয়াই কাগজ থেকে মুখ তুলে চায়। মিসেস এক্স চটি দুটোতে তার হাতের ঢেটো ঢুকিয়ে]

দেখ একবার, কি ছোটো ছোটো পা আমার কর্তার। দেখেছ? আর যদি তাকে একবার হাঁটতে দেখ—সে ভারী মজার দেখতে। অবিশ্যি তুমিতো আর ওকে চটিপরা অবস্থায় কখনো দেখনি।

[মিস ওয়াই জোরে হেসে ওঠে।]

ওই দেখ, ও আসছে।

[হাত দিয়ে মিসেস এক্স চটিজুটোকে টেবিলের ওপর দিয়ে হাঁটার ভঙ্গীতে নিয়ে যায়। মিস্ ওয়াই আবার হেসে ওঠে।]

তারপর ওতো যায় চটে—ঠিক এই রকম করে পা ঠোকে আর ধমকায় : "কক্ষি করতে পারে না যে রাঁধুনী, তাকে বকতে পারনা"। কিংবা "আচ্ছা বোকাতো। মেয়েটা আবার আমার পড়ার বাড়িটা ঠিক করে রাখতে ভুলেছে।" কিংবা হয়ত মেঝে থেকে হিম উঠে ওর পায়ে ঠাণ্ডা লেগেছে। "ধ্যেৎ—কি জমাট ঠাণ্ডা রে বাবা। উজবুকগুলো বাড়িটা পর্যন্ত গরম রাখতে পারে না।"

[একটা চটির সোলের সঙ্গে অন্য চটির সোলটি ঘসতে থাকে। মিস্ ওয়াই কেটে পড়ে প্রলম্বিত সশব্দ হাসিতে।]

এক একদিন আবার বাড়ি ফিরে ওকে খুঁজতে হয় ওর চটিজোড়া—মেরী হয়তো চটিজোড়া সরিয়ে রেখেছে সেখবার বড় "ব্যুরো"-টার নীচে। অবিশ্যি নিজের স্বামীকে নিয়ে তামাসা করাটা ঠিক নয়। তাছাড়া সবসুদ্ধ মিলিয়ে লোকটা ভাল—সত্যিকারের ছোট্ট খাসা স্বামী একখানা। তোমারো এমনিতর একটা স্বামীর দরকার। হাসছ কেন? কারণ জানো না? বলতে পারো না? এই ধরোনা কেন, লোকটা খুব বিশ্বাসী। হ্যাঁ, আমি জানি, সে নিজেই আমাকে সে কথা বলেছে কিনা। অমনতর খিলখিল করে ওঠার কি হলো এতে? অবিশ্যি আমি যখন বাড়ির বাইরে, তখন একদিন ওই লক্ষ্মীছাড়া বেটি মেয়েটা ওকে ফোসলাবার তাল করেছিল। কি ঘেন্না! এর চাইতে নোংরা ব্যাপার আর কিছু ভাবতে পার? [চুপ] হারামজাদীর চোখদুটো আমি খিমচে উপড়ে ফেলতুম—ঠিক ফেলতুম—অবিশ্যি যদি সেই সময়ে বাড়ি থাকতুম আমি। [চুপ] ও নিজে থেকেই সব আমাকে খুলে বললে ভাগ্যি। পরের কাছ থেকে এ কেচ্ছার কথা তাই আর শুনতে হয়নি। [চুপ] ভাবো তো একবার 'বেটি' ছুঁড়িটাইবা কেমনতর? কি জানি কেন, সব মেয়েগুলোই যেন আমার কর্তাটিকে ফোসলাবার জন্যে মুখিয়ে আছে। ও সরকারে বড় চাকরি করে কিনা—তাই বোধহয় সবাই ভাবে যে কাজকর্ম জুটিয়ে দেওয়ায় ওর হাত আছে। হয়তবা তুমিও চেষ্টা করেছ—হয়তবা তার জন্যে তুমিও জাল পেতে বসে আছ। হ্যাঁ—তোমাকেও আমি খুব বেশি একটা বিশ্বাস করি না। তবে কিনা ভালো করেই জানি যে তোমার ওপরে ওর কোনদিন এতটুকুও টান ছিল না, এখনও নেই। আর তাছাড়া তোমারো যেন ওর ওপরে একটা আক্রোশের ভাব আছে।

[চুপ। ওরা পরস্পরের দিকে বিব্রত ভাবে চায়।]

অ্যামেলিয়া, আজ সন্ধ্যেটা আমাদের সঙ্গে কাটাবে চলো। যাবে না? চলো না শুধু একবার দেখাতে যে তোমার মনে কোনো রাগ নেই—অন্তত, আমার ওপরে। ঠিক কেন বলতে পারিনা—কিন্তু তুমি—তুমি আমার শত্রু হয়ে থাকবে, এটা আমার ভয়ানক বিশ্রী লাগে। হয়ত সেবার তোমার পথে বাধা হয়েছিলুম বলেইবা। [ধীরে ধীরে] আমি জানি না, সত্যিই আমি একদম জানি না।

[চুপ। মিস ওয়াই অনুসন্ধিৎসুর মত তাকিয়ে থাকে। মিসেস এক্স চিন্তিত ভাবে]

কি রকম অদ্ভুত যেন—কি ভাবে আমাদের পরিচয় হলো। কেন যেন প্রথম দিন তোমাকে দেখে রীতিমত ভয় পেয়েছিলুম। এত ভয় যে তোমাকে চোখের আড়াল করতে সাহস হোতনা। কোথায় যাবো ঠিক করেছি, অথচ সেখানে না গিয়ে দেখতুম সব সময়েই আমি তোমার কাছাকাছি কোথাও আছি। তোমার শত্রু হবার মতো সাহস ছিল না, তাই তোমার বন্ধু হলুম। কিন্তু যখনি তুমি আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসতে, বাতাসে কেমনতর বেসুরো ভাব বেজে উঠত। আমি দেখতে পেতুম আমার স্বামী তোমাকে পছন্দ করে না—এতে আমার ভারী বিরক্ত লাগত, পরণের পোষাক গায়ে ঠিক নাহলে যেমনতর লাগে। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতুম ও যাতে তোমার সামনে অন্তত বন্ধুর ভাব দেখায়। কিন্তু কিছুতেই ওকে টলাতে পারিনি—মানে যতদিন না তুমি অন্যের সঙ্গে বাগবদ্ধ হলে। হঠাৎ তখন তোমরা দুজনে এমন প্রগাঢ় বন্ধু হয়ে উঠলে যে মনে হোত এতদিন বুঝি তোমরা তোমাদের সত্যিকারের মনের ভাবটি নিজেদের কাছেও স্বীকার করতে পারো নি—এতদিন যেন তা নিরাপদ ছিল না। তারপরে? হ্যাঁ, ঈর্ষ্যা অবশ্য আমি করি নি। আশ্চর্য নয় কি? মনে পড়ছে খোকার নামকরণের কথা। তুমি খোকার ধর্ম-মা হয়েছিলে। আমি জোর করে ওকে দিয়ে তোমাকে চুমো খাওয়ালুম। খেলো অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত—কিন্তু তোমাদের দুজনকে এমন বিব্রত দেখাচ্ছিল। মানে—তখন অবিশ্যি সেকথা আমি ভাবিনি—কিংবা পরেও না—না, একথা আমি কখনো ভাবিনি—শুধু এইমাত্র মনে হলো।

[উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে ওঠে।]

কোনো কথা বলছনা কেন? এতক্ষণের ভেতরে একটা কথা তুমি বলনি। তুমি শুধু আমাকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিচ্ছ।

তুমি শুধু ওখানে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছো আমার দিকে —আর, আর তোমার চোখদুটো আমার মনের এইসব ভাবনাকে টেনে টেনে বার করছে আমার ভেতর থেকে, যেন গুটির মধ্যে রেশমের মত তারা লুকিয়েছিল আমার মনে —এই সব ভাবনাচিন্তা—হয়তবা কুচিন্তা। না, না, ভাবতে দাও আমাকে। কিজন্যে তুমি তোমার বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভাঙলে? আর তারপর কখনো আর আমাদের বাড়ি আসোনি কেন? কেন আজ ক্রিসমাসের সন্ধ্যেটা কাটাতে চাওনা আমাদের সঙ্গে?

[মিস্ ওয়াই যেন কথা বলতে চায় এমনিতর ভাব করে।]

না, তোমাকে কোন কথাই আর বলতে হবে না। এখন সবই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হুঁ, সবকিছুর মূলে তাহলে এই? ঠিক, ঠিক। এখন সব মিলে যাচ্ছে। লজ্জা করে না? তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসতেও ঘেন্না করছে আমার।

[অন্য টেবিলে তার জিনিষপত্র সব সরিয়ে নেয়।]

তাই বুঝি ওর চটিতে ওই বিশ্রী টিউলিপের ছবি আমাকে তুলতে হবে—টিউলিপ যে তোমার পছন্দ।

[চটিজোড়া মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।]

তাই গ্রীষ্মে আমাদের যেতে হবে পাহাড়ে—সাগরের লোনাগন্ধ যে তুমি সইতে পার না। তাই আমার খোকার নাম রাখা হয়েছে এসকিল—তোমার বাবার ঐ নাম ছিল যে। আর তাই আমাকে পরতে হবে তোমার পছন্দসই রংয়ের পোষাক, পড়তে হবে তোমার পছন্দসই বই, খেতে হবে তোমার পছন্দসই খাবার, তোমার পছন্দসই পানীয়—যেমন, এই চকোলেট। তাই—ওহ্ ভগবান—কি ভয়ানক, ভাবতে গেলে —কি ভয়ানক। তোমার সব কিছু জোর করে চাপানো হয়েছে আমার ওপরে—এমনকি তোমার আবেগ অনুভূতিগুলো পর্যন্ত। আপেলের পোকার মতো তোমার মন আমার ভেতরে কুরিয়ে কুরিয়ে ঢুকেছে, আমার মনকে কুরে কুরে খেয়েছে, গর্ত করে সেঁধিয়েছে—শেষ পর্যন্ত আর কিছুই রাখেনি শুধু বাইরে খোসা আর ভেতরে কালো মাটির গুঁড়ো ছাড়া। তোমার সান্নিধ্য থেকে পালাতে চেয়েছি—পারিনি। সব সময়ে কাছে কাছে থেকে সাপের মতো চোখের দৃষ্টি দিয়ে অবশ করেছো আমাকে—অনুভব করেছি, আমার পাখা ঝটপট করছে আকাশে ওড়ার জন্যে, আর বারবার তোমার প্রচণ্ড টানে থুবড়ে পড়ছি মাটিতে। আমি যেন হাতপাবাঁধা অবস্থায় জলে পড়ে—যতই না চেষ্টা করছি ডাঙায় উঠতে ততই নীচে তলিয়ে যাচ্ছি—নীচে, নীচে, যতক্ষণ না জলের একেবারে তলায় নেমে আসছি। আর সেখানে প্রকাণ্ড একটা কাঁকড়ার মত ভয়ঙ্কর বসে আছ তুমি, ঘুপটি মেরে, দাঁড়া দিয়ে কখন আমাকে চেপে ধরবে তারি প্রতীক্ষায়। আর এখন—এইত সেখানে নেমে এসেছি আমি। নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার। কি ঘেন্নাই করি তোমায়, ঘেন্না করি, ঘেন্না করি। কিন্তু তুমি? তুমি শুধু বসে থাক ওখানে, নিশ্চুপ, স্থির, উদাসীন—কি অমাবস্যায়, কি পূর্ণিমায়, কি ক্রিসমাসে, কি গ্রীষ্মকালে—তা সে অন্য লোকেরা সুখী বা অসুখী যাই হোক না কেন। তুমি রাগ ঘেন্না পর্যন্ত করতে পারনা—আর ভালবাসা কি তাও জান না। ইঁদুরের গর্তের সামনে বেড়ালের মত ওখানে তুমি বসে আছো—না পারো টেনে বার করতে তোমার শিকারকে না পারো পিছু তাড়া করতে তার—কিন্তু অপেক্ষা করে করে তাকে হার মানাতে পারো তুমি। ওই কোনটাতে বসে থাক তুমি—জানো, ওরা তোমার জন্যে ওই জায়গাটার নাম দিয়েছে ইঁদুর ধরার কল। ওখানে বসে তুমি কাগজ পড়ো আর দেখো —কেউ কোনো বিপদে পড়লো কিনা, নতুন কাকে তাড়ানো হলো থিয়েটার থেকে। ওখানে বসে তুমি তোমার শিকার পাহারা দাও—শিকারের সম্ভাবনা কতখানি তার হিসেব করো —সংগ্রহ করো নতুন নতুন শিকার। বেচারী অ্যামেলিয়া। তবুকি জানো, সবকিছু সত্ত্বেও তোমার জন্যে আমার করুণা হয়—আমি জানি তুমি অসুখী, যা খেয়েছো তাই অসুখী —আর যা খেয়েছো বলেই তোমার এত হিংসে। তোমার ওপরে আমার রাগ হওয়ার কথা—কিন্তু সত্যি আমি রাগ করতে পারিনা—কতটুকু ছোট্ট মনুষ তুমি। আর যদি আমার স্বামীর কথা বলো—তা নিয়ে একটুও মাথাব্যথা নেই আমার। সত্যিই তো কিইবা আসে যায় আমার? তুমি কিংবা আর কেউ যদি আমাকে চকোলেট খাওয়া শিখিয়ে থাকো—তাতে কি হয়েছে?

[এক চামচ চকোলেট খায়; তারপর বিজ্ঞ ভাবে]

শোনাতো যায় চকোলেট শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। আর তোমার কাছ থেকে যদি পোষাক পরার রকমসকম শিখেই থাকি—বেশতো। তাতে আমার স্বামীর ওপরে আমারই দখল বেড়েছে। যেখানে আমি জিতেছি, সেখানে তুমি দখল খুইয়েছো। হ্যাঁ, সবসুদ্ধ হিসেব দেখলে মনে হয় ওর ওপরে তোমার যেটুকু জোর ছিল তা তুমি এতদিনে খুইয়েছো। অবিশ্যি তুমিতো ওর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতেই চেয়েছিলে —চুকিয়ে দিয়েওছো আর তার জন্যে এখন অনুতাপও করছো—কিন্তু, বুঝছোতো আমি তা কখনো করবো না। মন ছোটো করেতো কিছু লাভ নেই, কি বলো? হয়তো শেষ পর্যন্ত, তোমার চাইতে আমারি এখন মনের জোর বেশী। তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই পাওনি, তুমি শুধু নিয়েছ। আর

তাই চেরের যা হয় আমারো তাই হয়েছে। ঘুম ভেঙে উঠে দেখা গ্যালো তুমি যা খুইয়ে বসেছো, তা এসে জমেছে আমার ভাঁড়ারে। নইলে, তোমার হাতে সব কিছুই যে ব্যর্থ হয়ে গেল, তার কী ব্যাখ্যা করবে? তুমি কোনোদিন পারোনি পুরুষের ভালবাসা ধরে রাখতে—তা সে তোমার টিউলিপ আর আবেগ উত্তেজনা দিয়েও নয়। আর আমি তা পেরেছি। বই থেকে তুমি কোনোদিন বাঁচার শিল্প শিখলে না, আমি শিখেছি। এস্‌কিলের মত ছেলে তুমি পেটে ধরতে পারলে না, যদিও তোমারি বাবার নাম এস্‌কিল। আচ্ছা, তুমি সব সময়ে, সব জায়গায়, অমনতর চুপ করে থাকো কেন? চুপ—সব সময়ে চুপ। আমি ভাবতুম সে বুঝি তোমার মনের জোর খুব বেশী বলে। অথচ, হয়ত সত্যি কথা বলতে, তোমার কখনো কিছুই বলার ছিল না—তুমি হয়তো ভাবতে পর্যন্ত পার না।

[উঠে চটিজোড়া তুলে নিয়ে।

আমি ঘরে যাচ্ছি—টিউলিপের এমব্রয়ডারিটাও নিয়ে যাচ্ছি—হ্যাঁ, তোমার টিউলিপ। তুমি অন্যদের কাছ থেকে কখনো কিছু শিখতে পারোনি—তুমি অবস্থা বুঝে নিজেকে নুইয়ে দিতে পারলে না—তাই শুকনো ডাঁটির মত তুমি ভেঙে গেলে—আর আমি ভাঙলুম না। ধন্যবাদ অ্যামেলিয়া, তোমার কাছে যা শিখেছি তার জন্যে ধন্যবাদ। স্বামীকে কি ভাবে ভালবাসতে হয়, তা শিখিয়েছ বলে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি—তার কাছে।

[বেরিয়ে যায়।

অনুবাদ : শিবনারায়ণ রায়

[বয়সে ইব্সেনের চাইতে একুশ বছরের ছোটো আউগুস্ট যোহান স্ট্রিণ্ডবার্গ উনিশ শতকের সেরা নাট্যকারদের একজন। এই মহাপ্রতিভাবান সুইডিশ সাহিত্যিক উপন্যাস এবং কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তাঁর খ্যাতি প্রধানত নাট্যকার হিসেবে। জন্ম ১৮৪৯ সালে। তাঁর রচনাবলীকে মুখ্যত দুটি পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্বে তিনি বস্তুবাদী—তাঁর ঐতিহাসিক নাটকেও বস্তুনিষ্ঠা অশিথিল, স্বাক্ষি এবং সমাজের খুঁটিনাটিকে তিনি খুব নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলেন। যে সংক্ষিপ্ত একদৃশ্যের নাটকটি তর্জমা করেছি সেটি প্রথম পর্বের রচনা (১৮৮৯), এই পর্বে তাঁর প্রধান নাটক মাস্টার ওলাফ (১৮৭৮), দ ফাদার (১৮৮৭), মিস জুলি (১৮৮৮)। ১৮৯৫ সালে তাঁর জীবনে গুরুতর সংকট ঘটে ; স্নায়বিক অবসাদে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন ; ১৮৯৫-৯৭ এই সময়টিকে বলা হয় তাঁর জীবনের 'নরক অধ্যায়'। এই অধ্যায়ের পরবর্তী পর্বে স্ট্রিণ্ডবার্গ এক্‌সপ্রেশ্যানিস্ট রীতিতে নাটক লেখেন (এ ড্রিম প্লে, ১৯০২ ; দ গোস্ট সোনাটা, ১৯০৭)। স্ট্রিণ্ডবার্গ মারা যান ১৯১২ সালে।]

স্কাইলাইট

আইজাক বেবেল

ছোটবেলায় আমি একজন বাড়িউলি মাসিকে চিনতাম, মানাম কেবচিক। ছুটিছাটায় বাড়ি এলে যেতাম তাঁর কাছে। তাঁর যখন দিনকাল ছেল, মাসি আমাকে জানিয়ে রেখেছিলেন,

৫ রুবলের কমে তিনি খদ্দের বসান নি কখনও। দুনিয়া উল্টে গেলেও না।

মাসির ছোটখাট ফ্ল্যাটে সম্বল বলতে এখন দু'খানা মেয়ে, মারুসা আর তামারা। খদ্দের টানতে তামারাটাই বেশি ওস্তাদ। মাসি বলেছিলেন আমাকে।

কাজের ঘরে জানালা একটাই। রাস্তার দিকে। পর্দা ঠেলে দিলেই হল। আর একটা সিলিঙের নিচে, ঐ স্কাইলাইট বলে যাদের, ছোট্ট, ডালা তার সর্বক্ষণই তোলা। সেখান দিয়ে, বাথরুমের দরজা ভাঙা বলে শোবার ঘরের আসল জায়গাটা নিশ্চয়ই দেখা যাবে।

কেবেমাসিকে আমি একদিন বললাম, 'মাসি লফট থেকে মইটা নামিয়ে স্কাইলাইটে লাগিয়ে দাও না। বাথরুমের ভেতরটা তাহলে আমি দেখতে পারি। বিশেষ করে যখন নাকি মারুসা বাথরুমে। তুমি যাই মনে কর, তামারা নয়, মারুসাই ভাল। এই যে ৫ রুবল। তুমি রাজি?'

ওরে মুখপোড়া, তোর পেটে-পেটে এত?' বলে হাসতে হাসতে নোটখানা নিয়ে মাসি আমার গালে একটা ঠোনা দিলেন। আজকাল বসলেও কেউ ৫ রুবল দিতে দরাদরি করে। তা, এ ৫ রুবল এক আশাতীত ছপ্পর-পাত্র ছাড়া কী।

যাই হোক, মারুসা যখন লোক বসাত, ঐ ছোট্ট জানালাটার সদ্ব্যবহার আমি যৎপরোনাস্তি করেছি। সিঁড়ির মাথায় আমি। চড়বার সময় মাসি নিচেটা ধরত। মারুসা ভাবতে পারেনি সিঁড়িটা কেন নামানো হয়েছে। তামারাকে বারণ করা ছিল।

তো, সেদিন ঐ অবস্থায় আমি, আর ভাগ্যও প্রসন্ন, মারুসা আলো নেবায় নি।

সেদিনেরও অতিথি ছিল, বেশ মনে আছে, এক ন্যাদরপ্যাদর, নিজে-নিজেই খুশি, অমায়িক টাইপের লোক, তার গোঁফটা কাট-ছাঁটে ছাড়াই—বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দু'দিকে ঝুলে। সে অতি স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের জামাকাপড় সব এক এক করে খুলে রাখে—যেন সে নিজের বেডরুমে। আর সামনে তার বৌ।

সে জামা থেকে কলারটা খুলে রাখল। অতঃপর কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে আয়নায় গোঁফের নিচে এক নবাবিষ্কৃত ব্রণ পর্যবেক্ষণ করল। তারপর রুমাল বের করে সেটা টিপে ধরল। রুমাল খুলে দেখল, কী ব্যাপার। পায়ের বুট জোড়া খুলে সে উল্টে দেখল কিছুক্ষণ। হিলে কোনও গণ্ডগোল? সবসময়ই মুখে তার একটা দিলখুশ ভাব। মারুসাও বসে ছিল না। কার্যত, নির্বস্ত্র হতে তার সময় লেগেছে অনেক কম।

এ-বার তারা কিছুক্ষণ চুম্বনাদি করল। এবং দর্শনীয়ভাবে। তারপর পাশাপাশি বসে, জলে ঝাঁপাবার আগে, দুজনে দুটো সিগারেট ধরাল। আর ঠিক এই সময় সেটাই হল যা হবার নয়। এই সময়, উত্তেজনায় আমি পা বদল করতে গেলে, মইটা গেল হড়কে। আর, আমিও কিংকর্তব্য বোঝার আগেই জানলার ফ্রেম ধরে ঝুলে পড়লাম। প্রবল ঝনাৎকারের মধ্যে মই পড়ে গেল। আর আমি ঝুলে রইলাম সিলিং থেকে। একটা যাকে বলে হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল ফ্ল্যাট জুড়ে। কেবে মাসি ছুটে এলি তাঁর ঘর থেকে। এবং ট্রাম কণ্ডাকটরের পোষাক-পরা আগে দেখিনি একজন, সঙ্গে তামারা। ওর খদ্দের বেশির ভাগই ট্রামের কর্মচারী। ওরাই আমাকে নামাল ফের মইটই লাগিয়ে।

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়। মারুসার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তার খদ্দের সদাপ্রসন্ন লোকটি—প্যান্ট পরে নিলেও তার গা খালি মেদবর্জিত লম্বাপানা বেশ পেটাই চেহারা। মারুসা বেরুল তার পরে। এখন তার গায়ে ঢিলেঢালা নাইটি। সে অন্তর্বাস

পরার সুযোগ পায়নি।

মারুসা আমার চোখে-চোখ রেখে তাকিয়ে, মুখের ওপর মুখ এনে। ক্রমে তার মুখ শক্ত হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ফুলকি। তারপর বলল,

'কুকুর। কুত্তার বাচ্চা। এদের বাপ-মায়ের বিয়ে হয় না'।

সে চুপ করে গেল। তারপর লম্বাপানা লোকটির কাছে গেল। ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে তার হাত টেনে চুম্বন করল—দেখলাম দু'এক ফোঁটা জলও ঝরে পড়ল। হাত ধরে চুমু খেতে খেতে আর কাঁদতে কাঁদতে মারুসা বলল, 'তুমি কী ভালো। বলো, কিছু মনে করো নি?'

মারুসার শরীরটা ছিল লিকলিকে ডাঁটা দিয়ে তুলে ধরা গোলাপি পদ্মের মত। সে তার আজানুলম্বিত সরু সরু হাতদুটির দক্ষিণ দিকেরটি দিয়ে সদাপ্রসন্নর কোমরে একখানা আলতো বেড় দিয়ে, ঠোঁটে কখনো বুকে লম্বা লম্বা চুমু খেতে খেতে তাকে নিয়ে ফের ঘরে ঢুকে গেল। সে যখন দরজা বন্ধ করল, তার মুখে তখন দরদর অশ্রুধারা।

কিন্তু আমি বাস্টার্ড না। আমি ডিভিশনাল কমিশনার আলেকজান্দার ফিওদারোভিচ কেরেনিস্কির একমাত্র সন্তান এবং রীতিমতন বৈধ। পড়ছি। ওডেসার মিলিটারি স্কুলে। একদিন সেনাধ্যক্ষ হব।

মাদাম ফ্যানি কেবেচিকের দিকে এবার একটা দশ রুবল এগিয়ে দিয়ে আমি বলি, 'মাসি, স্কাইলাইটের নিচে মইটা ফের লাগিয়ে দাও।'

অনুবাদ : সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

[লেখক পরিচিতি : আইজাক বেবেল। জন্ম : ১৮৯৪, নিচু মধ্যবিত্ত ইহুদী পরিবারে। ছিলেন ম্যাক্সিম গর্কির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়া ও বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতের একেবারে অন্য চেহারা দেখা মিতে থাকে তাঁর গল্পে। বিপ্লব ও তার লালফৌজ নিয়ে নির্মম সত্য, মিষ্টুর বিদ্রূপ আর সেই সঙ্গে নিষ্পাপ পদ্যের অনুপ্রবেশ তাঁর গদ্যে।

বলা বাহুল্য, ১৯৩৭-এ তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৯/৪০ নাগাদ। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে হয় মারা যান, নইলে তাঁকে মেরে ফেলা হয়। সোভিয়েট লেখকদের জীবনীপঞ্জিতে যাঁর কখনো নামই ওঠেনি, সেই আইজাক বেবেল-এর স্থান আজ টুর্গেনিয়েভ ও শেখভের পাশেই। বই : ওডেসা টেলস্ (১৯২৪), রেড ক্যাভলেরি (১৯২৬) প্রমুখ যতদূর জানা, উপন্যাস লেখেন নি।]

জার্মানি

সাধুসন্ত এবং তাঁর বন্ধু বাবাবেক সম্পর্কে একজন তুর্কির পত্র

ভলতের

আমি তখন বারাণসীতে। গঙ্গার তীরে ব্রাহ্মণদের ঐ প্রাচীন পিতৃভূমিতে আমি জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করছিলাম। ভারতীয় ভাষা আমি মোটামুটি চলনসইভাবে বুঝতে পারতাম ; অনেক কিছু আমি কান পেতে শুনতাম আর সব কিছু চোখ খুলে লক্ষ করতাম। আমি বাস করতাম আমার ব্যবসায়ের অংশীদার ওমরির বাড়িতে। আমার পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে ওমরি ছিলেন সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী, বলতে বাধা নেই আমি ছিলাম মুসলমান, মহম্মদ বা ব্রহ্মা সম্পর্কে আমাদের দুজনের কেউ কখনো এমন একটি কথাও বলে নি যা অপরের বক্তব্যকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। দুজনে নিজের নিজের হাত মুখ ধুয়ে দুই সহোদরের ভাইয়ের মতো আমরা একই নেবুর সরবৎ খেতাম, একই অন্ন গ্রহণ করতাম।

একদিন আমরা একসঙ্গে গাভানি মন্দিরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা কয়েক দল সাধুর দেখা পেলাম। ওঁদের একদল ছিলেন যোগী অর্থাৎ কিনা ধ্যানী সাধু, অনেকে পুরনো দিনের নাগা সন্ন্যাসীদের চেলা। এসব সাধুদের জীবন কর্মময়। লোকে জানে যে এঁদের পরিশীলিত এক ভাষা রয়েছে, এই ভাষা হল আরো প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণদের ভাষা, আর এই ভাষায় একটি গ্রন্থ রয়েছে—এই গ্রন্থকে এঁরা বলে বেদম। জেন্দ-বেস্তা সহ এশিয়ার তাবৎ গ্রন্থের মধ্যে এ গ্রন্থই হল সবচেয়ে প্রাচীন।

আমি একজন সাধুর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি উক্ত গ্রন্থটি পাঠ করছিলেন। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, 'আহারে হতভাগা প্রেত, আমি স্বরবর্ণ গুণছিলাম, তুই আমার সংখ্যাটা গুলিয়ে দিলি ; আর এই ঘটনার ফলে টিয়েপাখির শরীর লাভ করার বদলে আমার আত্মার স্থান হবে খরগোসের শরীরে। টিয়েপাখি হয়ে জন্মাবো জেনে আমি সত্যি ধন্য বোধ করছিলাম। 'সান্ত্বনা' দেওয়ার জন্য আমি তাঁকে একটা টাকা দান করলাম। সেখান থেকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত আমার হাঁচি পেল। ঐ হাঁচির শব্দে সমাধিস্থ এক সাধুর সমাধি ভেঙে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি কোথায়? একি ভয়ংকর পতন। আমি আর আমার নাসাগ্র দেখতে পারছি না। দিব্য আলো মিলিয়ে গেল।' আমি তাঁকে বললাম, 'অবশেষে নাকের ডগা পেরিয়ে আপনি আরো দূরে দেখতে পাচ্ছেন, তবে এর জন্য যদি আমি দায়ী হয়ে থাকি তাহলে যে অন্যায় আমি করেছি তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই একটা টাকা আপনি গ্রহণ করুন। এরপর আবার ফের আপনি দিব্য আলোর সাধনা করতে থাকুন।

এভাবে একাজে সমস্যার সমাধান করে আমি আরো সব নাগা সন্ন্যাসীদের কাছে এসে হাজির হলাম; তাঁদের কয়েকজন আমাকে চমৎকার কিছু পেরেক এনে দিলেন, আমি যেন ব্রহ্মার প্রতি ভক্তিবশত ওগুলি আমার হাতে আর উরুতে ঢোকাই। আমি তাঁদের পেরেকগুলি কিনে নিলাম। পরে ওগুলি দিয়ে আমি আমার গালিচাটা লাগিয়েছিলাম। আরো কিছু সন্ন্যাসী হাতের উপর ভর দিয়ে নাচছিলেন, কয়েকজন ঝুলতে থাকা দড়ি বেয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন, কয়েকজন সন্ন্যাসী সারাক্ষণ জোড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিলেন, কয়েকজন এক একটা শেকল পরে ছিলেন, কয়েকজনের পরিচ্ছদ হিসেবে একটা তক্তা অন্য কিছু সন্ন্যাসীর মাথা একটা জালার মধ্যে ঢোকানো। এভাবে তাঁরা জগৎসংসারের সেরা মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। আমার বন্ধু ওমরি আমায় সবচেয়ে বিখ্যাত সন্ন্যাসীদের একজনের গুহায় নিয়ে গেলেন। সন্ন্যাসীর নাম বাবাবেক। তিনি বনস্পতির মতো উদোম। আর তাঁর গলায় ঝুলছিল তিরিশ সেরের ওপরেরও বেশি ওজনের মোটা একটা শেকল। তিনি একটা কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন। সারা চেয়ারটা ছোট ছোট পেরেকের মুখে ভর্তি, পেরেকগুলি সন্ন্যাসীর পাছায় ঢুকছিল। আর তাঁকে দেখে লোকের মনে হতে পারত যে তিনি যেন একটা মখমলের বিছানার ওপর বসে রয়েছেন। বহু নারী তাঁর কাছে উপদেশ নিতে আসছিল। তিনি ছিলেন পরিবারের বেদবাক্য, আর একথা বলা যায় যে তিনি ছিলেন বিপুল খ্যাতির অধিকারী। ওমরির সঙ্গে তাঁর এক দীর্ঘ আলোচনা হয়। আমি ছিলাম ঐ আলোচনার সাক্ষী। ওমরি তাঁকে বললেন, 'বাবাজী আপনার কি মনে হয় সাতবার পুনর্জন্মের পরীক্ষা পার হলে আমি ব্রহ্মালোকে পৌঁছাতে পারব?' সন্ন্যাসী বললেন, 'আপনি কিভাবে জীবন কাটান তার ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করছে।' ওমরি জানালেন, 'আমি চেষ্টা করি একজন সৎ-নাগরিক, সৎ স্বামী, সৎ পিতা ও সৎ বন্ধু হতে ; প্রয়োজনের সময় আমি ধনীদের সুদ ছাড়া টাকা ধার দিই, গরিবদের অর্থ দান করি, আমি প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখি।' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি মাঝে মধ্যে গুহ্যে পেরেক ঢোকান?'—'না, বাবাজি, কখনোই না'। সন্ন্যাসী জবাব দিলেন, 'আপনার কথা শুনে আমার রাগ হচ্ছে, অবশ্য করে বলা যায় যে, আপনি অবশ্যই শুধুমাত্র উনবিংশতিতম স্বর্গে পৌঁছাতে পারবেন। আর ব্যাপারটা দুঃখের। ওমরি বললেন, তা কেন, ব্যাপারটায় তো কোন গণ্ডগোল নেই ; আমি আমার ভাগ্যে খুবই সন্তুষ্ট : উনিশ নম্বর কি বিশ নম্বর তাতে আমার কী এসে যায়? আমি যেন আমার জীবনের তীর্থযাত্রায় আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারি আর যেন শেষ আহ্বানে সমাদৃত হই। ইহলোকে সৎ মানুষ হওয়া আর তারপর ব্রহ্মালোকে সুখী হওয়াটা কি যথেষ্ট নয়? বাবাবেক ঠাকুর, বলুন তো আপনার ঐ পেরেক আর শেকল নিয়ে আপনি নিজে কোন স্বর্গে যাবেন বলে আপনার ধারণা?' বাবাবেক বললেন, 'পঞ্চত্রিংশতিতম স্বর্গে।' ওমরি জবাব দিলেন, 'আপনি ধরে নিয়েছেন আপনি আমার চেয়ে ওপরে স্থান পাবেন—আপনার এই ধারণাটা আমার কাছে খুবই মজার বলে মনে হচ্ছে। আসলে ওটা আপনার মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফল ছাড়া কিছু নয়। ইহলোকে যারা মানমর্যাদা খোঁজে আপনি তাদের অনাচারী বলে বিবেচনা করেন, অথচ পরলোকে আপনি এমন বিরাট মর্যাদা চাইছেন কেন? আর কিসের ভিত্তিতে আপনি আমার চেয়ে বেশি সমাদর পাবেন বলে ধরে নিয়েছেন? জেনে রাখুন, আমি দশ দিনে যে পরিমাণ অর্থ দান করি তা দশ বছর ধরে আপনি নিজের পেছনে যতগুলি পেরেক ঢোকান তার দামের চেয়ে বেশি। ব্রহ্মা একটাই কাজের কাজ করেছেন তাতে করে গলায় এক শেকল ঝুলিয়ে উদোম ন্যাংটা হয়ে আপনি সারাটা দিন কাটাচ্ছেন ; এর দ্বারা আপনি মাতৃভূমির দারুণ উপকার করছেন। আপনার তাবৎ বন্ধু আত্মার অত্যধিক গরিমায় নাকের ডগার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বা কাঠের একটা তক্তা বয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের সবার চেয়ে আমি শতগুণ গুরুত্ব দিই যে বীজ বুনছে বা গাছ পুঁতছে তাকে।" এভাবে কথা বলার পর ওমরি নরম হয়ে এলেন,

বাবাবেকের গুণকীর্তন করলেন, পীড়াপীড়ি করে শেষ পর্যন্ত তাঁর শেকল আর পেরেক ওখানে রেখে ওমরির বাড়িতে এসে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতে রাজি করালেন। ঘষে ঘষে শরীরে ময়লা তুলে তাঁর গায়ে মাখানো হল সুগন্ধ আতর, তাঁকে রুচি সম্মত পোশাক পরানো হল। পনেরো দিন ধরে তিনি খুবই শান্তভাবে জীবন কাটালেন এবং স্বীকার করলেন যে তিনি আগের তুলনায় শতগুণ সুখী বোধ করছেন। কিন্তু তিনি জনসাধারণের মধ্যে তাঁর কদর হারাচ্ছিলেন, নারীরা আর তাঁর কাছে উপদেশ নিতে আসছিল না। বাবাবেক ওমরিকে ছেড়ে মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে আবার তাঁর পেরেকের আশ্রয় নিলেন।

অনুবাদ : পুষ্কর দাশগুপ্ত

[১৭৫০ সালে জার্মানির ড্রেসডেন (Dresden ফ. দ্রেস্দ্ Dresde) শহর থেকে প্রকাশিত ভলতের-এর রচনা-সংগ্রহের নবম খণ্ডে রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তাতে এর শিরোনাম ছিল 'একজন তুর্কির পত্র' (Lettre d'un Turc)। ১৭৫৬ সালে জেনিভা থেকে ভলতের বিভিন্ন রচনার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনেও বর্তমান রচনাটি স্থান পায়। তবে তার শিরোনাম ছিল দীর্ঘতর : 'সাধুসন্ত এবং তাঁর বন্ধু বাবাবেক সম্পর্কে একজন তুর্কির পত্র' (Lettre d'un Turc sur les fakirs et sur son ami Bababec) কিন্তু রচনাটি কবে, লেখা হয়েছিল তা জানা যায় না। 'আচার-ব্যবহার সম্পর্কে নিবন্ধ'-এর (Essai sur les moeurs) হিন্দু ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তার সঙ্গে বর্তমান রচনার চিন্তা-পদ্ধতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অনুমান করা যায় রচনাটি ১৭৪৫ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে লেখা।

আলোচ্য রচনাটি ভলতের-এর জীবৎকালে বিভিন্ন রচনা-সংকলনে স্থান পেলেও কখনো গল্প হিসেবে চিহ্নিত হয় নি। ভলতের-এর রচনাবলীর কেহল্ (Kehl) সংস্করণের Beau Marchais. 1732-1790 দ্বারা বর্তমান রচনাটিকে 'উপন্যাস ও গল্প' (Romans et contes) অংশে স্থান দেওয়া হয়। মনে হয় রচনাবলীর সম্পাদকমণ্ডলী রচনাটির নতুন শিরোনাম ব্যবহার করেন। 'বাবাবেক আর সাধুসন্তেরা (Bababek et les fakirs)। আমরা জানি ভলতের-এর জীবৎ-কালেই কেহল্ সংস্করণের রচনাসমগ্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তদনুসারে ভলতের মৃত্যুর আগে তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন, পাণ্ডুলিপি ও বেশ কিছু রচনার পরিমার্জিত রূপ সরবরাহ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান রচনাটিকে 'গল্প' হিসেবে নির্দেশে বা তার শিরোনাম পরিবর্তনে তাঁর কোন অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই।

ভারতীয় পরিবেশ ও ভারতীয়দের আচার-আচরণ সম্পর্কে একজন তুর্কি-র পত্র মোঁতেস্কিয়ো-র 'পারসিক পত্র' [১]-এর (Lettres Persannes) রচনা-পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মোঁতেস্কিয়োর রচনায় ফরাসি দেশে অবস্থান-রত মুজন পারসিক ফরাসিদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে চিঠি লিখছেন।

বর্তমান কাহিনী তিনটি প্রধান চরিত্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছে : একজন তুর্কি, ব্রাহ্মণ ওমরি এবং সন্ন্যাসী বাবাবেক, কাহিনীর ঘটনাস্থল হিন্দু-ঐতিহ্যপূর্ণ নগরী বারাণসী। ভিন্নধর্মাবলম্বী, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হলেন তুর্কি। উত্তমপুরুষে কথিত কাহিনীতে তিনি হলেন কাহিনীর উপস্থাপক। তাঁর বর্ণনার মধ্যে রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। অপরের সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত কৌতূহল, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও যুক্তিবাদ এই দৃষ্টিভঙ্গির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর এর ফলে কাহিনী-কথক হিসেবে তুর্কি মানবতা ও যুক্তিবাদী ব্রাহ্মণ ওমরির প্রতি সহমর্মিতা অনুভব করেন। ওমরি মানবিকতা ও কুসংস্কারবিরোধী যুক্তিবাদের সমর্থক। এখানে স্মরণীয় যে ভারতীয়দের প্রতি এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব সত্ত্বেও ভলতের হিন্দুধর্মের নানান অনাচার ও কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। এছাড়া আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গ থাকলেও ভলতের তাবৎ ধর্মের অন্ধ সংস্কার, অমানবিকতা ও প্রতারক-চরিত্রকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ওমরি শেষ পর্যন্ত যুক্তি ও মানবতাবাদী, সহিষ্ণু, সংস্কারহীন 'দার্শনিক'।]

জলের ঘটি ও জোয়ারের থলি

সাপোজমি জরয়াব

বেশ কিছুকাল ধরে আমার প্রতিবেশিনীর বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি ভেবেছি। বাড়িতে, বাজারে, মক্তব সব জায়গায় প্রতিবেশিনীর ওই বাচ্চাটা আমার শান্তি ও স্বস্তি নষ্ট করে দিচ্ছিলো। যেকোন ব্যাপারে যেই আমি কোন মতলব বা প্ল্যান নিজের মনে মনে ঠিক করতাম অমনি ও সেখানে এসে হাজির হতো আর এক জবরদস্ত ধাক্কায় আমার সব প্ল্যান প্রোগ্রাম বানচাল করে দিতো। সে সময় আমি বাড়িতে থাকলে সকল কাজকর্ম শিকেয় তুলে দেয়ালে হেলান দিয়ে পড়শীর বাচ্চাটাকে নিয়ে ভাবতাম। স্কুলে পড়াতে গিয়ে বই বন্ধ করে ছাত্রছাত্রীদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আমি ওই বাচ্চাটার কথাই ভেবে যেতাম। বাজারে একটা দোকান থেকে আরেকটা দোকানের দিকে যাওয়ার সময়ও ওই পড়শীর বাচ্চার কথা ভাবতে থাকতাম।

এই কয়েক সপ্তাহ আগে একটা দাঙ্গায় আমার পড়শীর বাচ্চাটা মারা গেছে। শোনা যায়, এক দিন ওই বাচ্চার মৃত মাংস পড়শীর দরজার সামনে এনে কেউ বলেছে—

"নাও, তোমার বাচ্চা..."

আর আমাদের পড়শী—ওই বাচ্চার মা—নিজের সমর ও গৃহকে, নিজের দেশ ও জাতিকে হাজারটা কথা শুনিয়ে দিলো, বুক ভরে কাঁদলো, আছাড়-পিছাড় খেলো। সে নিজের মাথার সাদা চুল মুঠো করে ধরে ছিঁড়লো। বাচ্চার মৃতদেহ কোলে তুলে নিয়ে নিজের মুখ ঘষতে লাগলো আর বিড় বিড় করতে থাকলো।

"আমার খোকা, আমার নিরীহ শহিদ।"

এরপর সে একদম চুপ করে গেলো। সে নিজের সবচেয়ে ভালো ও সবচেয়ে সুন্দর তোশকখানা ঘরের মাঝখানে বিছোলো আর খুব সাবধানে ছেলের লাশ তার ওপর শুইয়ে দিলো। তারপর যে ঘরে সিন্দুক সেই ঘরে গেলো। পুরানো একটা সিন্দুক খুলে তার ভেতর থেকে নিজের বিয়ের শাল বার করে আনলো। শাল থেকে ন্যাপথালিনের গন্ধ ভেসে আসছিলো। এটা ওর বিয়ের শাল। শালখানা ছেলের রক্তে ভেজা শরীরের ওপর বিছিয়ে দিয়ে কিছু লোককে খবর দিলো। ওর পক্ষে যতখানি সম্ভব জাঁকজমক ও মর্যাদা সহকারে নিজের স্নেহের পুতলীকে কবরস্থানে গিয়ে দফন করে এলো। সেখানে একটা সুন্দর কবরও বানিয়ে দিলো।

ওই দিনের পর থেকে ও কালো পোশাক আর সাদা দোপাট্টা পরতে শুরু করলো। প্রত্যেক জুম্মার দিন (শুক্রবার) ও এক ঘটি জল আর জোয়ারের থলি নিয়ে কবরস্থানে যেতো। সেখানে বসে ও কাঁদতো, বিলাপ করতো। জল আর জোয়ার কবরের ওপর ছড়িয়ে দিতো। কবরখানার শুকনো তৃষ্ণার্ত মৃত্তিকাকে জলসিঞ্চিত করতো আর পাখিদের কাছে প্রার্থনা করতো জোয়ার খাওয়ার আতিথ্য গ্রহণের জন্য।

সেদিনও জুম্মার দিন ছিলো আর বেশ গরম পড়েছিলো। এমন রোদ্দুর যে মানুষ নিজের ছায়াও দেখতে পাচ্ছিলো না। রোদ্দুর আর গরমের তীব্রতায় আমি তৃষ্ণায় বেহাল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সমগ্র সত্তা এক গেলাস ঠাণ্ডা জলের জন্য আকুল। রাস্তাঘাট অবিশ্বাস্য রকমের নিষ্প্রাণ ও নিস্তব্ধ। কোথাও কোথাও এক-আধটা দোকান খোলা। সেই সব দোকানের মালিকদের কৃশ ও জীর্ণ চেহারা মেয়েদের মতোই দেখাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো সকল প্রাণী রোদ্দুরের তীব্রতায় কাহিল হয়ে পালিয়েছে। সমস্ত জানালা বন্ধ। সকল দরজা বন্ধ। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো সব মানুষ কোন অজানা আতঙ্কে নিজের নিজের বাড়িতে দরজার আড়ালে চুপচাপ লুকিয়েছে।

খুব সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে আমি আমার গতি বাড়িয়ে দিলাম। সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে চলা এখন আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বহু বছর ধরেই আমি সামনে সতর্কভাবে পথ চলি। অনেক দিন ধরেই আমার মনে হয়েছে যে আমার প্রতিটি পদক্ষেপের নিচে একটা কবর রয়েছে আর প্রত্যেকটি কবরে শুয়ে আছে একজন খুন হওয়া মানুষ। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের বাড়িতে পৌঁছতে চাইছিলাম। আরেকবার এক গেলাস ঠাণ্ডা জলের কথা আমি ভাবলাম। আমার মনে হচ্ছিলো ঠাণ্ডা জলের গেলাস আমাকে ডাকছে। আমি খুব সাবধানে দৌড়তে শুরু করলাম।

হঠাৎ আমি আমার প্রতিবেশিনীকে দেখতে পেলাম। সে বরাবরের মতো কালো পোশাক ও সাদা দোপাট্টা পরে ছিলো। জলের ঘটি আর জোয়ারের থলি ওর হাতে। আমার পা মন্থর হয়ে গেলো। ঠাণ্ডা জলের গেলাসের কথা আমি ভুলে গেলাম। প্রাণ ছিনিয়ে নেওয়া গরমের ওই দুপুর আমি ভুলে গেলাম। আমার মনে হলো আমার মুখের রক্ত লালচে হয়ে গেছে।

বুঝতে পারি না কেন যে যখনই আমার পড়শীকে দেখি তখনই আমার সারা শরীর একটা অপরাধ বোধে ঝাঁকুনি খেয়ে ওঠে। যেন আমিই ওর সন্তানের লাশ কাঁধে তুলে নিয়ে ওর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছি—

"নাও, তোমার ছেলে..."

যখনই ওকে দেখি আমার এমনই কৈফিয়ত তৈরি হয়। আমি ওর চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করতে চাইছি এমন সময় পড়শী আমাকে বললো—

"কোথায় যাচ্ছো?...দাঁড়াও।"

আমি আমার জায়গায় স্ট্যাচু হয়ে গেলাম। বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেলো। রাস্তার তপ্ত পাথরের দিকে চোখ নামিয়ে ওর অপেক্ষায় রইলাম। গলায় যেন কিছু আটকে গেছে। আমার পড়শী সব সময়ের মতো এক ঘটি জল আর জোয়ারের থলি নিয়ে হেঁটে আসছিলো। মনে হচ্ছিলো ওর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে জলের ঘটি আর জোয়ারের থলির সাইজও বেড়ে যাচ্ছিলো। আরো একবার আমার মনে হলো, আমি ওর ছেলের মৃতদেহ নিজের কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছি আর ওর দরজার সামনে গিয়ে বলছি—

"নাও, তোমার ছেলে...।"

আমি ভয়ের চোটে পেছন দিকে হটতে লাগলাম। নিজের প্রতিবেশিনীকে ভয় পাচ্ছি। আমি ওর কালো পোশাক আর সাদা দোপাট্টার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলাম। নিজের স্কুলজীবনের স্মৃতিতে হারিয়ে গেলাম।

যখন আমি স্কুলে যেতাম তখন আমিও কালো পোশাক আর সাদা দোপাট্টা পরতাম; আমি আমার ক্লাসের মেয়েদের কথা ভাবতে লাগলাম। ওরাও সাদা দোপাট্টা আর কালো ইউনিফর্ম পরতো। আমার পড়শী হঠাৎ শব্দ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো,

"আমার ছেলের সঙ্গে সাতাশজন ছিলো...সবাই...সাতাশ মধ্যে সাতাশজনই..."

সে কথা অসম্পূর্ণ রেখে দিলো। সাদা দোপাট্টা দিয়ে নিজের চোখ দুটো চেপে ধরলো। ওর কাঁধদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে কাঁদছে।

আমি সেই গভীর অপরাধ বোধ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করলাম—

"সাতাশ জন..."

ওই সাতাশ সংখ্যা আমাকে আমার ইতিহাসের শিক্ষিকার কথা মনে পড়িয়ে দিলো। সে সময় সাত-আট বছরের ছোট মেয়ে ছিলাম। আমার ইতিহাসের এক শিক্ষিকা, মোটাসোটা, গোলগাল মহিলা। তার পা আর চোখও ছোট ছিলো। সে চোখে সুর্মা লাগাতো। সুর্মার কালো রেখায় তার চোখ দুটি বেশি রাগী দেখাতো। সে নিজের সঙ্গে একটা ছোট পার্স রাখতো। আমরা যখনই কোন প্রশ্ন করতাম সঙ্গে সঙ্গে সে ওই পার্সটায় কি যেন হাতড়াতে থাকতো, মনে হতো কিছু খুঁজছে, যেন আমাদের প্রশ্নের উত্তর তার ওই পার্সের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে।

সেদিন আমাদের পাঠ্য বিষয় ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তার আগে আমরা ওর কাছে একটা প্রশ্ন করলাম। আমাদের ইতিহাসের শিক্ষিকা তার ছোট পার্সের মধ্যে অন্বেষণ তালাশের পর উঠে দাঁড়িয়ে ব্লাকবোর্ডে সংখ্যা লিখতে শুরু করলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাত দশমিক উনসত্তর মিলিয়ন মানুষ মারা গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এশিয়া এবং য়োরোপে পঞ্চান্ন মিলিয়ন মানুষ মারা যায় এবং পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন মানুষ জখম হয়।

ত্রিশ মিলিয়ন মানুষ মারা গেছে।

সাত মিলিয়ন রাশিয়ান, পাঁচ দশমিক চার মিলিয়ন চীনা, চার দশমিক দু মিলিয়ন পোলিশ, তিন দশমিক আট মিলিয়ন জার্মান, তের দশমিক ছয় মিলিয়ন জাপানী সেনা, ত্রিশ শো হাজার মার্কিন সৈনিক, দু'শ ছাব্বিশ হাজার ইংরেজ সৈনিক, হিটলারের অগ্নিকুণ্ডে প্রতিদিন বারো হাজার য়েহুদিকে ঠেলা হতো ইত্যাদি।

ব্লাকবোর্ড বিবরণ আর সংখ্যায় ভরে গেলো। আমাদের ইতিহাসের শিক্ষিকা তাঁর বিশেষ চড়া গলায় তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন

"তোমরা লিখে নিয়েছো?"

সংখ্যাগুলি খাতায় লিখতে লিখতে আমি অস্ফুটে সেগুলি বলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। চক্কর লাগলো। আমি আমার কলম রেখে দিলাম। সংখ্যাগুলি আমার চোখের সামনে নাচতে থাকলো। যেন ওগুলোর মধ্যে প্রাণ এসে গেছে। খুন হওয়া মানুষগুলো আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকে নিজের নিজের কর্তিত আর আনত দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের পোশাক মাটি আর রক্তে জমাট। হঠাৎ আমার মনে হলো আমার শ্রেণীকক্ষ, স্কুলের উঠোন মাথা কাটা মানুষে ভরে গেছে। আমাদের শহরটাও মাথা কাটা মানুষে ছেয়ে গেছে। গোটা পৃথিবীটাই কবন্ধ মানুষে ভরে গেছে।

আমার শরীর কাঁপতে লাগলো। আমার নিশ্চিত মনে হলো যে আমার চারপাশে অনেক দূর অবধি সমস্ত জায়গা মাথা কাটা মৃত মানুষে ভরে গেছে আর আমি সেই মাথা

কাটা মানুষের মাঝে নিজের মাথা নিয়ে লজ্জিত দাঁড়িয়ে আছি...

ইতিহাসের শিক্ষিকা তাঁর ক্রুদ্ধ তীব্র স্বরে জিজ্ঞেস করলেন

"তোমাদের কোন প্রশ্ন আছে?"

আমি কৈফিয়ত চাইবার ঢংয়ে চিৎকার করে উঠলাম—

"এত রক্ত কোথায় গেলো? এত মার দাঙ্গা কেন? হে ভগবান, এসব কেন?"

আমাদের শিক্ষিকা চেঁচিয়ে উঠলেন—

"থামো, চুপ করে থাকো, বিষয়ের বাইরে যেও না।"

আর বরাবরের মতো সে নিজের ছোট পার্সের মধ্যে কি যেন খুঁজতে থাকলো যা সে পেলো না।

আমাদের ইতিহাসের শিক্ষিকা "বিষয়ের বাইরে যাওয়া"কে ভীষণ ভয় পেতো। আমার মনে হতো সে যেসব ব্যাপারে নিজের মনে ছক কষে নিতো সেসবের ওপরই তার দখল থাকতো। তার সব সময় অজানা বিষয়ের সীমানা থেকে ফিরে আসার নৈপুণ্যে দখল ছিলো। সে সেইজন্যই কক্ষনো বিষয়ের বিন্দুমাত্র বাইরে যেতো না।

বলতে পারবো না কেন কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত প্রতিটি মানুষের খুনে আমাদের ইতিহাসের শিক্ষিকার হাত আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও ওর হাত আছে আর ওই সমস্ত রেহাদিকে শেষ করার ব্যাপারে সে হিটলারের সঙ্গে ছিলো।

ওর সুর্মা লাগানো চোখে আমি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। ওর থলথলে চেহারা, সেই ছোট ছোট পা, পার্স আর ওর লাল নখ আমি একদৃষ্টে দেখতে লাগলাম।

আমি ইতিহাসের শিক্ষিকার ভাবভঙ্গিতে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা সংখ্যা ও বিবরণ আরেকবার দেখলাম। আরেকবার আমার মনে হলো সারা পৃথিবী খুন হওয়া কবন্ধে ভরে গেছে। সব মাথা কাটা মানুষ নিজেদের হাত তুলে ন্যায় চাইছে। আমার মনে হলো সেই শব্দের মধ্য থেকে পৃথিবীর সবথেকে উচ্চ গ্রামে তীব্র এক আওয়াজ ভেসে আসছে—

বিষয়ের বাইরে যেও না।

আর ঠিক তার পরেই সকল মাথা কাটা লাশ একের পর এক নিজেদের ঝুঁকে পড়া শরীর নিয়ে মাটির তলে চলে গেলো। বেঞ্চিতে বসা অবস্থায় হঠাৎই আমি আমার পা ওপরে তুলে নিলাম। ইতিহাসের শিক্ষিকা ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—

"তোমার আবার কী হলো? আঁা...। ও কেমন ধারা বসা?"

ইতিহাসের শিক্ষিকা আমার দিকে চক ছুঁড়ে মেরে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলো—

"বিষয়ের বাইরে যাওয়া...। উপদ্রব, উপদ্রব।"

কের জোরে চিৎকার করে উঠছিলেন...

"বেরিয়ে যাও। যাও বেরিয়ে।"

আমি আমার বইয়ের ব্যাগ গুছিয়ে তুলতে তুলতে পিছন ফিরে দেখলাম। আমার ক্লাসের সকল সঙ্গীরা কালো পোশাক আর সাদা দোপাট্টায় একই রকম ব্যাগ রেখে একজনের পেছনে আরেকজন তিন সারিতে বসে আছে। তারা ধীরে ধীরে আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। তার পর আবার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে দেখতে লাগলো। ওরা নিজেদের অনুভূতিহীন অসুস্থ চোখে নিহতের সংখ্যা দেখছিলো। আমার মনে হলো যেন আমার সহপাঠিনী মেয়েরাও নিজেদের রোগগ্রস্ত আত্মা নিয়ে আমাদের ইতিহাসের শিক্ষিকার সঙ্গে একই দুষ্কর্মের শরিক হয়েছে।

আমার নিজের সহপাঠিনীদের খারাপ লাগছিলো। ইতিহাসের শিক্ষিকাকে মন্দ লাগছিলো। আমি আমার বইয়ের ব্যাগ খুব সতর্কতার সঙ্গে বগলে চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালাম। আমি সেদিন প্রথম খুব সামলে নিজের পা ফেলেছিলাম। আমার মনে হয়েছিলো আমার প্রতিটি পদক্ষেপের নিচে একটি কবর আছে আর প্রতিটি কবরে একটি খুন হওয়া মানুষের দফন রয়েছে।

পড়শী মহিলার ডাকে আমার সম্বিত ফিরলো।

"আমার ছেলের সঙ্গে সাতান্ন জন ছিলো..."

আমার মনে হলো সে আমাকে ব্যঙ্গ করছে, আমাকে ভর্ৎসনা করছে। ওর সামনে আরেকবার আমার নিজের পাপের কথা মনে হলো। মনে হলো যে আমিই ওর ছেলের লাশ কাঁধে বয়ে ওর দরজার সামনে এনেছি। আমার মনে হলো আমি ওর ভিরস্কারের উপযুক্ত। আমি লজ্জা জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করলাম—

"কোথায় যাচ্ছো? এই রোদ্দুরে...মানুষ পুড়ে যাচ্ছে।"

সে চোখ দিয়ে জলের ঘটি আর জোয়ারের থলির দিকে ইশারা করে প্রায় চেঁচিয়ে বললো—

"কবরস্তান।"

বুঝতে পারছি না কেন ওর উত্তরে আমার দম বন্ধ হয়ে এলো। সে আমার পাশ দিয়ে ভিরের মতো ছিটকে গেলো। আমি আমার ঘড়ি দেখলাম। দুপুর সাড়ে বারোটা বেজেছে। আমি তৃষ্ণার্ত। ঘুরে তাকাতে প্রতিবেশিনীকে দেখতে পেলাম।

তার মাথা দুই কাঁধের মাঝখানে ধসে গেছে, ওর কোমর বেঁকে গেছে।

কালো পোশাক আর সাদা দোপাট্টায় ওকে আমার অতীতের সহপাঠিনীদের মতো দেখাচ্ছিলো। আমার মনে হলো যেন সে অতিকষ্টে জলের ঘটি আর জোয়ারের থলি হাতে নিয়ে হাঁটছে।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার পড়শীর পেছন পেছন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি তৃষ্ণা ভুলে গেলাম। এখন আর এক গেলাস ঠাণ্ডা জলের লোভ আমাকে আমার বাড়ির দিকে টেনে নিতে পারছে না।

আমি ধীরে ধীরে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে আমার পড়শীর পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম। খুবই সতর্কতার সঙ্গে আমি রাস্তায় পা ফেলছিলাম। দারুণ শঙ্কা আর বিস্ময়ের সঙ্গে আমি লক্ষ করলাম বন্ধ দরজাগুলো এক এক করে খুলে যাচ্ছে। প্রত্যেক দরজা দিয়ে কালো পোশাক আর সাদা দোপাট্টা পরিহিতা রমণীরা হাতে জলের ঘটি আর জোয়ারের থলি নিয়ে বেরিয়ে আসছে। এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। সকল মহিলার মুখচোখ চেহারা বিস্ময়করভাবে একটু-আধটু এদিক ওদিক হলেও আমার পড়শীর মতো দেখাচ্ছিলো। পড়শীর মতো দেখতে মহিলায় রাজসড়ক পুরো ভরে গেলো। লম্বা চওড়া রাস্তা এক দম কালো হয়ে গেছে। সেই সব মহিলারা সাদা দোপাট্টা আর কালো পোশাক পরে জলের ঘটি আর জোয়ারের থলি নিয়ে কবরখানার পথে হাঁটা শুরু করলো। সকলেরই মাথা তাদের কাঁধের মাঝখানে ধসে গেছে আর কোমর বেঁকে আছে।

গ্রীষ্মের মরসুমের প্রাণহরণকারী রোদ আর গরমে আমি কাহিল। আমি দেখছি পড়শীর মতো দেখতে মহিলারা দুপুরের এই রোদ আর তার তাপকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে মাথা নিচু করে কবরখানার দিকে এগিয়ে চলেছে।

যত এগোচ্ছে, জলের ঘটি আর জোয়ারের থলি হাতে ওই কালো পোশাক ও সাদা দোপাট্টা পরিহিতা মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমার মাথা থেকে সারা শরীরে ঘাম বয়ে যাচ্ছে। আমার দোপাট্টা নেই। আমি আস্তিন দিয়ে ঘাম মুছলাম।

আমরা অসমান রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম। রাস্তার পিচ ও গর্ত পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। বরাবরের মতো আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে রাস্তায় নিজের পা রাখছিলাম। আমরা কবরস্তানে পৌঁছে গেলাম। আমি আতঙ্ক ও আশঙ্কায় কেঁপে উঠলাম। উত্তর থেকে দক্ষিণ আর পুব থেকে পশ্চিম অবধি কবরখানা অস্বাভাবিক ভয়াবহ আর প্রসারিত হয়ে গেছে। যত দূর চোখ যায় শুধুই কবর...কবরগুলি যেন আর্দ্র ও বেদনা সিক্ত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সব কবরের ওপর একটা করে ঝাণ্ডা রয়েছে। সবুজ ঝাণ্ডা...লাল ঝাণ্ডা।

বাতাস পুরোপুরি স্তব্ধ। ওই ঝাণ্ডাগুলির সামান্যতম আলোড়নও নেই। মনে হচ্ছিলো ওই ঝাণ্ডাগুলি যেন নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাস বুকের মাঝখানে চেপে রেখেছে। যেন কালো পোশাক আর সাদা দোপাট্টা পরিহিতা মহিলা বাদের কোমর জলের ঘটি আর জোয়ারের থলির ভার বাঁকিয়ে দিয়েছে তাদের দেখে ওই ঝাণ্ডারা নড়াচড়া ভুলে গেছে। একদম চুপ হয়ে গেছে। নিজেদের সবুজ ও লাল মাথা গভীর শ্রদ্ধা ও বেদনায় ঝুঁকিয়ে দিয়েছে।

কালো পোশাক ও সাদা দোপাট্টা পরিহিতা মহিলারা ওই আর্দ্রতায় সিক্ত কবরগুলির কাছে গিয়ে আনত হয়ে কাঁদতে লাগলো। আমার পড়শীও একটি সুসজ্জিত সিক্ত কবরের সামনে নিজের শরীর এনে ফেলে অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে কোন শব্দ না করে কাঁদতে লাগলো।

কালো পোশাক ও সাদা দোপাট্টা পরিহিতা ওই মহিলারা কবরগুলির ধারে ধারে বসে পড়লো। নিজের নিজের ঘটি থেকে জল আর জোয়ারের থলি থেকে জোয়ার বার করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলো।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে চোখের ওপর ছায়া তৈরি করে চারিদিক নজর করলাম।

হঠাৎই আমার প্রতিবেশিনী ভেজা ভেজা কণ্ঠস্বরে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো—

"পাখি...পাখিদের দ্যাখো..."

আঙুল তুলে সে পুরনো গাছগুলির দিকে ইশারা করলো। আমি গাছগুলির দিকে তাকালাম। ত্রাসে আমার জায়গায় স্থাণুবৎ হয়ে গেলাম। ওই গাছগুলির ডালে বসে রয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন। ওই শকুনদের চোখ বন্ধ। আমি ভয়ে সেখান থেকে পালালাম। আমার স্বভাবসিদ্ধ সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে আমি কবরস্তান থেকে বেরিয়ে এলাম। কালো পোশাক আর সাদা দোপাট্টা পরা মহিলারা নিজেদের শূন্য ঘটি ও জোয়ারের থলি নিয়ে পড়ি কি মরি পালাচ্ছে। আমি অসমান পিচ ঢালা রাস্তা পেরোচ্ছিলাম। আমি আরেকবার অনুসন্ধানী চোখে পুরোনো গাছগুলির দিকে তাকালাম...আমি দারুণ উদ্বিগ্ন। শহরের সব গাছে শকুন বসে আছে। তাদের চোখ বন্ধ। আমি নীরব। আমার শরীর কাঁপছে। মহিলারা মাথা নিচু করে দ্রুত পায়ে হাঁটছে। তারা নিঃশব্দে মনে মনে কেঁদে চলেছে। বন্ধ দরজাগুলি একটা একটা করে খুলে যাচ্ছে। সেই

দরজাগুলি কালো পোশাক আর সাদা দোপাট্টা পরিহিতা মহিলাদের এক এক করে গিলে নিচ্ছে। মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

আমি নিজের গলিতে পৌঁছে গেলাম। গলির শান রীতিমতো তপ্ত। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। বিকেল সাড়ে চারটে বাজে কিন্তু এখনও অবধি গলিতে মেরে ফেলার মতো রোদের রাজত্ব। আমি পেছনে আমার পড়শীর পায়ের আওয়াজ পেলাম। ওর পায়ের শব্দ আমার কেমন যেন শোনালো। ওর বলা কথা আরেকবার আমার কানে বেজে উঠলো—

"আমার খোকার সঙ্গে সাতাত্তরজন লোক ছিলো ...সাতাত্তরজনের সকলেই..."

ওই সংখ্যা আমাকে দ্বিতীয় বার সেই ইতিহাসের শিক্ষিকার কথা ভাবতে বাধ্য করলো। ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা সংখ্যাগুলির স্মৃতি তাজা হলো। আমার আরেকবার মনে হলো যেন আমি ওর ছেলের লাশ কাঁধে নিয়ে ওকে বলছি—

"নাও, তোমার ছেলে..."

আমি খুবই লজ্জিত বোধ করলাম। এর মধ্যে আরেকটি দরজা খুলে আমার পড়শীকেও গিলে নিলো। ওই তপ্ত নির্জন গলিতে আমি একা হয়ে গেলাম।

অভ্যাসমতো একই ভাবে সতর্ক পা ফেলতে ফেলতে আমি ওই পুরোনো গাছগুলিতে বসে থাকা শকুনিদের কথা ভাবতে ভাবতে ত্রস্ত হলাম। সবকটা শকুনিকে দেখে মনে হয়েছে ওরা ভূরিভোজ সেরে বসে আছে।

আমি পেছন ফিরে দেখলাম। আমাদের পড়শীর দরজা হা করে খোলা রয়েছে। হাবেলির আধখোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো। আমার প্রতিবেশিনীর হাবেলি শুকনো আর তৃষ্ণার্ত। তার বাগানের ফুল ন্যাতানো...।

আধ খোলা দরজা, শুকনো ও পিপাসার্ত হাবেলি, বাগানের শুকনো ফুল আমার মন অস্থির করে দিলো। আমি সহসা নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতে লাগলাম।

ইস, যদি এক দিন আমার প্রতিবেশিনী এবং সব মহিলারা নিজেদের কালো পোশাক ও সাদা দোপাট্টা খুলে ফেলতো এবং লাল, সবুজ, নীল, হলুদ, কমলা আর বেগুনী রঙের পোশাকে নিজেদের দেহ ঢেকে নিতো...ইস্, যদি এক দিন আমার পড়শী এবং অন্য মেয়েরা নিজেদের ঘটির জল দিয়ে নিজেদের উঠোন এবং বাগানে জলসিঞ্চন করতো। ইস্, যদি একদিন আমার পড়শী এবং অন্য মেয়েরা তাদের জোয়ারের থলি নিয়ে প্রণোচ্ছল রঙ-বেরঙের পাখিদের আমন্ত্রণ জানাতো...তাহলে এই শহর কত সুন্দর আর আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো ; এই জগৎ কত মনোরম আর বর্ণময় হয়ে উঠতো। ইস্, যদি একদিন...

আমার হৃদয় হয়তো পাষাণ হয়ে গেছে কিন্তু আজ অনেক বছর পরে আমার হৃদয় ওই প্রার্থনায় আকুল। আজকে আমি আবার নিজেকে নিজে বললাম—

"ইস্, যদি একদিন...যদি..."

তারপরেই আমি আমার তিন বছরের শিশুকন্যার মতো খিলখিলিয়ে হেসে উঠলাম।

অনুবাদ : মিহির ভট্টাচার্য

[আফগানিস্তানের তিনটি প্রধান ভাষা—পুশতু, ফারসি এবং দারী। সুলোচনা জয়ন্তাব দারী ভাষায় লেখেন। ওঁর জন্ম ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কাবুলে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সেখানেই। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি প্যারিসে যান। সেখান থেকে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে ডক্টরেট পান। ওঁর গল্প ফরাসী ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ওঁর গল্প অবলম্বনে নাটকও প্যারিসে অভিনীত হয়েছে।

দারী থেকে এই গল্পের উর্দুতে অনুবাদ করেছেন নতুন দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি বিভাগের অধ্যাপক আবদুল হালিম আযগর। উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ভারত সরকারের পাবলিকেশন্স্ ডিভিশন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "আজকাল"-এর ডিসেম্বর ২০০২ সংখ্যায়। সেখান থেকে বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে।]

ওমেলাস ছেড়ে যারা চলে যায়

উর্সুলা কে. লেগুইন্

[আমেরিকান লেখিকা উর্সুলা কে. লেগুইন্-এর 'The Ones that walk away from Omelas'. গল্পের বঙ্গানুবাদ।]

বক-ওড়ানো ঘণ্টাধ্বনির সাথে সাথেই ঝকঝকে মিনার-ওলা সমুদ্র শহর ওমেলাসে উপস্থিত হল গ্রীষ্মোৎসব। বন্দরে নৌকোগুলোর সুসজ্জিত মাস্তুলে ঝিকমিক করতে লাগল হাজারো নিশানে। লাল ছাতা আর রঙ-করা দেয়াল-ওলা বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে যাওয়া জনপথগুলো দিয়ে, মাস-ঢাকা পুরোনো বাগানগুলোর মাঝখান দিয়ে, আর গাছের সারি-ঘেরা রাজপথগুলো দিয়ে, বিশাল বিশাল প্রমোদোদ্যান আর গণ-ইমারতগুলোকে ছাড়িয়ে, এগিয়ে চলতে লাগল শোভাযাত্রাগুলো। কয়েকটা ছিল বেশ বর্ণাঢ্য : বেগুনী ও ধূসর রঙের লম্বা আঁটোসাঁটো পোশাক-পরা বয়োজ্যেষ্ঠ লোকজন, গম্ভীর ও সুদক্ষ সব কারিগর, নিজেদের শিশুদের কোলে নিয়ে যেতে-থাকা, আর যেতে যেতে খোশগল্প করতে-থাকা শান্ত, প্রফুল্লচিত্ত রমণীরা। অন্যান্য রাস্তায় আবার বাজনার লয় ছিল দ্রুততর ; ঝলমল করছিল গং আর ডোপ্লিগুলো ; আর লোকেরা সবাই মিলে নাচছিল ; গোটা শোভাযাত্রাটাই ছিল একটা নৃত্যানুষ্ঠান, বাচ্চারা লুকোচুরি খেলছিল ছুটে ছুটে, তাদের চীৎকার আরো আরো উঁচুতে উঠছিল বাজনা আর গানের মাথার উপর দিয়ে বকেদের উড়ালের মতো। সবকটা শোভাযাত্রা এগোচ্ছিল শহরের উত্তর প্রান্তের দিকে, যেখানে স্থানীয় ভাষায় সবুজডাঙা নামের বিশাল জলাভূমিটার ছেলেরা আর মেয়েরা, উজ্জ্বল হাওয়ার মধ্যে নগ্ন হয়ে তাদের কাদামাখা পদতল আর গোড়ালি আর লম্বা, সুঠাম বাহু নিয়ে, অনুশীলন করাচ্ছিল তাদের অশান্ত ঘোড়াদের, ঘোড়দৌড়ের প্রাক্কালে। ঘোড়াগুলোর পরণে আদৌ কোনো সাজসজ্জাই ছিল না, স্রেফ একটা ক'রে কাজ-চলা লাগাম ছাড়া। আর তাদের কেশরগুলোয় বিনুনি করা হয়েছিল রূপোলি, সোনালী আর সবুজ শিকলি দিয়ে। তারা ফুলিয়ে তুলছিল তাদের নাসারন্ধ্রগুলো আর লাফাচ্ছিল আর একে অন্যের প্রতি প্রদর্শন করছিল ঔদ্ধত্য ; প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল তারা, যেহেতু ঘোড়ারা হল সেই একমাত্র জন্তু যারা আমাদের উৎসবগুলোকে তাদের নিজেদের বলে মনে করে। দূরে বহুদূরে উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে ওমেলাসকে তার উপসাগরের উপর অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল পর্বতমালা। এত পরিষ্কার ছিল ভোরের হাওয়া যে আঠারোটি পর্বতশৃঙ্গের উষ্ণীষের মতো তখনও জমে থাকা তুষার সাদা-সোনালী আগুনে ঝলমল করছিল সূর্যালোকিত হাওয়ার মাইলের পর মাইল জুড়ে, আকাশের ঘন নীল রঙের তলায়। ঘোড়দৌড়ের মাঠের চিহ্ন হিসেবে পোঁতা পতাকাগুলোকে কখনো ঝুলিয়ে দেওয়ার আর কখনো পত-পত করে ওড়ানোর পক্ষে ঠিক যতটা দরকার ততটাই হাওয়া বইছিল ফুরফুর করে। প্রশস্ত সবুজ জলাভূমিগুলোর নীরবতায় শোনা যাচ্ছিল নগরীর রাজপথগুলো থেকে ভেসে আসা, দূর থেকে আর কাছ থেকে ক্রমশঃই এগিয়ে আসতে থাকা গানবাজনার শব্দ। বাতাসের মধ্যে ছিল একটা ফুরফুরে হাল্কা মিঠে মেজাজ—যা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল আর ঘনীভূত হচ্ছিল আর ভেঙে পড়ছিল অনেকগুলো ঘণ্টার বিরাট সোল্লাস ধ্বনিময়তার মধ্যে।

সোল্লাস। উল্লাস নিয়ে কীভাবে কিছু বলতে পারে কেউ? কীভাবে দেওয়া যেতে পারে ওমেলাসের নগরবাসীদের কোনো বর্ণনা?

সাদামাটা লোকজন ছিল না ওরা, বুঝলে কি না, যদিও ওরা ছিল সুধী। কিন্তু আমরা এই হর্ষব্যঞ্জক কথাগুলো খুব একটা আর বলি না। যাবতীয় হাসি হয়ে গেছে প্রাচীন আদলের। এরকম একটা বর্ণনা দেওয়া থাকলে লোকে কিছু কিছু ধরে নিতে প্রবণ হয়। এরকম একটা বর্ণনা দেওয়া থাকলে লোকে এর ঠিক পরেই প্রবণ হয় রাজার খোঁজ করতে, যে রাজা একটা দুর্দান্ত জোয়ান ঘোড়ার পিঠে আসীন, এবং যাঁর চারপাশ ঘিরে রেখেছেন তাঁর মহান নাইটেরা, বা হয়তো যিনি বসে আছেন বিরাট পেশী-ওয়ালা সব ক্রীতদাস-বাহিত একটা সোনালী পাল্কিতে। কিন্তু কোনো রাজা ছিলেন না ওখানে। ওরা তরোয়াল ব্যবহার করত না, বা ক্রীতদাস রাখত না। ওরা বর্বর ছিল না। ওদের সমাজের নিয়মটিয়ম বা আইনকানুন আমি জানি না, কিন্তু আমার ধারণা তেমন কিছু থাকলেও সেগুলো সংখ্যায় নিতান্ত কম। ঠিক যেমন রাজতন্ত্র আর দাসপ্রথা ছাড়াই তাদের চলে যেত, একইরকমভাবে তাদের চলে যেত কোনো লেয়ার-বাজার, কোনো বিজ্ঞাপন,

কোনো গুপ্ত পুলিশ-বাহিনী আর কোনো বোমা ছাড়াই। তবু আমি আবার বলছি যে ওরা খুব সাদামাটা লোক ছিল না; ওরা ছিল না মধুস্বভাব মেষপালক, বা মহাপ্রাণ জংলী, বা ভোঁতা স্বর্গরাজ্যবিশ্বাসী। ওরা আমাদের চেয়ে কোনোভাবেই কম জটিল ছিল না। সমস্যাটা হল এই যে আমাদের একটা বদভ্যেস রয়েছে, পণ্ডিত ও অভিজাতবর্গের উৎসাহদানের ফলে, যার জন্য আমরা সর্বদাই সুখকে কেমন যেন একটা বোকা-বোকা ব্যাপার বলে ভাবি। একমাত্র যন্ত্রণা হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্মত, একমাত্র পাপ হল আকর্ষক। এই হল শিল্পীর প্রবঞ্চনা পাপের তুচ্ছতা আর যন্ত্রণার ভয়াবহ বিরক্তিকে মেনে নেওয়ার অস্বীকৃতি। তুমি যদি ওদের গ্রাস ক'রে ফেলতে না পারো, তো ভিড়ে যাও ওদের সঙ্গে। এতে যদি কষ্ট হয়, তো আবার করো। কিন্তু হতাশার স্তুতি করার অর্থ হল আনন্দের নিন্দা করা; হিংসাকে আলিঙ্গন করার অর্থ হল অন্য সব কিছুর ওপর থেকে রাশ হারিয়ে ফেলা। আমরা প্রায় রাশ হারিয়ে ফেলেছি; আমরা আর না পারি একজন সুখী মানুষের বর্ণনা দিতে, না পারি আনন্দের কোনো সমারোহ করতে। কীভাবে আমি তোমাদের ওমেলাসের লোকজন নিয়ে কিছু বলব? ওরা একেবারেই বোকা আর সুখী শিশু ছিল না—যদিও ওদের শিশুরা সত্যিসত্যিই সুখী ছিল। ওরা ছিল পরিপক্ক, বুদ্ধিমান, প্রাণোচ্ছল প্রাপ্তবয়স্ক—যাদের জীবন ছারখার হয়ে যায়নি। আহা কী অলৌকিক। শুধু যদি আরেকটু ভালোভাবে ব্যাপারটা বর্ণনা করতে পারতাম। শুধু যদি তোমাদের নিঃসংশয় করতে পারতাম আমি। আমার ভাষার মধ্যে ওমেলাসকে মনে হবে যেন কোনো রূপকথার গল্পের নগরী, অনেকদিন আগের আর অনেক অনেক দূরের, একদা কোনো সময়ের। হয়তো সবচেয়ে ভালো হবে যদি তোমরা একে তোমাদের নিজেদের খেয়ালমতো কল্পনা ক'রে নাও, তাতেই কাজ হবে বলে ধরে নিয়ে। কেননা নিশ্চিতভাবেই আমি তোমাদের সবায়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারব না। যেমন ধরো, প্রবৃত্তি নিয়ে কী বলা যায়? আমার মনে হয় রাজপথগুলো ও তাদের মাথার ওপর কোনো মোটরগাড়ি বা হেলিকপ্টার থাকবে না; এ-কথাটা উঠে আসে এই ব্যাপারটা থেকে যে ওমেলাসের লোকজন সুখী লোকজন। সুখের ভিত্তি হল যা প্রয়োজনীয়, যা প্রয়োজনীয়-ও নয় ধ্বংসাত্মক-ও নয়, আর যা ধ্বংসাত্মক তাদের মধ্যে একটা ন্যায়সঙ্গত পৃথকীকরণ। যাইহোক, এর মধ্যে মাঝের গোত্রটার ক্ষেত্রে—যা-কিছু অপ্রয়োজনীয় কিন্তু অ-ধ্বংসাত্মক সে-সবের ক্ষেত্রে—যা কিছু আরামের, বিলাসের, উদ্বেলতার ইত্যাদি সে-সবের ক্ষেত্রে—ওদের কাছে থাকতেই পারত কেন্দ্রীয় তাপ-নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, পাতাল-রেল, কাপড় কাচার যন্ত্র, এবং আরো অজস্র বিস্ময়কর সব যন্ত্র যা এখানে এখনো অবধি উদ্ভাবিত হয়নি, যেমন ভাসমান আলোর উৎস, জ্বালাবিহীন শক্তি, সাধারণ সর্দির আরোগ্য প্রভৃতি। অথবা, তাদের কাছে এ-সব কিছুই না-ও থাকতে পারত; কিছু এসে যায় না তাতে। তোমাদের যেমনটি পছন্দ তেমনটিই। আমি এরকম ভাবতে প্রবণ যে উপকূলের কাছের ও দূরের শহরগুলো থেকে ওমেলাসে উৎসবের আগের শেষ ক-দিন লোক আসতে থাকছে খুব দ্রুতগামী ছোটো ছোটো ট্রেনে আর দোতলা ট্রামে চেপে, এবং ওমেলাসের রেলস্টেশনটা সত্যিই শহরের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন ইমারত, যদিও সেটা জমকালো কৃষি-বিপণনভবনটির তুলনায় সাদামাটা। কিন্তু এমন সব ট্রেন-ফেনের ব্যবস্থা থাকলেও, আমার মনে হয় ওমেলাসকে এখনো পর্যন্ত তোমাদের কারো কারো মনে হচ্ছে বেশ শাস্ত্রশিষ্ট ভালো ভালো হাসি, ঘণ্টা, কুচকাওয়াজ, ঘোড়া, ছোঃ। যদি তাই হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে একটা গণসঙ্গমপর্ব জুড়ে দাও। একটা গণসঙ্গমপর্ব থাকলে যদি সুবিধে হয়, তো দ্বিধা কোরো না। শুধু, যেন কোনো মন্দিরটন্দির না থাকে যেখান থেকে সুন্দর দেখতে পূজারী আর পূজারিণীরা নগ্ন শরীরে বেরিয়ে আসবে—যারা ইতোমধ্যেই থাকবে অর্ধেক তুরীয় অবস্থায়, যে-কোনো পুরুষ বা মহিলা, প্রেমিক বা অপরিচিতের সঙ্গে সঙ্গম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে, রক্তের গহীন ঈশ্বরসত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া যাদের কামনা, তারা—যদিও এটাই ছিল আমার প্রাথমিক ধারণা। তবু সত্যিসত্যিই ওমেলাসে কোনো মন্দির না থাকাটাই আরো ভালো হবে—অন্ততঃ কোনো মানুষ-অধ্যুষিত মন্দির না থাকাটা। ধর্ম চলতে পারে, কিন্তু পুরোহিত শ্রেণী একদম নয়। অবশ্যই ঐ সুন্দর নগ্ন শরীরগুলি স্রেফ ঘুরে বেড়াতে পারে, তাদের নিজেদের দৈবসুধার মতো করে শরণাগতের ক্ষুধার কাছে, এবং শরীরের সম্ভোগসুখের কাছে, নিবেদন করে। তাদের ঐ শোভাযাত্রাগুলোয় যোগ দিতে দেওয়া হোক। সঙ্গমদৃশ্যগুলিকে ঘিরে বাজতে থাকুক ডোপ্‌নিগুলো, আর গং-গুলোর উপরে ঘোষিত হোক কামনার গৌরববার্তা। এবং (যে কথাটা একেবারেই অ-গুরুত্বপূর্ণ নয়) ধরা যাক এই সব সুখময় ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাদের জন্ম হবে, সকলেই তাদের ভালোবাসবে আর তাদের দেখভাল করবে। একটা জিনিস যেটা ওমেলাসে একেবারেই নেই বলে আমি জানি সেটা হল অপরাধবোধ। তো, এ-ছাড়া আর কী কী থাকা উচিত সেখানে? আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে ওখানে ওষুধ-টষুধের কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু এমনটা ভাবা বিশুদ্ধতাবাদী গোঁড়ামিসুলভ। যারা ওটা

পছন্দ করে তাদের জন্য, ত্রুৎস-এর নম্র অথচ একঘেয়ে মিষ্টতায় সুরভিত হয়ে উঠতে পারে নগরীর পথগুলো—যে ত্রুৎস্ প্রথমে মন ও প্রত্যঙ্গগুলোয় নিয়ে আসে একটা বিরাট ভারহীনতা আর উজ্জ্বলতা, এবং তারপর কয়েক ঘণ্টা বাদে একধরনের স্নিগ্ধ অবসন্নতা, এবং সবশেষে নিয়ে আসে মহাবিশ্বের খোদ রহস্য এবং অন্তরতম গোপন কথাগুলোর বিষয়ে বিস্ময়কর সব কল্পদৃশ্য, ঠিক যেমন আবার তা যৌনতার সুখটাকে অবিশ্বাস্যরকমভাবে উত্তেজিত করে তোলে; এবং এটা কোনোরকম অভ্যাসজনকও নয়। আরেকটু পরিমিত রুচির জন্য আমার মনে হয় ওখানে বিয়ারের ব্যবস্থা থাকা উচিত। আর কী, আর কী কী থাকতে পারে এই আনন্দময় নগরে? অবশ্যই জয়ের একটা বোধ, সাহসের এক সমারোহ। কিন্তু ঠিক যেমন আমরা ধর্মযাজক সম্প্রদায়কে বাদ দিয়েছি, আমরা বরং সৈন্যদেরও বাদ দিই। কোনো গণহত্যা থেকে উদ্ভূত আনন্দকে ঠিক আনন্দ বলা যায় না; ওটা চলবে না, ওটা ভীতিময় আর তুচ্ছ। বরং এক পরিসীমাহীন ও অকৃপণ পরিতৃপ্তি, কোনো বহিঃস্থ শত্রুর বিরুদ্ধে নয় বরং সমস্ত স্থানের সমস্ত মানুষের আত্মার মধ্যে যা কিছু সূক্ষ্মতম ও সুন্দরতম সে-সবের সঙ্গে এবং বিশ্বের গ্রীষ্মকতুর যাবতীয় জৌলুসের সঙ্গে একযোগে অনুভূত এক দাক্ষিণ্যময় বিজয়—এই নিয়েই উদ্বেল হয়ে ওঠে ওমেলাসের লোকজনের হৃদয়, এবং যে জয়োৎসব তারা পালন করে তা হল জীবনের। আমার সত্যিই মনে হয় না যে ওদের মধ্যে খুব বেশি লোকের দরকার হয় ত্রুৎসের সাহায্য নেবার।

এতক্ষণে শোভাযাত্রাগুলোর অধিকাংশই পৌঁছে গেছে সবুজডাঙা অঞ্চলে। আহার আয়োজকদের লাল ও নীল তাঁবুগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে রান্নার একটা চমৎকার সৌরভ। কচি কচি বাচ্চাদের মুখগুলো আদরণীয়ভাবে চটচটে হয়ে আছে, এক ব্যক্তির উদাসীন ধূসর দাড়িতে আটকে রয়েছে গরগরে প্যাস্ট্রির দু-চার টুকরো। তরুণ আর তরুণীরা উঠে পড়েছে তাদের ঘোড়ায় এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠের শুরুর লাইনের আশেপাশে জড়ো হতে শুরু করেছে। এক বৃদ্ধা মহিলা, বেঁটেখাটো, মোটা আর হাসিখুশি, একটা ঝুড়ি থেকে গোছা গোছা ফুল বিতরণ করছেন, আর দীর্ঘকায় তরুণ পুরুষেরা তাঁর ফুলগুলো নিয়ে তাদের চকচকে চুলের ওপর বেঁধে নিচ্ছে। ন-দশ বছরের এক শিশু ব'সে আছে ভিড়ের এক প্রান্তে, একা একা, আর একটা কাঠের বাঁশি নিয়ে বাজাচ্ছে। লোকে থেমে দাঁড়াচ্ছে শোনার জন্য, আর হাসছে, কিন্তু কেউ কথা বলছে না তার সঙ্গে, কারণ সে কখনোই থামাচ্ছে না তার বাজানো আর একেবারেই দেখছে না তাদের দিকে; তার কালো চোখদুটো মগ্ন হয়ে আছে সুরের মিষ্টি, মিহি ইন্দ্রজালে।

সে শেষ করল বাজানো, আর ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল কাঠের বাঁশি-ধরা তার হাতদুটো।

ঐ ছোট্ট ব্যক্তিগত নীরবতাটা ঠিক যেন ছিল একটা সংকেত, যার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ দৌড় শুরুর লাইনের কাছাকাছি প্যাভিলিয়ন থেকে বেজে উঠছে একটা ট্রাম্পেট: তীব্রভাবে, বিষণ্ণভাবে, তীক্ষ্ণভাবে, ঘোড়াগুলো তাদের শীর্ণ পা-গুলোর ওপর ভর দিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর তাদের মধ্যে কেউ একজন যেন উত্তরে চি-হি-হি ক'রে ডেকে উঠছে। নম্রমুখ তরুণ আরোহীরা ঘোড়াগুলোর ঘাড়ের ওপর মৃদু চাপড় দিচ্ছে আর তাদের শান্ত করছে—"শান্ত হ, শান্ত হ, এই যে...সেনা আমার...আশা আমার..."। দৌড় আরম্ভের দাগ বরাবর তারা সারে সারে দাঁড়াতে শুরু করছে। ঘোড়দৌড়ের মাঠের চারপাশের ভিড়কে মনে হচ্ছে হাওয়ার মুখে পড়া ঘাস ও ফুলের মাঠ। শুরু হল গ্রীষ্মোৎসব।

বিশ্বাস হচ্ছে তোমাদের? এই উৎসব, এই মহানগর, এই উল্লাস—এ-সবকে তোমরা কি স্বীকার করছ? না? তাহলে আমাকে আরেকটা জিনিস বর্ণনা করতে দাও।

ওমেলাসের সুন্দর গণ-ইমারতগুলির কোনো একটায় মাটির নীচের কোনো একটা জায়গায়, অথবা হয়তো শহরের বিশাল ব্যক্তিগত প্রাসাদগুলির কোনো-একটার কোনো প্রকোষ্ঠে রয়েছে একটা কুঠুরি। তার একটাই তালাবন্ধ দরজা, আর কোনো জানলা নেই। অল্প একটু ঘোলাটে আলো ঢুইয়ে ঢোকে ঘুলঘুলির ফাঁকগুলো দিয়ে—যে ঘুলঘুলিটা আবার ঐ প্রকোষ্ঠের করিডরের কোথাও থাকা মাকড়সা-জালভর্তি একটা জানলার থেকে ভেতরের দিকে। ছোট্ট ঘরটার একটা কোণে একটা মরচে-ধরা বালতির কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা গোটা-দুয়েক ডাণ্ডাওলা ঝাড়ন। যাদের মাথাগুলো শক্ত, গিট-পড়া আর দুর্গন্ধময়। মেঝেটা ময়লা ভর্তি, হাতের ছোঁয়াতে কিছুটা স্যাঁতস্যাঁতে—যে-কোনো প্রকোষ্ঠের ধুলো যেমন হয়। ঘরটা মোটামুটি তিন পা লম্বা আর দু-পা চওড়া—বস্তুত স্রেফ একটা ঝাঁটা-ফাটা রাখার খুপরি বা একটা অব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ঘর। ঐ ঘরের মধ্যে ব'সে রয়েছে একটা শিশু। সে একটা ছেলে বা মেয়ে যাহোক কিছু। তাকে দেখতে ছ-বছর বয়সীর মতো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে প্রায় দশ বছরের। সে মানসিকভাবে দুর্বল। হয়তো সে জন্ম থেকেই ঐ দুর্বলতার শিকার, বা হয়তো সে জড়বুদ্ধি হয়ে গেছে ভয়, অপুষ্টি আর উপেক্ষার ফলে। মাঝে মাঝে সে তার নাকটা উঁচিয়ে ধরে আর মাঝে মাঝে তার পায়ের আঙুল বা যৌনাঙ্গগুলিকে নিয়ে অনিশ্চিতভাবে

নাড়াচড়া করে—ঐ বালতি আর ন্যাতাদুটো থেকে সবচেয়ে দূরের কোণে উবু হয়ে বসে থাকতে থাকতে। সে ঐ ন্যাতাগুলোকে ভয় করে। ওগুলোকে তার ভয়ংকর কিছু মনে হয়। সে চোখ বন্ধ ক'রে থাকে, কিন্তু সে মনে মনে জানে যে ন্যাতাগুলো তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওখানে ; আর দরজাটা তালাবন্ধ রয়েছে ; আর কেউ ওখানে আসবে না। দরজাটা সবসময়েই তালাবন্ধ থাকে ; আর কখনোই কেউ আসে না, শুধুমাত্র এই ব্যাপারটা ছাড়া যে মাঝে মাঝে—ঐ শিশুটা সময় বা সময়ান্তর সম্পর্কে কিছুই বোঝে না—মাঝে মাঝে দরজাটায় সাংঘাতিক জোরে ঝনঝন শব্দ হয় আর দরজাটা খুলে যায়, আর একটা লোক, বা অনেকজন লোক, হাজির হয় সেখানে। ওদের মধ্যে কেউ একজন এগিয়ে আসতে পারে আর শিশুটার গায়ে লাথি মারতে পারে—শুধু ওকে দাঁড় করানোর জন্য। অন্যেরা কখনোই কাছে আসে না, শুধু ভেতরে তাকিয়ে তার দিকে উঁকি মারে ভয়চকিতে, বিরক্ত চোখে, খাবারের পাত্রটা আর জলের কলসটা সজোর ভ'রে দেওয়া হয়, দরজাটা তালাবন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, আর চোখগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ঐ লোকগুলো কখনোই কিছু বলে না, কিন্তু ঐ শিশুটা, সবসময়ের জন্যই ঐ যন্ত্রপাতির ঘরে থাকে নি, এবং যে মনে করতে পারে সূর্যালোকের কথা আর তার মায়ের কণ্ঠস্বরের কথা, মাঝে মাঝে কথা বলে ওঠে। "আমি ভালো হবো..." —সে বলে অনুনয়ে, "আমাকে বাইরে যেতে দাও। আমি ভালো হবো।" ওরা কখনো কোনো উত্তর দেয় না। প্রথম প্রথম শিশুটা রাত্রিবেলা চিৎকার করত সাহায্য চেয়ে, আর ভীষণ কাঁদত, কিন্তু এখন সে শুধুই একঘেয়েভাবে গোঙাতে থাকে, "অ্যাঃ হ্যাঁ, অ্যাঃ হ্যাঁ...", আর ক্রমেই কম আরো কম কথা বলে সে, সে এতটাই রোগা যে তার পায়ের ডিম ব'লে কিছু নেই, তার পেট ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর সে বেঁচে থাকে দিনে আধবাটি দানাশস্য আর লপসি খেয়ে। সে উলঙ্গ। তার পেছন আর জঙ্ঘা ভ'রে আছে দগদগে ঘায়ে, যেহেতু সে নিরন্তর ব'সে থাকে তার নিজেরই মলমূত্রের ওপর।

ওরা সবাই জানে যে সে ওখানে রয়েছে—ওমেলাসের প্রতিটি লোক। কেউ কেউ তাকে দেখতে এসেছে, আর অন্যেরা স্রেফ এটুকু জেনেই নিরুদ্বেগ যে সে ওখানে রয়েছে। ওরা সকলেই জানে যে তাকে থাকতেই হবে ওখানে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝতে পারে কেন, আর কেউ কেউ পারে না, কিন্তু ওরা প্রত্যেকেই বোঝে যে ওদের সুখ, ওদের মহানগরের সৌন্দর্য, ওদের বন্ধুত্বসমূহের নম্রতা, ওদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য, ওদের পণ্ডিতদের জ্ঞান, ওদের কারিগরদের দক্ষতা, এমনকি ওদের ফসলের প্রাচুর্য আর ওদের আকাশের সময় জলহাওয়া—এই সবই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ঐ শিশুটার ন্যক্কারজনক দুর্দশার উপর।

সাধারণত এই কথাটা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলা হয় যখন তাদের বয়স আট থেকে বারোর মধ্যে—যখনই তাদের বুঝতে সমর্থ ব'লে মনে হয় ; এবং যারা শিশুটাকে দেখতে আসে তাদের অধিকাংশই তরুণ, যদিও খুব প্রায়ই প্রাপ্তবয়স্ক এক-আধজনও আসে, বা ফিরে আসে, শিশুটাকে দেখার জন্য। ব্যাপারটা তাদের কাছে যত ভালো করেই ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকুক না কেন, এই তরুণ দর্শকেরা ঐ দৃশ্য দেখে সব সময়েই আহত হয় ও অসুস্থ বোধ করে। তারা অনুভব করে বিতৃষ্ণা—যে বিতৃষ্ণার তুলনায় তারা নিজেদের ভেবেছিল মহত্তর। তারা অনুভব করে ক্রোধ, অপমান, অক্ষমতা—সমস্ত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও। শিশুটার জন্য কিছু একটা করতে চায় তারা। কিন্তু এমন কিছুই নেই যা তারা করতে পারে। ঐ বাচ্চাটাকে যদি ঐ কদর্য জায়গাটা থেকে নিয়ে আসা হত বাইরে সূর্যালোকে, ওকে যদি পরিষ্কার করিয়ে দেওয়া হত আর খেতে দেওয়া হত আর আরাম দেওয়া হত, তো সেটা সত্যিই হত একটা খুব ভালো কিছু ; কিন্তু যদি তা করা হত, তাহলে ঐ দিন ঐ মুহূর্তেই ওমেলাসের সমস্ত প্রাচুর্য আর সমস্ত সুখের সৌন্দর্য শুকিয়ে যেত আর ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। এগুলোই হল শর্ত। ওমেলাসের প্রতিটি জীবনের সমস্ত শুভত্ব আর দাক্ষিণ্যকে বিনিময় করতে হবে ঐ একটিমাত্র ছোট্ট উন্নতি বিধানের সঙ্গে : একজনের সুখের সুযোগের জন্য ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে সহস্রজনের সুখকে—যার অর্থ বস্তুতঃই হবে অপরাধকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে ঢোকানো।

শর্তগুলো কঠোর এবং চরম ; শিশুটার সঙ্গে এমনকি একটা দয়ার্দ্র কথাও বলা যাবে না।

প্রায়ই এই তরুণেরা বাড়ি ফিরে যায় সাশ্রুনয়নে, বা এক অপ্রতিহীন উষ্মা নিয়ে, যখন তারা শিশুটাকে দ্যাখে আর এই ভয়ংকর ধাঁধাটার মুখোমুখি হয়। এ-নিয়ে তারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ কি বছরের পর বছর চিন্তা করতে পারে। কিন্তু যত দিন যায় তারা উপলব্ধি করতে শুরু করে যে এমনকি শিশুটাকে যদি ছেড়েও দেওয়া যেত, তাহলেও সে তার স্বাধীনতা থেকে খুব একটা উপকার পেত না : উলঙ্গতা ও খাদ্যের জন্য সামান্য একটু অস্পষ্ট সুখ, অবশ্যই, কিন্তু তার বেশি প্রায় কিছুই না। কোনো বাস্তব আনন্দ পাওয়ার পক্ষে সে খুবই অবনমিত ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। সে এত দীর্ঘকাল ধরে ভয় পেয়েছে যে সে এমনকি ভয় থেকে মুক্তি পেতেও অক্ষম। তার অভ্যাসগুলি এত বেশি অন্তর্মুখিত যে সে মানবিক

আচরণে সাড়া দিতেও অপারগ। বস্তুতঃ এত দীর্ঘ সময় পরে সে সম্ভবতঃ ভেঙে পড়বে তাকে আশ্রয় দেবার মতো দেয়ালগুলো চারপাশে না পেয়ে, আর তার চোখের জন্য অন্ধকারকে না পেয়ে, আর তার নিজেরই মলমূত্রের উপর বসে থাকতে না পেরে। এই তেতো অন্যায়ের কারণে ওদের চোখের সব জল শুকিয়ে আসে—যখন ওরা প্রত্যক্ষ করতে শুরু করে বাস্তবতার এই ভয়ঙ্কর ন্যায়বিচারকে, এবং শুরু করে তাকে মেনে নিতে। তবু, এ তাদের এই অন্ধ আর এই ক্রোধ, তাদের দাক্ষিণ্যের এই পরীক্ষা আর তাদের নিঃসহায়তার এই অঙ্গীকার, যা সম্ভবতঃ তাদের জীবনের এই প্রাচুর্যের যথার্থ উৎস। কোনো ম্যাড়ম্যাড়ে দারিদ্র্যজ্ঞানহীন সুখ ওদের সুখ নয়। ওরা মানে যে ওরা, ঐ শিশুটার মতোই, মুক্ত নয়। ওরা জানে দয়া কী। ঐ শিশুটার অস্তিত্ব, এবং তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওদের অবগতি, যা সম্ভব করে তোলে ওদের স্থাপত্যের মহত্ত্ব, ওদের সঙ্গীতের অব্যর্থতা, ওদের বিজ্ঞানের বিশালতা। ওরা যে ওদের শিশুদের সঙ্গে নম্র আচরণ করে তার কারণ ঐ শিশুটাই। ওরা জানে যে ঐ দুর্দশাগ্রস্তই একজন যদি ঐ অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে না বেড়াত তাহলে আরেকজন, ঐ বাঁশিবাদক, পারতই না কোনো আনন্দময় সঙ্গীত সৃষ্টি করতে সেই সময়ে যখন ঐ তরুণ অশ্বারোহীরা তাদের সৌন্দর্য নিয়ে ঘোড়দৌড়ের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় গ্রীষ্মের প্রথম প্রত্যুষের সূর্যালোকে।

এবার কি তবে তোমরা বিশ্বাস করবে ওদের? ওদের কি আরো একটু বেশি বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে না? কিন্তু আরো একটা জিনিস বলার আছে, আর সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

কখনো কখনো যেসব সদ্যযৌবনমুখী মেয়েরা বা ছেলেরা ঐ শিশুটাকে দেখতে যায় তাদের মধ্যে এক-আধজন কাঁদার জন্য বা ক্রোধপ্রকাশের জন্য আর বাড়ি ফিরে যায় না; বস্তুতঃ তারা আদৌ বাড়ি ফিরে যায় না। কখনো কখনো ওদের চেয়ে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো পুরুষ বা মহিলাও একদম চুপ হয়ে যায় দু-একদিনের জন্য, এবং তারপর বেরিয়ে যায় বাড়ি ছেড়ে। এরা বেরিয়ে যায় রাস্তায়, আর তারপর একা একা হাঁটতে থাকে রাস্তা ধরে। তারা হাঁটতেই থাকে, আর সোজা বেরিয়ে চলে যায় ওমেলাস নগরের বাইরে, সুন্দর তোরণটা পার হয়ে। তারা হেঁটে চলে ওমেলাসের চাষের জমিগুলোর পাশ দিয়ে। প্রত্যেকে যায় একাকী, তরুণ বা তরুণী, পুরুষ বা নারী। রাত্রি নামে। ঐ পথিক বাধ্য হয় গ্রামের পথগুলি দিয়ে হেঁটে যেতে—হলুদ আলো-জ্বলা জানলাওলা বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে, আর চলে যায় আরো দূরের বহু প্রান্তর অন্ধকারের ভিতর। তারা যেতেই থাকে। তারা ছেড়ে যায় ওমেলাস, তারা সামনের অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে যায়, এবং তারা আর ফিরে আসে না। যে জায়গার দিকে তারা যায় তা আমাদের অধিকাংশের কাছে ঐ সুখনগরীর থেকেও বেশি অকল্পনীয়। তার আদৌ কোনো বর্ণনাই দিতে পারব না আমি। এমন হতে পারে যে ঐ জায়গাটার কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু কেমন যেন মনে হয় যে ওমেলাস ছেড়ে যারা চলে যায়—তারা জানে কোথায় তারা চলেছে।

অনুবাদ : সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়

ইহুদি

পায়রা

আইজাক সিঙ্গার

অধ্যাপক ভ্লাডিস্লাভ ইবেসুব্বের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সঙ্গী হিসেবে তার শুধু বই এবং পাখি রইল। তিনি ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রফেসর পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন কারণ ওরজেল পোলস্কি সংগঠনের ছাত্রদের গুণ্ডামি তিনি আর সহ্য করতে পারেননি। ওরা ক্লাসে আসত সোনালী কাজ করা পার্কির টুপি মাথায়, হাতে মোটা লাঠি, যে কোন অজুহাতে মারপিঠ শুরু করতে প্রস্তুত। কোন বিশেষ কারণে, বা অধ্যাপক ইবেসুঝ কোনদিন হদিশ করতে পারেননি, এইসব ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগেরই ছিল লালচে মুখ, ঘামাচি ভরা কাঁধ, বোঁচা নাক, চৌকো ছাঁদের চেয়াল—যেন ইহুদিদের প্রতি এদের সম্মিলিত আক্রোশের ফলে এরা একই পরিবারের লোকেদের মত একই ধাঁচের দেখতে

হয়েছে। এমনকি এরা যখন সোচ্চার দাবি জানাতো যে ইহুদি ছাত্ররা আলাদা বেঞ্চে বসবে, তখনও ওদের গলার স্বর একই রকম শোনাত।

ভ্লাডিস্লাভ ইবেসুঝ সামান্য পেনশন পেতেন। ওই টাকায় বাড়ি ভাড়া এবং খাওয়ার খরচ কোনরকমে কুলিয়ে যেত। বুড়ো বয়সে মানুষের আর কি চাই? ওঁর বৃদ্ধা পরিচারিকা এক পোলিশ চাষীর ঘরের মেয়ে, চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পায় না। নাম টেক্লা। অধ্যাপক বহুদিন যাবৎ তাকে মাইনে দেওয়া বন্ধ করেছেন। দু'জনের জন্যেও স্যুপ এবং অল্পজ্বালে পাক করা রান্না তৈরি করত, যা দাঁত দিয়ে না চিবিয়েও খাওয়া যায়। ওদের কারোরই নতুন জামাকাপড় কেনার প্রয়োজন হত না, এমনকি একজোড়া জুতোও নয়। স্যুট, কোট, জীর্ণ-লোমের পোষাক, এবং অধ্যাপকের পত্নীর পুরোন জামাকাপড়গুলি বাড়িতে ছিল। সেগুলি ন্যাপথালিন দিয়ে সযত্নে প্যাক করে রাখা হয়েছিল।

এতগুলি বছর অতিক্রান্ত হওয়াতে, অধ্যাপকের লাইব্রেরী এত বিশাল হয়ে উঠেছিল যে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সারা দেওয়াল জুড়ে শুধু-বইয়ের আলমারী। জামাকাপড়ের তাকে, ট্রাঙ্কে, কার এবং চিলেকোঠায় বই এবং পাণ্ডুলিপি ঠাসা। যতদিন অধ্যাপকের স্ত্রী বেঁচেছিলেন, তিনি প্রায়ই কিছুটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। বইগুলি ঝাড়পোঁছ করে খোলা বাতাসে রাখতেন। মলাট ছিঁড়ে গেল বাঁধাতে দিতেন। যেসব পাণ্ডুলিপি অকেজো, সেগুলিকে দিয়ে স্টোভ জ্বালাতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে সংসার অগোছালো হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে অধ্যাপক একটা খাঁচাভর্তি পাখি জোগাড় করেছেন—টিয়া চন্দনা, ক্যানারি পাখি। তিনি চিরকাল পাখিদের ভালবাসতেন। খাঁচার দরজা খোলা থাকত যাতে পাখিরা ইচ্ছেমত উড়তে পারে। টেক্লা অভিযোগ করত ওদের জন্যে ও সারা বাড়ি পরিষ্কার করতে পারবে না, কিন্তু অধ্যাপক বলতেন : "ওরে বোকা, ঈশ্বরের সৃষ্টি জীবদের সবকিছুই পবিত্র।"

যেন এতেই তিনি ক্ষান্ত নন। রাস্তার পায়রাদেরও রোজ খাবার দিতেন। প্রতিটি সকাল এবং দুপুরে প্রতিবেশীরা দেখত তিনি এক ব্যাগ খাবার নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। ছোট্ট চেহারার মানুষটি, শরীর সামান্য সামনে ঝুঁকে পড়েছে, পাতলা দাড়ি যার রং সাদা থেকে হলদে রূপ নিয়েছে, সামান্য বাঁকা নাক এবং ডেবে যাওয়া মুখ। পুরু কাঁচের চশমার জন্যে ঘন ভ্রু-র নিচে তাঁর বাদামী চোখ দু'টো স্বাভাবিক বড় এবং রাগী মনে হত। তিনি সবসময় সবুজ রং-এর উপরের জামা পরতেন, এছাড়া পায়ে দিতেন ভেতরে ইলাস্টিক দেওয়া ভোঁতা-মুখো জুতো, বাজারে যার কোন চল ছিল না। তাঁর ছোট্ট গোল টুপির নিচ থেকে উস্কোখুস্কো সাদা চুল বেরিয়ে থাকত। গেট থেকে তিনি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি মুখ দিয়ে "ডাস্-ডাস-ডাস্" আওয়াজ করার আগেই (পায়রাদের ডাকার এই ভাষা, যেমন মুরগীর বাচ্চাদের ডাকার ভাষা হল "ঝিপ-ঝিপ্")। ঝাঁক ঝাঁক পায়রা চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরত। ওরা পুরোন টালির ছাদে এবং চর্মরোগের হাসপাতালের চারপাশের গাছে অপেক্ষা করত। প্রফেসর যে রাস্তায় থাকতেন তা নওই সুংয়াট বুলেভার থেকে শুরু হয়ে ভিস্টুলার দিকে বাঁক নিয়ে নেমে গেছে। গ্রীষ্মকালে পাথরের টুকরোগুলোর মাঝে ঘাস উঁকি দিত। এখানে গাড়িঘোড়া খুব কম। কচিৎ শবযাত্রার গাড়ি এসে সিফিলিস্ কিংবা লুপাস রোগে আক্রান্ত মৃতের শব তুলে নিতে আসত, কিংবা যৌন রোগে আক্রান্ত গণিকাদের হাসপাতালে পৌঁছে দিতে আসত পুলিশের ভ্যান। কয়েকটি বাড়ির উঠোনে হস্তচালিত পাম্পের ব্যবহার চালু ছিল। ওখানকার বেশিরভাগ ভাড়াটেরাই বৃদ্ধ, যাঁরা খুব কমই বাইরে বের হতেন। পায়রারা এখানে শহরের হট্টগোল এড়াতে পারত।

অধ্যাপক টেক্লাকে বলতেন পায়রাদের খাওয়ানো আর চার্চ কিংবা সিনাগগে যাওয়া তাঁর কাছে একই ব্যাপার। ঈশ্বর প্রশংসার অভাবে অভ্যুক্ত নন, কিন্তু পায়রারা প্রতিদিন সূর্য ওঠার মুহূর্ত থেকে খাবারের জন্যে অপেক্ষা করে। স্রষ্টাকে পূজো করার উৎকৃষ্টতম উপায় হল তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়ালু হওয়া।

অধ্যাপক শুধু ক্ষুধার্ত পায়রাদের খাইয়েই আনন্দ পেতেন না। তাদের কাছে তিনি শিক্ষালাভও করতেন। একবার তিনি ট্যাল-মাড়-এর একটি উদ্ধৃতি পড়েছিলেন যেখানে ইহুদিদের পায়রাদের সমগোত্রীয় বলা হয়েছে। ইদানিং তিনি এই তুলনার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারছিলেন। জীবনযুদ্ধে পায়রারা অস্ত্রহীন। ওরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে টিকে থাকে মানুষের ছুঁড়ে দেওয়া সামান্য খাবার খেয়ে। ওরা আওয়াজকে ভয় পায়, সবচেয়ে ছোট কুকুরটির তাড়া খেয়ে পালায়। যেসব চড়াইরা ওদের খাবার চুরি করে তাদেরও ওরা হটিয়ে দেয় না। পায়রা, ইহুদির মত শান্ত, নিরিবিলি এবং সুনামের উপর ভরসা করে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু প্রত্যেক নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। পায়রাদের সমাজে, ইহুদিদের মতই, বৃদ্ধব্যাঙ্কের নমুনা আছে যারা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গুণকে অস্বীকার করে। এমন পায়রাও ছিল যারা অন্যদের তাড়িয়ে দিত, ঠোকরাতো এবং অন্যরা পাওয়ার আগেই দানাশস্য কেড়ে নিত। অধ্যাপক

ইবেসুঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন শুধু ইহুদি বিরোধী ছাত্রদের জন্যেই নয়, ইহুদি কম্যুনিস্টপন্থী ছাত্রদের জন্যেও, যারা নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারের জন্যে ইহুদিদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করত।

বহু বছর যাবৎ যে অধ্যাপক ইবেসুঞ্চ পড়াশোনা করেছেন, পড়িয়েছেন, পুরোন নথিপত্র তন্নতন্ন করে ঘেঁটেছেন, বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার জন্যে লিখেছেন এই সবের পেছনে ছিল এক অবিরত অনুসন্ধান স্পৃহা। এই অনুসন্ধান কোন ঐতিহাসিক দর্শন, কোন একটি সূত্রের জন্যে, যা ব্যাখ্যা করবে মানবসভ্যতা কোন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যুদ্ধের পেছনে মানুষের কোন প্রেরণা কাজ করে। একটা সময় ছিল যখন প্রফেসর বস্তুবাদী ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তিনি লুক্রেটিয়াস, দিদেরো, ভোগট, ফ্যুয়েরেবাক-দের ভক্ত ছিলেন। খুব অল্প সময়ের জন্যে কার্ল-মার্কসকেও বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু সেই কাঁচা বয়সটা খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায়। প্রকৃতির উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যবাদের সত্যতা কিংবা বিজ্ঞানের নিষেধাজ্ঞা বিশ্বাস করতে হলে তাদের চাক্ষুস দেখতে হবে এমন কোন মানে নেই। হ্যাঁ, প্রকৃতির একটা পরিকল্পনা আছে, যদিও আমাদের প্রায়ই মনে হয় সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই একটা গড্ডালিকা প্রবাহ। আমাদের প্রত্যেককেই প্রকৃতির প্রয়োজন ছিল : ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলমান, একজন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, একজন সার্লেমান, একজন নেপোলিয়ন, এমনকি একজন হিটলারেরও। কিন্তু কেন, কার সুবিধার জন্যে? বিড়ালকে দিয়ে ইঁদুর খাইয়ে, বাজপাখিকে দিয়ে খরগোশ শিকার করিয়ে কিংবা সঙ্ঘবদ্ধ পোলিশ ছাত্রদের দ্বারা ইহুদিদের আক্রান্ত করিয়ে ঈশ্বরের কিই বা লাভ?

ইদানিং প্রফেসর ইতিহাস বিষয়ে পড়াশোনা করা একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর আসল উৎসাহ জীববিজ্ঞান এবং প্রাণীবিজ্ঞানে। পশু-পাখির বিষয়ে তিনি অনেকগুলি বই সংগ্রহ করলেন। যদিও তিনি গ্লুকোমায় ভুগছিলেন, এবং ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় সম্পূর্ণ হারিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র কিনলেন। তাঁর এই পড়াশোনা কোন পেশাদারী কারণে নয়। নিজের নৈতিক উন্নতির জন্যেই পড়তেন, যেমন ধার্মিক ছেলেরা মাঝা দুলিয়ে সুর করে ট্যালমুড পাঠ করে। তিনি কখনও নিজের একটা দাড়ি উপড়ে কাঁচের স্লাইডে রেখে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রত্যেকটি চুলের নিজস্ব জটিল আকৃতি আছে। একটা পাতা, পেঁয়াজের একটা খোসা, টেকলার ফুলের টবের এক চিলতে মাটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে নিজেদের সৌন্দর্য এবং সামঞ্জস্য প্রকাশ করত যা দেখে অধ্যাপকের মন উজ্জীবিত হয়ে উঠত। অধ্যাপক ইবেসুঞ্চ অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বসতেন আর ক্র্যানারি পাখিগুলি গান গাইত, চন্দনাগুলি কিচির-মিচির করত, কথা বলত কিংবা চুমু খেত, টিয়াগুলি বকবক করত আর টেকলার গ্রাম্য ভাষায় ওরা পরস্পরকে বাঁদর, বদমাস, রাক্ষস বলে গালাগাল দিত। ঈশ্বরের অশেষ বদান্যতার প্রতি বিশ্বাস জন্মানো সহজ নয়, কিন্তু তাঁর বিচক্ষণতার মহিমা ঝলমল করছে প্রতিটি ঘাসের পাতায়, পতঙ্গে, ক্ষুদ্রতম পোকায় কিংবা পুষ্পমুকুলে।

টেকলা ঘরে ঢুকল। তার ছোট্ট শরীর, মুখে দাগ, পাতলা চুল যাতে ধূসর এবং হলুদ খড়ের রঙের মিশ্রণ। তার পরনে ছিল রংচটা পোশাক, পায়ে খয়ে যাওয়া চটি। গালের হাড় উঁচু আর চোখ দুটি সামান্য ট্যাঁড়া এবং বেড়ালের চোখের মত সবুজ। একটা পা টেনে চলত। বাতের যন্ত্রণায় ভুগত এবং নিরাময়ের জন্যে হাতুড়ে ডাক্তারদের থেকে আনা মলম মাখত নিজের শরীরে। চার্চে গিয়ে তার উপাসনার গুরুদের উদ্দেশে মোমবাতি জ্বেলে দিত।

"আমি দুধ ফুটিয়ে রেখেছি," টেকলা বলল।

"আমার দুধের প্রয়োজন নেই," অধ্যাপক জানালেন।

"দুধের সঙ্গে সামান্য কফি মিশিয়ে দেব?"

"ধন্যবাদ টেকলা। আমার আপাততঃ কিছুই চাই না।"

"আপনার গলা শুকিয়ে যাবে।"

"কোথায় একথা লেখা আছে যে গলা ভেজা রাখতে হবে?"

টেকলা উত্তর দিল না, কিন্তু ঘর ছেড়ে গেল না। অধ্যাপকের পত্নী যখন মৃত্যুশয্যায়, টেকলা প্রতিজ্ঞা করেছিল সে অধ্যাপকের দেখাশোনা করবে।

কিছুক্ষণ পরে অধ্যাপক চেয়ার থেকে উঠে একটা বিশেষভাবে তৈরি বালিশের উপর বসলেন যাতে তাঁর অর্শের গোলযোগ না বাড়ে।

"তুমি এখনও এখানে, টেকলা? তুমি আমার মৃতা পত্নীর মতই একগুঁয়ে, তাঁর আত্মার শান্তি হোক।"

"অধ্যাপকের ওষুধ-খাওয়ার সময় হয়েছে," টেকলা জানাল।

"কিসের ওষুধ? বোকা মেয়েছেলে, কোন হাটই চিরকাল রক্তসঞ্চালন করতে পারে না।"

অধ্যাপক 'পোল্যান্ডের পাখি' বইটির খোলা পৃষ্ঠার উপর তার আতস কাঁচটি রেখে পাখিদের দেখতে গেলেন।

রাস্তার পায়রাদের খাবার খাইয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু ইচ্ছেমত ঘরের আনাচে কানাচে উড়তে পারে, খোলা খাঁচায় রাখা এমন এক ঝাঁক পাখি পোষা অনেক পরিশ্রম এবং দায়িত্বের কাজ। শুধু ঘর পরিষ্কার করলেই টেকলার পক্ষে লেঠা চুকে যায় না। এমন একটা দিন যায় না যেদিন কোন না কোন ঝামেলা তাকে পোয়াতে হয়নি। বই-এর তাকের পিছনে হয়ত একটা টিয়া পাখি আটকা পড়লো, তাকে উদ্ধার করতে হবে। পুরুষ পাখিগুলি যুদ্ধ করতো। মাদী পাখির নতুন পাড়া ডিমের হয়ত ক্ষতি হল। অধ্যাপক বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের আলাদা আলাদা ঘরে রেখেছিলেন, কিন্তু টেকলা অন্যমনস্ক হয়ে দরজা খোলা রেখে যেত। বসন্তকালে জানালা খোলা যেত না। পাখির বিষ্ঠার ঘরের বাতাসে বাসী অথচ মিষ্টি গন্ধের আমেজ। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী পাখিরা রাতে ঘুমোয়, কিন্তু এমন হত, একটা টিয়া হয়ত দুঃস্বপ্নে হঠাৎ জেগে গিয়ে অন্ধকার ঘরে অন্ধের মত উড়ে বেড়ালো, ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখা হত, তাতে পাখিটা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মরে না যায়। তা সত্ত্বেও, কয়েক দানা শস্যের বিনিময়ে এই পাখিরা প্রফেসর ইবেসুঝকে কি আনন্দই না দিত। একটা চন্দনা বহু শব্দ শিখেছিল, এমনকি সম্পূর্ণ বাক্যও। পাখিটা অধ্যাপকের মাথার ছোট্ট টাকে বসত, কানের লতি ঠোকরাতো, তারপর চশমাটার ডাটে উঠত, এমনকি অধ্যাপক যখন লিখতেন তখন তাঁর তর্জনীর ডগায় দাঁড়ির উপর খেলুড়েদের মত দাঁড়িয়ে থাকত। বহুদিনের পক্ষী বিষয়ক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক ইবেসুঝ নিশ্চিত হয়েছেন যে পাখিরা খুব জটিল, ওদের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব মহিমায় ভরপুর। বহু বছর যাবৎ পাখিদের নিরীক্ষা করেও ওদের উল্কট ভাবভঙ্গি দেখে তিনি আশ্চর্য হতেন।

অধ্যাপক বিশেষ খুশী হতেন কারণ এই প্রাণীর কোন ইতিহাস জ্ঞান নেই। যা ঘটে গেছে তা ওদের কাছে বজ্রপচা। সবরকম অভিযান, বিপজ্জনক কাজ ওরা নিমেষেই ভুলে যায়। প্রতিটি দিন একটি নতুন সূচনা। তবু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। অধ্যাপক দেখেছিলেন একটি পুরুষ টিয়াকে তার জোড়ার মৃত্যুতে শোকে রোগা হয়ে যেতে। তিনি পাখিদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন পরস্পরের প্রতি মিথ্যে ভালবাসা, ঈর্ষা, নিষেধ, এমনকি খুন ও আত্মহত্যার ঘটনা। ওদের তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন। ওদের ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুভূতি, সহজাত আবেগ, ডানার গঠন, ডিম পাড়া, পালক বদলানো কিংবা রং পাল্টানোর প্রণালী—এসবের পেছনে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলি কিভাবে? উত্তরাধিকারসূত্রে? ক্রোমোজোম, জীন্ এগুলিই বা কি?

স্ত্রী-র মৃত্যুর পরে অধ্যাপকের নিজের সাথে কিংবা বহুকাল আগে মরা গেছেন এমন লোকেদের সাথে কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছিলেন। তিনি ডারউইনকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, "না চার্লস, তোমার সূত্র খাটিয়ে এইসব ধাঁ ধাঁ মেলে না। তোমারটা দিয়েও নয়, মঁসিয়ে লামার্ক।"

সেইদিন দুপুরে ওষুধ খেয়ে অধ্যাপক তাঁর ব্যাগে ভরলেন তিসি, জনার, শুকনো মটর। ব্যাগ নিয়ে বাইরে গেলেন পায়রাদের খাওয়াতে। যদিও মে মাস, তবুও বৃষ্টি হয়েছিল এবং ভিস্টুলার দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। তখন বৃষ্টি থেমেছে, এবং সূর্যের আলো ঐশ্বরিক কুঠারের মত মেঘ চিরে নেমে এসেছে। অধ্যাপক আসার সাথে সাথেই পায়রার দল ঝাঁক বেঁধে হামলে পড়ল চারপাশ থেকে। তাড়াহুড়োয় কয়েকটা পায়রা অধ্যাপকের মাথার টুপিকে পাখার ঝাপটা মেরে প্রায় ফেলে দিচ্ছিল। তাঁর মনে পড়ল যে এত বড় দঙ্গলকে খাওয়ানোর মত খাবার তিনি সাথে আনেননি। তিনি খাওয়ারটুকু ছড়িয়ে দিলেন যাতে পাখিরা নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে, কিন্তু অল্পক্ষণেই তারা ঘন জটলা তৈরি করল। কেউ উড়ে অপরের পিঠে এসে নামল যাতে ভিড়ের মাঝে একটু ফাঁক খুঁজে পাওয়া যায়। এতবড় ঝাঁকের জন্যে রাস্তাটাও যথেষ্ট চওড়া নয়। "বেচারারা ক্ষুধার্ত," প্রফেসর নিজেকে বললেন। তিনি ভালভাবেই জানতেন তাঁর খাওয়ানোতে ওদের সমস্যা মিটবে না। ওদের যত খাওয়ানো হবে ওরা সংখ্যায় তত বাড়বে। তিনি পড়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার কোন জায়গায় পায়রারা দলে এত ভারী হয়েছিল যে ওদের সমগ্র ওজনে একটা বাড়ির ছাদ ধ্বসে পড়েছিল। দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করা অসম্ভব। কিন্তু তা বলে ত অধ্যাপক এই প্রাণীগুলিকে ক্ষুধার্ত রাখতে পারেন না।

অধ্যাপক ইবেসুঝ বাড়ীর বাইরের হল-এ ফিরে এলেন। সেখানে পাখির একবস্তা খাওয়ার রাখতেন। নিজের ব্যাগ ভরতে ভরতে বললেন, "আশা করি ওরা অপেক্ষা করবে।" তিনি বাইরে এসে দেখলেন পাখিরা তখনও অপেক্ষা করছে। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," বলেই তিনি অপ্রস্তুত হলেন কারণ তাঁর কথায় আস্তিকতার ইঙ্গিত ছিল। খাবার ছুঁড়ে দিতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর হাত কাঁপছিল এবং দানাগুলি তাঁর নিকটেই পড়ল। পায়রারা তাঁর কাঁধে এবং হাতে এসে বসল, ডানা ঝাপটে তাঁকে ঠোকরালো। একটা সাহসী পায়রা এসে খাবারের থলিটার ধারে উড়ে বসতে চেষ্টা করল।

হঠাৎ একটা পাথর এসে অধ্যাপক ইবেসুথের কপালে আঘাত করল। এক মুহূর্ত তিনি ব্যাপারটা টের পেলেন না। তারপরে আরো দু'টো পাথর তাঁকে আঘাত করল, একটা তাঁর কনুই-এ অন্যটা তাঁর গলায়। পায়রারা ঝাঁক বেঁধে উপরে উড়ল। কোনরকমে অধ্যাপক বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। স্যাকসান বাগান এবং মফস্বলে ইহুদিদের উপর ওতাদের আক্রমণের সংবাদ তিনি খবরের কাগজে প্রায়ই পড়ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। সেই মুহূর্তে তিনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারছিলেন না কোন্‌টা তাঁর পক্ষে বেশি ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল, কপালের আঘাত না লজ্জা। "আমরা কি এত নিচে নেমে গেছি," তিনি মৃদু স্বরে বললেন। টেকলা হয়ত জানালা দিয়ে দেখেছিল কি ঘটেছে। ও দু'হাত বাড়িয়ে অধ্যাপকের দিকে ছুটে গেল, রাগে জ্বলছে। গালাগালি এবং দিব্যি দিতে দিতে ও রান্নাঘরে ছুটে গেল ঠাণ্ডা জলে তোয়ালে ভিজিয়ে আনতে। অধ্যাপক মাথার টুপি সরিয়ে ফোলা জায়গাটায় হাত বোলাচ্ছিলেন। টেকলা ওঁকে শোয়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে কোটটা গা থেকে খুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। ওঁকে শুশ্রূষা করতে করতে টেকলা অনবরত অভিশাপ দিচ্ছিল। "ওদের শাস্তি দাও, ঈশ্বর। শাস্তি দাও, স্বর্গলোকের পিতা। ওরা যেন নরকে পুড়ে মরে। ওদের শরীর যেন পচে যায়। ওদের মড়ক লাগুক।"

"অনেক হয়েছে টেকলা, অনেক।"

"এটা যদি আমাদের পোল্যাণ্ড হয়, তাহলে এই দেশটার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলা উচিৎ।"

"পোল্যাণ্ডে অনেক ভাল লোকও আছে।"

"নিচু জাত, বেজ্মা, কুষ্ঠরোগা কুকুর।"

টেকলা বাইরে গেল, সম্ভবতঃ পুলিশ ডাকতে। অধ্যাপক শুনলেন ও প্রতিবেশীদের কাছে চিৎকার করছে, অভিযোগ করছে। কিছুক্ষণ বাদে সব নিস্তব্ধ। মনে হল ও পুলিশের কাছে যায় নি, কারণ শব্দ শুনে বোঝা গেল একাই ফিরেছে। ও রান্নাঘরে পায়চারী করতে করতে নিজের মনে অভিশাপ দিচ্ছিল। অধ্যাপক চোখ বন্ধ করলেন। "আজ না হয় কাল সব জ্বালা যন্ত্রণা নিজেকেই সহ্য করতে হবে," তাঁর মনে হল। "অন্যান্য বলির পাঁঠাদের চেয়ে আমার অবস্থা কোন অংশে ভাল? এটাই ইতিহাস, যা নিয়ে আমি চিরকাল ব্যাপৃত থেকেছি।"

একটা হিব্রু শব্দ যা তিনি বহুদিন ভুলে গেছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল : 'রেশারিম', অর্থাৎ শয়তান। শয়তানরাই ইতিহাস সৃষ্টি করে।

অধ্যাপক কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে শুয়ে রইলেন। এক মুহূর্তে তিনি খুঁজে পেলেন সেই উত্তর যা তিনি বহুরকাল যাবৎ হাতড়ে ফিরেছেন। নিউটন যে আপেলটিকে গাছ থেকে মাটিতে পড়তে দেখেছিলেন, একটা ওতোর ছোঁড়া পাথর তাঁর কাছে উন্মোচন করল ইবেসুথকে, সর্বকালের সত্য হিসেবে। প্রত্যেক যুগে জন্ম হয় সেই সময়ের উপযুক্ত অসাধু এবং রক্ত পিপাসু মানুষ। খলরা চুপ করে থাকতে পারে না। যুদ্ধ হোক কিংবা বিপ্লব, এক পতাকার নিচে মিলিত হয়ে তারা যুদ্ধ করুক কিংবা অন্য পতাকার নিচে, তাদের স্লোগান যাই হোক না কেন, তাঁদের উদ্দেশ্য এক—অমঙ্গল সৃষ্টি, পীড়ন, রক্তক্ষয়। একটিই প্রচলিত উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিলেন ম্যাসেডোনিয়ার আলেকজান্ডার এবং হ্যামিলকার, চেঙ্গিস খাঁ এবং সালেমান, টিমাইলনিটস্কি এবং নেপোলিয়ন, রোবসপিয়ের। অতি সরলীকৃত? মাধ্যাকর্ষের সূত্রও খুব সহজ ছিল, তাই সেটা আবিষ্কার করতে এত দেরী লেগেছে।

সন্ধে হয়ে এল। ভ্লাডিস্লাভ ইবেসুথ ঝিমোতে লাগলেন। ঘুমিয়ে পড়ার পূর্ব-মুহূর্তে তিনি নিজেকে বললেন, "তবুও, এই ব্যাপারটা এতটা সহজ নয়।"

সন্ধের সময়, টেকলা কিছুটা নতুন বরফ এনে অধ্যাপকের কপালে চাপালো। ওর ডাক্তার ডাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অধ্যাপক অনুমতি দিলেন না। ডাক্তার এবং প্রতিবেশীদের কাছে তিনি লজ্জায় পড়বেন। টেকলা ওঁর জন্যে কিছুটা ওটমিল তৈরি করল। সাধারণত রাতে শুতে যাওয়ার আগে অধ্যাপক প্রতিটি পাখির খাঁচা পরীক্ষা করতেন, নতুন জল ভরতেন, কিছু শস্যদানা এবং তরিতরকারী যোগ করতেন এবং বালি বদলে দিতেন। এই সন্ধ্যায় তিনি টেকলার ওপর এসব কাজের ভার ছেড়ে দিলেন। ও ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল। ওঁর শোবার ঘরে কয়েকটা টিয়াপাখি খাঁচায় রইল। অন্যরা পর্দার লাঠিতে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। প্রফেসর যদিও ক্লান্ত ছিলেন, তবুও সাথে সাথে ঘুমাতে পারলেন না। তাঁর ডান চোখের উপরের জায়গাটা ফুলে উঠেছিল। চোখের পাতা স্বাভাবিক নাড়তে পারছিলেন। আমি যেন সম্পূর্ণ অন্ধ না হয়ে যাই, পৃথিবীকে চালনা করে এমন শক্তিদের কাছে তিনি অনুনয় করলেন। অন্ধ হয়ে যাওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্নে দেখলেন বিচিত্র দেশ, এমন স্থান যা আগে কখনও দেখেননি, পাহাড়, উপত্যকা, বড় গাছে ছাওয়া বাগান এবং বিদেশী ফুলের কেয়ারী। "আমি কোথায় এসেছি?" স্বপ্নে নিজেকে প্রশ্ন করলেন। "ইটালীতে? পারস্যে? আফগানিস্থানে?" তাঁর পায়ের নিচে মাটি সরে

যাচ্ছিল, যেন তিনি উড়োজাহাজে যাত্রা করেছেন। তিনি অবশ্য উড়োজাহাজে যাচ্ছিলেন না। মনে হল শূন্যে ভাসছেন। "আমি কি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নাগাল ছাড়িয়ে এসেছি? কি ভাবে তা সম্ভব হল? এখানে কোন বাতাস নেই। আশা করি দম আটকে যাবে না।"

একবার জেগে উঠলেন কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে করতে পারলেন না কোথায় আছেন। কপালে বরফের পট্টিটা অনুভব করলেন। "আমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন?" তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর সব মনে পড়ল। "হ্যাঁ, শয়তানরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আমি ইতিহাসের নিউটনীয় সূত্র আবিষ্কার করেছি। আমার এতদিনের কাজ আবার নতুন করে লিখতে হবে।" হঠাৎ তিনি শরীরের বাঁ দিকে ব্যথা টের পেলেন। শুয়ে শুয়ে তিনি বুকের বেদনার স্পন্দন শুনতে লাগলেন। হার্ট এ্যাটাকের জন্যে বিশেষ বড়িগুলি পড়ার ঘরের ড্রয়ারে রাখা ছিল। স্তেফানী, তাঁর ভূতপূর্ব স্ত্রী, রাতে অসুস্থ হলে টেকলাকে ডাকার জন্যে তাঁকে একটা ছোট ঘন্টি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে চাইলেন না তিনি। এমনকি রাতের আলো জ্বালাতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্থ বোধ করছিলেন। টেকলা হয়ত সারাদিন কাজ করে এবং এই বিশ্রী অভিজ্ঞতার পর ক্লান্ত। গুণ্ডাদের আক্রমণে তাঁর চেয়ে ও বেশী মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। এই কয়েক ঘন্টা ঘুম ছাড়া ওর আর কিবা আছে? না কোনো স্বামী, না সন্তান, না আত্মীয় কিংবা বন্ধু। ওর জন্যে তিনি সব সম্পত্তি উইল করে দিয়েছেন। কিন্তু কতটুকু তার মূল্য? তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির দাম-ই বা কি? আর নতুন সূত্রটা...

এক সময় অধ্যাপকের মনে হল বুকে ছুরি মারার মত ব্যথাটা থিতিয়ে যাচ্ছে। তারপর তিনি প্রচণ্ডভাবে টের পেলেন তাঁর হৃদয়, ঘাড়, হাত এবং পাঁজরাগুলি কেটে টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তিনি ঘন্টিটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু সেটা পৌঁছনোর আগেই তাঁর আঙুলগুলি আড়ষ্ট হয়ে গেল। তিনি কোনদিন ভাবেন নি ব্যথা এত মর্মান্তিক রূপ নিতে পারে। মনে হচ্ছিল যেন তাঁর হৃদয়কে মুঠির মধ্যে আবদ্ধ করে চাপ দেওয়া হচ্ছে। দম আটকে হাঁপাতে লাগলেন। একটা শেষ চিন্তা তাঁর মনে এল। পায়রাগুলির কি হবে?

পরের দিন টেকলা যখন অধ্যাপকের ঘরে গেল, তখন তাঁকে প্রায় চিনতেই পারছিলেন না। যে দেহটা সে দেখল সেটা অধ্যাপকের নয়, বরং একটা বিস্মৃত পুতুলের পলিমাটির মত হলুদ, হাড়ের মত শক্ত, হাঁ করা মুখ, বেঁকে যাওয়া নাক, উর্দ্ধমুখী দাড়ি, একটি চোখের দুপাতা আটকানো, অপর চোখটি অর্ধনিমিলীত এবং অন্য জগতের হাসি মাখানো। মোমের মত আঙুলসমেত একটি হাত বালিশের উপর ছড়ানো।

টেকলা চিৎকার করতে লাগল। প্রতিবেশীরা ছুটে এলো। কেউ একজন এ্যাম্বুলেন্স ডেকেছিলো। একটু পরেই এ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন-এর শব্দ শোনা গেল, সহকারী ডাক্তার ঘরে ঢুকে বিছানার পানে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, "আমরা আর ওঁর কোন সাহায্যে লাগবো না।"

"ওরা ওকে খুন করেছে, খুন করেছে," টেকলা কেঁদে ফেলল। "ওকে পাথর ছুঁড়েছে। ওরা মারা পড়বে, ওরা খুনী, ওদের উপর কালো অভিশাপ নামুক, ওদের কলেরা হোক, নোংরা শয়তানগুলি।"

"ওরা কারা?" ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

"ওরা আমাদের পোল্যাণ্ডেরই গলাকাটা খুনী, গুণ্ডা, জানোয়ার, কসাই,"

টেকলা উত্তর দিল।

"উনি কী ইহুদি?"

"হ্যাঁ, ইহুদি।"

"আচ্ছা..."

জীবিতকালে প্রায় বিস্মৃত, মৃত্যুতে প্রফেসর খ্যাতিলাভ করলেন। ওয়ারশ' বিশ্ববিদ্যালয়, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঐতিহাসিক সমিতি, এবং বিভিন্ন সংস্থা, গোষ্ঠী এবং সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা এসে উপস্থিত হলেন। ক্র্যাকো, লেমবার্গ, ভীলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ তারবার্তা পাঠালো যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করার জন্যে তারা তাদের প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে। অধ্যাপকের ঘর ফুলে ভরে গেল। অধ্যাপক, ছাত্র এবং লেখকেরা পালা করে তাঁর মরদেহ সম্মানসূচক পাহারা দিতে লাগলেন। যেহেতু অধ্যাপক ইহুদি ছিলেন, ইহুদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমিতি দুই ব্যক্তিকে পাঠালো তাঁর মৃতদেহের সামনে পবিত্র নামগান পাঠ করতে। ভীত সচকিত পাখিগুলি দেওয়াল থেকে দেওয়ালে, বইএর এক তাক থেকে অন্য তাকে উড়ে বেড়ালো, কার্নিশ, বাতিদান এবং জামাকাপড়ের তাকে থিতু হয়ে বসার চেষ্টা করল। টেকলা ওদের নিজস্ব খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ওরা টেকলার থেকে দূরে উড়ে গেল। অন্যমনস্কতায় খুলে রাখা জানালা দিয়ে উড়ে কেউ কেউ পালিয়ে গেল। একটা টিয়া সতর্ক সুরে বার বার একই শব্দ আউড়ে গেল। একনাগাড়ে টেলিফোন বাজছিল। ইহুদি সম্প্রদায়ের অফিসাররা গোরস্থানের জমির জন্যে আগাম টাকা জমা দেওয়ার দাবী জানাচ্ছিল, এবং একজন পোলিশ মেজর, প্রফেসরের প্রাক্তন ছাত্র, তাদের এই

অযৌক্তিক দাবীর ফল কতটা মারাত্মক হবে সে বিষয়ে ভয় দেখাচ্ছিলেন।

পরের দিন সকালে ইহুদি সংকার সমিতির একটা গাড়ির রাস্তা ধরে এগিয়ে এলো, বাহন ঘোড়াগুলি কালো কাপড় এবং ঠুলিতে ঢাকা, শুধুমাত্র চোখের ফোকরদুটো খোলা। কফিনটা যখন বাড়ির বাইরে আনা হল এবং শবযাত্রার মিছিল ঢালু রাস্তা ধরে টামকী এ্যাভেনিউর এবং পুরোন শহরের দিকে অগ্রসর হল, ঝাঁক ঝাঁক পায়রা বাড়ির ছাদগুলির উপর উড়তে লাগল। ওরা সংখ্যায় এত বেড়ে গেল যে সরু রাস্তার দু পাশের বাড়িগুলির মাঝে আকাশ ওরা ঢেকে ফেলল। এর ফলে গ্রহণের সময়ের মত দিনের আলো অন্ধকারের রূপ নিল। ওরা থামল, মুহূর্তের তরে বাতাসে ঝুলে রইল, তারপর একযোগে মিছিলকে চক্কর দিয়ে, মিছিলের গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে চলল।

যে সব প্রতিনিধিরা গোলাকৃতি ফুলের বড় মালা নিয়ে শবযানকে অনুসরণ করছিলেন, আশ্চর্য হয়ে উপরে তাকালেন। রাস্তার বাসিন্দা, বৃদ্ধ এবং রুগ্নরা যারা অধ্যাপককে অন্তিম সম্মান জানাতে এসেছিলেন, বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন। বাইবেলের যুগের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা তাঁদের চোখের সামনে ঘটছিল। টেকলা, তার কালো শালের আড়াল থেকে হাত দু'টো উপরে তুলে চিৎকার করে উঠল, "যীশু।"

শবযান ব্রোয়ারনা স্ট্রীটে প্রবেশ করা পর্যন্ত ঝাঁক ঝাঁক পায়রা মিছিলে সামিল থাকল। চক্কর দেওয়ার সময় ওদের পাখা, সূর্যের আলো এবং ছায়ার পরম্পরায় একবার রক্তিম এবং পরক্ষণেই সীসার মত কালো বর্ণ ধারণ করছিল। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, পাখির দল ক্রমবং ভরে মিছিলের সাথেই চলতে চাইছে, একটুও আগে পিছে নয়। ফুরমানস্কা এবং মারিয়েন স্ট্যাডট-এর সংযোগস্থল পর্যন্ত পায়রার ঝাঁক মিছিলকে সঙ্গ দিল। তারপর শেষবারের মত একটা চক্কর দিয়ে ওরা একসাথে ফিরে গেল—একঝাঁক পাখাওয়ালা অতিথি যারা তাদের মঙ্গলময় প্রভুকে অন্তিম শয়ানে পৌঁছে দিতে এসেছিল।

পরের দিন সকাল শুরু হল। যে কোন শরৎকালের দিনের মত এবং বৈচিত্র্যহীন। আকাশ ভং ধরা এবং নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। চিমনির থেকে নির্গত ধোঁয়া নিচের দিকে নেমে টালির ছাদে জমা হচ্ছিল। পাতলা বৃষ্টি পড়ছিল, ফোঁটাগুলি সূঁচের মত ধারালো। গতরাতে প্রফেসরের বাড়ির দরজায় কেউ একটা স্বস্তিকা চিহ্ন এঁকে গেছে। টেকলা এক ব্যাগ ভর্তি খাবার নিয়ে বেরিয়ে এলো, কিন্তু মাত্র কয়েকটি পায়রা নিচে উড়ে এল। ওরা দ্বিধাগ্রস্তভাবে খাওয়ার খুঁটছিল, ইতিউতি চাইছিল যেন পক্ষীসমাজের কোন অলিখিত নিষেধাজ্ঞার ভয়ে ওরা ভীত। ময়লা ফেলার স্থান থেকে পোড়া এবং পচা আবর্জনার গন্ধ ভেসে আসছিল। আসন্ন ধ্বংসের পঙ্কিল দুর্গন্ধ।

অনুবাদ : বৌধায়ন মুখোপাধ্যায়

[আইজাক বশেভিস সিঙ্গার ইডিশ ভাষার লেখক। ইডিশ পূর্ব ইউরোপের ইহুদি সম্প্রদায়ের ভাষা। যে ভাষা আমাদের সংস্কৃত ভাষার মত মৃতপ্রায়। বেশিরভাগ ইহুদি লেখক ইংরেজি কিংবা হিব্রু ভাষায় লেখেন—যেমন সল বেলো, কিংবা আরো অনেকে যাঁরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। কিন্তু সিঙ্গার ইডিশ ভাষাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। সারা জীবন এই ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করে গেছেন। এতই আকর্ষক ছিল তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও লেখন-শৈলী যে নোবেল-প্রাইজ কমিটি এই স্বল্প পরিচিত লেখককে উপেক্ষা করতে পারেনি। ১৯৭৮ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বহু ছোট-গল্প ও উপন্যাসের জনক তিনি। লেখার বিষয়বস্তু ইহুদি জীবনের বৃত্তান্ত, ঔতিহ্য ও আধিভৌতিক চরিত্রের সমাবেশ, পূর্ব ইউরোপের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইহুদি সমাজের আচার-আচরণ, এই জাতির উপর জার্মানির অত্যাচার এবং বিভিন্ন দেশে এই জাতির গ্লানিময় অবস্থান। সিঙ্গার নিজেও পোল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় পালিয়ে আসেন ১৯৩৫ সালে। কিন্তু মার্কিন নাগরিক হয়েও তিনি হিব্রুমূল জীবনযাপন করেছেন আমৃত্যু। ক্রমাগত লিখে গেছেন ইডিশ ভাষায়, ইহুদি সমাজ ও চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে। 'পায়রা' গল্পটি তাঁর একটি বিখ্যাত-তম গল্প।]

শেষ বিচার

কারেল চাপেক

কুখ্যাত খুনী কুগলার, একাধিক পরোয়ানা আর পুলিশ ও গোয়েন্দাদের একটা পুরো বাহিনী যাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে ঠিক করেছিল ধরা সে দেবে না। দেয়ওনি — জীবিত অবস্থায়। তার নটা খুনের শেষটায় ছিল এক পুলিশকে গুলি করা— যে তাকে ধরতে এসেছিল। পুলিশটি মারা গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আগে সাত-সাতটা বুলেটে সে ঝাঁঝরা করেছিল কুগলারকে। সেই সাতটার মধ্যে, তিনটে ছিল মারাত্মক। মৃত্যু কুগলারের এমনই দ্রুত করে এল যে তাকে কোনো যন্ত্রণা বোধ করতে হল না। ফলে, মনে হল যেন কুগলার পার্থিব বিচারের হাত থেকে পালাল।

মহাশূন্যের অপর পারে ধূসর, বিষণ্ণ, জনমানবহীন পরলোকের অবস্থা দেখে তার দেহত্যাগী আত্মার অবাক হবার কথা, কিন্তু তা হয়নি। যে মানুষটার দু-দুটো মহাদেশের জেলে কাটানোর অভিজ্ঞতা আছে। তার কাছে এই পরলোক যেন এক নতুন পরিবেশ। কুগলার আশা করেছিল শুধুমাত্র এই লোকেও সে কাটিয়ে দেবে কষ্টে-সৃষ্টে, একটু সাহসে ভর করে, যেমন সে কাটিয়েছে মর্ত্যে। অবশেষে কুগলারের অবধারিত সেই শেষ বিচারের দিন এল।

স্বর্গে তো সর্ব্বদাই 'জরুরী অবস্থা' জারী থাকে, অতএব, কুগলারকে হাজির করা হল তিন বিচারকের এক বিশেষ আদালতে, তার আগের লোকে যেমন হত তেমন কোন জুরীর সামনে নয়। আদালত পৃথিবীর আদালতগুলোর মতই সাধারণ সাজানো, কেবল একটাই যা তফাত :— সাক্ষীর শপথের কোনো ব্যবস্থা নেই। এর কারণ সময়ে বোঝা যাবে।

বিচারকরা বৃদ্ধ, যোগ্য প্রশাসকের মত দেখতে কঠোর, অনাড়ম্বর একঘেঁয়েমিতে বিরসবদন। কুগলার বিরক্তিকর সচরাচর, আচার-প্রথা মেনে বলল—ফার্দিনান্দ গলার বেকার, জন্ম এত তারিখে, মৃত্যু...এখানে দেখা গেল কুগলার তার নিজের মৃত্যুর তারিখ জানে না। তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারল এই না-জানা তার পক্ষে ক্ষতিকারক হল বিচারকদের চোখে ; তার সাহায্য করার সদিচ্ছা ফিকে হয়ে গেল।

তুমি দোষী না নির্দোষ? মুখ্য বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'নির্দোষ'—বলল কুগলার, অননুতপ্ত।

'প্রথম সাক্ষীকে আনা হোক'—বিচারক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন।

কুগলারের বিপরীতে আবির্ভূত হলেন অসাধারণ এক ভদ্রলোক, রাজকীয়, শ্মশ্রুমণ্ডিত, সোনালী নক্ষত্র-খচিত এক আলখাল্লা পরিহিত।

তাঁর প্রবেশে বিচারকরা উঠে দাঁড়ালেন। এমনকি কুগলারও, অনিচ্ছায়, কিছু বা বিস্ময়ে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসার পরেই তবে বিচারকরা আবার বসলেন।

'সাক্ষী', মুখ্য বিচারক শুরু করলেন, "হে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর, এই আদালত আপনাকে ডেকে এনেছে এই আসামী-কুগলার, ফার্দিনান্দের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় আপনার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য। যেহেতু আপনিই পরম সত্য, তাই আপনাকে শপথ নিতে হবে না। অবশ্য শুনানীর স্বার্থে আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে বিচার্য বিষয়ের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকতে, বিশদ বর্ণনায় না যেতে, অবশ্য যদি সে বর্ণনায় এই মামলার কোনো যোগাযোগ না থাকে।

এবং তুমি, কুগলার, সাক্ষীর কথায় বাধা দিও না। উনি সব জানেন, অতএব কোনো কিছু অস্বীকার করে লাভ নেই।

'অতএব হে সাক্ষী মহাশয়, আপনি এখন শুরু করতে পারেন।'

বলে, মুখ্য বিচারক তাঁর চশমা খুলে সামনের টেবিলে ঝুঁকে আরাম করে বসলেন, বোঝা গেল সাক্ষীর এক দীর্ঘ বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি বিচারকদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ যিনি, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। লিপিকার দেবদূত জীবনের মহাগ্রন্থ খুললেন।

ঈশ্বর, সাক্ষী, লঘু কেশে, শুরু করলেন :—

'হ্যাঁ। কুগলার ফার্দিনান্দ। ফার্দিনান্দ কুগলার, এক কারখানা-শ্রমিকের ছেলে, প্রথম থেকেই ছিল এক খারাপ অবাধ্য শিশু। মাকে খুবই ভালবাসত, কিন্তু তা দেখাতে পারত না, ফলে আরো উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া হয়ে উঠল। যুবক, তুমি সবাইকে জ্বালিয়েছো। মনে পড়ে যখন তোমার বাবা তোমার পাছায় চড় মারতে গিয়েছিলেন তুমি তার বুড়ো আঙুল কামড়ে দিয়েছিলে। নোটারীর বাগান থেকে একটা গোলাপ চুরি করেছিলে?'

'সে গোলাপটা তো তহশীলদারের মেয়ে ইরমা—তার জন্যে—কুগলার বলল।

'সে জানি' ঈশ্বর বললেন। 'তখন ইরমার বয়স ছিল সাত। পরে তার কি হয়েছিল খবর রেখেছিলে।

'না, রাখিনি।'

'সে মিলমালিকের ছেলে অদকারকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু তার থেকে ইরমা যৌনরোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তারপর গর্ভপাতের সময় মারা যায়। রুডি জারুবাকে মনে পড়ে তোমার?'

'তার কি হয়েছিল?'

'কেন, সে নেভিতে যোগ দিয়েছিল আর তারপর বোম্বেতে এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। তোমরা দুটোতে সারা শহরের সব থেকে খারাপ ছেলে ছিলে। কুগলার, ফার্দিনান্দ তার দশ বছর বয়সের আগেই চুরি করা ধরেছিল, আর অনর্গল মিথ্যে বলত। কুসদও ছিল—যেমন বুড়ো গ্রীবল্, মাতাল, কুড়ে, ধার করে চলত। যাই হোক কুগলার অবশ্য অনেকবার তার খাবারের ভাগ গ্রীবল্‌কে দিত।

মুখ্য বিচারক হাতের ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলেন এর অনেকটাই হয়তো অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু কুগলার নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত প্রশ্ন করল—'আর...গ্রীবলের মেয়ের কি হয়েছিল?'

'মেরী?'—ঈশ্বর বললেন—'সে তো অনেক নীচে নেমেছিল। চোদ্দ বছরে বিয়ে করে, কুড়িতে মারা যায়। যন্ত্রণার মধ্যে তোমার কথা তার মনে পড়ে। চোদ্দ বছরে তুমি প্রায় একটি পাঁড় মাতাল হয়ে উঠেছিলে, আর প্রায়ই বাড়ি থেকে পালাতে। তোমার বাবার মৃত্যু হয় বলা যায়, দুঃখে ও দুশ্চিন্তায়, তোমার মায়ের দৃষ্টি ক্ষীণ হয় কেঁদে কেঁদে। তোমার পরিবারে তুমি অসম্মান এনেছ, আর তোমার বোন, তোমার ছোট্ট সুন্দর বোন মার্থা, সে কখনো বিয়েই করল না। কেননা যুবকই কখনো এলো না এক চোরের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করতে। সে এখনো বেঁচে, নিঃসঙ্গ, গরীব, গভীর রাত পর্যন্তও সেলাই করে। কৃপণতা তাকে নিঃশেষ করেছে, দরিদ্রদারদের করুণা তার আত্মসম্মানে ঘা দিয়েছে।'

'ঠিক এখনই সে কি করছে?'

'ঠিক এই মুহূর্তে সে উলফের দোকানে সুতো কিনছে। ঐ দোকানটা মনে পড়ে তোমার? একবার, যখন তোমার দু বছর বয়স, তুমি ওখানে একটা রঙীন কাচের মার্বেল কিনেছিলে। সেদিনই তুমি ওটা হারিয়েছিলে, আর কখনো খুঁজে পাওনি। রাগে দুঃখে কেমন কেঁদেছিলে মনে আছে?'

'কি হয়েছিল মার্বেলটার?'—কুগলার উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'ওটা তো নিকাশী মুখ দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছিল নর্দমায়। আর, ঘটনা হচ্ছে, ওটা এখনো ওখানেই পড়ে আছে, তিরিশ বছর পরেও। ঠিক এখনই ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে আর তোমার মার্বেল ঠাণ্ডা জলের তোড়ে কাঁপছে।

কুগলার মাথা নামিয়ে নিল, এই সদ্য উন্মোচিত মতের চাপে।

কিন্তু মুখ্য বিচারক তাঁর চশমাটিকে আবার তাঁর নাকে লাগিয়ে নিলেন এবং মৃদু কণ্ঠে বললেন, "হে সাক্ষী, এই মামলা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের। অভিযুক্ত কি খুন করেছে?'

তখন সাক্ষী মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন 'ও নয়জনকে খুন করেছে। প্রথম জনকে একটা ঝগড়া-মারামারির মধ্যে খুন করেছিলো আর সেই অপরাধে জেল খাটার সময় ও পুরোপুরি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ওর দ্বিতীয় শিকার ওর অবিশ্বাসী প্রেমিকা। এই অপরাধে ওর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল, কিন্তু ও পালিয়েছিল। তৃতীয়জন এক বৃদ্ধ, যার সর্বস্ব ও ডাকাতি করেছিল। চতুর্থজন একজন রাতপাহারাদার।'

'তাহলে সে মারা গিয়েছিল?' কুগলার প্রশ্ন করল।

'তিন দিন ধরে তীব্র যন্ত্রণা ভোগের পরে সে মারা গিয়েছিল, ঈশ্বর বললেন।' আর রেখে গিয়েছিল ছয়টি শিশু। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শিকার হল এক বয়স্ক বিবাহিত দম্পতি। ও ওদের একটা কুঠার দিয়ে হত্যা করেছিল, আর তারপর মাত্র বোলো ডলার পেয়েছিল, যদিও তারা কুড়ি হাজার লুকিয়ে রেখেছিল।'

কুগলার লাফিয়ে উঠল।

'কোথায়'?

'তোষকে', ঈশ্বর জানালেন। তোষকের মধ্যে একটা রেশমী থলেতেই ওরা তাদের লোভ ও কৃপণতার সঞ্চয় লুকিয়ে রেখেছিল। সপ্তম মানুষটিকে ও হত্যা করেছিল আমেরিকায়। ওর দেশের লোক, এক বিভ্রান্ত, নির্বান্ধব অভিবাসী।'

'ওঃ, তাহলে তোষকেই ছিল', ফিসফিসিয়ে কুগলার, বিস্ময়ে।

'হ্যাঁ,' বলে বলেন ঈশ্বর। 'অষ্টম ব্যক্তিটি এক পথ-চলতি লোক, কুগলার যখন পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিল, ওর সামনে পড়ে যায়। সে সময়ে কুগলার পেরিস্টাইটিসের যন্ত্রণায় জ্বলছিল। যুবক, তুমি মারাত্মক কষ্টে ছিলে। নবম এবং শেষ-শিকার হল এক পুলিশ, যে কুগলারকে মেরে ফেলেছিল, যখন কুগলার ওকে গুলি করেছিল।' 'আর সেই আসামী কেন খুন করত?' মুখ্য বিচারপতি জানতে চাইলেন।

'কারণ সেই একই, অন্যদের খুনীদের মত,' ঈশ্বরের জবাব। 'ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অর্থ লোলুপতার থেকে; কখনো ইচ্ছাকৃত কখনো ঘটনাচক্রে—কোনোটা আনন্দে, কোনোটা প্রয়োজনে। ও মহিলাদের প্রতি নম্র ছিল, পশুদের প্রতি কোমল, আর কথা রাখত। আমি কি ওর সুকৃতিগুলো বর্ণনা করব?

'ধন্যবাদ আপনাকে', বললেন মুখ্য বিচারক', কিন্তু তার দরকার হবে না। আত্মপক্ষ সমর্থনে আসামীর কি কিছু বলার আছে?'

'না'। কৃপলারের উত্তর, সত্যি অনাগ্রহজাত।

'এই আদালতের বিচারকরা এখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সারবেন।' মুখ্য বিচারকের ঘোষণা, এবং তাঁরা তিনজন এজলাস ছেড়ে ভিতরে গেলেন।

আদালত কক্ষে কেবল ঈশ্বর এবং কৃপলার।

"ওরা কারা?"—মাথা নাড়িয়ে চলে যাওয়া বিচারকদের দিকে ইঙ্গিত করে কৃপলার জিজ্ঞাসা করল।

'তোমার মতই মানুষ', ঈশ্বরের উত্তর। ওরা পৃথিবীতে বিচারক ছিলেন, তাই এখানেও তাই।

তার আঙুলের ডগা ঠোকরাল কৃপলার। 'আমি আশা করেছিলাম...মানে...আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য বিশেষ-ভাবিনি। তবে, ভেবেছিলাম...আপনিই বিচার করবেন, কেননা—'

'কেননা আমি ভগবান'। কথাটা শেষ করলেন সেই রাজপুরুষ। 'কিন্তু ঠিক এই কারণেই তো...তুমি বুঝতে পারো না? যেহেতু আমি সব জানি, আমি বিচার করতে পারি না। সেটা ঠিক হবে না। যাই হোক, তুমি জানো এবার কে তোমায় ধরিয়ে দিল?

'না, জানি না', বলল, কৃপলার, বিস্মিত।

'নাকি ওই পরিবেশিকাটি। মেয়েটা ঈর্ষা থেকে এ কাজ করল।'

'মাপ করবেন', কৃপলার সাহস করে বলল, কিন্তু আপনি কোনো-কাজের নয় লোকটা টেডি, যাকে আমি চিকাগোতে গুলি করেছিলাম—তার কথা বলতে ভুলেছেন।'

'মোটেই না,' ঈশ্বর বললেন। 'সে সেরে উঠেছিল, এখনো বেঁচে আছে। আমি জানি সে একজন চর, কিন্তু অন্যদিকে সে একজন ভালো মানুষ বাচ্চাদের খুব ভালোবাসে। কোনো মানুষকেই একেবারে নিষ্কর্মা ভাবা উচিত নয়।'

'কিন্তু আমি এখনো বুঝছি না আপনি কেন বিচারক নন,' কৃপলার চিন্তান্বিত স্বরে বলল।

'কারণ আমার জ্ঞান অসীম। বিচারকেরা যদি সব জানত, সব কিছু জানত, তাহলেও ওরাও সব বুঝতে পারত। ওদের হৃদয় বিদীর্ণ হত, ব্যথায়। ওরা বিচার করতে বসতে পারত না, যেমন আমিও পারি না। এখন যা দাঁড়িয়েছে, ওরা তোমার কেবল অপরাধগুলো জানে। আমি তোমার সবটা জানি। সম্পূর্ণ কৃপলার জানি। আর তাই আমি বিচার করতে পারি না।'

'কিন্তু ওরা কেন বিচার করবে, ওই এক লোকগুলো যারা পৃথিবীতেও বিচার করে?'

'কারণ মানুষ মানুষেরই। তুমি যেমন দেখছ, আমি তেমনই, কেবলই সাক্ষী। কিন্তু রায় স্থির করে মানুষই, এমনকি স্বর্গেও। আমার বিশ্বাস কর, কৃপলার, এমনটাই হওয়া উচিত। মানুষ স্বর্গীয় বিচারের যোগ্য নয়। সে কেবল অন্য মানুষেরই বিচার্য হতে পারে।

তখনই ফিরে এলেন তিনজন, তাঁদের আলোচনা সেরে।

গম্ভীর স্বরে মুখ্য বিচারক ঘোষণা করলেন, 'বারংবার খুন, নরহত্যা, ডাকাতি, আইনের প্রতি অসম্মান, বেআইনি অস্ত্র বহন করা এবং একটি গোলাপ চুরি করার অপরাধে কৃপলার ফার্দিনান্দকে এতদ্বারা যাবজ্জীবন নরকবাসের সাজা দেওয়া হল। এই শাস্তি অবিলম্বে শুরু হবে।

'পরের মামলা : টরেন্স, ফ্রাংক।'

'আসামী হাজির?'

অনুবাদ : নীরজা

একাকিনী

মন্নু ভাণ্ডারি

সোমা পিসিমা বুড়ি হয়েছেন।

সোমা পিসিমা স্বামী-পরিত্যক্তা।

সোমা পিসিমা একা।

সোমা পিসিমার জোয়ান ছেলেটা মরে যেতে তাঁর যৌবনটাই যেন শুকিয়ে গেল। ছেলের মৃত্যুতে এমন আঘাত পেয়েছেন তাঁর স্বামী যে তিনি স্ত্রী, ঘর-সংসার সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তীর্থবাসী হয়েছেন। পরিবারে আর এমন কেউ ছিল না যে পিসিমার নিঃসঙ্গতাকে দূর করতে পারে। পেছনের বিশ বিশটা বছর তাঁর জীবনের এই একঘেঁয়েমিতে কোনও রকম ব্যতিক্রম হয়নি, কোনও পরিবর্তন আসেনি। এমনিতে প্রতি বছর একটা মাসের জন্য স্বামী তাঁর কাছে এসে থাকেন, তবে সোমা পিসিমা কোনও দিন স্বামীর এই আসার আশায় বসে থাকেন না, তাঁর পথ চেয়ে থাকেন না। স্বামী যতদিন কাছে থাকেন, মনটা তাঁর আরও কেজার হয়ে থাকে, কারণ স্বামীর স্নেহহীন আচরণের অঙ্কুশ তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে অবাধ গতিতে বয়ে চলা স্বচ্ছন্দ জীবনপ্রবাহে ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলে। তখন তাঁর এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা সব বন্ধ হয়ে যায়। মুখে দুটি মিষ্টি কথা বলে সোমা পিসিমার হাতে এমন একটি সম্বল ধরিয়ে দিয়ে যাবেন যাকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর বিচ্ছেদের এগারোটি মাস কাটিয়ে দিতে পারেন—সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দিয়ে তাও হয় না। এই পরিস্থিতিতে পিসিমাকে তাঁর পাড়াপড়শিদের নিয়েই থাকতে হয়। কারও বাড়িতে মুণ্ডনের অনুষ্ঠান হোক কি জাতকষ্ঠীর পরব হোক, পৈতে হোক কি বিয়েশাদি হোক কিংবা মৃত্যুশোকই হোক, সোমা পিসিমা সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হন আর সেখানে বুক দিয়ে পড়ে এমন খাটাখাটুনি করেন যেন পরের বাড়িতে নয়, নিজের বাড়িতেই খাটছেন।

ইদানীং সোমা পিসিমার স্বামী বাড়ি এসেছেন আর এই একটু আগেই তাঁর সঙ্গে পিসিমার একটু ঝকাঝকি হয়ে গেছে। পিসিমা উঠোনে বসে রোদ পোয়াচ্ছেন, পাশের তেলের বাটি থেকে তেল নিয়ে হাতে মালিশ করছেন আর গজর গজর করে চলেছেন। এই একটি মাস তাঁর আর সব অবয়ব শিথিল হয়ে পড়ে বলে শুধু জিবটাই তাঁর সবচেয়ে বেশি সচল ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঠিক তখনই রাধা বউদি একখানি ছেঁড়া শাড়ি আর কিছু পাঁপড় হাতে করে উপর থেকে নেমে আসে।

—কী হয়েছে গো পিসিমা, অত বকবক করছ কেন? সন্ন্যাসী ঠাকুর আবার কিছু বলেছেন নাকি?

—আরে আমি কোথাও যাই সেটাই ওঁর ভালো লাগে না। গেল কাল ওই মোড়ের কিশোরীলালের ছেলেটার মুণ্ডন ছিল, যতো জ্ঞাতিগুষ্টি সব্বার নেমন্তন্ন ছিল। আমি তো জানতাম যে পরস্পর গরমে মুণ্ডনে আত্মীয়স্বজন গুষ্টিশুদ্ধ সকলকে নেমন্তন্ন করেছে বটে, কিন্তু ক্রিয়াকর্ম সামলানো ওই সব নতুন নতুন কনেবউদের দিয়ে হবে না, তাই তাড়াতাড়ি চলে গেলাম। হলও যা ভেবেছি তাই।—বলতে বলতে পিসিমা এগিয়ে এসে রাধার হাত থেকে পাঁপড়গুলো নিয়ে শুকোতে মেলে দিতে থাকেন।

—একটা কাজও ঠিকমতো হচ্ছিল না। বাড়িতে বড়ো বুড়ো কেউ থাকলে তবে তো বলে দেবে কিংবা আগে এসব করে থাকলে তবে তো জানবে। গীত গাইতে এসেছিল যে মেয়েরা তারা মুণ্ডনে গেয়ে যাচ্ছিল বিয়ের বন্না-বন্নী গীত। শুনে আমার তো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল। —সে সব কথা মনে পড়তেই কিছুক্ষণ আগেকার তাঁর সব দুঃখকষ্ট আর রাগ আক্রোশ গলে জল হয়ে গেল। সহজ স্বাভাবিক গলায় তিনি বলে চললেন—ওদিকে ভিয়েনে আজব তামাশা—সিঙাড়াগুলো সব কাঁচা কাঁচাই নামিয়ে নিয়েছে আর এত এত বানিয়েছে যে দুবার করে খাইয়ে দিতে পারবে অথচ ওদিকে গোলাপজামে এতই কম যে একপাতে দিতেই ফুলোবে না। তক্ষন তক্ষুনি ময়দা মেখে নতুন গোলাপজাম বানালাম। বউ দুটি আর কিশোরীলাল বেচারা তো এত সুখ্যাতি করছিল যে কী বলব। বলছিল—'মা গো, তুমি না থাকলে আজ কী যে কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। মা, তুমি আমাদের মান রেখেছ'। আমি বললাম যে আরে নিজেদের কাজে আমি আসব না তো কি বাইরের লোক আসবে। আজকাল তো ওঁর জন্য রাঁধাবাড়ার কাজ থাকে, তা নইলে আমি তো সেই সাতসকালেই চলে আসতাম।

—সন্ন্যাসী ঠাকুরের মেজাজটা তা হলে বিগড়াল কেন? তোমার এই আসা যাওয়াটা কি তাঁর ভালো লাগে না পিসিমা?

—এমনিতেই তো কোথাও আমি আসি যাই সেটা ওঁর ভালো লাগে না, তার উপরে কাল কিশোরীলালের বাড়ি থেকে কেউ আমাকে নেমন্তন্ন করতে আসেনি। আরে আমি তো বলি

ঘরের লোককে আবার নেমন্তন্ন কিসের। ওরা তো আমাকে নিজের মায়ের চেয়ে কম মনে করে না, তা নইলে কেউ এমনভাবে ভিয়েন আর ভাঁড়ারের ভার হাতে তুলে দেয়। কিন্তু ওঁকে কে বোঝাবে? বলছে তুই জবরদস্তি পরের ব্যাপারে ফপরদালালি করে বেড়াস।—বলতেই সেই সব রাগারাগি আর কটুকথা হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায়। এই কিছুক্ষণ আগেই সেই সব বাক্যবাণ তাঁর উপরে বর্ষিত হয়েছে। সে সব মনে পড়তেই তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

—আরে, আরে কাঁদছ কেন পিসিমা? অমন তো কত কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে। সন্ন্যাসী ঠাকুর এসে তো মোটে মাসখানেক থাকেন, তাঁর কথা একটু শুনলেই তো পার।

—সে তো শুনিই, কিন্তু দুঃখ হয় এজন্য যে আসেন তো উনি একটি মাসের জন্য তবু কোনও দিন একটু মিষ্টি করে কথা বলেন না। আমার কোথাও যাওয়া আসা ওঁর ভালো লাগে না। তা তুইই বল রাধা, উনি বছরের মধ্যে এগারো মাস হরিদ্বারে পড়ে থাকেন। ওঁর তো আত্মীয়স্বজনদের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমাকে তো সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে হয়। আমিও যদি সবার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়ে বসে থাকি তা হলে কী করে চলবে? আমি তো ওঁকে বলি গাঁটছড়া যখন বেঁধেছ তখন শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে রাখো—তা তো ওঁকে দিয়ে হবে না। ধর্মকর্ম যত উনিই করবেন, যশ খ্যাতি সব উনিই কুড়োবেন আর আমি এখানে একা একা পড়ে থেকে ওঁর নাম করে করে চোখের জল ফেলব। তার উপর আমি কোথাও যাই আসি সেটাও ওঁর সহ্য হয় না—বলেই পিসিমা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। রাধা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—কেঁদো না পিসিমা। আরে উনি তো রাগ করেছেন শুধু এজন্য যে না ডাকতে তুমি চলে গেছ তাই।

—বেচারারা এত সব কাজকর্মের হাঙ্গামাতে নেমন্তন্ন করতে ভুলে গেছে তাই বলে কি আমিও অভিমান করে বসে থাকব? তা ছাড়া নিজের লোকের আবার নেমন্তন্ন কীসের? আমি তো আপনজন বুঝি। কেউ যদি ভালো না বাসে তো দশবার ডাকলেও যাব না আবার ভালো যদি বাসে তাহলে না ডাকলেও মাথা হেঁট করে চলে যাব। আজ যদি আমার হরধু বেঁচে থাকত আর তার বাড়িতে যদি কোনও ক্রিয়াকর্ম হত তাহলে কি আমি তার ডাকের অপেক্ষায় বসে থাকতাম। আমার চোখে যেমন হরধু তেমনি কিশোরীলাল। আজ আমার হরধু নেই, তাইতেই তো আর সবাইকে দেখে মনটাকে ভুলিয়ে রাখি—বলে হেঁচকি তুলতে লাগলেন।

শুকনো পাঁপড়গুলোকে কুড়িয়ে তুলতে তুলতে কণ্ঠস্বরকে যথাসাধ্য কোমল করে রাধা বলল—তুমিও পিসিমা ব্যাপারটাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছ। নাও এবার চুপ করো তো, পাঁপড় ভেজে আনছি. খেয়ে বলবে কেমন হয়েছে?—বলে সে শাড়িটাকে গুটিয়ে নিয়ে উপরে চলে গেল।

সপ্তাহখানেক বাদে একদিন পিসিমা খুব হাসিখুশি মনে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে এসে বললেন—শুনেছ গো, ঠাকুরপোর শ্বশুরবাড়ির একটা মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে ওই ভগীরথবাবুদের বাড়িতে। তাঁরা সবাই এখানে এসে বিয়ে দিচ্ছে। ঠাকুরপো মারা যাবার পরে ওবাড়ির সঙ্গে তো কোনও সম্পর্কই আর রইল না, তবুও সম্পর্কে বেয়াই তো বটে। তাঁরা তো নিশ্চয়ই তোমাকেও নেমন্তন্ন না করে ছাড়বে না। বেয়াইকে বাদ দেবে কী করে?—বলে পিসিমা খুশিতে ডগমগ হয়ে হেসে ফেললেন। সন্ন্যাসীঠাকুরের মৌন উপেক্ষায় মনে মনে তিনি আঘাত তো পেলেনই, তবু মন তাঁর প্রসন্ন। এবাড়ি ওবাড়ি গিয়ে তিনি বিয়ের তোড়জোড়ের খবর জোগাড় করে আনতেন। শেষে একদিন তিনি এও শুনে এলেন যে তাঁদের বেয়াইমশায় শহরে এসে গেছেন। বেশ জোরকদমে বিয়ের প্রস্তুতি চলছে। জ্ঞাতিগুষ্টি সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হবে—খুব ধুমধাম হবে। দুপক্ষই যে পয়সাওয়ালা।

—কী জানি আমাদের নেমন্তন্ন করবে কি না? ঠাকুরপো মারা গেছে আজ পঁচিশ বছর, ও মারা যাবার পর থেকে তো কোনও সম্পর্কই নেই। সম্পর্ক রাখবেই বা কে? এসব তো পুরুষমানুষদের কাজ, আমার তো পুরুষমানুষ থেকেও নেই। —বলতেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে এল।

—আরে বাঃ পিসিমা। তোমার নাম থাকবে না মানে? তুমি ছেলে গিয়ে বেয়ান। যোগাযোগ নাই বা থাকল, তাতে সম্পর্ক তো আর চুকেবুকে যায় না।—জাঁতায় ডাল ভাঙতে ভাঙতে বাড়ির বড়ো বউ বলল।

—আছে গো পিসিমা, তোমার নাম আছে। আমি তো পুরো লিস্টি দেখে এসেছি।—বিধবা ননদ বলে উঠল। বসে বসেই একদম তার কাছটিতে সরে গিয়ে খুব উৎসাহ নিয়ে পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন—তুই নিজের চোখে দেখেছিস নাম? তা নাম তো থাকা উচিতই। আবার ভাবলাম যে কী জানি আজকালকার হাল ফ্যাশনে পুরানো আত্মীয়স্বজনদের বলবে কি বলবে না।—বলে পিসিমা আর একদণ্ডও না দাঁড়িয়ে ওখান থেকে চললেন। বাড়িতে গিয়ে সোজা রাধা বউদির ঘরে গিয়ে বললেন—কী রে রাধা, তুই তো জানিস আজকালকার ফ্যাশনে মেয়ের বিয়েতে কী দেয়? বেয়াইবাড়ির ব্যাপার, তাও

আবার পয়সাওয়ালা। খালি হাতে গেলে ভালো দেখাবে না। আমি তো সেকেলে লোক, তুইই বলে দে, কী দেব? এখন তো কিছু বানিয়ে দেবার আর সময় নেই, মোটে তো দুদিন বাকি আছে, তাই কিছু বানানো জিনিসই কিনে আনিস।

—তুমি কী দিতে চাও পিসিমা? গয়না, কাপড়, সস্তের জিনিস না কি কোনও রুপোর জিনিস?

—আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না রে। হাতে যা কিছু আছে তোকে এনে দিচ্ছি, তুই যা ভালো বুঝিস নিয়ে আসিস, দেখবি শুধু যাতে নিন্দেমন্দ না হয়। আচ্ছা আগে দেখি গিয়ে ক-টাকা আছে।—বলে উনি টলটলায়মান পায়ে নীচে নেমে এলেন। দু-তিনটে কাপড়ের পুঁটলি সরিয়ে একটি ছোট্ট বাক্স বের করলেন। বাক্সের তালাটাকে খুললেন। এদিক ওদিক করে একটি ছোট্ট ডিবে বের করলেন। খুব যত্ন করে সেটিকে খুললেন, দেখলেন ওতে সাতটা টাকা আর কিছু খুচরো পড়ে আছে, আর আছে একটি আংটি। পিসির ধারণা ছিল যে টাকা কিছু বেশি হবে, কিন্তু যখন মোটে সাতটা টাকা বের হল তখন ভাবনায় পড়ে গেলেন। বড়লোক বেয়াইর বাড়িতে এ কটা টাকায় তো বিশ্রিও হবে না। আংটিটার উপরে তাঁর চোখ পড়ল। এই আংটিটি তাঁর মৃত পুত্রের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন। বিকট সব আর্থিক সংকটের সময়ও তিনি আংটিটির মোহ ত্যাগ করতে পারেননি। আজও ওটিকে হাতে নেবার সময় বুকটা তার ধড়াস করে উঠল। তবু উনি টাকা পাঁচটি আর আংটিটিকে আঁচলে বেঁধে নিলেন। বাক্সটাকে বন্ধ করে উপরে চললেন। তবে এবারে তাঁর উৎসাহে কিছুটা ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। চলার গতি শ্লথ হয়ে পড়েছিল। রাধার কাছে গিয়ে বললেন—টাকা তো হল না রে বউ। হবেই বা কোত্থেকে, কে আছে আমার রোজগেরে? ওই ঘরটার ভাড়া যা আসে তা দিয়ে তো দুবেলার রুটির জোগাড় কোনওমতে হয়ে যায়। —বলেই তিনি কেঁদে ফেললেন। রাধা বলল—কী করব পিসিমা, আজকাল আমারও বড় টানাটানি চলছে, নইলে আমিই দিয়ে দিতাম। আর তা ছাড়া তুমি দেওয়া টেওয়া নিয়ে অত ভাবছই বা কেন? আজকাল তো দেওয়া নেওয়ার রেওয়াজই উঠে গেছে।

—না রে রাধা। বেয়াই বাড়ি বলে কথা। আজ পঁচিশ বছর হয়ে গেল তবু ওরা আমাদের কথা মনে রেখেছে আর আমি খালি হাতে যাব? না, না, তার চেয়ে যাব না সেও ভালো।

—তা হলে যেও না। ব্যস বেঁচে গেলে, এত লোকের মধ্যে কে টের পাবে যে গিয়েছ কি যাওনি।—রাধা সব সমস্যার সহজ সরল সমাধান করে দিয়ে বলল।

—উহুঁ, খুব খারাপ দেখাবে। সারা শহর থেকে লোকজন যাবে, আর আমি কি না বেয়ান হয়ে যাব না। না গেলে তো একথাই ভাববে যে আজ ঠাকুরপো বেঁচে নেই বলে সম্পর্কটাও রাখছে না। না, না, তার চেয়ে তুই বরং আংটিটাকেই বেচে দে।—বলে উনি আঁচলের গিঁট খুলে আংটিটাকে রাধার হাতে দিলেন। দিয়ে একান্ত মিনতির সুরে বললেন—তুই তো দোকানে বাজারে যাস রাধা, এটাকে বেচে দিয়ে যা ভালো বুঝিস একটা কিছু কিনে আনিস। ব্যস, মানটা যেন থাকে এটাই শুধু খেয়াল রাখিস।

গলিতে চুড়িওয়ালার হাঁক শুনে পিসিমার চোখ হঠাৎই তাঁর হাতের বাজে ময়লা চুড়িগুলোতে গিয়ে ঠেকল। কাল বেয়াইবাড়ি যেতে হবে, গয়না নেই তো নিদেনপক্ষে ভালো কাচের চুড়ি তো পরে নেবে। কিন্তু বড়ো লজ্জায় পা দুটি তাঁর জড়িয়ে যায়। কেউ যদি দেখে ফেলে? কিন্তু পরক্ষণেই এই দুর্বলতাকে জয় করে পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেলেন, গিয়ে ঝকঝকে একটা টাকা খরচ করে লাল সবুজ একগোছা চুড়ি পরে নিলেন। তবে সারাটা দিন হাত দুটোকে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখলেন।

সন্ধেবেলা রাধা বউদি পিসিমাকে রুপোর একটি সিঁদুরকৌটো, একখানা শাড়ি আর এক টুকরো ব্লাউজের কাপড় এনে দিল। সব কিছু দেখে পিসিমা খুব খুশি। এসব উপহার যখন উনি দেবেন তখন তাঁর বেয়ান পুরানো দিনের সব কথা বলে বলে সবার কাছে তাঁর মিতুকে স্বভাবের কত কত না প্রশংসা করবেন—এই ভেবে মনটা তাঁর পুলকিত হতে থাকে। আংটি বিক্রির দুঃখটাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকে। পাশের বেনের দোকান থেকে এক আনার হলুদ রং এনে রাতে উনি শাড়ি রং করলেন। বিয়েবাড়িতে সাদা শাড়ি পরে যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে? রাতে যখন শুতে গেলেন মনটা তাঁর তখন পরদিনের দিকে ছুটে চলছিল।

পরদিন সকাল ন-টা বাজতে না বাজতেই পিসিমা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেললেন। রং-করা শাড়িটা দেখে তাঁর মন ভরল না। আবার উপরে রাধার কাছে গিয়ে বললেন—রাধা, তুই যে রঙে ছোপানো শাড়ি পরিস তাতে তো বেশ একটা চেকনাই থাকে, জেল্লা থাকে, আমার শাড়িটার রং-টা তো তেমন খোলতাই হয়নি।

—তুমি যে এতে মাড় দাওনি পিসিমা। একটুখানি যদি মাড় দিয়ে দিতে তাহলে ভালো হত। এখনই দিয়ে দাও না, ঠিক হয়ে যাবে। ওরা কখন ডাকতে আসবে?

—আরে এসব নতুন ফ্যাশনওয়ালাদের কথা আর বলিস

না, একেবারে হয়তো ঠিক সময়ে ডেকে পাঠাবে। লগ্ন তো পাঁচটায়। দিনে যে কোনও সময় ডাক এসে যাবে।

রাধা শুনে মনে মনে হাসল।

পিসিমা শাড়িতে মাড় দিয়ে শুকিয়ে নিলেন। তারপর একটা নতুন থালা বের করে তাঁর অল্প বয়সে বোনা কুরুশের একখানি ছোটো টেবিল ক্লথ তার উপরে রাখলেন। থালাতে শাড়ি, সিঁদুরকৌটো, একটা নারকেল, কয়েকটা বাতাসা সাজিয়ে নিলেন, তারপর সব নিয়ে গিয়ে রাধাকে দেখালেন। সন্ন্যাসীঠাকুর সকাল থেকে এসব আয়োজন দেখছিলেন আর কাল থেকে আজ এ পর্যন্ত অন্তত পঁচিশবার পই পই করে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন কেউ যদি ডাকতে না আসে তো খবরদার একদম যাবি না, গেলে কিন্তু ভালো হবে না। প্রতিবারই পিসিমা খুব জোর গলায় বলছিলেন—আমাকে কি তুমি পাগল পেয়েছ না কি যে না ডাকতে হ্যাংলার মতো চলে যাব? আরে ওই যে পাশের বাড়ির নন্দা, ও নিজের চোখে নেমন্তন্নের লিস্টিতে নাম দেখে এসেছে। তা ছাড়া নেমন্তন্ন করবে না কেন? শহরের যত মানুষজনকে নেমন্তন্ন করবে আর নিজের বেয়াই বেয়ানকে নেমন্তন্ন করবে না?

প্রায় তিনটার সময় পিসিমাকে আনমনাভাবে ছাদে এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করতে দেখে রাধা বউদি ডেকে জিজ্ঞেস করল—কি গো পিসিমা, যাননি?

আচমকা চমকে উঠে পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন—কটা বেজেছে রে রাধা?...কী বললি, তিনটে? শীতকালে বেলা মোটেই টের পাওয়া যায় না। বেজেছে তিনটে অথচ সারাটা ছাদ থেকে রোদ এতটা সরে গেছে যে মনে হচ্ছে যেন সন্ধে হয়ে গেছে।—বলেই যেন হঠাৎ খেয়াল হল যে এ তো বউদির প্রশ্নের উত্তর হল না, তখন একটু ঠাণ্ডা গলায় বললেন—লগন তো সেই পাঁচটায়, তা চারটে নাগাদ চলে যাব ; সবে তো তিনটে বাজল।—খুব চেষ্টা করে গলার স্বরে একটি উপেক্ষার ভাব মিশিয়ে দিলেন। পিসিমা ছাদ থেকে গলির দিকে দুচোখ মেলে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর ঠিক পেছনেই দড়িতে তাঁর শাড়িটা শুকোতে দেওয়া রয়েছে, তাতে মাড় দেওয়া আর আভের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়া। আভের ছড়ানো ছিটানো কণাগুলো থেকে রোদের কিরণ চিকমিক করছিল, ঠিক তেমনি করে যেমনি করে কোনও লোককে গলিতে ঢুকতে দেখলেই পিসিমার মুখখানিতে খুশি ঝলকে উঠছিল।

রাত সাতটার আবছা আলোতে রাধা উপর থেকে দেখল ছাদের আলিসার সাথে সেঁটে গলির দিকে মুখ করে একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। দেখে মনটা তার ভারি হয়ে এল। কোনও প্রশ্ন না করে সে শুধু বলল—পিসিমা, এই ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ যে, আজ রান্না হবে না, সাতটা যে বেজে গেল।

যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন—কী বললি, সাতটা বেজে গেছে?—বলেই যেন আপন মনে প্রশ্ন করলেন—কিন্তু সাতটা কী করে বাজবে? লগ্ন তো পাঁচটায়।—পরক্ষণেই হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটাকে উপলব্ধি করে গলার স্বর যথাসম্ভব সংযত করে বললেন—কীই বা রান্নার আছে, এক্ষুনি করে নেব। দুজন মানুষের তো রান্না, কীই বা খাব আর কীই বা রাঁধব।

বলে উনি শুকনো শাড়িটাকে দড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে নীচে গিয়ে ওটাকে ভালো করে ভাঁজ করলেন, হাতের চুড়িগুলোকে একটা একটা করে খুললেন, থালাতে সাজানো সব কটি জিনিসকে তুলে নিয়ে খুব যত্ন করে তাঁর একমাত্র সিন্দুকটিতে গুছিয়ে তুলে রেখে দিলেন।

তারপরে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে গিয়ে উনুন ধরাতে বসলেন।

অনুবাদ : নন্দী শূর

[মহু ভাণ্ডারির জন্ম ১৯৩১ সালের ৩রা এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের ভানকুমারে। হিন্দি পরিভাষিক কোষের রচয়িতা সুখসম্পদ রায় ভাণ্ডারির ছোট মেয়ে। কর্মক্ষেত্র কলকাতা ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। মহু ভট্টাচার্যের পরিচালনায় তাঁর গল্প "ইয় হী সচ হ্যায়" 'এখানে আকাশ নেই', 'ত্রিশঙ্কু' নামক চলচ্চিত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'স্বামী' উপন্যাসও বিখ্যাত। এছাড়াও 'মহাভোজ', 'যহল অপেক্ষিত'। তাঁর অধিকাংশ রচনা গুজরাটী, মারাঠী, কন্নড়, তামিল, তেলুগু ও ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে।]

নাইট-শিফট্

পল জাকারিয়া

নিউজ ব্যুরোতে গুড়ি মেরে ঢুকে পড়লো মধ্যরাত। সিলিং ফ্যানের ছায়াগুলো শূন্য টেবিলগুলোর ওপরে বন্‌বন্‌ ঘুরতে লাগলো যেন ডানাওলা ঘৃণপোকার দল মাটিতে নেমে পড়েছে। ছড়ানো ছিটোনো কাগজের টুকরোগুলো বাতাসে প্রাণ পেয়ে ছায়াগুলোকে উড়ে উড়ে এড়াতে চেষ্টা করছে। খবরের টুকরোরা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রইল মেঝের ওপরে। কেউ টেবিলের পায়া জড়িয়ে ধরছে। কেউ দেয়াল বেয়ে উঠে পড়ছে, কেউ র‍্যাকের নিচে লুকোচ্ছে। কেউ বা এ কোণে ও কোণে লুটোপুটি করে কাঁপছে। এইরকমই এক চিল্‌তে খবর যখন গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়নের পা জড়িয়ে ধরল, বেদম চমকে উঠে ওটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, এক লাফে উঠে দাঁড়ালো সে। খবরটাকে হামা দিয়ে টেলিপ্রিন্টারের তলায় ঢুকে যেতে দেখতে দেখতে মৃত্যুঞ্জয়ন্‌ বলল—"টেলিপ্রিন্টার থেকে এসেছিল, টেলিপ্রিন্টারেই ফিরে গেছে। ওকে আর পুনর্জন্ম দিয়ো না ঈশ্বর।"

আবার চেয়ারে গুছিয়ে বসতে বসতে মৃত্যুঞ্জয়ন্‌ আরামসে আড়মোড়া ভাঙলো। দূরে কোথাও কোনো ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজে। দুর্ভেদ্য অন্ধকার একটা জানলার মধ্য দিয়ে ভেসে আসা ঐ সময়ের ঘণ্টা ওকে কেমন বিধুর করে দেয়। এতক্ষণ নিঃশব্দ-থাকা টেলিপ্রিন্টার এবারে সংবাদ উগ্‌রোতে শুরু করেছে আবার। শব্দটা অবিকল মেশিনগানের আওয়াজের মতো শোনাচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয়ন্‌ কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল। কিন্তু মধ্যরাত্রির ঘড়ির বাজনাটা এই ডামাডোলে মুছে গেল। সংবাদের জন্মের ডামাডোল। মৃত্যুঞ্জয়ন্‌ ভাবলো জন্মের সংবাদের ডামাডোল। মনুষ্যজাতির তার নিজের জন্মসংবাদ শোনার জন্যে এক অপূরণীয় ক্ষুধা আছে। এই সব প্রবল আওয়াজের মধ্যে সময়ের কোমল ছন্দটি কোথায় ডুবে গেল।

টেবিলের ওপরে টুকরো টুকরো সংবাদ কিলবিল করছে। ওরা হামাগুড়ি দিচ্ছে মেঝের ওপরে। ছুটোছুটি করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্বাস্তুদের মতো।

"সংবাদ আজ বড়ই চঞ্চল বলে মনে হচ্ছে", মৃত্যুঞ্জয়ন স্বগতোক্তি করল। সিলিং ফ্যানটা একখাবলা খবর নিজের দিকে টেনে নিল। ওপরে উঠে, সে কিছুক্ষণ ব্যাথার সঙ্গে ডানা ঝাপ্টাঝাপ্টি করল, শেষ পর্যন্ত জানালা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল—"কোথায় যাচ্ছো?"—মৃত্যুঞ্জয়ন্‌ প্রশ্ন করে—"কোথাও ডেলিভারি নেই আজকে।" তারপর, খোলাজানলার ওপারের অন্ধকার থেকে ক্যান্টিনের বেড়ালটা জবাব দিল। —"মিঞাও।"

এতদিনের নাইট শিফটের কাজে মৃত্যুঞ্জয়ন্‌ কোনোদিন সংবাদদের এমন ধারা অস্থির হতে দেখেনি। প্রত্যেক রাতে ডেস্কে বসে সে দেখে কী পড়ি-মরি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সংবাদের স্বল্পায়ু জীবন তৈরি হয়। সে ইচ্ছেমতো তাদের আয়ু দীর্ঘ করে, ছেঁটে ছোটো করে, তাদের গুরুত্ব কমায় বাড়ায়, তাদের তাৎপর্য নির্ধারণ করে দেয়, কিংবা একেবারে বাদই দিয়ে দেয়।

সারারাত্রি ধরে ঐ টেলিপ্রিন্টারটা একটা ঝগড়াটে, উন্মাদ পাগলের মতন রোলের পরে রোল কাগজ বমি করতে থাকে, অর্থাৎ তিনি বিশ্বের সংবাদ সমগ্র ঘোষণা করে চলেছেন।

আর কোনো নিষ্ঠুর শক্তির ভাড়াটে গুণ্ডার মতো মৃত্যুঞ্জয়ন্‌ সংবাদগুলোকে কেটে ছেঁটে ছাপার আকৃতি দেয়। ও চেয়ে দ্যাখে, খবরগুলো মেঝেময় ছুটোছুটি করছে, ঘরময় ওড়াউড়ি করছে।

বাকি সময়টা ও নিজের পূর্বজন্মগুলির কথা ভাবে। লক্ষলক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে যে অন্তহীন সংখ্যাহীন যাত্রাগুলি ও করেছে। সরীসৃপ, কীট, উদ্ভিদ, হরিণী, নারী —এবং পরমাণু/মাইক্রোব হিসেবে—সেই সব কথা চিন্তা করে। আশ্চর্য হয়ে যায় কবরের ধ্বংসাবশেষ, উইয়ে-খাওয়া গাছের গুড়ি দেখে, যেসব চিহ্ন ও পিছনে রেখে এসেছে এইসব জন্মযাত্রাগুলির স্মৃতিফলক হিসেবে। ভীষণ মনখারাপ হয়ে যায় ও যখন ওর নিজের অস্ত্র কঙ্কাল, ও ফসিলগুলোর কথা ভাবে—বিভিন্ন গড়নের, বিভিন্ন মাপের,—সব এই পৃথিবীর পেটের মধ্যে বরফ হয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে।

টেলিপ্রিন্টারটা ইতিমধ্যে গর্জন করে অনেকগুলো জন্মের খবর ঘোষণা করল। সংবাদ ছুটে বেড়াতে লাগলো, ঘর বাঁধবার ঠাঁই খুঁজে। মৃত্যুঞ্জয়ন্‌ সৃষ্টির অন্তিম মুহূর্তটির অপেক্ষায় রইল।

মৃত্যুঞ্জয়ন চেয়ার ছেড়ে উঠল ক্যান্টিনের বেড়ালটার খোঁজ করতে। হঠাৎ টিউবলাইটগুলো নিবে গেল। পাখাগুলোও

ধীরে ধীরে থেমে গেল। সংবাদের টুকরোগুলোর ওড়াউড়ি বন্ধ হল। টেলিপ্রিন্টার চুপ করল। জানলার বাইরে থেকে বেড়াল বলল—"মিএওঁ।"

—"এসো, আমার রাত-জাগার সঙ্গী", মৃত্যুঞ্জয়ন বলল অন্ধকারের মধ্যে। "এসো, আমরা একসঙ্গে পাহারা দিই।"

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বসে পড়লো মৃত্যুঞ্জয়ন্। অন্ধকার একেবারে নিরুত্তর।

মোমের আলোর নৃত্যরত সীমার দিকে চেয়ে চেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ন আবার চিন্তার গভীরে ডুবে যায়। এই আমি, সৃষ্টির শেষ। শিশুদের যন্ত্রণার শেষ আর পুনর্জন্মের শেষের জন্য যার এই উদগ্র কামনা—একদিন আমার অজাত শিশুটির জন্যে অশ্রুপাত করেছিলাম। কেন? তখন কি আমি অন্য কেউ ছিলাম? মৃত্যুঞ্জয়ন অবাক হয়ে যায়।

না। সেটাও আমিই ছিলাম। যেদিন আমার স্ত্রী গর্ভপাত করিয়ে এলো আমি সেদিন কেঁদেছিলাম। আমি সেই অজাত সন্তানটির জন্যে কেঁদেছিলাম, যার যাত্রা শুরু হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ হল না। ওরে আমার অজাত সন্তান, আমার জীবনের কুঁড়ি, তোর ফেরার পথটা যেন আনন্দের হয় ; আমি প্রার্থনা করেছিলাম। তুই প্রাণের উৎসধারা থেকে উৎসারিত হয়ে ঝরে পড়েছিলি শান্ত হ্রদের বুকে আবর্তন/evolution-এর অন্তে, কেবলই ফিরে যাওয়ার জন্যে—না পারলি জন্ম নিতে না মরণ। তুই কে ছিলি রে? তোকে যখন তোর যাত্রার অসীম আনন্দ থেকে, আর নিশ্চিন্তির উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো তখন আমার জন্যে তোর কী বিদায়বার্তা ছিল তোর? ওরে আমার অচেনা আগন্তুক, আমারই সঙ্গে বাঁচতে এসেছিলি তুই, কতটা দুঃখ, সুখ, মমতা, বিস্ময়, লুকিয়ে ছিলো তোর কচি শরীরে, হাসপাতালের আবর্জনাড়ে যেটা পচে ধুলোয় মিশে গেল?

ওর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল যে অশ্রুবিন্দুটির, আর ঠোঁটে কাঁপছিল যে কান্নাটা, তাদের মধ্য দিয়ে সেই শিশুটি যার যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে—ওকে ভালোবাসছিলো, এবং যাতনা দিচ্ছিলো, আরো একবার।

জানলার টোকাঠে, মোমবাতির আলোর সীমানা পেরিয়ে যে অন্ধকার, সেই আঁধারে ক্যান্টিনের বেড়ালটা আবির্ভূত হল। জানলা থেকে লাফ দিয়ে পড়ল ঘরের মেঝের, খবরের টুকরোগুলোকে মাড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের টেবিলের ওপরে চড়ে বসলো। দুটো বড়ো বড়ো জ্বলজ্বলে চোখ ওর দিকে তাকালো। বেড়াল বলল, "মিএওঁ।" মৃত্যুঞ্জয়ন্ ওর ভিজে ঠাণ্ডা নাকের ডগাটুকুতে সাবধানে তর্জনী ছুঁইয়ে বললো—"তুমি কী বলো? সময় শেষ?"

মৃত্যুঞ্জয়ন্ উঠে দাঁড়ালো, জানালার গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলো। বাইরে কিছুই নেই। শুধুই অন্ধকার। যেন কেউ একটা কালো হাত দিয়ে ওর চোখদুটোকে ঢেকে দিয়েছে। মোমবাতির ছোট্টো আলোর বৃত্তটার দিকে ফিরলো ও। এত অন্ধকারে যেন ওটা একটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। অকস্মাৎ ওকে চমকে দিয়ে গর্জন করে উঠলো টেলিপ্রিন্টার। মৃত্যুঞ্জয়ন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো টেলিপ্রিন্টার কীরকম নিষ্ঠুরভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আগুনের মতো। অন্ধকারে আকৃতিগ্রহণ করছে ওর মুখোমুখি হবে বলে।

মৃত্যুঞ্জয়ন নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। সে একদৃষ্টে তাকালো ওটার দিকে, শান্ত, সচেতন মনোযোগ সহকারে। তারপর, যেন ম্যাজিকে, ওটার মুখের ওপর শব্দ ছাপা হতে লাগলো, ভয়ংকর ভাবে পুনরাবৃত্ত হতে থাকলো একই কথা। যান্ত্রিক, যান্ত্রিক কর্কশতায় গর্জন করতে থাকলো টেলিপ্রিন্টার। সৃষ্টির অন্ত হয়েছে। সৃষ্টির অন্ত হয়েছে। সৃষ্টির অন্ত হয়েছে। সৃষ্টির অন্ত হয়েছে। সৃষ্টির...

অন্ধকার গাঢ়তর হলো। মৃত্যুঞ্জয়ন্ জানালার দিকে হেঁটে গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে। যেন পর্দার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। চতুর্দিকে সে হাতড়ে খুঁজে দেখতে চেষ্টা করল সদ্য-পঞ্চত্ব প্রাপ্ত সৃষ্টির শেষ চিহ্ন কিছু। কিন্তু অন্ধকার জানলাটাকেও মুছে দিয়েছে। সে ফিরে চলল।

অন্ধকারের কাফনে সর্বস্ব ঢেকে ফেলেছে। টেলিপ্রিন্টার এবং তার গর্জন ক্রমশ মিলিয়ে গেল নাস্তিতে। টেবিলটা, তার ওপরের কাঁপা শিখাটুকুকে নিয়েই অন্ধকারের মধ্যে গলে গিয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ন্ ছুটে গেল সেই চোখদুখানির দিকে, দ্রুত মুছে যাওয়া আলোর তীরে যে দুটি জ্বলছিল। ওই দুটি চোখের আলোকে সে বুকে চেপে ধরলো। তারপর, বিবর্ণ, বিস্তস্ত, শেষ হয়ে যাওয়া সময়ের দিকে তাকিয়ে সে হাসলো। বেড়ালটির গালে চুমু খেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ন বলল—"সময় শেষ।" অন্ধকার সর্বস্ব গ্রাস করল। আর দূর, অনেকদূর থেকে কোমল, মৃদু একটি সান্ত্বনার স্বর শোনা গেল, কোটি কোটি যুগের ওধার থেকে আদিম অন্ধকারের গর্ভ থেকে, "মিএওঁ।" ও শুয়ে রইলো সেই সহানুভবের কোমল শব্দকে বুকে জড়িয়ে।

সাংক্রমিক মৃত্যুঞ্জয়ন্ তার জন্মগুলিতে এবং মৃত্যুগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়ত, হর্ষিত, উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত হয়ে,—ব্রহ্মাণ্ডগুলির ধ্বংসে ও পুনর্জন্মের বিপুল, মহৎ ছন্দের তালে তালে।

অনুবাদ : নবনীতা দেবসেন

দোহা

পি. লঙ্কেশ

'কী যে বলব ভেবে পাচ্ছি না। কেউ মরে গেলে সবাই যেমন বলে, আহা। আমার মুখ দিয়ে সেরকম বেরোচ্ছে না, এমনকি কাঁদতেও পারছি না। সরোজাম্মা যদি এখন দেখত আমি কাঁদছি, হাসিমুখে বলে উঠত, "ছি, চুপ করুন তো। কাঁদলে ভাল লাগে না আপনাকে।" সরোজাম্মা শুধু তোমার স্ত্রীই ছিল না, সে তোমার বন্ধুও ছিল। বন্ধুত্বটাই বড় কথা। আমাদের বাড়ির সামনে ভোরের কুয়াশায়, সাঁঝের বেলা কিংবা প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে হাঁটতে দেখলে মনে হত বন্ধুত্ব এরকমই হওয়া দরকার। তার মৃত্যুতে, এই অকালমৃত্যুতে, বলার মতো কোনও শব্দই খুঁজে পাচ্ছি না। মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের কীইবা বলার থাকে।'

নাগরাজ বলছিল এই কথাগুলো।

শুনে আমি ওকে বললাম, 'বসো'। হঠাৎ খেয়াল হল, আমার বলা উচিত 'বসুন'। কারণ আমি কখনও নাগরাজকে 'তুমি' সম্বোধন করিনি। সে যখন স্নেহের সঙ্গে ভালবেসে কথা বলত, মনে হত আমাদের পরিবারের সঙ্গে কত তার ঘনিষ্ঠতা, মুখ দিয়ে আপনিই সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন বেরিয়ে আসত। সজ্জন ব্যক্তি, যদিও অভিযোগ শুনেছি ফরেস্ট অফিসার হিসেবে সে ঘুষ নেয়। কিন্তু ওর বোকামি দেখলে অবাকও লাগে, নিরীহ বলেই মনে হয় ওকে।

আমি বললাম, 'সেদিন একটু তাড়াতাড়িই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সারাদিন ফাইলের ঝামেলা, কর্মচারীদের তুলভাল, বড়সাহেব চেনাপ্পার খুঁতখুঁতানি, এসবে মাথা ধরে যায়। তারপর আছে পাবলিকের নানারকম বেয়াদপি, সন্দেহমূলক কথাবার্তা, গুজব, ঘুষের টোপ...। দেখে আমার হাসিও পায় মাঝে মাঝে। সেদিন আমি একটু পা চালিয়েই আসছিলাম, গেটের কাছে এসেছি তখনই শুনতে পেলাম চিৎকার। সরোজের গলা। ভয়ে ভয়ে দৌড়লাম। দরজাটা বন্ধ ছিল। প্রচণ্ড কান্নার আওয়াজ আসছিল, সেই সঙ্গে পোড়া গন্ধ, জোরে দরজায় ধাক্কা দিলাম। ছিটকিনি লাগানো ছিল না। দেখি, জামাকাপড়ে আগুন-লাগা অবস্থায় কুঁকড়ে সে নিচে পড়ে আছে। প্রতিবেশীদের চেঁচিয়ে ডাকলাম। কি ছুটে এল। মণি এল দৌড়ে আরেক দিক থেকে। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই শেষ। তখুনি আমার মেয়ে শান্তিকে ফোন করলাম, বললাম কী অঘটন ঘটে গেছে। মনে নেই ঠিক কী বলে খবরটা দিয়েছিলাম ওকে।'

নাগরাজের পাশে আরও চারজন বসে ছিল সেখানে। তাদের মধ্যে একজন গোপাল। কলেজে সে আমার সঙ্গে অভিনয় করত। এখন কোনও বিজ্ঞাপন অফিসে ডিজাইনারের কাজ করে। আরেকজন আমাদের অফিসের কেস-ওয়ার্কার রামহিরা। টাইপিস্ট মীরাও ছিল ওদের মধ্যে। অন্য কে এক মহিলা ছিল মীরার সঙ্গে আমি চিনতে পারিনি।

'ও পদ্মা স্যার। চেন্নাপটনা হাই ইস্কুলে পড়ায়।'

'কোন্ বিষয়ে পড়ান আপনি?'

'কন্নড় আর ইংরেজি স্যার।'

সেও এমনভাবে বসে ছিল যেন গভীর শোকগ্রস্ত আমার পত্নীর মৃত্যুতে। যেন আমার সমস্ত দুঃখের বোঝা সে নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। ওইভাবে মেয়েটাকে বসে থাকতে দেখে আমার হাসি পেল। আমি আর-একবার তার মুখের দিকে তাকালাম। সে আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে মেঝের দিকে চেয়ে রইল। বোধহয় তার চোখে জল ছিল। মন্দা লাগছিল দেখে। আমি জানি সে এসেছে কোনও মতলবে, হয়তো বদলি কিংবা অন্য কিছু একটা। প্রশ্নটা এসেই গিয়েছিল আমার মুখে, কিন্তু নিজেকে সামলালাম। মীরা আমায় তখন সরোজ সম্পর্কে অনেক কথা বলে চলেছে।

নাগরাজের ওঠার লক্ষণ নেই। পদ্মাও বদলি কিংবা অন্য কোনও সমস্যার কথা তুলছে না।

আমার বস্ চেন্নাপ্পা দুর্ঘটনার খবর শুনে একদিন আমায় ডেকে পাঠালেন, যদিও আমি তখন ছুটিতে, তবু গেলাম দেখা করতে।

'কী বসু, এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, আমায় কি খবর দেওয়া উচিত ছিল না? আশা করি পোস্টমর্টেম আর অন্যসব ঝামেলা নির্বিঘ্নে মিটেছে। তোমার মেয়ে নিশ্চয় খুব মুষড়ে পড়েছে। কী হয়েছিল? ঠিক করে বল তো—তুমি গিয়ে যখন দেখলে তখনও কি সে বেঁচে?

'হ্যাঁ, প্রাণ ছিল। আমার দিকে তাকালোও একবার। পুরো শরীর ঝলসে গিয়েছিল। তবু যদি বাঁচানো যায় এই আশায় হাসপাতালে নিয়ে ছুটলাম। কিন্তু যেতে যেতেই শেষ।'

'নিশ্চয় রান্না করতে গিয়ে আগুন লাগে?'

'হ্যাঁ, রুটি চাপানো ছিল তাওয়ায়, গ্যাস জ্বলছিল।' আমি বললাম।

ছোট মন চেম্বারলেন। বলল, 'খুব খারাপ কথা। দু'বছরে দু'দুটো পুড়ে যাওয়ার ঘটনা—আবার আমারই অফিসের সঙ্গে যুক্ত। সিলভিয়ার ফ্যামিলির কোনও খবর জান?'

'না স্যার আর কোনও খবর পাইনি।' আমি বললাম।

পরে একদিন আমার খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। মার্চ মাসের পরিষ্কার আকাশ। একটু আগেই সূর্য উঠেছে। শীতের সঙ্গে পাল্লাতে-থাকা কুয়াশা আকাশের কিনারে একটু-একটু লেগে আছে। খবরের কাগজের দিকে মন নেই আমার। আমি বাড়ির সামনে বাগানে ঘুরছি। গত এক সপ্তাহে যা-যা ঘটেছে এক-এক করে মনে পড়তে লাগল। শান্তি মাইসোরে তার স্বামীর ঘরে ফিরে গেছে। সে আমার এবং সরোজের ব্যাপারে কিছু জিগ্যেস করেনি। তাতে একটু দুশ্চিন্তা হয়েছে কিন্তু রাগ হয়নি আমার। বাইরের লোক, বারাই আমাকে চেনে, অদ্ভুত উদ্বেগ দেখায়। সহানুভূতির সঙ্গে খোঁজ-খবর নেয়। আমার জিভে আর কোনও জড়তা নেই। কারণ দেখি যে, আমার চেয়েও তাদের শোক বেশি। ঘটনার দিন সকালে আমাদের দুজনের মধ্যে যা-যা কথা হয়েছিল সেসব গড়গড় করে ওদের বলে গেছি। সরোজ সেদিন আমাদের সংসারের কথাই বলাবলি করছিল, শান্তির কথাও উঠেছিল। আমরা যে ছোট ভাড়াবাড়িতে থাকতাম শান্তি সেখানে গন্ধে জল দিয়ে বেড়াত ছোটবেলায়। তখন তো জলেরও অভাব ছিল। গুঁড়ো কফি কেনার জন্য সিকি-আধুলিও থাকত না মাসের কুড়ি তারিখের পর, এসব নিয়ে সে হাসাহাসিও করছিল। বলেছিল, সামনের ছুটিতে অন্তত কাছের রঙ্গনথিট্টুতে বেড়াতে যেতে হবে। একথাগুলোই আমি বলে গেছি যারা সহানুভূতি দেখাতে আসত তাদের। বার বার বলতে বলতে আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল সরোজ আসলে ঠিক কী বলেছিল, তাই যা মনে আসত তা-ই বলে গেছি। তা সত্ত্বেও আমার কথা শুনে শ্রোতাদের মন যেন বেশি করে গলে পড়ত। বোধহয় খুব একটা বাড়িয়ে এদিক-সেদিক বলতাম না। আমাদের পারিবারিক জীবন যেমন ছিল, সেরকমই। আমার পড়ার সাথিরা ও ধারওয়াড়, রাইচুড় থেকে শিক্ষাবিভাগের সহকর্মীরা এসেছিল দেখা করতে। এই সুযোগে বোধহয় আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছিল ওরা, পুরনো দিনের কথা বলে আমায় প্রভাবিত করতে চেয়েছিল কারণ এখন আমি এদের ওপরওলা। সরোজের গুণের কথা সবিস্তারে শুনিয়েছি ওদের। বলেছি, আমাদের কুড়ি বছরের দাম্পত্যজীবনে সে আমাকে কত বুঝত। আমরা পরস্পরের ওপর কতখানি নির্ভরশীল ছিলাম। কাছাকাছি ধারওয়াড় শহরের ধনী পরিবারের মেয়ে সরোজ কতটা মিতবাক, আন্তরিক এবং নরম স্বভাবের ছিল তাও ওদের বলেছি।

কেন এসব কথা মুখ দিয়ে বেরয় জানি না, তবে বলে সান্ত্বনা পাই। এই সান্ত্বনাই আমার হাসি এবং পরিহাসপ্রিয়তা টিকিয়ে রেখেছে।

একটু একটু বেলা বাড়ছে। চোখে পড়ল বেল দেখতে একটি মেয়ে হেঁটে আসছে রাস্তা দিয়ে। খানিক পরে বুঝলাম, এ তো সেই পদ্মা যে কিনা আমাদের টাইপিস্ট মীরার সঙ্গে এসেছিল। ওকে সেদিন হাঁটতে দেখিনি। ভাবলাম, নারীর সৌন্দর্য ফোটে তার চলনে। কিন্তু ওকে দেখে মনে হয় এমন কাঁচা বয়সেও সে হয়তো ভাবে চরিত্রই আসল সৌন্দর্য। কাছাকাছি এল যখন, অন্য কোথাও সে যাচ্ছে ভেবে আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু 'নমস্কার স্যার' বলে সে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে এল। সকালের ঝকঝকে আলোয় তার মুখ প্রশান্ত এবং মনোরম দেখাচ্ছিল। চমৎকার শরীর, যেন একটু আগেই স্নান সেরে নিয়েছে। মুখে নিশ্চিন্ত ভাব। 'নমস্কার, আসুন, কী ব্যাপার?' আমি জিগ্যেস করলাম, কিন্তু তখনও আমার মনে সন্দেহ, সে বোধহয় বদলি কিংবা প্রোমোশন-সংক্রান্ত ব্যাপারেই এসেছে।

'স্যার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার মায়ের পরিচয় ছিল। তিনি ওঁর সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। ভাবলাম যাই আপনার সঙ্গে আর-একবার দেখা করি, তাই চলে এলাম। আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো?' সে বলল।

তার কথা শুনে, তাকে সন্দেহ করেছি ভেবে আত্মগ্লানি হল। তবু জানতে চাইলাম, 'তুমি নিশ্চয় বদলির জন্য আসনি?'

সে মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

এর মধ্যে আমরা ঘরের ভেতরে চলে এসেছি। পদ্মার গম্ভীর ভাব এবং সহানুভূতি দেখে আমি যথেষ্ট বিচলিত হলাম। 'কফি করব আপনার জন্য? ঝি তো এখনও আসেনি, তাই না?' এই বলে সে উঠে গেল কফি করতে। বারণ করা গেল না, তাই বসে বসে ওকে দেখতে লাগলাম।

গলা নামিয়ে বললাম, 'পদ্মা, আমার কথা শুনে যদি বোর লাগে তো বোলো।'

'কী কথা?'

আমি বললাম, 'কিছু না, এখানে এসো পদ্মা। কফি করতে হবে না। অনেকদিন বাইরে বেরোইনি। শুধু

লোকজনের সঙ্গে বকবক করেছি। আজ একটু গাড়িতে ঘুরব।'

পদ্মা না বলল না। কী জানি তার মনে বিশ্বাস জাগাতে পেরেছি কি না। নাকি আমার এই ঘটনা সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসও এনে দিয়েছে তার মনে। কী রকম মেয়ে সে? মীরার সঙ্গে এসেছিল, এখন কীসের টানে একা একা এসেছে : আমায় সান্ত্বনা দিতে?

'পদ্মা, আমার মেয়ে শান্তি এখানে পাঁচদিন ছিল তার মা মারা যাবার পর। একদিনও সে আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলেনি। সে যদি আমায় দুষত কিংবা সে নিজে যা ভেবেছে তা নিয়ে যদি আমায় কড়া কোনও কথাও বলত তা হলে শান্তি পেতাম।' আমি বললাম। ব্যাপারটা ধরতে না পেরে পদ্মা বোধহয় ঘাবড়ে গেল। ভয়ও পেতে পারে। তাই হেসে ওকে এমন কিছু বলতে চাইলাম যা ওকে ঘাবড়ে দেবে না। 'আমার এবং সরোজের সংসার অন্য যে-কোনও সংসারের মতোই ছিল। কিন্তু সরোজ ছিল সিরিয়াস ধরণের মেয়ে। আমি নিজে হচ্ছি একেবারে ছেলেমানুষের মতো। আমাদের বিয়ের পর প্রথমদিকে একরকম নাচানাচিই করতাম ওর সামনে। বলতাম ওকে, দূর, প্রেমের কাছে বেকার বোর্ জিনিস এই বিয়ে। সে অবশ্য তাতে অপ্রস্তুত হত না, চুপচাপ তার মিষ্টি হাসি ধরে রাখত। ওরকম হাসি দেখে বুক ভরে উঠত পত্নীর ব্যক্তিত্ব এবং প্রেমের গভীরতায়। তখন যদিও আমি আড়াইশো টাকা মাইনে পাই, নিজের সাফল্যে খুশির শেষ ছিল না। কী যে আনন্দ হয়েছিল যখন শান্তি জন্মাল। সেই মেয়ে ইস্কুলে ঢুকল। একরত্তি মেয়ে, আমাদের চোখে দুনিয়ার সেরা সুন্দরী—সবচেয়ে ভাল মেয়ে। একদিন সে জেদ ধরল তার ইস্কুলে যেতে হবে কারণ সে স্পোর্টসে দৌড়বে। তার আবদারে আমরা গেলাম মেয়ের পুরস্কার নেওয়া দেখতে। দৌড়-এ সে লাস্ট হল। বিমর্ষ হাসি হেসে আমি ভাবলাম জীবনের বাস্তবতা এবং দুনিয়ার তাবৎ বাপ-মায়ের অলীক স্বপ্নের কথা...।'

'আপনি আমায় এত কিছু বলছেন কেন?' পরিহাসের সুরে হলেও সসম্ভ্রমে জিগ্যেস করল পদ্মা।

গাড়িতে বাঙ্গালোরের দুটো পার্ক ঘোরা হয়ে গেছে এর মধ্যেই আমাদের এবং আমরা একটা হোটেলে বসে কফি নিয়েছি। পদ্মা শিশুর মতো আমার কথা শুনে যাচ্ছে হালকা মনে, চোখ বড় করে। যৌবনের আবেগ গোপন না রেখেই সে বলল, 'বলুন, বলুন, আমি সব কথা শুনতে চাই।'

'মানুষ আসলে খুব সাঙ্ঘাতিক জীব।' কথার অবগাহনে পদ্মা জিগ্যেস করল, 'মেয়েমানুষকেও কি এর মধ্যে ধরেছেন আপনি?' যা খুশি ভাবুক সে এই মনে করে এবং তার কাঁচা মনে যাতে চোট না লাগে, সেজন্য আমি ওর কথা এড়িয়ে বললাম, 'আমরা কখনও মানতে চাই না যে আমাদের সন্তান অন্যের সন্তানের চেয়ে ভাল নয়। আমাদের নিজের সংসার অন্যের সংসারের চেয়ে মহৎ নয়। আমরা সব সময় কোনও-না-কোনও বড় কিছুর পেছনে ছুটি। এমনকি যখন পাপ করি তখনও তাতে এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় থাকি। শিশুসুলভ উৎসাহে একদিন একটা বাজে ক্লাবে গিয়ে ঢুকেছিলাম। শুধু অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য। জিতলাম কিছু, আবার হারলামও। বাড়ি ফিরে সরোজকে সব কথা খুলে বলতে পারতাম, বললে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে আমার পক্ষে কষ্ট হত না। কিন্তু বললাম না। তবু এই গোপনীয়তার জন্য কোনও ঝঞ্ঝাট হয়নি, সংসার যেমন চলছিল সেইরকম চলতে লাগল। এরই মধ্যে আমি আমার অনেক চাহিদা মিটিয়ে নিতে শুরু করেছি। তুমকুড়ের এক শিক্ষিকা অসুবিধের পড়ে আমার কাছে এসেছিল। তার নাম সিলভিয়া। নিরীহ মেয়ে। সেদিন তুমি যখন মীরার সঙ্গে এসেছিলে তোমায় দেখে তার কথা মনে পড়েছিল। সামান্য উপকার চাইতে এসেছিল সে। আমি তার নাম জিগ্যেস করলাম। যারা তার পেছনে লেগেছিল তাদেরও নাম জেনে নিলাম। আশ্বাস দিলাম তাদের সামলাব এবং বদলিরও ব্যবস্থা করে দোব। সে খুশি হয়ে ফিরে গেল। কিন্তু মানুষ যে কী শয়তান, পদ্মা। প্রতিশ্রুতি হয়েই রয়ে গেল আমার কথাগুলো।

বদলি হয়নি তার। ভয়-দেখানো সমানে চলতে লাগল। আমি জানতাম। এও জানতাম যে সে আবার আসবে। সত্যি সে এল। এসে সে নিজের সমস্যা বলার আগেই আমি আমার সমস্যার কথা বলতে শুরু করলাম। বললাম, এই পচা নষ্ট পৃথিবীতে কোনও ভাল কাজ করা যে কী কঠিন। আমার কথা শুনে সিলভিয়া আকৃষ্ট হল। তার অসহায় মন নিষ্ঠুর জানোয়ারদের হাত থেকে বাঁচার রাস্তা খুঁজে পেল। জালে আটকে-পড়া জীব আরেকটা জালে জড়িয়ে পড়ল। সিলভিয়া আমার হস্তগত হল। তার নরম লোভনীয় শরীরে আনন্দের ঢেউ তুললাম আমি। সে বদলি পেল। যারা তার পেছনে লেগেছিল তাদের হাত থেকেও বাঁচল। এই জটিল পরিস্থিতিতে আমার মনে একটা বে-পরোয়া ভাব এবং ভয় দুটোই এল। কোনও ঝামেলায় না পড়ে ভয়-ডর না জানতে দিয়ে আমি কাজ হাসিল করেছি। মনে হল আমার কাছে জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তু উন্মোচিত, ক্লাবে ঢুকলাম বিশ্ববিজয়ীর মনোভাব নিয়ে। সিগারেটের ধোঁয়া, জুয়া এবং

পানীয় আমার মতো বিজেতার যোগ্য সঙ্গী। সেই মাতাল মুহূর্তে যে-রঙিন পৃথিবীতে আমি এলাম তা আমার আত্মাকে গ্রাস করে নিল। ক্লাব থেকে যখন বাড়ি ফিরলাম, বাড়িময় বাস্তবতা। সরোজ কিছু বলেনি, সে স্বাভাবিক ছিল। সে যদি বলত, সেদিন আমাদের দুজনের পিকনিকে যাওয়ার কথা ছিল, আমি তার কথার মধ্যে বিদ্রূপটুকু ধরতে পারতাম। আমি সতর্ক হয়ে যেতাম। কিন্তু সে কিছু বলল না। আমার পাশে চুপচাপ শুয়ে রইল। আমার সাহস হল না, সে চোখ খুলে শুয়ে আছে না ঘুমিয়ে তা দেখার। আমি ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। সকালে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল একটাই। ঘুম থেকে উঠে দেখি, ক্লাবে আমি যে-টাকা জিতেছিলাম তার পুরোটা টেবিলের ওপর রাখা। কী করে সেখানে তা এল একথা ভাবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

এসব কথা এখন বলছি সরোজ মরে যাবার পর। সে যখন বেঁচে ছিল সে-সময় সত্যি কথাগুলো বলা আর তার মারা যাবার পরে বলা, দুয়ের মধ্যে বিস্ময়কর তফাত। একটা শীতল স্রোত বোধহয় বইছিল আমার এবং সরোজের মধ্যে। সে বরাবরের মতো ছিল শান্ত। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই সে কোনওভাবে টের পেয়েছিল সিলভিয়ার মৃত্যুর কথা। সেও মরেছিল স্বামীর ঘরে আগুনে পুড়ে। শুধু আমিই জানি তার মৃত্যু স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক।'

'তা হলে সত্যি কথা বলতে অসুবিধা কোথায়?' পদ্মা প্রশ্ন করল। মনে হল, পদ্মার মনে এবার অশ্রদ্ধা জাগছে আমার প্রতি। এই অশ্রদ্ধা জেনেশুনেই আমি তার মনে ঢুকিয়েছি। আমি চাইছি, একজন অফিসারের সংসারে যে-ট্র্যাজেডি ঘটে গেছে, যে-দুর্ঘটনা ঘটেছে এক ভদ্রলোকের জীবনে, সে-কথা ভেবে আমার প্রতি তার যেন কোনও আকর্ষণ না থাকে। শুধু এটা নয়, যে-কোনও সম্পর্কই আমার কাছে এখন খুব ভারি মনে হচ্ছে। আমি তাই বলতে বলতে উঠে পড়লাম, 'চল, তোমার বাড়ি কোন্ দিকে বলো, আমি তোমায় নামিয়ে চলে যাব।'

'হতভাগা মানুষের বিচিত্র পাপবোধ।' আমি বলে যেতে লাগলাম, 'মৃত্যু এমনই এক হিমশীতল ঘটনা যা সব শেষ করে দেয় এবং আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি জীবনের নানা বৈচিত্রের কথা ভেবে। বুঝলে পদ্মা...।'

পদ্মা আমার ঘাড়ে তার ঘাড় ছুঁইয়ে বসে ছিল, যেন ভয় পেয়েছে।

'তোমায় সত্যি বলছি, সরোজের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নয়।' আমি বললাম।

'আমি তা জানি। তবু কেন আপনি একথা বলছেন?' সে বলে উঠল।

'যার অন্তরে পাপ তার সংস্পর্শে এলে ভাল মানুষও মারা পড়ে। এটাই আমার ভয়। সিলভিয়া ও আমার সম্পর্কের মধ্যে কোনওদিনই কিছুমাত্র নোংরামি ছিল না। যে-কোনও জায়গায় দাঁড়িয়ে একথা আমি বলতে পারি। আমাদের মধ্যে ছিল নির্মল প্রেম। কিন্তু এক বিচিত্র পিপাসা থেকে তার সূত্রপাত।' বলতে বলতে আমি হাসতে থাকি। পদ্মার কানে সেটা হয়তো শোনাল গভীর জলে পড়ে বাঁচার জন্য হাত-পা-ছোঁড়া মানুষের হাসির মতো। কিন্তু পদ্মা হাসল না।

'সরোজের মৃত্যুর কথা বলার সময় লোককে আমি অনেক নতুন নতুন ঘটনার কথা বলি। কেউ কেউ যখন জানতে চায়, আমি বলি তার চিৎকার শুনেছিলাম। কাউকে বলি সে ফোনে চিৎকার করেছিল। আবার কখনও বলি, সে মাঝখানের হলঘরে পড়ে ছিল, আমি পৌঁছবার আগেই লোকেরা এসে আগুন নিভিয়ে দেয়, কিন্তু ততক্ষণে তার প্রাণ ফুরিয়ে গেছে। আমার শোক তাদের মনে এক আদর্শ সংসারের ছবি তুলে ধরে। কিন্তু এই দুর্ঘটনা তাদের সতর্ক করেনি। তাই আমি এসব কথা বলছি। এখন যেসব ছায়া আমাদের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সেগুলো দেখেও মনে হচ্ছে পুলিশ কিংবা হাকিম। মৃতদের সম্পর্কে, যাদের হয়েছে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা, তাদের সবার সম্পর্কে এক পাপবোধ মাথা তুলেছে আমার মনে। এই বেদনা কি আমাকে উদ্ধার করতে পারবে?'

'গাড়িটা একটু থামাবেন?' পদ্মা বলে উঠল।

আমার কাহিনীর গভীরে হাতড়াতে হাতড়াতে ব্রেক কষলাম। সঙ্গে সঙ্গে নামল না সে। ভয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমি। চুপচাপ বসে রইলাম। দয়া, ভয় না অশ্রদ্ধা কী তার মনে এখন? আমি কি তাকে আমার কাহিনী শোনালাম অফিসের ওপরওলার মতো নাকি সাধারণ এক মানুষের মতো অথবা মধুর কোনও প্রেমিকের মতো।

'আমি আসি।' শুনলাম সে বলছে। পাখির মতো ক্ষিপ্রতায় সে নামল, সুন্দরী যুবতী শরীরটা সামলে। আমায় অবাক করে দিয়ে সে আমার হাতে চাপ দিল। রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম। সে হাসছে না। তার মুখে কোনও অনুভূতির ছবি নেই। গাড়ি থেকে নেমে সে যখন তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল আমার চোখ তার পেছনে লেগে রইল। পেছন থেকে তাকে সিলভিয়া এবং সরোজের

মতো দেখতে লাগছিল। কিছুটা গিয়ে পদ্মা থামল এবং ঘুরে বন্ধুর মতো জানতে চাইল, 'কাল সকালে আটটায় আবার আসব কি?'

চিন্তায় পড়লাম। 'না, কাল আমি শহরে থাকব না। আমার কথা শুনে যদি বোর হয়ে থাকো কম কোরো লক্ষ্মীটি' বলে এগিয়ে গেলাম। সবুজ গাছপালার ভেতর দিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম আমি। আশা করি, আমার মনোভাব আমি তাকে স্পষ্ট করে বোঝাতে পেরেছি।

অনুবাদ : জি. কুমারস্বামী, আহিরুল হাসান

[পি. লঙ্কেশের জন্ম কর্ণাটকে, ১৯৩৫ সালে। কন্নড় ভাষায় তিনি একজন আধুনিক ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবি এবং ছোট গল্পলেখক। স্বয়ম্ভূ প্রতিভাধর এই লেখকের স্নাতকোত্তর শিক্ষা মহীশূরের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিক্ষকও এখানেই। পরে শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি 'লঙ্কেশ পত্রিকা' নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেন। ৫০টিরও বেশি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে কন্নড় ভাষায়। 'কালু কালাকুভা সময়' নামে ছোটগল্প গ্রন্থটি সাহিত্য একাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়। 'তুঘলক', 'সংক্রান্তি', 'তালেডাণ্ড' প্রভৃতি নাটকগুলি কন্নড় সাহিত্যে আলোড়ন তুলেছে। সময়ের প্রসঙ্গ এবং সামাজিক ব্যঙ্গধর্মীতাই তাঁর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর লেখা ছোটগল্প মানুষের সূক্ষ্ম সংবেদনার দিক তুলে ধরেছে। পি. লঙ্কেশ অবশ্যই একজন বিশিষ্ট সমালোচকও। এছাড়া কন্নড় ভাষায় 'ইডিপাস' এবং 'আস্থিগোনে'র অনুবাদ করে তিনি প্রশিদ্ধ অনুবাদক হিসেবেও পরিচিত হন। লঙ্কেশের মৃত্যু হয় ২০০০ সালে। এই গল্পটি 'কালু কালাকুভা সময়' নামক ছোটগল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।]

—

হিমাচলপ্রদেশ

মেঘে ঢাকা মুখ

হিমেশ

গত বছর শীতকাল নাগাদ হঠাৎই একটা ভাঙ্গাচোরা ধরনের বাড়িতে উঠে এলাম। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ছিলেন বাড়িটার আসল মালিক। উনিশ শ' উনপঞ্চাশ সালে তাঁর দেহাবসান হয়। এর ঠিক দু' বছরের মাথায় লালা বীরচন্দ বাড়িটা কেনেন এবং দশ বছরের মত সেখানে বসবাস করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর এক মাত্র সন্তান দুর্ঘটনায় মারা যায়। এদিকে যে কারণেই হোক বীরচন্দের প্রপুত্র অসৎ সঙ্গে মিশে একেবারে গোল্লায় যায় এবং নিজের ধ্বংসে নিজেই ডেকে আনে। বীরচন্দের সেই বখে যাওয়া নাতিই আমাকে বাড়িটা ভাড়া দেয়। এবং ভাড়া দেয় এই শর্তে যে বাড়ির যা কিছু মেরামতি সব আমাকেই করতে হবে। কম ভাড়া বলে আমি রাজি হয়ে গেলাম।

যদিও বাড়িটার ভালমতই মেরামতির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যতটুকু না হলে নয় তার বেশি আমি স্বরালাম না। মেরামতির সময় মান্ধাতার আমলের অসমাবপত্রে ভরা ভাঙ্গাচোরা এক গুদাম ঘর থেকে একটা ড্রয়ার টেনে কিছু মলিন কাগজপত্র পেলাম। পরে বাড়ি সারাইয়ের কাজ চুকে গেলে খেয়ালবশত একদিন কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা আবিষ্কার করলাম।

কাগজগুলো পড়তে পড়তে লাখু নামে এক মুচির সন্ধান পেলাম এবং সত্যি কথা বলতে কি একটু অবাকই হলাম। একজন বিদেশীর সঙ্গে এক মুচির কি সম্পর্ক থাকতে পারে? পরে বিষয়টা পরিষ্কার হল। পূর্বপুরুষের থেকে পাওয়া চর্মশিল্পে এই লাখু ছিল একজন দক্ষ কারিগর। তার পূর্বপুরুষেরা সম্রাট শাহজাহানের রাজসভায় খুবই সম্মানীয় ছিল। তারা যে সব চামড়ার জিনিস তৈরী করতো, সেগুলো হত লাল রঙের, নরম, পাতলা এবং উজ্জ্বল। একবার লাখুর প্রপিতামহ সম্রাটের কাছ থেকে এক শ' স্বর্ণমুদ্রা উপহার পেয়েছিল। কারণটা হল খরগোশের চামড়া দিয়ে সে এমন একটা সুন্দর পোষাক বানিয়েছিল যে সম্রাট যখনই কাশ্মীরে শিকারে যেতেন তখনই তাঁর টোগার (আলখাল্লা) সঙ্গে লাগিয়ে নিতেন।

ম্যাকডোনাল্ড বর্ণিত ঘটনাটির শুরু আঠেরো শ' চল্লিশ সালের কোন এক শীতকালীন শীহিম সকালে। স্থান কাংড়া

জেলার নুরপুর। গল্পের নায়ক লাখু তখন খুবই ব্যস্ত। হরিণের চামড়াগুলো বিয়ুল (যাকে আমরা পিপুল গাছ বলি) গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিচ্ছে সে। চল্লিশটা হরিণের চামড়া তাকে এখনই বেডি করে রাখতে হবে। কারণ আম্বালা থেকে ট্যালবাট সাহেব এই এলেন বলে। দেরি করা মোটেই চলবে। না। ওই চামড়াগুলো নিয়ে সে ইদানীং কয়েকদিন খুবই ব্যস্ত। একটা বড় মাটির ডাবাতে (গরুর জাবনা দেওয়া গামলা) চুন মেশানো জলে প্রথমে চামড়াগুলোকে ডুবিয়ে রাখতে হয়। দীর্ঘ কুড়ি দিন ধরে এক রকম বাধ্যতামূলক সতর্কতার সঙ্গে এই চামড়াগুলোর উপর নজর রাখা হয়। ডাবা থেকে এরপর এক এক করে চামড়াগুলো তুলে নিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেগুলোতে ভাল করে নুন ঘষা হয়। তারপর সারা দিনভর সেগুলো রোদ্দুরে শুকতে থাকে। কাঠের গুঁড়োর সাহায্যে ভাল করে আবার ঘষা হয়। চামড়া থেকে লোম তোলার জন্য এর থেকে ভাল পদ্ধতি আর নেই। ছুরির থেকেও ভাল কাজ হয় এতে। এরপর জলে ডুবিয়ে রেখে মাটির ভাঙা ভাঁড়ের টুকরো দিয়ে এগুলিকে ঘষা হয়। লাখুর এতেও খুঁতখুঁতানি যায় না। এরপর আবার ছুরি দিয়ে ঘষে ঘষে সে চামড়াগুলো মসৃণ করে।

পুরোনো নথি পড়ে আরও জানতে পারি যে কি করে আরও উন্নতমানের চামড়া তৈরী করা যায়। ডাবার মধ্যে জল ভর্তি করে তাতে ছ' সের বার্লি আর আড়াই সের নুন মিশিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরী করা হয়। সেই মিশ্রণে চার দিন ধরে চামড়াগুলোকে ডুবিয়ে রাখা হয়। পরবর্তী পাঁচ দিন দু'সের গোবরের মিশ্রণে এগুলোকে আবার ডুবিয়ে রাখা হয়। খুরপি দিয়ে চামড়াগুলোকে পরিষ্কার করে পুনরায় সাত সের যবের দানা, তিন সের নুন আর জল মিশিয়ে তিন দিন ধরে ডুবিয়ে রাখা হয়।

এরপর যেটা শুরু হওয়ার কথা, সেটা হল সব থেকে জটিল পদ্ধতি। আর এইখানেই লাখুর কেরামতি অসাধারণ। নুরপুরের কোথাও লাখুর মত এমন এলেমদার কারিগর নেই যে এত ভাল রঙ করতে পারে। ঝাকু অবশ্য আছে। তবে লাখুর মত নয়। চার সের লাক্ষা, দু' ছটাক (এক ছটাক সমান পঞ্চাশ গ্রাম) সল্ট পিপার আর দু' ছটাক লোডার ফলের খোসার মিশ্রণে চামড়াগুলোকে ফোটাতে হয়। যে কোন ভাবেই তা যেন বেশী ফোটানো বা কম ফোটানো না হয়ে যায়। তা হলেই সর্বনাশ। বেশী ফোটালে চামড়াটাই নষ্ট হবে আর কম ফোটালে লাল রঙটাই আসবে না। এই কাজটা লাখু একেবারে নিখুঁতভাবে করতে পারে। তিন দিন এই ভাবে রাখার পর অমলতাশ গাছের ছালের ক্বাথ তৈরী করে তার মধ্যে চামড়াগুলো আরও পাঁচদিন চুবিয়ে রাখতে হয়। সবশেষে নুনের গুঁড়ো দিয়ে সেগুলোকে ঘষতে হয়। এই সব পদ্ধতিগুলো লাখুর একেবারে নিজস্ব গোপন ফরমুলা যা সে তার পূর্বপুরুষ থেকে পেয়েছে। এই রকম উন্নত ধরনের চামড়া তৈরী করার কাজ সে অত্যন্ত গোপনে এবং গভীর রাতে করে থাকে যাতে করে কেউ তার গোপন রহস্য না জানতে পারে।

ওই চল্লিশটা চামড়া এরপর গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে তবে সে নিশ্চিন্ত। এখন যে কোন মুহূর্তে এইগুলো সে ডেলিভারি দিতে পারে। এতদিনে লাখুর মনে শান্তি। ঘাসের গাদার উপর গ্যাঁট হয়ে বসে হুকো টানতে থাকে আর নিজের কাজ তারিয়ে তারিয়ে দেখে। আর মনে মনে আনন্দে নেচে ওঠে। কম পরিশ্রম তো নয়। চল্লিশটা চামড়া তৈরী করতে ওর খরচ হল মাত্র বার টাকা ন' আনা ছ' পয়সা। বিক্রি হল একেবারে এক লাফে চারশ টাকায়।

এই চামড়া দিয়ে তৈরী দস্তানা এবং টাইট পাজামা কাংড়ার রাজারা ব্যবহার করতেন। সম্রাট শাহজাহানের কাছেও পৌঁছে যায় এই সব তৈরী জিনিস। তিনি ছিলেন রসজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি। খুব প্রশংসা করতেন এই সব কাজের।

নুরপুরের মিঞা নিহাল সিং ছিলেন খুবই শিকারপ্রিয়। শিকার করে আনার পর তিনিই লাখুকে হরিণ, খরগোশ ইত্যাদির চামড়া দিতেন। এই সূত্রে নিহাল সিংয়ের পরিবারের সঙ্গে লাখুর একটা সখ্যতা গড়ে ওঠে। তার চেহারা ছিল খুবই সুন্দর। এক কথায় সুদর্শন। নিহাল সিংয়ের কন্যা কমলার জম্মুর এক রাজ পরিবারে বিয়ে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কমলার স্বামী যুদ্ধে মারা যায়। কমলা শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে আসে। সেই থেকে কমলার সঙ্গে লাখুর দেখা সাক্ষাৎ। লাখুর গলা ছিল খুব সুন্দর। গান গাইতো অসাধারণ। কমলা লাখুর প্রেমে পড়লো। দু'জনের আশনাই গাঢ় হল। কিন্তু বিয়ে হল না। লাখুর পক্ষে সেই যুগে কমলাকে বিয়ে করা সম্ভব ছিল না। কারণ সে ছিল নীচু জাতের। এদিকে কমলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লো। লজ্জা ঢাকতে সে করলো আত্মহত্যা। মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে লাখু একেবারে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হল।

ম্যাকজেনাল্ড সাহেবের কাগজ থেকে আরও জানতে পারলাম যে লাখুর নামযশ সাত সমুদ্রের ওপারে পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। চর্মশিল্প মহলের সবাই তার কাজের দক্ষতার প্রশংসা করতো। আগে হত কি, ভারত থেকে কাঁচা মাল ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে তৈরী জিনিসে রূপান্তরিত হয়ে ভারতে পুনরায়

ফিরে আসতো। লাখুর দক্ষতায় এই ব্যবস্থা বাধা পায়। লাখুর তৈরী জিনিস নিয়েই ব্রিটিশ মন্ত্রী আমলারা নিজের দেশে পাড়ি দিত। এই ব্যবস্থা ইংরেজ ব্যবসাদাররা মেনে নিতে পারলো না। কারণ তাদের ক্ষতি হতে লাগলো। তারা ট্যালবাট সাহেবকে সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়োগ করলো। লাখু তখন কমলার শোকে মুহ্যমান। পাগল পাগল ভাব। ট্যালবাট সাহেব এই সুযোগটা কাজে লাগালো। লাখুর এই রকম মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে ট্যালবাট সাহেব তার সামনে কানপুরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখালো। সেখানে নাকি তার জন্যে স্বর্গরাজ্য অপেক্ষা করছে। লাখু টোপ গিললো আর নুরপুর ত্যাগ করলো।

এরপরের ঘটনা অন্ধকারে ঢাকা। লাখুর পরিণতি কি হল, সে আদৌ কানপুরে গেল কিনা এসব কোন কথাই ম্যাকডোনাল্ডের লেখায় পাওয়া যায় নি। তিনি হঠাৎই কেন জানি থেমে গেলেন এই ব্যাপারে। কিন্তু একটা কথা খুবই পরিষ্কার। লাখুর চলে যাওয়ার পর নুরপুরের চর্মশিল্পের অকাল মৃত্যু হয় এবং ব্রিটেনও তার একচেটিয়া চামড়ার ব্যবসা মনের আনন্দে চালাতে থাকে।

বসে থাকতে থাকতে আমি কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। এক সময় ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের কাগজগুলোর কয়েকটা আমার হাত থেকে ফড়ফড় করে উড়ে গেল। আমি চমকে উঠে সতর্ক হলাম। মনটা কেমন জানি ভারী হয়ে উঠলো। কাগজগুলো নিয়ে তড়িঘড়ি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিশিখা দপ করে জ্বলে উঠলো এবং মুহূর্তে নিভেও গেল। তারপর ধোঁয়ার কুণ্ডলির সঙ্গে সঙ্গে নুরপুরের উজ্জ্বল ইতিহাসের স্মৃতিটুকু চিরতরে হারিয়ে গেল মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কোন গহীন কোণে।

অনুবাদ : তরুণ দীর্ঘাঙ্গী

[হিমেশ. এস. রতন (১৯৩৫) হিমাচল প্রদেশের একজন প্রখ্যাত বিদ্যোৎসাহক সাহিত্য রচয়িতা, ছোট গল্পকার এবং নাটকার। তিনি 'হিমেশ' নামেই পরিচিত। তিনি ডেইলি দেশ সেবক সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা এবং বিভাগীয় লেখক। তাঁর পাঁচটি ছোট গল্প সংকলন এবং বারটি নাটক আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গল্পটিতে সুস্পষ্ট এক সংবেদনশীল চিত্তভাবনার পরিচয় মেলে।]

তামিল

ভুবন ও গুরুর দৃষ্টি

আর. চূড়ামণি

হঠাৎ একটা মুহূর্তে আমি ওঁকে লিফট দিয়েছিলাম।

মাউন্ট রোডে একটা পেট্রোল পাম্পে টাকা দেওয়ার আগে গাড়ির বিল দেওয়ার জন্য আমি দাঁড়িয়েছিলাম। সামনের বাসস্টপে ঐ ভদ্রলোক। বছর পঞ্চাশ হবে।

ধুতিজামা পরে যেমনেতে একটু রঙ বদলাচ্ছে। কপালে ঘাম লেগে রোদে চকচক করছে। পায়ে চটি, এ-পা ও-পা করছে। মুখখানি ধুতির খুঁটে মুছছে। একটা কাঁধে চামড়ার ব্যাগ বগলে রেখে দূরে বাস আসছে কিনা তাকিয়ে দেখছে। এরকম দেখে এঁর মনে হল উনি অনেকক্ষণ বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছেন। বাসস্টপে কেউ ছিল না। অনাথের মত প্রায় দাঁড়িয়ে।

আমার আগে দুটো গাড়ি পেট্রোল ভরে বেরিয়ে গেল। আমিও আমার অ্যামবাসাডার পেট্রোল ভরে ওনার পাশে এসে দাঁড়ালাম। জানলার বাইরে মাথা বের করে, 'একসকিউস মী, স্যার আপনি কোথায় যাবেন?'

উনি চমকে উঠলেন এবং নতুন একজন জিগ্যেস করাতে অবাক হয়ে একটু থতমত খেয়ে পিছিয়ে গেলেন।

'স্যার, আপনি কে বুঝতে পারছি না তো?

"আমিও আপনাকে চিনি না। সামনে পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল ভরতে এসে আপনাকে দেখলাম। যদি আমরা একই রাস্তায় যাই তাহলে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো ভেবেছি।"

উনি একটু বিভ্রান্ত হয়ে তাকালেন। একটু মাথার ঠিক নেই এরকমও মনে হল। অত কাছে থেকে দেখছেন বলে পঞ্চাশ মনে হয় না। টাকমাথা চেহারায় ক্লান্তি বয়সের জন্য হয়নি।

"আমার নাম এস. টি. রাজশেখর। সারাবানা এক্সপোর্টস অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার।"

পকেট থেকে পার্স বের করে আইডেন্টিটি কার্ড দেখালাম।

"ছি, ছি, কেন এসব..."

"আমি আসল লোক কিনা আপনাকে জানতে হবে তো? না হলে আপনি যদি আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার লোক মনে করেন।"

তখন উনি খুব হো হো করে হাসলেন। দাঁতগুলো ঝকমক করে উঠলো, "আমি কি লাখপতি, মন্ত্রী অথবা ভিআইপি অথবা কম বয়েসি মেয়ে যে আমায় তুলে নিয়ে যাবেন। আমি খুব সাধারণ লোক।"

আমি ঐ হাসিটা দেখতে পাইনি।

"বাসের জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?"

"অভ্যাস।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"টি. নগর, তুরুমালাই স্ট্রীট।"

"গাড়িতে উঠুন", সামনের পাল্লা খুলে দিলেন।"

"না, স্যার, আপনার কোথাও যেতে হবে"...ওঁর চোখ ছিল দূরে অন্য কোথাও।

"আমি বাসুল্লা রোডে যাবো, আপনাকে নামিয়ে দেবো।"

"শুধু শুধু কষ্ট করা।"

"আমার কোনো কষ্ট হবে না, আমিও সঙ্গী পাবো। কতক্ষণ আপনি রোদে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবেন।"

"ভুল হয়ে গেছে, ছাতা আনতে ভুলে গেছি।"

আবার উনি রাস্তায় তাকিয়ে দেখছেন, বাসের দেখাই নেই।

"বাসের জন্য দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই। হঠাৎ কোনো হরতালও হতে পারে। আপনি উঠে পড়ুন।"

"আপনি কি সত্যিই বাসুল্লা রোডে যাচ্ছেন?"

"উঠে পড়ুন, যা বলার গাড়িতে বসে বলব।"

উনি এখনও ইতঃস্তত করছেন। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা আর চলছে না, ফলে উঠে পড়লেন।

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, "আমার নাম মহালিঙ্গম, প্রাইভেট ফার্মের ক্লার্ক।" তারপর উনি পাশের সিটে বসলেন। পাল্লা আটকে গাড়ি স্টার্ট করলাম।

পাশের ভদ্রলোক ক্লান্ত পা দুটো সামনে সোজা ছড়িয়ে দিলেন। চোখটা বন্ধ করে বড় নিঃশ্বাস নিলেন, কিন্তু চামড়ার ব্যাগটা আগের মতই শক্ত করে ধরে থাকলেন।

"এটা কি খুব জরুরী ব্যাগ?"

"হ্যাঁ।" বলে আরও জোরে ধরলেন।

"কী জিনিস আছে আমি কি জানতে পারবো?"

"কুষ্ঠি, আমার মেয়ের কুষ্ঠি। হঠাৎ এসেছে। আমার মতো সাধারণ একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকের হাতে এর চেয়ে মূল্যবান আর কী থাকতে পারে?"

গাড়ির হাওয়ার ভেতরও ওঁর মুখে ঘামের বিন্দু আর প্রতিটি বিন্দু বলছে, 'মেয়ের বাবা, মেয়ের বাবা'।

হঠাৎ চিন্তাটা ঝাঁকি খেল। আমিও একজন মেয়ের বাবা। কিন্তু আমার গায়ে রোদে দাঁড়ানো ঘাম নেই, ঘেমো গন্ধের পরিবর্তে আমার গায়ে আফটার শেভ লোশনের গন্ধ। আর ওনার সুতির ধুতির পাশাপাশি আমার টেরিন প্যান্ট, ওনার চটির জায়গায় আমার পালিশকরা কালো জুতো।

"আমারও একজন মেয়ে আছে। নাম, নিরঞ্জনী। আপনার মেয়ের নাম কী?"

"ভুবনেশ্বরী ভুবনা বলে ডাকি।"

নিরঞ্জনীকে, নিকিটিকি ডাক নাম, সেটা আমি বলি না।

"থিরুমালাই স্ট্রীটের বাড়িতে ওর কুষ্ঠীটা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।"

"জানাশোনা?"

"না, অফিসের একজনের কাছে জানতে পেরেছি; ওদের বেশি চাহিদা নেই, সেজন্য, কুষ্ঠীটা দিতে যাচ্ছি। কপালে থাকলে বিয়েটা হবে।"

"বাড়ির ঠিকানা জানেন?"

তখন উনি বললেন, "হুঁ বলে ব্যাগের জিপ খুলে কিছু কাগজ উল্টে পাল্টে দেখলেন। চারকোণায় হলুদ লাগানো কুষ্ঠিটা চোখে পড়ল। আরও কাগজ ছিল, ঠিকানা হতে পারে, কিংবা বন্ধুর কোনো চিঠি, নাহলে অন্য কিছু থাকতে পারে।

সোজা করে গাড়িটা চালালাম। লাল সিগন্যাল-এ গাড়ি থামল। তখন উনি বললেন, "এটা দেখেছেন?"

মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম, ব্যাগ থেকে ছোট একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো বার করলেন। "এটাই ভুবনা।"

খুব রূপসী বলতে না পারলেও মুখে একটা সরল শ্রী আছে। বড় বড় চোখ, তেলমাখা কালো চুলের রাশি টাইট করে বাঁধা। কানে এক পাথরে কানপাশা, আসলে লালপাথর, ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট ছবিতে কালো দেখাচ্ছে—নিশ্চয়ই হীরে

নয়। কপালের টিপটা মুখের তুলনায় বড় লাগছে। আর একটু সাজলে সৌন্দর্য আর একটু খুলতো বা বাড়তো। কিন্তু বড় বড় চোখের তাকানোয়, জীবনে কী হবে, বিয়ে হলে তারপর কী হবে—এইসব ভেবে ভেবে একটা বিস্ময়, একটা বিস্ময়ের সৌন্দর্য সারা মুখে।

"এটাই ভুবনা।" আর একবার বলে মহালিঙ্গম আমার মুখে তাকিয়ে দেখলেন।

"খুব ভালো দেখতে, কত বয়েস?"

"গত ডিসেম্বরে উনিশ শেষ হয়ে গেছে।"

"সবে উনিশ বছর? বিয়ের জন্য এত তাড়া কেন?" তখন নিজের মনে ভাবছেন, নিজের মেয়ের বয়স কুড়ি। এম. বি-এ পাশ করে কমপিউটার শেখ করে কোনো একটা ফরেন ডিগ্রি নিতে হবে, মনে এল।

"তাড়াতাড়ি কোথায়? সম্বন্ধ দেখতে শুরু করলে কি বিয়ে হয়ে যায়? ভুবনা যখন আঠারো হয়েছে তখন থেকেই ওর কুষ্টিটা আমি বার করেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো ভালো জায়গা পাইনি।" বলে ফটোটা ব্যাগের ভেতর পুরে নিলেন।

"আঠারো। আঠারোতে মেয়ে তখন বাচ্চা।"

"কোন্ পরিবারে জন্মেছে, তার ওপর নির্ভর করছে।" কথাটা আমার মাথায় জোরে বাড়ি মারল। আমি কোনো কথা বললাম না। সবুজ আলো জ্বলতেই আমি গাড়ি স্টার্ট করলাম।

"আমার ক্ষমতায় ওকে প্লাস টু পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছি।"

ওর পরে আর একটা মেয়ে ও আর একটা ছেলে আছে। বউ বাড়িতে সেলাই করে কিছু আয় করে। তা-সত্ত্বেও একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া কী এত সোজা। জামাইগুলোকে হাতী-ঘোড়ার দাম দিতে হয়, আমি কী করবো বুঝতে পারছি না, আর তার জন্য কী মেয়ের বিয়ে না দিয়ে রাখতে পারবো?"

গাড়িতে বসেও কথা বলার ক্লান্তি ওনার সারা শরীরে একটা চাদরের মতো জড়িয়ে ধরলো।

তিরুমালাই স্ট্রীটে দু-বাড়ির আগে উনি নেমে পড়লেন। "আমাকে গাড়ি করে নামতে দেখলে ওরা আমাকে পয়সাওয়ালা ভাববে আর রেটটা বাড়িয়ে দেবে।" লিফট্ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। "আজ গাড়ি চড়ার ভাগ্য আছে" বলে আমি বিদায় নিলাম। উনি হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন। আমিও প্রতিনমস্কার জানালাম। তারপর উনি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন।

আমি অ্যাম্বাসাডারকে মাইলাপুরের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। ওখানে একজন শিল্পপতি বন্ধু আছে। মেয়ের কেরিয়ারের জন্য ঠাকুরের কৃপা পাওয়ার জন্য এরকম লোকের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। আমার কোনো কাজ নেই বাসন্তা রোডে।

ঈশ্বর ভালো রাখুন, মঙ্গল করুন। নিবিটিকি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে টিভ জব করেছে ভারতে। শেষে সে কমপিউটার ডিপ্লোমা করেছে, পরে আমেরিকায় কমপিউটার বিজ্ঞানে ডিগ্রি পেয়ে একবছর পরে বাঙ্গালোরে ফিরে একটা বড় কোম্পানিতে অফিসার হয়েছে। স্বামীও বিদেশে পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার। কনের জন্য ওকে চার লাখ দিয়ে কিনেছি বর হিসেবে। কনে পণ দিয়ে। তাদের একটি বাচ্চা, পরিবার কল্যাণ প্রকল্প অনুযায়ী। বাচ্চা নিকি কনভেন্টে পড়ে।

ঈশ্বর আমাকে নিরাশ করেননি। আমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমি প্রথম একটি কোম্পানির জি. এম. হয়েছি। পরে কোম্পানির ডাইরেকটরসের মধ্যে একজন হয়েছি। রিটায়ারমেন্টের পরে আমি যোগ দিই আমার নিজের কোম্পানি 'নিকি ফাইনান্সে'।

আমার বউ খুব গরমে বা রোদে কাঞ্জীভরম শাড়ি ছাড়া কিছু পরে না। ওর খুব প্রিয় চিনা গয়না, আমস্টারডাম কাট ব্লাউজকেট হীরে পছন্দ। আমরা বম্বেবাসী। তিন বছর অন্তত মাদ্রাজে আসি। এখানে আমাদের আত্মীয়রা আছে। মেরিন বীচ দেখতে আসি। তামিল হাওয়া শরীরে লাগানোর জন্যও অবশ্য, কারণ যতই আমরা ডায়েবেটিসের ডায়েট আর মাথায় ডাই ব্যবহার করি না কেন বয়স বাড়লে শৈশব আমাদের টানেই। আর স্ত্রীর কাঞ্জিভরম কিনতেও মাদ্রাজে আসি।

এখন আমার গায়ে মাদ্রাজের হাওয়া লাগছে।

পেট্রোল ভরবার জন্য আমি গাড়ির ভেতর ব্যাংকে বসে আছি। অ্যাম্বাসাডার মারুতির পরিবর্তে আমি কন্টেসার কিনেছি। সব এই এক সপ্তাহ আগে এই মাদ্রাজেই। পরে বোম্বে নিয়ে যাবো। নতুন গাড়িতে চেপে কাল সকালে বউ আর মেয়েকে নিয়ে 'মাঙ্গাড়' মন্দিরে যাওয়ার জন্য প্ল্যান করছি। তার জন্য পেট্রোল ভরার জন্য এসেছি।

মনে হল একটু দেরি হবে। নেমে রাস্তায় তাঁকে দেখলাম। অনেক আওয়াজ, ভীড়, গাড়ি, বড় বড় বিল্ডিং দেখে মনে হল মাদ্রাজও অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। চোখ পিটপিট করে তাকাই ওপরে, ডিস অ্যান্টেনা, কালার টিভি, আওয়াজ, সব শহরই কি আলাদা? কিন্তু রাস্তায় 'ও, এগ্রাইরা, বাড়িতে বলে এসেছো', 'রাস্তায় মরতে এসেছো' —এই কথাগুলো শুনে মনে হয় আমরা সত্যিই সকলে মাদ্রাজেই আছি।

রাস্তায় গাড়ি, ধুলো, আওয়াজ, বাড়ি, টি.ভি-র

আওয়াজ, অ্যান্টেনার শব্দ মানুষের যাওয়া আসা সব মিলে এক নিমেষে চোখে একটা পুরো দৃশ্য উপস্থিত হল।

উনি...।

চৈত্রের গরমে ধুতি-জামা পরে উনি দাঁড়িয়ে বগলে কালো লেদার ব্যাগ চেপে বাসস্টপে। চোখের ওপরে হাত রেখে দেখছিলেন, বাস আসছে কিনা।

কালো চশমা খুলে আমার কনটাক্ট লেন্স পরে আমি পরিষ্কার দৃষ্টিতে দেখলাম উনিই, সন্দেহ নেই। কী নাম? চোকোলিঙ্গম, রামলিঙ্গম? মুখের চেহারা দেখে মনে হয়, চশমা-পরা মাথার চুল নেই, মনে হল—ওরকমই।

নিমেষে মাথায় আলো খেলে গেল। দেখে মনে হল একটা বাচ্চা ছেলে ঘুড়ির মাঞ্জা ও সুতো ঘোরাতে ঘোরাতে অনেক পিছনে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে, উনি রাস্তার ওপারে, মনে হচ্ছে ১৫ বছর আগে ফিরে গেছি, ১৯৭০-এ চলে গেছি।

পনেরবার ক্যালেণ্ডার পরিবর্তন হয়ে গেছে। বার বছর মামল্লাম (কুম্ভ মেলা জাতীয় উৎসব) হয়ে গেছে। ছজন প্রধান মন্ত্রী চলে গেছে। সারা বিশ্বে একটা দেশ মুছে গেছে। একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ২৮ বছর জেলে থাকার পর মুক্তি পেয়েছে। মহাকাশে স্যাটেলাইটে বৃহস্পতি গ্রহে আমেরিকার মহাকাশযাত্রীরা পৌঁছে গেছে। কিন্তু উনি ঐখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। মাথাটায় একবার ঝলক দিয়ে এই জগতে আবার আমি ফিরে এলাম। গাড়িতে পেট্রোল ভরে ওঁর কাছে পৌঁছলাম। নিচে নেমে, 'ভালো আছেন? আমাকে চিনতে পারছেন?' ওঁর চমকানোটা আমি আগেই দেখেছি। হতচকিত হয়ে মুটা একটু কোঁচকালেন। তখন দেখলাম মাথায় একটা সাদা চুল, কপালে বলিরেখা, গালে ভাঁজ।

'আমি রাজশেখর, এস. টি. রাজশেখর। আপনার মনে পড়ছে, পনের বছর আগে এই বাসস্টপ থেকেই আমি আপনাকে লিফট্ দিয়ে ছিলাম?'

সঙ্গে সঙ্গে ওনার ভাবলেশহীন মুখ দেখে মনে হল, মনে করতে পারছেন না। আর লেদার ব্যাগটাকে জোরে চেপে ধরলেন। ওটা দেখে হঠাৎ নিজের জায়গায় ফিরে এসে বললাম, 'আপনার নাম মহালিঙ্গম না?

'হ্যাঁ।'

'আগেরবার আপনার মেয়ের হরস্কোপ নিয়ে আপনাকে তিরুমালাই স্ট্রীটে আমি পৌঁছে দিয়েছিলাম। এখনও আসুন কোথায় যাবেন, নামিয়ে দেব।'

'একটু মনে পড়ছে...আপনি বলেছিলেন না বাসুদ্রা রোডে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'গিয়েছিলেন?'

আমি হেসে ফেললাম, 'ভালো লোক আপনি, চলুন, গাড়িতে যেতে যেতে কথা বলে নেব' বলে গাড়ির সামনের দরজা খুলে দিলেন।

'আপনার নাম কী বলে বললেন?'

'এস. টি. রাজশেখর। উঠুন।'

'আপনি কেন কষ্ট...'

'কোনো কষ্ট নেই।'

'আমি শিওারিপেট্টাই-এর একটা ঠিকানায় যাবো।'

'আমিও ওদিকেই যাচ্ছি।'

এবার উনি হেসে ফেললেন। দাঁতটা আগের মত চকচক করছে না—মনে হল ওটারও বয়স বেড়েছে। 'স্কুল করেসপণ্ডেন্টসে ক্লার্ক হয়ে আছি। হেডমাস্টার জানাশোনা।'

আমি উত্তর দিলাম না। নিমপাতা চিবিয়ে খাওয়ার মতো একটা তেতো স্বাদ আমার গলা দিয়ে নেমে গেল গভীরে। একনিমেষে এয়ারকণ্ডিশনের আরাম মাটি হয়ে গেল।

উনি লেদার ব্যাগ খুললেন। ওর ভেতর থেকে একটা পাঁওটে বিবর্ণ পোঁটলা বের করে দেখে নিলেন সব ঠিক আছে কিনা, পরে আবার ব্যাগে রেখে দিলেন।

'আজ শনিবার না? স্কুল নেই। বাড়িতে তো নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারেন? আপনাকে দেখে খুব ক্লান্ত লাগছে।'

'ও দেখলে হবে? এখন কাজ হয়ে বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা এক গ্লাস ঘোল খেলে শুয়ে পড়ব।' আবার চুপচাপ... মানুষ, বাড়ি, রাস্তা, সিনেমা পোস্টার, রাজনৈতিক ব্যানার সব পার হয়ে গাড়ি চলছে। পেরিয়ারের রাস্তা এল।

'এখন আপনি কোথায় আছেন?' উনি বললেন।

'বোম্বাই'

'মাদ্রাজে আপনি আসেন কখনো কখনো?'

'তিন বছরে একবার।'

'বোম্বের পরে মাদ্রাজ।...একেবারে বিস্বাদ, ভালো লাগবে না।'

'তবু জন্মস্থান তো।'

'ঠিক আছে। গাড়ি মনে হচ্ছে নতুন। এয়ারকণ্ডিশন করেছেন।'

'ধন্যবাদ।' একটা বাঁকে গাড়ি ঘোরালাম। 'আমার মেয়ে-জামাই-নাতনি বাঙ্গালোর থেকে এসেছে। কাল

সকালে (কুড়ম) পুরো পরিবারসহ মজাড় মন্দিরে যাবো ভাবছি।'

'খুব ভালো কথা, ঘুরে আসুন। তার সঙ্গে কারুমারি আম্মান' দেবীর কাছে আমার ভুবনার বিয়ের জন্যও প্রার্থনা করুন।'

ঝাঁকুনি খেয়ে সামনে একটা ট্যাক্সির মুখোমুখি, দুর্ঘটনা হবার উপক্রম হতেই ট্যাক্সির ড্রাইভার বললেন, 'দেখবেন তো স্যার, লেখাপড়া জানা লোক তো।'

'ভুবনার জন্য? ভুবনেশ্বরী বলে বলতেন, তার জন্যে?'

'হ্যাঁ। এখনও বৃহস্পতি চোখ খুলে দেখেন নি। এখনও ওর হরস্কোপ নিয়ে আমি চিন্নারি পেটএ'-র ঠিকানায় দেবার জন্য যাচ্ছি।

আমি কথা বলতে পারিনি। মনে হল, সারা শরীর দগ্ধ হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, বিস্মিত হলাম, কী করে পুরো পথ অ্যাকসিডেন্ট না করে চলে এলাম।

'এই গলিতে গাড়ি যাবেনা, এখানে থামুন। আমি নেমে হেঁটে যাবো।'

মেশিনের মতন গাড়ি থামিয়ে নেমে ওনার দরজা খুলে দিলাম।

'অসংখ্য ধনাবাদ, স্যার, আসবো কি?'

উনি এত তাড়াতাড়ি নামলেন যে ওনার ব্যাগ থেকে সেই পোঁটলাটা মাটিতে পড়ে গেল। জিপ খোলা ছিল। আমি ঝুঁকে ঐ জিপ খোলা পোঁটলাটা তাড়াতাড়ি ওনার হাতে তুলে দিলাম। 'ধন্যবাদ, স্যার। ভুবনা আনতে বলেছিল একটা জিনিস, এটা ফেলে গেলে আবার আমাকে দোকানে দৌড়তে হতো।' পোঁটলাটা এবার ব্যাগের মধ্যে রেখে ভালো করে জিপটা টেনে দিলেন। 'তাহলে আমি স্যার, আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম। সরি। আসছি।'

পায়ে জোর নেই, জুতো পরা ঐ পা গলির ভেতর ঢুকে গেল। আমি ড্রাইভারের সীটে গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার দামী জুতোকে একবার আড়চোখে দেখলাম। 'কুমী' কোম্পানির। গাড়ির স্টীয়ারিং-এ মাথা এলিয়ে দিলাম।

ওই পোঁটলার মধ্যে ছিল মেয়ের জন্য গডরেজ ডাই।

অনুবাদ : অনুরাধা মহাপাত্র

পাঞ্জাবী

মরণ-ঋতু

দলীপ কৌর তিওয়ানা

[তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ, অন্ধ্রপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত পাঞ্জাবি বাংলা অনুবাদ কর্মশালায় শ্রীমতি সুকৃতা আজমানীর (Sukrita Ajmani) সাহায্যে এই অনুবাদ করা হয়েছিল।]

মাঝরাতে রচনা স্বপ্ন দেখল, ওর পায়ে সাপে কেটেছে। ভয় পেয়ে জেগে উঠল সে। লাইট জ্বালাল। পা'টা আলতো ক'রে ছুঁয়ে দেখল। বিছানাটা ঝেড়ে দেখল। ওধুই কি স্বপ্ন ছিল? বোধহয় কালকের কথা মনে পড়েছে। সিনেমা যাওয়ার সময় সে একটা ফুল ছিঁড়ে চুলে লাগাতে যাচ্ছিল, তখন মা বলেছিলেন, সকাল-সন্ধে গাছে হাত দিবি না। শ্রাবণ মাসে হাজার রকমের সাপ থাকে।

শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হয়। ফুল ফোটে। সব গাছপালা নতুন হ'য়ে ওঠে। ঝুলন সাজানো হয়। মলপোয়া বানানো হয়। তীজ * উৎসবের জন্য ভাইরা বোনেদের শ্বশুরবাড়ি থেকে আনতে যায়। আর...আর এ মাসেই ভীষণ সাপ বেরোয়। রচনা ভাবতে লাগল।

দূরে কোথাও কুকুর ডাকছে। একটা কালো পাখি ঝটপটিয়ে ওদের বাড়ির ওপর দিয়ে রাতের অন্ধকারের মধ্যে উড়ে গেল।

'আমি এই খারাপ স্বপ্নটা কেন দেখলাম? সাপে কাটলে

---

* তীজ : পঞ্জাবের লোক উৎসব।

তো লোকে মরেও যেতে পারে। কিন্তু আমার তো এখনও মরণ-ঋতু আসেনি।'

'মৃত্যুর কি কোনও ঋতু আছে?' রচনা নিজেকে জিজ্ঞেস করল।

কল থেকে টপ টপ ক'রে জল পড়ছে।

ওর মনটা আবার স্বপ্নের দিকে গেল।

'হ্যাঁ, ঋতুগুলো তো শুধু বাইরের পৃথিবীতেই থাকেনা। মনের ভেতরও থাকে। এক একটা ঋতু আছে, যখন আমরা আগে পিছে কিছু দেখতে পাইনা। একটা বাজা সময়। সেই সময়ে ঝড় ওঠে। প্রেত নৃত্য করতে থাকে। সেটাইতো মৃত্যুর মরসুম। ভাবতে ভাবতে রচনা তার নিঃশ্বাসে অন্ধকারের চাপ অনুভব করল।

'কিন্তু আমি তো এখন মরতে চাইনা। এপারে আমার সঙ্গে অরবিন্দ আছে। আর ও-পারে আমার ভবিষ্যৎ। আর মাঝখানের রাস্তাটায় ফুল বিছানো। অরবিন্দ আমার চুলে একটা ফুল লাগিয়ে দিয়েছিল।'

অন্ধকারে একটা জোনাকি তার আলো জ্বালিয়ে, কে জানে কোথায় চলে গেল।

স্বপ্নের সেই সাপটার কথা রচনার আবার মনে পড়ল। সারা দুনিয়ায় তার একমাত্র আমাকেই কাটিতে হ'ল? ওরই বা কী দোষ? এটাই তো ওদের স্বভাব।...অরবিন্দের স্বভাবটা খুব ভাল। নদীর ঠাণ্ডা জলের মতন হয়ে যায়।

নদীতে কিন্তু বান আসে। মানুষ ডুবে মরেও যায়।...না, আমি ডুবে মরতে চাইনা।'

অন্ধকারে বসে থাকা একটা কালো বেড়ালের চোখ জ্বলছে।

'আমি আজকে যত আজেবাজে কথা ভেবে যাচ্ছি।' ভাবতে ভাবতে সে পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু...'জানিনা আজকে অরবিন্দের কথা কেন এত মনে পড়ছে'। অরবিন্দ, ওর বাগদত্ত, যে দশ মাইল দূরে, অন্য এক শহরে, এখন হয়তো ঘুমোচ্ছে।

'কী জানি, আমারই স্বপ্ন দেখছে হয়ত।' কথাটা ভেবে ওর খুব ভাল লাগল। আকাশের চাঁদ হাঁটতে হাঁটতে ঠিক ওর বাড়ির ওপরে চলে এল।

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ও যাচ্ছে কোথায়? অরবিন্দের শহরে?' ভাবতে ভাবতে রচনা আবার একটু হাসল। ও সামনে এলেই রচনা হেসে ফেলে, এই কথা বলে অরবিন্দ ওকে ক্ষ্যাপাত। রচনা গম্ভীর হয়ে থাকার খুব চেষ্টা করত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেসেই ফেলত।

ঘুম আসছে না। ও উঠে বসল।

হাওয়ায় হাসনুহানার গন্ধ ভেসে এল। সে বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে গন্ধটা নিজের ভেতরে ভরে নেওয়ার চেষ্টা করল।

'কিন্তু লোকেরা বলে হাসনুহানার গন্ধে সাপ আসে।' ...হ্যাঁ, সাপ।

সে উঠে লাইট জ্বালালো। চারী [১] থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে খেল। তারপর বসে পাঠ [২] করতে লাগল।

পাঠেও মন বসছিল না। কী জানি কেন ওর মনে দুশ্চিন্তা ভিড় করে আসছিল।

স্টেশন থেকে ট্রেনের চিৎকার শোনা গেল। আজকে হুইসিলের আওয়াজটা খুব অচেনা আর ভয়ের।

'বিবি (মা), চা বসিয়ে দিই?' মা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। মাকে জিজ্ঞেস করল রচনা।

'তুমি আজ এত সকাল সকাল কী করে উঠে পড়লে?'

'এমনই ঘুম ভেঙে গেল।

'তুমি তোমার পড়াশুনো করো, আমি চা বসিয়ে দিচ্ছি।' মা উঠে বসল।

রচনা বাথরুমে স্নান করতে চলে গেল। স্নান ক'রে তৈরি হল। চা খেলো। একটু খবরের কাগজ পড়ল। ঠাকুমাকে রামায়ণের একটা অধ্যায়ও শুনিয়ে দিল। কিন্তু কলেজ যাওয়ার সময় এখনও হয় নি।

আজকে দিনটা যেন পা পা ক'রে হাঁটছে। সে কলেজের দিকে হাঁটা দিল। বাস স্ট্যাণ্ডের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওর অরবিন্দের কথা মনে পড়ল।

অরবিন্দের শহরগামী বাসটা হর্ণ দিচ্ছিল। যেন ওকে ডাকছে। রচনা তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়ল।

'অরবিন্দকে কী বলব? কেন এসেছি?'—ভেবে ওর নিজের ওপর রাগ হল।

'বলে দেব, খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলাম। ও আরও ক্ষ্যাপাবে।'

'ও তো এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। দশটায় ওর অফিস শুরু হয়।'

এসব ভাবতে ভাবতে অরবিন্দের শহর এসে গেল। বাস আড্ডা থেকে একটু দূরেই অরবিন্দের বাড়ি। ইলেকট্রিকের তারে লেগে একটা চড়াই পাখি মরে গেল। তার থেকেই ঝুলতে লাগল সেটা।

অরবিন্দের বাড়ি এসে গেল। রচনা আস্তে করে দরজা ধাক্কালো।

১। কুঁজো ২। পাঠ করতে = ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে

'কে?' অরবিন্দ ভেতর থেকেই জিজ্ঞেস করল।

রচনা কিছু না ব'লে আবার দরজা ধাক্কালো।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

ও আবার দরজা ধাক্কালো, এবার বেশ জোরে। অরবিন্দ দরজা খুলল।

রচনা হাসল। অরবিন্দ যেন চমকে উঠল। রচনা ওকে পাশে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরে ঢুকতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'রচনা...এ সুষমা...আমার অফিসের স্টেনো...রাত্রে...ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল...আমি বলেছিলাম...অফিসের জরুরি কাজ করার আছে...' ঘাবড়ে গিয়ে অরবিন্দ কী যেন আবোল-তাবোল সব বকে যাচ্ছিল।

রচনা একবার সুষমার দিকে তাকাল। গলা তুলে বলল, 'আমি রচনা, অরবিন্দের ভগদত্তা।'

তারপর সে অরবিন্দকে লক্ষ করল। আবার নিজের মধ্যেই কেমন গুটিয়ে গেল।

'মাফ ক'রো, আমার না-বলে আসা উচিৎ হয়নি।'— বলে যেমন এসেছিল, তেমনই চলে গেল।

অরবিন্দ ওকে ডাকছিল। কিন্তু ওর মনে হল, 'আমি রচনা নই। এ অরবিন্দও নয়। এ আমি কোথায় এসেছি? এরা কারা? এটা কোন মরসুম?' আগে, পরে কী আছে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ওর মনে ঝড় উঠল, মনে হল যেন কতগুলো প্রেত নৃত্য করছে। ও নিজের শহরগামী বাসে উঠে পড়ল। নিজের সেই পায়ের দিকে তাকাল। রাত্রিবেলা স্বপ্নে সাপে কেটেছিল। এখন বিষটা উঠছে।

অনুবাদ : সীমন্তিনী গুপ্ত

হিন্দি

অতৃপ্ত আত্মাদের রেলভ্রমণ

শরত জোশী

অন্ধকার যেন কালো কম্বলে ঢাকা পাহাড়, তীক্ষ্ণ তেজ হাওয়ার মধ্যে ভর্তি ট্রেন চলছিল। আত্মারা কাঁচের জানালাগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল। কখনও কখনও কেউ কাঁচের উপর ঝুঁকে দেখছিল জনবসতি, ভবঘুরে প্রেতের দলের ঘুরে বেড়ানো, যাগযজ্ঞের আগুন, সবই প্রায় চোখে পড়ছিল। দিকভ্রষ্ট তারাগুলি যেন কাঁপছিল। সবাই চলেছে এক অজানা রাস্তায়। বুড়ো হাওয়ার ঘরে বোধহয় আজ কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তাই এত উন্মাদনা, এত কোলাহল। কামরাটাও ভিজে ছিল। গতকাল মৃত লোকের দরজা পবিত্র জল দিয়ে ধোয়া হয়েছিল যা আজও শুকায়নি। এই সবই যেন এমন চর্চার বিষয় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সব যাত্রীরাই কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত, সবাই স্মৃতিচারণ করছিল বিগত দিনের তাই একে অপরের সাথে কোন কথা বলছিল না। সবাই ভাবছিল এবার সূর্য যাকে ওপরে ভগবান ভাস্কর বলে তার উদিত হয়ে যাওয়া উচিত, ভাবতে ভাবতে একটু গরমানুভূতি হল, কাঁপতে থাকা আত্মাগুলি এবার একটু আরাম অনুভব করল।

হরদয়ালবাবু ভাবছিলেন, ভাই বোধহয় এতক্ষণে ঘরে পৌঁছে গেছেন। ডাক্তার যদি ঠিক সময়ে পায় তাহলে, নটার পাঠানকোট ধরেই ফিরবে। কি জানি লাশটা তুলেছে কিনা, বউটা বোধহয় ভীষণ কাঁদছে, নিজের মনেই এই সব ভাবতে ভাবতে উদাস হয়ে গেল। হরদয়ালের পাশে বসা এক সাধু একমনে ঈশ্বরের নাম জপ করছিল। কোন এক গ্রামের এক বিধবাকে দাসী বানিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছিল। তারপর একদিন গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ার পর ভীষণ উত্তম-মধ্যম হয়েছিল। সেই মার সহ্য করতে না পেরেই ইহলোক ত্যাগ করে। কামরায় বসেই বিড়বিড় করে বলছিল 'সব শালার ফাঁসী হবে, সাধু-সন্তদের প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা। এই বছরে সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। কলেরা-প্লেগ হবে।" আর মাঝে মাঝে ঈশ্বরের নাম জপছিলেন. সামনেই এক অল্পবয়সী যুবক মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে বসেছিল। আত্মহত্যা করে এসেছে বোধহয় বেকারত্বের জন্য। কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না, কারণ মৃত্যুপর্বের এই টেনশন, আর ঝামেলা এখনও যেন

রয়েই গেছে, সে যে মুক্ত তা অনুভব করতে চাইছে কিন্তু পারছে কই।

"কত বছর বয়সে চলে এলে ভাই?" সাধু জিজ্ঞাসা করল, যুবকটি আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে দেখে চাপা স্বরে বলল, "২১ বছরে", "ওহ্ ভাই এত উদাস রয়েছ, জীবনের কোন সুখই তো তাহলে ভোগ করতে পারনি, নারীসঙ্গ পেলেনা, পাকা ফল চাখতে পারলে না, দেশ-বিদেশ ঘুরলে না, মুম্বাই দেখলে না, উদাস হওয়া তো স্বাভাবিক।"

এদিকে বোম্বাই এর বুড়ো শেঠ সম্পূর্ণ জীবন ভোগ করে এসেছে। সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কি মুম্বাই থেকে এসেছেন"?

"না, না, আমি তো হিমালয়বাসী। ২৫ বছর তপস্যা করেছি। গৃহাশ্রমে থাকাকালীন একবার মুম্বাই গেছিলাম।"

"অভিনেতা হতে?" পাশ থেকে কেউ টিপ্পনী কাটল।

সাধু বেশ উত্তেজিত হয়ে এদিক ওদিক তাকাল। "ছিঃ, আমি তো ছেলেবেলাতেই যোগী হয়ে গেছিলাম, ওরহরী মহাশয়ের মত ঘর ছেড়েছিলাম। মুম্বাইয়ে প্রায় বছর খানেক ছিলাম। অনেক সুন্দরীই আমাকে তাঁদের দিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি সর্বদা তাদের থেকে দূরে ছিলাম। জন্ম-মৃত্যুর রহস্যর পুরো জ্ঞান আমার ছিল যে। মধুরাতে আমার গুরুজী একটা বই লিখেছিলেন। আপনি পড়েছেন বোধহয়—"জন্ম-মৃত্যু-রহস্য" চারদিক নিস্তব্ধ ছিল।

"ভালই হল, এখন তো ঐলোকে স্বয়ং গুরুজীর দর্শন পাবেন। ওনার মুখ থেকেই এবার শুনবেন, ভীষণ মধুর বচন, সঙ্গে হারমনিয়াম নিয়ে গানও গান। তা আপনি মহাশয় কোথা থেকে এসেছেন?"

সাধু জিজ্ঞাসা করলেন শেঠকে।

"মুম্বাই থেকে"।

"সারাজীবন ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন বোধহয়?"

"হ্যাঁ, আমার তিনটে মিল ছিল" এদিকে ইন্দর অব্দি আমার তুলার ব্যবসা ছিল।"

সাধু ঘৃণার হাসি হেসে বলল, "লক্ষ্মী তুই বড় চতুর, মায়াবীও বটে।"

শেঠ এই কথা শুনে ভীষণ রেগে উঠল, "এই লক্ষ্মীর কৃপার ফলেই আমি অনেক সাধুর অন্ন সংস্থান করতে পেরেছি। সবতো ঘন্টার পর ঘন্টা আমার দরজার সামনে পড়ে থাকত। আমি সারা দেশের বড় বড় মন্দিরে বড়রকম দানও করতাম।"

"ধন্য, আপনি ধন্য" সাধু এই কথা শুনে বিভোর হয়ে গেলেন, "এইতো সত্যকারের মানবজীবন আর আপনি পাঁকের মধ্যে যেন পদ্ম"।

রেললাইনের উপর বসে থাকা প্রেতদের সরানোর জন্য লম্বা কেউ যেন সিটি বাজাল তারপর আবার রেলের গতি জোড় করে দিল, এদিকে সূর্যের আলোকছটা আস্তে আস্তে দীপ্ত হতে লাগল। কেউ বলে উঠল 'ভগবান ভাস্কর উদিত হচ্ছেন।' সবাই এক দৃষ্টে বাইরের দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে এক এক করে বন্ধ জানালা খুলতে আরম্ভ করল। আত্মারা বাইরের দৃশ্য উপভোগ করতে আরম্ভ করল। "আহা, কি মনোরম দৃশ্য।" এক কবি আত্মা বলে উঠল, "যদি আগে দেখতাম তাহলে বেশ কয়েকটা কবিতা হয়ত রচনা করে ফেলতাম।" আবার ভাবতে শুরু করল, "অনেক লেখাই তো লিখে এসেছি, বন্ধুদের উচিত আমার শেষের কবিতাগুলি দায়িত্ব সহকারে প্রকাশ করা আর তার থেকে যে রয়ালটি পাবে সেটা সুধাকে দেওয়া। আমার স্মৃতিতে অন্ততঃ সেটা প্রকাশিত হওয়া উচিত। যদি সময় বদলায় তাহলে হয়ত সাহিত্যের ইতিহাসেও নাম আসতে পারে, যদি না আসে তাহলে ভাবব সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল।'

কিছু সময় বাদে পাশে বসা এক বয়স্কাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"কোথা থেকে আসা হল?"

"আগরা থেকে"।

"পাগলা গারদে ছিলেন নাকি?"

"তুই থাকবি পাগলা গারদে। আমার তো ভরা সংসার ছিল। স্বামী বেঁচে এখনও। তিন ছেলের জুতার দোকান আছে। এখানে তোর এই কথা শুনলে না মেরে দাঁত ভেঙ্গে দিত।"

কবি আত্মা এটা শুনেই গুম মেরে গেল।

"ওঁদের কেন শুধু শুধু এখানে ডাকছেন বুড়িমা।" পাশ থেকে কেউ বলে উঠল।

"মনে পড়ছে যে ওঁদেরকে ভীষণভাবে," বলেই বুড়ি ফুঁপিয়ে উঠল।

সুন্দরলাল, যার গাজিয়াবাদে বড় মিষ্টির দোকান ছিল বলে উঠল, "পৃথিবীর উপর, সংসারের উপর ভীষণ রেগে আছি।"

সুন্দরলালকে তার ভাইপোরা বিষ দিয়েছিল সম্পত্তি হাসিল করার লোভে। একটা কথাই বারবার বলছে—"সব বদমাশ। সে ভাই হোক কিংবা ভাইপো।" বলে মুখ লাল করে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই রেল থামল। বড় জংশন এল বোধহয়। সকাল

হয়ে গেছিল। গাড়ির দরজা খুলে গেল। আত্মারা মনের মধ্যে অনেকরকম প্রশ্ন নিয়ে নিচে নামল খানিকটা পায়চারী করতে। নিমেষে অনেক ভিড় জমে গেল।

"স্বর্গ এসে গেছে কি?"

"আহা, জীবনভর যেন অনেক পুণ্য অর্জন করেছেন? সেদিন মরল আর এখন চিল্লাচ্ছে—স্বর্গ এসে গেছে কি?" প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা এক স্বেচ্ছাসেবক আত্মা অন্য আত্মাদের বাগাতে শুরু করল।

দশ মিনিটের মধ্যে সবাই জানতে পারল যে এখানে গাড়ি অনেকক্ষণ অব্দি দাঁড়াবে। এই স্টেশন থেকে শিশু আত্মারা এই গাড়িতে চড়ে আবার পৃথিবীতে চলে যায় আর যাঁরা এসেছে তাঁরা আবার অন্য গাড়িতে চড়ে। এর মাঝে একবার রেজিস্ট্রেশন হয়, সবার নাম, ঠিকানা নথিভুক্ত করা হয়। বিনা-ইটারসী লাইনের এক সহকারী স্টেশন মাষ্টারের আত্মার এইভাবে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকাটা সহ্য হল না, ওখানকার কর্মচারীদের সাথে সে ঝামেলা করে বসে রইল। প্লাটফর্মে নেমেই আত্মারা ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে লাগল। কিছু ভবঘুরে আত্মা এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চক্কর মারতে লাগল তো কিছু পরিচিত একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলতে শুরু করল।

"এসে গেছ—ভাই?"

"হ্যাঁ, এই এলাম"।

"আপন-পর সব আলাদা হয়ে গেল।"

"কি বলব। ঘরে প্রায় হাহাকার লেগে গেল। ছোটো ছোটো বাচ্চা, কি জানি কি হবে।"

"বন্ধু, সকলে ঠিক নিজের ব্যবস্থা করে নেবে।"

"যদি সরকার কিছু সাহায্য করে।"

"হুঁ, বেঁচে থাকতেই করল না তো মরে গিয়ে। এই আমার ব্যাপারটাই নাও না, গত বছরেই আমার সুপারিন্টেডেন্ট হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হতে দেয়নি। সারাজীবন না খেয়েও সরকারের পয়সা গুনেছি, হিসেব মিলিয়েছি, এখন স্মরণ করছে বোধহয়।"

"আরে চিন্তা ছাড় তো" তৃতীয় আত্মা বলে উঠল।

এক বাবু তার দপ্তরের পিয়নকে দেখতে পেল, যাকে উনি ওর অসুখের জন্য তিনমাসের ছুটি মঞ্জুর করেছিল। ও কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টি দিয়ে বলল, "আপনার দয়া সাহেব। ছেলে আমার অনেক চিকিৎসা করিয়েছিল কিন্তু ভাগ্য কে আটকায়? এমন সাধ্য কার?" আবার নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করল "তা আপনার কিভাবে আসা হল।"

"একটা জীপের সাথে ধাক্কা লেগেছিল।" বাবু বলল।

চালক বেঁচে গেল আর আমার শুধু শুধু প্রাণটা দিতে হল।"

"ওহ্, খুব জোরে চালাত, বিশেষ করে—জমুনালাল...."

"ওর সাথেই তো ধাক্কা লেগেছে।"

"আমি একবার ওর সম্বন্ধে নালিশ করেছিলাম বড় সাহেবের কাছে, কিন্তু কিছু লাভ হয় নি।"

তারপর দুজনে মিলে বড় সাহেবের চর্চা করতে আরম্ভ করল।

"বড় সাহেব তো ওকে মাথায় তুলে রেখেছে। আর চড়াবেই বা না কেন, বড় সাহেবের সব গড়বড় ব্যাপারই যে ও জানত। তাই একে অপরকে সাহায্য করত আর কি, শালা অফিসটাকে একদম মুদিখানার দোকান বানিয়ে দিয়েছে।"

এদিকে একজন ইঞ্জিনিয়ার, যার বক্তব্য হল যে তার এখানে চলে আসায় দক্ষিণ-ভারতের সব থেকে বড় সেতুর কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু লোকেদের কাছে ডাক্তারদের সম্বন্ধে খারাপ মন্তব্য করতে লাগল। "রোজ দশ টাকা করে শুধু ওষুধে আর ডাক্তারের পারিশ্রমিকে উড়ে যেত। শেষদিনেও তিনজন ডাক্তার এসেছিল, কিন্তু ওদের ডায়গোনোসিসই ভুল ছিল। নটার সময়ও উল্লুকগুলো বলে গেল ভয় পাবার কিছু নেই আপনি কাল ঠিক হয়ে যাবেন। একটার সময়ই আমার হেঁচকি উঠতে লাগল...."

"আর তারপর টা—টা।" সবাই হেসে উঠল।

এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বলে উঠল, "যারাই এলোপ্যাথির উপর ভরসা করেছে তারা তাদের আয়ু এমনিই চারবছর কমিয়ে ফেলেছে। রোগের সম্পূর্ণ নির্মূল এই ডাক্তারদের পক্ষে করা অসম্ভব। এটা তো শুধু হোমিওপ্যাথির দ্বারাই সম্ভব, আর...."

"আপনি থামুন তো মশাই, ডাক্তার, বৈদ্য ঐ একই পথেরই পথিক যারা মৃত্যুরূপী নদীর কিনারে বসে ঐ মৃত্যু পথযাত্রীদের কাছ থেকে কামিয়ে নেয়। যে মরার সে তো মরেই।"

"তা মরণ কে আটকায়? এ সাধ্য কার?" আমি আমার বাবাকেই, বাবাকেই বাঁচাতেই পারলাম না ডাক্তার হয়ে, এই আমাকে দেখুন না আমার ছেলেরা কি আমায় আটকাতে পেরেছে?"

মুহূর্তে নিস্তব্ধ তা ছেয়ে গেল, কাশীর এক মঠাধীশ মহারাজ চুপচাপ সব শুনছিলেন, এবার বলা শুরু করলেন, "অতীত নিয়ে ভাবে মূর্খরা, যা ভাবি তথা আগামী তার উপর

বিচার করা উচিত। আমি আমার প্রবচনে সব সময় এই বলে এসেছি, জীবন বড় ক্ষণিক।"

"কিসের ক্ষণিক, আশি বছর ধরে চটি ঘসেছি, শরীর ক্ষয়েছে। আমারটা আমি জানি।"

"এটা সত্যই, কিন্তু এই অনন্তকালের কাছে আশি বছর তো সামান্য। আমি তো সেড়শ বছর ঐ সংসারে ছিলাম।" সবাই চমকে উঠল...."আশ্চর্য্য তো।"

"আরে জীবন তো একটা রবারের মত, স্বামীজি খুব বেশী টেনেছিল। মজবুত রবার ছিল তাই।"

"সাধনা আর তপস্যার দ্বারাই সব হয়।"

"ভাল খাবার খেয়েছেন তাই, তা স্বামীজি মদ্যপান খুব করেছেন বোধহয়।"

"না-না শুধু ফলাহার। অন্ন তো ছুঁইনি।"

তখনই পাশ দিয়ে এক নারীআত্মা হেঁটে চলে গেল, রেলের এই কামরার দিকে উদ্বিগ্নের মত তাকাতে তাকাতে, বোধহয় কাউকে খুঁজছে। সবাই তখন স্বামীজির থেকে চোখটা সরিয়ে তাঁকেই দেখতে লাগল।

"ভারী সুন্দর তো।"

"মুখটা তো অনেকটা অভিনেত্রী রত্না সরীফীর মত না?"

"সেই তো বোধহয়।"

"এসো বন্ধুরা দেখি, একে।"

স্বামীজি আবার একা হয়ে গেলেন।

মুহূর্তে রত্নার মত লাগা মেয়েটির চারপাশে ভিড় জমে গেল। একজন সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে?"

"আপনার তাতে কি দরকার।"

সে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "না, মানে আপনি কি অভিনেত্রী রত্না?"

"রত্না, রত্না। ওফ সেও এই কথা বলত। জ্বালিয়ে খেল এই রত্না।"

সে পাগলীর মত হেসে উঠে বলল, "ও বলত যদি আমাদের বিয়ে না হয় তাহলে...আত্মহত্যা করব। আমি তো চলে এলাম কিন্তু সে তো এখনও এল না। ওঁকেই তো খুঁজছি।"

"আর কাকে খুঁজবে, প্রেমিকেরই খোঁজ করছে রে, তা কোন অস্ত্র দিয়ে, না বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন?"

"দাদা দুখী আত্মার সাথে ঠাট্টা করতে নেই।"

"তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে?"

"ঐ একলা মেয়েটিকে বিরক্ত করছো, লজ্জা নেই।" চারিদিকে এক অশান্ত বাতাবরণের সৃষ্টি হল আর তার সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল।

স্বামীজিও ঐখানে চলে এসে বললেন, "দেবী, শরীরের সাথে এই রকম প্রেমও তো এক ধরনের প্রতারণা, ঐ যুবকের সাথে প্রেমের পরিবর্তে ভগবানের সাথে যদি..."

"তাহলে ঐ আপনার আশ্রমেই পড়ে থাকত, আর কি?" কেউ টিপ্পনী কাটল।

"যখন দুজন একসাথে কথা বলে তখন মাঝখানে কথা বলতে...."

"শিখা বানাচ্ছে বেচারীকে।"

স্বামীজি অসন্তুষ্ট হয়ে বড় বড় পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "এই জন্য আমি সারাজীবন কোন স্ত্রীলোককে উপদেশ দিইনি। এই সমাজ ঠিক তার মত চশমা দিয়ে দেখে।"

হঠাৎ আকাশবাণী হল—"আপনারা মুখ্য কার্যালয়ের জানালার সামনে লাইন লাগান ; ওখানে সবার নাম ঠিকানা নথিবদ্ধ করা হবে।

[তারপর মারাঠী, হিন্দী, পাঞ্জাবী এরকম চোদ্দটি ভারতীয় ভাষার সূচনা দেওয়া হল]

ততক্ষণে লাইন লেগেগেছিল। কার্নালের প্রসিদ্ধ হিন্দী প্রচারক বিরহানন্দ কাব্যালঙ্কার সর্বপ্রথম হিন্দীতে নিজের নাম নথিভুক্ত করল। বয়স, ঠিকানা ইত্যাদি সব লেখার পর বিশেষ মন্তব্যতে লিখলেন "হিন্দী প্রচার করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন।" এরপর রেজিষ্টারের পাশে বসে থাকা আত্মা জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্য নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সারাজীবন অসত্য কথা বলিনি আর মৃত্যুর পরেও বলব না।"

"সারাজীবন অসত্য না বললে প্রচারক কি করে হলেন," অধিকারীও মজা করে বলে উঠলেন।

সব একসাথে হেসে উঠল।

"বোধহয় সেইজন্যই শহীদ হতে হল।"

বিনা কারণে আবার সবাই হেসে উঠল।

কাব্যালঙ্কার নিজের নাম লেখার পর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। চার-ছটা আত্মার নাম লেখা হয়ে যাবার পর আত্মহত্যা করে আসা সেই যুবকটি কলম নিয়ে ইংরাজীতে লিখতে আরম্ভ করলেন এম, এল, শ্রীবাস্তব। ব্যস, কাব্যালঙ্কারজী সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে বললেন, "অন্যের ভাষার ভূত এখনও মাথা থেকে নামেনি দেখছি, কেন রাষ্ট্রভাষাতে লিখতে পার না? ভারতীয় হিসাবে আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।"

যুবক বেশ রেগে একবার ওনাকে দেখে তারপর আবার নামটা কেটে হিন্দীতে লিখলেন। ওহঃ, কাব্যালঙ্কার-এর বুক

একদম ফুলে উঠল।

"বাস্তবে আপনি সত্যই হিন্দীর প্রচারক।" পাশ থেকে কেউ বলল। উনি হাসতে লাগলেন।

"তা বলিদান কি ভাবে দিতে হল পণ্ডিতজী?"

"কি বলব। চার বছর ধরে আমি প্রচার সভার অধ্যক্ষ ছিলাম। এই বছর আমার উপর অনাস্থা প্রস্তাব এনে অন্য একজনকে নির্বাচন করা হল। সেই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে আমি দেহত্যাগ করলাম।"

প্রায়ই শেষ বয়সে মধ্যপুরুষদের সঙ্গে জনতা এরকম ব্যবহার করে বসে।

কাব্যালঙ্কার আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। প্ল্যাটফর্মের উপর রৌদ্রছটা ছড়িয়ে পড়েছে। একটা দরজা দিয়ে বাচ্চার দল এসে বেঞ্চের উপর বসতে আরম্ভ করল।

"এরা কি ওই শিশু যারা জন্মের পরে পরেই মারা গেছে।"

একজন স্বেচ্ছাসেবক বলে উঠল, "আজ্ঞে না এরা সবাই জন্ম নিতে পৃথিবীতে যাচ্ছে।"

"আহা কি সুন্দর, যেন এক গোছা ফুল।"

"বড় হতে হতে বুড়ো হবে, এক তামাটে রূপধারণ করে আবার ফিরে আসবে।"

এক ভীষণ লড়াইএর পর দু মাস হাসপাতালে থেকে মারা যাওয়া কালু ওস্তাদের আত্মা ভিড় সরাতে সরাতে বাচ্চাদের সামনে এসে বলল, "কি রে ছোকরারা। দুনিয়ার কোথায় কোথায় যাবি?"

"কি নিজের বস্তির ছেলে খুঁজছ নাকি ওস্তাদ।"

"এখন থেকেই গুরুমন্ত্র দেবে নাকি?"

বাচ্চারা চুপ করে বসে একে ওপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল।

"আরে বল, বোবা নাকি?"

"এখনও ভাষণজ্ঞান হয়নি বোধহয়?—কাব্যালঙ্কারজী বললেন,

"জগতে যাব।" একটা বাচ্চা বলে উঠল।

"কোন জগতে? গরীবদের জগতে না বড়লোকদের? হৃদয়বালাদের না মিলবালাদের দুনিয়ায়?" কালুওস্তাদের এরকম রচনায় সবাই হেসে উঠল, "কালু ওস্তাদ শায়ের ছিলেন নাকি?

"ভাই এটা আবার কি শায়েরী—না এর মধ্যে রচনা কৌশল আছে, না বিম্ব, না সম্প্রেষণতা এক নিরস কবিতা।" কবি আস্তে আস্তে কাব্যালঙ্কারকে বললেন।

কাব্যালঙ্কারের আত্মা ঐ রকম সাহিত্যিক শব্দাবলী শুনে জিজ্ঞাসা করলেন,

"আপনি বোধহয় পৃথিবীতে এক সাহিত্যিক ছিলেন?"

"এখনও আছি। আমি দেহত্যাগ করেছি বটে তবে কবিসুলভ আচরণ আমি এখনও ছাড়িনি। আমার নাম বিনয় বর্মা। "রসিকেশ" শুনেছেন বোধহয়। আমার সঙ্কলন "চালাক চাঁদ আর নিমের ডালি" এর খুব আলোচনা হয়েছিল। গত মাসে "অমরাবতী" এর প্রথম পাতায় আমার কবিতা....।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি। আপনার বই আমার কাছে সমালোচনার্থে এসেছিল। কিছু মনে করবেন না আমার কিন্তু কোনো কবিতাই ভাল লাগেনি, তাই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।"

"আপনি বোধহয় কবিতাগুলো বুঝতে পারেননি," কবি একটু মুখটা বেঁকিয়ে বললেন।

"হ্যাঁ সেইতো, সাহিত্য পড়তে আর হিন্দীর প্রচার করতে করতে আমার চুল সাদা হয়ে গেল, আর আমি আপনার কবিতা বুঝতে পারিনি।" বলেই জোরে হেসে উঠলেন।

"আমি আপনার সাথে এই বিষয়ে তর্ক করতে চাই না।"—কবি জোরের সাথে বললেন।

"অবশ্যই করুন, এখন এই লোকে সাহিত্যচর্চার জন্য অফুরন্ত সময়। আমরা অন্য কোন এক সময়ে বসব।" কাব্যালঙ্কারবাবুর আত্মা মুখ ঘুরিয়ে ঐ শিশু আত্মাদের দিকে দেখতে লাগল যেখানে পালোয়ান কালু ওস্তাদ ওদের সাথে মজা করছিল।

"আচ্ছা বাচ্চারা, তোমরা এটা বলো যে তোমাদের মধ্যে বিনা বাপের বাচ্চা কে আছে?"

"কি, আপনি কি বলতে চান?" একজন চেঁচিয়ে উঠল।

"মানে কুমারী মেয়ে বা বিধবার বাচ্চা কে কে আছে? হাত তোলো।"

"ছিঃ ছিঃ—আপনি এই নিষ্পাপ আত্মাদের সাথে এরকম মজা করছেন।" সাধু আত্মা ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন।

"আর এরকম বাচ্চা জন্ম নিলে আপনাদের মত সাধু মহাত্মারা থু থু করেন তখন।"

"সাধু কখনও পাপকে সমর্থন করে না, অনৈতিকতার বিরোধ করাই এঁদের ধর্ম। আমরা সর্বদা বিরোধ করেছি পাপের।" সাধু আত্মা ভাষণ দিতে দিতে বললেন "বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্বন্ধ ঘোর পাপ আর এই পাপের ভ্রূনা সাজা অবশ্যই হওয়া উচিত। আর এইরকম সন্তানের সমাজে স্থান দেওয়া উচিত নয়।"

তখনই শিশু আত্মার দল থেকে কেউ বলে উঠল, "আমি এই সাধুরই বাচ্চা, এই আমার বাবা।"

সবাই চমকে ওঠার পরই হাসির রোল পড়ে গেল।

কালু ওস্তাদের আত্মা ঐ সাধুআত্মার গলা চেপে ধরে বলল, "কি রে সৈয়ানা, এই বাচ্চাটি কি বলছে?"

"সারা বিশ্বের ছেলেই আমার ছেলে আমরা যে সাধু।"

"কি বাচ্চা, এই সাধু তোর বাপ কি করে হল?"

"এ এক বিধবা স্ত্রীকে শিষ্যা বানিয়ে রেখেছিল। আমার জন্ম তার থেকে হয়েছে।"

"কি রে বদমাশ?"

"মিথ্যা, অসত্য, আমি কখনও শিষ্যা রাখিনি। নারীকে নরকের কীট মেনে এসেছি। এই বিষয়ে আমি প্রবচন দিতে পারি। শুনুন।" ততক্ষণে সবাই মিলে সাধুকে উত্তম মধ্যম দিতে শুরু করে দিয়েছে। আর সাধু হাত জোড় করে স্বামীজিকে বলছেন, "রক্ষা করুন প্রভু"। কিন্তু উনি হাসতে হাসতে বললেন, "আমরা এই জটাধারী সম্প্রদায়ের সাথে ভীষণ পরিচিত। এরা সবাই পাপী, গত কুম্ভতেই আমাদের ডেরায় এরকম কয়েকজনকে মারা হয়েছিল।

মাটিতে পরে থাকা সাধু হাত জোড় করে বললেন, "এই মহারাজ ও বদমাশ। এর গুরু বিধবাশ্রম চালায়, ভীষণ অনাচারী। যদি মারার হয় তো এঁকে আগে মারুন।"

কালু ওস্তাদ এই কথাও বিশ্লেষণ করতেন কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকরা সাধুকে ছাড়িয়ে ভিড় সরিয়ে ফেললেন। কালু ওস্তাদ আর সাধুর আত্মা দুটিকে দুই প্রান্তে নিয়ে চলে গেলেন স্বেচ্ছাসেবকরা।

আবার চারিদিকে নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। একটা ট্রেন এল, যাতে সমস্ত শিশুআত্মা চড়ে বসল।

"যাচ্ছি আমরা পৃথিবীর দুঃখ সহ্য করতে।"

"কিসের দুঃখ? বড় হয়ে তোমরাই তো আবার মজা লুটবে, মদ খাবে, তারপর খুক খুক করে কাশতে কাশতে এখানে আবার ফিরে আসবে।"

শিশুদের আত্মা প্লাটফর্ম ছেড়ে দিল। একদিকে জানালার পাশে দাঁড়ানো এক বুড়ি কেঁদেই চলেছে—"আমাকে নিয়ে চল বাবারা, আমাকে নিয়ে চল।"

মহারাজের আত্মা হেসে বলে উঠল, "আরে মোহ মায়া ছাড়, সবাইকে এখানে আসতে হবে। যদি পুণ্য করে এসে থাকিস তাহলে এখানেই সব ঘর সংসার হয়ে যাবে।"

"আগরায় আমাদের তিনটি বাড়ি ছিল, যতই পুণ্য করি এখানে ঝোড়ী পাব, বুড়ি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আবার আকাশবাণী হল, "সব আত্মারা কামরায় উঠে পড়ুন।" সবাই উঠে পড়ল।

একটা ভূত সিটি বাজাল, অনা ভূত সবুজ পতাকা দেখাল আর রেল আবার অজানা পথে চলতে শুরু করল। মহারাজ নীচে পায়চারী করছিল, ট্রেন যখন একটু গতি বাড়াল তখন লাফিয়ে সেই কামরায় উঠল যেখানে অভিনেত্রী রত্নার সমান রূপবতী মহিলা আত্মা বসেছিলেন।

জানি না এখন এই ট্রেন আবার কোথায় গিয়ে থামবে। সবাই চিন্তা করছে কিন্তু স্বামীজি যে জন্ম-মৃত্যুর রহস্যটাকে বোঝে সে নিশ্চিন্তভাবে চর আঙুলের সঙ্গে আঙুল মিলিয়ে ঐ সুন্দরীকে বোঝাচ্ছে—"নিজের প্রেমভাবটাকে কোন নশ্বর শরীরে কেন্দ্রিত কর না সুন্দরী। তাকে সৃষ্টির প্রতিটি কণার মধ্যে ছড়িয়ে দাও। তাকে দান করে দাও তবেই দেখবে যে কিরকম চরম শান্তি উপলব্ধি হচ্ছে।"

অনুবাদ : পার্থসারথী শীল

[লেখক পরিচিতি : জন্ম : ২৩শে মে, ১৯৩১, উজ্জয়ন (মধ্যপ্রদেশ) শিক্ষা : বি. এ. হিন্দীর ব্যঙ্গ লেখক হিসেবে বেশী পরিচিত। দৈনিক 'নঈ দুনিয়া', 'ইন্দর', 'নব লেখক' মাসিক এবং "মধ্যদেশ" দৈনিকের সম্পাদনা করেছেন। আকাশবাণী, ইন্দর এর এবং সূচনা এবং প্রসারণ মন্ত্রালয়, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

লেখ ঝীপ পর সরায় ইন্দ্রিয়, তিলিস্ম, কিসী অহানে, রহা কিনারে ব্যাঠ, পরিক্রমা ইত্যাদি।]

মা

বেঙ্কটেশ্বর রাও

আয়ারম্মার ঘর থেকে ফেরবার সময় মণিকাম্মার জুতো ছিঁড়ে গেল। মণির অবস্থা যেমন শোচনীয় হয়ে উঠেছিল তেমনি ওর জুতোটাও আর পরবার মতো অবস্থায় ছিল না।

এই জুতো ফেলে দেবার মতো মানসিক শক্তিও যেমন ওর ছিল না, তেমনি জুতো মেরামতের মতো পয়সাও উনি রাখেননি। এই কারণে জুতো জোড়া হাতে নিয়ে উনি বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

ঘরের ভেতর ঢোকা করা মাত্র ওঁর বৌমা ওঁর দিকে তেড়ে গেল।

"ছেঁড়া জুতোটা তো কোথাও ফেলে আসতে পারতেন। ঘরে নিয়ে আসার কি দরকার ছিল? এটাই বলার জন্য যে ছেলে মায়ের দিকে এটুকুও খেয়াল রাখে না।"

বৌমার স্বভাব উনি ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি আর এ-প্রসঙ্গে কোন কথাই বললেন না।

ওঁর ছোট নাতি কাঁদছিল। ওকেই কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করতে করতে নিজের কোলে নিলেন।

মণিকাম্মার স্বামী মাধব রাও গত বছর হৃদ্‌রোগে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুর একদিন আগে মণি স্বামীর সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলেন। বৌমার জন্য চুড়ি ও নাতির জন্য নতুন কাপড় নিয়ে এসেছিলেন।

"দেখো মণি—নিজের জুতোর দিকে একটু তাকিয়েছ কি? কি পুরনো হয়ে গেছে। চলো নতুন জুতো কিনে দি।"

বারণ করলেও মাধবরাও তাঁর কথা শুনলেন না। স্ত্রীর জন্য উনি একজোড়া নতুন জুতো কিনে দিলেন।

এই কারণেই এই জুতো তাঁর কাছে এত প্রিয়। জুতোটাকে দেখলেই স্বামীর কথা মনে পড়লে চোখে জল এসে যেত।

এই জুতো প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তাই মণি কখনো-সখনো এই জুতোটা পরতেন। ছ'মাস হয়ে গেছিল। একদিন জুতো ছিঁড়ে গেলে ছেলের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সেলাই করে নিয়েছিলেন। তখন থেকেই ক্রমাগত জুতোর মেরামতি চলছে।

একদিন ওঁর বৌমা কমলা বাজার থেকে বাচ্চার জন্য কাপড় ও জুতো কিনে আনল।

রাতে ছেলে সত্যম এবং বৌমা কমলার কিছু কথাবার্তা তাঁর কানে এলো।

"মায়ের জুতোটা তো পরবার মতো অবস্থায় নেই। একজোড়া তো ওঁর জন্য আনতে পারতে।"

ছেলের কথা শুনে মার হৃদয় ভরে উঠল।

"এই বয়সে তোমার মা কোথায় যাবেন? এখন জুতোর প্রয়োজন আছে কী? ঘরের মধ্যেই তো থাকেন। কোথাও যান তো না।"

বৌমার কথা শুনে উনি খুব দুঃখ পেলেন।

এর উত্তরে নিজের ছেলে কি বলল শুনতে পেলেন না।

বৌমার স্বভাব সম্বন্ধে উনি অভ্যস্ত ছিলেন। কতবার বৌমার মিথ্যে কটূক্তি শুনেছেন। সহ্যও করেছেন। এই নিয়ে কথা বাড়ানো পছন্দ করতেন না। ভগবানের নাম নিয়ে চুপচাপ থেকে যেতেন।

তাঁর সরল মন ও নরম স্বভাবের জন্য বৌমার স্বভাব আরো উগ্র হয়ে উঠেছিল।

পুরনো জুতোতেই উনি নিজের কাজ চালিয়ে নিতেন আজ ওনার দ্বিতীয় জুতোটাও জবাব দিয়ে দিল। ওটা সারাবার মত অবস্থাতে আর ছিল না।

স্বামীর দেওয়া জুতো জোড়া। যতই খারাপ হয়ে যাক, তাকে কি ফেলে দেওয়া যায়? স্বামীর ভালবাসার শেষ চিহ্ন এই জুতো জোড়া।

তাই যত্ন করে এক জায়গায় ওটাকে রেখে দিলেন।

খালি পায়ে জুতো ছাড়াই হাঁটার অভ্যাস ধীরে ধীরে হয়ে গেল তাঁর।

"কমলা...বারান্দায় আমার জুতো রেখেছিলাম। দেখতে পাচ্ছি না। কেনার পর মাত্র দু'মাস গেল। কাল সন্ধ্যাতে একটা জুতো ছিঁড়ে গেছে। অফিস যাবার সময় আমি সারিয়ে নিতে চাইছিলাম। একটু দেখতো, বাচ্চারা কোথায় রেখে দেয়নি তো? পেলে কাগজে মুড়ে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিও।"

একে তো অফিস যাবার সময় হয়ে যাচ্ছিল, তার ওপর

আবার জুতো পাওয়া যাচ্ছে না। ও হন্যে হয়ে বারান্দায় খুঁজতে লাগলো।

কমলা ঘরেও দেখে এলো।

কিন্তু জুতো খুঁজে পাওয়া গেল না।

"এটা কেমন বাড়ি? একটা জিনিসও ঠিক সময় পাওয়া যায় না? এখন কি করি? বাচ্চারা তো স্কুলে চলে গেছে।"

বিরক্ত হয়ে ও বাইরে বেড়াতে গেল। সামনে ওর মা জুতো হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে বাড়ির দিকে আসছিলেন।

"সত্যম বেটা...সকালে আমি দেখলাম...তোর জুতো ছিঁড়ে পড়ে আছে। বাচ্চারাও ছিল না। খালি পায়ে তুই অফিস কিভাবে যাবি? এই জন্য আমি নিজেই জুতো নিয়ে বাজারে গেছিলাম। মেরামত করতে একটু দেরি হয়ে গেল।" এই বলে মণিকাম্মা জুতো ছেলের পায়ের পাশে রেখে দিলেন।

ছেলে মায়ের দিকে তাকাতে পারলো না। ওর মাথা ঝুঁকে পড়ল, ওর দৃষ্টি মার পায়ের দিকে। একটা পা দিয়ে রক্ত পড়ছিল।

অনুশোচনায় ভরে গেল সত্যমের মন। মায়ের প্রতি ওর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

"মা...এই রক্ত কি করে?"

"কিছু না রে। রাস্তায়-কাঁচের টুকরো পড়ে ছিল। ওতে খানিকটা লেগে গেছে। এখন ঘাবড়াবার কিছু নেই। কাঁচের টুকরোও বের করে নিয়েছি।" এই বলে মণিকাম্মা ঘরে চলে গেলেন।

লজ্জায় ওর ছেলের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জুতো পায়ে দেবার সময় ওর পা কাঁপছিল।

ওর মনে হচ্ছিল মার বুকের ওপর ও পা রাখছে।

তারপর...

তাড়াতাড়ি ও বারান্দা থেকে নেমে এল।

অফিসের জন্য নয়—

জুতোর দোকানের খোঁজে—

—মার জন্য জুতো কেনা দরকার।

অনুবাদ : বিতস্তা ঘোষাল

[লেখক পরিচিতি : লেখক তেলুগু সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সামাজিক চেতনায় আচ্ছন্ন লেখকের একাধিক লেখায় পারিবারিক মূল্যবোধ, নীতিবোধ ফুটে ওঠে। উপরোক্ত লেখাটি হিন্দী অনুবাদ 'মাঁ' থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখকের একাধিক গল্প হিন্দী, তামিল, উর্দু, ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে। হরিজনদের নিয়ে লেখা Temple Bells তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি নিজেও সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষার একাধিক অনুবাদ করেছেন।]

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিঠি

জুলাই,

প্রিয় সুধীন,

বিনয় ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন যে, আমরা 'মার্কসিয়ান ওয়ে' সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে এই সিদ্ধান্ত অস্থায়ী। কারণ প্রধান সমস্যা হচ্ছে ছাপানোর কাগজ। ছাপানোর কাগজ পাওয়া যাবে কিনা সে-বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ আছে এবং কাগজের অভাবে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ঝুলে থাকছে। কাগজ সংগ্রহের ব্যাপারে বিনয় খোঁজ-খবর নেবেন এবং তাঁর অনুসন্ধানের পরেই পত্রিকা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারটি এখনও ঝুলে আছে বলে আমি এখনও পর্যন্ত প্রচারপত্রটি ডাকে দিইনি। তবে পরামর্শদাতা হিসাবে আমি যাঁদের যুক্ত করতে চাই, এমন কয়েকজনকে প্রচারপত্রটি পাঠিয়েছি। আমি স্যার সি. আর. রেড্ডী, স্প্র্যাট, ডঃ এইচ-সি মুখার্জি এবং বি. এইচ. ওয়াদিয়ার কাছ থেকে সদর্থক জবাব পেয়েছি। আপনি হয়তো শেষোক্তজনকে জানেন না। তিনি আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আপনি যখন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবেন, তখন তাঁর গুণের কথা জানতে পারবেন। এছাড়া, মুম্বাইর সাহিত্যিক মহলে তিনি পরিচিত। তর্কতীর্থ লক্ষ্মণশাস্ত্রীও আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। একমাত্র ধূর্জটির কাছ থেকে নঙর্থক জবাব এসেছে। ডঃ আম্বেদকরও সহানুভূতিশীল। কিন্তু তিনি একজন পরামর্শদাতা হবেন কিনা তা জানাতে ভুলে গিয়েছেন। আমি তাঁকে আবার লিখছি। অন্যদের নিকট থেকে এখনও জবাব আসতে পারে। অধ্যাপক সিদ্ধান্তের নিকট থেকে আমি সদর্থক জবাব আশা করছি। অন্যান্যদের নিকট থেকে সম্মতি পাওয়ার ব্যাপারে আমি আপনার উপর নির্ভর করছি। কারণ তাঁরা আমার চেয়ে আপনার সঙ্গে বেশি পরিচিত।

আমি যাঁদের কথা লিখেছি, তাঁদের সম্পর্কে আপনি কিছুই লেখেননি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তালিকাটি আপনাকে বেশী খুশি করতে পারেনি। কিন্তু আমার হাতে যা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বিনয় আমাকে লিখেছেন যে, আপনি পত্রিকার উঁচু মান বজায় রাখার ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। আমিও আপনার উদ্বিগ্নতার শরিক। আমার মনে পড়ছে, আমরা যখন পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে প্রথম বার আলোচনা করি, তখন আপনি আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, এ-ব্যাপারে খুব বেশী অসুবিধা হবে না। সুতরাং পত্রিকার উচ্চমান বজায় রাখার ব্যাপারে আমি নিজের চেয়ে আপনার ওপরেই বেশি নির্ভর করব। অবশ্য আমি আমার দায়িত্ব এড়িয়ে যাব না।

ছাপার কাগজ পাওয়ার অনিশ্চয়তার জন্য পুরো প্রকল্পটি এখন ঝুলে আছে। এই বিষয়ে আমি এখন আর কিছু লিখছি না।

আমার আশঙ্কা, আমার শেষ চিঠির কিছু মন্তব্য আপনাকে কিছুটা বিচলিত করেছে। এতে অবশ্য প্রমাণ হয় যে, আপনি 'অরাজনৈতিক' ভান করলেও আপনি খুব বেশী অরাজনৈতিক নন। আপনি নিজেকে রাজনীতির বাইরে রেখেছেন, তার কারণ, আমার সন্দেহ, আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে আপনি আমার মতোই বিরক্তির মনোভাব পোষণ করেন। আমার অনুমান এই বিরক্তিই আপনাকে একবারের জন্যও স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিতে দেয়নি। যাই হোক, আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, আমরা ফের মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে আমাদের আলোচনা মুলতুবি থাকতে পারে। কেবল এই তথ্যের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, সাহেবদের হ্যাট ও গান্ধী টুপির বাইরে আর এক ধরণের লোক আছে, যাঁদের আমি সবচেয়ে বেশী অপছন্দ ও অবিশ্বাস করি। এই ধরণের মানুষ হ্যাটের নিচে গান্ধী টুপি পরেন। এটা অসততা ও কাপুরুষতার প্রকাশ।

আমার বক্তব্যের মধ্যে আপনি বারবার যুক্তিসঙ্গত সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়ায় আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি কখনও ইন্টিলেক্চুয়াল ইন্ডিয়া পড়েছেন? যদি পড়ে থাকেন, তা হলে গত তিনটি সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপর আমার

মতামত জানতে পারলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। এই বিষয়ে আরও লেখা পরে ছাপা হবে। কিন্তু ছাপার ভুল দেখে ঐ লেখাগুলিকে বিচার করবেন না।

বিনয় বলেছিলেন যে, আপনি আগামী অক্টোবরে এদিকে আমার কথা এখনও ভাবছেন। আমার একান্ত ইচ্ছে যে, আপনি আপনার মন ঠিক করুন। আমরা বোম্বে থেকে দু বোতল ব্রাণ্ডি কিনে এনেছি। সেগুলি আমরা রাজেশ্বরীর জন্য রেখে দিয়েছি। আমি আশা করছি যে, রাজেশ্বরী আপনার জন্য নিজেকে ও আমাদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবে না। আমি আপনার জন্যও কিছু এনেছি। কিন্তু আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আপনারা অক্টোবরে নিশ্চয়ই আসবেন। তা না হলে আমাদের লোভ সামলানো কঠিন হবে। মনে রাখতে হবে, আপনি যেমন মনে করেন, আমি সে-ধরণের বিরক্তিকর রাজনৈতিক মানুষ নই। আমার মেজাজ সবচেয়ে ভাল থাকে, যখন আমার মস্তিষ্ক একেবারে ফাঁকা থাকে। যা সত্যিই ভাল সম্ভবত এখানেই আমাদের আধ্যাত্মিক ঐক্য।

রাজেশ্বরী ও আপনাদের দুজনের ভালবাসা।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

রায়

মার্কসিয়ান ওয়ে—এম. এন. রায় সম্পাদিত এই ত্রৈমাসিকটি বের হয় ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। দু বছর পরে পত্রিকাটির নাম হয় হিউম্যানিস্ট ওয়ে ১৯৫২ সালে পঞ্চম বই প্রথম সংখ্যা ছাপা হওয়ার পত্রিকাটির বন্ধ হয়ে যায়।

পত্রিকাটির সম্পাদক হওয়ার জন্য এম. এন. রায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে অনুরোধ করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তখন এ-আর-পি.তে কর্মরত। সরকারী চাকরি করে পত্রিকা-সম্পাদক হওয়ার অনুমতি পাওয়া যায় না। তাই এম. এন. রায় পত্রিকাটির সম্পাদক হন।

ফিলিপ স্প্রাট : ইংল্যান্ড থেকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল এদেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। মীরাট কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি।

তর্কতীর্থ লক্ষ্মণশাস্ত্রী যোশী—মহারাষ্ট্রের ওয়াং সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় মারাঠী ভাষায় বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়েছিল। এম. এন. রায়ের একজন রাজনৈতিক সহকর্মী।

অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত তখন লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৫৪-৫৫), প্রথম কেন্দ্রীয় পে-কমিশনের সদস্য হওয়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ ত্যাগ করেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির প্রচার-সচিব হয়েও কেন স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণে বিরত ছিলেন, এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর তিনি গান্ধীজীর রাজনীতি অপছন্দ করতেন। অথচ গান্ধীর রাজনৈতিক প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে, তাঁর বাবা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গান্ধী-হাওয়ার সক্রিয় রাজনীতি ও শিক্ষা প্রসারের কাজকর্ম থেকে বিরত হন। তারপর তাঁর বাবা যা করেছেন, তার ছেলে সুধীন্দ্রনাথ অনুমোদন করেননি। তিনি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী The World of Twilight গ্রন্থে লিখেছেন

In 1921, he made Tagore join him in opposition to Gandhi's anti-intellectual denounciations of Western education. (p. 15).

অন্যত্র তিনি যাবার প্রসঙ্গে লিখেছেন he subsequently realized that the Gandhian epoch had brushed aside everything he stood for, he might have also felt the need to assert his faith without examining its bearing on current events and gathering uncertainties. (p. 15). গান্ধীজীর প্রতি তাঁর বিরূপতা এত বেশী ছিল যে, অন্যান্য বাঙালী কবির মতো তিনি মহাত্মা গান্ধীজীকে নিয়ে একটিও কবিতা লেখেননি। মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে তার ধারণা কিছুটা বদলায়, গান্ধীজীর চেষ্টায় কলকাতার দাঙ্গা বন্ধ হওয়ায়। তাই Encounter পত্রিকায় প্রকাশিত Calcutta প্রবন্ধে কলকাতার দাঙ্গা বন্ধ করার ব্যাপারে গান্ধীজীকে কৃতিত্ব দেন।

অনুবাদ ও পরিটিপ্পি : নিরঞ্জন হালদার

—

জার্মানি

জরাথুস্ত্র এমনই বলেন

ফ্রেডরিক নীৎসে

এক

তিনটি রূপান্তর

সত্তার তিনটি রূপান্তরের কথা আমি তোমাদের কাছে বলতে চাই : সত্তা কিভাবে একটি উট হয়ে ওঠে, উট একটি সিংহ এবং সবশেষে সিংহ কিভাবে একটি শিশুতে রূপান্তরিত হয়।

বহু কিছুই সত্তার পক্ষে দুর্বহ। শ্রদ্ধা বিরাজ করে সেই সবল ভারবাহী সত্তায় কারণ দুর্বহ এবং দুর্বহতম ভারই এমন সত্তার শক্তি যাচ্ঞা করে।

কি সেই দুর্বহ? এমনই প্রশ্ন করে ভারবাহী সত্তা, তারপর উটের মত হাঁটু ভেঙে বসে আর যাচ্ঞা জানাতে থাকে সু-ভারগ্রস্ত হবার।

আর্য বীরগণ, সবথেকে দুর্বহ কি? আমার উপর যা গ্রহণ করতে পারি আর আপন সামর্থ্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারি, একথা ভারবাহী সত্তা জানতে চায়।

তা কি এমন নয়। নিজেকে নিগৃহীত করার জন্য আত্মশ্লাঘাকে যন্ত্রণা দান? নিজের প্রাজ্ঞতার প্রতি ব্যঙ্গ হানতে আপন মূর্খতার প্রদর্শন?

অথবা তা কি এমন, বিজয় উদ্‌যাপনের কালে নিজেদের নিমিত্তকে পরিত্যাগ? শয়তানকে প্রলুব্ধ করার জন্য উঁচু পর্বতোপরি আরোহণ?

কিংবা তা কি এরূপ। ওক-ফল ও জ্ঞানতৃণে জীবন-নির্বাহ এবং সত্যের জন্য আত্মার ক্ষুধা সহ্য করে চলা?

অথবা তা কি এমন। অসুস্থ হয়ে পড়া আর সান্ত্বনাদাতাদের বিদায় জানানো, এবং তোমার অনুরোধ শুনতে পায় না। এমন বধির বন্ধুজন নির্বাচন?

অথবা এমন কি তা। যা নাকি সত্যের নির্ঝর-রূপ সেই নোংরা জলে নিমজ্জন, এবং শীতল ও উষ্ণ বুকে-হাঁটা ব্যাঙদের পরিত্যাজ্য না ভাবা?

কিংবা তা কি এমন আমাদের যারা অবজ্ঞা করে তাদের ভালোবাসা আর অশরীরী যখন আমাদের ভয় দেখাতে চলেছে তার কাছে হাতখানি বাড়িয়ে ধরা?

দুর্বহতম একসমস্ত কিছুই ভারবাহক সত্তা নিজের স্কন্ধে চাপিয়ে নেয়। আর যখন উটের মতই সে নাকি ভারগ্রস্ত, উন্মত্তচিত্তে সবেগে ধাবিত হতে থাকে, এবং এমনই দ্রুতধাবনে সত্তা নিজেরই উন্মত্ততায় ছোটে।

কিন্তু নিঃসঙ্গতম উন্মত্ততায় সেই দ্বিতীয় রূপান্তরটি ঘটে। সত্তা এখানে সিংহে পরিণতি পায়, আর স্বাধীনতা ও আপন উন্মত্ততার প্রভুত্ব সে আয়ত্ত করবেই।

এখানে সে নিজেরই সর্বশেষ প্রভুরূপ খুঁজতে থাকে। নিজের কাছে এবং যার শেষ ঈশ্বরের পক্ষেও হয়ে উঠবে বিরূপ। যেহেতু বিপুলাকার দৈত্যের সঙ্গেই সে জয়ের জন্য সংগ্রাম চালায়।

কি সেই বিপুলাকার দৈত্য? সত্তা কোনমতেই যাকে প্রভু এবং ঈশ্বর বলতে রাজি নয়? মহাকায় সেই দৈত্যকে বলা চলে "তুমিই-হবে"। কিন্তু সেই সিংহের সত্তা বলতে থাকে 'আমিই হব।'

স্বর্ণে দীপ্তিত পথে তার ছড়িয়ে আছে 'তুমিই-হবে'—ধাপে-ধাপে আবৃত পশুপ্রকৃতি আর প্রতিটি ধাপেই হিরণ্য-দীপ্তিতে, "তুমিই-হবে"।

সহস্র বছরের মূল্যবান সেই সমস্ত ধাপে ধাপে শোভা পাচ্ছে এবং সকল দৈত্যের মধ্যে সবলতমটি একথা বলে উঠল, "সমস্ত কিছুরই সামগ্রিক মূল্য আমার মধ্যে দীপ্তিমান'।

সমস্ত মূল্যমান তো ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়ে গেছে, এবং সৃষ্ট সে সমস্ত মূল্যমানের প্রতিমূর্তি তো আমিই। আর ঠিক সেখানে আর কোন "আমিই-হব নেই, কোনমতেই তা বাচবেও না।" এমনই বলল সেই বিপুলাকায় দৈত্য।

হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, তাহলে সত্তা-মধ্যে কেন থাকবে সেই সিংহের প্রয়োজন? কেন ভারবাহী পশুই তাহলে যথেষ্ট হয়ে ওঠে না, যে কিনা অস্বীকৃতি জানায় আবার শ্রদ্ধাশীলও?

নতুন মূল্যমান সৃষ্টিতে—অর্থাৎ সেই সিংহও এমনকি সক্ষম নয়। অথচ নতুন সৃষ্টিকর্মের জন্য, নিজের স্বাধীনতা গড়ে তুলতে—সিংহের শক্তি দরকার।

স্বয়ং স্বাধীনতা সৃজনে অবিকল্প কোন পবিত্ররূপ দিতে এমনকি কর্তব্য প্রদানেও ; হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, সে জন্য তো সিংহের প্রয়োজন থেকেই যায়।

নতুন মূল্যমানের সেই উর্দ্ধতন অর্জনে—সেই তো কোন ভারবহনকারী এবং শ্রদ্ধাবান সত্তার পক্ষে সব থেকে ভয়ঙ্কর দায়িত্বগ্রহণ। ঠিকই এমন কোন এক সত্তার কাছে এটিই প্রত্যাশিত, আর সে তো শিকারী পশুরই কাজ।

সব থেকে পবিত্ররূপে একদা সে ভালোবেসেছিল, "তুমিই হবে"। এখন সে, অছিলা খুঁজে পাবেই এবং সার্বভৌমতাও, এমনকি সর্বাপেক্ষা পবিত্র রূপের মধ্যেও। অর্থাৎ সে, আপন ভালোবাসা থেকে স্বাধীনতার আরও জন্ম পারে। আর এই অর্জনের জন্যই প্রয়োজন সিংহের।

তবুও হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমায় বল, শিশু কি এমন করতে পারে, যা নাকি এমনকি সেই সিংহও করতে পারত না? কেন শিকারে পটু সিংহকে তথাপি একটি শিশু হতে হবে?

নিষ্পাপতাই হচ্ছে শিশু আর বিস্মরণতা, একটি নবীন আরম্ভ, একটি ক্রীড়া, স্বঘূর্ণিত চাকা, প্রথম এক আন্দোলন, একটি পবিত্র হ্যাঁ।

হ্যাঁ, সেই সৃষ্টির খেলার নিমিত্ত, হে আমার ভ্রাতৃগণ, জীবনে একটি পবিত্র হ্যাঁ-এর প্রয়োজন হয়। সত্তা স্ব-ইচ্ছা বাঞ্ছা করে, তার নিজের জগৎ, বিশ্বের দ্বারা প্রদত্ত নির্বাসনকে তা জয় করে নেয়।

সত্তার রূপান্তর তিনটি তোমাদের কাছে আমি জানিয়েছি। কিভাবে সত্তা একটি উটে পরিণত হয়েছিল, উট একটি সিংহে এবং সর্বশেষে সিংহ একটি শিশুতে।

জরাথুস্ত্র এমনই বললেন, এবং যে শহরে তিনি তখন আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার নাম এক অলীক গাভী।

দুই
সদ্‌গুণের পণ্ডিতি আসন

জরাথুস্ত্রের কাছে লোকেরা একজন জ্ঞানীব্যক্তির সুপারিশ জানাল, এমন একজন যিনি নিদ্রা ও সদ্‌গুণের বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করতে পারতেন। এর জন্য তিনি বিপুলভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃতও হয়েছিলেন। যুবকগণ তার আসনের সামনে বসে পড়ল। জরাথুস্ত্র তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর আসনের সামনে উপবিষ্ট যুবকদের মধ্যে বসলেন। তখন সেই জ্ঞানী ব্যক্তিটি এমন বললেন।

নিদ্রার সন্নিধানেই শ্রদ্ধা ও বিনয় বাস করে। সেই তো প্রধান বিবেচ্য, এবং যারা কুনিদ্রায় থাকে, রাতে জেগে থাকে সেই মানুষদের থেকে কোন প্রত্যাশা রেখনা।

এমনকি চোরও নিদ্রার আশ্রয়ে বিনয়ী হয়, রাতের গভীরে নিঃশব্দে সে চুরি করে। অবশ্য রাতের প্রহরী দুর্বিনীত, আপন কর্ম সে দুর্বিনীত হয়েই চালিয়ে যায়।'

নিদ্রাযাপন তুচ্ছ কোন কলা নয়, কারণ গোটা দিন জেগে থাকার পক্ষে তা জরুরী।

একেক দিনে দশটি নিজেকে অতিক্রম করতেই হবে, তা নিয়ে আসে স্বাস্থ্যকর পরিশ্রান্তি এবং চিত্তের পক্ষে, তা হল আফিম।

দশটি বার পুনরায় তুমি নিজের সাথে বোঝাপড়া করবেই। কারণ নিজেকে অতিক্রম করাই হচ্ছে যন্ত্রণার এবং কুনিদ্রা হল অসঙ্গতির, অস্থিতির।

দশটি সত্য তোমায় দিবাভাগে খুঁজে পেতেই হবে অন্যথায় রাত্রিকালে তুমি সত্য খুঁজে ফিরবে, আর তোমার হৃদয়কে ভূখা থাকতে হবে।

দিনের মধ্যে দশটি বার তোমায় হাসতেই হবে এবং উৎফুল্লচিত্ত হতে হবে : অন্যথায় নিদারুণ যন্ত্রণা-স্রষ্টা তোমার জঠর রাত্রিকালে বিব্রত করবে।

স্বল্প মানুষই একথা জানে, অথচ সুনিদ্রার জন্য একজন ব্যক্তির সমস্ত রকম সদ্‌গুণ থাকা জরুরী। আমি কি মিথ্যা সাক্ষী হয়ে থাকব? আমি কি ব্যভিচার করব?

আমি প্রতিবেশীর দাসীর জন্য বাসনাকামনা জানাব? সে সবই তো সুনিদ্রার পক্ষে অন্তরায়।

এমনকি কোন মানুষের যদি সমস্ত সদ্‌গুণ থাকে তাহলেও আরও একটি জরুরী ব্যাপার হল, সঠিক সময়ে সেই সদ্‌গুণকে নিদ্রামধ্যে পাঠানো।

গুণবতী রমণীকূলের মত একে অন্যের সাথে যাতে তারা বিবাদে না মেতে ওঠে, এবং তোমার সম্পর্কে, ওহে অসূয়ীজন।

ঈশ্বর ও প্রতিবেশির সাথে সুশান্তি বজায় রেখ, সুনিদ্রা এমনই যাচ্ঞা জানায় আর প্রতিবেশির শয়তানের সঙ্গেও সুশান্তি টিকিয়ে রেখ, না হলে রাত্রির সময়ে তোমায় সে ক্রমাগত তাড়িত করবে।

শাসককূলে সম্মান এবং বশ্যতা দেখিও, দুষ্ট শাসকদের প্রতিও। এমনই যাচ্ঞা করে সুনিদ্রা। আমি এখানে কি করতে পারি যদি নাকি ক্ষমতা শঠপায়ে হাঁটতে ভালোবেসে বসে?

নিজের ভেড়াদের সবথেকে হরিৎ প্রান্তরে যিনি চারণ করান, আমার বিচারে তিনি সর্বদাই শ্রেষ্ঠ পশুপালক'। সুনিদ্রার সাথে তার এমনই শুভযোগ।

বহুবিধ সম্মান আমি চাই না, এমনকি বিপুল ঐশ্বর্যও নয়, তারা যকৃৎকে উত্তেজিত করে। তথাপি সুনাম ও যৎসামান্য বৈভব ব্যতিরেকে ঘুমানো হল খারাপ।

দুষ্ট সঙ্গীদের থেকে ছোট এক সঙ্গীদলই আমার কাছে অধিক কাম্য। কিন্তু অবশ্যই সঠিক ক্ষণে তাদের আগমন ও বিদায় দরকার। সুনিদ্রার সাথে ব্যাপারটির এমনই সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

ঠিকই যারা দুর্বলচিত তারাও আমায় সন্তুষ্ট করে, তারাও সুনিদ্রার কথা বলে। আশীর্বাদনীয় তারাই, সর্বদাই যদি তারা বিশেষ করে তার মধ্যে সমর্পণ করে।

এভাবেই সুনীতিবানদের দিন কেটে যায়। যখন রাত আসে, আমি তখন সযত্নে নিদ্রাকে আবাহন না-করতে চাই। সেও ডাক শুনতে অপছন্দ করে। নিদ্রা, সদ্‌গুণের চালক।

তবুও দিবসমধ্যে যা-কিছু আমি করেছি, ভেবেছি যে সমস্ত ভাবতে থাকি। এভাবেই গোস্পদের মত ধৈর্যশীল অনুধ্যানে আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে চলি, দশটি অতিক্রান্তি তোমার কি কি ছিল?

আর কিইবা ছিল সেই দশটি সমঝোতা এবং সেই দশটি সত্য, দশটি হাস্যোল্লাস হৃদয় যাদের মধ্যে আমার মন প্রফুল্ল হয়েছিল?

এমন ভাবনায় এবং চল্লিশটি ধ্যানের কোলে আশ্রিত হয়ে অকস্মাৎ সে আমার আচ্ছন্ন করে বসে—নিদ্রা সেই অনাহুত সদ্‌গুণের চালক-স্বরূপ।

আমার চোখে মধু স্পর্শ দেয় নিদ্রা, পাতাযুগল ভারি হয়ে আসে। নিদ্রা আমার মুখাবয়ব স্পর্শ করে এবং তা খোলাই থেকে যায়।

অতি লঘু পদপাতে সে আমার কাছে আসে, চোরদের মধ্যে সব থেকে প্রিয়, এবং আমার থেকে চিন্তারাশি হরণ করে নেয়। তখন নির্বোধ আমি দাঁড়িয়ে থাকি, বিদ্যায়তনিক এই চেয়ারের পায়েরই মতন।

কিন্তু আর বেশিক্ষণ আমি তখন দাঁড়িয়ে থাকি না। অনতিবিলম্বেই আমি শুয়ে পড়ি—

সেই জ্ঞানীজনকে জরাথুস্ত্র যখন এমন বলতে শুনলেন, আপন মনেই হেসে উঠলেন। যেহেতু এর ফলে তার চিত্তে এক ঝলক আলো আবির্ভূত হল। এবং নিজের হৃদয়কে তিনি একথা বললেন।

চল্লিশটি অনুধ্যান নিয়েও এই জ্ঞানীমানুষটিকে একজন বোকা বলে মনে হয়। তবুও আমি বিশ্বাস করি, কিভাবে ঘুমোতে হয় তা তিনি ভালো মতন জানেন।

সেই ব্যক্তিও এমনকি সুধী যে জ্ঞানীব্যক্তিটির সান্নিধ্যে বাস করে ; এমন নিদ্রা তো সংক্রামক-এমনকি কোন দেয়াল —ভেদ করেও তা সংক্রামক।

এমনকি তাঁর পণ্ডিতি আসনেও রয়েছে কোন এক যাদুমন্ত্র। কেননা বিনা কারণে যুবকগণ সদ্‌গুণ প্রচারকের সমীপে উপস্থিত হয়নি।

তাঁর প্রাজ্ঞতা সুনিদ্রার জন্য অতন্দ্র থাকা। আর ঠিকই, জীবনের যদি কোন চেতনা থেকে থাকে এবং আমায় যদি নির্বুদ্ধিতা বেছে নিতেই হত, তাহলে এটিই আমার কাছে সবথেকে কাঙ্খিত নির্বুদ্ধিতা বলে বিবেচিত হত।

এখন আমি ভালো করেই জানতে পারছি ইতিপূর্বে মানুষ সবার আগে অন্য কি চাইত যখন কিনা তারা সদ্‌গুণের শিক্ষক খুঁজত। নিজেদের জন্য তারা সুনিদ্রা খুঁজেছিল এবং আফিম-বুঁদ সদ্‌গুণ তাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এসমস্ত পণ্ডিতি আসনের উচ্চপ্রশংসিত সকল সাধকদের কাছে প্রাজ্ঞতা হল স্বপ্নবিহীন নিদ্রাকর্ম ; জীবনের অন্য কোন মহত্তর তাৎপর্য তারা জানতে পারেননি।

এমনকি এখনো অবশ্যই সদ্‌গুণের এমন প্রচারকের মত কেউ কেউ আছেন এবং সর্বদা তাঁরা তেমন সম্মানীয়ও নন। কিন্তু তাঁদের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আর খুব বেশি সময় তাঁরা টিকেও থাকেননি ; ইতিমধ্যেই তাঁরা সেখানে শুয়ে পড়েছেন।

সেই সকল তন্দ্রালু-জনেরা আশীর্বাদ ধন্য হউন। যেহেতু তাঁরাই অতি দ্রুত নিদ্রার ঘোরে দুলতে থাকবেন—

এমনই বললেন জরাথুস্ত্র।

তিন

পশ্চাদ্-জগৎ জন

জরাথুস্ত্র একবার কোন এক সময়ে সমগোত্রীয় মানুষকে অতিক্রমের কথা ভেবেছিলেন, সকল পশ্চাদ্-জগৎ-জনের মতই। জগৎ তখন আমার কাছে কোন এক যন্ত্রণার্ত ও উৎপীড়িত ঈশ্বরের সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

একজন ঈশ্বরের সেই স্বপ্ন, সেই নির্মাণ কলা। এই জগৎ তখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল চিরন্তন পবিত্রমনে অসন্তুষ্ট কোন এক চোখের সম্মুখে বর্ণময় বাষ্পরাশি বলে।

ভালো ও মন্দ, আনন্দ এবং দুঃখ। আমি আর তুমি —সৃষ্টিশীল চোখের সম্মুখে এগুলি আমার কাছে বর্ণময় বাষ্পরাশি প্রতিভাত হয়েছিল। তখন স্রষ্টা নিজের থেকে দূরে তাকাতে চেয়েছিলেন—সেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করলেন।

যন্ত্রণাভোগীর পক্ষে আপনি যন্ত্রণা গ্রাহ্য না করা এবং নিজেকে ভুলতে পারাই হল প্রমত্তকর আনন্দ। জগৎ একদিন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল প্রমত্ত আনন্দ ও আত্ম-বিস্মরণ রূপে।

এই জগৎ চিরকাল অপূর্ণ, এক অন্তহীন দ্বন্দ্ব-বিরোধ-প্রতিরূপ এবং অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ তার নিজের অসম্পূর্ণ স্রষ্টার কাছে একটি উদ্বেলিত আনন্দরূপ—জগৎ একদা আমার কাছে এভাবেই দেখা দিয়েছিল।

এভাবেই কোন এক মুহূর্তে মানুষকে অতিক্রম করেই আপন স্বপ্ন আমি নির্মাণ করেছিলাম, সকল পশ্চাৎ-জগৎ-জনের মতই। সত্যিই কি মানুষের সীমা ছাড়িয়ে?

আহা, আমার ভ্রাতৃগণ, সেই ঈশ্বর আমি যাঁকে নির্মাণ করেছিলাম, তিনি তো মানবিক সৃষ্টি এবং মানবিক উন্মত্ততা, অন্য সকল দেবতার অনুরূপই।

তিনিও তো একজন মানুষ এবং একজন মানুষও তারই অহং-এর নিছক ভগ্নাংশ। আমার আপন ভস্মও আলোর উৎস, এসেছিল সে আমার কাছে, অশরীরী সেই। এবং সত্যিই সে বাইরে কোথাও থেকে আমার কাছে আসেনি।

হে আমার ভাইয়েরা কি ঘটেছিল? সেই যন্ত্রণার্ত সত্তাকে, নিজেকে আমি অতিক্রম করেছিলাম ; আপন ভস্ম আমি বয়ে নিয়ে গেলাম পর্বত-মধ্যে। আরও এক উজ্জ্বলতর শিখা, নিজের পক্ষে সম্ভব করেছিলাম। আর দেখ, সে কারণেই, অশরীরী সেই নিজেকে আমার থেকে প্রত্যাহার করেছিল।

মুক্তি-প্রাপ্ত এই আমি, এখন তেমন কায়াহীনে বিশ্বাস স্থাপন হবে আমার পক্ষে যন্ত্রণাও নিপীড়নের। আমার কাছে এখন যন্ত্রণাকর ও নিগ্রহের। এমনই আমি পশ্চাৎ-জগৎ-জনদের জানিয়ে দিলাম।

নিদারুণ যন্ত্রণাকর ও নির্বীর্যের ছিল সে। সকল পশ্চাৎ-জগৎ-জনকে যে নাকি সৃষ্টি করেছিল, এবং আনন্দের লঘু উদ্বেলন, সর্বাধিক যন্ত্রণাভোগীই কেবল যাঁর অভিজ্ঞতা জেনেছিলেন।

পরিশ্রান্তি, যে কিনা এক লাফেই চরম-প্রাপ্তিতে পৌঁছাতে চায়, কোন এক মরণ-লাফে। এক নিঃসম্বল, অজ্ঞান পরিশ্রান্তি, যা এমনকি কোন প্রকার যাকা জানাতে অনিচ্ছুক। সমস্ত দেবতা ও পশ্চাৎ-জগৎ-জনকে যা নাকি সৃষ্টি করেছিল।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, বিশ্বাস কর আমায়, এই দেহ আপনাকে নিয়েই হতাশ হয়ে পড়েছিল, নিজেরই মোহাচ্ছন্ন সত্তার অঙ্গুলি দিয়ে হাতড়ে খুঁজে ফিরেছিল নির্ভরতার দেয়ালগুলি।

হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, বিশ্বাস কর আমায়। ধরিত্রীকে নিয়ে এই শরীরই হতাশ হয়ে উঠেছিল—শুনতে পেয়েছিল অস্তিত্ব-জগৎ তাকে ডেকে বলছে। আর তখনি সে চেষ্টা করেছিল চূড়ান্ত সেই দেয়াল-মধ্য দিয়ে মাথা গলাতে—আর কেবল মাথাই নয়, 'পরলোক' মধ্যেও।

কিন্তু সেই "পরলোক" মানুষের কাছে গভীর গুপ্ত, সেই অমানবিক, নিষ্ঠুর জগৎ কিনা স্বর্গস্থ কোন কিছু। আর অস্তিত্বের, বিশ্ব মানুষের কাছে, মনুষ্যভাবে ছাড়া কথা বলে না।

ঠিকই, সমস্ত সত্তাকে প্রতিপন্ন করে তোলা যথেষ্ট কঠিন, এবং কথা বলানোও কঠিন। ওহে ভাইয়েরা আমার বল সমস্ত কিছুর মধ্যে সব থেকে অদ্ভুত বস্তুটিই কি সর্বাধিক প্রমাণিত নয়?

হাঁ, এই অহং। আপন দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও হতবুদ্ধিতা নিয়ে আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে সব থেকে সৎভাবে কথা বলে—এই সৃষ্টিকর্ম, ইচ্ছাবৃত্তি, মূল্য বিচারক অহং, সেই তো সবকিছুর পরিমাপক মূল্যমান।

আর সর্বাপেক্ষা এই ঋজু অস্তিত্ব, অহং-দেহ সম্পর্কে জানায় তথাপি দেহাতীত ভাবও ব্যক্ত করে এমনকি সে যখন গান গায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয় এবং ভাঙা ডানা ঝাপটাতে থাকে।

সেই অহং সর্বদা আরও সৎভাবে কথা বলা শেখে আর যতই তা শিখে নেয় ততই মর্যাদা খুঁজে পায়, দেহ ও ধরিত্রীর জন্য নামও পেয়ে যায়।

অহং নিজেকে আমায় একটি নতুন গৌরবভাব শিখিয়েছে আর আমি তা মানুষকে শিক্ষা দিই, স্বর্গস্থ দিব্যবস্তুতে, আপনমস্তিষ্ককে কোন মতেই বিশ্বাস না করতে, বরং তাকে মুক্তচিত্তে বহন করে চলা, কোন এক পার্থিব ভাবনা ধরিত্রীকে যা অর্থ প্রদান করে।

নতুন একটি প্রতিজ্ঞা মানুষকে আমি শিক্ষা দেব; মানুষ যা অন্ধভাবে অনুসরণ করে এসেছে সেই পথ বেছে নিতে এবং তা অনুমোদন করতে—আর কোনভাবেই তা থেকে অসুস্থ ও ধ্বংসোন্মুখের মতন ধীর লয়ে বিচ্যুত হওয়া নয়।

অসুস্থ ও ধ্বংসোন্মুখ—তারাই তো দেহ ও পার্থিবকে অবজ্ঞা করেছিল এবং স্বর্গীয় জগৎকে উদ্ভাবন করেছিল আর রক্তক্ষরণ প্রশমন করেছিল, তবুও কিন্তু সেই সমস্ত মধুর ও বিষাদ-গরল দেহ ও পৃথিবী থেকে তারা গ্রহণ করেছিল।

নিজেদের দুর্দশা থেকে তারা মুক্তি খুঁজেছিল আর ভাগ্য ছিল অতি সুদুরবর্তী। তারা তখন আর্তি জানিয়েছিল, "আহা সেখানে স্বর্গীয় পথগুলিই ছিল, অন্য অস্তিত্বে ও সুখমধ্যে যে পথে প্রবেশ করতে হয়।" তারপর তারা নিজেদের জন্য অলিগলি ও রক্তাক্ত চুমুকের সূচনা করলো।

দৈহিক-চক্র ও এই পৃথিবী অতিক্রম করে তারা, অর্থাৎ এ সকল অকৃতজ্ঞজনেরা নিজেদের স্থানান্তরিত মনে করল। কিন্তু স্থানান্তরণের আলোড়ন ও উৎল্লাস ভাবের জন্য ঋণটুকু কিসে নিহিত? তাদের দেহ ও এই পৃথিবীর কাছে।

রুগ্নদের প্রতি জরাথুস্ত্র সদয়। ঠিকই, তাদের আত্মতুষ্টি ও অকৃতজ্ঞতার মনোভাবে তিনি রুষ্ট নন। বরং তারা নতুন করে স্বাস্থ্য ফিরে পাক ও জয়ী হোক এবং নিজেদের জন্য আরও সুঠাম দেহ নির্মাণ করুক।

জরাথুস্ত্র কিন্তু আরোগ্যজনের প্রতিও ক্রুদ্ধ নন, তার মোহকে তিনি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন এবং মধ্যরাতে আর ঈশ্বরের সমাধির চারপাশে গোপনে চৌর্য বৃত্তি করে, তবু অসুস্থতা, রুগ্নভাব এমনকি তার কান্নার মধ্যেও থেকে যায়।

বহু অসুস্থ মানুষ সর্বদাই তাদের মধ্যে ছিল যারা বন্দনা গেয়েছিল এবং ঈশ্বরের জন্য কাতর ছিল, তারা ভীষণরকম ঘৃণা করত উপলব্ধিকারীকে ও সদ্‌গুণের সর্বশেষ রূপ অর্থাৎ ঋজুতাকে।

তারা সর্বদাই অন্ধকারকালের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়েছিল, সত্যিসত্যিই তখন মোহ ও বিশ্বাস ছিল কিছু পৃথক। যুক্তির প্রতি ক্রোধোন্মত্ত ভাবণই ছিল ঈশ্বরের সমরূপ, আর সন্দেহ প্রকাশই ছিল পাপ।

যে সমস্ত ঈশ্বরতুল্যদের আমি খুব ভালো করেই জানি, বিশ্বাসী হয়ে ওঠার জন্য তারা পুনঃপুনঃ, দাবি জানায়, অর্থাৎ সন্দেহ পোষণ হল পাপের কাজ। আমি তাও জানি যে যারা অতি উত্তম তারাও বেশিরভাগ কিসে বিশ্বাস রাখবে?

ঠিকই, পশ্চাৎ-জগতে নয়, আর রক্তক্ষরণ পরিশোধে নয়, বরং দেহেই তারা সর্বাধিক বিশ্বাস করে, এবং আপনাপন দেহই তাদের কাছে স্বয়ম্ভূ।

যদিও তাদের পক্ষে এ এক রোগ জর্জর অবস্থা এবং আনন্দের সাথেই নিজেদের কর্মাবরণ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। সে জন্য মৃত্যুর প্রচারকদের কাছে তারা কান পাতে', আর নিজেরা মৃত্যু-পুরীর কথা প্রচার করে।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, বরং স্বাস্থ্যবান দেহের সুরে কান রেখো, এ অনেক বেশি ঋজু ও শুদ্ধতর কণ্ঠস্বর।

আরও বেশি ঋজুতায় এবং শ্রদ্ধাভরে স্বাস্থ্যবান দেহ কথা বলে, নিখুঁত ও বিস্তারিত করে। এবং তা মৃত্তিকার গূঢ়ার্থকে ব্যক্ত করে—জরাথুস্ত্র এমনই বললেন।

অনুবাদ : দিলীপ ঘোষ

[জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নীৎসে (১৮৪৪-১৯০০) তাঁর সমকালে এবং এখনো পর্যন্ত সম্ভবতঃ বিশ্বের সবচেয়ে বিতর্কিত চিন্তাবিদ। তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তালিকা অতি দীর্ঘ। তিনি গভীরভাবে খ্রীষ্টিয় ধর্মমত বিরোধী, এবং দার্শনিক বীক্ষণেও সে ভাবনা সাড়ম্বরে ব্যক্ত করেছেন। এ ছাড়াও কেউ তাঁকে অস্তিবাদী, কেউ আবার শূন্যবাদী রূপে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গোড়া ভক্ত বলতেও দ্বিধা করেননি। ইহুদি বিদ্বেষী, হবাগনার পন্থী, প্রকৃতিপূজক, প্রাচীন হেলেনিক ও রোমান আদর্শের গভীর অনুরাগী হলেও নীৎসের রচনা উপর্যুপরি জনপ্রিয় হয়ে চলেছে।

ধর্ম ছাড়াও ট্রাজেডির জন্ম, শুভ ও অশুভের ভাবনা এবং অন্যান্য দার্শনিক বীক্ষণ, ও নীতি-দুর্নীতির বিষয়ে তাঁর মৌলিক মতামত,

মানবচিন্তার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান গড়ে নিয়েছে। এ যুগের দার্শনিক হাইডেগার, মিশেল ফুকো, জ্যাকলেরিদা, এবং সর্বশেষে রুমানীয় চিত্রবিদ্ সিওরণ সকলেই নীৎসের ভাবাদর্শে কোনো কোনো না ভাবে ঋণী। এঁদের সকলেই তাঁর প্রতি সমান সদয় নন।

তবুও নীৎসে আজ বিপুলভাবে পঠিত। তাঁর জীবনের মধ্যপর্বের রচনা Thus Spake Zoroathustra। এখানে তিনি প্রাচীন অগ্নি উপাসক পারসিক চিত্রবিদ্ জরাথুস্ত্রের বয়ানে নিজের বিদ্রোহী ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বোনের স্মৃতিচারণে আমরা জানতে পারি, জরাথুস্ত্রের মধ্যে তিনি ব্যক্তিমানুষের ঊর্ধ্বগামী চেতনা, তার সত্তার ক্রমাগত উত্তরণ, ইচ্ছাশক্তির দুর্দমনীয় অভিযান, সমগ্র মানবজাতির যুগান্তকারী অভ্যুত্থানের ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনা জলদগম্ভীর অথচ গীতিধর্মী কাব্যরূপে উপস্থিত করেছেন। এই ঊর্ধ্বগামিতার ভাবনা তিনি কৈশোর থেকেই চিত্তমূলে বহন করতেন।

নীৎসের জরাথুস্ত্র সুদীর্ঘকাল নির্জন পর্বতকন্দরে গূঢ় তপশ্চর্যা শেষ করে ফিরে আসছেন সমতলে, মানুষের মধ্যে। এতদিনের আহৃত জ্ঞান তিনি মনোমধ্যে বিতরণ করতে চান। সে এক অনবদ্য কথনরীতি, ও চিত্ররাশি নীৎসে জরাথুস্ত্রের ভাবণে আমাদের উপহার দিয়েছেন।

জরাথুস্ত্রের আখ্যান রচনার পরে আত্মজীবনীধর্মী সৃষ্টি Ecce Homo তে তিনি জানান, "আমার কথা শোন। যেহেতু আমি এমন এবং এমন একজন ব্যক্তি। সর্বোপরি, অন্য কারো সাথে আমাকে ভুল কোরো না।" এ বাণী নিরর্থক নয়, দার্শনিক ও চিত্রবিদ্ নীৎসে সত্যিই অনন্য। তাঁর কথার বদলে এই অনন্যতা হল, "তোমাকে আপন জীবন বদলাতেই হবে।"

অনূদিত অংশটুকু Thus Spake Zoroathustra রচনার প্রথম ভাগের তিনটি অধ্যায়। ইংরেজি অনুবাদের সূত্র—The Philosophy of Nietzsche. প্রকাশক, The Modern Library. Newyork. অনুবাদকের নাম Thomas Common ভূমিকা লেখক Willard Huntington Wright—অনুবাদক।

তেলুগু

শৃঙ্খলিত সাহিত্য

ওয়রওয়র রাও

"উৎপাদন উপকরণের তীব্র বিকাশের দ্বারা সম্ভার মাধ্যম দিয়ে যে ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে পুঁজিপতিরা সব দেশগুলিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্বীকার করার জন্য বাধ্য করে, এবং তাদের নিজের সমন্বয়ের সভ্যতাকে মেনে নেওয়ার জন্য অর্থাৎ পুঁজিবাদী হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের বাধ্য করে। এক কথায় বলা যায় পুঁজিবাদ নিজের ভাবমূর্তির একটি পৃথিবী রচনা করে।"

—মার্ক্স এবং এঙ্গেলস

পুঁজিবাদ যদি তার নিজের ভাবমূর্তির পৃথিবী রচনা করে তাহলে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার চরম রূপ সাম্রাজ্যবাদ এই কাজ অনেক ব্যাপকভাবে করে। এই পৃথিবী এবং তাতে সক্রিয় শক্তিগুলিকে নিজের মত করে পরিভাবিত করে এবং তাদের মেনে নেওয়ার জন্য অন্যদের বাধ্য করে। সে তার সভ্যতা এবং যে সংস্কৃতি সকলের উপর চাপিয়ে দেয় এবং তাদের তা মেনে নেওয়ার জন্য বাধ্য করে, এক কথায়, এই দুনিয়ার বিশ্বায়ন ও একরূপীকরণের প্রস্তাবে জুটে যায়।

বিপ্লবী লেখক হিসেবে আমরা জনগণের নানা ধরনের সংস্কৃতির প্রতি সম্মান রাখি এবং বহুমুখী বিচিত্র যথার্থের বিবিধ চিত্রের ছবি আঁকি, বিশ্লেষণ করি। সেইজন্য বিশ্বায়ন ও একরূপীকরণের সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাকে বোঝা এবং তার বিরোধ করা আমাদের দায়িত্ব। ওরা শুধু উৎপাদন উপকরণকেই নয়, বরং সাংস্কৃতিক আচরণকেও তাদের অধীন করতে চায়। এই অধীনতার শিকল ছেঁড়া আমাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব।

কিন্তু এই অধীনতার প্রক্রিয়া কি? কেউ কি বাস্তবে সাহিত্যকে বন্দী করতে পারে? কারণ সাহিত্য তো স্বাধীনতা খুঁজে বেড়ায়। অভিব্যক্তির সন্ধানে স্বাধীনতার কণ্ঠকে শিকল দিয়ে বাঁধা অসম্ভব। তাই সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক প্রক্রিয়ায় তাকে শেষ করার প্রচেষ্টায় যুক্ত থাকে। এই প্রচেষ্টাগুলিকে বোঝা ও চেনা সাধারণভাবে সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদ মানবীয় মূল্য, বিশ্বগ্রাম এবং সাংস্কৃতিক অন্তপ্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্লোগানের মাধ্যমে তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। তার এই প্রচেষ্টাগুলি তার রাজনৈতিক এবং আর্থিক চেহারার মত স্পষ্ট হয় না। এমনকি আমরাও, সব সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন এবং তার প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তারাও সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের অনুমান করতে পারিনা। সাম্রাজ্যবাদ আমাদের কতটা ক্ষতি করতে পারে এটা ভোপাল গ্যাসের দুঃখদায়ক ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ভোপাল গ্যাসের দুঃখদায়ক ঘটনা আমাদের নাকের উপর হচ্ছে, কিন্তু তা দেখে আমরা চিনতে পারছিনা। এই হিংসা অত্যন্ত নিরাপদ এবং তার মৌন কার্যকলাপ আমাদের সব ধরণের সংস্কৃতির মধ্যে ছড়ান রয়েছে।

সাহিত্যের উপর বিশেষ করে সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রজন্মের উপলব্ধিকে অস্বীকার করা। এই দৃষ্টিতে তা বিকাশমান বিশ্বজনগণের সাহিত্যিক অভিব্যক্তিই নয়, বরং লেখার ক্ষেত্রে মানুষের উত্তরাধিকারেরই বিরুদ্ধে। হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টায় সাহিত্য আজ যে স্তরে পৌঁছেছে, আমরা যদি আমাদের সাহিত্যকেই দেখি তো দেখতে পাব যে তা রাজদরবারের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জনগণের দিকে পৌঁছানর জন্য যাত্রা শুরু করেছে। ইতিমধ্যে জনগণই শিল্প ও সাহিত্যের পরম্পরা বিকশিত করেছেন। সামাজিক রাজনৈতিক উত্থানপতন এবং প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সচেতন লেখকরা সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। এটা কখনও ভোলেননি যে সামাজিক চেতনা হিসেবে সাহিত্য সামাজিক ন্যায় এবং মানুষের গরিমা প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে একটি শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে। বক্তব্য ওরূপ যাই হোক না কেন, জনগণের দুঃখ দুর্দশার চিত্রণ ও সামাজিক ন্যায় এবং মানুষের গরিমার উন্মোচন চাই।

সাম্রাজ্যবাদ সাহিত্যের এ ধরনের ভূমিকা চায় না। সে সাহিত্য থেকে সামাজিক প্রতিবদ্ধতার বিরুদ্ধে স্বার্থ, সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তি এবং পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যথাস্থিতি দাবী করে। সাহিত্যে সে সব ধরনের পতনশীল এবং বিকৃত চিন্তার সমাবেশ

চায় এবং চায় যে এ ধরনের প্রজন্ম জন্মাক যারা তার শাসনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না।

উদাহরণ হিসেবে প্রকাশন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কোম্পানীগুলির তথাকথিত সাহিত্যগুলি দেখুন। প্রায় সবই সস্তা বিকৃত এবং পতনোন্মুখ কামুকতা, হিংসা প্রবৃত্তিগুলির নকল উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে এই বইগুলির লক্ষ্য নবযুবক প্রজন্ম, যাদের তারা সংবেদনহীন সমুদায়ে বদলে দিতে চায়। যখন সমাজে ব্যাপক স্তরে অন্যায়ের রক্তক্ষয় তখন প্রয়োজন সংবেদনশীল লেখকদের, সেই সময় এই বইগুলি তার পাঠকদের সংবেদনহীন এবং উন্মত্ত করে তুলতে চায়।

এ ছাড়া এই বইগুলি পুঁজিবাদী চিন্তাধারার লক্ষ্যে তার পাঠকদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে চায়। সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক প্রকাশিত এই সাহিত্য তার অসৈনিক লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়ায় যে অধীনতা দাবী করা হয় তা সৈনিক কর্তৃত্ব থেকে বেশী ক্ষতিকারক। সব বই, পত্রপত্রিকা, মুদ্রিত এবং ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম নিজেদের পাঠকদের দর্শকদের এবং শ্রোতাদের নতুন মূল্য, নতুন আচার, দৈনন্দিন জীবনের নতুন অনুশীলন টানার এবং তার ব্যক্তিত্ব নির্মাণের চেষ্টা করে। উপনিবেশবাদ মেকলের শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে, দেখতে ভারতীয় কিন্তু চিন্তায় ইংরেজ তৈরী করার চেষ্টা করেছিল, আজ সাম্রাজ্যবাদ ব্যাপক স্তরে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়।

এই সব চিন্তাধারার উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও একটি আর্থিক উদ্দেশ্য রয়েছে। সব ধরনের উৎপাদনের মত সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যের সব থেকে বড় বাজার রয়েছে বিকাশমান দেশগুলিতে। অনেক বেশী লাভ রেখে তারা তাদের সাহিত্য এখানে বেচতে চায়। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণে দুটি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। একটি অধীনস্থ সাহিত্য চেতনার নির্মাণ এবং দ্বিতীয়তঃ নিজের উৎপাদন বিক্রী করা। কেবল তাই নয়, ওরা লোকেদের পরিবর্তনকামী চেতনা এবং প্রয়াসগুলিকে ভোঁতা করে দিচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংঘর্ষে লিপ্ত থাকা ভারতীয় পাঠকদের সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্য আকর্ষিত করে কি করে? এখানে আমাদের সমাজের আধা-সামন্ত আধা-উপনিবেশী চরিত্রই যে সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের আশ্রয়স্থল এটা বোঝা দরকার।

সামন্ত প্রকৃতি সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যে বর্ণিত সম্পত্তির ধারণকে মেনে নেয়। সম্পত্তির ভিতের উপর নির্ভর যে কোন ব্যক্তির গুরুত্ব বিচার করা এই সাহিত্যের মূল ভিত্তি। এ বিষয় নিয়ে সামন্ত সংস্কৃতির কোন মতবিরোধ নেই। এইভাবে এই বইগুলি অসমানতার চিন্তাধারাকে উৎসাহিত করে যা ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ব্যবস্থায় নিহিত। এ ছাড়া রাজ্যও যা সত্ত্বার অধিকারের কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টায় যুক্ত, এই বইগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে। কারণ তা বহু সাংস্কৃতিক অনুশীলনের স্থানে সমন্বিত সংস্কৃতির পক্ষে।

এ কথা সর্বমান্য যে এই বইগুলি সাহিত্যের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে পড়েনা। এ গুলিকে বাজে সাহিত্য হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু সামান্য সাহিত্য এবং বাজে সাহিত্যের মধ্যেকার তফাৎটা কম হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা দেখছি যে দুজনেই একে অপরের নকল করে। আমাদের চিন্তার কারণ সেই মূল্যগুলিকে নিয়ে যা এই ধরনের বইগুলিকে উৎসাহিত করে। তা সাহিত্যের নামে বা বাজে সাহিত্যের নামেই হোক না কেন।

এই সাহিত্যের স্থাপিত মূল্য আমাদের সংবেদনশীলতার উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। এই মূল্য ভাগ্যবাদ ও নিরাশাবাদকে উৎসাহিত করে। এটা ন্যায়, সংবেদনা, স্বাভাবিক প্রকৃতি, দারিদ্রের ভাবনাচিন্তা এবং সামাজিক ন্যায়ের চিন্তাধারাকে নষ্ট করে দেয়। এইভাবে এই ধরনের সাহিত্য আমাদের যুব প্রজন্মের বিশ্বাস সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

এই জন্য এই সাহিত্যের প্রতি আমাদের বিরোধ পুরোপুরি সিদ্ধান্তগত। উত্তেজনার জন্য আমাদের সস্তা উপায় মাদক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। আমরা শ্রেণী সংগ্রামে ও শত্রুর উপর বিজয় হাসিল করে যে উষ্ণতা পাই তা ভিন্ন ও ব্যাপক।

সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যের প্রতি আমাদের বিরোধ অনেক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দীর্ঘকালীন কর্মসূচির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষেই এই ধরনের সাহিত্যকে ইতিহাসের আবর্জনায় ফেলে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাৎকালিক ভাবে আমাদের এই সাহিত্যের বিরোধের প্রতিটি সম্ভাবনা খোঁজা উচিত। এই সাহিত্য মহিলাদের, গরীবদের এবং যুবকদের সবাইকে প্রভাবিত করে। তাই এর বিরোধ এ এদের প্রতিনিয়ত সমালোচনা, তার বিপদের বিশ্লেষণ এবং সময় সময় এ বিষয়ে লোকেদের সচেতন করা আমাদের নিয়মিত কর্মসূচীর অংশ হওয়া উচিত।

অনুবাদ : কাঞ্চন কুমার

আরবী সাহিত্য : আধুনিক কাল

এক

উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ওটমন তুর্কিরা সমগ্র আরবজগতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখেন। এই সময় মীলনদের উপত্যকায় আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রথম সূর্যোদয় দেখা দেয় বলা যায়। আরবী সাহিত্যের এই যুগান্তরের স্রষ্টা হলেন মোহাম্মদ আলি (খ্রিঃ ১৭৬৯-১৮৪৯) ও তাঁর দুই উত্তর সাধক অল-জাবার্তি (খ্রিঃ ১৮২৫-১৯০১) এবং অল-ইব্রাহিম (খ্রিঃ ১৮২৭-১৯০০)। আবদুল্লা ফিকোরি (খ্রিঃ ১৮৩৪-৯০), আলি অল-লেথি (খ্রিঃ ১৮৩০-৯৬), আবদুল্লা অল-নাদিম (খ্রিঃ ১৮৪৪-৯৬) প্রমুখ লেখকরাও গদ্য ও পদ্যে আধুনিক আরবী সাহিত্যের পথ প্রশস্ত করে দেন, যদিও এঁদের রচনায় ওটমন ঐতিহ্যের ধারা কিছু কিছু রয়ে গেছে। কেননা, ক্ষয়িষ্ণু তুর্কি সুলতান তখনও মুসলিম জগতের অধিকর্তা—ইসলামের ধ্বজাধারী প্রতিভূ। আরবী কবিরা তখনও তাঁর স্তুতিনামে শতমুখ। জামাল-অল-আফগানী (খ্রিঃ ১৮৯৭-১৯৭২) ও তাঁর প্রখ্যাত উত্তরসূরি মোহাম্মদ আবদুহ্ (খ্রিঃ ১৮৯৯-১৯৭৬) আরব জগতে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার নতুন স্রোত নিয়ে আসেন। আলি আবু-নগর (খ্রিঃ ১৮৯৮-১৯৬৭), ইব্রাহিম অল-নুআলিহি (খ্রিঃ ১৯০১-৬৯), মুস্তফা কামিল (খ্রিঃ ১৯০০-৭২), এবং প্রসিদ্ধ 'মিশর কবি' ও নাট্যকার আহ্মদ শওকি (খ্রিঃ ১৮৬৮-১৯৩২), হাফিজ ইব্রাহিম (খ্রিঃ ১৮৭১-১৯৩২), ইসমাইল সাবরি (খ্রিঃ ১৯০২-৭২) প্রমুখ কবি ও মনীষীরা আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রগতির পথ প্রস্তুত করেন। সিরিয়ার লেখক আহ্মদ ফরিস অল-সিদ্ধিক (খ্রিঃ ১৯০১-৮২), সুদূর মরক্কোর সিহার অল-দিন (খ্রিঃ ১৯০৫-৮১) এবং সিরিয়ার মিশরী কবি খলিল মতরুন (খ্রিঃ ১৮৭২-১৯৬৮) প্রমুখ কবি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকরাও এ সময় আধুনিক আরবী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন।

খেদিভ দ্বিতীয় আব্বাস হিল্‌মির (খ্রিঃ ১৮৯২-১৯১৪) আমলে মিশর সমগ্র আরব সাহিত্যের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। নতুন ভাবধারার অন্যতম রূপকার 'ফরা অন্‌তুন' আলেকজান্দ্রিয়ায় অল-জামিয়া অল-উথমানিয়া' নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেন। জর্জি খাদান (খ্রিঃ ১৮৬১-১৯১৪), আদিব ইশাক (খ্রিঃ ১৮৮০-১৯৭১), কবি উরালি অল-দিন ইয়াকন (খ্রিঃ ১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ বুদ্ধিদীপ্ত স্রষ্টাদের গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে, কবিতায় ওটমন সাম্রাজ্যের পতন এবং পশ্চিম এশিয়ায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে রুশ-তুর্কি যুদ্ধ, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রীক যুদ্ধ, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ইতালি-তুর্কি যুদ্ধ ও ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের বলকান যুদ্ধ এবং ইওরোপীয় শক্তির কাছে তুরস্কের উপর্যুপরি বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া আরবী সাহিত্যেও দেখা দেয়। খলিল মতরুন বুয়র যুদ্ধের পটভূমিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে বহু কবিতা রচনা করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে নব-জাগ্রত জাপানের হাতে সম্রাজশাহী জারের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়াও আরব সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে আব্বাসী যুগের সাহিত্যধারা ও দার্শনিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার তখন প্রবল প্রচেষ্টা চলে আরবী সাহিত্যে। কিন্তু নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিশর অভিযানের (খ্রিঃ ১৭৯৮-১৮০১) পর আধুনিকতা ও নতুনত্বের স্রোতও বইতে থাকে আরবী সাহিত্যে। ইওরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার সভ্যতার প্রতি আরব জনসাধারণের দৃষ্টি তখন আকৃষ্ট হয়। সিরিয়া ও লেবাননের খ্রিস্টান পাদ্রীদের দান এই ক্ষেত্রে কতখানি ছিল বুতরুছ অল-বুস্তানির (খ্রিঃ ১৭৯৯-১৮৮৩) রচনাই তার প্রমাণ। রিফা অল-তিহতাকী প্রথম মিশরীয় কবি যিনি প্যারিসে গিয়ে ফরাসী আঙ্গিকের অনুকরণে আধুনিক কবিতা লেখার রীতিটি আরবী সাহিত্যে প্রচলন করেন। ১৮৯৪ সালে কবি খলিল মতরুনই আধুনিক আরবী কবিতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন বলা যায়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর 'অল-খলিল' বা 'বন্ধু' কবিতা গ্রন্থ এর প্রমাণ।

দুই

মিশরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই সময় আধুনিক আরবী সাহিত্য ও ভাষার প্রসারে এগিয়ে আসে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহ ও আনুকূল্যে বহু কবি ও গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারদের রচনা আরবী সাহিত্যকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলে। শাকির আসলাম, আমিন রিহানি, জিব্রান খলিল, মেরি জিআকা, মোহাম্মদ অল-আকোরাদ, মোহাম্মদ লুতফি প্রমুখ লেখকেরা এখনও লিখছেন— গল্প, কবিতা, নাটক,

উপন্যাস, প্রবন্ধগ্রন্থ প্রভৃতি। বিজ্ঞানসম্মত ও পাশ্চাত্য ধারায় প্রভাবিত সমালোচনা সাহিত্যও এখন সৃষ্টি হচ্ছে।

আহম্মদ শওকি ও হাফিজ ইব্রাহিমের দুটি কবিতার অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা গেল। বসন্তের আগমনে উচ্ছ্বসিত হয়ে শওকি গেয়েছেন

মধুমাস এসেছে,
হে বন্ধু এসো
অভ্যর্থনা করো বসন্তকে
তোমার আনন্দলোকে।
আনন্দ-সুধা-পিপাসু সকলকে
বসন্তের পতাকা হাতে তুলে নিতে
উদ্দীপিত করো—
সবুজ অঙ্গন ঢাকো
আনন্দের রাঙা ফুলে ফুলে।

(এইচ. এ. আর জিব-এর 'আরাবিক লিটারেচার' গ্রন্থ থেকে গৃহীত ও অনূদিত)

হাফিজ ইব্রাহিম তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'শেখ আবদুহুর' শ্লোক-গাথায় লিখেছেন

প্রাচ্য আজ গভীর শোকে
অশ্রুপাত করছে
সারা বিশ্ব বেদনাহত, অশ্রুসিক্ত।
ভারতে শোকের ছায়া,
চীনেও দুঃখের স্রোত প্রবাহিত
মিশরের ঘরে ঘরে আর্তনাদ,
সিরিয়া বেদনা-বিধুর,
পারস্যের আকাশে বাতাসে মিশেছে দীর্ঘশ্বাস
তিউনিসের হ্রদ-নদীর ঢেউয়ে করুণ হা-হুতাশ।

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে গৃহীত ও অনূদিত)

কবি আহম্মদ শওকি ও ইব্রাহিম হাফিজ সত্যিই মিশরীয় ঐতিহ্যের জয়গান গেয়ে আরবী সাহিত্যকে মহিমান্বিত করে গেছেন। আরবী সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের ধারায় এই এক স্মরণীয় যুগ। আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রগতির পথে সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের দানও অপরিসীম। 'অল্-ওয়াকয়েউল মিছারয়া', 'আছ ছিয়াছত', 'অল্-আহরম' প্রভৃতি মিশরের বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেয়। 'আছ ছিয়াছত' পত্রিকায় 'হাদিসুল আরবাআ' বা বুধবারের সাময়িকী আলোচনায় ডক্টর তাহা হোসেন বহু প্রবন্ধে উসমিয়া ও আব্বাসীয় যুগের প্রাচীন কবি : আবু নওয়াছ, বশসার বিন বুরদ, মুতী বিন আরাছ প্রমুখদের কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে সার্থক আলোচনা করেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে আরবী সাহিত্যকে সংস্কারমুক্ত করতে সহায়তা করেন। 'আছ ছিয়াছত' সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে মোহাম্মদ মনসুর ফাহমী, অধ্যাপক আহমদ আমিন ও মোস্তাফা আবদুর রাজেক প্রমুখ পণ্ডিতেরা এক সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। যে ছাশ্চিক গদ্য এতদিন ধরে আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহনরূপে চলে আসছিল তা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের দৌলতে জনসাধারণের ভাষা হিসাবে সহজ, সরল নিরাভরণ রূপ নিল। বিদেশী বহু শব্দ এবং স্থানীয় কথ্য ভাষাও আধুনিক আরবী সাহিত্যজগতে স্থান করে নেয়। আরবের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র আরবীভাষাকে তার দুরূহ দুর্বোধ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্তি দেয়।

আরবী ভাষার সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মিশরে 'রয়েল ফিলোলজিক্যাল অ্যাকাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 'অ্যাকাডেমি'তে নিচের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল

ক. আরবী ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে যুগের চাহিদা অনুযায়ী আরবী ভাষাকে সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের প্রকাশক্ষম করে তোলা।

খ. বিদেশী ও কথ্য পরিভাষাকে আরবী রূপ দান করা —যদি আরবী ভাষায় উপযুক্ত প্রতিশব্দ পাওয়া না যায়।

গ. সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সংবলিত অভিধান সঙ্কলন।

আরবী ভাষার বিভিন্ন দিক ও পরিভাষা গ্রহণ সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্য এই 'অ্যাকাডেমি'র অধীনে কয়েকটি সাবকমিটি গঠিত হয়। ড. তাহা হোসেনের সম্পাদনায় 'অ্যাকাডেমি'র নিজস্ব মুখপত্রও প্রকাশিত হয়। বলিষ্ঠ গবেষণা ও তুলনামূলক আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রবর্তক হিসাবে ড. তাহা হোসেনের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

নাটক

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরবী সাহিত্যে নাটকের প্রচলন হয় নি। বিদেশী বণিক ও পর্যটকের দৌলতে যে দু'চারখানা নাটক আমদানি হত, তাদের অভিনয়ও একরূপ নিষিদ্ধ ছিল রক্ষণশীল আরব সমাজে। কেননা, নাটক বা দৃশ্যকাব্যের বিধান ছিল না শাস্ত্রে। নেপোলিয়নই আরব জগতে (মিশরে) প্রথম আধুনিক রঙ্গালয়ের সূচনা করেন। মিশর অভিযানের পর সৈন্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য মিশরে তিনি আমদানি করেন থিয়েটার বা রঙ্গালয়।

তারপর প্রায় অর্ধ শতককাল কেটে যায় আরবী সাহিত্যে সত্যিকারের নাটক রচিত হতে। কাশিম আমিনের নাটকগুলি

—'নারীর মুক্তি ও নতুন নারী'—ভিত নড়িয়ে দেয় আরব সমাজের। রঙ্গমঞ্চের জন্য নতুন নতুন নাটক লিখতে প্রেরণাও যোগায় পরবর্তীকালের লেখকদের। বেইরুটের খ্রিস্টান নাট্যকার মারুন নাকাশ (খ্রিঃ ১৮১৭-৫৫) ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের একখানি নাটক অনুবাদ করেন। তাঁর 'হারুন-অল-রসিদ' নাটকখানি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়। নাকাসের নাটকে ইতালীয় রঙ্গালয়ের প্রভাব দেখা যায়। শেক্সপীয়র, ভিক্টর হুগো বা কর্নেলির অনেক নাটকও এ সময় আরবী ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। বিভিন্ন ক্লাব আর প্রতিষ্ঠানে তাদের অভিনয়ও হয় সাফল্যের সঙ্গে। অল-বুস্তানীর কাব্য-নাট্যগুলি আগ্রহের সঙ্গে সকলে বরণ করে নেন। কবি আহ্মদ শওকীর নাটকগুলি সত্যি যুগান্তরের সূচনা করে আরবী নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে। তাঁর 'ক্লিওপেট্রার মৃত্যু' (১৯২৯), 'মজনু-লায়লা' (১৯৩১), 'আলি-বে-অল-কবির' (১৯৩২) আর 'আন-তারা' (১৯৩২) প্রভৃতি নাটকগুলি প্রাচীন মিশরের ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি। ফারাওদের আমল থেকে আরব সংস্কৃতির উজ্জ্বল দিকটা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সেরা নাটকগুলিতে। আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, দার্শনিক ভাবসম্পদ আর কলানৈপুণ্যে তাঁর রচনা একালের আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। খলিল মতরুনের অনূদিত শেক্সপীয়রের 'ওথেলো', 'হ্যামলেট' আর 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', মিশরের সেরা অভিনেতা জর্জ অবিয়াতের সজীব অভিনয়গুণে মিশর ও সিরিয়ার অনেকের চিত্ত জয় করে। মতরুন 'মিশর জাতীয় নাট্যসম্প্রদায় সমিতি'র সভাপতিও ছিলেন। তাওফিক-অল-হাকিমের 'গদ্ধভলিকার দল' (১৯৩৩) সমকালীন আরবী গদ্যনাটকের পথ প্রদর্শন করে। 'সেসিব অল-রিহ্যভিন' ও 'আল্লিজ্ব' গোষ্ঠির আরবীয় নাটকগুলিও কায়রো ও অন্যান্য শহরে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও পঠিত হয়ে আসছে।

চার

আধুনিক আরবী কবিতার এখন যুগসন্ধিক্ষণ বলা যায়। গত দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমগ্র আরবজগতের রাজনৈতিক পরিবর্তন যেমন ঘটেছে, তেমনি তার কবিতারও রূপপরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ভাবধারা ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ছাড়া ছন্দ ও শব্দবিন্যাসের দিকে এখনও আধুনিক আরবী কবিতা সেকালের কাব্যধারাকে আঁকড়ে রয়েছে। ইব্রাহিম হাফিস ও আহ্মদ শওকি নানা দিক থেকে দেশ ও জাতিকে প্রবুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করে তুললেও আধুনিক কোনো কোনো সমালোচকের কাছে তাঁরাও হলেন মধ্যযুগীয় কবিদের পর্যায়ভুক্ত।

প্রসিদ্ধ ইরাকী কবি আল-রুসাফির কবিতায় আধুনিকত্বের সঠিক রূপটি ধরা পড়ে। এখনকার অধিকাংশ কবিতায় ধূসর মরুভূমি, দুর্ধর্ষ বেদুইন, উটের ক্যারাভান কিংবা সুশীতল মরুদ্যানের পরিবর্তে বর্তমান আরবজগতের বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতার প্রচ্ছন্ন দিকটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সমকালীন কবিরা কেবল কবিতার জন্য কবিতা লিখে তৃপ্ত থাকেন নি। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে এ. জে. আরবেরি আধুনিক আরবী কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যে সঙ্কলনটি প্রকাশ করেছেন, তাতে আধুনিক আরবীকবিতার মোটামুটি তিনটি পরিচয় মেলে

(ক) বিদেশী প্রভাবপুষ্ট বিশ্বজনীনতা; (খ) প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কবিতা; (গ) প্রাচীন ও নবীন ভাবাদর্শের মিলন ঘটেছে এমন সব কবিতা।

উক্ত সঙ্কলনে কবি অল-রুশকি ইরাকের অতীত মহিমা-বন্দনায় পঞ্চমুখ। অল-আহ্মদের 'সিরিয়ার সূর্যাস্ত' এবং খলিল মড়বুমের 'জ্যোৎস্না', 'পরিশেষ', 'নদীর পরপার', 'নীল প্রজাপতি' প্রভৃতি কবিতা কাব্যরসিকদের নিশ্চয় আনন্দ দিতে পারে। বঞ্চিত মানুষের অতৃপ্ত কামনা, ব্যথা-বেদনা ও হতাশার সুরের প্রতিধ্বনি তোলে তাঁদের সাম্প্রতিক বহু কবিতা। ইলিয়াস আবু শবকাহ্-এর 'মৃত্যুস্বাদ' ও 'জীবনস্বাদ' কবিতা দুটি আরবেরির সঙ্কলনের সার্থক দুটি সংগ্রহ। 'সিরিয়ার সূর্যাস্ত' কবিতাটির দুটি স্তবক নিচে উদ্ধৃত করা গেল

একটি খেজুর গাছ জেগে থাকে
প্রহরীর মত,
কত বর্ষ কত যুগ হয়েছে বিগত
পাতায় পাতায় ব্যাকুলতা—
চুপি চুপি বলে যায় প্রাচীনকালের রূপকথা।

নৌকোর মতো সাবলীল
মেঘ চলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিগন্তের নীল;
হে নাবিক, পাল তোলো। ছলছলো
আকাশের নীল দ্বীপে চলো।

পাঁচ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সিরিয়া ও লেবাননে কাব্যচর্চার প্রবল ঢেউ বইতে থাকে। বেইরুট শহরের 'শিখা' (খ্রিঃ ১৯৩১) পত্রিকার সম্পাদক বিশারা অল-খুরি শিবলি অল-মুত্রত, প্রয়াত কবি আমিন তাকি অল-দিন (খ্রিঃ ১৮৭২-১৯৩৭) এবং ইলিয়াস ফুয়ার্দ (খ্রিঃ ১৮৬৯-১৯৩৭) তাঁদের কবিতার জন্য খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বেইরুটের

সাপ্তাহিক পত্র 'প্রদর্শনী' (১৯৩৫) ও দামস্কাসের 'সময়' (খ্রিঃ ১৯৩৫) পত্রিকাও আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রগতিকে সাহায্য করে। শুধু কাব্য-সাহিত্য নয়, কবিতার বিভিন্ন দিক আলোচনায় এই সময় বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। ফুয়াদ আফ্রাম অল-বুস্তানির 'বিস্ময়' (খ্রিঃ ১৯৩২), বেইরুটের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক আনিস অল-মাক দিসি এবং মিশরের ড. তাহা হোসেনের (তাঁর অবদানের কথা আগেই বলেছি) উদ্যমে আধুনিক আরবী সাহিত্যের—বিশেষ করে কাব্য-আলোচনার বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত হয়। যুদ্ধের পর বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র ও চিত্রশিল্পের দৌলতে 'খঞ্জল' বা লোক-গাথার কদরও বেড়ে ওঠে। বেদুইন, ফালাইন ও অশিক্ষিত পার্বত্যজাতিদের মুখে মুখে এইসব প্রাচীন লোক-গাথা এককালে ঘুরে বেড়াত। যাযাবরী উপজাতিদের প্রেম, বিরহ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সব লোক-গাথা রচিত। আর তাদের রচনাকালও আজকের নয়। 'আরবা-রজনী'রও আগে থেকে মুখে মুখে চলে আসছে।

ভীরু প্রেম আনে সংশয়। ভয় হয়, পাছে বুঝি হারিয়ে যায় তার প্রেম ও প্রিয়া। দরিদ্র কবির মনে দানা বাঁধতে থাকে সন্দেহ। তাই প্রিয়াকে সম্বোধন করে বলছেন

চালমা প্রিয়া, ডালমা প্রিয়া।
মুক্ত ওগো করছ কেন নিঃস্বটিরে?
দীন আমি, মন দেয়া-নেয়ার
সাধ্য কোথা?
প্রেমের ফাঁদে বদ্ধ তবে করলে কেন।
শাদির দুদিন পরেই যে গো তালাক দেবে
জানি জানি।

(আর. এ. নিকলসন-এর 'এ লিটারারি হিস্ট্রি অব দা আরবস' থেকে গৃহীত ও অনূদিত)

ধূ ধূ মরুভূমির দূর কান্তার কাঁপিয়ে ভেসে আসে বিরহকাতর কোনো প্রেমিকের গানের রেশ :

আগুন, আগুন, আগুন
জ্বলছে বুকে আগুন—
এ আগুনে জ্বলছ তুমিও, তা জানি—
আর কতকাল এ আগুনে পুড়তে হবে
বলে দাও তুমি
সুন্দর মরুভূমি।

(এ. জে. আরবেরির 'মর্ডান আরাবিক পোয়েমস থেকে গৃহীত ও অনূদিত)

এমনি আর একটি লোক-গাথা

ও মিজয়ানা। ও মিজয়ানা। ও মিজয়ানা।
আমার সকরুণ গান শুনে
উড়ে এসেছে ফিঙে আর ময়না।
বন্দিনী তুমি প্রাসাদ দুর্গে
সুন্দর মুখ তোমার এখন শুষ্ক বিশীর্ণ।
তবু তোমার কালো দুই চোখে নেমে আসে
ভোরের সূর্যের কোমল স্পর্শ;
অথবা আমি আসব ফিরে তোমার কাছে—
সেই স্বপ্ন-দেখার প্রথম আলোটুকু।

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে গৃহীত ও অনূদিত)

সামাজিক উৎসব ও নানা অনুষ্ঠানে অথবা উট চরাতে চরাতে এমন সব লোক-গাথা গীত হয়ে আসছে বহুদিন থেকে। আধুনি কালের কবিরা এগুলিতে মিশিয়েছেন আধুনিক কালের আবেগ ও মেজাজ।

ছয়

একালের আরবী কথা সাহিত্য প্রগতির পথে পরিপূর্ণতার দিকে। আধুনিক আরবী সাহিত্যের একটি উন্নত শাখা উপন্যাস ও কথাসাহিত্য। এর আগে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা ও বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ (প্রধানত ফরাসী উপন্যাস) আরবী সাহিত্যে কথাশিল্পের স্থান পূরণ করে আসছিল। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের প্রসার ও জনপ্রিয়তা উপন্যাসের চাহিদা বাড়িয়ে তোলে। মনফলুতীর 'অল-আবরাত', 'আল্ল জাইবাতের রফা-ইল' ও অল্ মাজিনীর 'ইবমুতাতবীয়াত' প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থ এককালে পাঠক সমাজে জনপ্রিয় ছিল। ড. মোহাম্মদ হোসেন জয়কল (খ্রিঃ ১৮৮৮-১৯৫১) তাওফিক হাকিম (খ্রিঃ ১৯০১-৭২) ও অল-মাজেনির (খ্রিঃ ১৯১১-৮১) মতো শক্তিশালী লেখক ও অনুবাদকের প্রচেষ্টায় মৌলিক উপন্যাস রচনার অনুশীলন শুরু হয়। 'অল-আতলাস, আবু হাদিদের 'ইবনতুল মামলুক' ও তাহা হোসেনের 'অল-আয়আম' কারাওয়সের 'ডাক', 'আদিব', 'দুর্দশা-বৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাস নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য। তাহা হোসেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের আরব মনীষীদের জীবন অবলম্বনে চরখণ্ড গল্প সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন। কবি আহমদ শওকির 'আবরা অল-হিন্দ (ভারতকুমারী) খানিকটা খাপছাড়া হলেও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস। মোহাম্মদ ইব্রাহিম অল-মুআলিহির 'ইসা-ইবন-হিসাম-কথা', হাফিজ ইব্রাহিমের 'নায়াল সতী' ও মোহাম্মদ লুৎফি জুমার 'নায়ালি-অল-বু-অল হোর' প্রভৃতি শক্তিশালী

রচনার দ্বারা আধুনিক উপন্যাসের গোড়াপত্তন হয়। আবদুল কাদের, অল-মাজেনি, আবদুল্লা ইনান, মোহম্মদ তাইমুর প্রমুখ কথাশিল্পীদের লেখায় উপরওলার আরবসমাজের খুঁটিনাটি চিত্র, সমাজে নারীদের স্থান, তাঁদের দুঃখযন্ত্রণা ভোগ, ব্যর্থতা হতাশা প্রভৃতি বিবরণ পাওয়া যায়। তাইমুরের গল্প-সংগ্রহ 'অল-সেখ-জুমা' কথ্যভাষায় সৃষ্ট প্রয়োগের নমুনা। এই সেদিনও পর্যন্ত আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যে ক্লাসিক-ঘেঁষা রচনা-রীতির প্রভাব বজায় ছিল। অল্-মারেনির লেখক ইব্রাহিম' (খ্রিঃ ১৯৬১) এর নিদর্শন। কিন্তু তাহা হোসেন, আহ্‌মদ আমিন, জায়কল ও তাওফিকুল্‌হাকিম প্রমুখ শক্তিধর লেখক ও কথাশিল্পীরা একালের আরবী উপন্যাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

সাত

এখনও এশিয়ার ভারত, চীন, জাপান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের সাহিত্যের বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব আরবী সাহিত্যে নেই। আরবের মরুজীবনের আধারের উপরে রচিত গীতি-কাব্য ও গাথা-কাব্য ভিন্ন আরবী সাহিত্যের বিপুল অংশই অন্য দেশের—বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীসের ও পারস্যের—সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছে। কিন্তু তা হলেও ইসলাম ধর্মের প্রথম ও প্রধান বাহন বলে আরবী ভাষার একটা অসাধারণ প্রতিষ্ঠা আছে এবং সেই প্রতিষ্ঠার ফলে বিগত হাজার বারো তেরো শ' বছর ধরে আরব ও আরব ভিন্ন অন্য জাতির চেষ্টায় এই ভাষায় একটি বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং সে প্রতিষ্ঠা এর সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছে। ইতিহাস বিশিষ্ট অর্থাৎ ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, গদ্যে ও পদ্যে নিবদ্ধ, সুকুমার সাহিত্য—এ সমস্ত বিষয়ে আরবী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আরবীর সাহিত্যে বিশ্বজনের বিনোদনের উপযোগী বহু অমূল্য রত্ন যে সঞ্চিত আছে তা নিশ্চয় স্বীকার্য।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-পঞ্জি :

এক. অ্যারাবিক লিটারেচার এইচ. এ. আর. গিব

দুই. এ লিটারারি হিস্টরি অব দ্য আরবস আর. এ. নিকলসন

তিন. চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া (প্রথম খণ্ড)

চার. মডার্ন আরাবিক পোয়েমস এ. জে. আরবেরি

পাঁচ. বৈদেশিকী ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বরাজ সেনগুপ্ত

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অনুবাদ কবিতা

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কবি জ্যোর্তিময় দত্ত যথার্থই লিখেছেন স্বপ্নভ্রষ্ট দেবশিশু। জীবনের শুরু করেছিলেন সাম্যবাদী মতাদর্শকে আক্ষরিক নয়, অস্তিত্বের সত্যে, প্রাণের তাগিদে, মানুষকে ভালোবাসার স্বপ্নে। তৎকালীন বহু মানুষের অতলান্ত স্বপ্নও ছিল এক সুন্দর স্বাধীন সপ্রাণ মানুষের পৃথিবী গড়ে দেবার। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও সেই আলোর দিব্যতাকে ছুঁয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। 'এই পথে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে', এরকম ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন কবিতায় সেই মুক্তির কথা লিখে মানুষের জীবন পাল্টে দেবেন, আন্তর্জাতিক মানুষের, জনযুদ্ধের, বিপ্লবী মানুষের সংগ্রামের কবিতার অনুবাদ করে তিনি তাঁর 'পদাতিক'-এর যাত্রা অনন্ত নীলিমায় নিয়ে যাবেন। তাঁর জীবন, কবিতা, কবিতার অনুবাদ মানুষের মুক্তির গান গেয়ে যাবে আমৃত্যু। কিন্তু হয়নি। কোনো সূক্ষ্ম পরিহাস হয়তো ছিল—যা তিনি ধরতে পারেননি জীবনের অনেক পর্যায়ে। কবিতায় মুক্তি জীবনে রূপ পায়নি।

কবিতা, কবিতার অনুবাদ এবং জীবনযাপনের সমীকরণ খুব বিপজ্জনক বিপন্ন রাস্তা। পরবর্তী জীবনে মতবাদ ও তার প্রয়োগ, বিশ্বাস ও চারিদিকের বিভ্রান্ত প্রলোভনের ভেতর একজন সত্যদ্রষ্টা কবিকে কখন কীভাবে দূরত্ব টানতে হয়, অন্ধকার খাদগুলিকে চিনে ত্যাগ ও স্বাধীনতার ঝুঁকি নিতে হয়, সমগ্রভাবে একা হয়ে গেলেও না হলে তিমির হননে গিয়ে সেই তিমিরেই আস্তে আস্তে গ্রস্ত হতে হয়। যথার্থ প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও মানুষজীবনের নিমজ্জমান গ্রাসের পরিণতির ছোঁয়া থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও নিজেকে আড়ালে সরিয়ে

নিয়ে নতুন পথ খুঁজে নিতে পারেননি। যেখানে জীবনানন্দ এই অন্তর্গত বিপন্নতায় নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন,

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার
আলোড়ন নেই, পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ
ছাড়া।

তবুও, এই শাপভ্রষ্ট দেবশিশুটি তাঁর কবিতায়, অনুবাদ কবিতায় দিব্যতার অর্থাৎ মানুষকে ভালোবাসার, মানুষের স্বাধীনতার আলোককণা দিয়ে আমাদের ছুঁয়ে গেছেন, আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞ।

ফুলগুলো সরিয়ে নাও আমার লাগছে /
মালা জমে জমে পাহাড় হয় / অথবা

ফুলকে দিয়ে মানুষ বড় মিথ্যে বলায় বলেই / আমার ফুলের প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই। —এরকম স্মরণীয় কবিতা লিখে তিনি আমাদের সুরভিত করেছেন চিরকালের জন্যই। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোঝার জন্য বোধহয় এর চেয়ে একটা গোটা মহাভারত লিখলেও এত গভীর অতল সুদূর বেদনায় বোঝানো যেত না। আবার ধ্বংসাবশেষ মানুষের গভীরে যে ফুলের শুদ্ধতা আছেই তার সুরভিকেই তিনি আবার ইশারায় আনেন। রাজনীতি সৃষ্ট চড়া চ্যাচামেচি, ছদ্ম জনগণেশের চিৎকারের পোড়া গন্ধের ভেতরেই মাঝে মাঝে সুকারিত বিচ্ছিন্ন একাকী বুকলফুল গুলি। করেকদশকের মধ্যেই মন্ত্রী, আমলা, ব্যবসায়ীপ্রাণ সংস্কৃতি জগতের ভেতর তাঁর অনুবাদ কবিতাগুলি আশ্চর্য অম্লান ব্যতিক্রম। আন্তর্জাতিক কবিতা, প্রাচীন ভারতীয় কবিতাকে তিনি বাংলাভাষায় বাংলা কবিতার মৌলিকতা ও তার হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে একেবারে আকাশ-গঙ্গার মতো মিশিয়ে দিতে পেরেছেন। তুর্কী কবি নাজিম হিকমত আর শুধু তুরস্কের নন, তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষেরও, এই গৌরব সম্পূর্ণভাবেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ পড়তে পড়তে আমাদের কখনও মনে হয় না, আমরা অন্য ভাষার কবিতা পড়ছি। সমস্ত আন্তর্জাতিকতার মূল প্রাণসূত্রটিকে দেশ-কালের সব বেড়া ডিঙিয়ে তিনি বাংলার নদীতে বইয়ে দিতে পেরেছে তাঁর অনুবাদ কবিতার মাধ্যমে। জীবনানন্দ যা পেরেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর সুচেতনা, সুরঞ্জনা, বনলতা, সরোজিনী, লোকেন পালিতরা বাংলার হয়েও সমস্ত হয়াইজন পেরিয়ে পৃথিবীর প্রাণের সমীপে চির আর্ত হয়ে আছে।

'নাজিম হিকমত'-এর অন্তর্গত 'আহম্মদ ত্বাইভার' কবিতায় যে ছবি পাই তা মনশ্চিত্রে দেখুন পৃথিবীর যে কোনো মনচিত্র ছড়িয়ে এক গভীর সত্যকে উন্মোচিত করে কিনা —'তিরিশ মাইল বেগে চলেছি/পুরনো ট্রাক সামলে ভাই/ সামলে চলো যেন পাহাড়গুলো দেখতে পায়/উলঙ্গ দিগম্বর আহম্মদ ত্বাইভারকে'। আহম্মদ ত্বাইভার শুধু একজন তুরস্কের মুক্তি যোদ্ধা হয়ে রইলেন না বাংলার, ভারতের কোনো জনপদের একজন স্বাধীনচেতা মানুষ যার স্বাধীনতার মূল্য তার ফাঁসি, তার উলঙ্গ দিগম্বর শরীরকে গাছে লটকে দেওয়া। বাংলায়, অন্ধ্রে, আরও নানান রাজ্যে যে মানুষ দেখা যায়। তুরস্কের মর্মধ্বনি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলাভাষার হৃদয়ে সঞ্চার করে দিয়েছেন। অথবা আমরাও যে বাঙালী বা ভারতীয় নই, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষ এই অস্তিত্ববোধ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এইসব অনুবাদকুসুমে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। 'পল রোবসন' কবিতায় পড়ি,

ওরা আমাদের গাইতে দেয়না, রোবসন
ইগল গায়ক, নিগ্রো ভাই আমার
আমরা আমাদের গান গাই ওরা চায়না।

প্রাচীন ফারসী কবি হাফিজের লেখা গজলের আনুবাদ করে তিনি বাংলা ভাষায় নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন। প্রায় ৭০০ বছরের ফারসী গজল বলে মনে হয় না, এতখানি সজীব সমসাময়িক প্রাণবন্ত—

গানে আর মদে জমাও আড্ডা
ভবরহস্য হাতড়ে কী লাভ? (স্বর্গে যা নেই)

অথবা,

এইখানে এসো এ পানশালায়
উপাসনালয়ে যেয়ো নাকো মোটে (হে দিশারী)

অথবা আর একটি অনুবাদে পড়ুন,

যদি হাফিজের একটি গজল
নিয়ে শুকতারা আসমানে মাতে
যদি নাচে যীশুখ্রীষ্ট সে সুরে
আশ্চর্যের কী রয়েছে তাতে? (সুবাভাস)

এখানে মঠ, মসজিদ, কবর, দেশ-বিদেশ কিছুতেই হাফিজের গজলকে বেঁধে রাখা গেলনা। এখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদগুলিকে কম্যুনিস্ট, অ-কম্যুনিস্ট, গণতন্ত্রী, এনার্কিস্ট অথবা অন্য কোনো গ্রুপে পুরে রাখা যায়না। এইসব অনুবাদ সব দেশের সব কালের—বাংলাভাষার অসমমান্য মাধুর্যে তাকে রূপময় করে রাখলেন।

আমি থাকবো শিকাগোর শ্বেত কপোতে
রোবসনের গানের মধ্যে আমি থাকব।'

—(দুঃখ হরতালের পাঁচ দিনের দিন)

তুরস্কের নাজিম হিকমত আর পারস্যের হাফিজ যেন বাংলার চিরকালের বন্য গোলাপ ও রক্তকরবী হয়ে ফুটে রইলেন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমে বাংলা ভাষায়। যে হাফিজের অন্বিষ্ট ছিল সত্য আর ঐক্য। ধর্মীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রেমের কবিতা ছিল তাঁর পথ—

এসো সাকি, এসো, রেখোনা বসিয়ে
হাতে হাত দাও, ভর্তি পেয়ালা ;
আগে ভাবতাম প্রেম কী সহজ,
আজ দেখি তাতে কী বিষম জ্বালা

(প্রেম সহজনা)

অথবা সেই আশ্চর্য কবিতাটির অনুবাদ, যেখানে হাফিজ নিজের মৃত্যু নিয়ে নিজেই মজা করেছেন,

আমি বলি, 'অত ব্যস্ততা কেন?
যেতেতো এখনও আছে ঢের দেরি।'
বলল সে, 'দেখেশুনে মনে হয়
এ নির্ঘণ্ট স্বয়ংকালেরই।'

ভারতীয় কবিতা গাথা সপ্তশতী, অমরুশতকের অনুবাদ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাঙালী পাঠককে চিরন্তন কবিতার রসাস্বাদন করিয়েছেন। অনুবাদে অনবদ্য বাংলা কবিতা ও ভাষার নজির বুদ্ধদেব বসু ছাড়া একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই প্রাণিত করেছেন বাংলা পাঠকের হৃদয়ে।

তাঁর মৃত্যুর পরেরকার শব্দ করুণ রাজনৈতিক টানা-হেঁড়ায় তাঁর সহজগভীর গোপন বকুলসুরভিকে নষ্ট করতে পারেনি—এই আশ্বাস আমাদের জন্য এখনও বেঁচে আছে। রাজনীতি সেখানেই শেষ হয়ে গেছে যেখানে সৃষ্টি খুঁজে পেয়েছে প্রাণের স্পন্দন, যে কোনো দাসত্ব থেকে মনের মুক্তি, যেখানে

'অন্ধ এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে।'

এই শব্দভ্রষ্ট শিল্পসত্তাটি কীসের যেন সন্ধানে ভেতরে ভেতরে প্রশ্নার্ত ছিলেন আমৃত্যু, বাইরে বাস্তবে সেসব প্রশ্নের উত্তর শেষ অব্দি মেলাতে পারেননি।

সুতনুকা সোম

—

যেসব বই না পড়লেই নয়

১) দুনিয়া কাঁপানো সেরা গল্প
সম্পাদনা ও অনুবাদ বৌধায়ন মুখোপাধ্যায়
বাউলমন প্রকাশন
২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলকাতা—১৯

২) কবিতার বই :
সন্নিহিতি
কণ্ঠস্বর প্রকাশনী

৩) **Black Milk**
Publishers—Writers Workship
Kolkata.

With Best Compliments From

VINAY ELECTRICALS

Dealers in Electrical Goods.
Contractors & Suppliers

37, Ezra Street
KOLKATA 700 001
Phone 2235 5739

My Compliments and
Best Wishes to Anubad Patrika

Keep it going and make us proud

Tanya Bal
(98300 10728)

With Best Compliments From

MADHU SUDAN BASAK

AUTHORISED AGENT (GOVT. OF INDIA)

For
All Postal Scheme, P.P.F., U.T.I., L.I.C.,
RBI 9% Tax Free Bond,
Company Fixed Deposit, All Mutual Fund

Basak Bhaban
2. JORABAGAN STREET. KOLKATA 700 006
RING 2269-9393

National Organisation For Implementation, Manifestation & Protection of Human Rights.

[Noimphur]

(For Violation of Human Rights)

19L. DR. A. K. PAUL ROAD. BEHALA,

KOLKATA - 700 034

Bidhan Chandra Ghosal
President (All India)
Ring 2468-7219

Sanatan Roychaudhuri
President (Eastern Region)
Ring 2546-1308

TUV
CERT
EN ISO 9002
Certificate : 041009318

RWTUV

Elevator Cars, Doors and Other Components
Enclosures for Electrical and Air Conditioning Industries

SPRING STEEL PRODUCTS

Plot No. A/298, Road 16-Z

Wagle Estate, Thane 400 604

Telephone 582 1341/1032 Fax 582 1032

esespl@bom